আপিলা-চাপিলা

অশোক মিত্র

প্রাককথা

অবচেতনা কখন চেতনায় রূপান্তরিত হয়, বলা মুশকিল, বিশেষত শিশুর নিজের ক্ষেত্রে। আমরা বলি অবোধ শিশু; সেই বোধহীনতা একটু-আধটু করে পাল্টে যায়, শিশু আপন-পর চিনতে শেখে, যাকে আপন বলে মনে হয় তাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে, অন্য কাউকে, কী কারণে সে নিজেও জানে না, দেখে, বা তার স্পর্শ অনুভব করে, ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। আনন্দ বা তৃপ্তি হলে শিশু খিল-খিল হাসতে শেখে, কিন্তু আনন্দের প্রথম অভিজ্ঞতা কোন মুহূর্ত থেকে, তা সে ব্যক্ত করতে অক্ষম। মানুষ ও অন্য জীব পেরিয়ে জড় বস্তু সম্পর্কেও তার একই প্রতিক্রিয়া। কোনওটা সে পছন্দ করে, কোনওটা থেকে ভয় পায়, অভ্যাসের সেতু বেয়ে অগ্রসর হতে-হতে শিশু ক্রমে প্রভেদ করতে শেখে। তার প্রথম অভিজ্ঞতার উপর অন্য অভিজ্ঞতার প্রলেপ পড়ে, যা পরিবর্তনের ভূমিকা নেয়, নয়তো সংশোধনের। আলঙ্কারিক অর্থে হাঁটি-হাঁটি পা-পা, শিশু অবচেতনা থেকে চেতনায় পৌঁছয়, নিজেকে সংসারের শরিক হিশেবে আবিষ্কার করে: সংসার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে প্রদেশ-দেশ, পরবর্তী পর্যায়ে সে পৃথিবীকে জানে, চেনে। এই চেতনাপ্রবাহের তাল-লয়-গতি এক-এক শিশুর ক্ষেত্রে এক-এক রকম। এই ভিন্নতা আমরা মেনে নিই, জীবনের রহস্যের মতো স্বতঃসিদ্ধ হিশেবে তা গ্রহণও করি।

অবচেতনার কোন লগ্নে এই ছড়াটি কে আমাকে শুনিয়েছিলেন, নিশ্চয় আদর করে, তা মনে আনা অসম্ভব: 'আপিলা-চাপিলা ঘন-ঘন কাশি, রামের হুঁকো শ্যামের বাঁশি...'। ছড়ার পরের চরণ ক'টি শৈশবের সঙ্কীর্ণ প্রহরগুলিতে আমার কণ্ঠস্থ ছিল। কখন তা স্মরণ থেকে মিলিয়ে গেছে, এখন আর মনে আনতে পারি না। বিদ্বজ্জনেরা আমাকে জানিয়েছেন, গোটা পূর্ববঙ্গময় ছড়াটির পাঠান্তর ছড়িয়ে আছে। সে সব আমার জানা নেই, এবং, কী আশ্চর্য, জানবার তেমন আগ্রহও নেই যেন। জীবনের সীমান্তে পৌঁছেছি, এখন নিজেকে গুটিয়ে আনতে চাই, আমার জানালার ওধারে জানি নতুন রোমাঞ্চ, কিন্তু পুরনো বিন্দুতেই স্থিত থাকতে চাই, আর তো বিস্ফারিত হওয়ার, বিস্তারিত হওয়ার সময় নেই। তাই আমি আমার ওই দুই-পঙ্‌ক্তিতে সঙ্কুচিত অবচেতনা থেকে উৎসারিত ছড়াটিকে বার-বার জড়িয়ে ধরি, পঙ্‌ক্তি দুটিকে, তাদের ভগ্নাংশিক সত্তা সত্ত্বেও, ঠোঁটে-জিভে হ্লাদিত করি: আপিলা-চাপিলা ঘন-ঘন কাশি...

এখন মনে হয় গোটা জীবনখানাই ছড়াটির মতো। যতগুলি পর্ব পেরিয়ে এসেছি, বেশির ভাগই ঝাপসা কুয়াশায় আবৃত: কোনও-কোনও মানুষজন-ঘটনার কথা মনে পড়ে, অনেক-কিছুই পড়ে না। ভয় হয়, আরও খানিক সময় গেলে স্মৃতি আরও দুর্বল হয়ে আসবে, এমনকি স্রেফ আপিলা- চাপিলা শব্দদ্বয়ের বাইরে কিছুই স্মৃতিতে অবশিষ্ট থাকবে না, আমাকে জড়িয়ে-জাপটে ধরা আপিলা-চাপিলা নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়বো।

হয়তো আমি একা নই, আমার কুড়ি বছর বয়সে জীবনানন্দের এক কবিতার মায়া-মদির

পঙ্‌ক্তিতে মন হড়কে পড়েছিল: 'অথবা যে সব নাম ভালো লেগে গিয়েছিল: আপিলা-চাপিলা...'। কিন্তু জীবনানন্দ আর এগোননি, রহস্যের শরীরে রহস্য আত্মগোপন করেই থেকেছে। আমার এই ছন্নছাড়া আয়ুষ্কালে কাছে-আসা সরে-যাওয়া আপিলা-চাপিলাদের নিয়ে একটু জটলা করবার শখ। আমি কি অমার্জনীয় অপরাধ করতে চলেছি?

এক

পরাধীন দেশ, সময় মন্থর, কিছুই ঘটে না, ঘটার যেন সম্ভাবনাও নেই। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে ইংরেজ প্রভুরা দেশের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। সুতরাং আমাদের বোকাসোকা অবস্থা, আত্মবিশ্বাসের অভাব আরও একটু বেড়েই গেল যেন। বাংলাদেশ সরকারের পীঠস্থান ঢাকা শহরে এখন যাঁরা গেছেন, তাঁরা আমাদের পুরনো ঢাকাকে আদৌ চিনে উঠতে পারবেন না। রাজধানী ঢাকা, চকমকে, ঝকঝকে! চওড়া-চওড়া রাস্তার বিস্তার, সৌধপ্রতিম অট্টালিকার পর অট্টালিকা। নেতৃপর্যায়ভুক্ত মানুষজন তুখোড়, অতি সংস্কৃত। যদিও, আমার সন্দেহ, গরিব-গুর্বোরা আজ থেকে সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগে যে-তিমিরে ছিলেন, আছেন সেই তিমিরেই। পুরনো ঢাকা শহর জরাজীর্ণতর, সরু-সরু রাস্তার ঠাসাঠাসি, এক কোণে অবহেলায় পড়ে আছে। আমাদের সময়ে শহরের জনসংখ্যা ছিল বড়ো জোর এক লক্ষ-সওয়া লক্ষ। রূপান্তরিত আধুনিক ঢাকা শহরে, শুনতে পাই, পঁচিশ-তিরিশ লক্ষ মানুষের বসবাস। সেই আমলের শহরটিকে এখন, গভীর দীর্ঘনিশ্বাসযোগেই বলতে হয়, 'কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে...'।'

সেই অতি ক্ষুদ্র শহরটিও ছিল প্রথাগতভাবে কুড়ি-পঁচিশটি পাড়ায় বিভক্ত। ধনী-দরিদ্রের বিভাজন তো ছিলই। অধিকাংশ আপাতসচ্ছল মানুষজন হিন্দু; বস্তিতে মালিন্যে অভাবে ক্লিষ্ট বসবাসকারীরা প্রধানত মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। এমন নয় যে একজন-দু'জন সম্ভ্রান্ত সচ্ছল মুসলমান পরিবার আদৌ ছিলেন না। ঢাকার নবাবগোষ্ঠী, তাঁদের বিভিন্ন শরিকদের জড়িয়ে যাঁরা শহরের এবং মফস্বলের বহু সম্পত্তির মালিক, তাঁদের কথা তো উল্লেখ করতেই হয়। তা ছাড়া শহরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন আরও বেশ কিছু মুসলমান জমিদার। কিন্তু বণিক, ব্যবসাদার, কলেজ ও স্কুল শিক্ষক, চিকিৎসক, উকিল, মোক্তার, এঁরা অধিকাংশই হিন্দু, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ-ম্লেচ্ছ-চণ্ডাল মেলানো ভিড়। প্রায় প্রতি পাড়ার কেন্দ্রস্থল জুড়ে একটু বর্ধিষ্ণু, কিংবা মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত, হিন্দুদের ঘরবাড়ি, পল্লীর প্রান্তদেশে মুসলমান বস্তি। প্রকৃতির নিয়ম হিশেবেই যেন এই গণবিন্যাসের মানচিত্র মেনে নেওয়া হতো।

তিরিশের দশকের ঊষালগ্নে আমার বয়স দুই কিংবা তিন। এ-সমস্ত সামাজিক ব্যাপার নিয়ে ভাবনার ভেলায় ভেসে যাওয়ার সময় তখনও আসেনি। চেতনার উন্মেষ-মুহূর্তে ভাসা-ভাসা এটুকু জানতে পেরেছি, আমাদের যে-পাড়ায় বাড়ি, তার নাম আর্মেনিটোলা। কে জানে কবে, হয়তো সপ্তদশ শতাব্দীতে, এক দঙ্গল আর্মেনি ব্যবসায়ী আমাদের শহরে উপনীত হয়েছিলেন, আমাদের পাড়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের ইতিহাস পুরোপুরি হারিয়ে গেছে; শুধু স্মৃতির স্বাক্ষর হিশেবে থেকে গেছে আর্মেনিটোলা পাড়া, এবং সে-পাড়ার পূর্ব প্রান্তে আড়াইশো-তিনশো বছরের পুরনো আর্মেনি গির্জা। আশ্চর্য, আমার মতো শিশুর চোখেও তার স্থাপত্য চোখ ধাঁধিয়ে দিত। গির্জার প্রবেশদ্বার-সংলগ্ন একটি মনিহারি দোকান, যেখানে টফি-চকোলেটের সম্ভার। তার ঠিক পাশে আমাদের পরিবারের

দর্জি কাসেম খলিফার আস্তানা। কাসেম খলিফার শুভ্র শ্মশ্রু কোমর গড়িয়ে নেমে গেছে, শান্ত সমাহিত চেহারা। চোখে ভালো দেখতে পেতেন না, শার্টের মাপ নিতে প্রায়ই গোলমাল করতেন। ঝুল কিংবা যাকে বলা হত পুট, তার হিশেবে প্রায়ই গোলমাল করে বসতেন। হাতা বড়ো হলে বলতেন, 'খোকামিয়াঁ, ওটাই ফ্যাচাং'। হাতা ছোটো হলেও বলতেন একই কথা।

সেই গির্জার পাশেই সিনেমাঘর, 'পিকচার হাউস', কয়েক বছর বাদে হাতবদল হয়ে যা হলো 'নিউ পিকচার হাউস'। আমার কাকার সঙ্গে এই সিনেমাঘরের মালিকের কী যেন সৌহার্দ্যসম্পর্ক ছিল। সেই সুবাদে আমরা বাড়ির ছেলেমেয়েরা প্রতি সপ্তাহে বিনা টিকিটে দুপুরের 'ম্যাটিনি শো'তে ছবি দেখতে যেতাম। বস্তির কুট্টি সম্প্রদায়ের যাঁরা সেই দুপুরে একটু আয়েশ করতে সিনেমাঘরে যেতেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের চমৎকার বিনিময় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাঁরা আমাদের প্রায়ই চিনেবাদাম কিংবা শীতের মরশুমে নুন-ছড়ানো কুল খাওয়াতেন।

একটা ব্যাপার বুঝে উঠতে পারতাম না। পিকচার হাউসে অ্যাডভেঞ্চারের ছবি দেখতে বাধা নেই, কিন্তু অন্য পাড়ার সিনেমাঘরে বাংলা ছবি দেখা মানা আমাদের ছোটোদের, বাড়ির অনুশাসন। সুতরাং পাতলা গোলাপি কাগজে 'আসিতেছে! আসিতেছে!' বা 'অদ্য শেষ রজনী' নয়তো 'ফুল সিরিয়াল' (কোনও পরব উপলক্ষে এক সঙ্গে তিনটি-চারটি চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী), সে-সবের রোমাঞ্চরহস্য পুরো স্কুল জীবনে অধরাই থেকে গেছে। যখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি, লীলা দেশাই-সায়গল অভিনীত 'জীবনমরণ' ছবি হইচই ফেলে দিয়েছিল, আমার কোনও-কোনও সহপাঠী তিনবার-চারবার করে দেখেছে। আমি একবারও দেখিনি শুনে এক সহপাঠীর সবিস্ময় উক্তি : 'তুই জীবনমরণ দেখিসনি, তোর জীবনটাই ব্যর্থ'। পিকচার হাউস ঘিরে আমার আরও অনেক প্রায় ফিকে-হয়ে-আসা স্মৃতি। ঢাকা শহরে কোনও ভদ্রগোছের প্রেক্ষাগৃহ ছিল না, অন্য সিনেমা হলগুলির আয়তন তেমন প্রশস্ত নয়, সুতরাং 'সাংস্কৃতিক' ঘটনাবলী প্রধানত পিকচার হাউসকে কেন্দ্র করেই। মালিকদের সঙ্গে আমার কাকার দহরম-মহরম, তাঁর সৌজন্যে শৈশবকালে ওখানে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অভিনয় দেখেছি, উদয়শঙ্কর সম্প্রদায়ের নৃত্যকলা ও একটু বড়ো হয়ে সায়গলের গান শুনেছি, এমনকি কিংকং নামে এক বিরাটবপু কুস্তিগীরের ব্যায়ামচর্চা পর্যন্ত। কুন্দনলাল সায়গলের অমন মাধুর্য-ঠিকরোনো কণ্ঠৈশ্বর্য, রবীন্দ্রনাথের গান শুনিয়ে মাতিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু বাংলা হরফ ভালো করে চিনতে পারতেন না। কোনও বিশেষ গান গাইবার জন্য কাগজে-লেখা ফরমায়েস শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছ থেকে এলে অনুরোধ জানাতেন যেন উঠে দাঁড়িয়ে বলা হয় কোন গানটা।

'সীতা'-র সেই দৃশ্য এখনও চোখে ভাসছে, আধো-ছায়া আধো-আলোয় মুহ্যমান মঞ্চ, রাম-রূপী শিশিরকুমারের অস্থির অন্তরবিদীর্ণ হাহাকার : 'প্রজানুরঞ্জন, প্রজারঞ্জন তরে জানকীরে মোর দিছি বিসর্জন...'। একটু বাদে, বনপরীদের নৃত্য, প্রত্যেকের হাতে বৃত্তাকার রঙিন কাগজের চক্র : 'নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি, আমার মন কয়, চিনি চিনি... পারুল শুধাইল কে তুমি গো, অজানা কাননের মায়ামৃগ।' জ্ঞানান্বিত হবার পর জেনেছি নৃত্যপরিকল্পনা হেমেন্দ্রকুমার রায়ের। হ্যাঁ, 'যখের ধন'-এর তিনিই। দু'-তিন বছর বাদে, শিশিরকুমার ভাদুড়ী আবার এসেছেন, 'রীতিমত নাটক' নিয়ে। প্রথম সারিতে আমরা দুই ভাই, তারপর মা, পাশের দুটি আসন খালি। নাটকের মধ্যে নাটক, অধ্যাপক দিগম্বর মিত্রের ভূমিকায় শিশিরকুমার ও অধ্যাপকের স্ত্রী কঙ্কাবতী দেবী, খালি আসন দু'টিতে এসে বসলেন।

অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ, হঠাৎ মঞ্চে অভিনীত দৃশ্যের কোনও বিশেষ অংশ অবলোকনে—সম্ভবত বাড়ি-থেকে পালিয়ে যাওয়া বোনরূপী রানীবালাকে দেখে—অধ্যাপক ক্ষিপ্ত, উঠে দাঁড়িয়ে মহিলা-বিরোধী কী এক উক্তি করলেন, কঙ্কা দেবী তাঁকে সামাল দিতে পারছেন না, প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে সোরগোল, হঠাৎ শিশিরকুমার নিচু হয়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে আমার মাকে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, এসব পাগলা দিগম্বরের প্রলাপ'। আমার মা অভিভূত।

কিন্তু এসব কয়েক বছর ব্যবধানের কথা। আমি যখন সাত-আট বছরে পৌঁছেছি, চেতনার প্রারম্ভিক উন্মীলনে, আমি তো তখনও বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে বাঁধা। শুধু তিনটি-চারটি আবছা স্মৃতি কুহকের মতো তাড়া করে ফেরে।

বাড়ির পাকা প্রধান অংশ দক্ষিণ থেকে উত্তরে এবং উত্তরের প্রান্তিক ঘর থেকে পশ্চিম দিকে প্রলম্বিত। বাইরের উঠোন ঘাসে ছাওয়া। বাইরের পাঁচিলের গা জুড়ে একটানা হরেকরকম ফুলের-ফলের গাছ। বাইরেকার মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে বাড়ির লোকজনদের জন্য থাকার আধ-পাকা ব্যবস্থা। পাশে খানিকটা ফাঁকা জমিতে পোষা হাঁসদের কাকলি। তার পাশে একটা-দুটো শুপুরি-নারকেল গাছ এবং ঘন শাখাপ্রশাখায় ছাওয়া একটি অশ্বত্থ গাছ। অন্দরের উঠোনে ঘাস নেই, নিকষ মৃত্তিকা। উঠোনের পশ্চিম দিকে রান্নাঘর, খাবার জায়গা। দক্ষিণে একটি মস্ত আটচালা, যাতে বাড়ির মহিলারা ধান কুটতেন, চিঁড়েমুড়ি ভাজতেন, পিঠেপায়েস তৈরি করতেন এবং সংসারের পুরনো জিনিশপত্র, যা বাতিল করতে মায়া লাগে, আটচালার উপর দিকে একটি আধাকুঠুরিতে—যাকে আমরা বলতাম, 'কার'— সেসব সংরক্ষণ করা হতো। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সেই কুঠুরিতে ওঠা; বাচ্চাদের মধ্যে আমরা যারা দুঃসাহসী, তারা হয়তো তরতর করে উঠে যেতাম, কিন্তু নামবার সময় ভয়, এই বুঝি পা পিছলে যায়!

যা বলছিলাম, আবছা এলোমেলো একটি-দু'টি স্মৃতি। ফাল্গুন-চৈত্রের কড়া রোদ, ভিতরকার উঠোনের মাটি ফেটে চৌচির। আলগা-আলগা অসংখ্য বিশুষ্ক ছোট মাপের ঢ্যালা। ডান পায়ের গোড়ালি লাট্টুর মতো ঘুরিয়ে ঢ্যালাগুলি মিনিটের পর মিনিট ধরে গুঁড়ো করে যেতাম। পরাধীন দেশ, মধ্যবিত্ত পরিবার, স্বদেশী পরিবেশ, কোনওরকম আতিশয্যের বালাই ছিল না, আমাদের খেলনাপাতিও যৎসামান্য। অবোধ শিশুকে গুরুজনরা দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামে অভ্যাস করাতে চেয়ে শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমি উঠোনময় ঢ্যালার পর ঢ্যালা গুঁড়ো করে চলেছি, খেলা আবিষ্কার হচ্ছে, প্রহর কাটছে। অথচ ভরা বর্ষায় এই উঠোনেরই অন্যরকম চেহারা। পাকা দালানের ছাদ থেকে, আটচালা রান্নাঘরের ছাদ থেকে, আমগাছের শরীর বেয়ে বর্ষার জল উপচে পড়ছে, একটা সময় উঠোন থইথই। আমাদের আনন্দ ধরে না, অবিশ্রাম কাগজের নৌকো বানিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া। টুকরো অন্য-একটি মনে-আসা, মনে-পড়া: শরৎ অথবা বসন্ত ঋতু, হয়তো বা ত্রয়োদশী বা চতুর্দশীর প্রায়-পূর্ণ-চাঁদ পুবের আকাশে, বাড়ির বাইরের মাঠে আমি উত্তর থেকে দক্ষিণে দৌড়চ্ছি, চাঁদও দৌড়চ্ছে আমার সঙ্গে। দক্ষিণ থেকে উত্তরে ছুটছি, চাঁদও ছুটছে। ওই সময়েই কি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সেই কবিতা, 'বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই, মা গো আমার শোলোক-বলা কাজলা দিদি কই', চেতনার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গিয়েছিল।

অন্য একটি স্মৃতি। বাইরের উঠোনে আমরা বাড়ির বাচ্চারা এবং প্রতিবেশী বাড়ির বাচ্চারা একসঙ্গে মিলে গোল্লাছুট কিংবা কানামাছি খেলছি। অথবা প্রজাপতির পিছনে ছুটছি। কাঁঠালচাঁপার গাছ, গুলঞ্চ, মরশুমি ফুল, পাতাবাহার, আকন্দ ও শেফালির ঝাড়—এসব কোনও কিছুই নয়, আমাকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করতো কামরাঙা গাছ ও তার ফল। নরম সবুজ

রঙের শান্ততা; পাঁচটি-ছ'টি উপর থেকে নিচ পর্যন্ত আলম্বিত কোমল শৃঙ্গসম ঢেউ, দুই ঢেউয়ের মাঝখানে মসৃণ সংকীর্ণ মালভূমি। খেতে একটু কষের আস্বাদ। কিন্তু খাওয়ার চাইতেও আমি হাত বুলোতে বেশি ভালোবাসতাম, এবং কামরাঙা নামের সম্মোহনে বুঁদ হয়ে থাকতাম। পরিণত বয়সে আত্মীয়স্বজনদের কিংবা বন্ধুবান্ধবদের, যাঁদের কন্যাসন্তান লাভের সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁদের বলতাম, 'মেয়ের ডাকনাম কামরাঙা রাখো'। তাঁরা শিহরিত হতেন; লজ্জা, লজ্জা, কোনও মেয়ের নাম 'কামরাঙা' রাখলে তার ভবিষ্যৎ যে কী প্রগাঢ় অন্ধকারে ডুবে যাবে, তাঁদের মুখে সেই শঙ্কার ছায়া দেখতে পেতাম।

অন্য যে-স্মৃতি, আমাদের বাড়ির মাত্র আধ মাইল উত্তরে কারাগারের মস্ত উঁচু পাঁচিলের আয়তন ও বিস্তার দেখে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হতাম। ভয়ও পেতাম একটু-আধটু। কারণ আমাদের বলা হতো, চোর-ডাকাত-খুনে-দুশ্চরিত্রদের সাজা দিয়ে কারাগারের অভ্যন্তরে সতর্ক পাহারায় রাখা হয়েছে। একটু-একটু করে চেতনার পরিধি বাড়ে, ক্রমে জানতে পারি শুধু চোর-ঠগিরাই নয়, জেলে আটক আছেন বিচারে দণ্ডিত, কিংবা বিনা বিচারে বন্দী, যাঁরা স্বদেশী করছেন, তাঁরাও। মহান পুরুষ তাঁরা, দেশকে বিদেশীদের হাত থেকে মুক্ত করবেন, সেই লক্ষ্যে প্রাণোৎসর্গ করতেও তাঁরা প্রস্তুত, তাঁদের শ্রদ্ধা করতে হয়, অনুসরণ করতে হয় তাঁদের জীবনের দৃষ্টান্ত।

এরই মধ্যে আমরা শিশুরা কী করে যেন শুনতে পেলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বাবার এক প্রতিভাবান ছাত্র—অনিল দাস—ঢাকা জেলে বন্দী হয়ে আছেন। আমাদের বাড়ির আর বাইরের পরিধির বাইরেও, তাঁর পৃথিবীর ভয়ংকরতা আমাদের অনুমানের অনেক দূরে। একদিন সারা শহর জুড়ে আলোড়ন, পাড়াতেও শোরগোল। অনিল দাস তাঁর কারাকক্ষে মাঝে-মাঝেই বেপরোয়া চিৎকার করে উঠতেন 'বন্দে মাতরম্'। যতবার চেঁচাতেন, ততবার জেলের প্রহরী তাঁকে চাবুক দিয়ে, লাঠি দিয়ে, মুষ্ট্যাঘাত-সহ মারতেন। সেই রকমই নাকি নির্দেশ ছিল জেলার সাহেবের। এমনই এক রাতে অনিল দাস সামগানের মতো অবিরত, অপ্রতিহত চেঁচিয়ে গেছেন 'বন্দে মাতরম্', প্রতি উচ্চারণের সঙ্গে বর্ষিত হয়েছে কশাঘাত। উচ্চারণ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হলেও তবু তা থামতে চায়নি। একটা সময়ে কিন্তু থেমে গেল, প্রহারের উৎপীড়নে অনিল দাসের প্রাণবায়ু নিঃসৃত। আমার অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের মানচিত্রে প্রথম শহিদ হিসেবে অনিল দাসের নাম মুদ্রাঙ্কিত। সারা শহর উতরোল। কিন্তু পরাধীন দেশ, মন্থর সময়, ক্ষণিক বাদে সেই আবেগক্রোধবিলাপের চিৎকারও স্তিমিত হয়ে গেল। পরে বড়ো হয়ে অন্য অভিজ্ঞান: স্বাধীন ভারতে কলকাতার রাস্তায় ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে যে-শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল, কংগ্রেস সরকারের ফৌজ তার উপর গুলি চালালে ঘটনাস্থলে যে-চারজন মহিলার মৃত্যু ঘটেছিল, তাঁদের অন্যতম লতিকা সেন, অনিল দাসেরই সহোদরা। ওই পরিবারে শহিদ হওয়া বোধহয় অমোঘ বিধান ছিল।

চেতনা ক্রমশ এক স্তরের পর অন্য স্তরে পৌঁছয়, আমরা অবাক বিস্ময়ে বিনয় বসু ও তাঁর সঙ্গীদ্বয় দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্তের রোমাঞ্চকর সাহসের কাহিনী শুনতে পাই। আর্মেনিটোলার দক্ষিণ প্রান্তে ইসলামপুর রোড পেরোলেই মিটফোর্ড হাসপাতাল। এ পাড়ে কে পি সাহার ওষুধের দোকান। বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে, হয়তো কাটা ঘুড়ি ধরবার তাগিদেই, কে পি সাহার দোকানের সামনে গিয়ে কোনও দিন পৌঁছেছি, কর্মচারীরা কোন বাড়ির ছেলে তা জানতেন, একা এত দূর চলে এসেছি দেখে দোকানের ভিতরে নিয়ে গিয়ে

বসাতেন, কাউকে সঙ্গে দিয়ে পরে বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন, কয়েক মিনিটের প্রতীক্ষা। তাঁদের মধ্যে একজন হঠাৎ কাহিনী বলতে শুরু করে দিলেন : 'খোকা, শোনো! হাসপাতালের ওই যে ফটকটা দেখছো, হঠাৎ ভোরবেলা হাসপাতালের ভিতর থেকে, সকাল ন'টা-সাড়ে ন'টা হয়তো হবে, পর পর শব্দ—পট পট পট, পট পট পট, গুলি ছোঁড়ার শব্দ। মুহূর্তের মধ্যে দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। আমরাও দোকান বন্ধ করলাম। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, বিনয় বসু বেরিয়ে এলেন। পিস্তলটি বাঁ দিকের পকেটে পুরে ডান দিকের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। তারপর পাড়ার অভ্যন্তরে ঢুকে রায়বাহাদুর সত্যেন ভদ্রর বাড়ির চত্বর পেরিয়ে পিকচার হাউসের পিছনের পাঁচিল পর্যন্ত এগোলেন। পাঁচিল ডিঙোলেন। আর্মেনি গির্জার পাশে ওঁর বন্ধুরা সাইকেল নিয়ে অপেক্ষমাণ, সবাই একত্র হয়ে ফুলবাড়ি রেল ইস্টিশনে চলে গেলেন। নারানগঞ্জ পৌঁছলেন, গোয়ালন্দের জাহাজ ধরলেন। গোয়ালন্দ থেকে ঢাকা মেলে চেপে শেয়ালদা। তারপর কলকাতার জনারণ্যে হারিয়ে গেলেন। দিন দশেক বাদে রাইটার্সের দোতলায় গোলাগুলির ঝড়। তিন-চারজন উচ্চপদস্থ সাহেব আমলা ঘায়েল হলেন, কোতল হলেন। বিপ্লবী অভিযানের নায়ক বিনয় বসু, তাঁর সঙ্গীদ্বয় দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্ত। 'এ্যাকশন' শেষে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী বাদল গুপ্ত পটাশিয়াম সায়নেড গলাধঃকরণ করলেন, বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্ত পরস্পরের প্রতি গুলি ছুঁড়লেন। চারদিন বাদে হাসপাতালে বিনয় বসুর মৃত্যু, বাদল গুপ্ত বেঁচে গেলেন, পরে তাঁকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হলো।' এই ইতিবৃত্ত কতটা সেই দোকান কর্মচারীর মুখ থেকে শুনেছিলাম, কতটা মা-জেঠিমা, বাবা-কাকা বা পাড়ার অন্যদের কাছ থেকে, তা এখন আর আলাদা করে বলতে পারি না। কিন্তু আমাদের ঘোর লেগে গেল। দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসিতে লটকানো হলো, পরদিন ফরোয়ার্ড না অ্যাডভান্স কোন কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কোলাম জুড়ে শিরোনাম : Dauntless Dinesh dies at the dawn।

বাড়িতে স্বদেশী আবহাওয়া। গান্ধিজী মহারাজের ভক্ত সবাই। পাশাপাশি চিত্তরঞ্জন দাশ-সুভাষচন্দ্র বসুদের প্রতিও শ্রদ্ধার্ঘ্য কম কিছু নয়। তবে সব ছাপিয়ে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীদের নীরব ও সোচ্চার উপাসনা দিকে-দিকে। আমরা বালক-বালিকারা অচিরে নতুন একটি খেলা আবিষ্কার করলাম। প্রথম খেলুড়ে উচ্চারণ করতো, 'এক গুলিতে দুই সাহেব মারবো।' পরক্ষণে দ্বিতীয় জনের উক্তি, 'এক গুলিতে পাঁচ সাহেব মারবো।' তৃতীয় জন বললো, 'এক গুলিতে নয় সাহেব মারবো।' এমনি করে বৃত্তাকারে ঘুরতে-ঘুরতে এক গুলিতে দু'হাজার তিনশো নিরানব্বুই সাহেব মারার উপাখ্যানে চলে যেতাম আমরা। পরাধীন দেশ, অনাড়ম্বর গার্হস্থ্য, খেলার সরঞ্জামহীন আমরা, সাহেব মারার প্রলয়ঙ্কর বিপ্লবী ক্রীড়াউন্মাদনায় নিমজ্জিত হতাম। অবশ্য তার পাশাপাশি অন্য একটি মশকরাও প্রচলিত ছিল আমাদের মধ্যে। শাদা পোশাক-লাল পাগড়ি পরিহিত মস্ত গোঁফওলা সিপাহি দেখলেই ফটক দিয়ে বাড়ির বাইরে গিয়ে সমস্বরে চেঁচাতাম, 'পাহারাওলা ভাগো'! বলেই বাড়ির মধ্যে পশ্চাদপসরণ করে ফটক শক্ত করে আটকে দেওয়া। আমাদের ছেলেমানুষি দেখে দাঁত বের করে হাসতো দিশি সিপাহিরা।

এলোমেলো ছায়া-ছায়া আলো-আঁধার। বুঝতে পারি, রাতবিরেতে বাড়িতে কারা যেন আশ্রয় নিতে আসেন, ভোরের আলো ফুটতে না-ফুটতেই কোথায় উধাও হয়ে যান। আমরা শিশুরা ফিসফাস ফিসফাস করে পরস্পরকে বোঝাই, স্বদেশী কাকারা এসেছিলেন, পকেটে

পিস্তল, পুলিশকে লুকিয়ে চলছেন তাঁরা। ওই যে গতকাল মীরপুরে স্বদেশী ডাকাতি হলো, মেলগাড়ি থেকে কয়েক হাজার টাকা লুঠ হলো, তার সঙ্গে অমুক বা তমুক কাকা জড়িত। শুধু আমাদের আর্মেনিটোলা পাড়াতেই নয়, গোটা শহর জুড়ে একই কাহিনী। যে কোনও পাড়ার আমরা যে কোনও গলি-উপগলি দেখিয়ে গর্বভরে বলতে পারতাম, গলির প্রথম বাড়ি থেকে কেউ বিলিতি কাপড়ের বা বিলিতি মদের দোকানে পিকেটিং করে জেলের ঘানি টানছেন; দ্বিতীয় বাড়ি থেকে কেউ পুলিশ খুনের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে আন্দামানে পায়ে বেড়ি পরে দিনাতিপাত করছেন; তৃতীয় বাড়ির প্রথম পুত্রসন্তান রাজনৈতিক কারণে বিনাবিচারে বন্দী হয়ে আছেন দমদম কি মেদিনীপুর জেলে। ওই বাড়ির কন্যাসন্তানটি আবার লীলা রায়ের শ্রীসঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত। তিনি হয়তো দাদা-দিদিদের মধ্যে দূতীর কাজ করতেন, কেমন করে পিস্তল পাচার করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে যান, সেই থেকে আমাদের ঢাকা জেলেই আটক হয়ে আছেন। বহুযুগ বাদে, আমার যুবাবয়সে, জীবনানন্দ দাশ আমাকে জানিয়েছিলেন, এমন এক রাজবন্দিনীর বৃত্তান্ত খবর কাগজে পড়েছিলেন: রাজশাহী জেলে কারারুদ্ধ, নাম বনলতা সেন। রাজশাহী থেকে নাটোর তো মাত্র এক কদম দূর। কোনও বাড়িতেই এমন সন্তানদের খামতি ছিল না। গান্ধিজীর পূর্ণ স্বরাজ ঘোষণায় তেমন আস্থা বিশেষ কারও নেই, থেকে-থেকে উচ্চারিত হচ্ছে রাজগুরু-সুখদেব-ভগৎ সিং-বটুকেশ্বর দত্তদের নাম। তা ছাড়া আমাদের ঘরের মানুষ বিনয়-বাদল-দীনেশরা তো আছেনই। শিশুদের কাছেও তখন এই নামগুলি প্রেরণা, নামগুলি বহন করছে স্বপ্নের দ্যোতনা।

অথচ উদ্ভট কাণ্ড, এই স্বদেশী পরিবেশের মধ্যেও শীতের আমেজ এলেই বাবা- কাকারা কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠতেন ক্রিকেটের নেশায়। তাঁরা বিভোর, অহোরাত্র ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা। পল্টন মাঠে আমাদের ঘরোয়া ক্রিকেট তো আছেই, পাশাপাশি দুই দল, ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ও ওয়াড়ি ক্লাব। দুই দলের মধ্যে বন্ধুতার অন্ত নেই, রেষারেষিরও। যাঁরা কলকাতার মাঠে ফুটবল খেলেন, ক্রিকেটে তেমন রপ্ত নন, তাঁরা ঢাকায় ফিরে হয় ওয়াড়ি নয় ভিক্টোরিয়ার মাঠে মশগুল হন। যেমন সম্পর্কে আমার মামা অনিল বসু। তাঁদেরই গ্রামের, মালখাঁনগরের, একদা বাংলা ক্রিকেটে বিখ্যাত হেমাঙ্গ বসু ও তাঁর ভাই অমূল্য বসু, অথবা তাঁদের জ্ঞাতি ফটিক (শৈলেশ) বসু ও ভোলা (নরেশ) বসু; কয়েকবছর বাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইস্টবেঙ্গলের ফুলব্যাক রাখাল মজুমদার। কিংবা ময়মনসিংহের পণ্ডিতপাড়া বা ফ্রেন্ডস ইলেভেন ক্লাবের কোনও অতিথি খেলোয়াড়। বাবা-কাকাদের সঙ্গে আমরাও ঝটপট দুপুরের খাওয়া খেয়ে মাঠে যেতাম। সেখানে কমলালেবুর কোয়া চুষতাম, কিংবা চিনেবাদামের খোসা ছাড়াতাম অফুরন্ত।

এখানেই তো শেষ নয়! বোধহয় ১৯৩৩ সাল, বিলেত থেকে জার্ডিনের অধিনায়কত্বে সাহেবি দল খেলতে এসেছে, একাধিক টেস্ট ম্যাচ। বড়োদিনের ছুটিতে বাবা-কাকারা কলকাতামুখো, ইডেন গার্ডেনে টেস্ট না দেখে উপায় কী? তখন কট্টরি কনকাইয়া নাইডু বিখ্যাতির শীর্ষে। তাঁর ছোটো ভাই কট্টরি সুগান্না নাইডু, সেই সঙ্গে মস্ত জোরে বল করনেওয়ালা মহম্মদ নিসার, সুইং বলে ওস্তাদ নাভানগরের অমর সিং, পরে ভূপালের নবাবের দলের সঙ্গে যুক্ত দুই সহোদর ভ্রাতা উজির আলি-নাজির আলি। সেই বছরই আঠারো বছরের অমরনাথ মুম্বইতে প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি করে তারকা বনে গেছেন। কলকাতা টেস্টে প্রথম দিনেই লাঞ্চের আগে ক্লার্ক না কার দুরন্ত বলে ভারতের উইকেটরক্ষক

দিলওয়ার হোসেনের মাথা ফেটে গেল, কিন্তু বেপরোয়া দিলওয়ার মাথায় ফেট্টি বেঁধে মাঠে ফিরে ফের পড়ন্ত বিকেলে খেলতে শুরু করলেন, চৌকোর পর চৌকো মেরে মাঠ-ভর্তি দর্শকের চোখ ধাঁধিয়ে দিলেন। বাবা-কাকারা উত্তেজনার তুঙ্গে পৌঁছে যাচ্ছেন। তেরো-চোদ্দো বছর বাদে অমিয় চক্রবর্তী মশাই কবিতা লিখেছিলেন : 'মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।' সত্যিই সেই তিরিশের দশকের মধ্য মুহূর্তে এই আপাতবৈপরীত্যকে মেলানোর পালা: স্বদেশী বোমা-পিস্তল, তার সঙ্গে সমান তালে মায়ালু বিলিতি ক্রিকেট। আমার এখন অনুমান, আসলে ক্রিকেটও তখন দেশপ্রেমের প্রতীক হিশেবে প্রতিভাত হয়েছিল। সেই ১৯১১ সালে গোরা দলকে হারিয়ে মোহনবাগান শিল্ড জিতেছিল, যার সম্মোহন পঁচিশ বছরেও কাটেনি। বিশ-পঁচিশ বছর বাদে ক্রিকেটে নতুন করে দেশকে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। লালমুখোরা আমাদের নির্যাতন করেছে, নিষ্পেষণ করেছে, আমাদের ছেলেদের ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছে, তবু আমরা মরে যাইনি, ওদের অস্ত্রেই ওদের নিধন করেছি, করবো, ক্রিকেটের মধ্যবর্তিতায়। ডানপিটে বিনয় বসু স্বয়ং ক্রিকেটে ওস্তাদ ছিলেন, তাঁর পরের দুই ভাই, জামশেদপুরে কর্মরত, বহুদিন বিহার ক্রিকেট দলের হয়ে খেলেছেন, তাঁদের একজন, বিমল বসু, অনেক বছর বিহার দলের ক্যাপ্টেন পর্যন্ত ছিলেন।

স্থবির শহরে বেড়ে ওঠা আমরা বালক-বালিকার দল, উত্তেজনার খোরাক চট করে সংগ্রহ হবার নয়। কিন্তু তা-ও হয়। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে নবাবপুর-ইসলামপুরের মিছিল, ধর্মনির্বিশেষে সাধারণ মানুষের সোৎসাহ যোগদান, ইসলামপুরের মিছিলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঢাকার নবাব বাহাদুর, নবাবপুরের মিছিলের রূপবাবু-রঘুবাবুরা, বণিক সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত যাঁরা। সেজেগুজে আমরা বাচ্চারা বড়োদের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে অকুস্থলে যেতাম, কোনও পরিচিত বাড়ির দোতলা বা তেতলায় জায়গা করে নিতাম, আকুল আগ্রহে শোভাযাত্রার দীর্ঘায়িত বর্ণিল শোভা চেখে-চেখে উপভোগ করতাম। আমাদের শৈশবের ওই ক'বছর অন্যতর আগ্রহ অবশ্য ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা। কুশীলবরা শহরের অনেকেরই চেনা, জয়দেবপুর ঢাকা থেকে মাত্র পনেরো মাইল দূরবর্তী, আমার ঠাকুরদা, যাঁকে আমি কোনওদিন দেখিনি, ভাওয়াল এস্টেটের ম্যানেজারি করেছেন। সন্ন্যাসী মেজোকুমার না কি কোনও প্রতারক তা নিয়ে সর্বদা উত্তেজিত তর্ক। সন্ন্যাসীর দিকেই পাল্লা ভারি। দু'পক্ষের উকিল-ব্যারিস্টারদেরও শহরের সঙ্গে কিছু যোগসূত্র ছিল। তাঁদেরও সমর্থকরা দ্বিধাবিভক্ত, যদিও এখানেও সন্ন্যাসীর হয়ে সওয়ালকারীদের স্পষ্ট সংখ্যাধিক্য। সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ির বাইরের চাতালে বাবা-কাকারা উত্তেজিত তর্ক করতেন, একমাত্র আমার কাকা একটু সন্ন্যাসীর প্রতিপক্ষের দিকে হেলে। তিনি উকিল মানুষ, মেজো রানিমার যিনি ব্যারিস্টার, তাঁর ভক্ত। তারপর একদিন ভরদুপুরে বিচারক পান্নালাল বসুর রায় বেরোলো, সন্ন্যাসী-ই কুমার। শহর আনন্দে উচ্ছল, স্থানীয় 'চাবুক' পত্রিকার বিশেষ সংস্করণ প্রতি পাড়ায় 'শয়ে 'শয়ে বিক্রি হলো। বাচ্চারাও বুঝতে পারলাম একটা মস্ত কিছু ঘটেছে যাকে শুভ বলে অভিহিত করা যায়। পরে বড়ো হয়ে পান্নালাল বসুর সুদীর্ঘ রায়, যা বই আকারে বেরিয়েছিল, রুদ্ধশ্বাস আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। খুবই সুলিখিত, মনে হলো যেন গোয়েন্দা কাহিনী পড়ছি। হায়, সেই পুস্তক সংগ্রহ করা এখন শিবের বাবারও অসাধ্য।

যে-সংসারে একটু-একটু করে বড়ো হচ্ছিলাম, সেখানে প্রাচুর্য ছিল না, কিন্তু অনটনও ছিল না। খুব সরেস চালও পাওয়া যেতো মণ প্রতি সাড়ে তিন-চার টাকা হারে। যাকে মাসকাবারের বাজার বলা হতো, তার জন্য সব মিলিয়ে আমাদের যৌথ পরিবারের পক্ষেও বিশ-পঁচিশ টাকা অঢেল। আর প্রতিদিনের মাছ-সবজির জন্য আট-দশ আনাই যথেষ্ট।

আর্থিক মন্দায় কৃষককুল শোচনীয়তার উপান্তে, বছরের পর বছর ধরে মধ্যবিত্ত পরিবারেও একই অবস্থা। পাশ করার পরেও ঘরের ছেলেদের চাকরি নেই। খুব প্রতিভাবান বা ভাগ্যবান কয়েকজন ইস্কুল মাস্টারি বা কেরানিগিরিতে ঢুকছে; এই সৌভাগ্য তা-ও মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। হয়তো গ্রামে কিছু জমিজমা ছিল, চালটা-ডালটা হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই প্রজারা পৌঁছে দিত। স্বাধীনতার স্বপ্ন ঘরে-ঘরে পরিব্যাপ্ত; ছেলেরা-তরুণরা-প্রৌঢ়রা, বৃদ্ধরা একই আবেগে মত্ত। ক্রিকেটে সফলতার প্রয়াস সেই উন্মাদনার অন্যতর পরিস্ফুটন।

আদর্শবাদী বাবা বাড়িতে বিলিতি কাপড় ঢুকতে দিতেন না, অন্য যে-কোনও বিলাসিতার উপকরণও। ছেলেবেলায় মাখন বলতে গয়লাদের দেওয়া কলাপাতায় জমানো ননী আমাদের ভোজ্য ছিল। গৃহস্বামীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও আমার মা কয়েকবছর বাদে পলসনের মাখনের টিন কিনে সেঁকা পাউরুটির টুকরোর উপর ছড়িয়ে দিতেন। তা-ও পরম সতর্কতার সঙ্গে, সীমিত বিন্যাসে, যাতে টিনের মাখন বহুদিন ধরে চলে। আমার কাছে এটা সাংসারিক মিতব্যয়িতার প্রতীক হয়ে ছিল।

ক্রমে-ক্রমে কী করে যেন ছ'-সাত বছর বয়সে উত্তীর্ণ হলাম। আগের থেকেই জানা ছিল, পাড়ার বিদ্যালয় আর্মেনিটোলা সরকারি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হবো। আমাদের পাড়া ও বংশাল পাড়ার প্রান্তসীমায় স্কুল। সামনে-পিছনে বিস্তৃত মাঠ। মস্ত লাল দালানের নিচের তলায় স্কুল, উপর তলায় ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের ধাঁচে তৈরি ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ। সেটাও সরকারি কলেজ, বিটি ডিগ্রির জন্য, বি.এ.-এম.এ-বি.এসসি এম.এসসি পাশ-করা ছাত্ররা পড়তে আসতেন। কলেজ থেকে ডিগ্রি পেয়ে তাঁরা স্বীকৃত শিক্ষক হিশেবে পরিগণিত হতেন। যখন হাঁটতে শিখেছি, গুরুজনদের সঙ্গে রাস্তায় বেড়াতে বের হতাম, তাঁরা আমাকে সেই স্কুলবাড়ির প্রাঙ্গণের পাশ দিয়ে নিয়ে গিয়ে বাড়িটা দেখিয়ে বলতেন, 'এই তোমার স্কুল'। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকতাম: রহস্যের ঘেরাটোপে আবৃত কুজ্ঝটিকার মতো সেই স্কুল বাড়ি।

তারও আগে অবশ্য একটা ঘটনা ঘটেছিল। বাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মতো মা-কাকিমাদের তত্ত্বাবধানে শেলেটে খড়ি এঁকে আমার অক্ষর পরিচয় হয়েছিল। এমনকি যুক্তবর্ণেও খানিকটা রপ্ত হয়েছিলাম, যদিও ইংরেজির সঙ্গে তখনও পরিচয় হয়নি। সরস্বতী পুজোর দিন ঘোষণা করা হলো, আমাদের মতো কয়েকজনের পোশাকি হাতেখড়ি হবে। সরস্বতী পুজোর অঙ্গ হিশেবে খাগের কলম দুধে ডুবিয়ে ভূর্জ পাতায় লেখার নির্দেশ দিলেন পুরোহিত মশাই : লেখো, 'শ্রীশ্রী সরস্বত্যৈ নমঃ'। আমার কোনওই অসুবিধে হল না, তরতর করে বার দশেক লিখে ফেললাম, শ্রীশ্রী সরস্বত্যৈ নমঃ। কিন্তু চরম সংকটের সূচনা পরমুহূর্তে। ললিত ঠাকুরমশাই এবার বললেন, 'মা সরস্বতীর কাছে সবাই গড় হয়ে প্রণাম করো'। বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েরা, তাঁরা হয়তো আমার মতো নির্ভুল 'শ্রীশ্রী সরস্বত্যৈ নমঃ' লিখে উঠতে পারেনি, কিন্তু মা সরস্বতীর কাছে গড় হতে তাদের কোনও গণ্ডগোল হল না। আমি জেদ ধরলাম, কিছুতেই গড় হবো না, কিছুতেই মূর্তিকে প্রণাম করবো না। বাড়ির গুরুজনরা চড়-চাপড় মেরেও আমার সুমতি ফেরাতে পারলেন না। আধঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তির পর তাঁদের রণে ভঙ্গ দেওয়া। সেদিন ওই কাণ্ডের পর থেকে আমার নাম হলো কালাপাহাড়। আমার সেই জেদ আজীবন অটুটই থেকে গেছে।

দুই

বছর ঘোরে। এবার স্কুলে ভর্তি হবার পালা। আর্মেনিটোলা স্কুলে কিছুদিন আগে পর্যন্ত সাহেব প্রধান শিক্ষক ছিলেন। আমি যখন ভর্তি হতে গেলাম, এক বাঙালি খৃস্টানধর্মী ভদ্রলোক, একদা সম্ভবত সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন, বীরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষকের পদে আসীন। কড়া মানুষ; কোনও বিষয়ই তেমন পড়াতেন না, তবে স্কুলের নিয়ম-অনুশাসন রক্ষা করতেন সুদক্ষভাবে। ক্লাস চলাকালীন প্রায়ই করিডোর দিয়ে হেঁটে বেড়াতেন, লক্ষ্য করতেন, কোথাও শোরগোল হচ্ছে কি না, বা কোনও ছেলে দুষ্টুমি করছে কিনা। তাঁর হাতে ছড়ি। আমাদের দিকে মাঝে-মাঝে তাকিয়ে হয়তো কপট রাগেই বলতেন : 'আমার বেতটা দেখেছো, তোমাদের চাইতে লম্বা'। ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতাম তাই শুনে।

মুশকিল হলো ভর্তি হবার দিনই। একটা পরীক্ষা দিতে হবে। তৃতীয় শ্রেণীর জন্য নির্দেশিত কক্ষে তিনটি সারণিতে বেঞ্চিগুলি সাজানো। আমি বসেছি তৃতীয় সারণির একেবারে শেষের দিকে; ছেলেরা উচ্চ-অনুচ্চ স্বরে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। এমন মুহূর্তে যিনি ক্লাস-শিক্ষক, নামটি এখনও মনে আছে, হেরম্বচন্দ্র ঘটক, অনেকে তাঁকে রঙ্গ করে ডাকতেন, 'মিস্টার হর্স', ঘটক-ঘোটকের উচ্চারণ-নৈকট্য হেতু। তো তিনি প্রথম সারণির ছেলেদের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলেন : 'লেখো'। কোনও সরল বাংলা বই থেকে আট-দশটি পঙ্ক্তি ধীরে-ধীরে বললেন। আমি কিন্তু বসেই রইলাম; আমার ধারণা হলো, উনি তো প্রথম সারণির সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, তৃতীয় সারণিতে উপবিষ্ট আমি, আমি কেন লিখতে যাবো? যে শাদা কাগজগুলি আমাদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল, মিনিট পনেরো বাদে তা নিয়ে নেওয়া হলো। আমার কাগজটি অবশ্য শাদাই থেকে গেল, আঁচড়বিহীন। ঘণ্টা দেড়েক বাদে বাবা প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি সবিনয়ে বললেন, 'আপনার ছেলের এখনও ভালো করে বোধোদয় হয়নি। কিছুই লিখতে পারেনি। বাড়িতে একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে না হয় আগামী বছর ভর্তি করাবেন।' বাবা জানালেন, বাড়িতে লেখাপড়ার ব্যাপারে আমি অনেকটাই এগিয়ে গেছি। প্রধান শিক্ষকমশাই কী ভাবলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সন্তান, শেষ পর্যন্ত ভর্তি করে নিলেন।

যত দূর মনে পড়ে, আমরা বোধহয় সবসুদ্ধু তিরিশ-পঁয়তিরিশ জন ছেলে ওই তৃতীয় শ্রেণীতে ছিলাম। প্রায় অর্ধেক হিন্দু, অর্ধেক মুসলমান। সরকারি স্কুল বলেই বোধহয় মুসলমান ছাত্ররা একটু বেশি পরিমাণে এখানে পড়তে আসতো। হিন্দু ছাত্রদের শ্রেণীবিন্যাস উচ্চবিত্ত থেকে বড়োজোর নিম্ন মধ্যবিত্ত পর্যন্ত। কিন্তু মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই আশপাশের মহল্লার বস্তি থেকে এসেছে। তাদের বাড়িতে শিক্ষার আদৌ কোনও ঐতিহ্য ছিল না, পরিবার থেকে তারাই প্রথম, যারা স্কুলে ভর্তি হয়েছে। শিশুরা সম্ভবত খুব নিষ্পাপ হয়। অমুকরা হিন্দু, তমুকরা মুসলমান : এই বোধ হয়তো ছিল, তবে তা থেকে কোনও বিকৃত সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার উৎসাহ কারও মধ্যে চোখে পড়েনি। স্কুলের চৌহদ্দির মধ্যে সবাই সবাইর

সমান, সবাই সবাইকে বন্ধুভাবে মেনে নিয়েছি। কখনও-কখনও ঝগড়া হয়েছে, কিন্তু সেই কলহ সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জরিত হয়নি।

উপরের ক্লাসে যাঁরা পড়তেন, তাঁরা আমাদের কাছে নায়কতুল্য। খেলাধুলোর উদ্যোগে হোক, নাটকে-আবৃত্তিতে হোক, কিংবা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্কুল বাড়ি সাজানোর উপলক্ষ্য হোক, তাঁদের প্রধান ভূমিকা নিয়ে আমাদের ছোটোদের মধ্যে সোচ্চার অথবা অর্ধ-উচ্চারিত কৌতূহল আর উৎকণ্ঠা। উঁচু ক্লাসে পড়তেন ঢাকার নবাববাড়ির ছেলে ইউসুফ রেজা; হকিতে তিনি তুখোড়! ইউসুফদা বড়োলোকের বাড়ির ছেলে, নিয়মিত স্কুলে আসতেন না তেমন। তবে অন্য কোনও স্কুলের সঙ্গে হকি খেলার প্রস্তাব এলেই তাঁকে খবর পাঠানো হতো; তিনি হাজির হয়ে আমাদের কৃতার্থ করে দিতেন। কিংবা ধরা যাক দোলারদা'র কথা। স্কুলের পশ্চিম-উত্তরপ্রান্ত সংলগ্ন মসজিদবাড়ির পাশের বস্তিতে থাকতেন। কিন্তু যখন বাইরে বের হতেন, পোশাকে খুব কেতাদুরস্ত। দোলারদা বেশ কয়েক বছর ধরেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে আসছিলেন, কৃতকার্য হচ্ছিলেন না। তাতে কী, আমাদের স্কুলের যে-কোনও সমস্যার আসান করতে হলে দোলারদাই ভরসা। বনভোজনে যেতে হবে, দলপতি দোলারদা। টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমাদের স্কুল দলের ক্রিকেট অথবা ফুটবল খেলার ব্যবস্থা হয়েছে, নেতৃত্বে দোলারদা। গ্রীষ্মকালে প্রভাতী স্কুল, গ্রীষ্মাবকাশের ছুটি শুরু হবার দিন মাস্টারমশাইদের ফুল দিয়ে, কবিতায় বন্দনা রচনা করে সম্ভাষণ জানাতে হবে, প্রধান উদ্যোক্তা দোলারদা। ইদলশরিফ অনুষ্ঠানে দোলারদা, এমনকি সরস্বতী পুজোর ব্যাপারেও প্রধান পরামর্শদাতা দোলারদা। মাস্টারমশাইদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু, একজন-দু'জন করে মুসলমান শিক্ষক সবেমাত্র যোগ দিচ্ছিলেন। পরাধীন দেশের আর্থিক দুর্দশা তখন চরমে। সরকারি স্কুলে তা-ও মাস্টারমশাইরা পঁচাত্তর টাকা করে মাইনে পেতেন, এবং কাজের স্থিরতা ছিল। অন্য পক্ষে বেসরকারি স্কুলে মাইনের হার সরকারি স্কুলের হারের অর্ধেকেরও কম।

একটু উঁচু ক্লাসে পৌঁছুবার পর আমাকে এক ভদ্রলোক বাড়িতে থেকে অঙ্ক পড়াতেন। তিনি পদার্থবিদ্যায় বি এসসি-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, এম এসসি-তেও, বি.টি-তেও প্রথম শ্রেণী। শহরের পশ্চিমপ্রান্তের একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে মাসিক পঁচিশ টাকা মাইনেতে কাজ করতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধবার পর একচল্লিশ-বেয়াল্লিশ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের আবহাওয়া দফতরে চাকরি নিয়ে পুনায় চলে গেলেন, শুরুতেই মাস মাইনে ছ'শো টাকা। যে কথা বলছিলাম, মন্দার ভয়াবহতা, আর্থিক দুরবস্থার সেই ঋতুতে, অন্যত্র কাজের অভাবে, বুদ্ধিমান প্রতিভাবান ব্যক্তিরা সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করবার সুযোগ পেয়ে বর্তে যেতেন। নিজেরা পড়াশুনো করতেন, প্রচুর পরিশ্রম করে ছেলেদের জ্ঞানান্বিত করবার চেষ্টা করতেন। এখন বলতে দ্বিধা নেই, বিদ্যাচর্চা সম্পর্কে আমার যতটুকু আগ্রহ, তার প্রায় পুরোটাই আর্মেনিটোলা স্কুলের সেই সব মাননীয় শিক্ষকদের প্রসাদে।

নিচের এবং উপরের ক্লাসে যে-যে বইগুলি পড়ানো হতো, তাদের কিছু-কিছু স্মৃতি এখনও মুছে যায়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমসাময়িক 'বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক, ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিক, কালীপ্রসন্ন ঘোষের পৌত্র শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত একটি বাংলা সংকলন নিচের ক্লাসে পাঠ্য ছিল। বইয়ের গোড়ায় শ্রীপতিবাবুর নাম জ্বলজ্বল করে ছাপা। শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ। আমি বরাবর বলতাম, শ্রীশ্রী পতিপ্রসন্ন ঘোষ, অর্থাৎ তাঁর উপর দেবত্ব আরোপ করতাম। যদিও ভদ্রলোক অতিপরিচিত, প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন

আড্ডা দিতে, তাঁর আটপৌরে আলাপের সঙ্গে কিছুতেই তাঁর ডবল শ্রী-ত্ব মেলাতে পারতাম না।

আরও যা মনে পড়ছে, তৃতীয় শ্রেণীতে শ্রীপতিবাবুর যে-সংকলনগ্রন্থ পড়তে হতো, তার প্রথম পাঠ রবীন্দ্রনাথের গান 'তোমারই গেহে পালিছ স্নেহে তুমি ধন্য ধন্য হে'। সমস্যা দেখা দিল। ড্রিল-ড্রয়িংয়ের সঙ্গে আমাদের একটি আলাদা ঘণ্টা ছিল গানের জন্য। ক্লাস-শিক্ষক ঘটকস্যার সর্বপারঙ্গম, আমাদের গানও শেখাতেন। শেখাবার জন্য ধার্য ছিল 'তোমারই গেহে...' সংগীতটিই। ঘটক স্যার স্কেল উঁচিয়ে আমাদের বলতেন, 'পদ বলো।' গানের পদ কাকে বলে, তা আমার অন্তত জানা ছিল না। সুতরাং বছর ভরেই আমার ভাগ্যে জুটতে লাগলো স্কেলের বাড়ি, কিছুতেই আর 'তোমারই গেহে' গানটি শেখা হলো না। যেটা বলতে খুব আনন্দ পাচ্ছি, বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বছর বাদে যখন রাজ্যের মন্ত্রী হিশেবে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বসা শুরু করেছি, হঠাৎ একদিন বেলঘরিয়া কিংবা বনহুগলি থেকে ঘটকস্যার কাঁপা-কাঁপা অক্ষরে এক আশীর্বাদ-ভরা চিঠি পাঠালেন, যত্ন করে রেখে দিয়েছি চিঠিখানা।

ব্যায়াম শিক্ষক ছিলেন পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়। প্রথাগত কুচকাওয়াজ তো আমাদের দিয়ে করাতেনই, সেই সঙ্গে স্কুল-প্রাঙ্গণে সবাইকে জড়ো করে 'ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল নিম্নে উতলা ধরণীতল'-এর সঙ্গে সুর-তাল মিলিয়ে হাত-পা ছোড়াছুড়িতেও অভ্যস্ত করাতেন। অঙ্কন শিক্ষক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্ভবত রাঢ় দেশের মানুষ, আমরা খুব বেশি চেঁচামেচি করলে জুলপির উপর চুল ধরে টানতেন। কিন্তু অন্য সময় প্রশান্ত, সমাহিত। ব্ল্যাকবোর্ডে রঙিন খড়ি বুলিয়ে বলতেন, 'এমনি করে, এমনি করে'। আমরা তাঁকে অনুসরণ করছি কি না তা নিয়ে তাঁর উদ্বেগ ছিল না বলেই প্রথম বছর বাৎসরিক পরীক্ষায় একটি পাখি আঁকতে বলায় আমি তিনটি এঁকে পঞ্চাশে তিন পেয়েছিলাম। তাতে অবশ্য প্রমোশন আটকায়নি। সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ দ্বারা সংকলিত একটি গ্রন্থ উপরের ক্লাসে আমাদের পাঠ্য, সম্ভবত প্রবেশিকা পরীক্ষায় সেই গ্রন্থ থেকে প্রশ্ন করা হতো। পণ্ডিতমশাই-কৃত এই সংকলনের কথা বিশেষ করে মনে আছে, কারণ তাতে বুদ্ধদেব বসুর একটি কবিতা ছিল। তাতে বুদ্ধদেব অঙ্গীকার করছেন, তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ উচ্চাভিলাষ, গ্রামে গিয়ে কৃষিকাজে নিজেকে নিয়োগ করা। কবে কোন মাহেন্দ্রলগ্নে যে তিনি কবিতাটি রচনা করেছিলেন, পরে মাঝে-মাঝেই লোভ হয়েছে বুদ্ধদেব বসুকে জিজ্ঞেস করি। পাছে তিনি লজ্জা পান, প্রতিবারই নিজেকে সংবরণ করেছি।

সরকারের স্কুল, মহামান্য ইংরেজ সরকারের। সুতরাং ইতিহাস পাঠের অর্ধেকটা জুড়ে ইংল্যান্ডের ইতিহাস, বাকিটা ভারতের। প্রবেশিকা পরীক্ষায়ও ইতিহাসের এই দু'টি ভাগ বজায় ছিল। ১৯৩৬ সাল, আমি স্কুলের নিচের শ্রেণীতে। জানুয়ারি মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জের রজতজয়ন্তী অভিষেক। স্বদেশী পরিবার থেকে এসেছি, তাতে তো ব্যত্যয় ঘটবার নয়: সারা স্কুল জুড়ে খানাপিনা হলো, আমরা নিমন্ত্রিত, আমাদের অভিভাবকরা পর্যন্ত।

(পরেও আর একবার মহোৎসবের আয়োজন হয়েছিল আমাদের স্কুলে। প্রধান শিক্ষক মহোদয় একটু বেশি বয়সে, ১৯৪০ সালে, বিবাহ করলেন। আমাদের আনন্দ ধরে না। ব্যান্ড বাজলো, বিউগল বাজলো, স্কুলের চারশো ছাত্র খানাপিনা করলো। পরের দিন ছুটি ঘোষিত হলো, যেমন হয়েছিল পঞ্চম জর্জের জয়ন্তী উৎসবের পরের দিন।)

বাড়িতে হয়তো আগেই এ-বি-সি-ডি তালিম নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু স্কুলেই রীতিমতো

ইংরেজি শিক্ষার শুরু। বহু বছর ধরে টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন মাইকেল ওয়েস্ট। তিনি ছাত্রদের ভালো করে ইংরেজি শেখবার সুবিধার জন্য অভিনব পদ্ধতিতে একটি পাঠ্যপুস্তকমালা রচনা করেছিলেন, 'নিউ মেথড রিডার'। একেবারে গোড়ায় ইংরেজি অক্ষরমালা চেনানো, তারপর বিএটি ব্যাট, সিএটি ক্যাট পর্যায়। প্রতি খণ্ডে হয়তো পনেরো-কুড়িটি অধ্যায় : কোনওটি গল্প, কোনওটি কবিতা, কোনওটি হয়তো বা প্রবন্ধ, সরল শব্দের সমারোহ। সেই সঙ্গে ছবির বাহার, প্রতিটি অধ্যায়ের পর লেখা থাকতো 'তুমি এখন পঁচিশটি শব্দ জানো', বা 'আটশো পঞ্চাশটি' কিংবা 'এক হাজার'। আর ছিল ভারতীয় পুরাণ থেকে অথবা আরব্য উপন্যাস থেকে সরলীকৃত কিছু উপাখ্যান, নয়তো কোনও ইংরেজি বাচ্চাদের ছড়া। ধাপে-ধাপে এগিয়ে যাওয়া, কবিতার ছন্দ শেখা, পাশাপাশি এখানকার-ওখানকার নানা ইতিবৃত্ত, আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের কথা ওয়েস্ট সাহেবের বই থেকেই আমি প্রথম জানতে পেরেছিলাম। অথবা সেই ভয়ংকর দানবের কথা, যে বলতো, 'ফি ফাই ফো ফাম, আই স্মেল দি স্মেল অফ এ ম্যান, বি হি অ্যালাইভ অর বি হি ডেড, আই শ্যাল ইট হিম উইথ মাই ব্রেড'। আলিবাবা আর সেই চল্লিশ দস্যুর কাহিনীও ওয়েস্ট সাহেবই আমাদের প্রথম শুনিয়েছিলেন। একটু-একটু করে এগোতাম আর মনে-মনে আওড়াতাম এতগুলি ইংরেজি শব্দ আমরা এখন জানি, প্রভুদের ভাষার শব্দ।

তবে শিক্ষার বাহন কিন্তু পুরোপুরি বাংলাই ছিল। ইতিহাস, ভূগোল, গণিত: সব-কিছুরই পাঠ্যপুস্তক বাংলাতে। ইতিহাস-ভূগোল চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের স্কুলে খানিকটা অভিনবত্ব। আগেই উল্লেখ করেছি, ইতিহাস পাঠের দুটো ভাগ : ইংল্যান্ডের আর ভারতের। প্রধান-প্রধান ঐতিহাসিক চরিত্রদের মুখে শিক্ষকমশাইরা কাল্পনিক ভাষণ রচনা করে বসিয়ে দিতেন, ভাষণে তাঁদের উজ্জ্বল কীর্তি ধরা পড়তো। তেমনই ভূগোলের ক্ষেত্রেও: বাঘা-বাঘা পর্যটকদের মুখে তাঁদের রোমাঞ্চকর ভ্রমণের বৃত্তান্ত উল্লিখিত হতো, যেমন মার্কো পোলো, আলবেরুনি, অথবা, নামটা যত দূর মনে পড়ছে, লাতিন পরিব্রাজক রুবরুকি। বিভিন্ন শ্রেণী থেকে একটু চোখে-মুখে কথা-কওয়া ছেলেদের বেছে নিয়ে তাদের দিয়ে এ সব ভূমিকার ভাষণ বলার সঙ্গে হাত-পা নেড়ে অভিনয় করার ব্যবস্থা ছিল দেদার। পড়ন্ত বিকেলে স্কুল ছুটি হবার আগে দোতলায় ট্রেনিং কলেজের লেকচার গ্যালারিতে ছাত্রদের জড়ো করে ঐতিহাসিক কিংবা ভৌগোলিক চরিত্রে অভিনয়ের আয়োজন, যথাযথ পোশাক পরিয়ে, এমনকি গোঁফ-দাড়ি-পরচুলার ব্যবস্থা করেও। একই সঙ্গে পড়াশুনো তথা বিনোদনের সমাহার।

আরও যে-ব্যাপারটা ছিল, বছরের গোড়ার দিকে, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতিটি ক্লাসেই বি.টি কলেজের শিক্ষার্থীরা উপর থেকে এসে আমাদের পড়ানোর ভার নিতেন। এটা তাঁদের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত সূচী, তথাকথিত কেজো অনুশীলন, তাঁরা কীরকম পড়াচ্ছেন, ছাত্রদের মধ্যে কতটা আগ্রহ-উৎসাহ সঞ্চার করতে পারছেন, পড়াতে গিয়ে তাঁদের জিভ শুকিয়ে যাচ্ছে কি না, এসব বিষয়ে তাঁদের পরীক্ষা নেওয়া হতো। পরীক্ষকমশাইরা এ সমস্ত কিছু দেখে এবং শুনে ক্লাসের এক কোণে বসে তাঁদের মন্তব্য নোটখাতায় পেশ করে চলে যেতেন। পাঠরত বি.টি ক্লাসের বাচ্চা মাস্টারমশাইরা যেমন আসতেন, তেমনই আসতেন কচি দিদিমণিরাও। দিদিমণিদের মধ্যে ভালোমানুষ কাউকে-কাউকে নিয়ে আমরা একটু মজাও করতাম। আর আমাদের খোদ মাস্টারমশাইরাও দিদিমণিদের খেপাতেন। বলতেন, 'আমাদের ছেলেরা আপনাদের এত ভালোবাসে যে আপনারা চলে যাওয়ার পরও কিছুদিন

আমাদের স্যার না বলে দিদিমণি সম্বোধন করে ওরা'।

স্কুলের নিচের ক্লাস থেকে শুরু করেই, কিংবা তার আগে থেকেই, পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডি অতিক্রম করে, যে-কোনও বইয়ের দিকে আমার ঝোঁক। অতি শৈশবে, তখন তো রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ' আমাদের জন্য ছিল না, বিদ্যাসাগর মশাইর 'বর্ণ পরিচয়' ও যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুশী' পেরিয়ে 'মোহনভোগ' ('কে নিবি মোহনভোগ আয় ছুটে আয় সে যে অমৃতযোগ স্নেহমমতায়'), উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সুললিত ভাষায় কাহিনীসম্ভার। কুঁচবরণ-কন্যা-তার-মেঘবরণ-চুল, চাঁদ-সদাগর, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি রাক্ষস-খোক্কস, সুয়োরানি-দুয়োরানিদের গল্পের পর গল্প: 'ঠাকুরমার ঝুলি'র সঙ্গে আরও এন্তার বইয়ের মিশেল। এখন আর মনে আনতে পারি না কোথায় পড়েছিলাম : 'পেটুক গণেশ, পেটুক গণেশ, তোমার কী কী খেতে রুচি?' যার ঝটপট জবাব : 'নরম-নরম রসগোল্লা আর গরম-গরম লুচি'। একটু বড়ো হলে আনন্দ-আবিষ্কারের কপাট একটির পর আর একটি খুলে যায়। দেব সাহিত্য কুটিরের বার্ষিক সংকলনগুলি, 'বার্ষিক শিশুসাথী', 'মৌচাক', 'রামধনু' হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রুদ্ধশ্বাস-করা বিমল-কুমার কাহিনী 'যখের ধন', 'আবার যখের ধন', পাশাপাশি জয়ন্ত-মানিক-সুন্দরবাবু। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'চালিয়াৎ চন্দর', দমকা হাওয়ার মতো শিবরাম চক্রবর্তী। সাধারণ জ্ঞান-বিলোনো সেই চমৎকার বই 'কে কী কেন কবে কোথায়', লেখকের নাম এখন আর মনে নেই। যেমন মনে নেই কে লিখেছিলেন, এক ছারপোকার সেই চমকপ্রদ আত্মজীবনী, 'রক্তচোষার দিগ্বিজয়'। না, আমাদের বাল্যে-কৈশোরে 'আবোল-তাবোল' অনুপস্থিত: শুধু মায়ের মুখে একটি-দু'টি মজাদার ছড়া শুনেছি মাত্র।

মনস্তাপ তো অন্য কারণেও। বাড়ির সবক'টি ছেলেমেয়েকে সন্ধ্যাবেলা অর্গ্যান বাজিয়ে মা গান-গাওয়ার তালিম দেওয়াতেন। কোন ফাঁকে আমি ও আমার এক তুতো ভাই পালিয়ে যেতাম, 'ঐ যে তোমার ভোরের পাখি, নিত্য করে ডাকাডাকি'-র বৃত্তের বাইরে। সুরবোধ আছে, কিন্তু গলায় সুর নেই, এখন অনুশোচনা হয়।

স্কুলের বৃত্তান্তে ফিরে আসি। যে-কোনও শ্রেণী থেকে হঠাৎ-হঠাৎ আমাদের দোতলার লেকচার গ্যালারিতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হতো। আমরা বসতাম গ্যালারির সামনে। পিছনের সারিগুলিতে বি টি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপকরা আমাদের পড়িয়ে আদর্শ শিক্ষণের নমুনা দেখাতেন, ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস বা ভূগোল। একবার ট্রেনিং কলেজের পঠনে সাহায্যে কলেজের অধ্যক্ষ আমাদের দু'দিন ধরে র‍্যাল্‌ফ হজসনের 'টাইম ই ওল্ড জিপসিম্যান' পড়িয়েছিলেন। প্রথম দিন পঠনান্তে তিনি আমাদের বললেন, 'কবিতাটি কাল বাংলায় অনুবাদ করে নিয়ে এসো সবাই।' আমি যে-বাংলা বয়ানটি নিয়ে হাজির হই তা তাঁর বেশ মনঃপূত হয়, নিজেই ঘরভর্তি সবাইকে পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন সেই পদ্য। আমার সেই আদি অনূদিত কবিতার কিছুই আর মনে নেই, শুধু এইটুকু ছাড়া : 'আর কত সুন্দরী বালা/গলায় দেবে তোমার মালা'। এখনও মাঝে-মাঝে শখ হয়, হজসনের কাব্যগ্রন্থ পেড়ে কবিতাটির মূল ইংরেজি পাঠ কী ছিল জানতে; হয়তো বাকি জীবনে সেই শখ মিটবে না। তবে স্কুল ম্যাগাজিনে আমার নামে ছাপানো প্রথম পদ্য নির্ভেজাল অপরাজিত দেবী : 'আমি শুধু বেঞ্চিতে এক পায়ে দাঁড়িয়ে/ত্রিভুজের যূপকাঠে গলা দিছি বাড়িয়ে'।

সময় গড়িয়ে যায়। তৃতীয় থেকে চতুর্থ, চতুর্থ থেকে পঞ্চম, তারপর একটু-একটু করে

উপরের ক্লাসে উঠে গেলাম। ইতিমধ্যে পুরনো বহু সহপাঠী এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেল; নতুন সহপাঠীও এলো অনেক। আমরা গড়ে তিরিশ-পঁয়তিরিশ জন, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে। তবু, কিছু আগেই উল্লেখ করেছি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও সম্প্রীতির অভাব বোধ করিনি কখনও। স্কুলে প্রথাসিদ্ধ যে-সমস্ত খেলাধুলো হতো, আমাদের ক্ষেত্রেও তাদেরই চল ছিল। স্কুলের সামনের দিকে বিস্তীর্ণ মাঠ, পিছনেও। পিছনের মাঠটাকে বলতাম বি টি ফিল্ড, টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ছাত্রদের থাকবার হস্টেল-সংলগ্ন বলে। খেলা হতো ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, হা-ডু-ডু কিংবা বাস্কেটবল। তা ছাড়া ব্যবস্থা ছিল অন্য একটি ক্রীড়ার, বোধহয় পৃথিবী থেকে যা ইতিমধ্যে বিলুপ্ত, আমরা বলতাম 'হ্যান্ডবল'। ফুটবলের তুলনায় অনেক ছোটো মাঠে খেলা, মাঠের মধ্যবিন্দুতে, ফুটবলের মতোই, রেফারিমশাই বাঁশি বাজাবার সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে যেত খেলা। হাতে ড্রিবল করে অন্য পক্ষের গোলে বল ঢোকাবার লড়াই। ফাউল ছিল, এমনকি পেনাল্টি কিকও ছিল। স্কুলের তত্ত্বাবধানেই প্রতিযোগিতামূলক খেলা হতো, হকি, ফুটবল, ক্রিকেট আর বাস্কেটবলে, বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে। দল বাছাই নিয়ে উত্তেজনা ছিল : কারও হরিষ, কারও বিষাদ। প্রতিযোগিতায় জেতা-হারা নিয়েও সমান উত্তেজনা। 'পেনাল্টি কিক'-এর মতো রাশভারি শব্দ আমাদের জিভে-ঠোঁটে ঠিক আসতো না, বলতাম 'প্ল্যান্‌টিক'। কলেজে উঠেও এই শব্দটি উচ্চারণ করেছি বলে মনে পড়ে। আরও একটি মজার ব্যাপার চালু তখন। প্রতিযোগিতায় কোনও ক্লাস হেরে গেলে সঙ্গে-সঙ্গে তারা প্রতিবাদপত্র লিখতে বসতো। আমাদের যিনি ব্যায়াম শেখাতেন তিনিই ছিলেন ক্রীড়াশিক্ষক, চিঠি যেত তাঁরই কাছে। যথা, 'আমাদের অমুক সময়ে একটি প্ল্যান্‌টিক প্রাপ্য ছিল। আমাদের তা দেওয়া হয়নি।' যথা, 'এই প্রতিযোগিতায় নিয়ম, প্রতিযোগীরা কেউই চার ফুট নয় ইঞ্চির বেশি লম্বা হতে পারবে না। কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষের অমুক ছেলেটি কোমরে রশি বেঁধে নিজের দৈর্ঘ্য দেড় ইঞ্চি কমিয়ে এনেছিল। সুতরাং ওই দলকে অবৈধ ঘোষণা করতে হবে, এবং পরের রাউন্ডে আমাদের উত্তীর্ণ করতে হবে।'

যেটা বলতে ভুলে গেছি, উপরের ক্লাসের ছেলেদের জন্য টেবল টেনিসও চালু হয়েছিল সেই সময়, আমরা বলতাম 'পিংপং'। দৌড়ঝাঁপ, মই বেয়ে ওঠা, স্লাইড বেয়ে নামা ইত্যাদি তো ছিলই। বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর স্কুলের বাৎসরিক স্পোর্টস। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে একটি আজব প্রতিযোগিতামূলক খেলাও বার্ষিক ক্রীড়া উৎসবের আবশ্যিক অঙ্গ ছিল: ধীরে সাইকেল চালানো। নিয়ম এরকম : সাইকেলের উপর বসে, ভারসাম্য বজায় রেখে, অথচ স্থাণু না থেকে, প্রতিযোগীদের সাইকেল চালাতে হবে; যে সবচেয়ে পরে প্রান্তরেখায় পৌঁছুবে, সে জয়ী; মধ্যপথে যাঁরা ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাবে, তারা তো আগেই বরবাদ। জীবনের প্রান্তসীমার কাছাকাছি এসে এখন বন্ধুবান্ধবদের বলি, আমরা নিয়ত ধীরে সাইকেল চালানোর প্রতিযোগিতায় নিরত; কে আগে ঢলে পড়বো সাইকেল থেকে, কে পরে পড়বো, কেউ তা জানি না।

বছরের পর বছর, ঋতুর পর ঋতু গত হয়, আমাদের চেতনার মানও ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী, কখনও ধীর লয়ে, কখনও দ্রুত। স্কুলের পাঠক্রম এবং পরিপার্শ্ব থেকে জ্ঞানের পরিধি বাড়ে একটু-একটু করে। বাড়ির আবহাওয়া থেকেও প্রতিদিন নিত্যনতুন জ্ঞানাহরণ করছি, পাড়াতে ঘুরে বেড়িয়েও। সরকারি স্কুল, অনেক বাধার নিগড়, প্রহরগুলি কাটাতে হয় রাজভক্তির পরাকাষ্ঠার মধ্যে। মহল্লায়-মহল্লায়, এ-পাড়া ও-পাড়ায় এবং বাড়ির মানচিত্রে

অথচ অন্য ঢেউয়ের সঞ্চার। ইতিউতি মিছিলের উচ্চারণে শুনি, 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই', 'বিনাবিচারে আটক আইন রদ করতে হবে' ইত্যাদি। একটু রোমাঞ্চ, একটু গা-ছমছমানি হয় সেসব শুনে। তবে যেটা এখনও গভীর বিষাদে মনকে ছেয়ে যায়, তা কয়েক ক্লাস উপরের ঘটনা। শহর জুড়ে সাম্প্রদায়িক কথাবার্তার ফিসফাস। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব পর-পর পাঁচবার লিগ জিতেছে সেই পর্বে। বাঘা-বাঘা খেলোয়াড়—ওসমান জান, জুম্মা খাঁ, বাচ্চি খাঁ, বড়ো রশীদ, ছোটো রশীদ, নুর মহম্মদ, দলপতি আব্বাস—এঁরা তখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন মাঠে-ময়দানে। প্রবীণ হিন্দুরা সহসা তাই নিয়ে মনস্তাপ করতে আরম্ভ করলেন, যার ছোঁয়া অল্পবয়সীদের মধ্যেও সেঁধোনো। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যেও প্রতি-আলোড়ন। তাদের কেউ-কেউ বলতে শুরু করলো, ইচ্ছা করে, ছক কেটে তাদের পিছিয়ে রাখা হয়েছে, হিন্দু জমিদাররা তাদের শোষণ করছে। ফজলুল হক সাহেব ওই সময়েই কংগ্রেস দলের সঙ্গে প্রাদেশিক সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন। তাঁকে তা গড়তে দেওয়া হলো না। বাধ্য হয়ে মুসলিম লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বঙ্গ প্রদেশের সরকার গড়লেন তিনি। জ্ঞানোন্মেষের পর আমি বহুবার ভেবেছি, শরৎ বসু মশাইকে যদি ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে হাত মেলাতে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিতেন, তা হলে হয়তো গোটা ভারতবর্ষেই তথাকথিত সাম্প্রদায়িক সমস্যা অন্য চেহারা নিত। যদি বছর পাঁচেক হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা মিলে-মিশে প্রাদেশিক প্রশাসন চালনা করতেন, জনমুখী, বিশেষ করে প্রজাকুলের স্বার্থে, বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন, ভেল্কিবাজি ঘটতো। হক সাহেব নিজের উদ্যোগে জমিদার ও মহাজনদের ক্ষমতা খর্ব করতে যেমন সফল হয়েছিলেন, তেমনই হতে পারতো কংগ্রেস-কৃষক প্রজা দলের সম্মিলিত উদ্যোগেও। নিশ্চয়ই তার প্রভাব গোটা ভারতবর্ষের রাজনীতির উপর ছড়িয়ে পড়তো এবং সম্ভবত বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক অভ্যুদয় কুড়ি-পঁচিশ বছর এগিয়ে আসতো। ফলে তাঁদের হীনম্মন্যতাবোধ দ্রুত হ্রাস পেত, অন্য দিকে উপর তলার হিন্দুদের ছড়ি-ঘোরানো মানসিকতা ক্রমশ দমিত হতো। এটা তো না মেনে উপায় নেই, আমাদের মতো দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এখনও পর্যন্ত সমাজচেতনার অগ্রদূত হিশেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে সুখবোধ করেন। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্তদের মধ্যে যদি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের সৌষাম্য সংঘটিত হতো, সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির আশঙ্কা অঙ্কের নিরিখে অনেকটাই নির্বাপিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

তবে এ সমস্তই ভাবনাবিলাস! কেউ-কেউ হয়তো যুক্তি দেবেন, তেলে-জলে মিশ খায় না, জমিদারসংকুল কংগ্রেস দলের সঙ্গে গরিব কৃষকদের সমর্থনপুষ্ট কৃষক প্রজা দলের বোঝাপড়া খুব বেশিদিন টিকতো না; জমিদারি উচ্ছেদ ও ঋণ মকুবের ব্যাপারে দুই দলে সংঘাত তো প্রায় অবধারিত ছিল; পরিণামে সম্মিলিত সরকার অচিরেই ভেঙে পড়তো। কিন্তু, অন্তত একটি সম্ভাবনা আমার কাছে এখনও তেমন অবাস্তব মনে হয় না: যে আড়াআড়ি হতো, তা হতো শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তিতে; হয়তো কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা দলের উপরতলার জমিদার ও তাঁদের সমর্থক মানুষজন এক দিকে হেলে পড়তেন, অন্য দিকে গরিব হিন্দু-মুসলমানের জোট অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠতো।

যা ঘটে গেল, বিকল্প কী ঘটতে পারতো, তা নিয়ে বিস্তারিত হওয়ার সত্যিই হয়তো তেমন আর সার্থকতা নেই। যেটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি, স্কুলের প্রতিটি ক্লাসে শ্রেণীবিন্যাসের জটিলতা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমান ছেলেরা একসঙ্গে ক্লাসে বসতাম, দুষ্টুমি করতাম, খেলতাম, বাড়ি-বাড়ি ফুল চুরি করতাম, কেউ পড়াশুনোয় একটু খাটো হলে তার

দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতাম। আমাদের চেতনায় অন্তত সাম্প্রদায়িক সমস্যাটি কোনও বড় আকার নিয়ে হাজির হয়নি। গোলমাল বাধতে শুরু করলো ১৯৪০-৪১ সাল থেকে: খবরের কাগজে বিষ ছড়ানো, কংগ্রেসের তরফ থেকে ফজলুল হককে শত্রু বলে ঘোষণা করা, অতঃপর তাঁর মুসলিম লিগে ঢুকে পড়া, সেই সঙ্গে বিভিন্ন চক্র থেকে দাঙ্গার উস্কানি ইত্যাদি নানা গোলমেলে পরিস্থিতির সৃষ্টি। একচল্লিশ সালের একটা বড়ো সময় জুড়ে ঢাকায় আমরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হই। স্কুল বন্ধ, হাটবাজার বন্ধ, লোকালয় নিঝঝুম, এ-পাড়া থেকে ও-পাড়ায় যেতে গা ছমছম। বারো-চোদ্দো বছরের বাচ্চা ছেলেদের ধরে পাড়ার দাদারা ছুরি চালানোয় হাতেখড়ি দিচ্ছেন। প্রথমে কলাগাছে ছুরি চালিয়ে নিশানা এবং আঙ্গিক রপ্ত করা; ছেলেছোকরারা এই বিদ্যায় তালেবর হয়ে উঠলে তাদের মন অস্থির, হাত নিশপিস। অন্য সম্প্রদায়ের কোনও গরিব ফেরিওয়ালা এ পাড়ায় এলে কীভাবে তাঁর পেট ফাঁসিয়ে দেওয়া হতো, এ-পাড়ার শিক্ষক বা কেরানি ও-পাড়ার মধ্য দিয়ে শর্ট কাট করতে গিয়ে কেমনভাবে আক্রান্ত হতেন, কচি মাস্তানদের দাপটের রমরমা, কীভাবে তারা তৈরি হতো দাগি অপরাধী হিশেবে, চোখের সামনে সে সব দৃষ্টান্তিত হতে দেখেছি। অন্য সম্প্রদায়ের কোনো চটজলদি শিকার না পেলে ওই কচি অপরাধীর দল তখন নিশ্চিন্তে-ঘাস-খেয়ে-বেড়ানো মাঠে-চরা ঘোড়াগুলির পেট ফাঁসিয়ে দেওয়ার আনন্দে মাতোয়ারা হতো। এই পাপের তো ক্ষমা নেই। যে-গুরুজনস্থানীয়রা তখন এদিকের-ওদিকের নৈতৃপর্যায়ে স্থিত ছিলেন, তাঁদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমরা করেছি গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে।

সমস্ত অন্তঃকরণ এখনও সেই ভয়ংকর স্মৃতির নির্দয়তায় শিউরে ওঠে। স্কুল-কলেজে যাওয়া, দোকানপাট, বাজার, অফিসে আদালতে হাজিরা, সব-কিছু বন্ধ। দিনভর গুজবের একচ্ছত্র আধিপত্য। ওই দুঃসহ বাতাবরণে সব গুজবের বাস্তব ভিত্তিও উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। জটলা এ-পাড়ায় যেমন, ও-পাড়ায়ও তেমনি। গোনাগুনতিও হতো, যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছি আমরা: আজ ওদের ঊনতিরিশজন ঘায়েল, আমাদের বাইশজন, আগামীকাল এই ঘাটতি উসুল করে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হোক তক্ষুনি। ছেলেদের ডেকে তাদের উপর ফরমান চাপানো হলো, কে ক'টা ছুরি মারবে, ক'টা ঘরে আগুন দেবে, কোন-কোন বাড়িতে ঢুকে লুঠপাট চালাবে।

১৯৪১ সাল শেষ। ১৯৪২-এ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স্ এলেন আর গেলেন। জওহরলাল নেহরু ও জিন্নার পারস্পরিক দাবি-দাওয়াগত সমস্যার কোনও ফয়সালা তিনি করতে পারলেন না। গান্ধিজী বলতে শুরু করলেন, প্রভুগণ, ঢের হয়েছে, এবার তোমরা বিদায় নাও, তেমন তেমন হলে ভারতবর্ষকে নৈরাজ্যের হাতে ছেড়েই প্রস্থান করো; আমাদের ভবিষ্যৎ আমরাই তৈরি করে নেবো। ততদিনে অবশ্য জিন্না রক্তের স্বাদ পেয়ে গেছেন। বিলেতে প্রধানমন্ত্রী রূপে আসীন হয়েছেন পরম নাক-সিঁটকোনো উইনস্টন চার্চিল মহাশয়। একের পর আর-এক ঘটনাবলী: ভারত ছাড়ো প্রস্তাব, কংগ্রেস নেতাদের গ্রেফতার, দেশের নানা প্রান্তে অস্থিরতা, ডাক ও তার চলাচল বন্ধ, রেললাইন উপড়োনো, ধর্মঘটের পর ধর্মঘট। ততদিনে তো মনের দিক থেকে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর বেড়েছে। অথচ এমনটা না-ও হতে পারতো। হরিপুরা এবং ত্রিপুরী কংগ্রেসের স্মৃতি তখন প্রায় ফিকে। সুভাষচন্দ্রকে প্রায় ঘাড় ধরে কংগ্রেস দল থেকে বিতাড়ন করা হয়েছে। তিনি ফরোয়ার্ড ব্লক গড়লেন, হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আর একবার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়কে পরস্পরের কাছাকাছি টানবার উদ্যোগ নেওয়া হলো। পাশাপাশি,

কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে ১৯৪০ সালে সুভাষচন্দ্র মুসলিম লিগের সঙ্গে মিতালি করলেন; উপরন্তু লিগের পক্ষ থেকে মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পথও মসৃণ করে নিলেন। কংগ্রেস দলে তা নিয়ে তীব্র সমালোচনা: 'জাতীয়তাবাদী' সংবাদপত্রে ছুভাছ মিয়াঁ ও আচার্য ইস্পাহানিকে ব্যঙ্গ করে কার্টুনের পর কার্টুন। স্পষ্টতই অনেক দেরি হয়ে গেছে। কে জানে, সুভাষচন্দ্র যদি সে-মুহূর্তে ইউরোপে প্রস্থান না করতেন, হয়তো যে-সম্ভাবনার অঙ্কুর ফুটতে-ফুটতে নির্জীব হয়ে পড়েছিল তাকে বাঁচিয়ে তোলা যেত আর একবার।

তিন

অপর একটি প্রসঙ্গ মুলতুবি রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না। আমরা স্কুলের উঁচু ক্লাসে উঠবার সঙ্গে-সঙ্গেই সোভিয়েট বিপ্লবের কথা শুনতে শুরু করেছি। বিমল সেন নামে এক লেখক-কৃত ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' উপন্যাসের সরল অনুবাদ পড়া শেষ। আর্মেনিটোলা স্কুলে আমাদের প্রবীণ শিক্ষক, প্রাণবল্লভ বসাক, যাঁকে আমি বাল্য বয়সে 'প্রাণবল্লম স্যার' বলে বরাবর অভিহিত করতাম, তাঁদের পারিবারিক বইয়ের দোকান 'অ্যালবার্ট লাইব্রেরি' নবাবপুর পাড়ায়। তাঁর সাক্ষাৎ ভাইপো গোপাল বসাক মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় সাজা পেয়ে বছর দশেক কয়েদ বাস করে কমিউনিস্ট হয়ে সদ্য ঢাকায় ফিরে এসেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির গোপন শাখা এ-পাড়ায় ও-পাড়ায়। সংগঠন গড়ে উঠছে বিভিন্ন কলেজে, কোনও-কোনও স্কুলে পর্যন্ত, একটু-একটু করে। আমরা কান পেতে শুনছি চুপি-চুপি কথা বলা বিভিন্ন মতাদর্শ নিয়ে। বারো-তেরো-চোদ্দো বছরের আমাদের দলে ভেড়াবার জন্য, তা সে যে-দলেই হোক, প্রগাঢ় আগ্রহ, তালিম হিশেবে দাদারা রাজনৈতিক-কারণে-বাজেয়াপ্ত বই থেকে অনুলিখনের নির্দেশ দিচ্ছেন। এমনি করেই আমরা যেমন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র সঙ্গে ভাব জমাচ্ছি, সেই সঙ্গে রেবতী বর্মনের কমিউনিস্ট ইস্তেহারের হাতে-লেখা বাংলা অনুবাদও এখান-ওখান থেকে চেয়েচিন্তে এনে পড়ছি, নির্জন দ্বিপ্রহরে বা গভীর রাত্রে, গুরুজনদের দৃষ্টি এড়িয়ে।

গুরুজনদের দৃষ্টি এড়িয়ে গ্রন্থপাঠের প্রসঙ্গে সাহিত্যপাঠের মহার্ঘ মুহূর্তগুলির কথাও মনে পড়ছে। মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত যে-কোনও সাধারণ বাঙালির কাছে রবীন্দ্রনাথ তখনও প্রধানত হয় রবিঠাকুর, নয় রবিবাবু। প্রায় প্রতি বাড়িতেই একটি করে 'চয়নিকা'; তা থেকে, যে-কবিতা সব সময় সব চেয়ে বেশি আমাদের নির্দেশ দেওয়া হতো জোরে চেঁচিয়ে মুখস্থ করবার জন্য, তা 'আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের পর...'। 'পশিল' যে আসলে 'প্রবেশ করিল', সেটা সম্যক উপলব্ধি করতে আমি বোধহয় একটু ধন্ধে পড়ে গিয়েছিলাম, আর্ষপ্রয়োগের ব্যাপারটা মাথায় ঢুকত না বলে। তেমন অভাবের সংসার না হলে সাধারণ গৃহস্থ বাড়িতে অন্তত এক, কখনও দুটো, মাসিক পত্র-পত্রিকা রাখার চল ছিল। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স থেকে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা আসতো আমাদের বাড়িতে। পুরনো 'ভারতবর্ষ', অন্তত গোটা কুড়ি বছর জুড়ে, বাঁধানো রাখা ছিল বইয়ের আলমারিতে। আলমারিতে তালাচাবির ব্যবহার ছিল না। সুতরাং দীর্ঘ দুপুরে বড়োদের এড়িয়ে আমি এক-একটি খণ্ড বের করে এনে ডুবে যেতাম 'ভারতবর্ষ'-তে। মজে যেতাম দিলীপকুমার রায়ের 'রঙের পরশ মনের পরশ'-এ, শরৎবাবুর 'শেষ প্রশ্ন'-তে ও অসমাপ্ত 'শেষের পরিচয়'-এ, নরেন্দ্র দেব মশাইয়ের রূপকথায় কিংবা অনুবাদ কবিতায়, রাধারাণী দত্তর রবীন্দ্রনাথের-প্রভাবে-সর্বসমাচ্ছন্ন দীর্ঘ কবিতায়, শৈলজানন্দের কয়লাকুঠির গল্পে, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের প্রতিটি বাক্যান্তে অবধারিত তিনটি-চারটি ফুটকির সমারোহ-

সহ, অতি চমৎকার বাঙালি ঘরোয়া গল্পে। সত্তর বছর বাদে ডট-কমের ভুবনে আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছি, কিন্তু সেই কৈশোরেই সৌরীন্দ্রমোহনের সৌজন্যে ডটের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়। বয়স বাড়ে, পুরনো 'ভারতবর্ষ' ঘাঁটতে ঘাঁটতে এগিয়ে যাই। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'অভয়ের বিয়ে' ও 'তারপর', ময়মনসিংহ জেলার বাচনে ঠাসা 'শেষ পথ'। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর বেপাড়া নিয়ে গল্প 'ইতি'। সেই গল্প যে-পৃষ্ঠায় শেষ হলো, সম্ভবত পাদপূরণের জন্য, সেখানে শ্রীবুদ্ধদেব বসুর কবিতা, 'সব শেষ হলো তবে? তা-ই হোক, অশ্রু ফেলিও না। জানো নাকি অশ্রুজল ওষ্ঠপুটে ঠেকে বড়ো নোনা, বিষম বিস্বাদ, যে ওষ্ঠে রেখেছো এঁটে প্রণয়ের সম্পূর্ণ সম্বাদ'। কিন্তু শুভ্রশ্মশ্রুতে-মুখাবয়ব-মণ্ডিত পরম উদারহৃদয় সম্পাদক জলধর সেনের জাদু দেখানোর এখানেই ইতি নয়। পরের সংখ্যাতেই শোভাবর্ধন, অথবা মতান্তরে কলঙ্কলিপ্ত-করা, বুদ্ধদেব বসুর আরও ভয়ংকর রচনা, এবার গল্প, 'যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন'। হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় নামে একজন রোমান্টিক বিষাদের গল্প-উপন্যাস লিখতেন, যেমন 'বিরহ-মিলন কথা'। আর-একজন, অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়, স্যানিটরিয়ামে নির্বাসিত প্রেমপীড়িত যক্ষ্মারোগীদের নিয়ে। সব কিছুই আমার প্রথম পড়া 'ভারতবর্ষ'-এ, এমনকি প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প 'সাগর সঙ্গমে' পর্যন্ত। সেই সঙ্গে স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের 'অন্ত্যেষ্টি', সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'পান্থনিবাস' ও 'হংসবলাকা'। সাহিত্যের আধুনিক পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে গেলাম যেন।

গুরুজনদের কাছে মাঝে-মাঝে ধরা পড়ে যেতাম। তখন কয়েকদিন হয়তো আমাকে চোখে-চোখে রাখা হতো। কিন্তু মন্থর সময় আবার পুরনো বৃত্তে ফিরতো। আমি বেপরোয়া, সৃষ্টিরসের সন্ধানে মেতে উঠেছি ততদিনে, জেনে গিয়েছি বুদ্ধদেব বসু ঢাকা শহরেরই ছেলে, আপাতত কলকাতাপ্রবাসী। তাঁর বাবা ভূদেবচন্দ্র বসু আমার মায়ের জ্ঞাতি; প্রায়ই আমাদের বাড়িতে ওঁর আনাগোনা। একটু পরে ক্রমশ 'প্রগতি', 'কল্লোল', 'কালিকলম' ইত্যাদির কথাও জানতে পারলাম। নবম-দশম শ্রেণীতে উঠতেই সাহিত্যপাঠের অর্গল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত:। বাংলা বই, পত্রিকা, সেই সঙ্গে ইংরেজিও। এক টাকা দিলে পাওয়া যেত তিনটি পেঙ্গুইন।

আমি তখন সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীতে। বুদ্ধদেব বসুর এক অনুজ, জয়দেব, স্কুলে আমার এক ক্লাস-দুই-ক্লাস নিচে পড়তো। 'কবিতা' পত্রিকার নাম ভাসা-ভাসা আগেই শুনেছিলাম। একদিন জয়দেব আমাকে প্রথম তিন-চার বছরের একগুচ্ছ 'কবিতা'র সংখ্যা পড়তে ধার দিল। সহসা নতুন গ্রহলোকে পৌঁছে গেলাম। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ইলেকট্রনের তামাশা', সমর সেনের উদ্ধত কামনার মতো সেই মেয়ের বর্ণনা, জীবনানন্দ দাশের 'মৃত্যুর আগে'; আমি কোন সংখ্যাটি ফেলে অন্য কোন সংখ্যাটি হাতে নেবো, মুহ্যমান, হতভম্ব, স্থির করতে পারি না। ঘোরের মধ্যে কাটলো। অথচ পাশাপাশি যে-স্মৃতিখণ্ডটি এখনও সমান উজ্জ্বল, 'কবিতা' উপভোগের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। 'কবিতা'-র ওই সংখ্যাগুলি বুদ্ধদেব বসু তাঁর পিতৃদেবকে উপহার পাঠিয়েছিলেন : 'শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র বসুর করকমলে, বুদ্ধদেব'। বাবাকে নয়, শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র বসুকে; ব্যাপারটি আমার কাছে আশ্চর্য তথা অভিনব মনে হয়েছিল।

অবশ্য ইতিপূর্বেই রবীন্দ্রনাথে বিভোর হওয়া। 'চয়নিকা' পেরিয়ে 'সঞ্চয়িতা', 'সঞ্চয়িতা' পেরিয়ে 'খেয়া', 'বলাকা' পেরিয়ে 'পূরবী'; তারপর 'মহুয়া' অতিক্রম করে আমি 'লিপিকা' ও 'শেষ সপ্তক'-এ জড়িয়ে গেছি। আমাদের কয়েক ক্লাস উপরে আর্মেনিটোলা স্কুলে পড়তেন দুই ভাই, সৈয়দ আলি আহসান ও সৈয়দ আলি আশরাফ। পূর্ব পাকিস্তান গঠিত

হওয়ার পর তাঁরা দু'জনেই ঘোর জামাত-ই-ইসলামির অনুরক্ত হয়ে পড়েন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আলি আশরাফ, করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপক, ওখানেই থেকে যাওয়া মনস্থ করেন। আলি আহসান অবশ্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি, প্রবীণতম। কিন্তু তাঁর ধর্মীয় গোঁড়ামি, আমার সন্দেহ, প্রবলতর হয়েছে। অথচ স্কুলে দুই ভাই-ই নম্রতায়, শিষ্টতায়, প্রতিভার উজ্জ্বলতায় আমাদের আদর্শস্থানীয় ছিলেন। আলি আহসান প্রায়ই 'লিপিকা' থেকে 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' আবৃত্তি করে শোনাতেন আমাদের।

বলছিলাম, মজেছিলাম রবীন্দ্রনাথে, ডুবেওছিলাম অনেকখানি। তবু, রবীন্দ্রনাথ আমার সত্তা-চেতনা ঘিরে থাকা সত্ত্বেও, 'কবিতা' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা থেকে আধুনিক কবিতার মদিরা পানের নেশাও আমাকে পেয়ে বসলো: সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব, অজিত দত্ত, আর, সবচেয়ে যিনি তাঁর চাতুর্য, নাস্তিকতা এবং গদ্য-বিভঙ্গ দিয়ে মোহমুগ্ধ করে রাখলেন, তিনি সমর সেন।

ইতিমধ্যে আমরা আর্মেনিটোলা পাড়া ছেড়ে কায়েতটুলিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি একটি ছোটো বাড়িতে উঠে গিয়েছি। কয়েক বছর বাদে ফের আর্মেনিটোলার পুরনো বাড়িতে কিছু সময়ের জন্য, তারপর আমার বাবা বক্সিবাজার পাড়ায়, ঢাকেশ্বরী মন্দিরের সন্নিকটে, নতুন বাড়ি তৈরি করলেন। আমার স্কুল পর্বের শেষ দুই বছর সেই বাড়িতেই কেটেছে। বাড়ির ঠিক বাইরে অর্ফ্যানেজ রোডের উপর মস্ত এক কৃষ্ণচূড়া গাছ, বছরে অন্তত চার-পাঁচ মাস যা আমার সমস্ত অন্তর রাঙিয়ে দিয়ে যেত। পলাশের লালও দেখেছি, রক্তজবার লালও, কিংবা রক্তগোলাপের; কৃষ্ণচূড়ার মহিমার সঙ্গে তুলনা হয় না তাদের। বরাবর স্কুলে আমার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়া এক বন্ধু সাইকেল চেপে ছুটির দিনে আড্ডা দিতে আসতো। বাইরে থেকে বেল বাজালে আমি বেরোতাম, সেই কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম অভিশাপ-আশীর্বাদের প্রচ্ছায়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের গল্প। ওই সময়েই হয়তো ঝোঁকের মাথায় বুদ্ধদেব বসুকে চিঠি লিখতে শুরু করেছিলাম। লেখক বুদ্ধদেব বসুকে সম্মান জানানো চিঠি, সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুকেও ; কৈশোরের আবোল-তাবোল প্রলাপমাখানো চিঠি; বুদ্ধদেব প্রতিটি চিঠিরই জবাব দিতেন। তার চেয়েও যা বড়ো কথা, আমি সেই ঋতুতে কবিতায় পুরোপুরিই বখে গেলাম। আমার প্রথম কবিতাপ্রয়াস অথচ বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা'-য় প্রকাশিত হয়নি, তা ছাপিয়েছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'নিরুক্ত' পত্রিকায়। সেই কবিতার নাম, আশ্চর্য হবেন না কেউ, 'কৃষ্ণচূড়াকে নিয়ে'। আমার বয়স তখন ষোলো। পরে কলকাতায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রথম যেদিন আলাপ হলো, তাঁর প্রথম প্রশ্ন, 'আপনিই তো সেই অশোক মিত্র, যিনি কৃষ্ণচূড়াকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন, যে-কবিতায় এমন লাইন ছিল : "উচ্ছল চোয়ালওয়ালী মেয়ের পাল?" হাত মেলান ভাই।'

অনেক এগিয়ে এসেছি। আমাকে ফিরতে হবে ওই নিটোল বিশাল কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়াতেই কিছুক্ষণের জন্য। কবিতায় প্লাবিত হবার দিন সেগুলি, কিন্তু সেই সঙ্গে গানেও। অনেকে এখন বিশ্বাস করতে চাইবেন না, কিন্তু তিরিশের দশকের উপান্তে, চল্লিশের দশকের প্রারম্ভে, রবীন্দ্রনাথের গান মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরে-ঘরে স্বতঃসিদ্ধতার মতো উপস্থিত ছিল না। পঙ্কজ মল্লিক মশাই প্রতি রবিবার ভোরবেলা এক ঘণ্টার জন্য বেতারে রবীন্দ্রসংগীতের তালিম দিতেন। বাংলা চলচ্চিত্রে, প্রধানত কানন দেবী এবং কুন্দনলাল সায়গলের মধ্যবর্তিতায়, আমরা রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে আরও কিছুটা পরিচিত হয়েছিলাম। যাঁরা ব্যাকরণিক সংজ্ঞায় নিখুঁততম রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশক-পরিবেশিকা, কনক দাশ-সতী

দেবী-শান্তিদেব ঘোষ-অমিতা সেন, বাজারে কিন্তু তাঁদের রেকর্ড তেমন প্রচলিত ছিল না। রবীন্দ্রনাথের গান শান্তিনিকেতনে পড়ে থেকেছে এক পাশে, ঘরোয়া বাঙালির সঙ্গে তার যেন কোনও যোগাযোগ নেই। এরই মধ্যে আমরা বিভিন্ন স্কুলে-কলেজে 'শারদোৎসব' বা 'নটীর পূজা' মহড়া হচ্ছে শুনতে পাচ্ছিলাম; কখনও-কখনও প্রত্যক্ষ শ্রুতিদর্শনের অভিজ্ঞতাও হচ্ছিল। তা হলেও তা যেন বাঙালির মধ্যবিত্ততা থেকে বিশ্লিষ্ট, বিচ্ছিন্ন। সুতরাং খুব নির্ভয়ে এবং নির্ভাবনায় দাবি করতে পারি, আমরাই প্রথম প্রজন্ম, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গানে অবগাহিত হবার অসহ্য আনন্দে ভেসে যেতে পেরেছি। আরও যা আশ্চর্য বলে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের গান হঠাৎ ছড়িয়ে পড়তে শুরু হলো তাঁর মৃত্যুর পরেই। কলকাতা, এবং মফস্বলেও, রবীন্দ্রসংগীতচর্চার বিদ্যাপীঠ খোলা শুরু হলো একটি-দু'টি করে। শান্তিনিকেতনে বা শান্তিনিকেতনের বাইরে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গানে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে জর্জ বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠলাবণ্যে রবীন্দ্রসংগীত বাঙালির একান্ত উত্তরাধিকার হিশেবে অচিরেই প্রমাণিত হলো। জর্জ বিশ্বাস নিশ্চয়ই শান্তিনিকেতনে তালিম নেননি। আর আমি যে বিশেষ মুহূর্তের কথা বলছি, সুচিত্রা মিত্র তখনও সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় তখনও কণিকা মুখোপাধ্যায়। যা যোগ করতে হয়, এই সময়বৃত্ত আধুনিক বাংলা গানেরও স্বর্ণযুগ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের ঐশ্বর্য তো বিলোচ্ছেনই দিলীপকুমার রায় ও সাহানা দেবীর দৌত্যে অতুলপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজকে মোহিত করলো। নজরুলকে ভুলে থাকি কী করে। এবং তাঁর ঐতিহ্য অনুসরণ করে, কিছুটা বাংলা চলচ্চিত্রের সম্মোহে ধরা পড়ে, হিমাংশুকুমার দত্ত-অজয় ভট্টাচার্য-প্রণব রায়-সুবোধ দাশগুপ্ত কথায়-সুরে বাংলা গানে আধুনিকতার যুগ-সূচনা করলেন, তাঁদের প্রভূত হাত বাড়ালেন বিখ্যাত ভ্রাতৃত্রয় সুবল দাশগুপ্ত-কমল দাশগুপ্ত-বিমল দাশগুপ্ত। যাঁদের এখানে নামোল্লেখ হলো, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কাব্যরচনায় সমান সুদক্ষ ছিলেন, 'কবিতা' পত্রিকায় তাঁদের রচনা ছাপা হয়েছে।

এ সমস্তই হয়তো আমার স্কুলজীবনের শেষ অধ্যায় বর্ণনার প্রেক্ষিতে ঈষৎ উৎক্ষিপ্ত, কিংবা হয়তো তা নয়। যে চেতনা ও মনস্কতার স্তরে কিশোরকালের অন্তিম মুহূর্তে, তথা তারুণ্যের প্রথম প্রহরে, পৌঁছেছিলাম, তাতে তো নানা বর্ণের নানা ঝোঁকের মিশেল। কবিতা পড়ছি, গান শুনছি, খেলার মাঠে হুল্লোড়ে মাতছি, পাড়াটে বিসংবাদে নিজেকে জড়াচ্ছি, একটু-আধটু রাজনৈতিক অনুভবের সংস্পর্শে আসছি। তখন থেকেই বাড়ির ঐতিহ্য মেনে ক্রিকেট সম্পর্কে অনাবিল আগ্রহ। এদেশের-বিলেতের-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার প্রতিটি স্কোর প্রায় মুখস্থ। ১৯৩৮ সালে ওভাল টেস্টে ব্রাডম্যানের অস্ট্রেলিয়াকে ইংল্যান্ড গো-হারা হারালো, সেই সঙ্গে লেন হাটন ব্যাটিং-এ ব্রাডম্যানের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেলেন। তা নিয়ে আমার কিশোরকালীন মনস্তাপ মনে করে এখনও মজা-মেশানো হাসি পায়, অথবা হাসি-মেশানো মজা! যে চেতনার উল্লেখ একটু আগে করেছি, যে চেতনায় আমি যৌবনের উন্মেষে উত্তীর্ণ হয়েছি, তার জন্য অবশ্য স্কুলের মাস্টারমশাইদের সস্নেহ সাহায্য-পরামর্শ-উপদেশের কাছে অনেকাংশে ঋণী। স্কুলের শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে কিছু কথা আগেই বলেছি। কিন্তু শিক্ষকদের সম্বন্ধেও খানিকটা না বললে কৃতঘ্নতা হবে। ইতিহাস এবং ইংরেজি পড়াতেন যথাক্রমে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও নগেন্দ্রনাথ দাশ মশাই; ভূগোল শিক্ষক সরোজকুমার সেনগুপ্ত। বাংলা পড়াতেন, প্রথম দিকে মণীন্দ্রচন্দ্র সেন ও পরে প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞান নিয়ে আমাদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কামরুদ্দিন

আহমেদ স্যার আড্ডার ঢঙে কাটিয়ে দিতেন। শামসুদ্দিন আহমেদ সাহেব বেশ কয়েকবছর অঙ্ক আর ভূগোলের পাঠ নিয়েছিলেন আমাদের। সংস্কৃত পড়াতেন পণ্ডিত প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ।

এঁদের সবাইয়ের কাছেই বহুভাবে ঋণী আমি। তবে সবচেয়ে বেশি ঋণগ্রস্ত বোধহয় শামসুদ্দিন স্যারের কাছে। এমন ছাত্রবৎসল শিক্ষক খুব কমই দেখেছি। পড়া না পারলে, কিংবা দুষ্টুমি করলে, কড়া শাসন করতেন, জুলপির উপরের চুল টেনে ডাস্টার দিয়ে গুঁতোতেন। তথাচ ছাত্র-অন্ত প্রাণ, ছাত্রদের শুভ-অশুভ নিয়ে তাঁর অহোরাত্র চিন্তা। একটি ব্যাপারে আমাদের তিনি গভীর ত্রাসের কারণ হয়ে থাকতেন: প্রতি রবিবার, এবং ছুটির দিনে, নিজের পয়সায় রিকশায় চেপে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের জ্ঞাত করে আসতেন, আমরা কে কোন বিষয়ে ভালো, কোন বিষয়ে খাটো, কার হাতের লেখার উন্নতি দরকার, কার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিলে ভালো হয়। আমাদের দেশজ প্রবচনের বয়ান 'অতি ঘরন্তী না পায় ঘর'। শামসুদ্দিন স্যারের বাড়িতে থেকে তাঁর ভাগ্নে গোলাম হোসেন পড়াশুনো করতেন, আমাদের কয়েক ক্লাস উপরের শ্রেণীর ছাত্র। শান্ত মানুষ, লেখাপড়ায় তেমন দড় নয়, কিন্তু খেলাধুলোয় ওস্তাদ। সেই গোলাম হোসেন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে দু'বছর আই এসসি পড়েছেন। ফুটবলে তাঁর উৎসাহের জুড়ি নেই, কুশলতায়ও। পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারবেন কি না সে সম্পর্কে তাঁর নিজেরই হয়তো সন্দেহ ছিল; কাহিনীর বাকিটুকু শামসুদ্দিন স্যারের কথাতেই বলি, 'বুঝলি, আমার কী কপাল। গোলাম হোসেনের পরীক্ষার তারিখ এসে গেছে। প্রতিদিন সাতসকালে দুধ-কলা-ভাত খাইয়ে রওনা করে দিতাম। বিকেলে ফিরলে জিজ্ঞাসা করতাম, কেমন পরীক্ষা দিলি? তার সংক্ষিপ্ত জবাব, ভালো। পরে আবিষ্কার করলাম হতভাগা পরীক্ষা দিতে বসেইনি, সারাদিন ফুটবল ঠেঙিয়ে বেড়িয়েছে। আমি কী করবো বল্। আমার দিদির একটা মাত্র সন্তান। সে উচ্ছন্নে গেল!' তা বলে শামসুদ্দিন স্যারের অতটা আক্ষেপের কারণ ছিল না। এক-একজন মানুষের প্রতিভা এক-এক দিকে খোলে; গোলাম হোসেনের প্রতিভার ক্ষেত্র ছিল ফুটবলের বর্তুল ঘিরে।

সম্ভবত ১৯৪০ সাল সেটা। কলকাতা থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের ফুটবল দল ঢাকায় কয়েকটি প্রদর্শনী খেলা খেলতে হাজির। ডাকসাইটে দল সে সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের : গোলে মোহনবাগানের রাম ভট্টাচার্য, দুই ফুলব্যাক, ইন্দু কুণ্ডু ও সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় (দু'জনেই ভবানীপুরের) ; হাফব্যাকদের মধ্যে এরিয়ানের দাশু মিত্তির, মোহনবাগানের নীলু মুখার্জি: যতদূর মনে পড়ে, রাইট আউট স্বনামখ্যাত নির্মল চাটুজ্যে, এবং লেফ্‌ট আউট, তথা দলপতি, মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অধিনায়ক আব্বাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে খেলায় প্রেসিডেন্সি ড্র করলো। কিন্তু ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সঙ্গে খেলতে গিয়ে এক-শূন্য গোলে তাদের পরাজয়: গোলদাতা সেই গোলাম হোসেন। ঢাকাতে বিদেশবিভুঁয়ের দল খেলতে এলে বরাবরই একটু বিপাকে পড়তো। আরও দু'-তিন বছর পূর্বেকার কাহিনী : বিলেত থেকে আর্সেনাল-উলভারহ্যাম্পটন ইত্যাদি দুর্ধর্ষ ক্লাব থেকে বাছাই করে গঠিত ইসলিঙটন কোরিন্থিয়ান্স নামে এক ফুটবল দল ভারতবিহারে এল। তারা পেশোয়ার থেকে ত্রিবান্দ্রম, করাচি থেকে কলকাতা-মাদ্রাজ সব মিলিয়ে বিভিন্ন শহরে গোটা পঁচিশ খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল। ভারতবর্ষের অন্য সব ক'টি খেলায় তারা অপরাজিত, একমাত্র ঢাকা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কাছে, কী আজব ব্যাপার, তারাও এক গোলে হেরে গেল। গোলটি করেছিলেন উয়াড়ি ক্লাবের পাখি সেন, যিনি কলকাতায় রেলের টিমে খেলতেন।

আই এফ এ দলে তাঁর জায়গা হতো না, কিন্তু স্বস্থান ঢাকায় বিজয়ী বীর। মনে আছে, পরের দিন ঢাকার সমস্ত স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল বিজয় উৎসবের আবেগে।

কৃষ্ণচূড়া গাছ, 'গীতবিতান'-এ ডুবে যাওয়ার প্রথম উন্মাদনা, কবিতা আর কবিতায় ঘেরা আর্মেনিটোলা স্কুল। স্কুলের উত্তর প্রান্তে একটি মস্ত গুলঞ্চ গাছ। 'গীতবিতান' আসলে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যের নির্যাস, এই উপলব্ধির পাশাপাশি একটু-একটু করে রবীন্দ্রসংগীতের মোহিনী মায়ায় আবিষ্ট হওয়া যদিও কবুল না করে উপায় নেই বাংলার ঘরে-ঘরে নজরুলের গানের জাদু তখনও রবীন্দ্রসংগীত ছাপিয়ে।

যেটা বলা প্রয়োজন, আমার নিজের ধারণা, সাহিত্যপ্রীতি, গানে অনুরাগ, আড্ডায় মজে যাওয়া, এ-সমস্ত কিছুরই অঙ্কুর হয়তো আমার মামাবাড়ির পরিবেশে। আমাদের নিজেদের আদি গ্রাম ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ মহকুমার প্রায় সঙ্গমস্থলে, লাঙ্গলবন্ধ গ্রাম ও বন্দরের পাশে। তা ধবলেশ্বরী ও শীতলক্ষা নদীর সম্মিলিত আক্রোশে ভেঙে-ধুয়ে-মুছে যায়। প্রপিতামহ নতুন করে বসতি স্থাপন করেছিলেন মানিকগঞ্জ মহকুমার সাভার শহর-সন্নিহিত চান্দহর গ্রামে। এমনই ললাটলিখন, সেই বসতিও নদীর গর্ভে অচিরে নিশ্চিহ্ন হয়। আমরা তাই গ্রামের বাড়ি বলতে মামাবাড়িই বুঝতাম। বিক্রমপুর পরগনার মালখাঁনগর গ্রাম; গ্রামের সুখ্যাতি-কুখ্যাতি দুটোই অন্তত সেই তিরিশ-চল্লিশের দশকে অতি প্রকট। গাঁয়ের জমিদারদের কুলীন বলে অহংকারের অবধি নেই। প্রজাপীড়নেও তাঁরা সমান তুখোড়। প্রজাদের অধিকাংশ হয় মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত নয়তো কৈবর্ত, মাহিষ্য, নয়তো মাঝি-মেঝেন গোষ্ঠীর, মুসলমানই বেশি। এঁদের উপর জমিদারি অত্যাচারের সীমা-পরিসীমা ছিল না। একটি কাহিনী আমি অন্যত্র উল্লেখ করেছি, পুনরুক্তি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। হেমন্তের শিথিল দুপুর ; জমিদারনন্দন কর্ষিত মাঠের আল ধরে উত্তর থেকে দক্ষিণে আসছেন ; একটি তরুণ মুসলমান প্রজা, হয়তো বড়ো জোর সতেরো-আঠারো বছর বয়স হবে, সেই আল বেয়েই দক্ষিণ থেকে উত্তরবর্তী। প্রথাগত ব্যাকরণের নাকি অনুজ্ঞা, জমিদারবাড়ির কেউ উল্টো দিক থেকে আলের পথে হেঁটে এগিয়ে এলে প্রজাকুলের প্রত্যেককে সঙ্গে-সঙ্গে আল থেকে নেমে যেতে হবে। সেই অবোধ প্রজাসন্তান নিয়মটা হয়তো ভালোমতো জানতো না ; জমিদারনন্দনের মুখোমুখি হয়ে সেই নির্বুদ্ধির ঢেঁকি, এত আস্পর্ধা, আল থেকে না নেমে শরীরটা একটু বেঁকিয়ে তাকে জায়গা করে দিয়েছিল। তাই নিয়ে জমিদারের মহলে ঢিঢিক্কার; তবে নিরামিষ ঢিঢিক্কার নয়। ছেলেটিকে পেয়াদা পাঠিয়ে বেঁধে নিয়ে আসা হলো তখনই। জমিদারবাড়ির প্রাঙ্গণে তার শরীরটি আছড়ে ফেলা হলো, দড়ি দিয়ে তাঁর হাত-পা বাঁধা হলো। তারপর পেরেক-ঠোকা একটি কাঠের তক্তি দিয়ে প্রহারে-প্রহারে তাকে রক্তাক্ত-জর্জরিত করা। ওই দুঃস্বপ্নস্মৃতি কোনওদিন ভুলতে পারিনি। ওই স্মৃতির অভিজ্ঞতাই আমাকে বুঝতে শিখিয়েছে, পূর্ববঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায় কেন পাকিস্তানের সমর্থনে তাঁদের সম্মতি জ্ঞাপন করেছিল। কে জানে, আমার বামপন্থী মানসিকতার উৎসও হয়তো ওই স্মৃতির অসহ্য নিপীড়নে নিহিত। (তবে একটি বিশেষ বাল্যশিক্ষার প্রভাবও কী করে অস্বীকার করি? আমার নীতিবাগীশ বাবা ভর্ৎসনার সুরে প্রায়ই বলতেন : সব সময়ে উপরের দিকে তাকাতে নেই, মাঝে-মাঝে নিচের দিকেও চোখ ফিরিও।)

লতায়-পাতায় পল্লবিত মাতুলগোষ্ঠী বসু ঠাকুরদের অথচ গুণাবলীও ছিল যথেষ্ট। প্রজাকুলের উপর অত্যাচারের পাশাপাশি তাঁরা ঋতুতে-অঋতুতে দানধ্যান করতেন। অঢেল

জমিদারি সম্পত্তি, উপার্জনের জন্য আলাদা বৃত্তি অন্বেষণের তখনও প্রয়োজন দেখা দেয়নি। তাঁদের জীবনযাত্রার কথা মনে হলেই আমার একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'এমনি করে যায় যদি দিন যাক না' আর 'চারু ও হারু' গ্রন্থের সেই উদ্ধৃতি, 'লিখিবে পড়িবে মরিবে দুখে, মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে' স্মরণে এসে যায়। জমিদারতনয়দের ঘুম ভাঙতো সকাল দশটা-সাড়ে দশটায়। চা দিয়ে মুড়ি কিংবা অন্য কোনও খাদ্যবস্তু গলায় ভিজিয়ে তাঁরা প্রাতরাশ সারতেন। অতঃপর বড়শি হাতে নদীর ধারে বা দিঘির পাড়ে চলে যেতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে প্রতীক্ষার সাধনা : মাছ ধরার সফলতার শেষে, হয়তো দুপুর গড়িয়ে যখন প্রায় বিকেল বা সন্ধ্যা হয়-হয়, বাড়ি ফিরতেন। গৃহিণী বা বাড়ির রাঁধুনি উনুনে সেই মাছের স্বাদু ঝোলের রান্না বসাতেন। স্নানান্তে খেতে বসতেন জমিদারনন্দন, ভরসন্ধ্যায় বা কনে-দেখা-আলোর মুহূর্তে। তারপর বারোয়ারিতলায় নৈশ আড্ডা, নিখাদ গ্রাম্য কলহ বা ষড়যন্ত্র। নৈশ আহার মধ্যরাত্রি পেরিয়ে। এই বংশের মানুষগুলির প্রতিভা অথচ নানা দিকে ব্যাপ্ত। জমিদারদের বাড়ির ছেলেরাই ঢাকা কিংবা ময়মনসিংহ বা কলকাতায় ফুটবল অথবা ক্রিকেট খেলেছেন। কেউ-কেউ গ্রামের স্কুলেই প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করে মেধাবী পণ্ডিত হয়েছেন। গ্রাম থেকে দুই-একজন আই সি এস বেরিয়েছেন। এই গ্রামের অন্তত দু'জন দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হয়েছেন পর্যন্ত: একজন বসন্তকুমার বসু, কলকাতার নামী অ্যাডভোকেট, গায়িকা উমা বসুর পিতামহ; সমাজসেবিকা ফুলরেণু গুহর মাতামহ। অন্যজন চন্দ্রকান্ত বসু ঠাকুর। শেষোক্ত ভদ্রলোক অস্তায়মান সূর্যের মতো প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রধান থেকে জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন, জেলা কংগ্রেসে পৌরোহিত্যের পর মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি, সব শেষে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। আমি যখন তাঁকে দেখি, আশি পেরিয়ে গেছেন, অসমর্থ শরীর, বাড়ির একটা ঘরে তাঁর চলাফেরা আবদ্ধ। অথচ মনের অস্থিরতা নির্বাপিত হবার নয়। ঘরের আসবাব সামান্যই : একটা খাট, একটা টেবিল, একটা চেয়ার, একটা নিকষ তক্তপোশ। প্রতি দশদিন অন্তর এই আসবাবগুলিই এখান থেকে ওখানে করছেন, ওখান থেকে এখানে। অতীতের হাতছানি তিনি ভুলতে পারেননি, নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে। চন্দ্রকান্ত বসু ঠাকুরের অনুজ নীলকান্ত আরও বেশি আজব মানুষ ছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করতেন, নিজের খরচে সে নাটক ছাপাতেন পল্লীর দুর্গোৎসবে পাড়ার ছেলেছোকরাদের বগলদাবা করে নাটকের তালিম দেওয়াতেন, তাঁর নজর এড়াবার জন্য উঠতি বয়সের ছেলেরা সতত সতর্ক, তবে মাঝে-মাঝেই তারা হঠাৎ ভয়াবহভাবে ধরা পড়ে যেত। নীলকান্ত যখন নাটক ফাঁদতেন না, তখন তাঁর প্রধান উপজীব্য স্বদেশী করা। চরকা কাটতেন, গ্রামে-গ্রামে গান্ধিজীর মহিমা প্রচারে যেতেন। অথচ এই গ্রাম থেকেই একজন-দু'জন অন্য আদর্শ-অবলম্বী যুবক বেরিয়েছে, তাঁরা পিস্তল-বোমায় দীক্ষিত। কেউ-কেউ, যেমন অতীন্দ্রনাথ বসু, বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্দান্ত কৃতী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও বছরের পর বছর জেলখানায় কাটিয়েছেন, সুভাষচন্দ্রের শিষ্য হিশেবে। গ্রামের আরেকজন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য মাদ্রাজের উপকূলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাবমেরিনে অস্ত্র পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েন, প্রভুরা তাঁকে গুলি করে মারেন। সেই দুঃসাহসী মালখাঁনগরীয় শহিদ, মানকুমার বসু, বিশেষ কেউ মনে রাখেনি তাঁকে। মালখাঁনগর জমিদার বংশের মেয়েদের সুখ্যাতির সঙ্গে প্রচুর অখ্যাতি-অপখ্যাতিও ছিল। উমা বসু বা হিমাংশুকুমার দত্তের সুরারোপিত গীতমালার প্রধানা গায়িকা সাবিত্রী ঘোষ

ছাড়াও আরও অনেক সংগীতপটীয়সী মহিলা এই পরিবার থেকে বেরিয়েছেন। কলকাতা বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হওয়ার ক্ষেত্রেও মালখাঁনগর গ্রামের ললনারা বিক্রমপুর পরগনায় অগ্রবর্তিনী। আর লেখককুলের কথাই যদি বলতে হয়, বুদ্ধদেব বসু যেমন এই বংশপরম্পরা বহন করেছেন, করেছেন সুনির্মল বসুও। প্রতিভা বসু বুদ্ধদেব বসুর সহধর্মিণী, কিন্তু সেই সঙ্গে এই গ্রামের ভাগিনেয়ীও। বলতে কুণ্ঠা বোধ করা হয়তো উচিত, হয়তো বা উচিত নয়, আমার স্ত্রীও মালখাঁনগরের ভাগিনেয়ী, আমি যেমন ওই গ্রামের ভাগিনেয়।

অত্যাচারী জমিদারকুল, তথাচ সংগীতে আগ্রহী, সাহিত্যে আগ্রহী, অন্তত কয়েকজনের কথা জানি বিদ্যাচর্চা আর খেলাধুলার নামে বরাবরই প্রায় উন্মাদ। জমিদারতন্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা ও বীতরাগে আমার অন্তঃকরণ কৈশোর-তারুণ্যের সেই সেতু-মুহূর্তেই সমাচ্ছন্ন। তা বলে না মানি কী করে, বাঙালি মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির যে আদল আমার চেতনাকে প্রধানত রূপ দিয়েছে, তা মামাবাড়ির পরিবেশে বছরে অন্তত দু'-তিন মাস নিমজ্জিত থাকতাম বলেই। তা ছাড়া পূর্ববঙ্গের জল-নদী-বৃক্ষ-উদ্ভিজ্জ-লতাপাতাকে যতটুকু চিনেছি তা মালখাঁনগর গ্রামের আতিথেয়তাতেই। গ্রামময় পুকুরের ছড়াছড়ি, প্রতিটি বাড়ির পিছন দিকে একটি করে পুকুর, যা বর্ষার সময় খালের সঙ্গে যোগ হয়ে যেত, এবং সেই খাল মিলে যেতো মাইল খানেক দূরবর্তী ধবলেশ্বরী নদীর সঙ্গে। গ্রামের অদূরে তালতলা বাজারে স্টিমার কিংবা লঞ্চ এসে ভিড়তো। আমরা দুড়দাড় করে জেটির উপর প্রায় আছড়ে পড়ে অবতরণ করতাম। বাচ্চার দল, বর্ষার সময় বাদ দিয়ে অন্যান্য ঋতুতে, মামাবাড়ি পর্যন্ত হেঁটেই মেরে দিতাম। মহিলারা অথবা বৃদ্ধরা পালকিতে সমাসীন হতেন, তখনও সাইকেলরিকশা চালু হয়নি। বর্ষাকালে কোনও সমস্যা নেই, স্টিমার থেকেই নৌকোয় সরাসরি উঠে যেতাম আমরা। নৌকো খালে পড়তো, একটা সময়ে পৌঁছে দিত মামাবাড়ির পুকুরঘাটে। গ্রামে কিছু-কিছু পাকা বাড়ি, সেই সঙ্গে অজস্র কাঁচা বাড়িরও মিশ্রণ : হয়তো দেওয়ালে, গঙ্গা-যমুনা গাঁথুনির উপরে করোগেটেড টিনের চালা, কিংবা টিলা বা খড়ের আচ্ছাদন। বড়ো বাড়ি, মধ্যের বাড়ি, ছোটো বাড়ি, নাজির বাড়ি, এমন ধারা শরিকদের বিভিন্ন বাড়ির পরিচয়। প্রত্যেকের আলাদা সংসার, কিন্তু এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যেতে কোনও পোশাকি আচারের আড়াল নেই। যে-কোনও শরিকের যে-কেউ অন্য এক শরিকের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে আড্ডা জমাতে পারতেন, অথবা গানে মজে যেতে।

প্রায়ই সকালে-দুপুরে-বিকেলে গুরুজনদের শাসন না মেনে এদিকে-ওদিকে বেরিয়ে পড়তাম। আসলে মামাবাড়িতে এলে শাসনের ফর্দ স্বভাবত একটু হ্রস্বায়িত হয়ে যেত। সুতরাং আমাদের স্বাধীন রাজা হতে, নিরুদ্দেশ যাত্রায় যেতে, বিশেষ কোনও বাধা থাকতো না। হারিয়ে যেতাম গ্রামের পথে, বাঁশঝাড়ের গহনে, কিংবা আম-কাঁঠালের জঙ্গলে। অথবা পাকা ধানের সুঘ্রাণে নিঃশ্বাস নিতে-নিতে গ্রীষ্মের দুপুরে স্বচ্ছ পুষ্করিণীতে নেমে ঝাঁপাঝাঁপির আনন্দে টইটম্বুর হতাম। কখনও তালতলা বাজার থেকে যে দীর্ঘ মেটেল পথ ইছাপুর-আউটশাহী পর্যন্ত প্রলম্বিত, তা দিয়ে হাঁটতাম, আরও হাঁটতাম, আরও। নদীর উপর দিয়ে প্রবল হাওয়া বয়ে যেতো, তার শোঁ শোঁ শব্দ। বড়ো-বড়ো বট-অশ্বত্থ গাছ, তারাও হাওয়ার ঝাপটা নিতো, তাদের ডাল-শাখা-পাতা মুখর হয়ে উঠতো। সেই সঙ্গে তাল, শুপারি বা নারকেল গাছের মন-মাতানো আন্দোলন।

দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আমরা অনেকেই বিচ্যুত। যে শহরে আমি বেড়ে উঠেছি, সেই ঢাকা থেকে আমি নির্বাসিত। তা হলেও সেই শহরের জন্য তেমন কোনও

আলাদা কাতরতা অনুভব করি না। শুধু মাঝে-মাঝে অভাব বোধ করি পূর্ববঙ্গের নদীসংকুল, হাওয়াতে দীর্ণ, বৃক্ষরাজিতে পর্যুদস্ত প্রকৃতির সংশ্লেষের। মনে-মনে একটি তত্ত্ব পোষণ করে এসেছি, খুলেই বলি এখানে। মানুষের কল্পনা জল-নির্ভর, হাওয়া-নির্ভর, প্রাকৃতিক সম্পদ-নির্ভর। এমন নয় যে রাঢ়ভূমিতে যাঁদের জন্ম তাঁরা সবাই-ই কল্পনায় কিঞ্চিৎ খাটো। তা সত্য হলে কাজী নজরুল ইসলাম অমন বেপরোয়া কবিতা লিখতে পারতেন না। তবু বিক্রমপুর পরগনাকে, এবং তার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যরাজিকে, স্বগত নমস্কার না জানিয়ে উপায় নেই। আমি আজ যা, তা অনেকটাই, জোর দিয়েই বলতে পারি, সেই প্রকৃতির করুণা, যদিও এবার-ফিরাও-মোরে নাটকীয়তায় প্রবেশ হাস্যকর হবে।

আমাকে তা হলেও ঢাকা শহরে একচল্লিশ-বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ সালের পরিবেশের স্মৃতিমেদুরতায় ফিরে আসতে হয়। খানিক আগে উপর-থেকে-চাপানো সাম্প্রদায়িক সংঘাতের উল্লেখ করেছি, যার পরিণামে ১৯৪১-এর একটা বড়ো সময় আমাদের কাছে নিরর্থক হয়ে যায়। তারপর বেয়াল্লিশের আন্দোলন, একটু-একটু করে রাজনীতির অন্ধিসন্ধিতে অনুপ্রবেশ, রাজনৈতিক দাদাদের সঙ্গ-সান্নিধ্যের জন্য বাসনা-প্রার্থনা। এ পাড়ায় একদল প্রবল, ভিন পাড়ায় অন্য এক দল। পাড়াগত কোঁদলই দিনকতক পরে রাজনীতির খোলস পরে উদয় হতো। অগস্ট আন্দোলন বলতে গেলে একমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়েরই আন্দোলন। গান্ধিজী সপারিষদ কারাভ্যন্তরে অদৃশ্য হলেন, বাংলাদেশের জমিদার-প্রধান কংগ্রেস নেতারা কেউ-কেউ শখের কারাবরণ করলেন; কেউ-কেউ ততটা প্রাগ্রসর নন। কয়েক সপ্তাহের জন্য আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করলো মুখ্যত বামপন্থীদের নির্দেশনায়। আন্দোলনে অহিংসার ছিটেফোঁটাও নেই, এখানে-ওখানে পুলিশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ, রেল লাইন ওপড়ানো, ডাকঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের ঢুকতে বাধা দেওয়া। ওদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্তরা স্বচ্ছন্দে ক্লাস নিতেন, ক্লাস করতেন। সেটাই ছিল স্বাভাবিক, কারণ তাঁদের আটকাতে গেলে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন খুব সম্ভব বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মোড় নিত।

ততদিনে আর্মেনিটোলা স্কুল পেরিয়ে জগন্নাথ কলেজে প্রবেশ করেছি : ইন্টারমিডিয়েট আর্টস পঠন, যা এখনকার এগারো-বারো ক্লাসের প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত। হঠাৎ গণ্ডিটি যেন মস্ত বড়ো হয়ে গেল। প্রতিদিন নতুন-নতুন চেনা-পরিচয়, এবং মেয়েদের সঙ্গে ক্লাস করার প্রথম রোমাঞ্চ। অবশ্য সব কিছু ছাপিয়ে মন্বন্তরের বিভীষিকা। বাংলাদেশে সে বছর ফসলের ঘাটতি তেমন ছিল না। কিন্তু ফসলের একটা বড়ো অংশ মহান বিদেশী সরকার অন্যত্র পাচার করে দিয়েছিলেন। তার উপর এ-জেলা থেকে ও-জেলায়, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে, খাদ্যশস্য যাতে অবাধে বাহিত হতে না পারে, সেজন্য প্রতিটি জেলায় কাতারে-কাতারে সব ধরনের নৌকো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। পরাধীন দেশ, সেই সঙ্গে প্রভুদের মনে জাপানি আতঙ্ক। জাপানিরা এসে পাছে ফসলের দখল নেয়, তাই শস্য বাজেয়াপ্ত করো, নৌকো ডুবিয়ে দাও বা বাজেয়াপ্ত করো। সরকার যে বীভৎস কুকাজ আরম্ভ করলেন, সেটা সম্পন্ন করলেন জোতদার-মহাজন সম্প্রদায়। ইতিপূর্বে মজুতদার কথাটির সঙ্গে সাধারণের পরিচয় হয়নি, এবার হলো। সর্বত্র আতঙ্ক। যাঁদের বিত্তের বা সম্পদের জোগান ছিল, বা জীবিকাগত ভিত্তি ছিল, তাঁরা কোনওক্রমে খেয়ে-পরে বাঁচলেন। অন্যদের ক্ষেত্রে খাদ্যের অনটন, পরিচ্ছদের অনটন। শহরে-গ্রামে ভয়, যে ভয়ের বাস্তব ভিত্তি ছিল। চালের দাম হু হু করে

চড়তে শুরু করলো তেতাল্লিশ সালের গোড়া থেকে, কাপড়ের দামও। ক্রমশ বাড়তে লাগলো নিরন্নের হাহাকার, গ্রাম ছাপিয়ে শহরে।

স্কুলে থাকতে ইতিহাসের বইতে ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা পড়েছিলাম। এবার সেই বিভীষিকার সঙ্গে সম্পূর্ণ মুখোমুখি। যে চাষিরা ফসল বুনেছেন, ফলিয়েছেন, সেই ফসল ঘরে তুলেছেন, তাতে তাঁদের ন্যূনতম অধিকার নেই। সে ফসল কোথায় হাওয়া হলো, তা তাঁরা কেবল অনুমানই করতে পারেন। বিদেশী শাসকের ভূমিকা তাঁদের কাছে তেমন স্পষ্ট নয়। কিন্তু জোতদার-মজুতদারদের উদগ্র লোভের শিকার যে তাঁরা হচ্ছিলেন, তা তো তাঁদের প্রত্যক্ষ সজ্ঞান অভিজ্ঞতা। গ্রামে খাবার নেই; খাদ্য না পেয়ে একটা সময়ের পর অসহায় অবোধ মানুষগুলি শহরের দিকে ধাওয়া করলেন, নিজেদের জমিজমা-ভিটেভূমি ছেড়ে, গৃহস্থঘরের যতটুকু সামান্য উপকরণাদি ছিল তা-ও *ঠেলে* ফেলে, স্রেফ বেঁচে থাকবার, টিকে থাকবার প্রচণ্ড বাসনায়।

ঢাকা শহরে ইতিমধ্যেই সৈন্যদের আনাগোনা শুরু হয়েছে, শহরের একটা-দুটো অঞ্চলে তারা ডেরা বেঁধেছে। কোথাও-কোথাও সরকার থেকে তাদের জন্য আদেশবলে ঘরবাড়ি দখলও করা হয়েছে। এরকম দখল অবশ্য ঘটেছে অন্য অজুহাতেও। বোমার আক্রমণ থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাবার জন্য ভূগর্ভে আশ্রয়স্থল খোলা হয়েছে ইতস্তত। সিঙ্গাপুর-মালয়-ব্রহ্মদেশ ততদিনে জাপানিদের করায়ত্ত হয়ে গেছে।

ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকরা স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিম বাংলার সমস্যার প্রধানত যে ধরনের বিশ্লেষণ করেছেন, যা পরে পড়েছি, তা একটি বিরাট অপূর্ণতার শিকার। পঞ্জাবের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে, ওরা কেমন নিজেদের উদ্যোগে ঝটপট দেশভাগের সমস্যা পেরিয়ে সুখী-সমৃদ্ধ জীবনে উঠে আসতে পেরেছে, বাঙালিরা পারেনি কারণ তারা উদ্যমহীন, পরের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপাতে তাদের জুড়ি নেই। এই স্বভাবনিন্দুকরা সময়ের পটভূমিকাটুকু ভুলে থাকতে চান। দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধজনিত সামাজিক-আর্থিক চাপ বাঙালি অস্তিত্বকে, সেই সঙ্গে অস্তিত্বচেতনাকেও, নড়বড়ে করে দিয়েছিল, যে-সংকট পঞ্জাবকে ছুঁতে পারেনি। উদ্বাস্তুদের জন্য পঞ্জাবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে-পরিমাণ সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তার সিকি পরিমাণও বাঙালি শরণার্থীদের ভাগ্যে জোটেনি। মহাযুদ্ধ থেকে পঞ্জাবের আখেরে লাভই হয়েছে: ফৌজে-যোগ-দেওয়া পঞ্জাবকুল তাঁদের বিত্তের সম্ভার বাড়াতে পেরেছিলেন, বাঙালিরা যা আদৌ পারেননি।

চার

তেতাল্লিশ সালে মান্দালয়ের অরণ্য ডিঙিয়ে আরাকান পেরিয়ে সুভাষচন্দ্র বসুর জাতীয় ফৌজ মণিপুর সীমান্তে; গোপন বেতারে সুভাষচন্দ্রের উদাত্ত আহ্বান, কুর্বানির বদলে আজাদি। এই লগ্নে লক্ষ-লক্ষ অভুক্ত মানুষ, নারী-পুরুষ-শিশু, শহরে ঢুকছে, প্রতি পাড়ায় রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, সরকার উদাসীন। তখন আর ভাত ভিক্ষা করে পাওয়ার সম্ভাবনা পরপারে; মানুষগুলি খুদ ভিক্ষা করছে, ফ্যান ভিক্ষা করছে। কোনও-কোনও গৃহস্থদুয়ারে হয়তো বা পাচ্ছে, কিন্তু অধিকাংশ উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্তরা নিজেদের সংসার-পরিজনের সংস্থান নিয়ে ব্যস্ত। ওইরকম সময়ে যাদের সামর্থ্য আছে তারাও, স্পষ্ট বোঝা গেল, নির্দয়তার উপাসক। এখানে-ওখানে ক্বচিৎ একটি-দু'টি সরকারি লঙ্গরখানা, একটি-দু'টি বেসরকারি লঙ্গরখানা, কিন্তু যে-মানুষগুলি খিদেয় ধুঁকছে, তারা, একের পর এক, ক্রমশ রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ছে। দয়ালু কেউ-কেউ তাদের জিজ্ঞেস করছে, কী রে হাসপাতালে যাবি? সাড়া দেবার মতো শারীরিক শক্তি অধিকাংশেরই নেই। যাদের আছে, তারা কোনওক্রমে ঘাড় নেড়ে অস্ফুট উচ্চারণ করছে, না, একটু ফ্যান দাও বাবা।

এই মরা, প্রায়-মরা মানুষগুলিকে ডিঙিয়ে কলেজে যাই। এত ভয়ংকর দুর্বিপাক, মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তের দৈনন্দিন দিনাতিপাতের কর্মসূচি তেমন ব্যাহত হয় না। অথচ অকুণ্ঠ স্বরে বলতে হয়, কমিউনিস্ট পার্টি ও সেই দলের কর্মীদের দিনের পর দিন ধরে ত্রাণের কাজে লেগে থাকার কথা। কমিউনিস্ট পার্টি সেই মুহূর্তে খুবই একটা ভালো অবস্থানে নেই। জনযুদ্ধ নীতির ফলে সাধারণ মানুষের মনে দল সম্পর্কে দ্বিধা ছাপিয়ে সন্দেহ, সন্দেহ ছাপিয়ে বিতৃষ্ণা, ক্রোধ। মাত্র এক বছর আগে ঢাকা শহরের পূর্ব প্রান্তে তরুণ কমিউনিস্ট কর্মী, প্রতিভায় ভরপুর তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ সমাজবিরোধীদের হাতে নিহত হয়েছেন। সারা দেশ জুড়ে, শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে, তা নিয়ে গভীর বিক্ষোভ ও চিৎকৃত ধিক্কার। কিন্তু, মানতেই হয়, ঢাকা শহরে বিশেষ শোরগোল নেই। এমনও বলতে শোনা গেল, হাজার হলেও ছেলেটা বিপথগামী ছিল, কমিউনিস্ট দলে নাম লিখিয়েছিল। এই মানসিকতার মানুষগুলিরও বিতৃষ্ণাবোধ আস্তে-আস্তে উবে যেতে শুরু করলো কমিউনিস্ট কর্মীদের ত্রাণের কর্তব্যে অভাবনীয় অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠতা দেখে। কয়েক বছর আগে বন্দীমুক্তি আন্দোলনে অবশ্য কংগ্রেস, এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন শাখার বামপন্থী গোষ্ঠী, সম্মিলিত প্রয়াস চালিয়েছিল। একটু-একটু করে বেশ কিছু রাজবন্দী ১৯৩৯ সাল থেকে শুরু করে পরের কয়েক বছর জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন। তাঁদের একটি বড়ো অংশ কারাভ্যন্তরে মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়েছেন, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আনুগত্যের শপথে তাঁরা অবিচল। জনযুদ্ধ নীতি ঘোষণার খানিক বাদে কমিউনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত। একদা ঘোর স্বদেশী, বোমা পিস্তল নিয়ে শাসকদের উপর চড়াও হয়েছিলেন যে যুবককুল, তাঁদের মধ্যে অনেকেই কমিউনিস্ট বনে যাওয়ায় এক ধরনের কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন মনোভাব

বাঙালি মধ্যবিত্তর উপর চেপে বসলো। বেয়াল্লিশ সালে কিংবা তারও আগে যাঁরা জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ অগস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাকক্ষে প্রত্যাবর্তন করলেন; যাঁরা কমিউনিস্ট হয়েছিলেন, তাঁরা করলেন না।

এই দোলাচলের মধ্যে মধ্যবিত্ত মানুষ দুর্ভিক্ষের করাল বিভীষিকায় অভিজ্ঞ হলেন, যা তাঁদের স্বার্থপর হতে শেখালো। সেই সঙ্গে তাঁদের মনে সুভাষচন্দ্রের আবেগে-উত্তাল-করা আহ্বানের ঘোর ও কমিউনিস্ট দল ও কর্মীদের সম্পর্কে বিতৃষ্ণার পাহাড় একটু-একটু করে উঁচু হয়ে উঠছিল। অথচ ঠিক সেই মুহূর্তে নতুন অভিজ্ঞান, মধ্যবিত্ত স্বার্থপরতাকে দুয়ো দিয়ে কমিউনিস্ট কর্মীরা দুর্গতদের-বুভুক্ষুদের-মরণাপন্নদের সাহায্যে নেমে পড়েছেন। তাঁদের উদ্যমের তুলনা নেই, তিতিক্ষার তুলনা নেই, আত্মত্যাগের তুলনা নেই। নানা সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান ত্রাণকার্যে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের দিকে কমিউনিস্ট কর্মীরা সহযোগিতার হাত বাড়ালেন, তাঁরাও বাড়ালেন। গোটা বাংলায় তিরিশ-চল্লিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঠেকানো গেল না। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি ঈষৎ অনুকম্পায়ী হতে শিখলেন। মজুতদারদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তাঁরা নিজেরা পড়েননি, সেই লজ্জা তাঁদের। তবে তাঁদের পক্ষে যুক্তি ছিল, দুর্ভিক্ষের প্রধান হোতা বিদেশী শাসকবৃন্দ, যাঁদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা সরব হতে সেই প্রলয়ংকর মুহূর্তে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সে সময় দুঃসহ টানাপোড়েন : সোভিয়েট দেশকে না বাঁচালে ভবিষ্যতের সোনালি সমাজস্বপ্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ; সেই স্বপ্নকে বাঁচাতে হলে মিত্রপক্ষকে সমর্থন না করে উপায় নেই এই মহাযুদ্ধে। কিন্তু সাধারণ মানুষকে এই তত্ত্ব বোঝাতে কালঘাম ছুটে যায়।

গ্রামে-গঞ্জে শহরে-বন্দরে সামাজিক দ্বন্দ্ব, যার মুক্তিস্নানে অবগাহন করে কমিউনিস্ট পার্টি, অন্তত বাংলার মাটিতে, গভীর শিকড় গাঁথলো। এই কাহিনীর মলিন দিক আছে, পাশাপাশি গৌরবের দিকও। পার্টির সাহস ও আদর্শনিষ্ঠায় প্রেরণা লাভ করে ক্রমশ বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে দলে দলে কিশোর-যুবক-তরুণ শ্রমিক-কৃষকের সমস্যা নিয়ে আলাদা করে চিন্তা করতে শিখলেন; শিখলেন কর্মী-কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-অভিনেতা-করণিক-সহ সামগ্রিক সম্প্রদায়। ঊনবিংশ শতকের বাঙালি উজ্জীবন নিয়ে অনেক চর্চা ও গবেষণা হয়েছে, কিন্তু ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ ইত্যাদির নায়কত্বে যে-সাংস্কৃতিক বিপ্লব চল্লিশের দশক থেকে শুরু করে তার পরের অন্তত তিরিশ বছর বাঙালি জীবনকে রাঙিয়ে দিয়েছিল, তা নিয়ে তেমন তন্নিষ্ঠ আলোচনা এখনও হয়নি। 'নবান্ন' নাটক সম্বন্ধে বহু কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু ওই নাটক তো সবে সূচনা : নাটক ছাড়িয়ে লোকনৃত্য, লোকনৃত্য ছাড়িয়ে লোকগাথা, যাত্রা, মৃৎশিল্প, সাহিত্য, কাব্য, সংগীত, চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্য, এমন কি সুনীল জানার মতো শিল্পীর ক্যামেরা নিয়ে সাধনা, তাপস সেনের আলো নিয়ে, খালেদ চৌধুরী মঞ্চসজ্জা নিয়ে। সবাই মানুন না-মানুন, এই মস্ত সাংস্কৃতিক উতরোলের উৎস দুর্ভিক্ষ-উত্তর সেই সমাজজিজ্ঞাসা থেকে।

কলিকালও অতিক্রান্ত হয়। একটা সময়ে বুভুক্ষু শিশুনারীপুরুষের ভিড় থিতিয়ে এলো, গ্রাম থেকে কেউ আর নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে না, যারা নিষ্ক্রান্ত হলো তাদের সংখ্যা নিঃশেষ, শহরের রাস্তায় কঙ্কালের জঞ্জাল অবসিত। জনমতের চাপে পড়ে সরকার খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিশপত্র সরবরাহের জন্য রাষ্ট্রীয় সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। নতুন বছরের ফসল গোলায় উঠলো। যে-তিরিশ লক্ষ মানুষ হারিয়ে গেল তাঁদের স্মৃতি ধূসর থেকে

ধূসরতর, এই স্মৃতিধূসরতা ছাড়া বেঁচে-থাকা বাঙালিদের আত্মসমর্থনের হয়তো অন্য কোনও উপায় ছিল না। ১৯৪৪ সাল, খাদ্যের সমস্যা ছাড়া বস্ত্রেরও তখন প্রচুর অনটন। কিছু-কিছু মধ্যবিত্ত বাঙালি চোরাবাজারে টাকা কামাতে রপ্ত হলেন, প্রবোধকুমার সান্যালের মতো অনেকেই বাঙালি মধ্যবিত্তের বিবেকস্খলন নিয়ে গল্প-উপন্যাস রচনা করলেন। আমাকে সবচেয়ে বেশি ধাক্কা দিয়েছিল যে-গল্প তা কিন্তু কোনও প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের রচনা নয়। সেই গল্প, '১৯৪৪ সাল', লিখেছিলেন সোমনাথ লাহিড়ী। ঐ পর্যায়ে অনেকে বিবেক-মোচড়ানো কবিতাও লিখেছিলেন, বিষ্ণু দে-অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়-বিমলচন্দ্র ঘোষ-সুকান্ত ভট্টাচার্যের নামোল্লেখ না করাও অনুচিত হবে।

কৈশোর থেকে সদ্য তারুণ্যে পৌঁছেছি। দুর্ভিক্ষ পেরিয়ে এলাম, গতানুগতিকতার মধ্যে সেঁধিয়ে গেলাম। ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের দ্বিতীয় বছর, দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা ঠিক ভুলে ওঠা যায় না। তবে তাতে কী, আমাদের যৌবন তার দাবি থেকে তো সরে আসবে না। সুতরাং একটু-একটু পড়াশুনো, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সামান্য অনুপ্রবেশ, উঁচু ধাপের গণিতে দখলদারির চেষ্টা, কিছু-কিছু বাংলা-ইংরেজি সাহিত্য পাঠ। কলেজে চমৎকার শেক্সপিয়র পড়াতেন অধ্যাপক প্রফুল্লনাথ রায়। পক্ক কেশ, চোখে পুরু কাঁচ, তাঁর শাণিত ইংরেজি উচ্চারণ আমাদের ষষ্ঠাদশ শতকের মধ্যযুগীয় ইংল্যান্ডে পৌঁছে নিয়ে যেত। যে-ক'জন অধ্যাপক বাংলা সাহিত্য পড়াতেন, তাঁদের অন্তত একজনের কথা এখনও মনে আছে ; কৌতুকের রসদ আছে সেই কাহিনীতে। কাব্যালোচনায় অধ্যাপক মশাইয়ের 'সমান্তরাল অনুচ্ছেদ' উল্লেখ করার ঝোঁক। সন্ন্যাসী উপগুপ্তের মধ্যরাতে মথুরাপ্রান্তে পীড়াপন্না নাগরিকাকে পরিচর্যা করবার প্রসঙ্গে তিনি হঠাৎ 'পতিতা' কবিতা থেকে প্রচুর ভাব দিয়ে আবৃত্তি করলেন : 'মথুরাতে কত মুগ্ধ হৃদয় স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি'। দুর্বিনীত আমি, চট করে উঠে নম্র প্রতিবাদ জানালাম, স্যার, ওটা 'মথুরাতে' নয়, 'মধুরাতে'। ওই অপ-উক্তির জন্য ক্লাস থেকে সেদিন বহিষ্কৃত হয়েছিলাম।

আরও একটি গল্প বলবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। জ্বর গায়ে আই.এ. পরীক্ষা দিতে বসেছি। 'সিক রুম', কলেজেই একটি আলাদা ঘরে আমি একা। রসায়ন বিভাগের এক কড়া অধ্যাপক পাহারা দিচ্ছিলেন: আমার পিতৃবন্ধু, অসহযোগ আন্দোলনের সময় পাদুকা ব্যবহার বিসর্জন দিয়েছিলেন, কেউ কেউ তাই জনান্তিকে তাঁকে 'গান্ধি' বলে উল্লেখ করতো। কলেজের অধ্যক্ষ অতি অমায়িক ভালো মানুষ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার তুখোড় ছাত্র, কিন্তু বাঘা যতীনের মন্ত্র শিষ্য নাম শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ। অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় লুকিয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। আমেরিকায় গিয়ে ঘরসংসার পাতেন ; পঁচিশ বছর বাদে দেশে প্রত্যাবর্তন। দেশে ফেরার কয়েক বছর বাদে আমাদের কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে আসেন। মোটা থলথলে শরীর, শ্বেতশুভ্র ধুতিপাঞ্জাবি পরিহিত, ফিনফিনে শৌখিন চাদর গায়ে জড়ানো। আমাদের সদাসখাসহচরশুভানুধ্যায়ী। গণিতে স্ট্যাটিক্স-ডিনামিক্সের পরীক্ষা, আমার শরীরে জ্বর, তেমন মনঃসংযোগ হচ্ছে না। বেশ কয়েকটি অঙ্কের সমাধানে পৌঁছুতে পারছি না, এমন সময় ত্রস্ত অধ্যক্ষ মহোদয়ের প্রবেশ, পাহারাদেনেওয়ালা গান্ধিবাদী অধ্যাপককে তিনি ফিসফিস করে বললেন, 'ওকে বলে-টলে দিচ্ছেন তো?' ওকে মানে আমাকে। অধ্যক্ষ বদান্য হলে কী হবে, সেই অধ্যাপক একে নীতিনিষ্ঠ, তায় কড়া ধাঁচের মানুষ, আমার কোনোই সুরাহা হলো না, শুধু, এখনও মনে আছে, যখন শেষ ঘণ্টা বাজলো, পরীক্ষার খাতা তাঁকে সমর্পণ করতে গেলাম, চোখ পাকিয়ে

বললেন, 'তুই একটা গাধা'। আমার গাধাত্ব সম্পর্কে আমার নিজেরও কোনও সংশয় ছিল না, কারণ সেই ঋতুতে আমি, আকণ্ঠ, কবিতায় এবং বন্ধুদের প্রতি অনুরাগে মজেছিলাম। পরীক্ষার ফল তবু যে গুরুজনদের ও মাস্টারমশাইদের খুশি করতে পেরেছিল, তা নেহাতই কাকতালীয়।

জগন্নাথ কলেজের লাইব্রেরিটি প্রাচীন, কিন্তু তখনও চমৎকার গুছিয়ে রাখা। গ্রন্থাগারিক ভদ্রলোক, যামিনীরঞ্জন ধর, আমার ডাঁই-করা বই নেওয়া দেখে প্রথম দিকে একটু সন্দিগ্ধ ছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন, আমি পড়া-পড়া খেলা করছি : বই নিচ্ছি, পরের দিনই ফেরত আনছি, নতুন বই নিচ্ছি, আবার ঝটপট ফেরত দিচ্ছি। কয়েক সপ্তাহ বাদে বুঝলেন, বইয়ের প্রতি আমার আগ্রহ নিছক লোক-দেখানো নয়। নিজেই তিনি তখন কী বই পড়লে উপকৃত হবো, সেই উপদেশ দিতে শুরু করলেন। এক সঙ্গে আটটি বই বাড়ি নিয়ে যেতে দিতেন, আমার উৎসাহের শেষ নেই। ইন্টারমিডিয়েট পড়বার ওই দু'বছর সাহিত্যকাব্যইতিহাসদর্শন-সংক্রান্ত যত বই পড়েছি, তা বোধহয় পরবর্তী কোনও পর্যায়েই ছুঁতে পারিনি। এমন নয় যে প্রতিটি গ্রন্থই আমি সমান বুঝতে পারতাম, অথবা তা থেকে সমান আনন্দ পেতাম। কিন্তু এটুকু অন্তত হৃদয়ঙ্গম হয়েছিল, জ্ঞানের ঈশান-নৈঋতসদৃশ অনেকগুলি দিক আছে, সেগুলি প্রব্রজ্যায় অন্তত একবার করে না বের হতে পারলে মানব অস্তিত্ব ব্যর্থ। কী পড়তাম তখন? এক কাঁড়ি অল্ডাস হাক্সলি, ডি এইচ লরেন্স, বার্নাড শ, ইবসেন, হামসুন, বালজাক, শেকভ, দস্তয়ভস্কি, মেটারলিঙ্ক, এমনকি বাল্টিক ঔপন্যাসিক সিলানপা পর্যন্ত। কবিতায় প্রধান ঝোঁক অবশ্য 'আধুনিক বাংলা কবিতা'-পরবর্তী যত কিছু লেখা হচ্ছিল তাদের প্রতি। ইংরেজি ভাষার কবিদের মধ্যে পাউন্ড-এলিয়ট-স্পেন্ডার-কামিংস-অডেন তো আছেনই। ফরাশি কিংবা ইতালিয়ান কাব্য তেমন বেশি নয়, এমনকি অনুবাদেও নয়। মন কেড়ে নিয়েছিল প্রধানত শেক্সপিয়রের নাটক এবং সনেটগুচ্ছ, কিছু পরিমাণে কীটস-শেলী-ব্রাউনিং, তবে সবচেয়ে আকর্ষণ করতো তথাকথিত মেটাফিজিক্যাল কবিকুল, ডান ও হেরিক তাঁদের মধ্যে প্রধান। ইতিহাস, জীবনী ও আত্মজীবনী, ভারতবর্ষের-ইংল্যান্ডের-ইওরোপের-সোভিয়েট দেশের ইতিবৃত্ত, সেই সঙ্গে আমেরিকারও। জীবনী ও আত্মজীবনীতে আমার রুচির তেমন ছুঁতমার্গ ছিল না, দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক নেতাদের জীবনী যেমন পড়তাম, তেমনই ক্রিকেট বীরদের, কিংবা চিত্রজগতের নায়ক-নায়িকাদের পর্যন্ত, নয়তো বার্বেজ অথবা বিয়ারবম ট্রী-র মতো মস্ত অভিনেতাদের।

জগাখিচুড়ি সময়, জগাখিচুড়ি সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ, পড়াশুনোও তথৈবচ। তবে যে-শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, যে-সমাজব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ ছিলাম, তাতে এমন মিশ্রণ সম্ভবত অপ্রতিরোধ্য। সেই সব বই পড়ার কোনও স্মৃতি এখন আর বহন করি না, তবু কী করে অস্বীকার করি আমার মানসিক গঠন ক্রমে-ক্রমে যে-পরিণতিতে পৌঁছেছে, তার পলিমাটি সেই দুর্ভিক্ষ-সদ্যোত্তীর্ণ পরিবেশ থেকে গৃহীত, সেই এলোপাথাড়ি পড়াশুনো থেকে আহৃত।

তাই কী সব? আমার মনে অন্তত কোনও দ্বিধা নেই, ভালো হোক মন্দ হোক, কুৎসিত হোক সুন্দর হোক, মোলায়েম হোক কর্কশ হোক, যে মানসিকতায় আমি কুড়ি বছর বয়সের পর থেকে উত্তীর্ণ, তার প্রধান রস সিঞ্চিত হয়েছে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিরবচ্ছিন্ন সান্নিধ্য থেকে। প্রধান সেই বন্ধুদের কথা একটু বলি। স্কুলে বরাবর আমার সঙ্গে যে পড়েছে, যার সঙ্গে সেই

বছরগুলিতে আমার সবচেয়ে বেশি সখ্য ছিল, যে আমাদের বক্সীবাজারস্থ 'অমিতশ্রী' বাড়ির বাইরে কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে সাইকেল চেপে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিত, তার নাম জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর সে চলে যায় প্রেসিডেন্সি কলেজে, কলেজ স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে অবস্থিত ওভারটুন হলের ওয়াই.এম.সি.এ আবাসনে সে থাকতো। সপ্তাহে দু' দিন-তিন দিন তার চিঠি আসতো কলকাতা থেকে, আমার চিঠি যেত ঢাকা থেকে। কৃষ্ণচূড়ার প্রচ্ছায়ায় আড্ডা দেওয়ার বিকল্প যেন এই চিঠির আদানপ্রদান। ওভারটুন হলে তার ঘরসঙ্গী কাস্টমসে কর্মরত এক যুবক, সুরঞ্জন সরকার। জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি লেখার উৎসাহ দেখে, কিংবা কবিতা-সাহিত্যপ্রসঙ্গ-ঠাসা আমার চিঠির বিভঙ্গের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, সুরঞ্জন সরকারও আমাকে চিঠি লিখতে শুরু। তবে নিজেকে খানিকটা আড়ালে রাখার জন্যই বোধহয় চিঠিতে প্রথম দিকে, তার স্বাক্ষর থাকতো সুপ্রিয় সোম। শৌখিন চিঠির কাগজ নাগালের বাইরে, আমি চিঠি লিখতাম শাদা ফুলস্ক্যাপ কাগজে, ছ' পৃষ্ঠা থেকে বারো-চোদ্দো পৃষ্ঠা জুড়ে। জ্যোতিষের চিঠি স্বল্পায়ত কিন্তু সুপ্রিয় সোম-নামী ছদ্মবেশীর আমার সঙ্গে দৈর্ঘ্যের প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিয়ে যাওয়া। সে-সব চিঠিতে কবিতার উদ্ধৃতি, সদ্য-পাঠ-করা-উপন্যাস বা জীবনীগ্রন্থের উল্লেখ, রাজনীতির কথা, সিনেমা-নাটকের প্রসঙ্গও, পরচর্চা। তবে সব ছাপিয়ে কবিতারই উল্লেখের পর উল্লেখ। যেমন কবিতায় মজেছিলাম, পরস্পরেও সম্ভবত সমান মজেছিলাম, কাব্যসম্ভোগের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক অনুরাগে। জীবনানন্দ দাশ-বিষ্ণু-দে-সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-বুদ্ধদেব-অজিত দত্ত-অমিয় চক্রবর্তীদের কাব্যপ্রসঙ্গ, কার কোন কবিতা আমার বা সুরঞ্জন সরকার দ্বারা সদ্য পঠিত, তার আবেগাপ্লুত বিবরণ। সেখানেই আমাদের উৎসাহ রুদ্ধগতি হতো না। নিজেদের কবিতাচর্চার কাহিনীও চিঠিতে-চিঠিতে বিনিময়-প্রতিবিনিময় হতো। পরম সৌভাগ্য, সে-সব কবিতা নিরাপদে হারিয়ে গেছে। সে বয়সে যা স্বাভাবিক, কোনও কবিতাই ঠিক নারীপ্রসঙ্গবিবর্জিত ছিল না। একটি-দু'টি চরণ এখনও মাঝে-মধ্যে স্মৃতিকে আলগোছে চিমটি কাটে। যেমন, সুরঞ্জনের কোনও চিঠিতে হঠাৎ মশ্লো : 'হাওড়া স্টেশনের মতো মেয়েদের দূর থেকে সুন্দর দেখায়।/ তারপর কাছে গেলে নানাবিধ আঁকিবুকি দাগ।/যে মেয়ের প্রোফিল ভালো তার দাঁত ভালো নয়,/বুদ্ধির উজ্জ্বল আলো নিভে গেলে বোকা বিস্ময়'। ওরই কাছাকাছি সময়েই কি আমি একটি চৌপদী লিখে পাঠিয়েছিলাম : 'উত্তর হতে কন্‌কনে হাওয়া বয়,/শীতের শিশির আনে কোন অনুনয়?/ ট্রামে-বাসে কিছু বুনন-নিরতা মেয়ে,/ কাঁহাতক শীত এড়ানো সেদিকে চেয়ে?'

ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছি। ওটাও কিঞ্চিৎ আকস্মিকতা। গুরুজনরা চাইছিলেন আমি অর্থবিজ্ঞানের ছাত্র হই। কিন্তু আই.এ পরীক্ষায় ইংরেজিতে অবিশ্বাস্য ভালো করায়, এবং নিজের প্রগাঢ় কাব্যপ্রীতির জন্য, আমার ছিল ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি। যেদিন ভর্তি হতে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম, ইংরেজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় মশাই একটু দেরি করে এলেন; অশান্ত আমি, অধৈর্য আমি, অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর হীরেন্দ্রলাল দে-র ঘরে ঢুকে গেলাম। তারপর থেকে এই প্রায় ষাট বছর সেই জোয়াল বইছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ-মার্বেলে মোড়া অন্তহীন-প্রতীয়মান-হওয়া সুদীর্ঘ করিডোর, এ-মাথা থেকে ও-মাথা এক ঘণ্টায়ও যেন অতিক্রম করা যায় না, তার বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা, সেই গোলকধাঁধায় প্রথম-প্রথম হারিয়ে যাওয়ার ভয়। এই আশ্চর্য অট্টালিকা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে পূর্ববঙ্গ ও অসম প্রদেশের

প্রশাসনিক পীঠস্থান হিশেবে ইংরেজ প্রভুরা তৈরি করিয়েছিলেন। কিন্তু দিল্লির দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ, ওই মস্ত দালানে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহল খোলা হলো। রমনা জুড়ে বকুল-রাধাচূড়া-বট-অশ্বত্থদলের বিস্তীর্ণ প্রান্তর ও ঘন বনরাজি জুড়ে ইতস্তত-ছড়ানো যে দালানকোঠা, যা উঁচু আমলাদের জন্য প্রায় একই সময়ে তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দের আবাস হিশেবে ঘোষিত। বলা হতো কেমব্রিজ-অক্সফোর্ডের কায়দায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো, ওখানকার বিভিন্ন কলেজের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনটি আবাসিক হল, ঢাকা, জগন্নাথ আর সলিমুল্লা মুসলিম হল। প্রায় কুড়ি বছর বাদে যখন মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, আর একটি হল সংযোজিত হলো, ফজলুল হক মুসলিম হল। তা ছাড়া প্রতিটি হলে অনাবাসিক, ঢাকা শহরে বাস-করা-ছাত্রদের ভর্তির ব্যবস্থা। মেয়েদের জন্যও একটি আলাদা হস্টেল, যাকে বিলিতি কায়দায় বলা হতো 'চামারি'। আনুমানিক কুড়ি জন ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা ছিল সেখানে, যদিও তার দ্বিগুণ-তিনগুণ মেয়ে শহর থেকে পড়তে আসতো। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হলাম, চার হল মিলিয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা অন্তত দুই হাজার, যার মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা দুশো। অনাবাসিকদের মতো, প্রত্যেকটি ছাত্রীকেও কোনও একটি হলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হতো।

বিশের দশকে সারা দেশ থেকে ছেঁকে অধ্যাপক ও অন্যান্য শিক্ষকদের আমন্ত্রণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল, অনেকে এসেছিলেন খোদ বিলেত থেকে। প্রথম পর্বের বেশ কয়েকজন উপাচার্য তো খাঁটি সাহেব, অক্সফোর্ড বা কেম্‌ব্রিজের প্রখ্যাত ডন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য প্রদেশের গভর্নর। বিশ-তিরিশ-চল্লিশের দশক জুড়ে বাইরেটা টলমল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতি-পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রধানত আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়, রমনার মায়াবী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে ছড়ানো-ছিটনো, সময়ের গতি ঢিমেতাল। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অধ্যাপকদের নিবিড় সম্পর্ক। প্রথম বর্ষ থেকেই টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা, যা ছাত্র-অধ্যাপকদের পারস্পরিক বন্ধন আরও দৃঢ় করে আনে। প্রতিটি হলে আলাদা বিনোদন-কক্ষ, যেখানে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় বিতর্ক কিংবা বক্তৃতা, সাহিত্যসভা কিংবা সংগীতের আসর বসে। প্রতিটি হলে বার্ষিক নাট্য-উৎসব ছাড়াও বিভিন্ন ঋতুতে আনন্দসন্ধ্যার আয়োজন, ঢাকা-জগন্নাথ হলে একটু বেশি, সলিমুল্লা হলে একটু কম। প্রতিটি হলেই ছাত্র ইউনিয়নের সুঠাম ব্যবস্থা, যার জন্য বার্ষিক নির্বাচন, দুরন্ত পার্লামেন্টারি কায়দায়। প্রতি হলে একজন করে প্রভোস্ট এবং অন্তত দু'জন করে হাউজ টিউটর, যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী থেকেই মনোনীত। প্রভোস্টের তত্ত্বাবধানেই প্রতিটি হল-ইউনিয়নের পরিকাঠামো। হলের সঙ্গে যুক্ত ছাত্রছাত্রীরা আট-দশ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করতেন, তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান প্রতিনিধি, যাঁকে অন্য দুই হলে বলা হতো সহ-সভাপতি, সভাপতি অবশ্যই প্রভোস্ট। তবে ঢাকা হলের ক্ষেত্রে প্রধান ছাত্র প্রতিনিধি প্রধান মন্ত্রী রূপে আখ্যাত হতেন। তা ছাড়া ছিলেন সাহিত্য সম্পাদক, যিনি হল-ম্যাগাজিনেরও সম্পাদক, ক্রীড়া-সমাজসেবা-সংস্কৃতি-নাট্য সম্পাদক ইত্যাদি। ঢাকা হলের প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে পরবর্তী যুগে যাঁরা দেশবিখ্যাত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন কেন্দ্রের প্রাক্তন আইন মন্ত্রী অশোক সেন, প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নের অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত, এমন আরও অনেকে। তিন হলের ছাত্রছাত্রীদের যৌথ ভোটে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠিত হতো, তারও আলাদা কার্যক্রম। ছাত্রীদেরও আলাদা নিজেদের ইউনিয়ন ছিল।

বহু বছর ঢাকা হলের প্রভোস্ট বা আচার্য হিশেবে সমাসীন ছিলেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ; তিনি ১৯৪০ সালে বাঙ্গালোরে চলে গেলে আচার্য নিযুক্ত হলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু: তাঁর নিজের গভীর অনিচ্ছা, কিন্তু ছাত্রদের বিশেষ আগ্রহ, প্রভোস্ট হতে সম্মত হতে হলো তাঁকে। ছাত্রদের কোনও গুরুজনের কাছ থেকে কী ধরনের প্রশ্রয় পাওয়ার ব্যাকুলতা, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাদের কেন এমন নিশ্চিন্ত প্রত্যাশা, তার একটি দৃষ্টান্তমণ্ডিত কারণ উল্লেখ করি। তিনি ঢাকা হলের প্রভোস্ট, হলের ছেলেরা কী তুচ্ছ ব্যাপারে অন্য কোন হলের ছেলেদের সঙ্গে মারামারিতে প্রবৃত্ত হয়েছে, ঘুষোঘুষি, হকি স্টিকের আস্ফালন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, তাঁর সহকারীরা, শিক্ষকবৃন্দ ও দুই হলের প্রভোস্ট ছুটে এসেছেন, ঢাকা হলের ছেলেরা একটু থমকে গিয়ে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। এমন সময় দেখা গেল প্রভোস্ট সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বিস্রস্ত কাঁচা-পাকা চুল, পুরু কাচের চশমার আড়ালে চোখের তীব্র দৃষ্টি, জোর পায়ে ছেলেদের দিকে আসছেন। সবাই সন্ত্রস্ত, কী জানি কী প্রচণ্ড বকুনি দেবেন এবার। কাছে এসে হঠাৎ বাঁ হাত বাড়িয়ে তিনি কোমল গলায় বললেন, 'একটা সিগারেট দিবি?'

প্রথম পর্বে জগন্নাথ হলে প্রভোস্ট ছিলেন সাহিত্যিক ও আইনবিশারদ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত; তিনি ঢাকা থেকে চলে এলে দীর্ঘ দিন ধরে রমেশচন্দ্র মজুমদার ওই পদে সমাসীন ছিলেন। উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে তিনি উপাচার্য পদে বৃত হওয়ায় দর্শনের অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য মহাশয় এবার জগন্নাথ হলের প্রভোস্টের পদে। সলিমুল্লা হলে প্রায় দুই দশক ধরে প্রভোস্ট অধ্যাপক মুহম্মদ হাসান। তিনি রমেশচন্দ্র মজুমদারের পর উপাচার্য পদে বৃত হলে তাঁর পরিত্যক্ত আসন গ্রহণ করেন মাহমুদ হুসেন, ইতিহাসের অধ্যাপক, ষাটের দশকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি ডক্টর জাকির হুসেনের অনুজ। মাহমুদ হুসেন সাহেবের মতো সজ্জন বিদ্বান মানুষ সর্ব ঋতুতেই অতি বিরল। পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর তিনি ওই দেশের বিদেশ মন্ত্রী হয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য।

বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত বিশের দশকের উপান্তে ও তিরিশের দশকের গোড়ায় জগন্নাথ হলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ঢাকা হলের বার্ষিক মুখপত্র 'শতদল', জগন্নাথ হলের 'বাসন্তিকা'। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেও বহু বছর ওঁরা দু'জনেই 'বাসন্তিকা'-র জন্য লেখা পাঠিয়েছেন, অধিকাংশই কবিতা। 'শতদল'-এ যাঁরা লিখতেন তাঁদের হয়তো ততটা বাইরে পরিচিতি ছিল না। একজনের কথা মনে পড়ে, কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, ছাত্রাবস্থায় ভালো ছোটো গল্প লিখতেন, জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে কলকাতায় ফার্মা কে এল এম নামে প্রকাশনা সংস্থা খুলেছিলেন। তাঁর প্রেমের-মদিরতা-মাখানো এক গল্প এখনো স্মৃতিতে ভাসে, একটি গানের দু'টি চরণ তাতে অন্তর্ভুক্ত, 'অসীম হতে এলো তোমার আক্রমণ, এই কি আমার হেরে যাওয়ার ক্ষণ?'

সলিমুল্লা হলে আমার সমসাময়িক যে-ছাত্রকুল ছিলেন তাঁদের মধ্যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুজিবনগরে জন্ম নেওয়া স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি; তাঁর অন্যান্য সহকর্মীও অনেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। তবে বাঙালি সমাজের এমনই বিচিত্র লীলা, আমাদের সময়ে ফজলুল হক মুসলিম হল ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ছিলেন মুহম্মদ তোয়াহা, পরে ওই দেশের প্রধান নকশালপন্থী নেতা : কখনও জেলে যাচ্ছেন, কখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছেন; কয়েক বছর হলো গত হয়েছেন, মৃত্যুর পূর্বে আকর্ষণীয় একটি আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দের কয়েকজনের কথা উপরে ঈষৎ উল্লেখ করেছি, এবার একটু বিশদে যেতে হয়। প্রায় হলফ করেই বলতে পারি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পঁচিশ বছর প্রায় যে-কোনও বিভাগে শিক্ষকমণ্ডলীর জ্ঞান, মেধা ও প্রতিভার জুড়ি সারা দেশে ঢুঁড়ে পাওয়া সত্যিই মুশকিল হতো। প্রথম দিকে বাঙালি মনীষীদের মধ্যে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুশীলকুমার দে, মোহিতলাল মজুমদার, কালিকারঞ্জন কানুনগো, সুশোভন সরকার; বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের নাম পূর্বেই করেছি, যেমন করেছি দর্শনের অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্যের উল্লেখ। প্রথম দিকে দুই দুঁদে উপাচার্য ল্যাঙলি ও হার্টগ সাহেব, বাংলা সাহিত্য বিভাগে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও জসিমুদ্দিন, পদার্থবিজ্ঞানে কে. এস কৃষ্ণন, ওয়াল্টার জেন্‌কিনস, কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, যাঁরা পরবর্তী কালে কলকাতায়, বাঙ্গালোরে ও কাশীতে প্রথিতযশা বিজ্ঞানী হিশেবে নাম কিনেছিলেন। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে আরও ছিলেন আমার পিতৃবন্ধু কাজী সাহেব, কাজী মোতাহার হোসেন, রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞা সনজীদা খাতুনের বাবা।

সুশীলকুমার দে-র মতো সুদর্শন পুরুষ খুব কম দেখেছি। কখনও স্যুট-টাইয়ের নিখুঁত বিলিতি সাজে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন, কখনও নিটোল বাঙালি পোশাকে, উভয় বেশেই তিনি অনিন্দ্যকান্তি। পড়াতেন অসম্ভব ভালো; বিশেষ করে, বলেই ফেলি, ছাত্রীদের হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর জুড়ি ছিল না। তিনিই সম্ভবত একমাত্র অধ্যাপক যিনি বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন : ইংরেজি থেকে স্বেচ্ছায় বাংলা সাহিত্য পড়ানোয় চলে যান, পরে বাংলা থেকে সংস্কৃতে। তাঁর 'বাংলা প্রবাদ' বিখ্যাত গ্রন্থ, বাংলা প্রাচীন সাহিত্য নিয়ে তাঁর গবেষণার গভীরতা কিংবদন্তী। তবে অনেকেই হয়তো জানেন না, তিনি রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' কাব্যের ঢঙে অনুপ্রাসের নিক্কণ-সমাচ্ছন্ন দেদার কবিতা লিখেছিলেন একদা, যা অন্তত 'বাসন্তিকা' ও 'শতদল'-এ নিয়মিত মুদ্রিত হতে দেখেছি, পরে বই হয়েও বেরিয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যিনি প্রধান অধ্যাপক ছিলেন তাঁর পাণ্ডিত্য অনস্বীকার্য, তবে তাঁর রুচির সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি তখনই আমাদের পীড়া দিত। সেটা তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময়, এক অতিশয় বুদ্ধিমতী প্রতিভাময়ী ছাত্রীকে তিনি ক্লাস থেকে একদিন বের করে দিয়েছিলেন। ছাত্রীটির অপরাধ, তিনি হাত-কাটা ব্লাউজ, যা নাকি অধ্যাপকের বিচারে অশ্লীল, পরে ক্লাসে এসেছিলেন; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে বোধহয় উজ্জ্বলতমা ছাত্রী সেই মহিলা তবে ছাড়বার পাত্রী নন তিনি, প্রতিবাদের ঝড় তুললেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অধ্যাপককে তাঁর ফরমান প্রত্যাহারের নির্দেশ দিলেন। এই শিক্ষক মহোদয়ের অধ্যয়নের ভঙ্গিতে একটি বিশেষ মুদ্রাদোষ ছিল, ডাইসি এই বলেছেন, মন্তেস্ক্যু এই মন্তব্য করেছেন, অন্য অমুকে এই বলেছেন, অন্য তমুকে যা বলেছেন তা এই : ডাঁই-করা বই নিয়ে ক্লাসে ঢুকতেন, সে-সব বই থেকে প্রভূত উদ্ধৃতি বের করে শোনাতেন। তিনি নিজে কী বলছেন তা জানবার সৌভাগ্য আমাদের কোনওদিন হতো না।

সাম্মানিক ইংরেজি আমার পড়া হলো না, তবে সাবসিডিয়ারি বিষয় হিশেবে ইংরেজি ছিল, তাই ওই বিভাগের অধ্যাপকদের সঙ্গে পরিচিত হতে সময় লাগেনি। হাসান সাহেব উপাচার্য হওয়ার পর ইংরেজির প্রধান অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন সত্যেন্দ্রনাথ রায়। জ্ঞানী মানুষ, কিন্তু তার চেয়েও যা বড়ো কথা, অমন নিখাদ ভালো মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

টিউটোরিয়াল ক্লাসে তাঁর ভালোমানুষির সুযোগ নিয়ে কত যে দৌরাত্ম্য করেছি তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর উদারচেতনা সম্পর্কে একটি গল্প, তাঁর সম্পর্কে-নাতনি মালিনী ভট্টাচার্য কিছুদিন আগে আমাকে শুনিয়েছিলেন। অধ্যাপক রায়ের এক ভ্রাতুষ্পুত্র, অসম্ভব দুরন্ত, তাঁর বাড়িতে কিছুদিন ছিল। তার যন্ত্রণায় বাড়ির অন্য সবাই কাতর, একমাত্র ডক্টর রায় স্থিতধী, অবিচল। তাঁর পড়ার টেবিলে চিনে পোর্সিলিনের অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ও দামি মস্ত একটি মৃৎপাত্র অবস্থান করছিল। ভ্রাতুষ্পুত্রটি একদিন অপরাহ্ণে জ্যেঠুর কাছে আবদার জানালো, দার্শনিকসম্মত গলায়, 'জ্যেঠু, আমার এটা ভাঙতে ইচ্ছে করছে'। জ্যেঠু সস্মিত হেসে বললেন, 'ভাঙো'। ভ্রাতুষ্পুত্র সঙ্গে-সঙ্গে ভেঙে খানখান করলো মৃৎপাত্রটি।

ইংরেজি সাহিত্যের আরও কয়েকজন অধ্যাপকের কথা বলতেই হয়। অধ্যাপক রায়ের মতোই ভালো মানুষ, মৃদু স্বভাব, সুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, পরে কলকাতাস্থ চারুচন্দ্র কলেজে সত্যেনবাবু যখন অধ্যক্ষ হন, সুকুমারবাবু সহ-অধ্যক্ষ, তাঁর উপরও আমরা প্রচুর অত্যাচার চালিয়েছি। আর ছিলেন শ্রীমতী চারুপমা বসু, হার্ডি পড়াতেন। আমাদের মতো দুরন্ত ছেলেদের সঙ্গে পেরে উঠতেন না। আমার মাতৃদেবীর সহপাঠিনী, তা হলেও তাঁকে আদৌ আমল দিতাম না। তবে তিনি মেয়েদের 'চামারী'-র তত্ত্বাবধায়িকা ছিলেন। আমাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সাহসী কেউ-কেউ ওই আবাসিকায় গিয়ে কোনও মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে চাইলে তাঁর অনুমতি নিতে হতো। তাই দায়ে পড়ে আমরা ক্রমে-ক্রমে সভ্যভব্য হতে শিখলাম। ইংরেজি বিভাগে আর ছিলেন বিশালবপু শ্রীশ দাস, বাংলা সাহিত্যেও যাঁর সমান আগ্রহ, একদা 'আমার বই' নামে একটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বই লিখে নাম কুড়িয়েছিলেন। মজলিশি মানুষ, আমাদের সঙ্গে অঢেল আড্ডা দিতেন। দেশভাগের পর কোথায় হারিয়ে গেলেন; হয়তো আমারই দোষ, ভালো করে খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। ইংরেজি বিভাগে ওই একই সময় ছিলেন ইসরাইলি অধ্যাপক অ্যালেক্স অ্যারনসন, সাহিত্যচর্চা করতেন, এক সময়ে শান্তিনিকেতনেও ছিলেন। আরো যাঁকে মনে পড়ে, ইংরেজ মহিলা, একটু উদ্ভট স্বভাবের, কিন্তু ভারি ভালো মানুষ, এ. জি. স্টক।

যে-দুই ইংরেজির অধ্যাপকের নামোল্লেখ সব শেষে করছি, তাঁরা মন্মথনাথ ঘোষ ও অমলেন্দু বসু, দু'জনেই বুদ্ধদেব বসু-র ঘনিষ্ঠ, 'প্রগতি' পত্রিকার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিলেন। অমলেন্দুবাবু পরে আলিগড়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। ইংরেজি-বাংলায় প্রচুর পাণ্ডিত্য-ছড়ানো প্রবন্ধ লিখেছেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও শেষের দিকে যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর পড়ানোয় চমক ছিল, গমক ছিল, কথনের চাতুর্যে এবং উদ্ধৃতির সমারোহে ছাত্রকুলকে মাতিয়ে রাখতে পারতেন। সর্বোপরি অত্যন্ত সুদর্শন ও বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। বহুদিন বাংলা লেখার চর্চা ছিল না তাঁর। ষাটের দশকে আমার উপরোধে ফের বাংলা চর্চা শুরু করলেন 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় লেখা দিয়ে, মস্ত উপকার হলো বাংলা সাহিত্যের। আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে উনিশশো তেষট্টি সালে প্রথম যখন অমলেন্দুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাই, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের তিনি তখন প্রধান অধ্যাপক, সখেদে জানালেন সহকর্মীদের কেউই তেমন পড়াতে পারেন না, 'একটা ছেলে যা-ও পারতো, তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে'। 'ছেলেটি' জ্যোতি ভট্টাচার্য।

মন্মথবাবু সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর। প্রধানত শেক্সপিয়র ও মিল্টন পড়াতেন। হয়তো হ্যামলেটের একটি উক্তির তিনটি কি চারটি পঙ্‌ক্তিতেই প্রহর কাটিয়ে দিতেন। আমাদের যে কোর্স শেষ হচ্ছে না, নির্ধারিত পাঠ্যের অনেক কিছু যে বাকি থেকে যাচ্ছে, তাঁর উদ্বেগ

যেমন ছিল না তা নিয়ে, আমাদেরও চেতনা ছিল না। কারণ তিনি যেন সৃষ্টির গভীরে আমাদের উত্তীর্ণ করতেন, একটি শব্দ বা একটি বাক্যবন্ধকে ঘিরে ট্র্যাজেডির গহনে ছুঁড়ে দিতেন নিজেকে, নিয়ে যেতেন আমাদেরও। সাহিত্য ও কাব্য আস্বাদের প্রেরণা সবচেয়ে বেশি মনে হয় তাঁর অধ্যাপনা থেকেই সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। আই. এ.-তে আমার পরীক্ষার খাতা দেখেছিলেন, অসম্ভব বেশি নম্বর দেওয়া সত্ত্বেও আমি ইংরেজিতে অনার্স নিইনি, ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হইনি, তা নিয়ে তাঁর আক্ষেপের অন্ত ছিল না। অনেকেরই হয়তো জানা নেই, নাট্যকার মন্মথ রায়ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বাংলায় একাঙ্ক নাটিকা রচনার তিনি অগ্রদূত, এরকম একটি প্রবাদ আছে। অথচ মন্মথ রায়েরও কয়েক বছর আগে থেকে মন্মথনাথ ঘোষ একাঙ্ক নাটক লিখতে শুরু করেন, যার সাক্ষ্য বহন করছে ওই মাত্র তিন-চার বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে হঠাৎ-বন্ধ-হয়ে-যাওয়া 'প্রগতি' পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলি।

বিলেত গিয়ে ডিগ্রি আনেননি মন্মথবাবু। সুতরাং, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-সোপানে তাঁর ধাপে-ধাপে উন্নতি ঘটেনি, লেকচারার হয়েই ছিলেন। দেশভাগের পর দিল্লি চলে গিয়ে ওখানে একাধিক কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। কিন্তু ততদিনে তাঁর মনের গড়ন বদলে গেছে। তাঁর সমসাময়িক বন্ধুবান্ধব, বিশেষত অর্থনীতির অধ্যাপকরা, বৃত্তির ক্ষেত্রে উন্নতি করছেন, প্রচুর উপার্জন করছেন, তিনিই একপাশে পড়ে রয়েছেন। অভিমান-আহত মন্মথবাবুর রোখ চেপে গেল। সাহিত্যচর্চা অর্থহীন, ব্যর্থ ; তিনি সাহিত্য ভুলে যাবেন। তাঁর নিজের মতো করে তিনি অর্থ উপার্জন করবেন। দিল্লিতে সংসারের খরচ অসম্ভব সংকুচিত করে আনলেন। এমনকি খবর কাগজ নেওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন, শুধু এমন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার গ্রাহক হলেন যাতে ফাটকা বাজার নিয়ে বিশদ সংবাদ থাকে। হ্যামলেট-ওফেলিয়ার অন্তর্বেদনার হৃদয়-মোচড়ানো বিশ্লেষণ করতেন যে-মন্মথনাথ ঘোষ, তিনি ফাটকাবাজারে মেতে উঠলেন, অচিরে দেদার টাকা করলেন। দিল্লিতে বড়ো বাড়ি তুললেন, তাঁর সাহিত্যরস কোথায় হারিয়ে গেল। আমার সম্পর্কে অথচ তাঁর অপত্যস্নেহ বরাবর অটুট ছিল, আশির দশকের উপান্তে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। শেষের দিকে দিল্লি গিয়ে দেখেছি, তাঁর বিনোদনের উপকরণ বাজি ধরে কন্ট্রাক্ট ব্রিজ খেলা, একমাত্র পাঠ্য হ্যারল্ড রবিন্স। আমার কাছে অন্তত, পৃথিবীতে এবংবিধ ট্র্যাজেডির তুলনা নেই।

সবশেষে অর্থনীতি বিভাগের প্রসঙ্গে আসি। এখানেও ডাকসাইটে শিক্ষকদের সমারোহ। ভারতজোড়া খ্যাতি-কুড়োনো অধ্যাপক পানাণ্ডিকর বেশ কয়েক বছর আগেই মুম্বই ফিরে গেছেন; যোগীশচন্দ্র সিংহ মশাইও তেমনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। কিন্তু যাঁরা ছিলেন তাঁরাই যথেষ্ট। প্রধান অধ্যাপক হীরেন্দ্রলাল দে, তখনকার দিনে লন্ডনের ডি. এসসি। তিনিও খানিক বাদে ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান হয়ে মুম্বই চলে গেলেন। তখন বিভাগীয় প্রধান হলেন অধ্যাপক কৃষ্ণবিনোদ সাহা, অর্থনীতির তত্ত্ব নিয়ে তাঁর মৌলিক গবেষণা ছিল। পড়াতেন চমৎকার, কিন্তু তাঁর অধ্যাপনার সঙ্গে স্বল্পবাকের অদ্ভুত সমাহার। খুব কম কথায় যা বোঝাবার বুঝিয়ে দিতেন ; যারা সেটুকু সময়ের মধ্যে বুঝতে পারতো না, তাদের মহা সংকট। তাঁর বাক্-মিতব্যয়িতা সম্পর্কে একটি গল্প আমাকে বলেছিলেন অর্থনীতি বিভাগে অন্যতম শিক্ষক পরিমল রায় : বাইরে যাঁর গাম্ভীর্যের মুখোশ, কিন্তু অন্তর রসে টইটম্বুর। ইনিও 'প্রগতি' দলের অন্তর্ভুক্ত, বুদ্ধদেব বসু-র বন্ধু। আশ্চর্য ভালো ছড়া ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর রসালো প্রবন্ধের একটি সংগ্রহ, 'ইদানীং', কিছুদিন আগেও বাজারে পাওয়া যেত। তবে তাঁর লেখা অমূল্য ছড়াগুলি সংগৃহীত হয়নি ; বাংলা সাহিত্যের পক্ষে সেই ক্ষতি অপূরণীয়।

যা বলছিলাম, কৃষ্ণবিনোদবাবু টিউটোরিয়াল ক্লাসে পরিমলবাবুকে 'ক্ষয়িষ্ণু প্রান্তিক উপযোগিতা' নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে অনুজ্ঞা করেছিলেন। পরিমল রায় সাহিত্যসংপৃক্ত মানুষ, ওই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদাহরণের শরণাপন্ন হলেন। লিখলেন, প্রবল তৃষ্ণার মুহূর্তে কেউ যদি এক পেয়ালা চা হাতে ধরে দেয়, তা পান করে গভীর তৃপ্তির উদ্রেক হয় ; যদি তারপর দ্বিতীয় এক পেয়ালা পান করতে দেওয়া হয়, প্রাপক খুশি মনে তা-ও পান করেন ; তৃতীয় পেয়ালা গ্রহণের অনুরোধ জানালে ভদ্রতাবশত কোনওক্রমে গিলে নেন, তবে ততটা তৃপ্তি হয় না ; অতঃপর চতুর্থ পেয়ালা তাঁর হাতে গুঁজবার চেষ্টা হলে তিনি ধন্যবাদসহ প্রত্যাখ্যান করেন : এই ঘটনাক্রম 'ক্ষয়িষ্ণু প্রান্তিক উপযোগিতা'র নিদর্শন। প্রবন্ধটি পাঠান্তে কৃষ্ণবিনোদবাবু নাকি মন্তব্য করেছিলেন : চতুর্থ পেয়ালাটি ধন্যবাদ-সহ অথবা বিনা ধন্যবাদে প্রত্যাখ্যাত হলো কিনা তা জানতে অর্থনীতি শাস্ত্রে আমাদের আগ্রহ নেই।

পরিমলবাবু ঢাকায় আমাদের বছর দুই হয়তো পড়িয়েছিলেন, কিংবা তারও কম, কারণ ততদিনে দেশভাগের পূর্বসংকেত শুরু হয়ে গিয়েছে। তিনিও দিল্লিগামী হন, প্রথমে রামযশ কলেজে, পরে আই. এ. এস ট্রেনিং স্কুলে অধ্যাপনা। কয়েক বছর বাদে যখন দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্সে যোগ দিই, পরিমলবাবুর বাড়িতে বাঁধা আড্ডা; সেই বর্ণনা পরে দেবো। দিল্লি ত্যাগ করে পরিমলবাবু পরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কাজ নিয়ে নিউ ইয়র্ক চলে যান। সেখান থেকে আমাকে তিনি যে-চিঠি দিয়েছিলেন, তার প্রথম বাক্য : 'অশোক, এই দেশে গরুতেও থাকে না।' এই মন্তব্য বর্তমানের বিশ্বায়িত যুবককুলের মধ্যে যদি প্রচার করতে যাই, তাঁরা আমার গর্দান নেবেন। নিউ ইয়র্ক পৌঁছুবার কয়েক মাসের মধ্যেই পরিমলবাবু মারা গেলেন, ওই দেশে তাঁকে খুব বেশি দিন তাই থাকতে হয়নি।

অর্থনীতি বিভাগে তরুণতম শিক্ষক ছিলেন আমার অগ্রজপ্রতিম সমররঞ্জন সেন, দেশসেবিকা আশালতা সেনের একমাত্র সন্তান। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই সমরদা বিলেত চলে গেলেন। বছর দুয়েক বাদে ফিরে এসে আমাদের আবার পড়াতে শুরু করেন। তবে অতি স্বল্প সেই অধ্যায়। কয়েক মাস গত হলেই নতুন দিল্লির কৃষি মন্ত্রক থেকে তাঁর আহ্বান এলো, চলে গেলেন।

পাঁচ

এতক্ষণ যাঁর কথা বলিনি, অথচ যিনি আমার ভবিষ্যৎ জীবনচর্যার অন্যতম প্রধান নিয়ামক, তিনি অমিয়কুমার দাশগুপ্ত। অর্থনীতির তত্ত্ব নিয়ে তাঁর মতো তন্নিষ্ঠ গবেষণা ইতিপূর্বে আমাদের দেশে কেউ করেননি। তাঁর চেয়ে দক্ষতর শিক্ষকও আমি দেশে-বিদেশে কোথাও পাইনি। তাঁর বিদ্যা ও পড়ানোর উৎকর্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবাদপ্রতিম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দশকের পর দশক ধরে তিনি ঢাকায় প্রতিভাধর এন্তার ছাত্র তৈরি করেছেন। পরে কটকে র‍্যাভেনশ কলেজে, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং দিল্লিতে, একই জ্ঞানচর্চার পরম্পরা। মজার ব্যাপার হলো, বাংলার বিদগ্ধ মহলে প্রেসিডেন্সি কলেজ, এবং সেই সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোনও গীত নেই, একজন-দু'জন পণ্ডিতপ্রবর এমনটাও দাবি করেছেন, প্রেসিডেন্সি কলেজই বাংলা, বাংলাই প্রেসিডেন্সি কলেজ। ইত্যাকার দাবি আসলে এক ধরনের কূপমণ্ডূকতা, পৃথিবীকে জানবার-চেনবার-বোঝবার জন্মগত অক্ষমতা। মাত্র ক'দিন আগে এক বাংলা দৈনিকের রবিবাসরীয় বিভাগে 'মানুষগড়ার কারিগর' শিরোনামে এক মস্ত প্রবন্ধ ফাঁদা হয়েছিল : কিংবদন্তী শিক্ষকদের নিয়ে আলোচনার প্রয়াস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের বাইরে যেন পৃথিবীই নেই, বিদ্যাচর্চা ও শিক্ষকতাও অনুপস্থিত। শিক্ষকদের তালিকায় সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রায় অনুল্লিখিত, অনুচ্চারিত অমিয় দাশগুপ্ত মশাইয়ের নামও। সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রায় পঁচিশ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন; তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্ফুরণ ও বিকিরণও ঢাকাতেই। ১৯৪৫ সালের পর অবশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে এসেছিলেন বছর পাঁচ-ছয়ের জন্য, তারপর শান্তিনিকেতন, জাতীয় অধ্যাপক হিশেবে বৃত হওয়া, রাজ্যসভার সদস্য। কিন্তু, হলে কী হয়, সেই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে একবার জাত খুইয়েছিলেন, তা আর পুনর্জয় করতে পারলেন না। কলকাতার বিদ্বজ্জনের কাছে তাঁর স্থান মেঘনাদ সাহার অনেকটাই নিচে।

অমিয় দাশগুপ্তের ললাটলিখন আরও শোকাবহ। পশ্চিম বাংলায় ক্বচিৎ-কদাচিৎ একজন-দু'জন পণ্ডিত মানুষ ব্যাতিরেকে বিশেষ কেউই তাঁর নাম উচ্চারণ করেন না। অথচ তিনি জীবনের শেষ বারো-চোদ্দো বছর একাদিক্রমে শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছেন, ওখানকার ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছেন, যে যখনই তাঁর কাছে জ্ঞাতব্য কিছু জানবার জন্য গিয়েছেন, স্বভাবঔদার্যে সমাদরে সে-সব অনুরোধ-আবদার রক্ষা করেছেন। এমনকি শান্তিনিকেতনে থাকাকালীনই নিভৃতে নিজের মতো করে অন্তত তিনটি তত্ত্বভিত্তিক গ্রন্থ রচনা করেছেন, সে-সব গ্রন্থ বিদেশে প্রকাশিত ও বহু সংবর্ধিত, কিন্তু পশ্চিম বাংলার নিথর ডোবায় তাঁর কোনও অনুকম্পন অনুভূত হয়নি। আমার এটা প্রতীতি, তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ অর্থনীতির শিক্ষক আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেননি। একটু আগে যা বলেছি, জটিল তত্ত্ব সোজা করে বোঝানোর ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা তুলনাহীন। সামান্য সান্ত্বনা, অমর্ত্য তার একটি গ্রন্থ অমিয়বাবুকে উৎসর্গ করেছে, উৎসর্গের বয়ানে তার অকপট স্বীকারোক্তি, 'যিনি

আমাকে প্রথম ধনবিজ্ঞানের মর্মবাণীতে দীক্ষিত করেছিলেন, সেই অমিয় দাশগুপ্তকে'।

ধনবিজ্ঞানে আমার তেমন আগ্রহ কোনওদিনই ছিল না। আকস্মিকতার পরিণামে, এবং কিছুটা দায়ে পড়ে, এই শাস্ত্রে আলতোভাবে অনুপ্রবেশ করেছি, প্রথম সুযোগেই সেই চত্বর থেকে বিদায় নিয়েছি। কিন্তু এটা স্বীকার করতে তো ন্যূনতম দ্বিধা নেই, অর্থনীতি সম্পর্কে আমার যতটুকু জ্ঞান, পুরোটাই অমিয়বাবুর শিক্ষকতার করুণাহেতু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিশেবে তাঁকে আদৌ পাইনি। আমরা পড়তে ঢোকার কয়েক মাসের মধ্যে তিনি অন্যত্র চলে গেলেন, কয়েক বছর বাদে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন এম.এ পড়তে গেলাম, তখন থেকেই তাঁর স্নেহ আমার উপর অঝোরে বর্ষিত হলো। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ঘরে নয়, দিনান্তে এবং ছুটির দিনে, প্রত্যূষে, দ্বিপ্রহরে তথা সায়ংকালে, আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে তিনি আমাকে অর্থনীতির রহস্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন।

অমিয় দাশগুপ্তকে আমি নিজে ঢাকায় শিক্ষক হিশেবে পাইনি, কিন্তু তাঁর অধ্যাপনাযশ ঢাকার হাওয়ায়-হাওয়ায় নন্দিত হতো; আমাদের আগে দুই দশক ধরে যে ছাত্রকুল বিদ্যাচর্চা করেছেন, তাঁদের মুখে লোকপ্রবাদের মতো ঘুরতো। তখনকার তরুণতর শিক্ষকরা অনেকেই তাঁর ছাত্র, তাঁদের কাছেও সেই প্রবাদের উপর্যুপরি অভিভূত উচ্চারণ শুনতাম। অথচ কলকাতা এবং তার আশেপাশে কেউই তেমন করে তাঁর নাম জানেন না, তাঁর গ্রন্থাদির সঙ্গে পরিচয় নেই। বরঞ্চ হালে তাঁর পুত্র এবং জামাতা সম্পর্কে—দু'জনেই অর্থনীতিবিদ—অনেক বেশি আলোচনা, অমিয়বাবু উহ্য থেকেই যান। অবশেষে, কী জানি কী মনে করে, বছর দশেক আগে পশ্চিম বাংলার একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সাম্মানিক ডি.লিট ডিগ্রি দেওয়া হয়। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি সমাবর্তনে যেতে পারেননি। কিন্তু দীর্ঘ দু'বছরের মধ্যেও তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেই সম্মানপত্রটি পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়নি।

অমিয়বাবু ঢাকা ছেড়ে চলে গেলেন যেমন, এক বছর-দু'বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ থেকেও অন্যান্য বহু শিক্ষক প্রস্থান করলেন। আসন্ন দেশভাগের অনিশ্চয়তা, অনেকেরই ভবিষ্যৎ-চিন্তা একটু উচ্চকিত। ভাঙা হাট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা পড়ে রইলাম। যাঁরা চলে গেলেন তাঁদের অনুপস্থিতির পীড়নে আমরা বিচলিত। তা হলেও তখন যৌবনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে, সাহিত্য-প্রেম-রাজনীতি-উন্মুখতা, বন্ধুবান্ধবদের সংখ্যা শাখাপ্রশাখায় ক্রমশ বিস্তৃত। যাঁদের সঙ্গে সখ্যের নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে ছিলাম, কালের রীতিতে তাঁরা কোথায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছেন, অনেকের সঙ্গেই পরে আর যোগাযোগ হয়নি। কেউ-কেউ হয়তো ইতিমধ্যে এই পৃথিবী থেকেই অপসৃত। যে-দু'জন কলেজকালীন বন্ধুর সঙ্গে এখনও মাঝে-মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, তাদের একজন সুনীলরঞ্জন বসু, বাচ্চু, অন্যজন হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়। বাচ্চুর বরাবরই লেখাপড়ার চেয়ে নৃত্যবাদ্যে অধিকতর উৎসাহ, শেষ পর্যন্ত ওর বি. এ ডিগ্রিও নেওয়া হয়নি। তবে গিটারে নিমগ্ন থেকেছে, ঢাকা শহরে অনেক কিশোরী-যুবতী মেয়েদের নিয়ে নাচের মহড়া করিয়ে অনুষ্ঠানে হাজির করেছে। এখন কলকাতায় স্থিত, একটা যেমন-তেমন সরকারি কাজ থেকে অবসর নিয়ে সংগীতচর্চায় সদা ব্যাপৃত, ক্বচিৎ দেখা হয়। হরিসাধন দিল্লিতে বাণিজ্যমন্ত্রকে যোগ দিয়েছিল, অবসর না-নেওয়া পর্যন্ত বেশির ভাগ সময় বিদেশের দূতাবাসে অতিবাহন করেছে, এখন দিল্লিতে বাড়ি তুলেছে। তার কন্যা, সুজাতা, আমার বড়ো প্রিয়।

এনায়েত করিমের কথা বলি। আমরা একই বছরের, আমি আরমেনিটোলা স্কুলে, এনায়েত কলেজিয়েট স্কুলে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ও প্রথম হয়েছিল, আমি বেশ খানিকটা

নিচে। (তার কারণ অবশ্য বুদ্ধদেব বসু। প্রবন্ধের পেপারে 'তোমার প্রিয়তম বাংলা গল্প' নিয়ে লিখতে বলা হয়েছিল। অকালপক্ক আমি, লিখেছিলাম 'রাধারানীর নিজের বাড়ি' নিয়ে। খাতা দেখেছিলেন নিয়মনিষ্ঠ এক পণ্ডিতমশাই, একশোতে আমাকে মাত্র উনপঞ্চাশ দিয়েছিলেন।) এনায়েত আই এ পড়তে প্রেসিডেন্সি কলেজে চলে যায়। বি. এ ক্লাসে ফিরে আসে ঢাকায়, ততদিনে সে ছাত্র ফেডারেশনের উৎসাহী কর্মী। ইতিহাস-বিখ্যাত মধুর দোকানের সম্মুখবর্তী সংকীর্ণ মাঠে আমাদের সকাল থেকে সন্ধ্যা আড্ডা। একসঙ্গে বি. এ পরীক্ষা দিলাম, আমি প্রথম, এনায়েত দ্বিতীয়। ছাত্র আন্দোলনের ফেরে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এনায়েত কিছুদিন কারাবাস করে এলো। জীবনের গতি ঘুরে যায়। কয়েক বছর বাদে এনায়েত পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে ঢুকলো, হল্যান্ডে গিয়ে হাজির হলো, আমিও তখন সে-দেশে আমাদের আড্ডা আবার জমলো। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি কলকাতাস্থ পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনে ওর কয়েক মাস অধিষ্ঠান। দিল্লি থেকে আমার কলকাতা এলেই আর-এক দফা আমাদের আড্ডার বেপরোয়া ঋতু। বছর দশেক বাদে, ততদিনে পাকিস্তান কিছু সময়ের জন্য কমনওয়েলথের বাইরে, এনায়েত নতুন দিল্লির দূতাবাসে উঁচুপদে আসীন, সঙ্গে স্ত্রী হোস্না। কূটনৈতিক মানুষ, মেপে কথা বলা ইতিমধ্যে বাধ্য হয়ে রপ্ত করেছে, অথচ আমার সঙ্গে হৃদ্যতা বরাবরই তুঙ্গে থেকেছে। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় এনায়েত ওয়াশিংটনের দূতাবাস থেকে বেরিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে, বাংলাদেশ সরকারের প্রথম বিদেশ সচিব নিযুক্ত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর প্রয়াণ। আমার অবসাদবোধের সীমা নেই। হোস্নার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ তার পরেও অবশ্য অব্যাহত থেকেছে, হোস্না কলকাতায় আমাদের ফ্ল্যাটে এসেও থেকেছে। কয়েক বছর হলো সে-ও মায়া কাটিয়ে চলে গেছে।

যে কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর অভাবে এখনও অহরহ বিষণ্ণ বোধ করি, এনায়েত করিম, নির্দ্বিধায় বলতে পারি, তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। ও-রকম মুক্তমনা মানুষ পৃথিবীর জঙ্গলে কদাচ চোখে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে বসে সে একদিন আমাকে এক উপাখ্যান শুনিয়েছিল, যাতে তার সাম্প্রদায়িকতাবোধরহিত কৌতুকপ্রিয়তা বিচ্ছুরিত। হয়তো হুবহু নয়, তবে তার বলা গল্পটি যথাসম্ভব বিশ্বস্ত আকারে এখানে পেশ করি। ঢাকার কোনও বস্তি থেকে আদালতে এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে এসেছে। উকিলের প্রশ্ন : 'তেরা নাম বাতা'। উত্তর: 'হুজুর, কেরামত আলি'। উকিলের দ্বিতীয় প্রশ্ন : 'তেরা বাপকা নাম বাতা'। —'হুজুর, রহমত আলি'। —'তেরা বাপকা বাপকা নাম বাতা'।—'সেলামত আলি, হুজুর'। —'ইস দফে তেরা বাপকা বাপকা বাপকা নাম বাতা'।—'ইমারত আলি, হুজুর'। —'আভি উসকা বাপকা নাম বাতা'। —'মাফ কিজিয়ে হুজুর, উ শালে হিন্দু থা'।

আরও দু'জনের কথা বলতে হয়, যাদের সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক এই পঞ্চান্ন বছর পেরিয়ে এখনও অশিথিল। উভয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সমকালীন, দুই বোন তারা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের প্রধান জুম্নরকর সাহেবের দুই কন্যা, সুশীলা ও শান্তি। অবাঙালি বলে তাঁদের ভুল করবার কোনও সুযোগই ছিল না, এখনও নেই। ঢাকা শহরে বড় হয়ে ওঠা, চেতনার উন্মেষ বাংলা ভাষার মধ্য দিয়েই, এমনকি দেশজ বাংলা বুকনিও, আমার সন্দেহ, আমার চেয়ে তাদের অনেক বেশি রপ্ত। সুশীলা, 'সুশী' নামেই অধিক পরিচিত, সংস্কৃত সাহিত্যে অসম্ভব ভালো ছাত্রী। পরবর্তী সময়ে স্টেটসম্যান পত্রিকার একদা সম্পাদক অমলেন্দু দাশগুপ্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এমন বিদ্বান ও সুভদ্র পরিবার কচিৎ চোখে

পড়ে ; তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা, পেশায় হিশেবরক্ষক, নম্র ও শান্ত ; কন্যা সুপ্রিয়া, এখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, তার স্বামী সুকান্ত চৌধুরী ও দাশগুপ্ত-দম্পতির কনিষ্ঠ পুত্র অম্লানও তাই। অম্লানের স্ত্রী অদিতির মতো সর্বগুণসম্পন্না সর্ব অর্থে ভালো মেয়ে আমার অভিজ্ঞতায় চোখে পড়েনি। কনিষ্ঠা জুন্নরকর দুহিতা শান্তি তার ঘরোয়া নাম 'বেবি' হিশেবেই বেশি পরিচিত ছিল। গিন্নিবান্নি মানুষ এখন, আর সেই নামে তো তাকে ডাকা যায় না। সে ইতিহাসের তুখোড় ছাত্রী, চোখেমুখে কথা বলতো। সুশীলা শান্ত, বৈকালিক নদীর মতো, ধীর কণ্ঠস্বর; শান্তি অন্যদিকে উচ্ছল ঝরনা, কল-কল কল-কল, আড্ডায়, পরচর্চায়, কৌতুকপ্রিয়তায় জুড়ি নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে সাম্মানিক ডিগ্রি অর্জন করে কলকাতায় এসে এম.এ পাশ করে। কিছুদিন বাদে বাবা-মার সঙ্গে পশ্চিম ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর বরোদাতে সতীশ দিঘে নামে এক চিকিৎসকের সঙ্গে পরিণীত হয়। তার দুটি উজ্জ্বল কন্যা, বিশাখা ও অঞ্জলি, তারাও এখন পাকাপোক্ত গৃহিণী। আমি কখনও কাশীতে, কখনও লখনউয়ে, কখনও দিল্লিতে, কখনও বিদেশে, কখনও ফের কলকাতায়। অথচ শান্তির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা, আমার সমস্যার সে শরিক, তাঁর সমস্যার আমি। আমার কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডল অন্তত শান্তি জুন্নরকর নামের সঙ্গে সহ-শিহরিত।

আর একজনের কথাও বলতে হয়, তিনি সাগরিকা ঘোষ। সাগরিকা রাজনৈতিক কর্মী, আমার চিন্তাবিন্যাসের সঙ্গে তাঁর একেবারেই মিল নেই, কিন্তু পরস্পরের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ এখনও অটুট।

বন্ধুদের সঙ্গে আদান-প্রদানের বিনিময়-প্রতিবিনিময়ের সেই বছরগুলি প্রশ্নবোধক চিহ্নে তবু সমাচ্ছন্ন। ভারতবর্ষ অস্থির, বাংলাদেশও সমান আন্দোলিত। আমরা মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তরের ভয়ংকর সময় পেরিয়ে এসেছি, অথচ সামনের দিকে কী আছে তা জানি না। রাজনীতির আবর্ত, আজাদ হিন্দ ফৌজের উত্তর-আলোড়ন, কংগ্রেস সম্পর্কে যুবসম্প্রদায় ক্রমঅধৈর্য, তখনও পর্যন্ত কংগ্রেসের-মধ্যে-থাকা বামপন্থী গোষ্ঠীগুলি মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো। এরই মধ্যে, হাজার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, কমিউনিস্ট পার্টির একটু-একটু করে দানা বাঁধা। কারান্তরালে, আন্দামানে এবং অন্যত্র, অনেক রাজবন্দী, কংগ্রেসের বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে, দলবদ্ধভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনে দীক্ষাগ্রহণ করেছেন। সে সমস্ত খবর আমরা বাইরে ঈষৎ জানতে পেরেছি, আবার অনেকটা জানিও না। সেই লগ্নে বাংলাদেশে মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভা, পাকিস্তান আন্দোলন ক্রমশ শক্তি অর্জন করছে। প্রধানত কংগ্রেস দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের স্বার্থপরতা ও অবিমৃষ্যকারিতা হেতু, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ধমান আড়াআড়ি, যা ছাত্রসমাজের উপরেও কালো ছায়া ফেলেছে। ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে, এবং ছেচল্লিশ সালের গোড়ায়, আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দিবীরদের মুক্তি আন্দোলন এবং মুম্বই বন্দরে নৌবিদ্রোহ কেন্দ্র করে যে-সংহত উদ্দীপনা ক্ষণিক দেখা দিয়েছিল, তার আবেশে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের তরুণদের, অল্প সময়ের জন্য হলেও, কাছাকাছি আসা ঘটলো। ঢাকা শহরে কয়েক বছর আগে যে-দাঙ্গা হয়েছিল, তার দুঃসহ স্মৃতি, আমরা আশা করেছিলাম, এই সুযোগে মিলিয়ে যাবে, স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রত্যন্তকালে ধর্মনির্বিশেষে সমগ্র তরুণ সম্প্রদায় একতাবদ্ধ হয়ে সংগ্রামশীল হবে। কিন্তু আশা কুহকিনী। ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ সালের ঘটনাবলী দুই সম্প্রদায়কে, তরুণদের সুদ্ধু, সম্পূর্ণ বিভক্ত করে দিল। অতঃপর স্বাধীনতা ও দেশভাগ। হয়তো ভুল বললাম, দেশভাগ ও স্বাধীনতা।

কী করে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনোর চর্চা চলছিল সেই সময়ে, এখন ভেবে অবাক হই। বেশ কিছু অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেছেন। নতুন যাঁরা, তাঁরা অনভিজ্ঞ। তা ছাড়া বাইরের হুলস্থুল অবস্থার প্রভাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে পড়েছে। পর-পর কয়েক বছর, নভেম্বরের শুরু থেকে মার্চ মাসের গোড়া পর্যন্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ে রলরোল অব্যাহত। কোনও-না-কোনও উপলক্ষ্যে ধর্মঘট, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে দৈনন্দিন সভা। মধুর দোকানে গোল হয়ে বসে চা-চর্চার সঙ্গে ছাত্ররাজনীতির কৌশলবিন্যাস, মিছিল, স্লোগানের পর স্লোগানের উচ্চনাদ। ছেচল্লিশ সালে বড়ো দাঙ্গার সময় বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কয়েক মাস এমনিতেই বন্ধ, তারপরও ছুটকোছাটকা নানা গোলমাল।

তখনও শ্রীসঙ্ঘের সঙ্গে আমার গভীর যোগাযোগ। লীলা রায় যে-ক'সপ্তাহ ঢাকা থাকেন, আমার উপর তাঁর অকুণ্ঠ স্নেহের বর্ষণ। কয়েক বছর বাদে আমি মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়লাম, তিনি খুবই বিষণ্ণ হয়েছিলেন। সেই অস্থির মুহূর্তে তেমন অপরাধবোধ অনুভব করিনি। পরে যখন তিনি কলকাতায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায়, জ্ঞানহীন, বিছানায় নিঃসাড় শুয়েছিলেন, অনেকবার ভেবেছি তাঁর কাছে গিয়ে, আমার আদর্শ উত্তরণের জন্য অনুশোচনা নয়, সৌজন্যমূলক দুঃখও নয়, বিনম্র শ্রদ্ধা প্রকাশ করে আসবো: সংকোচে আর যাওয়া হয়নি।

এই ঋতুতে আমি সাহিত্য ও কবিতায় আদ্যোপান্ত মজে আছি। 'কবিতা' পত্রিকার গ্রাহক হয়েছি, বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে নিয়মিত পত্রবিনিময় চলছে, অনেক অপোগণ্ড গম্ভীর বাক্যবাণ প্রতি চিঠিতে তাঁর উদ্দেশে নিক্ষেপ করছি, তিনি প্রতিটি চিঠির প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিচ্ছেন। চিঠি দিচ্ছি জীবনানন্দ দাশ-সঞ্জয় ভট্টাচার্যদের। অনুজ দেবীপ্রসাদের সঙ্গে কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তখন 'রঙমশাল' সম্পাদনা করছিলেন, কিন্তু পাশাপাশি 'সংকেত' নামে বড়োদের জন্য একটি মাসিক পত্রিকারও সূচনা করেছিলেন, কয়েকটি সংখ্যা বের হবার পর বন্ধ হয়ে যায়। তবে তখন সাহিত্যযশোপ্রার্থী আমাকে ঠেকাবে কে? অবিশ্রান্ত পত্রাঘাতে কামাক্ষীপ্রসাদকেও সেই ঋতুতে জর্জরিত করে তুলেছি।

আমার চিঠির জোয়ার, যা আসলে সাহিত্যঈপ্সার উৎসমুখ, প্রবল ধারায় বইছিল, সম্পূর্ণ একটি অন্য প্রবাহ বেয়েও। জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জেনে ফেলেছি, সুপ্রিয় সোম আসলে ওভারটুন হল ওয়াই এম সি এ-তে তার ঘরসঙ্গী সুরঞ্জন সরকার। সুরঞ্জন সরকারের দিক থেকে এবার স্বনামে আমাকে চিঠি লেখার শুরু। সপ্তাহে দু'টি কি তিনটি চিঠি, আমার দিক থেকেও সেই সংখ্যক প্রত্যুত্তর, এখন অনেকের কাছে সম্ভবত বিশ্বাসযোগ্য ঠেকবে না। সে সময় কাগজ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য। আমি প্রতিটি চিঠি লিখতাম, পূর্বেই উল্লেখ করেছি, শাদা ফুলস্ক্যাপ কাগজের উভয় পৃষ্ঠা ভরে, এবং চিঠিগুলির আয়তন আট-দশ-বারো-চোদ্দো পাতা ছাড়িয়ে যেত। বাষ্পভারাতুর চিঠি, কাহিনী ভারাতুর চিঠি, কবিতা ভারাতুর চিঠি, এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে দুর্বার স্বচ্ছন্দ বিহার। তবে এমনি করেই আমার হয়তো বাংলা রচনায় আস্তে-আস্তে ঈষৎ স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে।

প্রথম দিকে আমার লিখনে অসম্ভব বুদ্ধদেবীয় ঝোঁক অতি প্রকট; যে-আড়ষ্টতা বুদ্ধদেবের নিজস্ব ধর্ম, তা আমার ক্ষেত্রে নির্বোধ শব্দ কণ্ডুয়ন মাত্র। ভরসার কথা, এই পর্ব খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। সুরঞ্জন সরকার মহা মর্কট মানুষ, তার কাছ থেকে আমিও মর্কটত্বে দীক্ষা নিলাম। রচনায় দুষ্টুমি এলো, কিছুটা হয়তো চালিয়াতিও। কয়েক মাস বাদে অন্য এক অভাবনীয় সৌভাগ্যের পালা। রিপন কলেজে সুরঞ্জন সরকারের সহপাঠী

অরুণকুমার সরকার। খুব সম্ভব সুরঞ্জনের কাছে আমার কিছু চিঠি অরুণ দেখেছিলেন। তাঁর কী মনে এলো অনুমান করতে পারি না, তিনিও হঠাৎ সপ্তাহে একটি-দু'টি করে চিঠি পাঠাতে লাগলেন, তাতে বিভিন্ন সাহিত্য প্রসঙ্গ, রাজনীতি, দর্শন, কখনও-কখনও আস্ত একটি কবিতা, কিংবা কবিতার টুকরো। সুরঞ্জন ও অরুণকুমার সরকারের যৌথ মাদকতায় আমি অচিরে নেশাগ্রস্ত হলাম। মনে পড়ে এমনই কোনও চিঠিতে অরুণকুমার সরকার তাঁর সদ্য-লেখা কবিতা মকশো করে পাঠিয়েছিলেন : 'হে রাত্রি, মিনতি শোনো, মিত্র হও, কটাক্ষ হেনো না'। আরও যা মনে পড়ে, কোনও চিঠি, হয়তো দুই কিংবা তিন দিন ধরে লেখা, বিক্ষিপ্তভাবে, কখনও সকালে একটি অনুচ্ছেদ, দুপুরে একটি, রাত্রে অন্যটি, পরদিন আবার তেমনই করে এখান-ওখান থেকে কাগজের টুকরো জড়ো করে সেই অসম পরিমাপের কাগজে চিঠির বিন্যাস। এরকম একটি চিঠিতে হঠাৎ নিম্নোক্ত উচ্চারণ : 'ঘুম থেকে উঠে কী খারাপ যে লাগছে কী বলবো। হঠাৎ একটি কবিতার লাইন মনে এলো: "লিখলুম বিচিত্রা দাশকে, বহুদিন দেখিনি আকাশকে।"' কবিতাটি পরে অরুণকুমার সরকার সম্পূর্ণ করেছিলেন, তা বিখ্যাতও হয়। অরুণের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আলোক সরকার প্রত্যয়সহ জানিয়েছিলেন, 'লিখলুম বিচিত্রা দাশকে বহুদিন দেখিনি আকাশকে'-র অব্যবহিত পরবর্তী পঙ্‌ক্তি দু'টি আমার ফিরতি চিঠিতে আমি নাকি যোগ করে দিয়েছিলাম, বাকিটুকু অরুণের স্বকীয় সংযোজন; সেই পঙ্‌ক্তিদ্বয়, 'উষ্ণ তোমার স্মৃতি তবুও/আমার এ হৃদয়ের ফ্লাস্কে'। তবে এই ব্যাপারে আমার কোনও স্মৃতিই নেই : আলোকের সাক্ষ্যই আমার পাপাচারের কাহিনীর দায় বহন করছে।

ঢাকা থেকে কলকাতায় বছরে একবারের বেশি আসা হতো না। থাকতাম রাঙা পিসির বাড়িতে টালা পার্কে। সেখান থেকে দু' নম্বর বাসে চেপে কলেজ স্ট্রিটে চলে আসা ; আড্ডা সেরে বারোটা-সাড়ে বারোটা নাগাদ ফিরে যেতাম নগরের উত্তরপ্রান্তে। বিকেল ছ'টা বাজলে ফের কলেজ স্ট্রিটে। সুরঞ্জনের ঘরে আড্ডা, ততদিনে সুরঞ্জনের নতুন ঘরসঙ্গী, মোনা, নরেন্দ্রনাথ নবিশ, অসমের এক সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত দারুণ শৌখিন যুবক, যাঁর চাকচিক্যের বহর অবলোকনে আমি প্রায় মূক হয়ে যেতাম। পরে সুরঞ্জনের দৌত্যে সেই নির্বাক পর্যায়ের অবসান ঘটে। সন্ধ্যাবেলা সুরঞ্জনের ঘরে জড়ো হতেন অরুণকুমার সরকার, সোমেশ আচার্য নামে অন্য-এক তরুণ, যিনি কমিউনিস্ট নেতা গোপাল আচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্র, আবদুল আজিজ নামে এক সাহিত্যরসিক ভদ্রলোক, যাঁর ওভারটুন হলের ঘরে 'পরিচয়' ও 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার জড়ো-করা সংখ্যা দেখতাম। আরও যাঁরা-যাঁরা আসতেন, দ্রুততার সঙ্গে প্রবেশ করতেন, দ্রুততার সঙ্গেই তাঁদের নির্গমন ঘটতো, হয়তো মাত্র একটি চতুর বাক্যবন্ধ উচ্চারণ করে, কিংবা একটি সদ্য-শেখা ইংরেজি শব্দের প্রসাদ বিতরণ করে। একটা সময়ে যখন ওই ছোটো ঘরে স্থানসংকুলান হতো না, একতলায় ভবানী দত্ত লেনের গা-ঘেঁষা ওয়াই এম সি এ রেস্তোরাঁয় আমাদের অবতরণ। আমাদের পছন্দের বেয়ারাটির নাম এবং চেহারা এখনও মনে ভাসছে, নিতাই। নিতাই আমাদের সবাইকে চা পরিবেশন করতো, কিন্তু নানাজনকে পরিবেশিত পেয়ালার পরিমাপে উল্লেখযোগ্য তারতম্য: বড়ো আকার, মেজো আকার, খুদে আকার। সুরঞ্জন নিতাইকে কাছে ডেকে ফিসফিস করে প্রশ্ন ছুঁড়তো, 'ভাই, আসল কথাটি বলো তো, ছোটো পেয়ালাগুলি বড়ো পেয়ালাগুলির পুত্রসন্তান, তাই না?'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে রেস্তোরাঁয়, আলো ঝলমল। কিন্তু দুটো প্রায়-বলাই-চলে ফরাশি জানালা, তাদের ওপাশে ভবানী দত্ত লেন, ঘুটঘুটে অন্ধকার। যতদিন ওভারটুন হলে গেছি,

বা ওয়াই এম সি এ-র রেস্তোঁরায় ঢুকেছি, চোখ ওদিকে গেলেই ভবানী দত্ত লেনের অন্ধকারে-ঠাসা চেহারা, যেন কোনও প্রগাঢ় রহস্য সেই গলিকে মুড়ে রেখেছে। বহুদিন মনে-মনে চিন্তা করেছি, রেস্তোরাঁ পেরিয়ে আরও দশ-পনেরো গজ গেলে যদি একটি ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ সেই অন্ধকারকে আরও প্রগাঢ় করে পড়ে থাকতো, তা হলে সেই পিস্তলবিদ্ধ শব নিয়ে একটি চমৎকার গোয়েন্দাকাহিনী রচনা করা সম্ভব। পরবর্তী কালে বন্ধু-সখা-সহচর অনেককে প্রলোভিত করার চেষ্টা করেছি এমনধারা একটি কাহিনী ফাঁদতে। মনে হয় পৃথিবীতে রোমাঞ্চবিলাসী মানুষের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান, কেউই আমার উপরোধ তেমন গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেননি। দু'-একজন হয়তো বলেছেন, তুমি প্রথম একটা-দুটো কিস্তি শুরু করো না কেন, তারপর আমরা দায় গ্রহণ করবো। পৃথিবীতে আলস্যেরও তো শেষ নেই, আমার আর অকুতোভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া হয়নি।

ওয়াই এম সি এ রেস্তোরাঁয় আড্ডা যখন জমাট হতো, তখন হইহই করে কফি হাউসে নিজেদের স্থানান্তরিত করতাম। অ্যালবার্ট হলের তখন এখনকার মতো জরাজীর্ণ অবস্থা নয়, সিঁড়িগুলিও এত ভাঙাচোরা তোবড়ানো ছিল না, সিঁড়ির পাশের দেওয়াল তাম্বুলচর্চার অঢেল সাক্ষ্য বহন করতো না। কফি হাউসের ভিতরে এক আলাদা জগৎ, উজ্জ্বল পরিবেশ। সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই কফির মাদকতা-মাখানো গন্ধে নিজেদের জারিয়ে নেওয়া। সবুজ রঙের নিচু বেতের চেয়ার, চারটি-পাঁচটি করে প্রতিটি টেবিলের সংলগ্ন। এখন ঠিক মনে পড়ছে না, তিন আনা দিলেই হয়তো এক পেয়ালা কফি হাজির হতো, ঠাণ্ডা কফির জন্য সম্ভবত পাঁচ আনা, আইসক্রিম কফির জন্য আট আনা। বেয়ারাদের পোশাক সুশুভ্র, কালিমাবিহীন : মাথায় পাগড়ি, পাগড়ির পুরোভাগে তুঙ্গ হয়ে ওঠা উষ্ণীষ। ওরা আমাদের মুখ চিনতো, যেহেতু ঘণ্টার পর ঘণ্টা সকাল-দুপুর-বিকেল আমাদের কাটতো ওখানে। সকাল সাড়ে সাতটায় বউনি করে আসতাম, কফির সঙ্গে অমলেট, মাখন-মাখা রুটি, নয়তো প্লাম কেক। দুপুর একটু গড়ালে হয়তো চপ কিংবা কাটলেট। বিকেলে-সন্ধ্যায় কফির সঙ্গে উদরপূর্তির অন্য কোনও ব্যবস্থা। মেরিডিথ স্ট্রিটের কফি হাউসের সঙ্গে তখনও আমাদের পরিচয় হয়নি, তখনও আমরা কলেজ স্ট্রিটকেন্দ্রিক। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ঝেঁটিয়ে ছাত্ররা আসতেন, একজন-দু'জন দুঃসাহসী ছাত্রীও। কবিরা আসতেন এন্তার, লেখক, সম্পাদক, একগুচ্ছ রাজনীতিবিদ। অন্য কিছু মানুষ, যাঁরা বাউন্ডুলেও হতে পারেন, মস্ত বৈজ্ঞানিকও হতে পারেন, অবিন্যস্ত চুল, এলোমেলো পোশাক, প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। সিঁড়ি দিয়ে আর এক দফা উঠে তেতলায় তথানামাঙ্কিত ব্যালকনি, কফির দাম ওখানে দ্বিগুণ, যাঁরা নিভৃতে প্রেমচর্চা করতে চান, তাঁরা যেতেন। আরো যেতেন কিছু-কিছু এলেমদার ব্যক্তি। তাঁদের সম্বন্ধে গভীর ঘৃণা পোষণ করা হতো : আমরা নিচের মহলে, ওঁরা উপর মহলে, সুতরাং পরিত্যাজ্য।

লম্বা ফরসা চমৎকার চেহারার একটি বেয়ারার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। গর্বের সঙ্গে তার উষ্ণীষ অন্য সবাইয়ের উষ্ণীষ ছাড়িয়ে যেত, ছাপিয়ে যেত, তাকে সার্জেন্ট মেজর বলে অভিহিত করতাম। বহু বছর বাদে একদিন পুনে শহরে বেকার দ্বিপ্রহরে ঘুরতে-ঘুরতে ওখানকার কফি হাউসে হাজির হয়েছি, হঠাৎ একজন এসে সেলাম ঠুকলো। তাকিয়ে দেখলাম, আমার সার্জেন্ট মেজর, কলকাতা থেকে পুনেতে বদলি হয়ে এসেছে। ঝটকা মেরে চেয়ার থেকে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরলাম, আত্মীয়তা ও প্রীতিবোধ অন্তরে শিহরণ তুলে দিল।

কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে আমরা কেউ ঘড়ির দিকে তাকাতাম না। অথচ একটা সময়ে,

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ, উঠতেই হতো। উঠতেই হতো, কারণ মোটাসোটা ম্যানেজারমশাই, বোধহয় জনৈক চৌধুরী, পরনে টাই-সমেত বিদেশি পোশাক : আমরা ও আমাদের মতো যে-ক'জন অবিবেচক ছিলাম, সময়ের অনুশাসন উপেক্ষা করে তখনও গ্যাঁট হয়ে বসে, তাদের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে করুণ নয়নে তাকাতেন। তাঁর প্রতি দয়াবশতই আমরা শেষ পর্যন্ত নিষ্ক্রান্ত হতাম।

এই চৌধুরীমশাইকে নিয়েও সুরঞ্জন সরকারের একটি বিশেষ বাঁদরামির কথা মনে পড়ছে। সেটা সাতচল্লিশ সালের শেষের দিক, কফি হাউসের উত্তর দেওয়ালে গান্ধিজীর একটি প্রতিকৃতি টাঙানো। তার পাশে অন্য একটি প্রতিকৃতিও : ভারতীয় কফি বোর্ডের যিনি সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন, সম্ভবত তাঁর। কোনও এক প্রভাতকালে হঠাৎ লক্ষ্য হলো দুটি ছবিই উধাও; হয়তো নতুন করে বাঁধাতে দেওয়া হয়েছে, কিংবা অন্য কোনও কারণে। সুরঞ্জন পায়ের তলায় ঘাস গজাতে দিতে রাজি নয়, তক্ষুনি কারও কাছ থেকে একটি শাদা কাগজ চেয়ে নিয়ে খসখস করে ম্যানেজারকে চিঠির খসড়া রচনা : 'মহাশয়, আমরা আজ এটা দেখে হতচকিত এবং বিস্ময়ে বিস্ফারিত, জনৈক শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির ছবির পাশে ভারতীয় কফির জনকপ্রতিম মহামহিম মহানাত্মা শ্রীযুক্ত অমুকের যে অপার্থিব প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছিল, যে-প্রতিকৃতির উদ্দেশে আমরা প্রতিদিন সকালে-দ্বিপ্রহরে-অভিভূত সন্ধ্যায় স্বগত প্রার্থনা নিবেদন করতাম, সেই ছবি কোনও অজ্ঞেয় কারণে অপসারিত হয়েছে। এরকম ভয়ঙ্কর ঘটনাচক্রে আমরা বিমূঢ়। কোন দুশমন-শয়তানদের ষড়যন্ত্রে এই পাপকর্ম সাধিত হয়েছে তা জানবার জন্য আমরা অবিলম্বে লালবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। কিন্তু তাতে আপনার দায়িত্ব বাষ্পে পরিণত হতে পারে না। আমরা নিম্নলিখিতগণ আপনার কাছে দাবিসনদ পেশ করছি। এই চিঠি পাওয়ামাত্র পত্রপাঠ পলমাত্র বিলম্ব না করে আপনি যদি ভারতীয় কফির মহান জনকের প্রতিকৃতি দেয়ালে ফিরিয়ে না দেন, তা হলে আমরা কফি হাউসের প্রতিটি টেবিল চূর্ণ-বিচূর্ণ করবো, প্রতিটি চেয়ার ভস্মীভূত করবো এবং আপনার ঝাঁ-চকচক বর্তুল মস্তকে বাইশটি তৈলাক্ত লাঠির বাড়ি মারবো'। সব শেষে পাঠোদ্ধার-অসম্ভব কয়েকশো স্বাক্ষর। পরদিন সন্ধ্যাবেলায়ই মহাত্মা গান্ধির প্রতিকৃতি দেওয়ালে ফিরলো, ভারতীয় কফির জনক চিরকালের জন্য বিসর্জিত হলেন।

সুরঞ্জনের দুর্ধর্ষ উপস্থিতপ্রতিভার অন্য একটি কাহিনী : সম্ভবত মুরারি সাহার বিবাহ, বিবাহবাসর কলকাতার উত্তর সীমান্তে, দক্ষিণ কলকাতা থেকে এক ভাড়া-করা বাসে চেপে বন্ধু-বোঝাই বরযাত্রী দল, সেই বাসে চেপেই মধ্যরাত্রিতে বিয়েবাড়ি থেকে ফেরা, চালক রাস্তা সংক্ষেপ করতে গিয়ে ক্যানাল ইস্ট রোড ধরেছে, হঠাৎ বাস বন্ধ হয়ে গেল, অনেক সাধ্যসাধনাতেও চালু করা সম্ভব হলো না, রাত দেড়টা পেরিয়ে দুই ছুঁইছুঁই করছে। এমন মুহূর্তে সুরঞ্জন খালপাড়ে চড়ে-বেড়ানো দু'টি হৃষ্টপুষ্ট মহিষ হ্যাট-হ্যাট করে তাড়িয়ে নিয়ে এসে বাসের সামনে জুড়ে দিল, তারপর চালকের আসনে বসে বিকট শব্দে ইঞ্জিন চালালো, ইঞ্জিনগর্জনে উদভ্রান্ত মহিষদ্বয়ের দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে শুরু করা; আর একটু হলে বরযাত্রী সম্প্রদায়ের বাগমারি খালের পূত জলে সলিল সমাধি ঘটতো।

সেই বছরগুলিতে কফি হাউসে আমাদের টেবিলে যাঁরা জড়ো হতেন, সুরঞ্জন সরকার, অরুণকুমার সরকারের বাইরে, তাঁরা অবশ্য অনেকেই বর্তমানে বিখ্যাত। মনে পড়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এক সন্ধ্যায় জমাট-হয়ে-বসা আমাদের তাঁর সেই দীর্ঘ কবিতা প্রথম পড়ে শুনিয়েছিলেন, 'আর কতকাল তা হলে কবিতা লিখতে বলো, আর কতকাল

লেখা-লেখা খেলা খেলতে বলো'। আতোয়ার রহমানের সঙ্গেও আমার বোধহয় কফি হাউসেই প্রথম আলাপ। তাঁকে তার কয়েক মাস আগে ময়মনসিংহে এক ছাত্র সম্মেলনে প্রথম দেখেছিলাম। তিনি আর আমি দুই বিপরীত জোটে; দুই পক্ষের মধ্যে কিছু দাঙ্গা-মারামারিও হয়েছিল। কফি হাউসের মাতাল পরিবেশে সে-কথা আমরা দু'জনেই ভুলে যাওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলাম। আসতেন শিল্পী মণীন্দ্র মিত্র, দার্শনিকমনা ত্রিদিব ঘোষ, মানবেন্দ্রনাথ রায়-ভক্ত বেহালার সমরেন রায়, কবি ও জয়প্রকাশ নারায়ণ-আসক্ত আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, সদ্য-বিশ্ববিদ্যালয়-থেকে-বেরুনো ঝকঝকে চেহারার মুরারি সাহা, যিনি কয়েক মাস আগে 'শতাব্দী' নামে একটি সাহিত্যসংকলন প্রকাশ করে নাম কুড়িয়েছেন এবং যাঁর বিবাহঘটিত সুরঞ্জন-কাহিনী এইমাত্র বর্ণনা করেছি। আসতেন সুহৃদ রুদ্র, তাঁর সম্পাদিত 'দ্বন্দ্ব' পত্রিকা তখন যথেষ্ট আলোচিত। নিউজপ্রিন্টে ছাপা হতো, কিন্তু যথেষ্ট আকর্ষণীয় মালমশলা থাকতো প্রতি সংখ্যাতেই। এখন আর মনে আনতে পারি না, 'যাযাবর'-এর 'দৃষ্টিপাত' 'দ্বন্দ্ব'তে ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছিল কিনা। তবে তখন 'দৃষ্টিপাত' নিয়ে যথেষ্ট শোরগোল ওই পত্রিকা এবং তার বাইরেও যে হয়েছিল তাতে ভুল নেই। শুনলে এখন মজা লাগবে, মাঝে-মাঝে সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মশাইও তাঁর পারিষদবর্গসহ কফি হাউসের এক কোণে আড্ডা জমাতেন। আড্ডায় মশগুল হতেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দুই অধ্যাপক, ধীরেন্দ্রনাথ সেন ও নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য; প্রথমজন গোড়ার দিকে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের সম্পাদক ছিলেন; মার্কস বাদী প্রত্যয়ের জন্য তাঁকে সরে যেতে হয়, কিংবা নিজেই সরে যান। নির্মলবাবুও প্রথম দিকে কমিউনিস্ট বন্ধুবান্ধব ও ছাত্রদের পছন্দ করতেন; চীন সংকটের পর ঝাঁকের কই কংগ্রেসের ঝাঁকে ফিরে যান। এঁরা দু'জনেই অত্যন্ত ছাত্রবৎসল, প্রায়ই পয়সা খরচ করে ছাত্রদের কফি খাওয়াতেন। নির্মলবাবুর ছেলে সব্যসাচী, বাপ্পা, কুড়ি-পঁচিশ বছর বাদে আমার খুব কাছের মানুষ হয়ে যায় : তার বাবা যে-ক্ষুদে অস্টিন গাড়ি চালিয়ে শহরময় ঘুরতেন, তা নিয়ে ওর সঙ্গে প্রচুর স্মৃতিপরিক্রমা করেছি।

কফি হাউসে আড্ডার প্রসঙ্গে সমসাময়িক অন্য একটি পত্রিকার উল্লেখ না-করলে অন্যায় হবে। দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যালের 'অচলপত্র' স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠে স্ফুলিঙ্গের মতোই মিলিয়ে যায় কয়েক বছরের ব্যবধানে। তাঁর সহচররা, যেমন ব্রহ্মদেশ-ফেরত বারীন দাশ, কফি হাউসের বাঁধা খদ্দের ছিলেন না, মাঝে-মাঝে আসতেন। দীপ্তেন সান্যালের কলমে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ফল্গুর মতো সাহজিকতায় বইতো। তাঁর একটি pun, আমার বিবেচনায়, অমরত্বের অধিকারী। এখন আর বিশেষ কারও মনে নেই, বুদ্ধদেব বসু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে বাংলা সাহিত্যের একটি ক্ষুদ্রায়তন আলোচনা পুস্তক রচনা করেছিলেন : An Acre of Green Grass। দীপ্তেন্দ্রকুমারের 'অচল পত্র'-এ প্রকাশিত মন্তব্য : আসলে এক একার ঘাস, বুদ্ধদেব বসু-র একার গ্রাসের পক্ষে, অনেকটাই।

আরও অজস্র নাম আউড়ে যেতে পারি। কিন্তু ভয় হয়: হয়তো কারও-কারও নাম বিস্মরণহেতু বাদ পড়ে যাবে, যা অক্ষমার্হ হবে। শুধু একজনের কথা বলি যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় একদা প্রথম হয়েছিলেন, পরে আর তেমন যুত করতে পারেননি। ইংরেজি সাহিত্যে বি. এ., এম. এ পাশ করে বেসরকারি কলেজে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন, সেই সঙ্গে কিছু অপেশাদার রাজনীতিচর্চাও। তাঁর বিষয়ে প্রবাদ শুনেছিলাম, তাঁকে কোনও পত্রিকা থেকে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'সৃষ্টি' উপন্যাসটি আলোচনা করতে বলা হয়েছিল। তিনি যে-আলোচনা লিখেছিলেন তার অতি বিখ্যাত প্রথম পঙ্‌ক্তি :

'প্রথম দর্শনেই সঞ্জয় ভট্টাচার্য আমাকে হতাশ করেন, যদিও আমার নিজের চেহারা প্রায় অমিয় চক্রবর্তীর মতো'। প্রায় ভুলেই যাচ্ছিলাম, অমিয় চক্রবর্তীও কফি হাউসে মাঝে-মাঝে দেখা দিতেন, খানিকক্ষণ বসতেন, তারপর উঠে যেতেন। কে না জানে তাঁর প্রথম প্রেম ছিল কফি নয়, চকোলেট। প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের ঘন-ঘন চকোলেট বিলোতেন। গুজব ছিল, শ্রীমতী হৈমন্তী দেবী অমিয়বাবুকে কড়া শাসনে রাখতেন, বাড়িতে বেশি মিষ্টান্ন জাতীয় পদার্থ খেতে দিতেন না। অমিয়বাবু তাই ফ্লুরি থেকে পেস্ট্রি কিনে পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে ট্রামে চেপে খেতে-খেতে এলগিন রোডের ফ্ল্যাটমুখো হতেন প্রতিদিন বিকেলে।

অনেক সখ্যের স্থাপত্য শুরু হয়েছিল কফি হাউসে, অনেক প্রেমের প্রথম উচ্চারণের গুঞ্জরণ, অনেক রাজনীতি তথা বিপ্লবের স্বপ্নউন্মীলন, অনেক বিশুদ্ধ আড্ডায় বহুজনের ভেসে যাওয়া। কত কবিতা যে লেখা হয়েছে কফি হাউসের টেবিলে বসে ইয়ত্তা নেই। একটি বিশেষ কবিতার কথা মনে পড়ে, ইলাস্ট্রেটেড উইকলি পত্রিকার পৃষ্ঠার মার্জিনের ফাঁকে-ফাঁকে অরুণকুমার সরকারের কবিতা 'মালবিকা হালদারকে মনে পড়ে বর্ষার সন্ধ্যায়, ব্রিস্টলে টেম্পলে মন্টিকার্লোর প্রেক্ষিতে'। কবিতাটির আদি পাঠ অবশ্য 'সুরঞ্জন সরকারকে মনে পড়ে' ইত্যাদি। সুরঞ্জনের কাস্টমসে চাকরি, ওভারটাইম খাটলেই প্রচুর টাকা, দুঃখী-দুঃখী বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে মাঝে-মাঝে তার ব্রিস্টলে-মন্টিকার্লোতে চংক্রমণ। সুতরাং আদি পাঠ বহাল রাখলেও অরুণের কাব্যকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে ফৌজদারিতে চালান দেওয়া সম্ভব হতো না।

বছরে একবার-দু'বার কলকাতা আসতাম, কফি হাউসকেন্দ্রিক আড্ডার গহনে ডুবে যেতে, কিন্তু, একটু আগে যা বলেছি, সব মিলিয়ে এক সঙ্গে আট-দশ দিনের বেশি কলকাতাবাস হতো না। তবে উন্মাদনায় ভেসে যাওয়ার পক্ষে তাই-ই যথেষ্ট। কোনও-কোনও দিন অরুণকুমার সরকারকে নিয়ে কবিতাভবনে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। আমার সন্দেহ, তখন কবিতাভবনের অন্তত সাময়িক ভাঙা হাট। সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এমনকি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ও যাওয়া-আসা ছেড়ে দিয়েছেন, সম্ভবত বুদ্ধদেবের সঙ্গে রাজনৈতিক মতামতের আড়াআড়ির কারণে। বিষ্ণু দে-ও অনিয়মত, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে তাঁর নিজের আড্ডাও তো ততদিনে জমে উঠেছে। এরই কিছুদিনের মধ্যে 'বৈষ্ণব'-'বৌদ্ধ' দুই সম্প্রদায়ের কাব্যিক কোদল তুঙ্গে। এটি একটি রহস্যময় অধ্যায়, যার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির 'জনযুদ্ধ' নীতি ঘোষণাই মনে হয় একমাত্র দায়ী ছিল না। তেতাল্লিশ সালের প্রত্যন্ত পর্যন্ত সমর সেন-মঙ্গলাচরণরা 'কবিতা' পত্রিকায় কবিতা পাঠিয়েছেন, সমালোচনা লিখেছেন। কিছু ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভুল-বোঝাবুঝি সম্ভবত বিনিময়-প্রতিবিনিময়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্বভাবছন্দোচাতুর্য সম্পর্কে বুদ্ধদেবের মুগ্ধতাঘোর কোনওদিনই কাটেনি। 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনে অরুণ মিত্রের 'লাল ইস্তাহার' ঢোকানো নিয়ে প্রকাশক বুদ্ধদেব বসু প্রচুর অসুখী, যদিও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপরোধে অন্য সম্পাদক আবু সয়ীদ আইয়ুব তা মেনে নিয়েছিলেন। অনুমান করা সম্ভব, একটু-একটু করে রাজনৈতিক বিশ্বাসের তফাতের সঙ্গে ব্যক্তিগত ঝোঁকের দূরত্ববৃদ্ধির মিশ্রণ ঘটে। অথচ ওই পর্বেও প্রতিভা বসু-সম্পাদিত 'বৈশাখী' সংকলনে দিনেশ দাসের সেই চতুর কবিতা মুদ্রিত হয় : 'দক্ষিণ পথে মেলে যদি দক্ষিণা, ভেবে দেখো তবু সেই পথ ঠিক কিনা'। তবে আর কয়েক বছর বাদেই বুদ্ধদেব বসু সম্পূর্ণ দক্ষিণপন্থী বনে গেলেন, কলকাতাস্থ পুরনো

সুহৃদ্‌দের মধ্যে শুধু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর সঙ্গে রইলেন। পরবর্তী যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের আগমন বেশ কিছু কালক্ষয়ের পর। প্রাক্তন অনুরাগীদের মধ্যে একমাত্র মণীন্দ্র রায়কেই কখনো-সখনো দেখতাম, দ্বিতীয়া স্ত্রী তপতী চট্টোপাধ্যায়-সহ। তাঁর অকালমৃতা প্রথম স্ত্রী রমা গোস্বামীকে নিয়ে রচিত বুদ্ধদেবের সেই শোকগাথা : 'ভুলিবো না: এত বড়ো স্পর্ধিত শপথে জীবন করে না ক্ষমা, তাই মিথ্যা অঙ্গীকার থাক': ছাত্র ফেডারেশনের সেই উচ্ছল-উৎসাহী সদস্যা রমা গোস্বামীকে আর ক'জনই বা এখন মনে রেখেছেন?

বুদ্ধদেবের সমস্ত স্নেহবর্ষণ তখন প্রধানত নরেশ গুহকে ঘিরে। পুরনো বন্ধুরা খসে গেছেন, নতুন-কোনও অন্তরঙ্গ পরিচয় সূচিত হয়নি, মাত্র কয়েকজন ছাত্র, কয়েকজন ভক্ত-পাঠক, কয়েকজন তরুণ কবিযশোপ্রার্থী। আমরা চড়াও হবার আগে কয়েক মাস গল্পলেখক পৃথ্বীশ রায়চৌধুরীর আনাগোনা ছিল, ক্ষয়রোগে সে অচিরেই মিলিয়ে যায়। কালীঘাটের গলিতে তার অপরিসর ঘরে মাঝে-মাঝে গেছি। পৃথ্বীশ একই সঙ্গে ছবি আঁকতো, গল্প লিখতো। কোনও অজ্ঞাত কারণে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছেদ হয়েছিল, তা রাজনীতিঘটিত নয়। ওই তরুণ, যতদিন তার সঙ্গে কথা বলেছি, আমার মনে হতো, সে যেন জানে তার দিন শেষ হয়ে আসছে, সব সময় একটি বিষাদের আবরণ তাকে ঘিরে। হয়তো উল্লেখ করা প্রয়োজন, পৃথ্বীশ সম্পর্কে অরুণকুমার সরকারের মাসতুতো ভাই।

মিমি-রুমি তখনও ছোটো, পাপ্পা মাত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে। শিশুদের বাইরের বারান্দায় খুব বেশি বের হতে দেখতাম না ; প্রতিভা বসু মাঝে-মাঝে আসতেন। উপর থেকে কখনও-কখনও নামতেন অজিত দত্ত মহাশয়ের স্ত্রী, আমরা যাঁকে বেবিদি সম্বোধন করতাম। অজিতবাবু নিজে কিন্তু আদৌ নামতেন না। ততদিনে বুদ্ধদেব অজিতবাবুকে নিয়ে তাঁর বিলাপোক্তি লিখে ফেলেছেন : 'ছিলে তুমি ওস্তাদ ঘুড়ি উড়িয়ে/ছন্দের বাঁকাচোরা মোড় ঘুরিয়ে...'। এমনটাই বোধহয় হয়, সেই আট বছরের বন্ধু আমি আর নয়নকুমারের মতো। ঢাকায় প্রায় স্কুলপর্ব থেকে বুদ্ধদেবের সাহিত্যসখা অজিত দত্ত। অজিত দত্তর তুতো সম্পর্কের ভাই প্রভু গুহঠাকুরতা; এঁদের সম্মিলিত সৃষ্টি 'প্রগতি' পত্রিকা। অজিতবাবু 'কবিতা'র উন্মেষমুহূর্তেও ছিলেন, কিন্তু কোথায় যেন একটি প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়ায়। দুই বাড়ির ছেলেমেয়েরা হরিহরআত্মা, অবিরল ২০২ নম্বরের দোতলা-তেতলা ছুটোছুটি করছে। কবিদের স্ত্রীরাও নৈকট্যে নিবিড়। কিন্তু কবিতা ভবন থেকে 'বৈশাখী' বার্ষিকী যেহেতু বেরোচ্ছে, তার জবাব দিতেই কি অজিত দত্ত নিয়মিত 'দিগন্ত' বার্ষিক পত্রিকা শুরু করলেন? ঠিক জানি না। তবে ওই ক'বছর, ছেচল্লিশ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তী পাঁচ-ছ' বছর, কবিতা ভবনের নিয়মিত সান্ধ্য অতিথি নিছকই নরেশ গুহ অরুণকুমার সরকার, ঢাকা থেকে কখনও-কখনও আমি, পরে চাইবাসা থেকে নিরুপম চট্টোপাধ্যায়। অবশ্যই আসতেন নিউ থিয়েটার্সের শিল্প-নির্দেশক সৌরেন সেন। সৌরেনবাবু অধিকাংশ সময় একপাশে চুপচাপ বসে থাকতেন, আমরাই আসর জমাতাম। আমাদের মতো তরুণ ও সদ্যযুবাদের কণ্ঠস্বর শ্রদ্ধাবিনীত থাকতো, শুধু বুদ্ধদেবই মাঝে-মাঝে তর্ক প্রসঙ্গে উচ্চগ্রাম হতেন, কিংবা আমাদের কোনও রসিকতায় হাসিতে ফেটে পড়তেন। আরও আসতেন, হয় ঢাকা থেকে বা পরে দিল্লি বা আলিগড় থেকে, 'প্রগতি'র পুরনো বন্ধুরা, মন্মথনাথ ঘোষ, পরিমল রায়, অমলেন্দু বসু। আমি সে সময় আকাট বাঙাল, আমার শিক্ষকদের সমাগমে একটু ভরসা পেতাম।

নরেশ অবশ্য তখনও পর্যন্ত দ্বিরাচারী। বুদ্ধদেব বসুর প্রতি যেমন সর্বসমাচ্ছন্ন ভক্তি, সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষক অমিয় চক্রবর্তী সম্পর্কেও। অবশ্য রিপন কলেজে

নরেশ-অরুণ-নীরেন-বীরেন এঁদের সবাইকেই বুদ্ধদেব পড়িয়েছেন। প্রায়ই বলতেন, বীরেনের যে-প্রতিভার প্রতিজ্ঞা, ওর আরও বেশি করে কবিতা লেখা উচিত। ১৯৫০ সালে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কবিতা'য় প্রকাশিত সেই কবিতা, 'মার্চেন্টের মারে নেই সেই সব খুঁত', বুদ্ধদেব চেঁচিয়ে পড়ে প্রায় পাড়া জড়ো করে ফেলেছিলেন। তাঁর পক্ষে হতাশাব্যঞ্জক, আমাদের কারও-কারও পক্ষে মস্ত হর্ষদ্যোতক, বীরেন কিছুদিনের মধ্যেই আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে অজস্র কবিতা লিখতে শুরু করলেন, সে-সব কবিতা রাজনৈতিক আদর্শে আগাগোড়া লেপা; বুদ্ধদেব ছাত্রের বিপথগামিতায় মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে পরিচয়সূত্রেই তাঁর পরিবারস্থ অন্যদের সঙ্গে আলাপ। বিষ্ণু দে'র পরিবারের সঙ্গে ঠিক তার উল্টো। মিমি-রুমিদের সঙ্গে চেনা-জানার বেশ-কয়েক বছর পর বিষ্ণুবাবুর দুই দুহিতা, ইরা, রুচিরা, ও তারা, উত্তরা, আমার নৈকট্যের বৃত্তে উদিতা; ওঁদের মধ্যবর্তিতা ও আগ্রহেই আমার বিষ্ণুবাবু ও প্রণতিদির কাছাকাছি আসা।

মিমি-রুমিরা একবার কবিতাভবনের ভিতরের উঠোনে মঞ্চ খাটিয়ে বোধ হয় 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় করেছিল। রুমির অভিনয় আমার কাছে অতি চমৎকার লেগেছিল, পরে কিন্তু মিমি একটি-দু'টি চলচ্চিত্রে নায়িকা সেজে নেমেছে, রুমি ওই পথ মাড়ায়নি। কেন মাড়ায়নি, তা নিয়ে এখনও আমার দুঃখবোধ।

ইরা এখন গাব্দা-গোব্দা গৃহকর্ত্রী, শাশুড়ি মা ও ঠাম্মা, পুত্রবধূ রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে আমাদের মুগ্ধ করে, ইরা নিজেও এখন রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনা-অনুভাবনায় তদ্‌গতপ্রাণ। তবে ওকে একটি কথা মনে করিয়ে দিয়ে প্রায়ই খ্যাপাই : এক সন্ধ্যায় গোলাম মহম্মদ রোডের বাড়িতে বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে গল্প করে বেরিয়ে আসছি, দেখি বছর দশেকের ইরা, ফ্রকবতী, কাকে মস্ত জ্ঞান দিচ্ছে, 'রবীন্দ্রনাথকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না, তাঁর আগাপাশতলা ন্যাকামি'।

১৯৪৮ সাল থেকেই আমার রাজনৈতিক মতিগতি বুদ্ধদেব বসু-নরেশ গুহদের প্রতীপ মেরুতে ভ্রাম্যমাণ। বিষ্ণুবাবু ততদিনে 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকার সঙ্গে নিজেকে গভীরভাবে জড়িয়েছেন, রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে যে-পত্রিকা আমার অলিন্দবর্তী। সুতরাং ওই আপাত-ভিন্ গোয়ালে ভিড়ে যেতে তেমন মনঃসংকটে ভুগতে হয়নি। মজা লাগছে এটা মনে করে, কাছাকাছি সময়ে 'সাহিত্যপত্র'-এ বিষ্ণুবাবু আমার একটি কবিতা খুব খুশি মনে ছাপিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে 'ফরাশি অনুই'-র সঙ্গে 'কনুই'-র মিল ছিল।

তা হলেও, না বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে, না নরেশের সঙ্গে, ব্যক্তিগত সম্পর্ক তো ঘোচবার নয়। তাঁরা দু'জনেই তখন কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডম-এর গভীর অনুরাগী, ব্যক্তিস্বাধীনতা নিয়ে সদা চিন্তিত, আমার সঙ্গে প্রায়ই লম্বা তর্ক। নরেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেই একটি কাহিনী এখানে বিবৃত করছি। সম্ভবত উনপঞ্চাশ সালের দোলের দিন। নরেশের বাসস্থান তখন পাইকপাড়া-সংলগ্ন ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে এক গলির একটি প্রায়ান্ধকার খুপরিতে। ভোরবেলা আমি ওখানে হাজির, একটু বাদে দু'জনে হেঁটে-হেঁটে বি টি রোড ধরে শ্যামবাজারের দিকে এগোচ্ছি, উদ্দেশ্য ওখান থেকে বাস ধরে বালিগঞ্জগামী হবো। টালা ব্রিজ থেকে সানুদেশে পৌঁছুতেই দেখি জটলা। এক দঙ্গল ছেলে হাতে আবির-পিচকিরি নিয়ে দোলোৎসবে মেতেছে। আমাদের দেখে তারা প্রবল উৎসাহী : 'আসুন দাদা, একটু হয়ে যান'। আমি দ্বিরুক্তি না-করে আত্মসমর্পণ করলাম, দুই গালে একটু রঙের চাপড় মেরে আমাকে মুক্তি দেওয়া হলো। কিন্তু নরেশ অন্য ধাতুতে গড়া,

ব্যক্তিস্বাধীনতার সংগ্রামে জাগ্রত সৈনিক, ব্যক্তিস্বাধীনতা নিয়ে, হোলি না খেলবার নাগারক অধিকার বিষয়ে, লম্বা বক্তৃতা ফাঁদলেন। ছেলেগুলির হাতে সময় কম, তারা মিনিটখানেক বক্তৃতা শুনে নরেশকে নিঃশব্দে চ্যাঙদোলা করে তুলে নিয়ে ঘোড়াকে-জল-খাওয়ানোর বাঁধানো আধারে রঙ গোলা ছিল, তাতে চুবিয়ে দিল। এই প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধান করছিলেন একজন, যাঁর মাথায় গান্ধি টুপি, ফরসা পাঞ্জাবি-পাজামায় রঙের ছিটেফোঁটাও নেই। একটি ছেলেকে জনান্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম : 'ভাই, ওঁকে রঙ দিচ্ছেন না কেন?' গম্ভীর জবাব পেলাম, 'উনি আমাদের ক্লাবের সেক্রেটারি।' নরেশ গুহ রঙিন জলে অবগাহনের পরেও তড়পাচ্ছেন। তাঁকে কোনওক্রমে বুঝিয়ে বলি, যে-রাজনৈতিক দল তাঁরই মতো ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করে, কমিউনিস্টদের ঘৃণা করে, এই ছেলেরা সেই দলেরই উগ্র সমর্থক, তাই তার খেদ করবার কোনও কারণ নেই। এই সময়েই কিন্তু নরেশ 'দুরন্ত দুপুর'-এর আশ্চর্য কবিতাগুলি লিখছেন, এমন মৃদু মর্মরের মতো কথা বলা, উদাস করে দেওয়া, বৈশিষ্ট্যের তুলনা মেলা ভার। কাছাকাছি কোনও বছর এক ঘোর বর্ষায় নরেশ আর আমি দু'-এক দিনের জন্য শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম, সেখানেই তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'দূরে এসে ভয়ে থাকি। সে হয়তো এসে বসে আছে...'র জন্ম। তাঁর অন্য এক কবিতার একটি চরণ মাঝে-মাঝে আমাকে তাড়া করে ফেরে : 'তোমার রক্তের মতো পবিত্র হবো, বলেছিলে'।

নরেশ গুহর সৌজন্যেই আমার দিলীপকুমার গুপ্তর সঙ্গে আলাপ। উৎসাহে সর্বদা টগবগ করছেন, মাথায় নানা মৌলিক চিন্তা কিলবিল করছে, সে সব চিন্তার ফলিত প্রয়োগের জন্য সদাব্যস্ত, সদাত্রস্ত, কার সাধ্য আটকায় ডি কে-কে। সিগনেট প্রেস টিকে রইলো না, তাই-ই সম্ভবত, আমার অন্তত সেরকম ধারণা, তাঁর অপেক্ষাকৃত অকালে চলে যাওয়ার কারণ। আতিথেয়তায় ভরপুর, ব্যবহারে অভিজাত, কাউকে কোনওদিন ব্যথা দিয়ে কথা বলেছেন, তা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। এক বিশেষ রাত্রির কথা মনে পড়ে। কোনও এক পঁচিশে বৈশাখে নরেশ, অরুণ এবং আমাকে সারারাত তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের গান শোনার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মস্ত রেডিওগ্রামে এক সঙ্গে আটটি-দশটি রেকর্ড চাপিয়ে দিচ্ছেন, রেকর্ডগুলি নিজের থেকেই ঘুরে যাচ্ছে, পূজার গান-প্রেমের গান প্রকৃতির গান, ঘণ্টায়-ঘণ্টায় গানের সারাৎসার পাল্টে যাচ্ছে; যখন কীর্তন শুনছি, উপর থেকে আমাদের জন্য রসের মিষ্টি আসছে, যখন খেয়াল-টপ্পা ধরনের গান, হয়তো কাবাব পরিবেশিত হচ্ছে, 'শরতে আজ কোন অতিথি'র সঙ্গে বড়ো মাপের সন্দেশ, যখন রঙ্গ ভরা কোনও গানের আমেজে ঘর ছেয়ে যাচ্ছে, আমাদের জন্য লেডিকেনির আবির্ভাব। ডি. কে-কে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যখন সিগনেট প্রেস থেকে নিষ্ক্রান্ত হলাম, পুবের আকাশে ছাব্বিশে বৈশাখের সূর্যের অস্ফুট-অর্ধস্ফুট আভা।

ছয়

যাঁরা আমার এই অতীত কণ্ডূয়ন কৃপা করে পাঠ করছেন, তাঁদের কেউ-কেউ সম্ভবত আশ্চর্য বোধ করবেন, এতক্ষণ পর্যন্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়নি বলে। আমার কৈফিয়ত অতি স্পষ্ট। তিরিশের-চল্লিশের দশকের যে-বাঙালি সাহিত্যিকদের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তাঁদের থেকে একটু পৃথগীকৃত আমার চেতনায়-মানসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান। দশ বছর বয়সে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার পৃষ্ঠায় মাস থেকে মাসান্তরে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' পড়তে শুরু করি, তারপর প্রতি পাঁচ বছর অন্তর, প্রতি দশ বছর অন্তর, ফিরে-ফিরে গেছি এই অসামান্য উপন্যাসের সান্নিধ্যে। প্রতিবারই মনে হয়েছে এর চেয়ে মহত্তর সৃষ্টি বাংলা গদ্যের ইতিহাসে নেই। আমার স্পর্ধা ক্ষমার্হ বিবেচিত হোক-না-হোক কিছু যায় আসে না, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসপ্রয়াসের ঊর্ধ্বেই আমি স্থান দেবো 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-কে: একই সঙ্গে ব্যাপ্তি, বিস্তার, গাম্ভীর্য, শ্লেষ, সমাজজিজ্ঞাসা, বিরহকাহিনী, মিলনকাহিনী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে যে-চিন্তা আমাকে অনবচ্ছিন্ন দীর্ণ করে রেখেছে: প্রতিভা কী করে এমন আপাতঊষর আপাতক্লিন্ন অপলিমাটিতে জন্মগ্রহণ করে? এটা তো ভোলা অসম্ভব, 'পুতুলনাচের ইতিকথা' রচনা যখন শুরু, তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স মাত্র ছাব্বিশ। একই সঙ্গে, পাশাপাশি, তিনি 'পূর্বাশা' পত্রিকার জন্য 'পদ্মানদীর মাঝি'-র কিস্তিও দাখিল করে যাচ্ছেন মাসিক পাঁচ টাকার কড়ারে। মানিকবাবু জীবনভর আর যদি অন্য-কিছু না-ও লিখতেন, তাঁর সৃষ্টিমহত্ত্ব সময়ের বিচারে খাটো হওয়ার আশঙ্কা থাকতো না, নেই-ও। অথচ ওই 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাতেই তারও কিছু আগেই প্রকাশিত হয়েছে 'আত্মহত্যার অধিকার' নামক গল্পটি। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অধঃপাতমুখী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নির্মম অবরোহণের গাথা, যার সমকক্ষ বাংলা সাহিত্যে আর কোন সৃষ্টি? মানিকবাবুর প্রসঙ্গে পরে আমাকে ফিরতেই হবে, হয়তো একাধিকবার, তা হলেও এখানে এই সামান্য মন্তব্য সংযোজন করে ঈষৎ চিত্তশান্তি পাচ্ছি। এই উল্লেখের পরোক্ষ একটি কারণ: ছেচল্লিশ সালের গোড়ার দিকে একদিন কবিতাভবনে ঢুকছি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তখনও বুদ্ধদেব বসু-প্রতিভা বসুদের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করেননি, বেরিয়ে আসছেন। অরুণকুমার সরকারের সঙ্গে সামান্য পরিচয় ছিল, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, নমস্কার-প্রতি নমস্কার। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেই-ই আমার প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ।

যে ক'টা দিন কলকাতায় থাকি, কবিতাভবনে নিয়মিত যাই, কখনও একা, কখনও অরুণকুমার সরকারের সঙ্গে। তবে কবিতা অতিক্রম করে অরুণের অন্য নেশা, মানবেন্দ্রনাথ রায় সম্পর্কে ঘোর মোহ। সেই সূত্রেই কি না জানি না, তাঁর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের রচনার প্রতিও সমান ঝোঁক। আমি মফস্বল থেকে প্রায় সকলেরই কবিতা পড়ি : বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ, অজিত দত্ত, সমর সেন, অমিয় চক্রবর্তী। 'এক পয়সায় একটি'

সিরিজের ষোলো পৃষ্ঠার কবিতাগ্রন্থ তখন বেরোতে শুরু করেছে। 'বনলতা সেন'-এ অন্তর্ভুক্ত সব-ক'টি কবিতা আমাদের মুখস্থ, ঘুমে-জাগরণে তারা তাড়া করে ফেরে, মনে হচ্ছিল যেন চমকে-বিস্ময়ে বুঁদ হয়ে যাওয়ার অন্তহীন পালা। সমর সেনের 'নানা কথা', কামাক্ষীপ্রসাদের 'রাজধানীর তন্দ্রা', অমিয় চক্রবর্তীর 'মাটির দেয়াল', আরও কত। অশোকবিজয় রাহার ক্ষীণকটি বইটিতে হঠাৎ এই পঙ্‌ক্তি আবিষ্কার করে বিস্ময়ের আনন্দে, না কি আনন্দের বিস্ময়ে, আমাদের প্রায় লাফিয়ে ওঠা : 'আ রে! আধখানা চাঁদ আটকে আছে টেলিগ্রাফের তারে'। বাংলাদেশের গ্রাম-ঘেঁষা মফস্বলে দিনযাপন না করলে পঙ্‌ক্তিটির ব্যঞ্জনা, আমার বিবেচনায়, বোঝা অসম্ভব। শ্রীহট্ট শহরের দুই কবিকে নিয়ে প্রায়ই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতাম : অশোকবিজয় রাহা ও প্রজেশকুমার রায়। দেশভাগের পর প্রজেশকুমার রায় শ্রীহট্টেই থেকে গেলেন; নিঃশব্দ থেকে নিঃশব্দতর, তারপর নৃশংসভাবে তাঁর নিহত হবার প্রায়-অগোচর বৃত্তান্ত। অশোকবিজয় শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা শুরু করেন; ওখানে একটি সুন্দর ছোটো বাড়ি তৈরি করে নাম রাখলেন 'সুরাহা'; আমৃত্যু নিখাদ কবিস্বভাব বজায় রেখেছিলেন।

ঢাকাতে ইতিমধ্যে আমাকে খুঁজে-পেতে আবিষ্কার করেছেন কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। তিনি বয়সে আমার চেয়ে অন্তত দশ বছরের বড়ো, কিন্তু অমন উদারচেতা গণতান্ত্রিক সুকোমল মানুষ কম দেখেছি। আমার কিছু-কিছু গদ্যরচনা পড়েছেন, কিছু-কিছু পদ্যপ্রয়াসও। বুদ্ধদেব বসুর কাছ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে আমার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপন। ভদ্রলোক সপ্তাহভর অতি প্রত্যূষে ট্রেনে চেপে নারায়ণগঞ্জ চলে যেতেন। সেখানে তাঁর বাঁধা কাজ; বেশি রাত্রে ফিরতেন। কিন্তু সপ্তাহান্ত সাহিত্যের জন্য বরাদ্দ। প্রায় প্রতি রবিবার আমি আমাদের বক্‌শিবাজার-এর বাড়ি থেকে তাঁর মালিটোলার বাসস্থানে হাজির। মাঝে-মাঝে অচ্যুত গোস্বামী এবং অজিত গুহর মতো আরও কেউ-কেউ আসতেন। কিরণশঙ্করের উৎসাহে 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'-এর বৈঠকে আমার যাওয়া শুরু হলো।

এই সময় থেকেই আমাদের জীবনানন্দ-সম্মোহনেরও সূচনা। 'কবিতা' পত্রিকার প্রাথমিক পর্বে প্রতি সংখ্যাতেই তাঁর মায়া-ছিটোনো কবিতার পর কবিতা। মন্বন্তরের ডামাডোলের মধ্যেই 'বনলতা সেন' আমাদের হাতে পৌঁছয়, মন্ত্রমুগ্ধ ঘোরে পরস্পরকে তা থেকে পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি শোনাই। তখনও আধুনিক বাংলা কবিতার খাস মহলে জীবনানন্দ অপাঙ্‌ক্তেয়। তাঁর স্তবকে-স্তবকে বিচ্ছুরিত আকুলি-বিকুলি অনেকের কাছেই প্রলাপসম উচ্চারণ। তাঁর রচনায় রূপকথা আছে, এলায়িত আনন্দ অথবা দীর্ঘশ্বাস উপস্থিত, তবে চাতুর্য তো নেই, যে-বিশেষ চাতুর্যে 'কবিতা' পত্রিকার উন্মেষমুহূর্ত থেকেই পাঠকমহল অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। ঢাকা থেকে কোনও এক ঋতুতে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের ঠিকানায় জীবনানন্দকে চিঠি পাঠাতে শুরু করলাম। জবাব আসতে লাগলো; তাঁর কবিতার মতোই, তাঁর চিঠিতেও এক বিশেষ ধরনের দ্বিধাবিজড়িত স্বপ্নালু বিষাদমাত্রা। আমরা—অরুণকুমার সরকার, সুরঞ্জন সরকার, আমি— ততদিনে পরিপূর্ণ জীবনানন্দগ্রস্ত। সজ্ঞান দ্বিরাচারিতা : বিষ্ণু দে-সুধীন্দ্রনাথ দত্তে আবিষ্ট আছি, অথচ জীবনানন্দীয় ঘোরও লেগেছে তা ধিন-তা ধিন।

মনের পরিকাঠামোয় সেই সঙ্গে অন্য একটি দ্বিভাজনও। কবিতার অন্তরলোকে পৌঁছে গেছি, কবিতা নিয়ে অহোরাত্র ওঠা-বসা, স্বপ্নে শিহরিত হওয়া। কিন্তু বাইরের পৃথিবীতে

ঘনায়মান ক্রান্তির সংকেত, দেশটা কি সত্যি-সত্যিই ভাগ হয়ে যাবে? স্বাধীনতা-পরবর্তী সমাজব্যবস্থা কোন দিকে মোড় নেবে তা নিয়ে চিন্তার ঘনঘটা। শুধু নিরন্তর প্রশ্নে জড়িয়ে থাকাই নয়, সক্রিয় রাজনৈতিক আবেগও সমস্ত চেতনা ছুঁয়ে। তখনও নিখাদ মার্কসপন্থা থেকে একটু দূরে অবস্থান করছি, তবে অভিজ্ঞতার সোপানগুলি বেয়ে দ্রুত উপরে উঠছি; বেশ বুঝতে পারছি, ব্যক্তিসত্তাও সামাজিক সংজ্ঞার অনুজ্ঞাবাহী। অশান্ত রাত্রি গভীর হলে বিছানায় শুয়ে কবিতার জাদুকরী অক্ষরমালার পাশাপাশি সমাজজিজ্ঞাসায় উৎকীর্ণ প্রহরের পর প্রহর।

কলকাতা-নোয়াখালি দাঙ্গার জের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়লো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের পাঠচর্চা বিঘ্নিত। এরই মধ্যে, উপর থেকে নির্দিষ্ট অমোঘ বিধানের মতো, সিদ্ধান্ত-অনুশাসন। কংগ্রেসের কর্তাব্যক্তিরা আর অপেক্ষা করতে রাজি নন; কিছুদিন আগেও বিদেশী শাসক-প্রস্তাবিত ঈষৎ-শিথিল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যে-খসড়া দাখিল করা হয়েছিল, তা পেরিয়ে এবার তাঁদের অসহিষ্ণু উৎসাহের পরিক্রমা; মুসলিম লিগের পাকিস্তান দাবি পুরোপুরি মেনে নিতেও তাঁরা সম্মত। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, আমাদের বাঙালি সত্তা চরম সংকটের সম্মুখীন: দেশ ভাগ হয়ে গেলে আমাদের কী অবস্থা দাঁড়াবে, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শ থেকে, বেপথুমান, কোথায় গিয়ে অনিশ্চিত অবস্থান করবো?

এই বিশেষ মুহূর্তে শরৎচন্দ্র বসু ও আবুল হাশেম কর্তৃক অখণ্ড বঙ্গদেশের যুগ্ম প্রস্তাব, যার সঙ্গে হাসান শহিদ সোহরাবর্দিও খানিক বাদে নিজেকে যুক্ত করলেন। অকূলপাথারে যেন পরিত্রাণের ইঙ্গিত পেলাম। বঙ্গভূমিস্থ প্রায় প্রতিটি বামপন্থী দল এই প্রস্তাবের পক্ষে; কিন্তু হলে কী হবে, কংগ্রেসের অন্য দিকে ঝুঁকে-পড়া। এবং কংগ্রেসের নতুন মিত্র হিন্দু মহাসভা। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উঠে-পড়ে লাগলেন, বাংলাদেশ যাতে ভাগ হয়ে যায় এবং হিন্দুপ্রধান পশ্চিম প্রান্তের জেলাগুলি যাতে ভারতের অঙ্গীভূত হয়, পুবের জেলাগুলির মানুষজন পড়ে মরুক গে। শ্যামাপ্রসাদের মতের সঙ্গে ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানালো কংগ্রেস। হিন্দু মহাসভার অবিসংবাদী নেতা আশুতোষ-তনয় তাঁর মত প্রচারে ঢাকায় বক্তৃতা দিতে এলে অ-মুসলমান ছাত্রকুল দল বেঁধে প্রতিবাদে সামিল হলাম। করোনেশন পার্কের সন্নিকটে আমাদের ঠেকাতে বেপরোয়া লাঠির বাড়ি পুলিশের। কী আশ্চর্য মহাযোগ : হিন্দু মহাসভার নেতাকে ছাত্ররোষের হাত থেকে বাঁচাতে মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভার পুলিশ লাঠিপেটা। কয়েকজনের মাথা ফাটল, হাত ভাঙলো।

কিন্তু দেশভাগ ও বঙ্গভাগের ওই উৎসাহতরঙ্গ রোধিবে কে? সাতচল্লিশ সালের মধ্য-অগস্ট, রাতারাতি পাকিস্তানের নাগরিক হয়ে গেলাম। আমরা অবশ্য মনস্থির করেছিলাম, যে-কংগ্রেস দল আমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলো, যে-দল অথচ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের নেতৃত্ব দেবে, তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হওয়াই ভালো: আমরা পাকিস্তানের বিশ্বস্ত নাগরিক হবো, সব সম্প্রদায়ের মানুষজন মিলেমিশে নতুন দেশ গঠন করবো। এমনকি লিগ নেতাদের অনেকেই, অন্তত প্রথম লগ্নে, এ ধরনের সংকল্পেরই প্রতিধ্বনি করেছিলেন। আরও একটি মস্ত শুভ লক্ষণ : কলকাতায় যেমনটি, তেমনই ঢাকাতেও, সেই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য শহরাঞ্চলে, আজাদির পুণ্যমুহূর্ত থেকে সহসা হিন্দু-মুসলমান মিলনের মস্ত জোয়ার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা একসঙ্গে পড়াশুনো করি : অ-মুসলমান ছাত্ররা ঢাকা হল-জগন্নাথ হলের সঙ্গে যুক্ত, মুসলমান ছাত্ররা সলিমুল্লা ও ফজলুল হকের সঙ্গে। এতদিন পর্যন্ত আমরা সংলগ্ন অথচ বিচ্ছিন্ন হয়েই ছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে এক সঙ্গে ভোট দেওয়া সত্ত্বেও। সে-সব নির্বাচনে এক ধরনের উপর-উপর বন্দোবস্ত হতো। ঢাকা হল-জগন্নাথ হলের এক গোষ্ঠী সলিমুল্লা মুসলিম হল-ফজলুল হক হলের কোনও এক গোষ্ঠীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে হয়তো নির্বাচনে জিততো। কিন্তু মেলামেশা ছিল না, ভাবের আদানপ্রদান ছিল না। সম্মিলিত ছাত্র ইউনিয়নের দায়িত্ব ও পয়সা-কড়ি যে-গোষ্ঠীর যাঁরা জিততেন, ভাগ করে নিতেন, কোনওক্রম সহাবস্থান।

দমকা হাওয়ার মতো মেলবন্ধনের উন্মাদনা এবার আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল। চার হলের সঙ্গে যুক্ত ছাত্ররা এই প্রথম একে অপরকে চিনতে, পরস্পরের সমস্যাগুলি বুঝতে শিখলাম। পরিণামে একটি ঘনবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন জন্মগ্রহণ করলো। আস্ত একটি নতুন দেশ, পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা করাচি-লাহোরে কেন্দ্রীভূত। ঢাকা বারোশো মাইল দূরে, আপাত অবহেলায় পড়ে থাকা। পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনিক পরিকাঠামোতে এলোমেলো, অব্যবস্থা। অ-মুসলমান সরকারি কর্মচারীরা অনেকেই ভারতবর্ষে চলে গেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককুলের একটি বড়ো অংশও, কিছুটা আতঙ্কে, কিছুটা অনিশ্চয়তার শিকার হয়ে, ভারতবর্ষ-মুখো। তার উপর পশ্চিম বঙ্গ থেকে কাতারে-কাতারে ছাত্র পূর্ব পাকিস্তানে, বিশেষ করে ঢাকার স্কুল-কলেজে, ভর্তি হতে আসছে, আসনের অসংকুলান, শিক্ষকের অসংকুলান, ছাত্রাবাসেরও সমান অনটন। সমস্যাগুলি মুসলমান ছাত্রদের একার নয়, হিন্দু ছাত্রদেরও একার নয়, সবাই মিলিতভাবে সমস্যাগুলির সম্মুখীন। সুতরাং অবলীলায় একমত হলাম আমরা : সম্প্রদায় নির্বিশেষে, হল নির্বিশেষে, ঐক্যবদ্ধ যৌথ আন্দোলন দাঁড় করাতে হবে। সবচেয়ে যা আতঙ্কের, দেশভাগের গোলমাল-হরিবোলের পরিণামে রাষ্ট্রীয় সরবরাহ ব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছে; খাদ্যের অভাব, বস্ত্রের অকুলান। এ-সব সার্বিক সামাজিক সমস্যাও তো ছাত্রদের সমস্যা, সুতরাং আন্দোলনে যূথবদ্ধতা।

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস থেকে পরের বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ পর্যন্ত আমাদের নিয়মিত ক্লাস করা প্রায় হয়েই ওঠেনি। আন্দোলন-সভা-মিছিল, উপাচার্যের কাছে ডেপুটেশন, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। প্রথম দিকে কলকাতা থেকে স্থানাবিচ্যুত হয়ে আসা খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ; তিনি অবশ্য ঢাকা শহরের পুরনো বাসিন্দা। কয়েক মাস বাদে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হয়ে তিনি করাচি চলে গেলেন, তারপর ময়মনসিংহের নুরুল আমিন মুখ্যমন্ত্রী। ছাত্রদের আন্দোলনের সঙ্গে সাধারণ নাগরিকদের সমস্যাজড়িত বিবিধ আন্দোলন ক্রমশ যুক্ত হতে থাকলো। নভেম্বর-ডিসেম্বর-জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি অপেক্ষাকৃত মোলায়েম আবহাওয়ার ঋতু, আমরা দুপুর-বিকেল রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরছি, স্লোগানে নিজেরা উচ্চকিত হচ্ছি, রাজপথ উচ্চকিত করছি, দাবিসনদ রচনা করছি, তা পেশ করছি প্রশাসকবৃন্দ ও রাজনৈতিক নেতাদের কাছে। এই সময়েই বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের একটি যুক্ত সংগ্রাম কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এগারোজনের কমিটি, তন্মধ্যে দুজন অ-মুসলমান, আমি এবং আর একজন। সলিমুল্লা মুসলিম হলের একটি ছাত্রনেতার কথা এখনও মাঝে-মাঝে মনে পড়ে। নাম বোধহয় নইমউদ্দীন, বেঁটে, কালো, ঝটিতি বক্তৃতা দিতে ওস্তাদ। তাঁর ভাষণের দেশজ বাচনের একটি নমুনা : 'ভাইগণ, বন্ধুগণ, আমরা অনেক সহ্য করেছি। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আসুন, আমরা একসঙ্গে মিলে ফুটবলটায় এবার একটা কিক মারি'। নাজিমুদ্দিন সাহেব মানুষ হিশেবে, মানতেই হয়, আদৌ খারাপ ছিলেন না : কথাবার্তায় শিষ্ট, সম্ভবত ধর্মভীরুও, তবে মোটা, ছোট্টো শরীর, জালার মতো স্ফীত উদর। ফুটবলে কিক মারাটা অবশ্যই প্রতীকী, তাঁর অবয়বের প্রতি

ইঙ্গিত। জড়ো-হওয়া ছাত্রদের মধ্যে হাততালি-ঠাসা খুশির ঢেউ।

অ-মুসলমান ছাত্রদের কাছে একটা মস্ত আবিষ্কার : মুসলমান ছাত্রনেতারা কোনও সংকোচ বা অবদমনে ভুগতেন না, মনের কথা দুর্দান্ত স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতেন। খাজা নাজিমুদ্দিনকে লক্ষ্য করে যেমন গাল পাড়া, অন্যদের সম্পর্কেও সমান অকুতোভয়। নুরুল আমিন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তিন-চার সপ্তাহের জন্য বিদেশ সফরে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ভয়ংকর বস্ত্রসমস্যা; মহিলাদের পরিধেয়ের পর্যন্ত আকীর্ণ অভাব। ছাত্রদল ক্ষিপ্ত, লম্বা মিছিল করে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসস্থান অভিমুখে ধাওয়া। ছাত্রদের মেজাজ দেখে রক্ষীবাহিনী ভীত, এখানে-ওখানে নিজেদের লুকোলো। আমরা সোজা মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকখানায়। নুরুল আমিন প্রায় ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছেন, দয়া ভিক্ষা করার ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় নতজানু। হঠাৎ শুনি ছাত্রদের মধ্য থেকে কারও কর্কশ ক্রোধোক্তি : 'আমাদের মায়েরা-বোনেরা কাপড় পাচ্ছে না, আর তুই হতভাগা নিজের বিবির জন্য বারো সুটকেস ভরে শিফন শাড়ি এনেছিস বিদেশ থেকে, তোকে কোতল করবো'।

আমার ধারণা, পূর্ব পাকিস্তানে সে সময় থেকে শুরু করে একাত্তর সাল পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ বছর ধরে যে-বিদ্রোহের দীর্ঘ পর্ব, তার উৎস এই সংঘবদ্ধ ভয়হীন ছাত্র আন্দোলনেই। ছাত্রদের একটি প্রধান অংশ আকাট কৃষককুল থেকে উঠে এসেছেন, পিতামাতারা নিরক্ষর। এই ছাত্রসম্প্রদায়ই প্রথম প্রজন্ম যাঁরা শিক্ষার আলোতে দীপ্য হয়েছেন, বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের গোড়াপত্তন সংসাধিত করেছেন। নিজেদের পরিবারের মালিন্য-খিন্নতার সঙ্গে বড়োলোকদের অবস্থার দুস্তর আপেক্ষিক ব্যবধান তাঁদের ক্রমশ অস্থির করে তুলেছে। সেই অস্থিরতা থেকে সংকল্পের উত্থান, বিদ্রোহের উত্থান। যেহেতু তাঁরা কৃষককুল থেকে উদ্ভূত, ভদ্রতার পরচুলো তথা মুখোশ পরতে অভ্যস্ত হননি, রেখে-ঢেকে কথা বলতে শেখেনইনি। যা মনে এসেছে, স্পষ্ট করে বলেছেন। তেমন আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, ভারতবর্ষের রাজনীতিতে হিন্দু প্রাধান্যের অধ্যায়ে যা ঘটেছে, আসলে তারই প্রতিধ্বনি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে। ভারতবর্ষে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রেরা জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, ব্যূহ গঠন করেছেন, ছাত্র আন্দোলনকে সামগ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানে তেমনধারাই ঘটেছে, তফাত শুধু এই ছাত্রদল মাটির অনেক কাছাকাছি, তাঁদের ভাষা তাই কর্কশ। আমাদের সমসাময়িক যাঁরা সলিমুল্লা-ফজলুল হক হলের ছাত্র-নেতৃত্বে ছিলেন, তাঁরাই এক-চতুর্থাংশ শতক সময়ের ব্যবধানে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা বলে পরিগণিত হয়েছেন; এঁদের একজন-দু'জনের নাম ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি। অবশ্য অনেক আগে থেকেই আমরা অ-মুসলমান ছাত্ররা মাঠে-ময়দানে নামা। হিরোসিমা-নাগাসাকি নিয়ে উদ্বেগ, ১৯৪৫ সালের শেষ ভাগে আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন, রামেশ্বর-রশিদ আলি দিবসের রক্তাক্ত পটভূমি, ভারতীয় নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ, যা পরে ষাটের দশকে উৎপল দত্তের 'কল্লোল' নাটকে রুদ্র মহিমায় রূপায়িত। আমার দিনযাপনে ওই মুহূর্তে এক আশ্চর্য রসায়ন, কবিতায়-সাহিত্যে নিমগ্ন থাকা চলছে, দিবস-রাত্রি আড্ডার জোয়ার, কিন্তু সেই সঙ্গে রাজনীতির, ঘুম-পাড়ানো নয়, হাউইয়ের মতো জ্বালিয়ে দেওয়া, নেশা। কলকাতার আন্দোলনের রেশ মফস্বলে আমাদেরও স্পর্শ করে গেছে : ছেচল্লিশের মধ্য প্রহরে সর্বভারত-ব্যাপী ডাক-তার কর্মীদের আন্দোলনের সঙ্গে আমরা ছাত্ররাও নিজেদের যুক্ত করতে পেরে গর্ববোধ করেছি। তবে যতিপতন, কয়েক সপ্তাহ যেতে-না যেতেই অগস্ট

মাসের কৃষ্ণদিবস, যার পরিণতিতে, আমাদের ঘোর অনিচ্ছাসত্ত্বেও, তথাকথিত নেতারা মেনে নিলেন দেশবিভাগের নির্দয়তা। যা বাড়তি পরিতাপের, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো তখন-পর্যন্ত-নগণ্য নেতারা ভারতবর্ষের মাটিতে সম্মানের ঠাঁই পেলেন, প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম লিগের মধ্যেও উগ্রপন্থী, রগচটা নেতাদের উপরে উঠে আসা।

অথচ এমনটা না-ও হতে পারতো। আবুল হাশেম সেই পর্বে প্রাদেশিক মুসলিম লিগের সাধারণ সম্পাদক, নিখাদ অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির জন্য সারা জীবন চেষ্টা করে গেছেন, তাঁর আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন, কলকাতায় মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে ১৯৪৩ সালে যেদিন তিনি প্রাদেশিক লিগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন, সেদিনও সভায় গেছেন ধুতি পরে। সংকীর্ণবুদ্ধি স্বার্থপর কংগ্রেস নেতারা তাঁর আবেদনে কর্ণপাত করলেন না, তাঁরা বরঞ্চ হিন্দু মহাসভার সঙ্গে হাত মেলালেন। ভারতবর্ষে অনেকেই হয়তো জানেন না, বিখ্যাত প্রাবন্ধিক ও বিপ্লবী চিন্তাজীবী বদরুদ্দিন উমর আবুল হাশেমের জ্যেষ্ঠ পুত্র; সৈয়দ শহীদুল্লা-মনসুর হাবিবুল্লাদের মাতুলও তিনি।

ততদিনে আমি প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেছি, আলোচনা-অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছি, পরিচয়ের পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনে বিভাগের বিখ্যাত ভালো ছাত্র, সরদার ফজলুল করিম, কৃষক পরিবারের সন্তান, ইচ্ছা করলেই মস্ত উঁচু কাজে যোগ দিতে পারতেন পাকিস্তানে, পরিবর্তে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ওঁর সঙ্গে আলাপ প্রগতি লেখক সংঘের সূত্রে। মুনীর চৌধুরী ও তাঁর দাদা কবির চৌধুরীর সঙ্গে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণেই পূর্ব পরিচয়, তাঁরা বুদ্ধিমত্তা ও সৌজন্যের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। ক্রমশ আলাপ হলো 'লাল শালু'-র লেখক, অতি অমায়িক, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র সঙ্গে। সংঘের সম্পাদক অজিত গুহর উৎসাহের শেষ নেই, সংঘের কার্যসূচি ক্রমশ প্রসারিততর হলো। এ-সময়েই, অথবা কিছু আগে বা পরে, পরিচয় হয় সানাউল হকের সঙ্গে; পঞ্চাশের দশকের উপান্ত পর্যন্ত সানাউল পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান কবি বলে খ্যাত ছিলেন, তারপর অবশ্য রাষ্ট্রদূত গোছের বড়ো-বড়ো কাজের ঝামেলায় কাব্যচর্চা খানিকটা চাপা পড়ে, কিন্তু তাঁর সৌহার্দ্যবোধে নয়।

স্কুলে-কলেজে যাদের সঙ্গে পড়েছি, দাঙ্গার ঋতুতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ আলগা হয়ে এসেছিল। আবার নতুন করে সাম্প্রদায়িকতার পাঁচিল ডিঙিয়ে আমাদের মেলামেশা শুরু। হঠাৎ আবিষ্কার করে মজা পেলাম, ভালোও লাগলো, বাঙালি হিন্দু সমাজের একটি প্রথা উঠতি মুসলমান পরিবারেও অদৃশ্য প্রভাব ফেলেছে, একটু বেশি করেই ফেলেছে। হিন্দু পরিবারের প্রচলিত ডাকনামগুলি মুসলমান সংসারেও ঢুকে গেছে : ঝুনু, টুলু, পল্টু, খোকন, মন্টু, বাদল, চুনি, মণি ইত্যাদি। এমনিতেই মুসলমান সমাজে নামকরণে বৈচিত্র্যের যথেষ্ট অভাব, এক ঝাঁক নুরুল ইসলাম, এক ঝাঁক সিরাজুল হক। এক নুরুল ইসলামকে অন্য-এক নুরুল ইসলামের থেকে তফাত করার তাগিদে পোশাকি নামের সঙ্গে ডাক নাম জুড়ে দেওয়ার রেওয়াজ শুরু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন সময় থেকে। নুরুল ইসলাম ঝন্টুর বন্ধু নুরুল ইসলাম সখা, সিরাজুল হক বেণুর দোসর সিরাজুল হক খাঁদু। আমার বিশেষ সুহৃদ, সত্তরের দশকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পুলিশ কর্তা, মুস্তাফিজুর রহমান খাঁ, অবশ্য বরাবরই আমাদের কাছে মন্টু।

১৯৪৮ সালের প্রারম্ভ পর্যন্ত আমরা আশায় বুক বেঁধেছিলাম, এদিন যাবে এদিন যাবে ; যেহেতু মুসলমান ছাত্রদের সঙ্গে সম্মিলিত আন্দোলনে নামতে সফল হয়েছি, আপাতদৃষ্টিতে

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্যা বইছে, এখন থেকে অবস্থার মোড় ঘুরবে। এরকম সময় ঢাকায় হাজির বাইশ-তেইশ বছরের একটি উজ্জ্বল ইংরেজ মেয়ে, সম্ভবত লিডস বা উত্তর ইংল্যান্ড-এর অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, নাম কারমেল ব্রিংকম্যান। সে ঢাকায় এসেছে আন্তর্জাতিক ছাত্র সংহতির প্রতিনিধি হিশেবে। আন্তর্জাতিক ছাত্রসংহতি ও বিশ্ব যুবসংস্থার যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেই সম্মেলনে পাকিস্তান থেকে কারা-কারা প্রতিনিধি যেতে পারেন, তার প্রাথমিক ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পড়েছে তার উপর। পশ্চিম পাকিস্তানে পরিস্থিতি অতি প্রতিকূল, ছাত্র আন্দোলন বলে আদৌ কিছু নেই, ওমুখো আর না হয়ে কারমেল সোজা ঢাকা চলে এসেছে, ঠিক করেছে পূর্ব পাকিস্তান থেকেই গোটা পাকিস্তানের প্রতিনিধি বাছাই করা হবে। যুব প্রতিনিধিরা তিন ভাগে বিভক্ত থাকবেন : কৃষিজীবী যুবক, শ্রমজীবী যুবক এবং ছাত্র যুবক। যেহেতু ঢাকায় আগে থেকেই সব কিসিমের ছাত্ররা এক সঙ্গে কাজ শুরু করে দিয়েছিলাম, ছাত্র প্রতিনিধি বাছতে কারমেলের তেমন বেগ পেতে হলো না ; আমাদের সহায়তায় সে শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী যুব সংগঠনেরও অবলীলায় সন্ধান পেল। সবাই বুঝতে পারছিলাম, বিশ্ব যুবসংস্থা ও আন্তর্জাতিক ছাত্র সংহতি, দুটোই কমিউনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রতিষ্ঠান, চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ তাদের পীঠস্থান, তবু আমাদের আগ্রহের সীমা ছিল না। তারা অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করলো বলেই আমাদের কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী বন্ধুদের সঙ্গে কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ ঘটলো। আরও মস্ত বড়ো যে আকর্ষণ, কলকাতার সম্মেলনে সারা পৃথিবী ঝেঁটিয়ে যুব প্রতিনিধিরা এসে জড়ো হবেন, তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে চিন্তা-ভাবনার আদান-প্রদানের সুযোগ এই দুটি বিশ্ব সংস্থা আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিল। আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

সবসুদ্ধু পাকিস্তান থেকে, বকলমে পূর্ব পাকিস্তান থেকে, এগারোজন প্রতিনিধি সম্মেলনের জন্য মনোনয়ন করা হলো, আমি একমাত্র অ-মুসলমান। কারমেল বললো, অন্তত একজন মহিলা প্রতিনিধি না থাকলে ঠিক শোভন হয় না। অথচ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর মাত্র এক বছরও সম্পূর্ণ হয়নি, সভা-সমিতিতে মিছিলে-আন্দোলনে যোগ দিতে পূর্ব পাকিস্তানের মেয়েরা তখনও ততটা সড়গড় নয়। শেষ পর্যন্ত আমাদের পরিচিতা এক মহিলা, বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্রী, মা ইরানি, বাবা বাঙালি খ্রিস্টান, মেয়েটি মুস্তাফিজুর রহমান খাঁ মন্টুর বউদি, তাকে পাকড়ানো গেল। সে অবশ্য ততদিনে নিখাদ মুসলমান, কিন্তু সকলের সঙ্গে মেলা-মেশা ও আড্ডা দিতে স্বচ্ছন্দ ; সবচেয়ে বড়ো কথা, অন্তত পাকিস্তান প্রতিনিধিগোষ্ঠীকে নারীবিবর্জিত থাকতে হলো না। তখনও পর্যন্ত ঢাকা-কলকাতার প্রধান যোগাযোগ ট্রেন-স্টিমার, স্টিমার-ট্রেন। স্পষ্ট মনে আছে সেই ফেব্রুয়ারি মাসের শীত-শীত সাত সকালে, ধুতি-পরিহিত আমি, হাতে মস্ত পাকিস্তানি জাতীয় পতাকা, শিয়ালদহ স্টেশনে প্রচণ্ড অহংকারের সঙ্গে অবতীর্ণ হলাম। মুসলমান প্রতিনিধি যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের অনেকেরই আত্মীয়-স্বজন কলকাতার এখানে-ওখানে, বিশেষ করে পার্ক স্ট্রিট-পার্ক সার্কাস অঞ্চলে, সুতরাং থাকার জায়গা নিয়ে কারওরই সমস্যা দেখা দিল না; আমি যেমন বরাবর থাকি, টালা পার্কে পিসির বাড়িতে উঠলাম। আরও যা যোগ করতে হয়, কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সংগঠন ও সভ্য ভাগাভাগি তখনও সম্পূর্ণ হয়নি : কেউ এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছেন, কেউ ওদিক থেকে এদিকে। কলকাতায় পৌঁছে জানতে পেলাম, আমাদের কৃষক প্রতিনিধিদের তালিকায় একটু বদল হচ্ছে। পূর্ব-মনোনীত

তিনজনের মধ্যে একজন বাদ যাচ্ছেন, পরিবর্তে তখনই-যথেষ্ট-বিখ্যাত কৃষক নেতা সৈয়দ মনসুর হাবিবুল্লা, যিনি পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঠিক সেই মাস থেকে পূর্ব পাকিস্তানে কাজ শুরু করবার আয়োজন করছিলেন, তৃতীয় কৃষক প্রতিনিধি রূপে আসছেন। শাদা টুপি পরা, চিকনের কাজ করা মিহিন কোর্তা, খানদানি চোস্ত পাজামা পরিহিত মনসুর হাবিবুল্লা যখন পাকিস্তানের যুব কৃষকদের সমস্যা নিয়ে ওয়েলিংটন স্কয়্যারের সম্মেলন-মঞ্চ থেকে উর্দুতে-ইংরেজিতে ভাষণ দিচ্ছিলেন, অতি চমৎকার দৃশ্য। প্রায় দুই যুগ বাদে, মনসুর সাহেব, ১৯৭৭ সালে পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ, পরে বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় আমার সহযোগী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলনে তাঁর বক্তৃতা ও পরিধেয়ের উল্লেখ করে তখন প্রায়ই মজা করেছি।

এই যুব সম্মেলন আমার পক্ষে অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। শুধু ভারতবর্ষের নানা জায়গা থেকে আসা ছাত্র ও যুব প্রতিনিধিদের সঙ্গেই নয়, তারও বাইরে প্রায় গোটা পৃথিবী থেকে জড়ো হওয়া যুব নেতাদের সঙ্গেও পরিচয় ঘটলো। এঁরা প্রত্যেকেই ইতিমধ্যে মার্কসীয় প্রজ্ঞায় দীক্ষিত, এমন কি কুমিনটাং চীন বা দক্ষিণ কোরিয়া থেকে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদেরও আনুগত্য বুঝতে ভুল হওয়া সম্ভব ছিল না। মালয়েশিয়ায় গৃহযুদ্ধ চলছে, সেই দেশের অরণ্যের গহন থেকে গেরিলা যুদ্ধরত যুব প্রতিনিধিরা এসেছেন, এসেছেন ব্রহ্মদেশ থেকে, ইন্দোনেশিয়া থেকে ; আফগানিস্তান, ইরাক, ইরান, পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির প্রতিনিধিরাও হাজির। যেমন উপস্থিত মিশর ও আলজেরিয়া থেকে কয়েকজন, বর্ণবিদ্বেষে-সমাচ্ছন্ন গভীর-তমসায়-ঢাকা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেও লুকিয়ে কয়েকজন। তা ছাড়া সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা তো ছিলেনই, ছিলেন পূর্ব ইওরোপ থেকে, পশ্চিম ইওরোপ থেকে, অন্য মেরুপ্রান্তের অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড থেকেও। বোধহয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা থেকেও, সেই সঙ্গে লাতিন আমেরিকার প্রতিনিধিরা। তবে তাঁদের কথা আলাদা করে তেমন মনে পড়ে না।

বিদেশী প্রতিনিধিরা বেশির ভাগই ছিলেন ফৌজ-কর্তৃক-যুদ্ধের-সময়-ব্যবহৃত দু'-তিন-বছর-আগে পরিত্যক্ত লেক ব্যারাকের সারি-সারি কুঠিতে। চারদিকে কৃষ্ণচূড়া-পলাশের পাশাপাশি নারকেল বৃক্ষেরও সমারোহ ; ল্যান্সডাউন ও সাদার্ন অ্যাভেনিউর কোল ঘেঁষেই সম্ভবত, কোকোনাট গ্রোভ সরাইখানাটি তখনও অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। পশ্চিমি দেশগুলির কয়েকজন প্রতিনিধিকে হোটেলে, নয়তো এঁর-ওঁর বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। তবে অধিকাংশই ছিলেন লেক ব্যারাকে, সারারাত ধরে সেই ব্যারাকের বিশ্বনন্দিত, বিশ্বনিন্দিত মশককুলের প্রগাঢ় আশ্লেষে বিচলিত না হয়ে। কয়েকটি আলাদা ঘরে নানা বিষয় নিয়ে ছোটো-ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে প্রায় সারারাত ধরে তর্ক-আলোচনা, পরে প্রস্তাব অধিগ্রহণ। মূল অধিবেশন মধ্য কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কয়্যারে, বর্তমান প্রজন্মের কাছে যা সুবোধ মল্লিক স্কয়্যার হিশেবে পরিচিত। বুদ্ধির দীপ্তি, আবেগের জোয়ার, অঙ্গীকারের তীক্ষ্ণতা সভামঞ্চ জুড়ে। বিভিন্ন মহাদেশ থেকে প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় দুস্তর ফারাক, তবু কোথায় যেন এক অত্যাশ্চর্য মিলিয়ে-দেওয়া মিশিয়ে-দেওয়া। কোনও-কোনও দেশ সদ্য স্বাধীন হয়েছে বা শিগগিরই হবে, কোনও-কোনও দেশ স্বৈরতন্ত্রের জগদ্দল পাথর-চাপা থেকে কয়েক মাস আগে বেরিয়ে এসেছে, এখন তরুণদের দুই চোখের নীলিমা ঘিরে সাম্য-ঘেরা টলমল নতুন স্বপ্ন। প্রথম দিনের প্রারম্ভিক অধিবেশন, প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধিরা মঞ্চে উঠছেন তাঁদের জাতীয়

পতাকা নিয়ে। মঞ্চস্থ মাইক্রোফোনে তাঁদের অভিনন্দন জানানো হচ্ছে, গোটা ওয়েলিংটন স্কয়্যার জুড়ে তার সহস্রগ্রাম উচ্চ সমর্থন। আয়োজন-ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে অবশ্যই ছিলেন কলকাতার পার্টি এবং ছাত্র-যুবা নেতারা। নাগপুরের অর্ধেন্দুভূষণ বর্ধন, এখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক, মঞ্চে প্রধান অভ্যর্থনাজ্ঞাপকের ভূমিকায়। যুগোস্লাভিয়া থেকে আগত প্রতিনিধিরা মঞ্চে সদ্য সমাগত, বর্ধন স্লোগান দিচ্ছেন, 'যুগোস্লাভ প্রতিনিধিবৃন্দ জিন্দাবাদ!' হঠাৎ নজরে এলো মঞ্চে উপবিষ্টা গীতা মুখোপাধ্যায় পাশে-বসে-থাকা সুখেন্দু মজুমদারকে সজোরে ধাক্কা দিচ্ছেন, সেই সঙ্গে ফিস ফিস অনুজ্ঞা : 'যাও, বর্ধনকে যোগ করতে বলো, "কমরেড টিটো জিন্দাবাদ"।'

ইতিহাসের এমনই বিচিত্র রসিকতা, মাত্র কয়েক মাস গত হতেই কমরেড টিটো আর কমরেড রইলেন না, যুগোস্লাভ রাষ্ট্র কমিনটার্ন থেকে, নাকি কমিনফর্ম থেকে, বিতাড়িত। দুই বাংলা জুড়ে বামপন্থীরা ভ্যাবাচ্যাকা, ঘরে-ঘরে কয়েক হাজার সদ্য-জন্ম-নেওয়া শিশু, যাদের আদর করে টিটো নাম দেওয়া হয়েছিল, তারা রাতারাতি টুটু বনে গেল।

প্রাসঙ্গিক একটি মজার ঘটনার কথা বলি। বিলেতের এক ঘোর বামপন্থী শ্রমিক নেতা, উইলিয়াম গ্যালাচার, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরূপে পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়েছিলেন, টিটোকে ব্রাত্য বলে ঘোষণার পরমুহূর্তে অভিমানভরে দল ছেড়ে দেন। কয়েক বছর বাদে ইতালীয় সোশ্যালিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পিয়েত্রো নেনি, সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশান্যাল-এর উগ্র সোভিয়েট-বিরোধিতায় বিরক্ত হয়ে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নান্তে স্ট্যালিনের প্রতি অনুরাগ-আনুগত্য বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করে কমিউনিস্ট মহলে প্রচুর বাহবা কুড়োন। সেই মরশুমে গ্যালাচারও পার্টিতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর সম্বন্ধে তাই বলা হতো : He went out with Tito, came back with Nenni।

কলকাতার যুব সম্মেলনে বিশ্ব যুবসংস্থা থেকে পরিচালক মণ্ডলীতে অন্যতমা, লন্ডনপ্রবাসী ধনী পার্শি বংশের দুহিতা, কিটি বুমলা। সারা সম্মেলনে কিটির চেয়ে সুন্দরীতরা কেউ ছিল না, বিশ্ব যুবসংস্থার সংগঠনের গুরু দায়িত্বে তার অধিষ্ঠান, এঁদো ঢাকা শহরের অখ্যাত ছাত্র আমি, অবাক বিস্ময় ও মুগ্ধতাবোধ নিয়ে কিটির দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সেই কিটি ভারতবর্ষকে তার রাজনৈতিক কর্মস্থলরূপে বেছে নিল, কেরলের পার্টি কমরেড রামদাস মেননকে বিয়ে করলো, বছর কুড়ি বাদে দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্সে শিক্ষক পদপ্রার্থী, ভাগ্যচক্রে নির্বাচন কমিটিতে আমি। তার উপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে, কিটি তা হলেও আদর্শে অবিচল, দিল্লিতে পার্টি মুখপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে সর্বক্ষণের কর্মী, গর্ব বোধ করি ভেবে আমি তার কাছের মানুষ। এটাও বোধহয় সময়চক্রের খেলা; পাঁচ দশক আগে যে-দূরত্বের বিচারে সম্রাজ্ঞীসমা, সে এখন ঘনিষ্ঠ সহচর।

তবে এসব ঘটনা তো তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলনে জট পাকালো ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে। সমস্ত বামপন্থী দল থেকে বেছে সম্মিলিত ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলী নির্বাচন করা হয়েছিল ; সভাপতি ছাত্র কংগ্রেসের প্রধান, সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র, অরবিন্দ বসু। সত্যপাল দাং, জলি কাউল, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, গীতা মুখোপাধ্যায়, এঁরা তো ছিলেনই, সেই সঙ্গে ছিলেন বলশেভিক দলের বিশ্বনাথ দুবে ও শ্রীমতী সুধা রায়। আর ছিলেন বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলের জনৈক ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, তখনও তিরিশের কোঠায়, সুতরাং যুবা মানুষ। মুশকিল হলো অরবিন্দ বসু সম্প্রদায় প্রথম থেকেই একরোখা; তাঁদের দাবি রাজনৈতিক প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ

ফৌজের শৌর্যের বর্ণনা বিশদ করে লিপিবদ্ধ করতে হবে। অন্যান্য এশিয় দেশের প্রতিনিধিরা বললেন, সুভাষচন্দ্র বসুর—তাঁরা উল্লেখ করতেন চন্দ্র বসু বলে—সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা সর্বস্বীকৃত, কিন্তু তাঁর নাম আলাদা করে উল্লেখ করলে অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের কাছ থেকেও উপরোধ আসবে তাঁদের দেশের বীর নায়ক-নায়িকাদের নামাবলী প্রস্তাবে থাকুক, সেটা খুব গোলমেলে ব্যাপার হবে; তার চেয়ে বরঞ্চ সাধারণভাবে সমস্ত দেশেরই উপনিবেশ-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অভ্যুত্থানের সপ্রশংস উল্লেখ থাক। ঘণ্টার পর ঘণ্টা উত্তীর্ণ, অরবিন্দ বসু আর ওই ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে কিছুতেই বুঝিয়ে ওঠা গেল না। বিশেষত শেষোক্ত ব্যক্তিটি, বরাবরই দেখেছি, কুচুটে, ঘোঁট পাকাতে ভালোবাসেন, তিন দশক বাদে পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভাতেও অনুরূপ ভূমিকা পালন করেছেন।

বিশ্বনাথ দুবের মতো বিচিত্র চরিত্রের মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বিরল হয়ে এসেছে। তত্ত্ববিশ্বাসের ব্যাপারে তাঁর ধনুর্ভঙ্গ পণ : বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী। ভারতীয় প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক ডাকা হয়েছিল সম্মেলনে গৃহীতব্য রাজনৈতিক প্রস্তাবে সংযোজনের জন্য একটি অনুচ্ছেদের খসড়া তৈরি করবার উদ্দেশ্যে। বেয়াল্লিশ সালের অগস্ট আন্দোলনকে কেউ-কেউ অগস্ট বিপ্লব বলে উল্লেখ করতে চাইলেন। বিশ্বনাথ দুবে রেগে আগুন, উনি নাকি চারশো পৃষ্ঠার থিসিস লিখেছেন প্রমাণ করতে ওই পাতি-বুর্জোয়া ব্যাপারটা মোটেই বিপ্লব ছিল না, ওটা বিদ্রোহও নয়, এমনকি উত্থানও নয়। তিন ঘণ্টা জোর তর্ক চললো, শেষ পর্যন্ত বিশ্বনাথ দুবে জয়ী, খসড়ায় লেখা হলো 'অগস্ট ঘটনাবলী'।

শ্লীলতা থেকে বিচ্যুতির অভিযোগ উঠতে পারে, তা হলেও অন্য একটি ঘটনা, যা নিজের চোখে দেখেছি, বর্ণনা না-করে পারছি না। কমরেড দুবে ও কমরেড সুধা রায় পাশাপাশি হাঁটছেন, হঠাৎ বিশ্বনাথবাবুর ছোটো তরফের প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে ধুতি সরিয়ে জলত্যাগ। অপেক্ষমতী সুধা রায় নির্বিকার, বিশ্বনাথ দুবে ততোধিক নির্বিকার।

রাজনৈতিক প্রস্তাব প্রকাশ্য অধিবেশনে দাখিল করার মুহূর্ত সমাগত। শেষ চেষ্টাও বিফল। গভীর রাত্রিতে ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দের এক-তৃতীয়াংশ তাঁদের মত মানা হলো না বলে সম্মেলন থেকে বেরিয়ে গেলেন। বেরিয়ে গিয়ে বিবৃতি দিলেন, কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্রকারীরা এত নির্লজ্জ যে সুভাষচন্দ্র বসুকে পর্যন্ত যথাযোগ্য সম্মান জানাতে বিমুখ। তাঁরা শাসালেন, কলকাতার সচেতন জনগণ এই অপমান মেনে নেবে না। সম্মেলনের সংগঠকদের পক্ষ থেকে অবশ্য ব্যাখ্যা করে প্রতি-বিবৃতি সঙ্গে-সঙ্গে, জল ঘোলা হওয়া তাতে বন্ধ হলো না। গুজবের পর গুজব ছড়ালো। সবচেয়ে বড়ো গুজব : ওয়েলিংটন স্কয়্যার থেকে মোড় ঘুরে খানিকটা এগিয়ে বউবাজারের মোড়ে পৌঁছুলে জনৈক স্বনামখ্যাত সমাজবিরোধীর স্বদেশী পাঁঠার দোকান ; তিনি নাকি দলবল নিয়ে সম্মেলনস্থল আক্রমণ করবেন সূর্যোদয়ের পূর্বেই। সংগঠকরা শুধু বেগতিক নন, একটু ভয়ার্তও। সেই নিবিড় নিশীথেই নিজেদের মধ্যে তাঁরা আলোচনা-পরামর্শ করলেন। অতি মুখমিষ্টি নম্র স্বভাবের কয়েকজনকে সেই স্বদেশী সমাজবিরোধীকে শান্ত করার জন্য বাছাই করা হলো ; এত বছর সময়ের ব্যবধানে বলতে বাধা নেই, একজন-দু'জন দৃষ্টি-আকর্ষণকারিণী তরুণীকেও সেই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে যুক্ত করা হলো। রাত্রের মতো ফাঁড়া কাটল; দেশপ্রেমিক সমাজবিরোধীটি হয়তো ভাবলেন, এত-এত বিদেশীদের ভিড়ে দিশি মামলা নিষ্পত্তি করতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

সম্মেলনের সমাপ্তি দিবসে শহিদ মিনারের— তখনও অক্টরলোনি মনুমেন্ট—সানুদেশে কলকাতাবাসীদের পক্ষ থেকে বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দকে অভিনন্দনজ্ঞাপন। শ্যামবাজারের পাঁচ মাথা থেকে মিছিল শুরু করে ময়দানে শেষ ; মিছিলের সম্মুখভাগ যখন ময়দানে, শ্যামবাজারের পাঁচ মাথা থেকে তখনও জনতার স্রোত বের হচ্ছে। লাল ঝাণ্ডার অসংকোচ সমারোহ, সমাজবিপ্লবের অসংকোচ দুন্দুভি। কলকাতার নাগরিকদের পক্ষ থেকে কারা-কারা বক্তৃতা দিয়েছিলেন, এখন আর মনে নেই। তবে সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠলাবণ্যে তখন দুর্দমনীয় উদ্দামতা, কী করে যেন মিনিট পাঁচেকের জন্য লাউডস্পিকারের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে, বেপরোয়া দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন সুচিত্রা মিত্র তবু খোলা গলায় স্বর আরও উঁচুতে উপরে তুলে গাইছেন, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি...'।

অধিকাংশ প্রতিনিধিই ফিরে গেলেন, আমি কয়েকটা দিন কলকাতায় বাড়তি রইলাম, বেশ কয়েকজন বিদেশী প্রতিনিধিও থেকে গেলেন পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য। তাঁদের মধ্যে কারও-কারও বোধহয় পরবর্তী সপ্তাহে কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার কথা। এই বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দের জন্য জ্ঞানপ্রকাশ-চারুপ্রকাশ ঘোষ মশাইদের ক্রিক রো-সংলগ্ন ডিক্সন লেনে অবস্থিত বিরাট বনেদি বাড়িতে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। নিবিষ্ট মনে অতিথিরা গান-বাজনা-আবৃত্তি-নাটকের ভগ্নাংশ ইত্যাদি শুনছেন, হঠাৎ মেদিনী কাঁপিয়ে বোমা-স্টেনগানের আক্রমণ। সেই সমাজবিরোধী স্বয়ং ছিলেন কিনা জানা নেই, কিন্তু দুই জিপে চেপে তাঁর অনুগত সাঙ্গোপাঙ্গরা সশস্ত্র আক্রমণ হানলেন, কমিউনিস্টদের নির্বংশ করতে হবে। দু'জন সাংস্কৃতিক কর্মী অকুস্থলেই মারা গেলেন, আরও অনেকে আহত। লজ্জায় আমাদের মুখ কালো হয়ে এলো, লজ্জার সঙ্গে ক্রোধ, অপমান, ধিক্কারবোধ। হয়তো কাকতালীয়, হয়তো কাকতালীয় নয়, এই ঘটনার পর ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেই আমার পুরনো রাজনৈতিক আনুগত্য আস্তে-আস্তে আমি শিথিল করে দিলাম। তখন থেকে আজ পর্যন্ত তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন বছর অতিক্রান্ত, স্বপ্নকে বাস্তবের মৃত্তিকায় স্থাপিত করার মার্কসবাদী অঙ্গীকারের কাছে আমার বিবেক-চেতনা-আবেগ-অভীপ্সা সমর্পণ করে আছি।

ঢাকায় ছাত্র আন্দোলন ইতিমধ্যে স্তরের পর স্তর অতিক্রম করে যাচ্ছে, ছাত্রদের আন্দোলনের সঙ্গে জনগণের বিভিন্ন আন্দোলন ক্রমশ ঘনবদ্ধ হচ্ছে, অথচ কী গেরো, ধনবিজ্ঞানের সাম্মানিক পরীক্ষায় বসতে হবে, বছর ভরে তেমন পড়াশুনো হয়নি, একটা-দুটো মাস আদা-নুন খেয়ে লাগা। নির্ঝঞ্ঝাটেই আশানুরূপ—অর্থাৎ অভিভাবকদের কাছে আশানুরূপ—ফল করে বেরিয়ে এলাম। পরীক্ষায় বসা এবং ফল বেরোনোর মধ্যে কয়েক মাসের ব্যবধান, ছাত্রদের অসন্তোষ-অভিযোগ উঁচু পর্দায় বাঁধা, কয়েক মাস ধরে দফায়-দফায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের জোরালো ধর্মঘট। সরকার বাহাদুর অন্তর্বর্তী কয়েক মাসে অনেকটা সামলে উঠেছেন, সাহস সঞ্চয় করেছেন, ছাত্রদের মধ্যেও কয়েকজন বিভীষণের খোঁজ পেয়েছেন, যথেষ্ট দমন-পীড়নের সাহায্যে ধর্মঘট প্রতিবার ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। ছাত্রদের কেউ-কেউ গ্রেফতার হলেন, কেউ-কেউ বহিষ্কৃত হলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আমাদের মতো অ-মুসলমান ছাত্র একজন-দু'জন, যারা যবনিকার একটু আড়ালে ছিলাম, তাদের নামে হুলিয়া জারি হলো। সুতরাং সিদ্ধান্ত, কিছুদিনের জন্য পূর্ব পাকিস্তান থেকে গা ঢাকা দেওয়া সমীচীন। পুলিশ তখনও রণ্ড-দুরন্ত হয়নি, ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ

পৌঁছে গোয়ালন্দ স্টিমার ধরে এক রাত্রের মধ্যে কলকাতা পৌঁছুতে তেমন অসুবিধা হলো না।

অপেক্ষায় আছি, কবে ফিরে যাবো, ইতিমধ্যে খবর এলো যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরীক্ষার ফল বের করা হয়েছে এবং আমি প্রথমই হয়েছি, তা হলেও, ঢাকাতে নাকি গুজব, আমাকে আর ভর্তি করা হবে না। আমার বাবা-মা তখনও ঢাকায়, দু'জনেই শিক্ষকতার সঙ্গে জড়িত। তাঁদের কাছ থেকেও অনুরূপ আভাস পেলাম। যখনই তাঁর বাড়িতে থাকতে গিয়েছি আদরে ঢেকে রাখতেন আমার রাঙা পিসিমা। কিন্তু অনির্দিষ্টকাল যেহেতু কলকাতায় থাকতে হবে, পিসিবাড়ি ছেড়ে ওভারটুন হলের ওয়াই. এম. সি. এ. হস্টেলে একতলায় একটি অতি-অন্ধকার ঘর ভাড়া করে উঠে গেলাম। সেই সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায় কিনা তা নিয়ে এর-ওর কাছে সাহায্য ভিক্ষা শুরু।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ পর্যন্ত ভর্তি হওয়া গেল না, আশুতোষ-দ্বারভাঙা-সেনেট হল বিল্ডিংয়ে অধ্যয়ন করে পরীক্ষায় বসে নিজেকে পুণ্যবান বলে আর সারা জীবন নিজেকে বিজ্ঞাপিত করা হলো না। সমস্যা যা দেখা দিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিরা জানালেন, তা নাকি 'টেকনিক্যাল'। ইন্টারমিডিয়েট আর্টস-এ উত্তীর্ণ হবার পর ঢাকায় তিন বছর কোর্সের অনার্স পড়েছি, তিন বছরের শেষে অর্থনীতিতে আট পেপারে পরীক্ষায় বসে সফল হয়েছি। যারা অনার্স পাশ করতো ঢাকায়, তাদের এম.এ পড়ার সময়সীমা মাত্র এক বছর, এবং পরীক্ষা দিতে হতো সাকুল্যে পাঁচ পেপারে। কলকাতায় দুই বছরের এম.এ পঠনান্তে আট পেপার নিয়ে পরীক্ষা। যাতে বছর নষ্ট না হয়, সেজন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছিলাম, আমি আট পেপারেই পরীক্ষা দেবো, কিন্তু দয়া করে যেন তাঁরা এম.এ ক্লাসে আমাকে ষষ্ঠ বর্ষে ভর্তি করে নেন। জবাব পেলাম, অসম্ভব, আমাকে আটটি পেপারে তো পরীক্ষায় বসতেই হবে, উপরন্তু এম.এ ক্লাসের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে পুরো দু' বছর অতিবাহন করতে হবে, ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির আবেদন বরবাদ। ঢাকার মতো ঘোর মফস্বল শহরের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছি, আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা চাঁদে হাত দিই, সরাসরি ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে চাই? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পুরুষদের একজন, তাঁদের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করে একটি উক্তি করেছিলেন, যা আমার স্মৃতিতে আজও উডকাটের মতো খোদাই হয়ে আছে। ভারি মিষ্টি গলায় কথাটি বলেছিলেন ভদ্রলোক, 'তোমাকে যদি বাবা ভর্তি করি, রাস্তা থেকে মুটে-মজুর ডেকে ভর্তি করতে হবে'।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্তে বন্ধুবান্ধব ক্ষুব্ধ। সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ গৌরকিশোর ঘোষ। সে তখনও একটু-আধটু সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। শিক্ষা ও রাজনীতি বিষয়ে হালিশহর না কোথায় এক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়েছিল। গৌরের কথায়, 'বুঝলে, ওখানে সবাই বরাবরই সন্দেহ পোষণ করতেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি অতিশয় হারামজাদা। কয়েকজনের মনে যা একটু সংশয় ছিল, তোমাকে ভর্তি না-করার ব্যাপারটি যখন বললাম, তাঁরা নিঃসন্দেহতর হলেন'।

সেই বয়সে অবশ্য বেশিক্ষণ মন খারাপ করার অবকাশ ছিল না। সুরঞ্জন সরকার তখনও ওভারটুন হলে, তেতলায়। সুতরাং আমাদের নরক গুলজার : অরুণকুমার সরকার, গৌরকিশোর ঘোষ, মণীন্দ্র মিত্র, মোনা নবিশ, সোমেশ আচার্য, পটনার এক বামপন্থী যুবক, নাম, যতদূর মনে আনতে পারি, অর্ধেন্দু হালদার, কয়েকবছর বাদে শুনতে পাই মনোবেদনায় আত্মহত্যা করেছেন। মাঝে-মধ্যে সুরঞ্জনের সঙ্গে আড্ডা দিতে ঢুকতেন,

জামশেদপুরের ছেলে, দু'-বছর বাদে ক্রিকেট টেস্ট খেলবেন, পুটু চৌধুরী। বিমিশ্র ভিড়, তবে অসাহিত্যভক্তরা একটু বাদে কেটে পড়তেন। সাহিত্য-কবিতা নিয়ে, এবং সাহিত্য-কবিতা সংক্রান্ত গুজব-খেউড় নিয়ে, প্রহরের পর প্রহর। কফি হাউসে আরও অনেক সদ্য আলাপ-হওয়া বন্ধুজনের সঙ্গে অফুরন্ত আড্ডার বিস্তৃততর পালা। কফি হাউসে তখন দু'টি অতি-তরুণ যুগল টেবিলে-টেবিলে ঘুরতো, দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিমাই চট্টোপাধ্যায়। দীপক পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতির পণ্ডিত অধ্যাপকরূপে বিরাজ করে। নিমাই বহুদিন লন্ডন-প্রবাসী; তবে প্রায় প্রতি বছর, অনাবাসী ভারতীয়দের কায়দায়, এক-দুই-তিন সপ্তাহের জন্য দেশ ঘুরে যায়।

শাটুল গুপ্তের সঙ্গেও অ্যালবার্ট হলের কফি হাউসে প্রথম আলাপ, যদিও, কয়েক বছর গত হলে, তিনি তাঁর আনুগত্য মেরিডিথ স্ট্রিটে চালান করে দেন। আরও যাঁরা আড্ডা দিতেন কফি হাউসের সেই ঋতুতে, তাঁরা পান্নালাল দাশগুপ্তের তৎকালীন মন্ত্রশিষ্যদ্বয় বিপ্লবী কমিউনিস্টপার্টিভুক্ত অমর রাহা ও তান্তু (পৃথ্বীশ) দে। উনপঞ্চাশের গোড়ায় হইরই কাণ্ড, দমদম-বসিরহাট অভ্যুত্থান, তাতে অমর রাহা ও তান্তু দুজনেরই অগ্রবর্তী ভূমিকা। অধিকাংশের মতো, তাঁদেরও ধরা পড়তে হয়, সুতরাং বহু বছরের কারাবাস। ঘটনার দু'দিন বাদে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহ, তান্তু রাতের অন্ধকারে শাটুল গুপ্তের বাড়িতে উপস্থিত। বন্ধুকে ফিরিয়ে দেননি শাটুল গুপ্ত, পুরো এক সপ্তাহ লুকিয়ে রেখে তান্তুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, অতঃপর এক প্রত্যুষে তান্তুর নিঃশব্দ প্রস্থান, গ্রেফতারের পর বিচার, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

উনিশশো তেষট্টি সালে ছাড়া পেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎমাত্র তান্তুর বিস্ময়োক্তি, 'আপনাকে তো আমি চিনি'। কী করে? অচিরে রহস্যের হদিশ মিললো। তান্তুদের বিচারক ছিলেন আমার হবু শ্বশুরমশাই। আমার স্ত্রী তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, ক্লাস ফেরত পিতৃদেবকে তুলতে প্রতিদিন বিকেলে আলিপুর আদালতের বাইরে প্রতীক্ষা করতেন, তখনই বিচারাধীন বন্দীদের কারাকক্ষে ফেরত পাঠানোর উদ্দেশ্যে ভ্যানে তোলা হতো, সে-সব বিকেলে তান্তু নাকি আমার স্ত্রীকে দেখেছেন। তান্তুর কাছে অন্য একটি কথাও শুনেছিলাম। চোদ্দো বছর বাদে জেল থেকে বেরিয়ে তাঁর সবচেয়ে ভয় হতো অনভ্যস্ত পায়ে রাস্তা পেরোতে। শাটুল আর তান্তু দুজনেই আর বেঁচে নেই, পালিয়ে-বেড়ানো তান্তুকে শাটুলের আশ্রয়দানের কাহিনী খুব কম লোকেরই জানা, এখন স্মৃতির অতলে চাপা পড়ে যাবে।

সেই অদ্ভুত ঋতুতে অথচ বিপ্লব-প্রয়াস ও ফিচ্‌লেমির নিটোল সহ-অবস্থান। সুরঞ্জন ওই পর্বে চোখে-মুখে কথা বলে, ওর ভয়ে এপাড়ায়-ওপাড়ায়-বেপাড়ায় সবাই সন্ত্রস্ত কখন কী কেলেঙ্কারি বাধিয়ে ফেলে, সজ্ঞানে, সুপরিকল্পনা সহকারে। একদিনের কথা বলি, তারিখটা, বোধ হয় একুশে অক্টোবর, সুরঞ্জনের জন্মদিন। দুপুর থেকে আমার ঘরে ওর মোতায়েন হওয়া। হঠাৎ খেয়াল চাপলো সুষ্ঠুভাবে জন্মদিনটি পালন করতে হবে। এক টাকা খরচ করে বত্রিশটি পোস্টকার্ড কেনা হলো, তখন তা-ই দাম ছিল। দুপুর থেকে সন্ধ্যা গড়িয়ে গহন না-হয়ে যাওয়া পর্যন্ত প্রশংসনীয় দ্রুততার সঙ্গে বত্রিশটি বিভিন্ন ঠিকানায় পোস্টকার্ডগুলি বাণীতে ভরাট করা। শ্রম বিভাজন, আমার হাতের লেখা যাঁরা জানেন, তাঁদের সুরঞ্জন কর্তৃক শর নিক্ষেপ ; সুরঞ্জনের হাতের লেখা যাঁদের চেনা, তাঁদের দিকে আমার অজ্ঞাতকুলশীল তীর ছোঁড়া। গুরুজনস্থানীয়দের কাছে লেখা, সমবয়সিনী চুম্বকরূপিণী মহিলাদের কাছে

লেখা, কয়েকটি চিঠি বাংলার প্রধান-প্রধান আধুনিক কবিদের, কয়েকটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য অথবা আচার্যপ্রতিমদের, একজন-দু'জন উঠতি সাহিত্যযশোপ্রার্থীদেরও। কী ছিল না সে-সব চিঠিতে? গালাগাল, কেচ্ছা, চিমটি কাটা, ভাঙ্চি দেওয়া ইত্যাদি। সদ্য-শান্তিনিকেতন ছাড়া, সে-মুহূর্তে প্রচুর লিখনেওয়ালা সুদর্শনকান্তি এক কবিকে লেখা হলো, বিশ্বভারতীর ঠিকানায়, অম্লান বিবেকে লেখকের নাম স্বাক্ষর করা হলো, অরুণকুমার সরকার, প্রযত্নে 'দ্বন্দ্ব' পত্রিকা। শান্তিনিকেতনে তখনও ছুটি চলছে, ছাত্রদের নামে পাঠানো সমস্ত চিঠি ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের বাড়িতে জড়ো হতো। বাড়ির মহিলারা পরম উপভোগ সহকারে উক্ত কবিকে লেখা চিঠির বয়ান পাঠ করলেন : 'শোনো খোকা, তুমি নাকি কাব্যি মকশো করো, সে কাব্যি নাকি আবার সাহিত্য পত্রিকায় ছাপা হয়? ফিচকেমির আর জায়গা পাওনি? এই চিঠি পাওয়া মাত্র পত্রপাঠ অবিলম্বে সঙ্গে-সঙ্গে ঝটিকাগতিতে কবিতা লেখা যদি ছেড়ে না দাও, বাবাকে বলে দেবো, বলে বেত খাওয়াবো'। মুশকিল হলো, ক্ষিতিমোহনবাবুর বাড়ির সেই মহিলারা, হয়তো অমর্ত্যর মাসুতুতো বোনটোন হবেন, চিঠিখানা পড়েই ক্ষান্ত হলেন না, পত্রপাঠ অবিলম্বে, সঙ্গে-সঙ্গে, ঝটিতিগতিতে ঠিকানা কেটে উক্ত কবির কলকাতার বাসস্থানে চিঠিটি রওনা করিয়ে দিলেন। কবিটি পরে আমার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিলেন। তবে, বলতে বাধা নেই, সে-সময় বড়োই সরল ছিলেন, ঠিকানা-কাটা চিঠিখানা পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে দুই নম্বর বাসে চেপে হেদোতে নেমে 'দ্বন্দ্ব' দপ্তরে হাজির : 'মহাশয়গণ, আপনাদের সঙ্গে অরুণকুমার সরকার নামে কোনও ভদ্রলোক কি যুক্ত আছেন?' 'অবশ্যই আছেন।' 'দেখুন, তিনি আমাকে কী চিঠি লিখেছেন।' পরের সন্ধ্যায় দপ্তর-ফেরত অরুণকুমার সরকার আমার ঘরে হাজির, ভাগ্যবৈগুণ্যে সুরঞ্জনও সেখানে, মহা শোরগোল, সুরঞ্জন সরকারের মুক্ত হাসিতে অরুণের আরও ক্ষেপে যাওয়া, আমি বাধ্য হয়ে শান্তি স্বস্ত্যয়ন ছিটোলাম।

সাত

অস্ট্রিয়া থেকে হিটলার দ্বারা যে-রাষ্ট্রপ্রধান বিতাড়িত হয়েছিলেন ১৯৩৭ সালে, সুরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর মুখাবয়বের অনেকটা মিল। অনেক সময় সুরঞ্জনকে তাই চিঠি পাঠাতাম : শুজনিগ, প্রযত্নে সু.স.। বরাবরই হুল্লোড়-হুজ্জোতি সুরঞ্জনের দ্বিতীয় প্রকৃতি। অন্য পক্ষে অরুণকুমার সরকার নম্র, মৃদুভাষী, সপ্রতিভ, সন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল চোখ, চশমার আড়ালে তা স্তিমিত না হয়ে আরও অনেক উজ্জ্বল, প্রশস্ত কপাল। মুড়ি-মুড়কির মতো সে সময় ওঁর কবিতা লেখা চলছে, যে কোনও ছুতোয় বা ছুতোহীনতায়।

গৌর তখন পুরোপুরি বেকার। বড়ো জোর একটা-দুটো টিউশানি করতো। চরম আর্থিক দুরবস্থা, তবে তেমন ভাঙতো না আমাদের কাছে। শয়নং হট্টমন্দিরে আর ভোজনং অনেকদিনই অনিশ্চিত। চশমার বাঁ চোখের কাচটি আড়াআড়ি ফাটা। সেই ফাটা চশমা নিয়েই গৌর ঘুরে-ফিরে বেড়ায়, পাল্টাবার পয়সা নেই। বিকেল সাড়ে তিনটে-চারটে নাগাদ, প্রায় সময় বেঁধে, গৌর আমার ওয়াই. এম. সি. এ-র ঘরে ঢুকতো, বলা চলে বিকেলের আড্ডার ও-ই বউনি করত। একে-একে অন্যরা আসতেন। বেশির ভাগ দিনই নিতাইকে মুরুব্বি পাকড়ে লাগোয়া রেস্তোরাঁ থেকে চা এবং হালকা খাবার আনাতাম, আমাদের ভাগটা গৌরের দিকেই ঠেলে দিতাম। তারপর কফি হাউস, হয়তো নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, হয়তো বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কিংবা আতোয়ার রহমান, অথবা নরেশ গুহ বা মুরারি সাহা বা ত্রিদিব ঘোষ, সবাই-ই এক সঙ্গে এক টেবিলে। মাঝে-মাঝে আরেকজন যোগ দিতেন, দেশশরণ দাশগুপ্ত, ষাটের দশকের পর তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। স'-আটটা সাড়ে-আটটা নাগাদ উঠে পড়ে বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট-কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে হল্লা করে পৌঁছে যাওয়া, আমাদের ঘিরেই তো পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। প্রতিদিন নতুন কারও সঙ্গে আলাপ, নতুন কারও কাছ থেকে টাটকা-লেখা কবিতা শোনা, কোনও নতুন পত্রিকার গুজবে কান পাতা, নয় তো রাজনীতি নিয়ে সর্বশেষ বুলেটিন। কমিউনিস্ট পার্টি ইতিমধ্যে বেআইনি ঘোষিত, নেতারা অনেকেই আত্মগোপন করেছেন, তবে তখনও কলেজ স্কয়্যার পাড়া জুড়ে বিপ্লবের মহড়া, কী কারণে যেন, শুরু হয়ে যায়নি। তার জন্য আরও মাস ছয়েকের প্রতীক্ষা। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রী মহলে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব উঠতি, অন্য সকলের পড়তি। একদিন আশুতোষ বিল্ডিঙের তেতলার করিডোরে ঘোরাফেরা করছি। একজন এসে উত্তেজিত খবর দিল, সোসাইটি না কোন সিনেমা ঘরে একটি সোভিয়েট-বিরোধী ছবি দেখানোর চেষ্টা চলছে, সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে হবে। অবিলম্বে ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিলে জড়ো হয়ে মাইলখানেক পথ হেটে সেই সিনেমা ঘরে চড়াও হওয়া, সিনেমার ম্যানেজার মশাই ভয়ে জবুথবু; আমাদের আদেশ অবশ্যই তিনি শিরোধার্য করবেন।

কলকাতায় ভর্তি হতে পারবো কি পারবো না, তা তখনও জানি না, অনিশ্চয়তার দ্বিধাথরোথরো চূড়ায়, এঁকে ধরছি, তাঁকে ধরছি, কর্তৃপক্ষজনের মন যদি ভেজাতে পারি।

অপেক্ষমাণ এরকম মাস দেড়েক সময় অর্থনীতির ষষ্ঠ বর্ষের ক্লাসে যাওয়া শুরু করেছিলাম। একশো পঁচিশ-তিরিশ জনের ভিড় ওই ক্লাসে, কে আমাকে আলাদা করে শনাক্ত করবেন, শনাক্ত করে অনধিকার প্রবেশের অপরাধে বহিষ্কার করবেন? ওই সময়েই, মনে পড়ে, তাপস মজুমদার-অশোক সেনের মতো কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দু' জনেই তখন শাণিত যুবক। অশোক সেন প্রতিভার দীপ্তিতে অন্য সবাইকে ছাপিয়ে, অন্য দিকে তাপস মিচকে বুদ্ধিতে ; পরবর্তী জীবনে প্রাজ্ঞ অধ্যাপকের ভূমিকার আড়ালে তাপসের সেই মিচকেপনা যেন আড়াল পড়ে গেছে, তবে 'বারোমাস' সম্পাদক অশোক সেন শাণিতই আছেন; তাঁর কন্যা রুশতী, আমার কাছে অন্তত, উজ্জ্বলতার ঈশ্বরী।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে-পড়া বন্ধুদের মনখারাপ হবে, কিন্তু কবুল করতে বাধ্য হচ্ছি, যাঁদের বক্তৃতা তখন কয়েক সপ্তাহ ধরে শুনেছি, একমাত্র অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের কথা বাদ দিলে, তাঁরা সবাই পর্যাপ্ত পরিমাণে বিস্মরণীয়। ঢাকায় যাঁদের কাছে পড়েছি, বুক চিতিয়েই বলবো, এঁরা কেউই তাঁদের সমগোত্রীয় নন। সব কিছুই কেমন ঢিলেঢালা, ভিড়-ভাড়াক্কা পরিবেশ, অধ্যাপকদের যথেষ্ট দেরি করে ক্লাসে ঢোকা, আরও দশ-বারো মিনিট নাম ডাকতেই ব্যয়, লেকচারগুলি না শুনলেও মহাভারত অশুদ্ধ হতো না।

মস্ত ব্যতিক্রম অবশ্যই বিনয় সরকার মশাই। পাগলাটে, কিন্তু এক আজব জাদু-মাখানো পাগলামি। ঘণ্টা পড়বার সঙ্গে-সঙ্গে আসতেন। নাম ডাকা নিয়ে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। পঞ্চাশ মিনিটের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি আমাদের জ্ঞানের-কৌতুকের প্রবাহে ভাসিয়ে নিয়ে যেতেন। ওঁর অধ্যাপনার বিষয় ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষের আর্থিক ইতিহাস। তা তো উপলক্ষ্য মাত্র। প্রতিদিন মৌলিক খেয়ালে তিনি নিজে মাততেন, আমাদের মাতাতেন। কথায় ধার, চোখে বিদ্যুৎ, মাঝে-মাঝে চেয়ার ছেড়ে কপট ক্রোধে আস্তিন গুটিয়ে ছাত্রদের দিকে তাঁর ধাবমান হওয়া। তিনি যা পড়াতেন, তা থেকে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের জবাব দিতে কতটা সুরাহা হতো, আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু কল্পনার অনেকগুলি দিক তিনি কেমন সহজ করে খুলে দিতেন। অন্তত দু'টি বিষয় বা তত্ত্ব যা তিনি উল্লেখ করেছিলেন, উদ্ভট বা অনুদ্ভট যা-ই হোক, এখনও মনে গেঁথে আছে। এক, তাঁর ঈষৎ-পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে : 'চুরিবিদ্যা বড়ো বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা ; বিনয় সরকার বলে, চুরিবিদ্যা বড়ো বিদ্যা যদিও পড়ে ধরা'। তাঁর ব্যাখ্যা : ইংরেজরা সারা পৃথিবী থেকে অসাধু উপায়ে কাঁচামাল চুরি করে প্রযুক্তি গড়ে নিজেদের শিল্পোদ্যমে সফল হতে পেরেছিল; তাদের ভূমিকা তস্করের, তবু তাদের ভূমিকা সাফল্যেরও, সুতরাং চৌর্য ধরা পড়লেই বা কী! আকর্ষণীয় অন্য যা বলতেন বিনয় সরকার মশাই, প্রায় প্রতি-পিরিয়ডেই বলতেন, ইংরেজি ভাষার উপর ভর করে : 'দ্য ব্যাটল অফ ইস্ফল ইজ সারপ্লাস ভ্যালু'। আমরা ধন্ধে, জলবৎ তরল করে বুঝিয়ে দিতেন তিনি। সুভাষচন্দ্র বসু প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকদের কাছ থেকে পাঠ্যবিষয়গত শিক্ষার বাইরেও অনেক-কিছু পেয়েছিলেন, পেয়েছিলেন একটি প্রেরণা, আহরণ করেছিলেন একটি প্রতিজ্ঞার গর্ব। সেই প্রতিজ্ঞা ও প্রেরণার ফলেই সুভাষ আই সি এস হলেন, আই সি এস ছাড়লেন, কলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা হলেন, গ্রেপ্তার হয়ে মান্দালয়ে, সেখান থেকে ফিরে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, কলকাতার মেয়র হলেন, ইওরোপে গিয়ে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন অব্যাহত রাখলেন, 'ভারতীয় সংগ্রাম' বইটি লিখলেন, হরিপুরায় জাতীয় কংগ্রেসে সভাপতি, গান্ধিজীর বিরুদ্ধে লড়াই করে ত্রিপুরী কংগ্রেসে ফের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন, কিছু লোকের ষড়যন্ত্রে তাঁকে পদত্যাগ করতে

হলো, ফরোয়ার্ড ব্লক গড়লেন, হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলন হলো, বিদেশে নিষ্ক্রমণ, তারপর আজাদ হিন্দ ফৌজ : এ-সমস্ত কিছুই ওই প্রেসিডেন্সি কলেজে পঠন থেকে আহৃত সারপ্লাস ভ্যালু, 'দ্য ব্যাটল অফ ইম্ফল ইজ সারপ্লাস ভ্যালু'। আমরা যারা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার সুযোগ পাইনি, তাদের কাছে উদ্বৃত্ত মূল্য, কবুল না করে উপায় কী, আমৃত্যু অধরাই থেকে যাবে।

আমার দিন ফুরোলো, ব্যাকুল বাদল সাঁঝে না হলেও ফুরোলো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জবাব পেয়ে গেলাম, অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি, অতঃ কিম্‌। হঠাৎ অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্তের কথা মনে পড়ে গেল, তিনি ততদিনে কটকের র‍্যাভেনশ কলেজের কাজ ছেড়ে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির প্রধান অধ্যাপক। কী আশ্চর্য, এক সপ্তাহও সময় লাগলো না, তিনি ওখানকার উপাচার্য অমরনাথ ঝার সঙ্গে কথা বললেন, আমি বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে কাশীতে অমিয়বাবুর বাড়িতে হাজির, কোনও বছরের ক্ষতি হলো না আমার। অন্তত সেই মরশুমে, উদ্বাস্তু ছাত্রদের সম্পর্কে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বেশি সহানুভূতি দেখিয়েছিল, অন্য নানা প্রশ্নচিহ্ন সত্ত্বেও।

মফস্বলের বাঙাল, মফস্বলের বাঙালই থেকে গেলাম, শুধু স্থান পরিবর্তন, ঢাকার বদলে কাশী। সনাতন হিন্দু ধর্মের যত অপগুণ তা ওই চল্লিশের দশকের উপান্তেই কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঞ্জীভূত। প্রাদেশিকতাবোধ, পরধর্মঅসহিষ্ণুতা, কূপমণ্ডূকতা, কূটকচালি—কিছুরই অভাব ছিল না কাশীতে, এখনও নেই। কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কার্পণ্য নেই আমার, তা হলেও, ভাগ্যি ভালো, এক বছরের তেমন বেশি সময় আমাকে সেখানে থাকতে হয়নি। অমিয়বাবুর বাড়িতে ক'দিন থেকে গিয়ে উঠলাম হিন্দু কলেজের ছাত্রাবাস বিড়লা হস্টেলে। বিড়লাবাবুরা নিদান দিয়েছিলেন, তাঁদের টাকায় প্রতিষ্ঠিত ছাত্রাবাসে আমিষের প্রবেশ ঘটতে পারবে না, সুতরাং পার্শ্ববর্তী ব্রোচা হস্টেলের বাঙালি মেসে দু'বেলা খেতে যেতাম। আমাকে বাদ দিয়ে ওখানে সবাই বিজ্ঞানের ছাত্র। অবশ্য মাছ-মাংস প্রত্যহ খাদ্যের তালিকাভুক্ত ছিল না, শুধু সপ্তাহান্তে, শনি ও রবিবার, আমিষচর্চা। বাকি দিন ফুলকো চাপাটি, ডাল, ঢ্যাঁড়শ কিংবা অন্য কোনও শুকনো সবজি সহযোগে তরকারি, যাকে বলা হত সুখা, সব শেষে আলুর সঙ্গে পটোল কিংবা মটরশুঁটি, কিংবা ফুলকপির মিশেল, ঝোল-ঝোল, ব্যাকরণগত নাম নাকি রসদার, একবার অভ্যাস হয়ে গেলে খেতে অসুবিধা হতো না, পুষ্টিকর। মাস দুয়েকের মধ্যেই আমার লিকলিকে শরীরে মাংস যুক্ত হলো।

কয়েক মাস বাদে আমার বাবা-মাও ঢাকা থেকে চলে এলেন, ওখানে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা তাই সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেল। ঢাকায় ফিরে যেতে না-পারার জন্য স্বভাবতই একটু মন খারাপ। সেই প্রসঙ্গ পাশে সরিয়ে রাখলে কাশীর অধ্যায়টি আমার পক্ষে যুগপৎ পরম সৌভাগ্যের ও চরম বিরক্তির। বিরক্তি এই কারণে যে, স্বাধীন ভারতের সংকীর্ণতম মানসিকতার সঙ্গে প্রথম পরিচয় এখানে। আর মস্ত সৌভাগ্যের হেতু, প্রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই, অর্থনীতি বিভাগের অধিকাংশ শিক্ষক পাতে দেওয়ার যোগ্য ছিলেন না। শাপে বর সেজন্যই। অমিয় দাশগুপ্ত নিজেই প্রচুর পরিশ্রম করে অনেক কিছু পড়াতেন, অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস, অর্থশাস্ত্রের তত্ত্ব, বৈদেশিক বাণিজ্যের তত্ত্ব, মুদ্রা ব্যবস্থার তত্ত্ব। উনি. ক্লাসে যা পড়াতেন, তা প্রায় গীতিকবিতার মতো মর্মে প্রবেশ করতো। প্রতিটি লেকচারের প্রতিটি বাক্য নিজের বিশেষ সাংকেতিক ভাষায় টুকে নিতাম, হস্টেলে ফিরে সন্ধ্যাবেলায় সংকেত থেকে সম্প্রসারণের পর স্পষ্ট করে লিপিবদ্ধ করা। তা-ই যথেষ্ট, আমার আর

বাড়তি পড়াশুনোর দরকার হতো না। তবে বারবার করে যে-কথা বলতে হয়, আরও বেশি করে অর্থনীতির ভিতরে প্রবেশ করতে পেরেছিলাম রবিবার কিংবা অন্যান্য ছুটির দিনে অমিয়বাবুর বাড়ি হাজির হতাম বলে। ভিতরের বারান্দায় তিনি একটি বেতের চেয়ারে বসতেন, আমি সামনে দাঁড়াতাম, হয়তো কোনও দেওয়ালের গা ঘেঁষে। তিনি একটির পর একটি অর্থনীতির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন : হয়তো তত্ত্বগত সমস্যা, হয়তো কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা, যার বিশেষ অর্থনীতিগত ব্যঞ্জনা আছে, কিংবা কোনও সমসাময়িক দিশি কিংবা আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে। তিনি বলতেন, আমি শুনতাম, কোনও প্রশ্ন করার দরকার হতো না, তিনি প্রতিটি বিষয়েই প্রাঞ্জলতম। মাঝে-মাঝে চা-জলখাবার আসত, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই খেতাম। আমি খুব কম বই পড়েছি, খুব কম বইয়েরই নাম জানতাম। অমিয়বাবু কোনও ব্যাপারেই নামাবলী আস্ফালন পছন্দ করতেন না। বাড়তি বই পড়লেই, তিনি বলতেন, বাড়তি বিষয় জানা হয় না, বরঞ্চ একটি বিশেষ বই ভালো করে পড়তে উপদেশ দিতেন, তাঁর ছাত্রাবস্থায় তিনি যেমন অ্যালফ্রেড মার্শালের 'প্রিন্সিপিলস্ অফ ইকনমিক্স' আদ্যোপান্ত পড়েছিলেন প্রতিটি পাদটীকাসহ। এ ব্যাপারে কলকাতার অধ্যয়নসংস্কৃতি নিয়ে তাঁর বিশেষ আপত্তি ছিল : 'ওঁরা ফুলঝুরির মতো ক্লাসে নামের তালিকা ছড়ান। এক ধরনের অস্বাস্থ্যকর আদিখ্যেতা, ছেলেমেয়েরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে এই-বই ওই-বইয়ের খোঁজ করে, এই-নাম ওই-নাম মুখস্থ করে, বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবার সুযোগ পায় না। কলকাতার ছাত্র-ছাত্রীদের মতো দুর্ভাগা কেউ নেই, তবে অপরাধটা ওদের নয়, ওদের মাস্টারমশাইদের'।

তা হলেও দিন গুনতাম কবে গ্রীষ্মাবকাশ বা শীতাবকাশ বা শারদাবকাশ শুরু হবে। সঙ্গে-সঙ্গে পঞ্জাব মেলে চড়ে কলকাতায়, ভেসে যাওয়া কলকাতার কাঙ্ক্ষিত আড্ডায়। কাশীতে নতুন করে কারও সঙ্গে তেমন পরিচয় হয়নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি সমিতি খুব সক্রিয়, মাঝে-মাঝেই চড়ুইভাতি অথবা নাটক অথবা সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন। এ সমস্ত অনুষ্ঠানে মাস্টারমশাইদের সদ্যোদ্ভিন্নযৌবনা কন্যা বা ভ্রাতুষ্পুত্রীরাও যোগ দিতেন, ছাত্রদের চাঞ্চল্য স্বভাবতই একটু বাড়তো।

পুনরুক্তি করছি, কাশীতে ওই কয়েকটা মাস থাকার সবচেয়ে বড়ো লাভ, অমিয় দাশগুপ্ত মশাইয়ের কাছে অর্থশাস্ত্রে হাতেখড়ি, যা সারাজীবন আমার পাথেয় জুগিয়েছে। অন্য যে-লাভের কথা সেই সঙ্গে বলতে হয়, তাঁর এবং তাঁর স্ত্রী শান্তি মাসিমার কাছ থেকে অপত্য স্নেহপ্রাপ্তি। ঘরের ছেলে হয়েই গিয়েছিলাম, ঘরের ছেলে হয়েই থেকেছি পরবর্তী চল্লিশটিরও বেশি বছর। সুখে-দুঃখে আপদে-বিপদে আমাকে অভয় জুগিয়েছেন তাঁরা, উপদেশ বর্ষণ করেছেন, ভর্ৎসনা করেছেন। আমার জীবন যে-আদল পেয়েছে তার জন্য অনেকাংশেই তাঁরা দায়ী। কখনও-কখনও আমার অবিমৃষ্যকারিতা তাঁদের আহতও করেছে। এ বিষয়ে বেশি কিছু লিখতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে বলে মনে হয়।

কাশীবাসে অন্যতর লাভ হয়েছিল ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীত ঠেসে শোনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রধান আকর্ষণ সংগীত কলেজ, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ তার অধ্যক্ষ। অনেক প্রথিতযশা সংগীতজ্ঞ কলাবিশারদ অতিথি হিশেবে আসতেন। সংগীত কলেজের প্রাঙ্গণ ঢেকে মস্ত সামিয়ানা টাঙানো হতো। ভোর রাত্রিতে আকাশে যখন ফিকে রঙের ছোপ লাগতো, ততক্ষণ পর্যন্ত সংগীতে অবগাহন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে। তবে এখন যেন কেমন খটকা লাগছে, বছরজোড়া যাঁদের সংগীত শুনে ধন্য হয়েছি, তাঁদের মধ্যে মুসলমান ওস্তাদদের তালিকা ধু-ধু

শাদা। সেই অভাব অবশ্য দু'বছর লখনউ থাকাকালীন পরে পুরো মিটিয়ে নিতে পেরেছিলাম।

বরাবরই বন্ধুসর্বস্ব দিনাতিপাত আমার, কিন্তু কাশীতে তেমন কোনও সখাসংগ্রহের সৌভাগ্য ছিল না। তবু, বলতেই হয়, কী করে যেন মরভি হস্টেলের এক দঙ্গল ফার্মেকোলজি পাঠরত বাঙালি ছাত্রের সঙ্গে ভীষণ দোস্তি হয়ে যায়। দু'জনের কথা একটু বেশিভাবে মনে পড়ে : মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ও অনিল সেনগুপ্ত। তারা আমাকে প্রায়ই নেমন্তন্ন করে তাদের মেসে খাওয়াতো, প্রচুর অশ্লীল বাংলা গানে, এমনকি রবীন্দ্রনাথের নানা গানের কথা বদলে নিয়ে পর্যন্ত, সুধাসিঞ্চিত করতো। তাদের কাছে একটি বিশেষ ঋণের কথা আমৃত্যু ভুলতে পারবো না। এম.এ পরীক্ষায় বসেছি, পরীক্ষা চলছে, হঠাৎ অসতর্কতার কারণে কানের কোণ পেকে উঠে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়লো। সারা মুখ ফুলে ঢোল, অসম্ভব ব্যথা, শরীরে জ্বর। সাতসকালে পরীক্ষা দিতে বসবো; দুঃসহ ব্যথায় কাতর আমি, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মাঝরাত্রে প্রায় এক মাইল হেঁটে মরভি হস্টেলে পৌঁছুলাম। বন্ধুরা সেঁকের ব্যবস্থা করলো, কেউ সাইকেল চেপে কোনও অজ্ঞাত পাড়া থেকে এক হাতুড়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলো, তিনি কড়া পেনিসিলিন ছুঁচ দিয়ে শরীরে ঢুকিয়ে দিলেন, ভোরবেলা জ্বরমুক্ত, বেদনামুক্ত হয়ে পরীক্ষা দিতে বসলাম।

এই পরীক্ষার ঋতুরই অন্য তিনটি স্মৃতি। তখনও আপেক্ষিক সস্তা গণ্ডার দিন। বিড়লা হস্টেলে টানা বারান্দার পাশে আমার ঘরের জানালা, তা ঘেঁষে পড়ার টেবিল, বিকেল থেকে শুরু করে অনেক রাত্রি পর্যন্ত পরীক্ষার পড়া চলতো। একটি চিনেবাদামওলাকে মাসের গোড়ায় দশ টাকা আগাম দিয়ে রেখেছিলাম। সে প্রতি বিকেলে টেবিল উজাড় করে চিনেবাদাম ছড়িয়ে দিয়ে যেত, বাদাম ভেঙে নুন সহকারে চিবোতাম, রাজকীয় সুখ, বিকেল কেটে গাঢ় রাত্রির সমাগম। আর যা মনে পড়ছে, অনিল সেনগুপ্ত, বিশ্বনাথ পাড়া থেকে সাইকেলে তার হস্টেলে ফেরবার পথে, পাঠরত আমার সঙ্গে মসকরা করবার উদ্দেশ্যে বিড়লা হস্টেলের পাশ দিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে আমার প্রিয়তম রবীন্দ্রনাথের গান উঁচু গলায় গাইতে-গাইতে যেত, যেন মনে করাবার জন্য, অর্থনীতিতে পরীক্ষায় বসা তুচ্ছাতিতুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথের গানের মোহ এড়িয়ে আমি অযথা কেন অন্ধ নরকে নিজেকে বন্দী করে রাখছি। পরীক্ষা-সংক্রান্ত শেষ স্মৃতি : ভোরবেলা পরীক্ষা, একটি মাঠের মধ্য দিয়ে পরীক্ষার হলের দিকে যাচ্ছি। একগাদা ইটের পাঁজা জড়ো করা এক জায়গায়, সদ্য-উদিত রোদের কিরণচ্ছটার আভায় রক্তলাল হয়ে যাচ্ছে। এখনও, কাশীতে পরীক্ষায় বসার কথা মনে এলেই, আমাকে আওড়াতে হয় : রোদে রাঙা ইটের পাঁজা, তার উপরে বসলো রাজা, ঠোঙা ভরা বাদামভাজা, খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না।

একটু আগে যা বলেছি, কাশী থেকে প্রতি ছুটিতে কলকাতা। প্রথমবার এসেই দেখি কলকাতার চেহারা পালটে গেছে। বারুদের গন্ধ। দুপুরে-বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে, তার বাইরে কলেজ স্ট্রিটে, ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের নিত্যনৈমিত্তিক সংঘর্ষ। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ঢুকেও পুলিশ কর্তৃক ছাত্রদের তাড়া করা। একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলাম একদিন। পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে সঙিন বাগিয়ে একতলা থেকে দোতলায়, দোতলা থেকে তেতলায় আশুতোষ বিল্ডিং-এ পেটো-নিক্ষেপকারী ছাত্রদের হন্যে হয়ে খুঁজছে, অথচ এরই মধ্যে, কলকাতায় তখনও গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হয়নি, কোনও ক্লাসঘরে ছাত্রছাত্রীরা নিরুদ্বিগ্নে ইতিহাস বা ইংরেজি সাহিত্যের উপর অধ্যাপকের বক্তৃতা নিবিষ্ট চিত্তে শুনছে,

বাইরে বোমা-বন্দুকের দুন্দুভি। চোরাগোপ্তা ইটপাথর বা বোমা ছুঁড়ে ছাত্রদের এ গলিতে-ও গলিতে অহরহ ঢুকে যাওয়া, কখনও পুলিশের গুলি, কখনও একজন-দু'জন হতাহত। ফুটপাথে-সাজানো বইয়ের দোকানগুলির পাশে রক্তের দাগ না-মেলানোর আগেই ছিটকাপড়, খেলনা কিংবা অন্য কোনও সামগ্রীর সম্ভার ছড়িয়ে ফেরিওয়ালাদের জীবিকা-নিষ্ঠা, যেন সব কিছুই অতি সাধারণ। কলকাতার ছাত্রসমাজ আরও বেশি বামপন্থার দিকে ঝোঁকা, মধ্যবিত্তদের বড়ো অংশও। তখন থেকেই কলকাতার লালদুর্গ হিশেবে খ্যাতির শুরু, যদিও কমিউনিস্ট পার্টি তখনও বেআইনি।

কলকাতায় বন্ধুদের ঢল, কবিদের ভিড়, পাশাপাশি রাজনীতির মাতোয়ারাও। দেশটাকে আমূল নতুন করে গড়তে হলে মার্কসীয় ভাবাদর্শের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই : প্রতিদিন এই প্রতীতিতে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে আসা। অথচ, পার্টির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ, আমার তখনও হয়নি। হয়নি আরও প্রায় বছর পনেরো। তাতে আনুগত্যে ঘাটতি ঘটেনি, রক্ত পতাকায় তখন থেকেই আমার ঘোর-লাগা অনুরাগ।

এম.এ পরীক্ষার ফল বেরোলো, কলকাতায় ফল বেরোবার আগেই কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল প্রকাশিত, একটু চিমটি কেটে কলকাতাস্থ সহপাঠীদের সঙ্গে আমার রসিকতা বিনিময়। কিন্তু সমস্যা, এখন তো সরকারি তকমা-আঁটা বেকার, বেশ কয়েক মাস ধরেই বেকার। ইতিমধ্যে আমার কাকা কলকাতায় চলে এসেছেন, পিসির বাড়ির কাছাকাছি বাড়ি ভাড়া করেছেন। ওখানেই আমার আস্তানা। প্রতিদিন টালা পার্ক থেকে কলেজ স্ট্রিট কি বালিগঞ্জ বাসে চেপে চলে আসি। কখনও দুপুরে কাকিমার আশ্রয়ে ফিরি, দ্বিপ্রাহরিক আহারের উদ্দেশ্যে, কখনও তা-ও না, একেবারে রাত দশটা বাজিয়ে তবে ফেরা। এখন ভাবতে অবাক লাগে, কত বাসের ছড়াছড়ি ছিল কলকাতায় তখন; নাকি ভুল বললাম, আসলে বাসের তুলনায় জনসংখ্যার হ্রস্বতাহেতুই ওরকম মনে হত। একটু বেশি রাত্রে দু-নম্বর বাসে চেপে ফিরতে হবে, এই বাসটা পছন্দ হলো না, অস্যার্থ বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ আরও একটু প্রলম্বিত করা। পাঁচ মিনিট বাদে যে-খালি বাসটা এল, তাতে লাফিয়ে চড়ে বসা, কিংবা তাতেও না, কারণ ইতিমধ্যে আতোয়ার রহমান জীবনানন্দের 'সাতটি তারার তিমির' প্রকাশ করেছেন সত্যজিৎ রায়ের আঁকা উগ্র নীল প্রচ্ছদ-সহ। সুরঞ্জন হঠাৎ এসে-যাওয়া পরের বাসটির সামনে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলো, 'অই বাসে যেয়ো নাকো তুমি'।

হাওয়া বদলের পালা। আমি মার্কসবাদে ও কমিউনিস্ট পার্টির দিকে ঝুঁকছি, বুদ্ধদেব বসু বিপরীতমুখো হচ্ছেন, উগ্র থেকে উগ্রতর, উগ্রতর থেকে উগ্রতম। কবিতাভবনের প্রাক্তন বন্ধুরা আসা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন, আমরা কচিকাঁচারাই শুধু যাই। আমি কিন্তু গিয়ে প্রায়ই ঝগড়া করি। ঢাকা থাকাকালীনই আমাকে বুদ্ধদেব যেসব চিঠি লিখতেন, তা থেকে আমার একটা মস্ত উপকার হয়েছিল। তিনি ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, আমার কাব্যপ্রতিভা প্রায় শূন্যের কোঠায়, অথচ সঙ্গে-সঙ্গে গভীর মমতার সঙ্গে জানাতেন, আমার গদ্যের হাত ভালো, খুব ভালো, খুবই ভালো। উদ্ধত অর্বাচীন বয়স, তখন ঠিক মানতে চাইতাম না তাঁর এই মহামূল্য উপদেশ। তবে সেটা গৌণ, আমার সঙ্গে বুদ্ধদেবের তখন বিতণ্ডা রাজনৈতিক আদর্শের প্রেক্ষিতে। পুরনো 'চতুরঙ্গ' ঘেঁটে, কিংবা প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের তরফে প্রচারিত, বুদ্ধদেবের ফ্যাসিবিরোধী আদি রচনাগুলি পড়ছি, সোমেন চন্দ-র হত্যা নিয়ে ক্রোধ-ও আবেগ-মিশ্রিত তাঁর দীর্ঘ কবিতা, কিংবা 'ফ্যাসিবাদ ও সভ্যতা' নামে লম্বা প্রবন্ধ। মনে পড়ছে প্রতিভা বসু পর্যন্ত 'ফ্যাসিবাদ ও নারী' নামে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের পুস্তিকা

লিখেছিলেন একদা, সম্ভবত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপরোধে। তাঁদের কাছে সে-সব এখন বাতিল।

রিপন কলেজের কাজ বুদ্ধদেব বসু তখন বেশ কয়েক বছর হলো ছেড়ে দিয়েছেন। কলেজ তেমন-একটা সুখের সময় ছিল না তাঁর কাছে। স্বভাবলাজুক, চ্যাংড়া ছাত্রকুল সামলাতে ঘোর অপটু তিনি। ছাত্রদের ভয়ই পেতেন বোধহয়, ছুতো পেলেই কলেজ কামাই করতেন। গল্পটি বুদ্ধদেব নিজেই আমাকে বলেছিলেন। অধ্যক্ষের ঘরে টেলিফোন, একদিন কাউকে ফোন করে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন, শুনতে পেলেন এক ছাত্র আর একজনকে বলছে, 'জানিস, শালা জাহানারাকে ফোন করে এলো'। জাহানারা চৌধুরী তিরিশের দশকের এক চলবলে বহুগুণবতী উত্তেজক মহিলা, 'স্কুলের মেয়ে' নামে একটি বই লিখে নাম কুড়িয়েছিলেন, বুদ্ধদেব বসু সে-বইয়ের এক গদোগদো আলোচনাও করেছিলেন কোনও পত্রিকায়, সম্ভবত 'মৌচাক'-এ। হয়তো, কবিতাভবন থেকে পুস্তক প্রকাশ করতে গিয়ে, অনভিজ্ঞতার কারণেই, প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তাঁর; নতুন প্রজন্মের রুচি পাল্টেছে, বুদ্ধদেবের গল্প-উপন্যাসের কাটতি ভীষণ কমে গেছে। স্পষ্ট বোঝা যেত, সপরিবার ঈষৎ অনটনের মধ্যে আছেন। আমার সঙ্গে মতের মিল নেই, আমাকে উপেক্ষা করে নরেশ গুহ-অরুণকুমার সরকারের কবিতার দিকে তাঁর পক্ষপাত। অথচ মুগ্ধ হয়ে যেতাম বুদ্ধদেবের নিষ্ঠা ও তিতিক্ষা লক্ষ্য করে। প্রতিদিন নিয়ম ধরে লিখছেন, নিয়ম ধরে পড়ছেন, সংস্কৃত ভালো জানতেন না, কোনও পণ্ডিতপ্রবরের কাছ থেকে শিখতে শুরু করেছেন। আমাদের মতো ফিচকের দল অসময়ে এসে বিরক্ত করছি, কিন্তু তাঁর অভ্যর্থনায় কোনও যতিমুহূর্ত নেই। আমাকে 'সাতটি তারার তিমির' সমালোচনার জন্য দিয়েছিলেন। গায়ে আমার তখনও 'বৌদ্ধ' গন্ধ। 'কবিতা' পত্রিকায় যে-সমালোচনা বেরোলো, তা যথেষ্ট বিরূপ। জীবনানন্দের পছন্দ হয়নি, পরে আমাকে তিনি বলেওছিলেন তা। তবে জীবনানন্দের সেই ক্ষোভের ঋতু নিশ্চয়ই খুব সংক্ষিপ্ত ছিল।

কিছুদিন বাদে বুদ্ধদেব এক কপি 'দ্রৌপদীর শাড়ি' হাতে ধরিয়ে দিলেন, 'কবিতা'র জন্য সমালোচনা চাই। আমি ঠোঁটকাটা লম্বা বহরের আলোচনা লিখলাম, এবার বুদ্ধদেবের অসন্তোষ, লেখাটি 'কবিতা'-য় অন্তর্ভুক্ত হলো না। ততদিনে আতোয়ার রহমানের সঙ্গে আমার নিবিড় বন্ধুত্ব। তিনি উঁচিয়েই ছিলেন, তবে 'কবিতা'-য় প্রত্যাখ্যাত সমালোচনা সঙ্গে-সঙ্গে 'চতুরঙ্গ'-এ বের করতে আমার বিবেকে বাধলো, সৌজন্যে বাধলো। আতোয়ারকে রাজি করাতে পারলাম যে, কোনও-কোনও ক্ষেত্রে কৌতুকেরও দাঁড়ি টানতে হয়।

এই বেকার মাসগুলিতেই নরেশ গুহর সঙ্গে সখ্য পল্লবিত হওয়া। আমার চেয়ে অন্তত চার বছরের বড়ো নরেশ, সাত বছরের বড়ো অরুণকুমার সরকার ও সুরঞ্জন দু'জনেই। তবে ওরকম কবিতার-প্রেমে-উচ্ছন্নে-যাওয়া যুবক সম্প্রদায়ের কাছে এমনধারা বয়সের ফারাক আদৌ ধর্তব্য নয়, অন্তত আমাদের ক্ষেত্রে ধর্তব্য ছিল না। নরেশ তখন সদ্য চারুচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা গ্রহণ করেছেন, সত্যেন দত্ত রোডে নতুন ফ্ল্যাট নিয়েছেন, আনকোরা নতুন বাড়িতে, দোতলায়, উত্তর দিকে অপরিসর ব্যালকনি সমেত। ওই ফ্ল্যাটে আমাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আড্ডা, লেখালেখিও। নিরুপম চট্টোপাধ্যায় ঘোর বুদ্ধদেবপ্রেমিক, চাইবাসা না বিহারের অন্য কোথাও থেকে কলকাতায় জড়ো হয়েছে, তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কিন্তু আসল এঁচোড়ে পাকা। আলাপের প্রথম দিনেই আমাকে অনুপ্রাসবিন্যাসে শিক্ষা দিল, 'অশোক তোশকে শুয়ে মশক মারিল'।

নরেশ অতি ভদ্র অতি সংস্কৃত মানুষ; খানিকটা বুদ্ধদেবকে অনুসরণ করতে গিয়ে, খানিকটা অমিয় চক্রবর্তীকে, দুই কবি তথা শ্রদ্ধাবান শিক্ষকের দোটানায় পড়ে ঈষৎ বিচলিত। সেই দ্বৈত দেবভক্তির পর্ব ওঁর একটু কাটলো বছর পনেরো-ষোলো বাদে যখন অমিয় চক্রবর্তী মার্কিনিদের ভিয়েতনাম লীলাকেলির ঘোর বিরোধী হয়ে গেলেন, মার্কিনদের চাবকে প্রবন্ধ লিখলেন।

আমরা অন্যরা আজন্ম নাস্তিক, যাঁরা ভক্তির ছুৎমার্গ-বিলাসী তাঁদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে-আক্রমণে টিট করতে ভালোবাসি। সুতরাং প্রতিদিন নরেশরূপী অভিমন্যু বধের পালা। কিন্তু ওঁর ভালোত্বের-তুলনা নেই, এই এতগুলি দশক, স-চিনু, আমাদের অত্যাচার সহ্য করে আছেন। এখন তো সবাই জীবনের উপান্তে, অরুণ-সুরঞ্জনের মতো কেউ-কেউ ইতিমধ্যেই অন্তর্হিত।

ওই বছরগুলিতে, সুরঞ্জন ও অরুণকে যেমন, নরেশকেও আমি রাশি-রাশি চিঠি লিখেছি, ক্ষণিকের মস্তিষ্কবিকৃতিহেতু কোনও মাসে প্রতিদিনই। ক্যাম্বিসের দুটো বিরাট ঝোলায় সংরক্ষিত ছিল আমার কাছে লেখা সে-সব চিঠি। বন্ধুদের লেখা চিঠি, জীবনানন্দ-বুদ্ধদেব-সুধীন্দ্রনাথের চিঠি, পুরনো মাস্টারমশাইদের চিঠি, দু'-একজন বান্ধবীর চিঠি, সবই এখন হারিয়ে গেছে কোথায়। প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে, আমি তখন বিদেশে, কলকাতার বাড়িতে যে-তোরঙ্গের মধ্যে চিঠিগুলি রাখা ছিল, তা কোন জাদুবলে অদৃশ্য হয়ে যায়। জীবনে এর চেয়ে বড়ো শোক পাইনি। অথচ কী ভয়ংকর বিপদ, কয়েকদিন আগে নরেশ হঠাৎ জানালেন, তাঁকে লেখা আমার সমস্ত চিঠি তাঁর জিম্মায় এখনও অটুট অবস্থায় আছে, সেগুলি প্রকাশ করবার জন্য অনুমতি প্রার্থনীয়। পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে ওঁর উপর যে-অত্যাচার চালিয়েছি, তা নিয়ে অভিযোগবোধ হয়তো নরেশের হৃদয়ে সুপ্ত ছিল, এবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। একেই বোধহয় বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ।

মজার ব্যাপার, যদিও আতোয়ার রহমানের সঙ্গে ময়মনসিংহের সেই ছাত্র সম্মেলনের সময় থেকেই সামান্য আলাপ ছিল, পাকাপাকি পরিচয় হলো নরেশেরই সূত্রে ১৯৪৯ সালে, কফি হাউসে। আমার সঙ্গে আতোয়ার রহমানের চরিত্রগত কোনও মিলই নেই। তিনি শৌখিন, আমি আটপৌরে। তিনি দুর্দান্ত ট্রটস্কিপন্থী ; আমি, বাজারে গুজব, নিকষ স্টালিনবাদী। ছাত্রাবস্থা থেকেই আতোয়ারের পয়সাকড়ির অভাব ছিল না। জনশ্রুতি, একবার ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনের প্রাক্কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রীদের নিজের পয়সায় লাইটহাউসে সিনেমা দেখিয়েছিলেন ; নির্বাচনে তাঁর জয় আটকায় কে। অন্যদিকে আমাদের পরিবারে তখন প্রচণ্ড আর্থিক দুর্গতি। শিয়ালদহে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তু না-হলেও, খুব একটা রকমফের নেই। এ এক অদ্ভুত রসায়ন, পঞ্চাশ বছর ধরে আতোয়ারের সংসার ও আমার সংসার একাকার হয়ে আছে। আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে আতোয়ারের অকস্মাৎ মৃত্যু সত্ত্বেও সেই অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেনি। নরেশকে পেরিয়ে, প্রায় নরেশকে এড়িয়েই, আমি 'চতুরঙ্গ'-এর বাঁধা লেখক হয়ে গেলাম, 'চতুরঙ্গ'-এর আড্ডার বাঁধা খদ্দের! তা ছাড়া, 'চতুরঙ্গ' মানেই তো তখন পাশের ফ্ল্যাটের 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও প্রকাশক সত্যপ্রসন্ন দত্তর নিত্য সাহচর্য। অথচ যাঁরা এখানে নিয়মিত জড়ো হতেন, তাঁদের অধিকাংশেরই রাজনৈতিক বিশ্বাস আমার মতের ঘোর পরিপন্থী।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সত্যপ্রসন্ন দত্ত তাঁদের উঠতি-বাঙালি ধনতান্ত্রিক মানসিকতার অঙ্গে

ভাসা-ভাসা ট্রটস্কিবাদের অঙ্গরাগ চড়িয়েছিলেন। গণেশচন্দ্র এভিনিউর ওই দালানেই পাশের অন্য-একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন শিলু পেরেরা, শ্রীলঙ্কার একদা ডাকসাইটে ট্রটস্কিপন্থী নেতা এন এম পেরেরার একদা-সহধর্মিণী, এন এম পেরেরা একটা সময় সিরিমাভো বন্দরনায়েকের মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী হয়েছিলেন। শিলু পেরেরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পুলিশ এড়িয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন, যুদ্ধ শেষ হলেও কলকাতাতেই থেকে গেলেন, হয়তো কলম্বোর খেয়ালি মেজাজের সঙ্গে কলকাতার কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন বলেই। পাশের অন্য একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন অজিত রায় মুখুজ্যে এবং তাঁর জর্মান সহধর্মিণী; এঁরাও নাম-লেখানো ট্রটস্কিপন্থী। 'চতুরঙ্গ'-এর আড্ডায় আর হাজির থাকতেন ঘনিষ্ঠ সুহৃদ নৃপেন্দ্র সান্যাল, এবং নিকষ ট্রটস্কিপন্থী ইন্দ্র দত্ত সেন, যাঁকে আমরা সবাই 'বড়দা' বলতাম ; সত্যপ্রসন্ন দত্তকে ডাকতাম 'বড়োবাবু'। হংস মধ্যে বক অথবা বকের ভিড়ে হাঁস হয়ে আমি উপস্থিত। যে-সমস্ত গোঁড়া কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে পরে পরিচয় হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে একমাত্র রবীন সেনেরই ট্রটস্কীয় আদর্শে কিছুদিন পথ চলা ছিল, গণেশ এভিনিউর ফ্ল্যাটে চল্লিশের দশকের শেষের দিকে তাঁকেও দু'-একদিন দেখেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ তো 'শেষের কবিতা'র সর্বশেষ কবিতায় বলেই গেছেন, 'তোমারে ছাড়িয়ে যেতে হবে'; রবীন সেন কয়েক বছরের ব্যবধানে কমিউনিস্ট পার্টিতে ফিরে আসেন।

এম. এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশিত, ছাত্র নই আর, এরপর কী করবো জানি না। চিরকাল তো বেকার থাকা চলে না, কাশীতে মাস্টারমশাই অমিয় দাশগুপ্ত উদ্বিগ্ন। অবশেষে কলকাতার কুহকিনী আড্ডা আমাকে ছাড়তেই হলো। কাকতালীয়, একই দিনে তিনটি বেকারত্ব ঘোচাবার মতো চিঠি পেলাম : পশ্চিম বাংলায় সরকারি কলেজে অধ্যাপনার কাজ, দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্স-এ রাণাডে গবেষক হওয়ার আমন্ত্রণ, এবং, যা সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক, বঙ্গীয় কায়স্থ মহাসভা না ওরকম নামের কোনও সংস্থা থেকে মাসিক একশো টাকা মাইনেতে গবেষণা কর্মযোগে আহ্বান, গবেষণার নির্দিষ্ট বিষয় 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যই ব্রাহ্মণ ছিলেন কি না'। তৃতীয় সম্ভাব্য চাকরিটি সুরঞ্জন সরকারের কীর্তি; সে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিল বিডন স্ট্রিট বা অন্য কোথাও দপ্তর-খোলা সংগঠনটি এক কায়স্থসন্তান খুঁজছে গবেষণা কাজের জন্য। গবেষণার বিষয় ও সিদ্ধান্ত পূর্ব থেকেই স্থিরীকৃত, মাসিক একশো টাকার বিনিময়ে তা ঝটপট লিখে দিতে হবে। ওঁদের নাকি মূল বক্তব্য, পিরেলি-ফিরেলি বাজে কথা, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পূর্বসূরিরা আসলে ভাগলপুরে বসবাসকারী কায়স্থ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ, ওখান থেকে উত্তরবঙ্গে পৌঁছে ব্যবসাবাণিজ্যে পয়সাকড়ি করেছিলেন, অতঃপর কলকাতায় এসে চিৎপুর অঞ্চলে বসবাস। চিৎপুর পাড়াময় ছুতোর-মুচি-চামাররা ছড়ানো; হঠাৎ আগত পয়সাওয়ালা লোকদের তারা 'ঠাকুর' বলে সম্মানীয় সম্বোধন করতে শুরু করলো, তা থেকে ঠাকুর বংশপরিচয়। এই প্রতিপাদ্যটি গুছিয়ে লিখে দিলেই নাকি তিন মাসের কড়ারে মাসে একশো টাকা প্রাপ্য। সুরঞ্জন কালবিলম্ব না-করে আমার নামে এক দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছিল, অবশ্যই আমাকে না-জানিয়ে।

নিকট গুরুজনদের কথা অমান্য করে সরকারি কলেজে অধ্যাপনা গ্রহণ করলাম না, কায়স্থ মহাসভার হাতছানিও ফিরিয়ে দিলাম, ভি কে আর ভি রাওয়ের উৎসাহ-ভরা লম্বা চিঠি পেয়ে ট্রেনে চেপে দিল্লিমুখো।

দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্স-এর সেটা প্রথম কি দ্বিতীয় বছর। তখনও নিজস্ব দালান তৈরি হয়নি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগের একটি অংশে বিজয়েন্দ্র কস্তুরি রঙ্গ বরদারাজা

রাওয়ের সাম্রাজ্য। রাও মহাশয়ের সঙ্গে সহকারী অধ্যক্ষ হিশেবে বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : মাটির মানুষ, অর্থনীতিতে কৃতিত্বের পাশাপাশি সাহিত্যে ও সংগীতে রুচিবান, রাধাকুমুদ-রাধাকমল মুখোপাধ্যায়দের ভাগিনেয়। আমার বাল্যকালে উনি কিছুদিন অমিয়বাবুদের সহকর্মীরূপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। মা'র মুখে শুনেছি, একদিন আমাদের বাড়িতে এসে নাকি অর্গান বাজিয়ে 'হে ক্ষণিকের অতিথি' গেয়েছিলেন। রাও মহাশয় বরাবরই উচ্চনাদ, হম্বিতম্বি করা তাঁর পছন্দ। যতক্ষণ স্কুলের পরিখার মধ্যে থাকেন, চেঁচিয়ে পাড়া মাত। অন্যদিকে বীরেনবাবু নম্র, স্বল্পবাক, সুমিষ্ট নিচু কণ্ঠস্বর, মুখ তুলে কথা বলতেও যেন ঈষৎ জড়তা।

ঢাকায় আমার অন্যতম মাস্টারমশাই পরিমল রায় পুরনো দিল্লির যমুনাবর্তী মেটকাফ হাউসে আই এ এস শিক্ষানবিশদের জন্য যে-বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল, তার অধ্যাপক হয়ে এসেছেন। তিনিও সপ্তাহে একদিন দিল্লি স্কুলে পড়াতে আসতেন। আর যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য ঘোর কাশ্মিরী পৃথ্বীনাথ ধর, যিনি পরে ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রণালয়ের সচিবরূপে, এবং তারও পরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যতম প্রধান রাজপুরুষ হিশেবে, খ্যাতিমান। আমার চেয়ে বয়সে অনেকটা বড়ো। পৃথ্বীনাথ ধর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরমহলের ছাত্রদের জন্য সদ্য-নির্মিত আবাসনস্থল গয়্যার হলেরও প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। গয়্যার হলেই আমার থাকবার জায়গা নির্দিষ্ট: দোতলায় বিলিতি প্রথায় বড়ো স্যুইট, একদিকে বসার জায়গা, সোফা-কোচ সমেত, অন্যদিকে শয়নকক্ষ, লাগোয়া ব্যালকনি, যা থেকে দিল্লির নিচু-নিচু পাহাড়-বনরাজি দেখা যায়। স্নানের জায়গা একটু দূরে, কিন্তু তা-ও ঝকঝকে। এক তলায় মস্ত খাবার ঘর, পাশে প্যান্ট্রি, প্যান্ট্রির ওধারে দরাজ রান্নাঘর, তিন-চারটে কী তারও বেশি চুল্লি জ্বলছে, সম্ভ্রান্ত হোটেলের কেতামাফিক শুভ্র পোশাক ও তেকোণা শাদা টুপি-পরা পাচকের দল। নানা প্রদেশ থেকে গবেষক-ছাত্রদের ভিড়, বেশ কিছু বিদেশী ছাত্রও, এমনকি খোদ মার্কিন দেশ থেকে পর্যন্ত। সদ্য স্বাধীন দেশ, প্রধান মন্ত্রীর নাম জওহরলাল নেহরু, প্রশাসনের পীঠস্থান নতুন দিল্লি, সেই পীঠস্থানে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়, যে-বিশ্ববিদ্যালয়ের এতদিন তেমন নামডাক ছিল না, কিন্তু এখন থেকে অন্যরকম হতে বাধ্য। ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গয়্যার স্বাধীনতার মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, তাঁরই নামাঙ্কিত আমাদের বাসকুঞ্জ।

ঠাঁট-ঠমকের অভাব নেই, তবে বাংলা প্রবচন তো বহুদিন আগে থেকেই শিক্ষা দান করে এসেছে, বাহির বাড়িতে লণ্ঠন, ভিতর বাড়িতে ঠনঠন। রাও উদ্যোগী পুরুষ, যত না স্কুলের গণ্ডির মধ্যে থেকে অধ্যয়নচর্চায় নিজেকে নিযুক্ত করছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি সময় ব্যয় করছেন সদ্যগঠিত স্কুল অফ ইকনমিক্স-এর জন্য টাকা তোলার ব্যাপারে। এখানে যাচ্ছেন, ওখানে যাচ্ছেন, এঁকে ধরছেন, তাঁকে ধরছেন, টাটা গোষ্ঠীকে ধরে অর্থ আদায় করে লেডি রতন টাটার নামে স্কুলের গ্রন্থাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করছেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিবিধ কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত, দেশময়, তথা বিদেশময়, বক্তৃতা দিচ্ছেন, নানা কমিটির সদস্য হিশেবে কাজ করছেন। সদা ব্যস্ত, সহকর্মীদের উপর, ছাত্রদের উপর চোটপাট করে বেড়াচ্ছেন, অথচ তাঁর মধ্যে একটি ছেলেমানুষও লুকিয়েছিল। কোনও অভ্যাগত এসেছেন, স্কুলে বক্তৃতা দেবেন, রাও মহাশয় তাঁর পরিচয় দিতে ওঠার ভণিতায় ছেলেমেয়েদের অবধারিত শোনাতেন, 'জানো, আমি গত তিন বছরে এগারোবার মার্কিন দেশে গিয়েছি, এই ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলার সঙ্গে ওখানেই প্রথম পরিচয়।' তাঁর শিশুসুলভ আচরণের অন্য

একটি নমুনা : করিডোর দিয়ে যাচ্ছি, ওঁর সঙ্গে দেখা, আমাকে ধরে হাত দুলিয়ে তাঁর সহাস্য উক্তি, 'জানো অশোক, এই সপ্তাহে আমাদের লাইব্রেরিতে চার টন বই আসছে।'

কেমব্রিজের অতি মেধাবী ছাত্র, ভারতীয় অর্থব্যবস্থা নিয়ে চমৎকার গবেষণা করেছেন। বিবেকানন্দ-ভক্ত, পরোপকারী, কিন্তু তাঁর আচরণে-বিচরণে, ছেলেমানুষির গা ঘেঁষে, কোথাও এক ধরনের সামন্ততান্ত্রিক অহমিকাও। সামাজিক বিচারে তাঁর চেয়ে যিনি একটু খাটো, তাঁকে প্রায় অকারণে আঘাত দিয়ে কথা বলবার প্রবণতা রাও সাহেবের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এটা বোধহয় স্বাধীনতা-উত্তর যুগের প্রথম অধ্যায়ের সমাজচূড়ামণিদের বৈশিষ্ট্য। আরও অনেককেই, যাঁদের সঙ্গে আমার পরে পরিচয় হয়েছে, এই গোত্রভুক্ত করতে পারি।

অধ্যাপক রাওয়ের ঘোর অশিষ্টাচারের একটি স্মৃতি এখনও মনে দাগ কেটে আছে। আজকের পরিভাষায় যাঁদের বলা হয় নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ, তাঁদের অন্যতম, জন হিকস, এবং তাঁর স্ত্রী উরসুলা হিকস—তিনিও অর্থনীতিবিদ—সে বছর দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্সে মাস তিনেকের জন্য পড়াতে এসেছিলেন। তাঁদের চলে যাওয়া উপলক্ষ্যে স্কুলের তরফ থেকে বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন, সবাইকে নিয়ে গ্রুপ ফোটো তোলা হবে। দেশে যা সাংস্কৃতিক নিয়ম, ছাত্রছাত্রীরা নিচে শতরঞ্চির উপর বসলো, নয়তো পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। মধ্য সারণিতে চেয়ারের সারি, শিক্ষকবৃন্দ বসবেন, মধ্যমণি অবশ্যই রাও সাহেব, তাঁর এক পাশে হিকস, অন্য পাশে মিসেস হিকস। বীরেন গাঙ্গুলি মশাই কী কারণে যেন একটু দেরি করে এলেন, ততক্ষণে চেয়ারগুলি সব ভরাট হয়ে গেছে, তাঁর জন্য বসবার জায়গা নেই। ডক্টর রাও তড়াক করে উঠে এদিক-ওদিক তাকালেন, তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো চেয়ারের সারির একপ্রান্তে উপবিষ্ট শ্রম-অর্থনীতি বিষয় নিয়ে পড়ানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত সদ্য-নিযুক্ত এক অতিনিরীহ গাড়োয়াল-সন্তানের উপর। যুবক শিক্ষকটির নাম নলিনীকান্ত পন্থ। রাও সাহেবের চড়া গলায় হুকুম, 'নলিনী, তুমি উঠে পিছনে গিয়ে দাঁড়াও, হাজার হলেও তুমি এখনও অস্থায়ী লেকচারার'। আমি অন্তত, মনে-মনে বললাম, ধরণী দ্বিধা হও।

আট

দিল্লিতে নতুন-নতুন মানুষজনের সঙ্গে আলাপ। ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতে ক্রমে-ক্রমে সামান্য দুরস্ত হলাম। স্থানীয় ছাত্র ফেডারেশনেরও ঘনিষ্ঠ হওয়া গেল। প্রতি সন্ধ্যাতেই কোনও-না-কোনও বক্তৃতা বা বিতর্ক বা সংগীতের অনুষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রাঙ্গণে-ওই প্রাঙ্গণে, অথবা দিল্লির কোনও কলেজে। অনেক মিশ্র আড্ডা; আড্ডা দিচ্ছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি, সর্ব অর্থে সাবালক হচ্ছি, প্রতি রবিবার সকালে কনৌট প্লেসে গিয়ে প্রচুর বিদেশী সিনেমা দেখছি।

সময় কাটছে বিবিধ প্রসঙ্গে, কিন্তু কাজের কাজ গবেষণা কিছুই এগোচ্ছে না। অথচ রাও মহাশয় আমাকে নিযুক্তিপত্রেই লিখেছিলেন, যেহেতু আমি অমিয় দাশগুপ্তের পেয়ারের ছাত্র, আমার গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং পরামর্শদাতা হবেন। কী নিয়ে গবেষণা করবো খেটে-খুটে তার একটি দশ পৃষ্ঠার চুম্বক তৈরি করে তাঁর কাছে দাখিল করে অপেক্ষায় থাকি, খোদ পরামর্শদাতাকে অথচ আর ধরতে পারি না। সপ্তাহ যায়, মাস যায়, বছরই বুঝি গড়িয়ে যায়, তিনি রাজকার্যে ব্যাপৃত, নয়তো স্কুলের জন্য হন্যে হয়ে এই তল্লাট-ওই তল্লাট থেকে অর্থ সংগ্রহ করছেন। সাত-আট মাস প্রতীক্ষার পর একদিন ওঁকে অবশেষে ধরা গেল। ঘরে ঢুকে সবিনয়ে নিবেদন করলাম, 'আপনার দফতরে আমার গবেষণা-চুম্বকটি মাস কয়েক আগে রেখে গিয়েছিলাম, আপনি দয়া করে পড়ে উঠতে পেরেছেন কি? যদি পড়ে থাকেন, তা হলে আপনার মতামত জানতে পেলে উপকৃত হবো'। শুনে রাও সাহেব মহাকুপিত। গলা উঁচু পর্দায় চড়িয়ে বললেন, 'অশোক, আমার বদ্ধমূল ধারণা আমার বন্ধু দাশগুপ্তর কাছে তুমি ঠিকমতো অনুশীলন পাওনি, তোমাকে দাশগুপ্ত বড্ড বেশি আদুরে করে তুলেছে। গবেষণা মানে নিজে চিন্তা করবে, চিন্তা করে বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করবে, সে-সব নিয়ে বিস্তৃত সিদ্ধান্তে পৌঁছে নিজের উপর নির্ভর করে লিখবে, অথচ সে-সব কিছু না করে তুমি আমার কাছে এসে ঘ্যানর-ঘ্যানর করছো। আমি দুঃখিত'। গোস্তাকি মাফ করতে হয় বলে আমার পড়ি-কি-মরি প্রস্থান।

পরিমলবাবুকে গিয়ে সবিস্তারে জানালাম। বরাবরের মতো ওঁর মুচকি হাসি, সেই সঙ্গে আড্ডার বিভঙ্গে উক্তি, 'দিল্লি এসেছো, লাড্ডুটা খেয়েছো, এবার আরাম করে পস্তাও'। যে-কয় মাস দিল্লিতে ছিলাম, আমার প্রধান প্রস্থানই ছিল পরিমলবাবুর মেটকাফ হাউসের বাড়ির নিয়মিত রবিবাসরীয় আড্ডায়। নিটোল বাঙালি আড্ডা। নীরদচন্দ্র চৌধুরী অবশ্য আসতেন না, তিনি সাহেবসুবো বাদে কারও বাড়িতেই পদধূলি দিতেন না। যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের কথা মনে পড়ছে। আসতেন বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী, সাহিত্যরসিক, 'কবিতা' পত্রিকায় একবার বাংলা ছন্দ নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, পেশায় সরকারি চাকুরে, বেতার বিভাগে। আর আসতেন দিল্লি পলিটেকনিকে ইংরেজির অধ্যাপক দিলীপ সান্যাল : একদা বোধ হয় 'শনিবারের চিঠি'-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন,

পরে কলকাতা থেকে কিছুদিন 'সমসাময়িক' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। দিলীপবাবু কথা বলতেন, অফুরন্ত কথা, বিভিন্ন বিষয়ে কথা, তবে শুনতে খারাপ লাগতো না, এলেম ছিল বলার ধরনধারণে, বিষয়বস্তুতে আকর্ষণও ছিল। আর একজন ছিলেন, তখনও তরুণ অধ্যাপক, কলকাতারই ছাত্র। তিনিও সমানে কথা বলে যেতেন, অন্য কাউকে সুযোগ না দিয়ে। মুশকিল হলো, তাঁর বচনে সমস্ত জায়গা জুড়ে আমিত্ব, খানিকবাদে একঘেয়ে ঠেকতো, অন্যদের যে বিরক্তি উৎপাদন হচ্ছে, তা বোঝবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। এখন তিনি অগ্রগামী বার্ধক্যে; অবসর জীবনে কথা বলার সুযোগ কমে গেছে বলেই হয়তো, এখানে-ওখানে অজস্র লিখে যাচ্ছেন। একটি ব্যাপারে তাঁর চরিত্র অনড় : অন্যদের যে বিরক্তি উৎপাদন করছেন, উপলব্ধি করার ক্ষমতা এখনও তাঁর নেই।

আর যাঁরা পরিমলবাবুর আড্ডায় নিয়মিত হাজির, তাঁদের মধ্যে ছিলেন খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, রামযশ কলেজে অর্থনীতি পড়াতেন, কিছুদিন পরিমলবাবুর বাড়িতেই ছিলেন। কোনওদিন গিয়ে যদি খগেনবাবুর খোঁজ করতাম, পরিমলবাবু ভাববিহীন মুখে বলতেন, 'উনি সদ্য দশ ঘণ্টা ঘুমিয়ে উঠেছেন, ঘুম থেকে উঠে পদ্মাসন হয়ে আধ ঘণ্টা ধরে নিদ্রার শ্রান্তি দূর করবার জন্য একটু বিশ্রাম করছেন'। মাঝে-মাঝে আসতেন পরিমলবাবুর ছাত্র, এবং ঢাকাতে আমার কিছুদিনের মাস্টারমশাই, সমররঞ্জন সেন। তিনি তখন থেকেই বরিষ্ঠ সরকারি আমলা, পরে বরিষ্ঠতর হয়েছেন, ওরকম অতিথিবৎসল মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়। তাঁর স্ত্রী শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী, অনীতা সেন, সেই সুবাদে ওঁদের বাড়িতে শান্তিনিকেতন থেকে দিল্লিতে বেড়াতে-আসা অনেক গুণী শিল্পীর সংগীত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সমসাময়িকা সুশীলা জুন্নরকরও তখন দিল্লিতে, ইতিমধ্যে অমলেন্দু দাশগুপ্তের সঙ্গে পরিণীতা। অমলেন্দু তখন কেন্দ্রীয় তথ্য বিভাগে, না কি বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসে।

পরিমলবাবুর ওখানে আড্ডা দিতাম, রানিদি যত্ন করে খাওয়াতেন, কোনও এক সপ্তাহে কী কাজে বুদ্ধদেব বসু এলেন, সন্ধ্যাবেলা মেটকাফ হাউসের বাইরে যমুনাসংলগ্ন মাঠে বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে পা ছড়িয়ে আমাদের ঢাকা-কাব্য-সাহিত্য-ঘেঁষা বিশ্রম্ভালাপ। যমুনার ওপারে এবড়োখেবড়ো ঘাস, একটি-দু'টি জীবজন্তু চরছে, হঠাৎ বুদ্ধদেব উল্লসিত উৎসাহে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বললেন, 'দ্যাখো, দ্যাখো, কী সুন্দর একটা হরিণ ঘাস চিবুচ্ছে'। পরিমল রায়, তাঁর প্রথামতো ভাববিকাররহিত, সংক্ষেপে জানালেন, 'ওটা হরিণ নয়, বাছুর'। বুদ্ধদেব হতাশ।

বাঙালি আড্ডায় দিল্লিতে মশগুল হচ্ছি, মার্কসবাদী বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো, পৃথ্বীনাথ ধরের সঙ্গে আলাপ জমলো। শীলা বাহাদুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী, সে মাঝে-মাঝে গয়্যার হলে এসে ধর সাহেবের খোঁজ করতো, প্রেমের প্রথম পর্বের মায়াঞ্জন তাঁর দু'চোখে। বিবাহের পর শীলা সংগীতজ্ঞ হিশেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, কিন্তু পৃথ্বীনাথের গানে তেমন ভক্তি আছে বলে তখনও মনে হয়নি, এখনও মনে হয় না। তখন তাঁর কমিউনিস্ট অনুরাগের ঋতু, আমার কাছাকাছি আসার তা-ও বোধ হয় অন্যতম কারণ। একদিন সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন কক্ষে সভা ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে। ছাত্র ফেডারেশনের মস্ত চাঁই হরিশচন্দ্র, পরে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিল, বিয়ে করেছিল চীনে-পাঠানো মেডিক্যাল মিশন-খ্যাত ডক্টর অটলের কন্যাকে। ১৯৫০ সালে জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে তিব্বত নিয়ে চীন সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের চুক্তি

সদ্য-সদ্য সই করা হয়েছে, বামপন্থী মহলে উচ্ছ্বাস। চুক্তির সমর্থনে ছাত্র ফেডারেশন দ্বারা আহূত সভা। আমি আর পৃথ্বীনাথ ধর একসঙ্গে গেছি, পিছন দিকের আসনে বসেছি। নির্বিঘ্নে চলছিল সব কিছু, হঠাৎ সম্ভবত-জর্জ-ফার্নান্ডেজের-ভক্ত কিছু যুবক, চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সভাকক্ষে সরব। হরিশ নিজেই দক্ষতার সঙ্গে ব্যাপারটা সামলে দিচ্ছিল, কিন্তু পৃথ্বীনাথের সেটা উগ্র রুশ-চীন ভালোবাসার ঋতু। হঠাৎ আমার পাশ থেকে উঠে দাপিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'মারো বুদ্ধুলোগোকো'। বহু বছর ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় না। সময় পাল্টে গেছে, কাহিনীটি মনে করিয়ে দিলে লজ্জায়-অনুশোচনায় নিশ্চয়ই লাল হয়ে উঠবেন।

রাও সাহেবের ভর্ৎসনার বিবরণ নিয়ে রঙ্গপালা শেষ হওয়ার পর পরিমল রায় পরামর্শ দিলেন, সব জানিয়ে অবিলম্বে অমিয়বাবুকে যেন চিঠি দিই। চিঠি দিলাম, অমিয়বাবু সক্রিয় হলেন। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির কেউকেটা, বিনয় দাশগুপ্ত মশাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও আমার কথা জানতেন, এম এ পরীক্ষায় আমার একটি পেপার পরীক্ষা করে অতিশয় আহ্লাদিত হয়েছিলেন; তিনিও উপাচার্য নরেন্দ্র দেবকে বললেন। বিনয়বাবুর তার পেলাম : অবিলম্বে যেন বাক্সপ্যাঁটরাসুদ্ধু লখনউয়ের ট্রেনে চাপি, সোজা তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠি। রাও সাহেবকে না বলেই, তাঁর কাছে অনুমতি না নিয়েই, পলায়নপর হলাম, অবশ্য তিনি তখন দেশেও ছিলেন না। লখনউ পৌঁছুলাম, চারবাগ স্টেশন থেকে টঙ্গায় চেপে নতুন হায়দরাবাদ পাড়ায় বিনয়বাবুর বাড়িতে। বাড়ির বাইরের বারান্দা-সংলগ্ন অতিথি গৃহে তোফা রাত্রিবাস। পরদিন বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ঘরে ইন্টারভিউ। কয়েক মিনিট গড়ালেই বুঝতে পারলাম ইন্টারভিউটি নেহাতই মামুলি, অমিয় দাশগুপ্ত মহাশয় চিঠি দিয়েছেন, ডি পি সাব প্রশংসা করেছেন, বিনয়বাবুর সুপারিশ। আচার্য নরেন্দ্র দেব, দেবতুল্য মানুষ, আগে থেকেই মনস্থির করেছেন, আমাকে একটা-দুটো স্বাস্থ্যসূচক প্রশ্ন করলেন, বাকি সময় নির্বাচন কমিটির অন্যান্যরা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ব্যস্ত রইলেন, আমি নির্বাক শ্রোতা। পরদিন কলকাতার ট্রেন ধরলাম, সুরঞ্জন ততদিনে আতোয়ার রহমানের গণেশ অ্যাভেনিউস্থ 'চতুরঙ্গ'র ফ্ল্যাটে নিজেকে স্থানান্তরিত করেছে। আমিও ওখানে প্রশ্নহীন নিরুদ্বিগ্নতার সঙ্গে উঠলাম, পাচক-অভিভাবক-সর্বময় কর্তা আতিকুল্লা-র তৃতীয় প্রজা হিশেবে। দু'দিন বাদে লখনউ থেকে বিনয়বাবুর চিঠি, লেকচারারের পদে নিযুক্ত হয়েছি, বড়োদিনের ছুটির পর কাজে যোগ দিতে হবে।

প্রায় দু'-বছর লখনউতে পরম আরামে মনের সুখে পড়ানোর কাজ করেছি। যেদিন কাজে যোগ দিতে পঞ্জাব মেল ধরে লখনউ রওনা হলাম, সেদিনও কফি হাউসে সন্ধ্যা অবধি আড্ডা। ট্রেনের সময় হয়ে গেছে, সম্ভবত জল খাচ্ছিলাম, জলের গ্লাস নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে হুড়মুড় করে ট্যাক্সিতে চাপা। লখনউ পৌঁছে পরদিন হজরতগঞ্জের কফি হাউসে চিঠিতে ব্যাখ্যাসহ গেলাসটি জমা দিলাম, গেলাসটি পরে ওঁরা কলকাতায় কলেজ স্কয়্যারের কফি হাউসে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কিনা জানতে আমার বিবেক পীড়িত হয়নি কখনোও।

লখনউ নিয়ে প্রগলভ্ হওয়ার আগে একটি অন্তিম দিল্লিকাহিনীর বিবৃতি সেরে নিই। আমলা শহর দিল্লি, কিন্তু তখন থেকেই সেই সঙ্গে বৈশ্য শহরও। এক রবিবার সকালে কনৌট প্লেস পাড়ায় সিনেমা দেখতে এসেছি, ছবি শেষ হলে সিন্ধিয়া হাউসের বাসস্টপে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছি। দিল্লিতে পরিবহনের হাল এমনিতেই করুণ, রবিবার আরও

বেশি বেহাল। দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি বিশ্ববিদ্যালয়মুখো বাসের জন্য। প্রায় চল্লিশ মিনিট গত, বাস আর আসে না, এমন সময় একটি ঝলমলে কালো রঙের মস্ত মার্কিন গাড়ি, রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়ালো, চালকই একমাত্র আরোহী, দুরন্ত পোশাক, চোখে কালো চশমা, বিশুদ্ধ ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন আমার গন্তব্য কোথায়, তিনি লিফ্ট দিতে পারেন কিনা, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যাচ্ছেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে পাশে গিয়ে বসলাম, গাড়ি চললো, ধনবিজ্ঞানে গবেষণা করছি জেনে চালক জানালেন তিনি দর্শন শাস্ত্রের অনুরাগী, অস্তিত্ববাদ নিয়ে প্রচুর কিয়ের্কগার্দ-হিদেগার-সার্ত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন। আলাপ জমলো, আমার মন্তব্য, তাঁর প্রতি-মন্তব্য, বুদ্ধির চর্চায় প্লাবিত হলাম। গয়্যার হলে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে তাঁকে বিদায়ী ধন্যবাদ জানাতে উদ্যত হয়েছি, হঠাৎ দার্শনিক ভদ্রলোক দ্রুত ডান হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আট আনে'।

কাশীর গেরুয়া সংস্কৃতিতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলাম এক বছর-দু'বছর আগে, প্রতিতুলনায় লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রথম দর্শনেই ভারি হৃদয়-জুড়োনো ঠেকলো। ক্যানিং কলেজের গথিক স্থাপত্যের নিদর্শন-ঠাসা পুরনো ঘরবাড়ি, চারপাশে অপেক্ষাকৃত নতুন অট্টালিকার সারি, বাদশাবাগে বৃক্ষনিবিড় অধ্যাপকদের কোয়ার্টারপুঞ্জ, কেয়ারি-করা ফুলের বাগান, টেনিস কোর্ট ইত্যাদি। তখনও পর্যন্ত লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে উগ্র প্রাদেশিকতার ছোঁয়া লাগেনি, বরং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে শিক্ষককুল বিশের দশক থেকেই জড়ো হয়েছিলেন বলে বেশ খানিকটা ঔদার্যের পরিমণ্ডল। বিশিষ্ট একটি মিশ্র সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়কে আচ্ছন্ন করে : একদিকে অযোধ্যার তালুকদার সম্প্রদায়ের বনেদিয়ানা, পাশাপাশি একগাদা তরুণ মার্কসবাদী শিক্ষকের চিন্তাভাবনার প্রভাব। সহবতের শহর লখনউ, হিন্দুস্থানি সংগীতচর্চার কেন্দ্রভূমি, আদবকায়দার বিচ্ছুরণে তকল্লুফের বন্যা। তার উপর, কে অস্বীকার করবে, ইসাবেলা থোবার্ন কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হওয়া অসংখ্য সুন্দরী মেয়ে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মানবিক সৌন্দর্যের চমৎকার সংশ্লেষণ। ক্যানিং কলেজ থেকে এক ফার্লং দূরবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দফতরের সঙ্গে সংযোগকারী সুদৃশ্য রাস্তাটিকে অভিবাদন জানাতেই যেন, দীর্ঘ জম্বুপুঞ্জ ; যতবার হেঁটে গেছি, বারবার রবীন্দ্রনাথের চরণখণ্ড, 'জম্বুপুঞ্জে নীল বনান্ত', মনে ধাক্কা দিয়েছে।

সমাজতন্ত্রে গভীর বিশ্বাসী জননায়ক নরেন্দ্র দেব মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তাঁর অদৃশ্য কিন্তু অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ-ইঙ্গিতের প্রসাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ মিত্রতা-মদির তথাচ অভিনব। অভিজাত, কিন্তু সব কিছু তবু অতি সহজা-সচ্ছল। আরও যা বলতে হয়, একা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সংস্কৃত করতে, উন্নত করতে, শাণিত করতে যথেষ্ট। লখনউ জুড়ে ডিপি সাহেবের খ্যাতি। আমার এক বন্ধু কলকাতা থেকে একবার চিঠি পাঠিয়েছিলেন, 'অশোক মিত্র, প্রযত্নে ডি পি, উত্তর ভারত'। সেই চিঠি বেপাত্তা হয়নি, নিশানা ভুল করেনি, কারণ ডাক বিভাগেও ধূর্জটিপ্রসাদের অনেক ছাত্র, শিষ্য ও ভক্ত। আমি যখন হাজির হলাম, রাধাকুমুদ-রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এই দুই বিশ্রুত মনীষী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তবে রাধাকমল তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাংলোতে থাকছেন, প্রতি সকালে তাঁর বাসগৃহে গবেষক-ছাত্রদের ভিড়। অন্যান্য বাঙালি অধ্যাপকরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ আলো করে আছেন : ইতিহাসে কালিকারঞ্জন কানুনগো ও শৈলেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, যিনি ক্ষিতিমোহন সেনের মধ্যম জামাতা; দর্শন শাস্ত্রে সম্মানিত অধ্যাপক প্রবাদপ্রতিম সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং তাঁর স্ত্রী সুরমা

দাশগুপ্ত ; রসায়নে অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এ.সি চ্যাটার্জি নামে সমধিক পরিচিত, সেই ধ্যানচাঁদের আমল থেকে এক নাগাড়ে প্রায় তিরিশ বছর ভারতীয় হকি ফেডারেশনের কর্ণধার। অবশ্যই উল্লেখ্য ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, যাঁর স্ত্রী চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত প্রথম যুগের রবীন্দ্রসংগীত গায়িকাদের মধ্যে অগ্রগণ্যা। তা ছাড়া নৃতত্ত্ব বিভাগে ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, কথায়-বার্তায় সামান্য হাম্‌বড়া, কিন্তু কৃতী পুরুষ। এত বছরের ব্যবধানে অন্য অনেক নাম ভুলে গেছি। ঈষৎ মনে পড়ছে আর একজনের কথা, বোধহয় অর্থনীতি বিভাগের, ভুজঙ্গভূষণ মুখোপাধ্যায়। বাণিজ্য বিভাগে বিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় তো প্রায় সম্রাট হিশেবেই বিরাজ করতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অখণ্ড প্রতিপত্তি। সবশেষে ঈষৎ সন্তর্পণে আর একজনের কথা বলি, ধনবিজ্ঞানী, বাণিজ্য বিভাগে আমার সহকর্মী ছিলেন, ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, খুব কম মানুষই তাঁকে এখন চিনবেন, তিনি সিগনেট প্রেসের নীলিমা দেবীর প্রথম স্বামী। ভূপেনবাবুর দ্বিতীয় বিবাহও সুখের হয়নি। সজ্জন, চাপা মানুষ, লোকেরা তাঁকে কৃপা করে, এই প্রতীতির ফলে আরও কুঁকড়ে থাকতেন।

সুরেন দাশগুপ্ত মশাই তখন খুবই অসুস্থ, বাড়ি থেকে বেরোতে পারতেন না, সুরমাদিকে পড়াতে যেতে হতো, আমি অনেক সময় পরমজ্ঞানী দার্শনিককে সঙ্গে দান করে আসতাম। দু'জনেই স্নেহ করতেন প্রচুর, ছেলেমানুষ আমার সঙ্গে প্রায় কৌতুকবিনিময়ের সম্পর্ক। দাশগুপ্ত মশাই মাঝে-মাঝে রঙ্গ করতে বলতেন, যদি বদ্যি মেয়ে বিয়ে করতে চাই, ওঁকে যেন বলি, ওঁর জানা অনেক ভালো-ভালো মেয়ে আছে।

লেকচারার হিশেবে মাসে তিনশো পঁচিশ টাকা মাইনে পেতাম, খরচ করে ওঠা যেতো না। লখনউতে পৌঁছে প্রথম দু'-একমাস নিউ হস্টেলে ছিলাম। নির্মল সিদ্ধান্ত মহাশয় দিল্লিতে কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হয়ে গেলেন; শ্রীমতী সিদ্ধান্তও সঙ্গে গেলেন। তাঁদের মেয়ে রঞ্জনা—অপু—মার্কিন দেশে পি-এইচ ডি. করছে, ছেলে কলকাতায় চাকুরিরত। সিদ্ধান্ত মহাশয়ের বাদশাবাগের বাড়ি খালি পড়ে আছে, অথচ ব্যবস্থাপনার জন্য লোকজনের অভাব নেই। ধূর্জটিবাবু আমার জন্য ওই বাড়ির একটি অংশে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি, আর সদ্য কেমব্রিজ থেকে পি. এইচডি. করে ফেরা, কেন্দ্রীয় ড্রাগ রিসার্চ গবেষণাগারে ক'দিন আগে যোগ দেওয়া, সুভদ্র, অতি চমৎকার দেখতে নিত্যানন্দ, আমরা দু'জন সিদ্ধান্ত-নিলয়ে বিনিপয়সার তালুকদার হয়ে রইলাম। যে-অংশটিতে আমি থাকতাম তার একটি ঘরে আলমারি-বোঝাই শার্লক হোমস ও আগাথা ক্রিস্টি ; রাত জেগে এক-একটি আগাথা ক্রিস্টি কাহিনী নিয়ম করে নিধন করতাম।

বি.এ-বি.কম ক্লাসে হিন্দিতে পড়ানোর রেওয়াজ শুরু হয়ে গিয়েছিল, তাতে আমার সুবিধাই, রাজভাষা যেহেতু জানি না, লেকচারের দায়ভার সপ্তাহে মাত্র দশটি, পাঁচদিন করে প্রতিদিন দু'টি পিরিয়ড। সাড়ে ন'টায় শুরু হয়ে সাড়ে এগারোটায় আমার দিনের পালা সমাপ্ত হতো, কিংবা মধ্যিখানে এক ঘণ্টার বিরতি দিয়ে সাড়ে বারোটায়। তারপর থেকে নিশ্ছিদ্র নিশ্চিন্ত অবসর। অবশ্য, কয়েক মাস গত হলে, ধূর্জটিবাবু মাঝে-মাঝে তাঁর ক্লাসে আমাকে দিয়ে বক্তৃতা দেওয়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। একবার একাদিক্রমে দুই সপ্তাহ ধরে কেইনস সাহেবের সাধারণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলাম ; ধূর্জটিবাবু ছোট্ট করে বলেছিলেন, 'ছেলেরা তারিফ করেছে'।

বাচ্চা ছেলে হলেও ভালোই পড়াতে পারছি জেনে নরেন্দ্র দেব মহাশয়ও বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন। কখনো-কখনো ছুটির দিনে আমাকে বাসস্থান থেকে তুলে নিয়ে কফি

হাউসে যেতেন, আমার উগ্র বামপন্থী কথাবার্তা একটু প্রশ্রয়ের সঙ্গেই শুনতেন। সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ওঁর লেখা একটি হিন্দি প্রবন্ধ বাংলায় অনুবাদ করে 'চতুরঙ্গ'-এ ছাপিয়েছিলাম, খুশি হয়েছিলেন খুব। মাত্র একদিনই আমাকে মৃদু ভর্ৎসনা করেছিলেন। কলকাতা সে-সময় ক্রমশ অগ্নিগর্ভ, কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। ছ'-সাত বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে, অভিভাবকের সঙ্গে ট্রামে যাচ্ছে, হাতে খেলনা পিস্তল ঘুরে-ঘুরে তাগ করে যাত্রীদের বলছে, 'কংগ্রেসকে যদি ভোট দাও, তোমাকে গুলি করে মারবো'। আমি ঈষৎ শ্লাঘার সঙ্গে নরেন্দ্র দেব মশাইকে কাহিনীটি বলতেই ওঁর মুখ গম্ভীর, তারপর ছোটো মন্তব্য : 'তোমরা হিংসার বাতাবরণ আমদানি করছো, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের যে সর্বনাশ হবে তা চিন্তা করছো না'। আমার হয়তো কিছু বলবার ছিল, কিন্তু সম্মানীয় মানুষ, নিরুত্তরই রইলাম।

সিদ্ধান্ত মহাশয়ের বাড়িতে আমাদের কয়েকমাস থাকার পর অপু আমেরিকা থেকে ফিরে এলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে কাজ শুরু করলো, আমি অন্যত্র সরে গেলাম। বিনয়বাবুই দুই বিচিত্র ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন : শ্যামকিষেণ কিচলু ও গামাণ্ডিমল বান্টিয়া। শ্যামকিষেণ কাশ্মিরি, গামাণ্ডিমল রাজস্থানী। কিন্তু তাঁদের সেই পরিচয় উহ্য। দু'জনেই বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাসময় থেকে সদস্য, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্ধ ভক্ত। এই দুই বাউণ্ডুলে বন্ধু কী করে যেন ম্যাল অ্যাভিনিউর অতি অভিজাত পাড়ায় করাচিতে-চলে-যাওয়া কোনও মুসলমান তালুকদারের বিরাট বাগানঘেরা প্রাসাদের দোতলাটি দখল করে ছিলেন, একতলা পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা এক সিন্ধি পরিবার ভোগ করেছিলেন। শ্যামকিষেণরা তাঁদের দখলদারি থেকে একটি বড়ো আয়তনের আলোকোজ্জ্বল ঘর ও সংলগ্ন তকতকে বাথরুম আমাকে ভাড়া, কিংবা উপভাড়া, দিলেন, মাসিক দক্ষিণা পঞ্চাশ টাকা। আহা, সে ভারি সুখের সময় ছিল। প্রতিদিন সকালে কফি হাউসে প্রাতরাশ সেরে বিশ্ববিদ্যালয়ে, সাড়ে এগারোটা নয়তো সাড়ে বারোটার মধ্যে পড়ানো শেষ, হেঁটে হজরতগঞ্জে পৌঁছনো, সেখানে 'রঞ্জনা' নামে এক রেস্তোরাঁয় দুপুর-রাত্রি দু'বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা, এখানেও মাসে পঞ্চাশ টাকা দেয়। মিচকে লোকে বলতো, রেস্তোরাঁটির নামকরণের প্রেরণা নাকি জুগিয়েছিল স্বয়ং অপু, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত-তনয়া রঞ্জনা। দুপুরে আহার সেরে ম্যাল অ্যাভিনিউর ঘরে ফিরে যাওয়া। মাঝে-মাঝে একতলার সিন্ধি পরিবারের তিনটি তরুণী কন্যা, যৌবনযন্ত্রণায় দীর্ণ, একটু-আধটু উত্ত্যক্ত করার চেষ্টা করতো। তাদের এড়িয়ে দোতলায় নিজের ঘরে, নিদ্রা কিংবা বই পড়া। বিকেল যখন সন্ধ্যার দিকে গড়িয়ে যেত, হজরতগঞ্জের কফিহাউসের দিকে পুনঃপ্রস্থান।

কফি হাউস সরগরম। ধূর্জটিপ্রসাদ তো এসেইছেন, অধ্যাপকবৃন্দের একটি বড়ো অংশও। সংগীত নিয়ে আলোচনা, মেটাফিজিক্স কি সাংখ্য দর্শন, অথবা অর্থনীতি-রাজনীতি, বিশেষ করে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ে কচকচানি, কারণ রামমনোহর লোহিয়াও পৌঁছে গেছেন, আচার্য নরেন্দ্র দেব তো একটু আগে থেকেই ছিলেন। এক কোণে তাঁর নিজের দলবল নিয়ে ফিরোজ গান্ধি, পরে লোকসভায় অত্যন্ত সরব হলেও কফি হাউসে তত মুখর হতেন না, অন্যদের আলাপচারিতা শুনতেন। নৃতত্ত্ব বিভাগের ধীরেন মজুমদার মহাশয়, ঢাকাই বাঙাল, ঠোঁটকাটা। একদিন ফিরোজ আমাদের টেবিলের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, ধীরেনবাবু উচ্চস্বরে বললেন, 'এই নির্বাক লোকটা আড়াই লক্ষ ভোটে শাজাহানপুর থেকে জিতেছে। যদি জিতে না-ও থাকে, শিগগিরই জিতবে, নেহরু-মাহাত্ম্য, ভারতীয় গণতন্ত্র'।

কফি হাউসের আড্ডা ছুটির দিনেও সমান জমাট। অনেকের সঙ্গে কমিউনিস্ট-নেতা জাইন

আহমেদও জড়ো হতেন, কখনও-সখনও লখনউ বেড়াতে-আসা অরুণা আসফ আলি, কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে হবো-হবো করছেন। বিশেষ একজনের কথা উল্লেখ না করা অন্যায় হবে : অর্থনীতি বিভাগে আমার সতীর্থ, বীরবাহাদুর সিংহ। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাসমারোহে 'মার্কস ক্লাব' পরিচালনা করতো। প্রতি বছর মাত্র একটি সভা বসতো, বিষয়, মার্কসবাদের তাৎপর্য। শুরুতেই শেষ, এলিয়ট সাহেব তো বলেই গেছেন সেটাই নিয়তি, সারা বছর 'মার্কস ক্লাব' আর একবারও মিলিত হতো না।

কয়েকমাস বাদে বিনয় দাশগুপ্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র পরিমল, ডাক নাম অংশু, প্যারিস থেকে ফিরলো, সরবোন-এর ডিগ্রি-সমেত, ইতিহাসে মস্ত পণ্ডিত। বিনয়বাবুর খুশি উপচে পড়ে, অংশুর জন্য বাড়ির প্রাঙ্গণে আলাদা স্যুইট তৈরি করে দিলেন, আমাদের অবারিত আড্ডার আর একটি জায়গা হলো। তবে পৃথিবীতে বোধহয় অবিমিশ্র সুখ বলে কিছু নেই। অংশুর সঙ্গে পরিচয় ও আড্ডা দেওয়ার কল্যাণে আমাদের কয়েকজনের প্রায়ই ওই বাড়িতে নৈশাহারের নিমন্ত্রণ থাকতো। মুশকিল দেখা দিল বেশি রাত হলে আহারান্তে অংশু প্রায়ই বলতো, 'চলো, তোমাদের ছেড়ে দিয়ে আসি'। প্রমাদ গুণতাম আমরা, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাড়া থেকে গোমতী নদী পেরিয়ে পুরনো শহরে ঢোকবার মুখে মাঙ্কি ব্রিজের উপর অংশুর ঝরঝরে ফোর্ড গাড়ি অবধারিত বন্ধ হয়ে যেতো, ভরা পেটে সেই গাড়ি অতঃপর আমাদের চড়াইতে ঠেলতে হতো। একটা সময় এলো, ওর নৈশাহারের নিমন্ত্রণ আমরা সভয়ে, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে, প্রত্যাখ্যান করতে লাগলাম।

বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলের বাইরে নতুন হায়দরাবাদ পাড়া, অভিজাত বাঙালি বসতি। ওখানে তখন বাড়ি করেছিলেন অসিতকুমার হালদার। সরকারি কলাভবনে ছিলেন বীরেশ্বর সেন। পুরনো বিপ্লবী স্বদেশী নেতা কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গেও ওখানে পরিচয়, তাঁর কন্যাদ্বয় গীতা ঘটক ও রীতা গঙ্গোপাধ্যায় বর্তমানে সংগীতজগতে বিখ্যাত,অবশ্য তখন তারা নেহাত বালিকা। বিনয় দাশগুপ্ত আমিনাবাদে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন পাহাড়ী সান্যালের অগ্রজ ধীরেন সান্যালের সঙ্গে, ভাইয়ের মতোই স্নেহোচ্ছল, অতিথিবৎসল; যতবার ওঁর কাছে গেছি, গভীর তৃপ্তি নিয়ে ফিরেছি।

তবে ধূর্জটিপ্রসাদের বাড়ির আড্ডাই লখনউতে পরমতম আকর্ষণ। ধূর্জটিবাবুর বাকচাতুর্যের তুলনা নেই। ইংরেজিতে বলছেন, বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানিতে বলছেন, শান্তিপুরি সুসংস্কৃত বাংলায় বলছেন। খেয়ালি মানুষ, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাচ্ছেন, অর্থনীতি থেকে দর্শনে, দর্শন থেকে ইতিহাসে, ইতিহাস থেকে সমাজতত্ত্বে, সমাজতত্ত্ব থেকে ব্যাকরণতত্ত্বে, পাণিনি বিশ্লেষণে, অতঃপর উদয়শঙ্কর প্রসঙ্গ উঠতে নৃত্যচর্চা, পরমুহূর্তে শিশির ভাদুড়ীতে পৌঁছে গেছেন। আবর্তের মতো ঘুরে-ঘুরে আসতো কথার তোড়, গল্পের তোড়, চিমটি কাটার তোড়। আমাদের প্রায় সমবয়সী, রাম আদবানি নামে একটি ছেলে, হজরতগঞ্জে একটি সুশোভন বইয়ের দোকান খুলেছিল। কফি হাউসে ঢোকবার আগে বা পরে আমরা প্রত্যেকেই ওর দোকানে ঢুঁ মারতাম, বিদেশ-থেকে-আসা টাটকা বইয়ের সম্ভার, যথাসাধ্য কিনতাম। ধূর্জটিবাবুর বাড়িতে রাম টাঙ্গা বোঝাই করে বই পাঠিয়ে দিত ওঁর বাছাইয়ের জন্য। ধূর্জটিবাবু প্রতি সপ্তাহে টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্ট ও এডুকেশনাল সাপ্লিমেন্ট রাখতেন; যে কোনও হালের বইয়ের কথা তাঁর ঠোঁটের ডগায়, সিগারেট যেমন।

অনেকের সম্পর্কে অনেক গল্প শুনিয়েছেন তিনি, নিদর্শন হিশেবে মাত্র দু'টির উল্লেখ করবো। ঘোর ব্রাহ্ম হেরম্ব মৈত্র, কলেজ স্ট্রিট থেকে পড়ন্ত বিকেলে বাড়ি ফিরবেন, বাসের

জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। কোনও বাসই তাঁর পছন্দ হয় না : কোনও বাসের নাম শিব, কারও দুর্গা, কারও সরস্বতী, অন্য কারও বা পার্বতী। অবশেষে রাত যখন ন'টা ছুঁই-ছুঁই, একটি বাস এলো, 'সত্যনারায়ণ'। হেরম্ববাবু উঠে চালকের পাশে গিয়ে বসলেন, সত্য রক্ষা হলো। অপর এক গল্প। লখনউবাসী এক বাঙালি ব্যারিস্টার, ঘোর সাহেবিভাপাপন্ন, নাম এইচ. কে. ঘোষ, লোকেরা জনান্তিকে বলতো হেঁচকি ঘোষ। অতুলপ্রসাদ সেনের প্রয়াণ দিবস, শোকে-মুহ্যমান হেঁচকি ঘোষ হাঁক পাড়লেন, 'বেয়ারা, মেরা রোনেকো কুর্তা লাও।'

ধূর্জটিপ্রসাদের বাড়িতে যখন আড্ডা বসতো, ছায়ামাসি প্রতি আধঘণ্টা অন্তর কফি সন্দেশ-সহ পাঠাতেন, নিজের হাতে বানানো সন্দেশ। ধূর্জটিবাবুর আড্ডায় আমরা এমন কি দোহার গাইবারও ঠিক সুযোগ পেতাম না, তিনি একাই একশো। কফি হাউসে যাঁরা যেতেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে ধূর্জটিপ্রসাদের বাড়িতেও উপস্থিত। আড্ডার নেশা, কিংবা ধূর্জটিপ্রসাদের কণ্ঠবৈভবের মায়ামুগ্ধতা, কিছুতেই ছাড়বার নয়। অন্য যে-দু'জন নিয়মিত আসতেন, আগে উল্লেখ করিনি, তাঁরা নবেন্দু বসু ও গিরিন চাটুয্যে। নবেন্দুবাবু বৃত্তিতে হাওয়াবিদ, লখনউর বনেদি মানুষ, শহরের পুরনো কাহিনী তাঁর চেয়ে বেশি কেউ জানতেন না। 'প্রবাসী'-'ভারতবর্ষ'-'বিচিত্রা'-য় প্রচুর লিখেছেন, পরবর্তী সময়ে আমি অন্তত একবার তাঁকে দিয়ে 'চতুরঙ্গ'-এ একটি প্রবন্ধ লেখাতে সফল হয়েছিলাম: লিখেছিলেন লা মার্টিনিয়ারের প্রতিষ্ঠাতা ক্লদ মার্তাঁ-কে নিয়ে।

গিরিন চাটুয্যে নিশ্চয়ই আর বেঁচে নেই, লখনউ সেক্রেটারিয়েটে কাজ করতেন, স্মিত চেহারা, ঠোঁটে সব সময় অর্ধস্ফুট হাসি। মুখে শৌখিন পাইপ, একটিও কথা বলতেন না, শুধু মাঝে-মাঝে পাইপটি মুখ থেকে নামিয়ে ঈষৎ ঘাড় নাড়তেন, তাতেই ভয়ংকর বুদ্ধিজীবী হিশেবে লখনউ জুড়ে তাঁর খ্যাতি।

ধূর্জটিপ্রসাদ ও ছায়ামাসি স্নেহ উজাড় করে দিয়েছিলেন আমার উপর। ছায়ামাসি প্রায়ই খেতে বলতেন, অবশ্য বাদশাবাদ পাড়ার অন্য মহিলারাও বলতেন, ক্ষিতিমোহন সেনের কন্যা লাবুদি কিংবা ধীরেন মজুমদারের সহধর্মিণী মাধুরীদি। অবিবাহিত আপাতঅসহায়-দেখতে বাঙালি যুবক, প্রচুর অনুকম্পা কুড়োতাম। তা হলেও আলাদা করে ছায়ামাসির স্নেহবর্ষণের কথা বলতেই হয়। তিনি চমৎকার কবিতা লিখতেন, একসময় 'কবিতা' পত্রিকায় তাঁর কবিতা ছাপা হয়েছে। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের পরিচর্যায় নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছিলেন। অতি আস্তে কথা বলতেন, বাঙালি আভিজাত্যের বিচ্ছুরণ তাঁর বাক্যরাজিতে। লখনউর সময় থেকে শুরু করে, পুরো পঞ্চাশ বছর, তাঁর ভালোবাসা-স্নেহাশীর্বাদ কুড়িয়েছি : এই সৌভাগ্যের তুলনা নেই।

লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি স্বভাবতই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর, ওখানে ফিরে যাওয়ার আগ্রহও আর তেমন কোনওদিন হয়নি। কিন্তু এটা তো স্বীকার না-করে পারি না, পড়াতে শিখেছিলাম ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিতে-নিতে, কোনও ছাত্র অতর্কিত একটি প্রশ্ন করলো, যার সে-মুহূর্তে উত্তর জোগাতে পারিনি; ওই অক্ষমতার পীড়নে ভাবতে শিখলাম, ভাবতে-ভাবতে বিষয়টির গহনে যেতে শিখলাম ; পড়ানোও ক্রমে-ক্রমে স্বচ্ছন্দ ও সুখকর হয়ে এলো। তবে অর্থশাস্ত্র যে-গতিতে গত অর্ধশতাব্দীতে এগিয়েছে, তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো ধৈর্য বা সামর্থ্য আমার কোনওদিনই ছিল না। সুতরাং একটি বিশেষ ক্ষণে অর্থনীতিচর্চা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছি। এক ধরনের দ্বান্দ্বিকতা এখানে। পড়াতে ভালো লাগে, অথচ যা পড়াতে হবে সে বিষয়ে আমার সম্যক জ্ঞান নেই, সুতরাং নিষ্ক্রমণ

বিধেয়। অর্থনীতির বৃত্ত থেকে বিদায় নেওয়ার ফলে আমার মনে কোনও শোকতাপ নেই, যা অবধারিত তাই-ই ঘটেছে। অবশ্য লখনউতে যে দু'-বছর ছিলাম, একটু-আধটু দুরাশা সম্ভবত ছিল, ধনবিজ্ঞানে রপ্ত হবো, বই লিখবো, নাম কুড়বো। গণিত চর্চার অভ্যাসে তখনও পুরো মরচে পড়ে যায়নি। বাবা পদার্থবিদ, মা-ও গণিতশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ : কিছুটা বংশগত ধারাবাহিকতায় আস্থা পোষণ তেমন অযৌক্তিক ছিল না। অর্থনীতির সঙ্গে গণিত মিশিয়ে নতুন একটি বিজ্ঞান সবেমাত্র শুরু হয়েছে। গাণিতিক পরিভাষায় অর্থনীতির তত্ত্ব প্রথমে ব্যক্ত করতে হবে, তারপর সেই তত্ত্বের সূত্র ধরে কোনও সম্পাদ্য গঠন করতে হবে ; সেই সম্পাদ্য তথ্যযুক্ত কিনা তা প্রমাণ বা অপ্রমাণ করবার জন্য পরবর্তী পর্যায়ে সংখ্যাবিজ্ঞানের দ্বারস্থ হতে হবে। উল্লিখিত তিনটি ধাপ মিলিয়ে ইকনোমেট্রিক্স। এই বিদ্যায় প্রভূত কৃতিত্ব সে সময় অর্জন করেছিলেন ইয়ান টিনবার্গেন নামক এক ওলন্দাজ অর্থনীতিবিদ। সুপণ্ডিত পদার্থবিজ্ঞানী, সেখান থেকে অর্থশাস্ত্রে তাঁর প্রব্রজ্যা, বিশের-তিরিশের দশকের আর্থিক মন্দার বিশ্লেষণে ইকনোমেট্রিক্স প্রয়োগ করে তিনি ধনবিজ্ঞানকে নবতর স্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন, পৃথিবী জোড়া তাঁর নাম। মনের গোপনে ইচ্ছাপোষণ করতাম, অধ্যাপক টিনবার্গেনের সান্নিধ্যে থেকে যদি কিছুদিন গবেষণাচর্চা করতে পারি, বড়ো ভালো হয়।

ভাগ্যলিখন বলাটা বাড়াবাড়ি হবে, তবে ঠিক এমনই সুযোগ আমার সামনে উপস্থিত হলো। বিদেশে গিয়ে ওই নববিজ্ঞান সাধনা করবার মতো রেস্ত নেই, আমার শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন। হঠাৎ আমস্টারডাম থেকে এক সমাজবিজ্ঞানী-অধ্যাপক, হফস্ট্রা, ভারতবর্ষ ঘুরতে এলেন, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। হল্যান্ড ছোটো দেশ, রফতানি করেই সে দেশের মানুষদের জীবনধারণ। দু'শো-তিনশো বছরের সাম্রাজ্যবিস্তারের আদি ইতিহাস যা-ই হোক, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ছোটো পরিসরে হল্যান্ডের অবস্থান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে উপার্জন-উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে নতুন-নতুন দেশ ও অঞ্চলের সঙ্গে বিনিময়-পরিচয় জরুরি। ওলন্দাজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় হল্যান্ডের সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় মিলে সেই লক্ষ্যে কিছুদিন আগে একটি আন্তর্জাতিক সহযোগ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল স্টাডিজ নামে একটি আন্তর্জাতিক মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়েছে, প্রথম অধ্যক্ষ হিশেবে মনোনীত হয়েছেন অধ্যাপক হফস্ট্রা। তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকা ঘুরে ছাত্র সংগ্রহের। হল্যান্ডের রাণী মহোদয়া হেগ শহরে অবস্থিত তাঁর অন্যতম প্রাসাদ, নর্ডেন্ডে প্যালেস, মহাবিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্রছাত্রী যাঁরা আসবেন, তাঁদের সমস্ত ব্যয় ওই ওলন্দাজ আন্তর্জাতিক সহযোগসংস্থা নির্বাহ করবে।

হফস্ট্রা সাহেব লখনউতেও এলেন, ধূর্জটিবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন, ধূর্জটিবাবু আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, নর্ডেন্ডে প্রাসাদবাসী হতে রাজি আছি কিনা। অধ্যাপক টিনবার্গেনের সঙ্গে গবেষণা করার আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁকে খুলে বললাম। হফস্ট্রা জানালেন, কোনও অসুবিধা হবে না, অধ্যাপক টিনবার্গেনও ওই মহাবিদ্যালয়ে নিয়মিত পড়াবেন। সুতরাং আমার লখনউয়ের পালার আপাতত সমাপ্তি।

নয়

লখনউ থেকে বিদায়, ধূর্জটিবাবু ও ছায়ামাসির স্নেহসিক্ত শুভেচ্ছা নিয়ে ট্রেনে করে কলকাতা। কলকাতার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ উদ্দাম আড্ডা। বোধহয় জাহাজের টিকিট কাটতে আমার একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, মুম্বাই থেকে ইওরোপগামী জাহাজে জায়গা পেলাম না, কলম্বো ছুঁয়ে যাওয়া, ওরিয়েন্ট লাইনের 'অট্রান্টো' জাহাজে ব্যবস্থা হলো। কলকাতা থেকে বিমানে মাদ্রাজ, সেখানে উডল্যান্ড হোটেলে এক মস্ত সুইটে রাত্রিবাস। ঘরটি খাশা, আহার নিরামিষ হলেও উপাদেয়। মাদ্রাজ থেকে ফের বিমানে চেপে কলম্বো, কলম্বোর গ্র্যান্ড ওরিয়েন্টাল হোটেলে নিশিযাপন, পরদিন মধ্যঅপরাহ্ণে জাহাজ ছাড়লো। পথে নেপ্‌লসে নেমে পম্পেই দর্শন, মার্সেইতে নেমে লা কারবুয়েরের সৃষ্টি ও নির্মাণ অবলোকন, সতেরো-আঠেরো দিন বাদে টিলবেরি ডকে নেমে লন্ডনের প্রথম দর্শন। দু'-রাত কাটিয়ে ছোটো জাহাজে চেপে উত্তরসাগর পাড়ি দিয়ে হল্যান্ডের পোত, হুক-ভ্যান হল্যান্ড, সেখান থেকে ট্রেনে হেগ শহরে পৌঁছোনো। সদ্য সংস্কার হয়েছে, টাটকা প্রসাধনের গন্ধে ছাওয়া নর্ডেন্ডের রাজপ্রাসাদ, বিদ্যার্থীদের মধ্যে আমিই প্রথম সেখানে প্রবেশ করলাম।

ঢাকা ছিল অজ মফস্বল। ওখানে বাংলা ভাষার মধ্যবর্তিতায় স্কুলের পড়া শেষ করেছি। আই এ, বি এ, এম এ পড়াও ঢাকা ও কাশীর মতো প্রায় গ্রাম্য পরিবেশে, চলা-ফেরায় ও আচরণে গ্রাম্য গন্ধ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও আমার কপাল ফিরলো না, অক্সফোর্ড-কেমব্রিজ নয়, হার্ভার্ড-বার্কলে নয়, নেহাতই দীনদরিদ্র হেগ শহর, ওলন্দাজ ভাষায় বলে 'দেন হাগ', আরও একটু সংস্কৃত করে বলা হয় 'স্ক্রাভেনহাখেন'। কী আর করা, মেনে নিতে হয়। আমার পক্ষে সান্ত্বনা ছিল, অধ্যাপক টিনবার্গেনের সঙ্গে কাজ করতে পারবো, তাঁর বক্তৃতা শুনতে পাবো, তাঁর কাছ থেকে শিখতে পারবো, এক মস্ত সৌভাগ্য! পৃথিবীর অন্যতম প্রধান অর্থনীতিবিদ, কিন্তু স্বভাবে-ব্যবহারে যথার্থই তৃণাদপি সুনীচেন। শহরের সর্বত্র সাইকেলে চেপে ঘুরে বেড়াতেন, আমাদের পড়াতে আসতেন, তা-ও সাইকেলে চেপে। অথচ তখন তিনি, অধ্যাপনার পাশাপাশি, ওদেশের পরিকল্পনা পরিষদের প্রধান, সরকারি যানবাহন তাঁর এমনিতেই প্রাপ্য। মজার ব্যাপার যিনি দেশের সংখ্যা পরিষদের অধ্যক্ষ, তিনিও আমাদের পড়াতে আসতেন, প্রতিদিন তাঁর আগমন শোফার-চালিত মস্ত মার্কিন গাড়ি চেপে, হয়তো প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই নামতেন অধ্যাপক টিনবার্গেন তাঁর বিনীত সাইকেল থেকে। আমাদের পড়াতেন ইংরেজি ভাষায়, কোনওরকম ভণিতা ছিল না, পরিস্বচ্ছ, অনাড়ম্বর বিশ্লেষণ, যুক্তির ধাপে-ধাপে মিনিটের পর মিনিট এগোনো, আবিষ্ট হয়ে শুনতাম, কখন ঘণ্টা অতিক্রান্ত হতো টেরও পেতাম না। ক'দিন বাদে ওঁর সঙ্গে আমার গবেষণার কাজ শুরু হয়ে গেল। প্রতি সপ্তাহে পরামর্শ দিতেন কী বই ঘাঁটবো, কী রিপোর্ট দেখবো, কোন-কোন রিগ্রেশন অঙ্ক কষে এনে তাঁকে পরের সপ্তাহে দেখাবো। নিয়মের কোনও বিচ্যুতি নেই,

আমার সামর্থ্য ও মেধার মাপে তত্ত্বকথা রচনা করতে দিতেন, অঙ্ক কষবার কথাও বলতেন, পরের সপ্তাহে, আগে থেকেই সময় দেওয়া থাকতো, নির্দিষ্ট দিনে গিয়ে দেখাতাম, ফের পরামর্শ, খানিকটা সংশোধন আমি যা করে নিয়ে এসেছি সেই কাজের, পরের সপ্তাহের করণীয় সম্পর্কে নম্র নির্দেশ। প্রায় পনেরো মাস ধরে আমার গবেষণার কাজ চলেছিল, কোনও সপ্তাহেই এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি। যা ইতিপূর্বেই সম্ভবত একাধিকবার বলেছি, অর্থশাস্ত্রে আমার কোনওদিনই তেমন দুরন্ত আগ্রহ ছিল না, প্রথম পর্বে অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্তের, এবং এই পর্বে অধ্যাপক টিনবার্গেনের, অনুপ্রেরণায় বিষয়টিকে একটু-একটু করে যেন ভালোবাসতে শিখলাম।

টিনবার্গেনের সমাজতন্ত্রে নিবিড় বিশ্বাস, হল্যান্ডের সমাজতান্ত্রিক দলের তিনি অন্যতম প্রধান সদস্য, তার উপর কোয়েকার সম্প্রদায়ের সঙ্গেও তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। আদ্যন্ত সাধুপ্রকৃতির মানুষ, গলার স্বর সর্বদা অনুচ্চ, বাড়ির কাজে স্ত্রীকে অজস্র সাহায্য করেন, ভৃত্যহীন সংসার, এরই মধ্যে আমাদের মাঝে-মাঝে নৈশাহারে আমন্ত্রণও জানান। তাঁর সৌজন্যে আমরা বিব্রত। হয়তো একটি বিশেষ বিষয়, যা আমার গবেষণাকর্মের সঙ্গে সংপৃক্ত, তা নিয়ে উভয়ে আলোচনা করছি, আলোচনা তেমন এগোচ্ছে না, তিনি একটি তত্ত্ব কাগজে মকশো করছেন, পছন্দ না হওয়ায় কাটছেন, ফের মকশো করছেন, সম্ভবত মিনিট পাঁচ-দশ এমনি গেছে, হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে সাতিশয় বিনীত উচ্চারণে : 'তোমার এত সময় নষ্ট করছি, আমি অত্যন্ত লজ্জিত'। বলা ভালো, অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হলে প্রথম বছরই টিনবার্গেন তা পেয়েছিলেন।

মহাবিদ্যালয়ের নাম, আগেই উল্লেখ করেছি, ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল স্টাডিজ। বহু দেশ থেকে ছাত্রছাত্রীর আগমন, ইওরোপ-এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকা ঝেঁটিয়ে। প্রাসাদের দোতলায় লেকচারকক্ষ, বসার লাউঞ্জ, খাবার ঘর, লাইব্রেরি, ক্লাসঘর ইত্যাদি। সারা পৃথিবী থেকে খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকাদি, পড়ে ফুরোনো যায় না। অধিকাংশ বিদ্যার্থীর বয়স তিরিশের নিচে। তাঁদের কলকাকলি প্রাসাদকে কাঁপিয়ে তোলে, দিনে, রাত্রিবেলায়ও। দোতলার এক পাশে পড়তে-আসা মেয়েদের জন্য আবাসস্থান, আমরা ছেলেরা প্রাসাদের পুরো তেতলা জুড়ে থাকি। প্যান্ট্রিতে সারাক্ষণ কফির ব্যবস্থা, সেই সঙ্গে হল্যান্ডের বিখ্যাত বিয়ার, অথবা নানা ফলের নির্যাস। কফির সময় অধ্যাপকবৃন্দের, ছাত্রছাত্রী সমভিব্যহারে, লাউঞ্জে জড়ো হওয়া, লেকচারের রেশ তুলে ফের আলোচনা, বিরতি শেষ। কোনও ছাত্রীর কফি পান তখনও শেষ হয়নি, হঠাৎ দেখি অধ্যাপক টিনবার্গেন সেই ছাত্রীর পেয়ালাটি নিজে হাতে করে ক্লাস ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন, ছাত্রীটির লজ্জার শেষ নেই, আমাদেরও।

অর্থশাস্ত্রের বাইরে সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ও ওখানে পড়ানো হতো, অধ্যাপকরা হল্যান্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসতেন, যাঁরা একটু দূর থেকে আসতেন তাঁরা রাত্তিরটা আমাদের সঙ্গে কাটাতেন, মেলামেশা, আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের প্রচুর সুযোগ। সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক আইন এ-সব বিষয় তো ছিলই, পাশাপাশি বিভিন্ন ইওরোপীয় ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা, যার যা অভিরুচি। প্রায়ই এখানে-ওখানে দল বেঁধে শিক্ষাসফরে গমন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া তো ছিলই। রটারডাম বন্দর পরিদর্শন, দেশের নিচু অঞ্চলে ডাইক-বাঁধ দেখতে যাওয়া, আইন্ডহোভেন শহরে গিয়ে ফিলিপস সংস্থার শাখাপ্রশাখা পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন। সব শেষে, যা বিশেষ করে

বলতে হয়, চিত্র প্রদর্শনীগুলি চষে বেড়ানো : আমস্টারডাম, রটারডাম, হেগ, লাইডেন, কোথায় নেই চিত্রের সমারোহ, দেখে আশ মেটে না। টিশিয়ান প্রমুখ ঘোর ধ্রুপদী শিল্পীদের শিল্পকর্ম ছেড়েই দিলাম, ভ্যানডাইকের কথাও না হয়, কিন্তু উজাড়-করা রেমব্রান্ট, উজাড়-করা ভার্মিয়ার, উজাড়-করা ভ্যান গঘ, গোটা দেশ জুড়ে ইমপ্রেশনিস্ট, উত্তর- ইমপ্রেশনিস্ট এবং পরবর্তী যুগের কিউবিস্ট বা বিকল্প কোনও বিমূর্ত-প্রাকরণিক-পদ্ধতিতে-অঙ্কন-দুরন্ত শিল্পীদের ছবিও চতুর্দিকে এন্তার ছড়ানো। যে-দেড় বছর-দু'বছর ওদেশে ছিলাম, যদি গবেষণার কাজে পুরো অবহেলাও করতাম, আমার মানসিক বিকাশে তবু কোনও খামতি ঘটতো না, যে-হাজার হাজার চিত্রসম্ভোগে ওই সময়টা অতিবাহিত করেছি তার নান্দনিক মূল্যের তুলনা হয় না। আন্তর্জাতিক পরিবেশের মধ্যে থাকা, নানা দেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেশা, তাদের সমাজের-রাজনীতির কথা জানা। শুনছি স্বাধীন দেশের, সদ্য-স্বাধীন-হওয়া দেশের, স্বাধীন হবো-হবো-করা দেশের, এখনও-পরাধীনতার-অন্ধকারাচ্ছন্নতায় লেপা-পোছা দেশের, সৌন্দর্য ও সমস্যার বিবরণ। প্রায়ই সান্ধ্য অনুষ্ঠান, বক্তৃতা, আবৃত্তি, কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত, টুকরো-টাকরা অভিনয়, হল্যান্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছেলেরা-মেয়েরা আসছে, আমরা তো আছিই। আমাদের থাকবার প্রথম বছর ছোটো দেশ বন্যার তোড়ে ভেসে গেল, কয়েকদিনের জন্য আমরাও গিয়ে ত্রাণকার্যে যোগ দিলাম, সাধ্য ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী।

একই প্রাসাদে ছেলেরা-মেয়েরা প্রায় একসঙ্গে থাকছে, মাত্র একটি তলার ব্যবধান। তাই আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না যে, এই দেশের মেয়ে ওই ভিন দেশের ছেলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, ওই ভিন দেশের ছেলে এই দেশের মেয়ের প্রতি। এধরনের অনুরাগে-বিনিময়ে প্রচুর মাধুর্য অবশ্যই ছিল, তবে কোনও-কোনও ক্ষেত্রে অন্তিমে বিষাদকাহিনীও। একটু ভারসাম্যের অভাব ছিল, প্রথম বছর ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাধিক্য সামান্য দৃষ্টিকটু, তবে আস্তে-আস্তে সেই অস্বস্তি মিলিয়ে যায়।

আমার পক্ষে যা মস্ত ভাগ্যের ব্যাপার, পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান, দু'দিক থেকে আসা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সমান সৌহার্দ্য অচিরেই গড়ে উঠলো। যা তখন থেকেই বেশ বোঝা যাচ্ছিল, এঁদের নিজেদের মধ্যে আড়াআড়ি অনেক দূর এগিয়ে গেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্রছাত্রীদের একটু নাক-উঁচু ভাব, পূর্ব পাকিস্তানিরা এত পিছিয়ে-পড়া, লেখাপড়ায়-খেলাধুলায় সব ব্যাপারে, ভালো করে কথা পর্যন্ত বলতে পারে না, ওরা যেন পাকিস্তানের লজ্জা। অন্য পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের যে-ক'জন ছিলেন, অধিকাংশই তরুণ অধ্যাপক, কিংবা সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোনো বিদ্যার্থী-বিদ্যার্থিনী, তাদের পর্বত-প্রমাণ পুঞ্জীভূত ক্ষোভ : পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের উপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে, আমরা যদিও সংখ্যায় ওদের চেয়ে অনেক বেশি, বিভিন্ন ব্যাপারে সমপরিমাণ সুযোগ পাচ্ছি না আমরা। এরই মধ্যে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি এলো, গেল। বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিশেবে চাই, এই দাবিতে সারা পূর্ব পাকিস্তান আলোড়িত, তার ঢেউ পৌঁছলো সাড়ে ছ-হাজার মাইল দূরে হল্যান্ডেও, পাকিস্তানের দুই তরফের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভুলবোঝাবুঝির বোঝা আরও ভারি। আমার মতো কয়েকজন ভারতীয়কে মধ্যবর্তী হয়ে তাদের মধ্যে শালিসি করতে হতো। সম্ভবত আমরা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম, এখানে এক সঙ্গে আছি, এক সঙ্গে থাকছি, পড়ছি, খেলছি, বেড়াচ্ছি, রাজনীতির কর্কশ প্রসঙ্গগুলি যেন খানিকটা চাপা দিয়ে রাখতে সবাই সচেষ্ট হই; একটু-আধটু পারস্পরিক রঙ্গ, চিমটি কাটা অবশ্যই চলতে পারে।

এরই মধ্যে একটি ব্যাপার ঘটলো। হঠাৎ বছরের শেষে পাকিস্তান থেকে তিন-চার জন উচ্চপদস্থ আমলা এসে আমাদের সঙ্গী হলেন, তাঁরা পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিংবা ওধরনের কোনও পাঠক্রমে ভর্তি হয়ে ছ' মাস থাকবেন। হবি তো হ, তাঁদের মধ্যে একজন ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নাম, যদ্দুর মনে পড়ে, কুরেশি, তিনিই একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকায় গুলিচালনার আদেশ দিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রছাত্রীরা রাগে ফুঁসছে, কুরেশির সঙ্গে কথা তো বলবেই না, তাঁর সঙ্গে তারা নাকি এক টেবিলে বসে পানাহারও করবে না ; যদি এ-ব্যাপারে ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ কোনও অন্যায় অনুরোধ জ্ঞাপন করেন, তা হলে তারা দল বেঁধে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতেও প্রস্তুত। এই সংকটে ওলন্দাজ কর্তাব্যক্তিরা আমাদের, ভারতীয় ছাত্রদের, শরণাপন্ন হলেন, আমরা যদি পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব দয়া করে মিটিয়ে দিই। উভয় পক্ষের সঙ্গেই কথা বলা হলো, বিদেশে নিজেদের কেলেঙ্কারি ফলাও করে প্রকাশ করলে তেমন একটা স্বাস্থ্যকর পরিণাম না হওয়ারই আশঙ্কা। দু'পক্ষই ক্রমশ ঠান্ডা হলো। রফা হলো, পূর্ব পাকিস্তানিরা কুরেশির সঙ্গে কথাবার্তা না বলুক; এক টেবিলে খেতে আপত্তি নেই, যদি একেবারে পাশাপাশি বসতে না হয়। শান্তি চুক্তি গোছের কিছু স্থাপিত হলো, তবে তখন থেকেই বুঝতে পারছিলাম যা জোড়া লাগবার নয়, তা জোড়া লাগবে না। এক দিকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অত্যুগ্র অহমিকা, অন্য দিকে পূর্ব পাকিস্তানিরা ততদিনে মাতৃভাষা বাংলার প্রেমনিগড়ে বাঁধা পড়ে গেছে, তারা ইতিমধ্যেই অনুদ্ধারণীয়।

সেই সময়টা জো ম্যাকার্থিরও অভ্যুদয়-পতনের যুগ। ইনস্টিটিউটে বেশ কয়েকজন মার্কিন ছাত্রছাত্রী ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও দুই ভাগ, কেউ-কেউ ঘোর কমিউনিস্ট-বিদ্বেষাকীর্ণ, ম্যাকার্থির অন্ধ ভক্ত; অন্য পক্ষ ইলিনর রোজভেল্টের আদর্শে দীক্ষিত, ম্যাকার্থিয় অনাচার তাঁদের কাছে অসহ্য। এঁদের মধ্যে এক দম্পতি, মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ওয়েন ল্যাটিমোর, যাঁকে ম্যাকার্থি অন্যায়ভাবে নাস্তানাবুদ করেছিলেন, তাঁর অন্ধ ভক্ত। তাদের সঙ্গে অন্য পক্ষীয়দের প্রায়ই তর্ক-বিসংবাদ হতো, তবে তার তিক্ততা পাকিস্তানিদের অন্তর্কলহের স্তরে পৌঁছুতো না।

দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশে এবং অন্য ছুটি-ছাঁটায় হল্যান্ড থেকে বেরিয়ে পড়তাম, ইওরোপ যতটা সম্ভব দেখে নেওয়া যায় সেই লক্ষ্যে। পাথেয় কম, টিপে-টিপে খরচ করতে হতো। এখান-ওখান থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে ভিন দেশের ভিন শহরে এঁর-ওঁর-তাঁর কাছে আতিথ্য মেলবার অন্বেষণ, কখনও-কখনও সে-অন্বেষা সফলও হতো।

এমনই একবার বেরিয়ে সপ্তাহ দুই প্যারিসে এক ঘোর বাঙালি আড্ডায় কাটিয়ে এসেছিলাম। আমার লখনউবাসের বন্ধু টোলন অধিকারী, সংখ্যাতত্ত্বে মস্ত পণ্ডিত, পরে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ হয়েছিল, তারই আতিথ্যে প্যারিসে বেশি সময় কাটানো। তখন কয়েক গণ্ডা কলকাত্তাই মানুষ প্যারিসে প্রবাসী, যাঁদের কথা মনে পড়ছে তাঁদের মধ্যে পরিতোষ সেন, হৈমন্তী সেন (পরে মজুমদার), কবি-ঔপন্যাসিক লোকনাথ ভট্টাচার্য, ফরাসী চলচ্চিত্রকৌশল শিখতে আসা গড়পাড়ের বারীন সাহা, আরও অনেকে। আমার বন্ধু শান্তি চৌধুরীর বোন অঞ্জুও ততদিনে গিয়ে পৌঁছেছিল কিনা মনে নেই। উন্মাদনায় ঠাসা ঋতু সেটা, ফরাসী দেশে কমিউনিস্ট পার্টি সবচেয়ে শক্তিশালী দল, তাদের শ্রমিক সংগঠন সি জি টি যে-কোনো মুহূর্তে পুরো দেশকে ধর্মঘটে স্তব্ধ করে দিতে পারে। ছাত্র-শিক্ষক-কবি-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা সবাই ঝাঁক বেঁধে কমিউনিস্ট পার্টিতে। জাঁ পল

সার্ত্র পর্যন্ত ঘোষণা করেছেন, দর্শন বিচারে দলের সঙ্গে তাঁর যত মতভেদই থাক, তিনিও বিশ্বাস করেন ফ্রান্সের ভাগ্য, ইওরোপের ভাগ্য, গোটা পৃথিবীর ভাগ্য কমিউনিস্ট আন্দোলনের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। শান্তি আন্দোলন দেশে-দেশে দানা বেঁধেছে, ফ্রান্স তার কেন্দ্রবিন্দু, পিকাসোর আঁকা ঘুঘুপাখি রুমালে-ন্যাপকিনে-স্কার্ফে-পাতা চাদরের নক্সায়-খাবার টেবিলে-হাওয়ায় ওড়ানো বেলুনে শোভা পাচ্ছে। হেগ থেকে ট্রেনে চেপে যখন প্যারিসে রওনা হলাম, এক মার্কিন বান্ধবী উপহার হিশেবে একেবারে শেষ মুহূর্তে একটি বই হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। ট্রেনে বইটি খুলে দেখি ভিতরে একটি দশ ডলারের নোট, সঙ্গে ছোট্ট পিনে গাঁথা শাদা কাগজে দু'লাইনের পদ্য : 'অশোক ডিয়ার/হ্যাভ এ বিয়ার'। আমার বিবেক এতটুকু কাঁপলো না, তখন দশ ডলারের ক্রয়মূল্য অনেক, কমিউনিস্ট পার্টির সদর দফতরে গিয়ে চল্লিশটি পিকাসোর ঘুঘু-আঁকা শান্তি রুমাল কিনে জনে-জনে বিলিয়েছিলাম, মার্কিন সাহায্যের এমন যথাযথ ব্যবহারের নিদর্শন আমাকে অতিক্রম করে বোধহয় আর কেউই দেখাতে পারেননি।

প্যারিসের বাঙালি আড্ডা কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট সমর্থকে ঠাসা। বারীন সাহা তাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা, এমনকি শান্তিনিকেতনের আট-দশ বছর মিহিন হাওয়া গায়ে-লাগানো ছেলে লোকনাথ, সে-ও ততদিনে বামে ঝুঁকেছে, পরিবেশের পাপ। তবে সেই মুহূর্তে লোকনাথ এত বেশি করে বান্ধবী ফ্রাঁসের প্রেমে মশগুল যে, সব সময় রাজনৈতিক স্লোগানে জোগান দেওয়ার মতো সময় বার করতে পারতো না।

প্যারিসের ক্ষণিক সাম্যবাদী বসন্ত, হল্যান্ডে ফেরা। তবে আমরাও পিছিয়ে রইলাম না। খুঁজে-পেতে হল্যান্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতীয় ছাত্রদের হদিশ নিলাম, তাদের নেমন্তন্ন করে হেগ শহরে নিয়ে আসা হলো, সবাই মিলে হল্যান্ডের ভারতীয় ছাত্র সংসদের সম্মেলন উদ্‌যাপন করলাম, রাজপ্রাসাদে প্রচুর বামপন্থী অঙ্গীকার উচ্চারণ করে। হল্যান্ডের দু'-তিনটি বামপন্থী দল থেকে প্রতিনিধিরা এলেন, প্যারিস থেকে অনুরূপ প্রতিনিধি হয়ে এলো লোকনাথ। রাজস্থানের ছেলে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র, মুহম্মদ শফি আগোয়ানি, তখন আমাদের কথায় উঠতো-বসতো; নিজেরা আড়ালে থেকে তাকে সভাপতি নির্বাচিত করলাম। পরে অবশ্য সে বহুদূর ভ্রমণ করে : প্রথমে রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের, পরে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হয়, প্রাতিষ্ঠানিক হোমরাচোমড়াদের সঙ্গে এখন ভীষণ মিলেমিশে থাকে। হঠাৎ যদি আমার সঙ্গে এখানে-ওখানে দেখা হয়ে যায়, দৃশ্যত একটু ভীত, একটু বিচলিত বোধ করে। তবে এধরনের পুরনো পাপী পৃথিবীতে অগণিত।

হল্যান্ডে থাকাকালীন সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম করাচি থেকে আসা একটি পঞ্জাবি মেয়ের সঙ্গে, নাম খুরশীদ হাসান। সে যখন প্রথম হেগে পৌঁছয়, সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ. করে বেরিয়েছে, আন্তর্জাতিক আইনের ধারাবলী নিয়ে গবেষণা করতে এসেছে। প্রথম-প্রথম রাস্তায় একা বেরোতে ভয় পেত, কী করে যেন আমার উপর অসম্ভব নির্ভরশীল হয়ে পড়লো, আমি দাদা, ও আমার ছোটো বোন, সমস্ত বুদ্ধিপরামর্শ আমার সঙ্গে। পড়াশুনোয় মেধাবী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্না, বিষয়গত আলোচনার মুহূর্তে চোখে-মুখে কথা বলে। তখনও শেখ আবদুল্লাহ্ কারাবন্দী হননি, আমাদের ভারতীয় ছাত্রদের তাই যথেষ্ট মনের জোর ছিল, খুরশীদের সঙ্গে কাশ্মীর নিয়ে তর্ক-রসিকতায় মাততাম। খুরশীদ খেপে যেত, খানিক বাদে আবার শান্ত হয়ে আসতো।

আমার কাছে খুরশীদের নিয়ত আব্দার, তবে মাঝে-মধ্যে তার চোটপাটও। একবার স্যাডলার্স ওয়েলস ব্যালে দল এসেছে, ময়রা শিয়েরার প্রধানা ব্যালেরিনা, সোয়ান লেক হবে। দেখতে যেতে খুরশীদের খুব শখ, অনেক টাকা খরচ করে একেবারে সম্মুখবর্তী সারিতে টিকিট কেনা হলো। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ব্যালে শুরু হবার কথা, ট্যাক্সিতে যেতে অন্তত মিনিট পনেরো সময় লাগবে। সাড়ে পাঁচটা বাজলো, পৌনে ছ'টা, ছ'টা, সওয়া ছ'টা, মেয়েদের মহল থেকে খুরশীদ বেরোচ্ছে না, আমি উদ্‌ভ্রান্ত, বারবার খবর পাঠাচ্ছি, কিন্তু প্রসাধনরতা মহিলাকে কিছুতেই আর বাইরে আনতে পারছি না, অথচ দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি। অবশেষে শ্রীমতী খুরশীদ দেখা দিলেন, শৌখিন ঝলমলে শাড়িতে নয়নমোহিনী, কেশচর্চাসমৃদ্ধা, সাড়ে ছ'টা পেরিয়ে গেছে, যখন অপেরা হাউজে পৌঁছুলাম, সন্ধ্যা সাতটা বাজতে মিনিট পাঁচেক বাকি, বেশ কয়েকটি পিরুয়েত-পা-দ্য-দো সমাপ্ত। আমার মেজাজ একটু খিঁচড়ে গিয়েছিল, কিন্তু কিছুই যেন হয়নি, খুরশীদের এমন ভাব। বার কয়েক আমি অনুযোগ করাতে পুরো একমাস আমার সঙ্গে কথা বন্ধ রেখেছিল। হঠাৎ একদিন ফিক্ করে হেসে ফের সন্ধি স্থাপন।

পাকিস্তান থেকে একজন অতি উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ, কী একটা কোর্সে যোগ দেবেন, তিন মাসের জন্য আমাদের সঙ্গে থাকতে এলেন। চমৎকার মানুষ, উর্দু সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার হিশেবে খ্যাত, খুরশীদকে দেখে ও তার সঙ্গে আলাপ করে ভদ্রলোক মজে গেলেন, আমাকে বিপদে পড়তে হলো। খুরশীদকে মুখোমুখি বলবার সাহস ঠিক কুড়োতে পারছেন না, আমাকে খুরশীদ 'দাদা' বলে মান্য করে, সুতরাং আমি যদি অনুগ্রহ করে তাঁর প্রস্তাব তার কাছে পৌঁছে দিই, তিনি তার পাণিপ্রার্থী। কী আর করা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভূমিকা পালন না-করে তো উপায় নেই, খুরশীদকে গিয়ে বললাম, সে হেসে কুটিপাটি। আমাকে বোঝালো, এরকম বিবাহ হতেই পারে না, তারা—খুরশীদের পরিবার—খাঁটি সৈয়দ বংশীয়, মুসলমান সমাজে সর্বোত্তম, অন্য দিকে ওই ভদ্রলোকের বংশ পরিচয় ধারেকাছেও না। ভদ্রলোককে গিয়ে খুলে বললাম, তিনি ভেঙে পড়লেন। এই ঘটনার আগে আমার ধারণাই ছিল না যে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও জাতপাতের এত কড়াকড়ি।

আসল কারণটি বেশ কয়েক সপ্তাহ বাদে খুরশীদ আমার কাছে কবুল করেছিল। করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন সে এম.এ. ক্লাসের ছাত্রী ; হার্ভার্ড থেকে অসম্ভব চৌকস, বিতর্কে সুনিপুণ, অতি সুদর্শন একটি ছাত্র কোনও এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে করাচি আসে, সুচিত্রা ভট্টাচার্য-বর্ণিত উনিশ বছর বয়সের উতরোল বিন্দুতে অবস্থানরতা খুরশীদের হৃদয় কেড়ে নেয়। অথচ রক্ষণশীল গোঁড়া মুসলমান পরিবারের মেয়ে, খুরশীদ জানে এই প্রণয়ের কোনও ভবিষ্যৎ নেই, তাই সে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে, কোনওদিন বিয়েই করবে না। শেষ পর্যন্ত এই প্রতিজ্ঞা অবশ্য সে রক্ষা করতে পারেনি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী বছরগুলিতে হল্যান্ড চরম আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। উপার্জনের তাগিদে ফুল, মাছ, মাংস, ডিম, রেডিয়ো, যন্ত্রপাতি সব-কিছু পড়ি-কি-মরি রফতানি হচ্ছে। আমরা যদিও খুব শৌখিনভাবে ছিলাম, খাওয়ার টেবিলে আহার্য উপচে পড়ছে, তা হলেও সপ্তাহে ডিম মাত্র একটি করে বরাদ্দ। প্রতি রবিবার সকালে, অন্যরা প্রাতরাশ খেয়ে এখানে-ওখানে বিহারে যেতো, আমি না-খেয়ে অপেক্ষা করতাম খুরশীদের জন্য। সে রবিবার বেশ দেরিতে সকালে ঘুম থেকে উঠতো, আমি ধৈর্য ধরে থাকতাম। রবিবার ইনস্টিটিউটের পাচককুল ছুটিতে, প্রাতরাশ আমাদের নিজেদেরই

তৈরি করতে হত। খুরশীদ এসে ডিম ফেটিয়ে-ফেটিয়ে মস্ত লম্বা পেট-মোটা অমলেট তৈরি করে দিত, সেজন্যই আমার প্রতীক্ষা। পরে সে অনেক কীর্তিমতী হয়েছে, তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ বরাবর অক্ষুণ্ণ থেকেছে, তবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী অত্যন্ত করুণ, আমার বলবার সুযোগ ঘটবে।

বিদেশে আরামে-আনন্দে দিন কাটাচ্ছি, কিন্তু হৃদয়ে বামপন্থী ঘোরের উন্মাদনা, পোড়া দেশের খবরের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে থাকি। ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে কলকাতা শহর বিপ্লবের প্রায় প্রান্তসীমায়, লন্ডন টাইমসে প্রতিদিন খবর পড়ে অস্থির উত্তেজনা অনুভব করি। কেম্‌ব্রিজ-থেকে-আসা এক ইংরেজ ছোকরা, ফস্ করে মন্তব্য করলো : 'লন্ডন হলে খবরকাগজে একখানা চিঠি পাঠালেই সমস্যা মিটে যেত'। মনে-মনে বললাম, কী কল তোমাদের সাহেব কোম্পানিরা আমাদের দেশে বানিয়ে এসেছে, তা যদি তোমরা জানতে, বুঝতে।

দিন কাটে, আমার আগ্রহ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব থিসিস শেষ করে দেশে ফেরা। হল্যান্ডে তখন নিয়ম ছিল, তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক যদি মনে করেন থিসিসের কাজ সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত হয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনের কতটা মেয়াদ পূর্ণ করলেন, তা হলে তা ধর্তব্য নয়। ইনস্টিটিউট অফ সোসাল স্টাডিজের ডিগ্রি দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না, প্রয়োজনানুগ আইন তখনও দেশের সংসদে গৃহীত হয়নি। আমাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, ওই দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির জন্য প্রার্থী হবার আমরা অনুমতি পেয়েছিলাম। অধ্যাপক টিনবার্গেন রটারডম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্র বিভাগের সঙ্গে যুক্ত, আমার তাই থিসিস দাখিল করবার কথা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে। থিসিসের কাজ প্রায় শেষ, শুধু লিখে ফেলাটা বাকি, টিনবার্গেন তিন মাসের জন্য মার্কিন মুলুকে পেনসিলভেনিয়া রাজ্যে হাভেরফোর্ড কলেজে পড়াতে গেলেন। ওঁর অনুমতি নিয়ে আমার সেই তিন মাস কেমব্রিজে প্রস্থান। এক ল্যান্ডলেডির কাছ থেকে ঘর ভাড়া করেছিলাম; অর্থনীতি বিভাগের গ্রন্থাগার মার্শাল লাইব্রেরিতে বসে থিসিসের অধ্যায়ের পর অধ্যায় লিখে ফেললাম। কেমব্রিজে কে ছাত্র কে অ-ছাত্র তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই, নিকি কাল্‌ডর, জোন রবিনসন, ডিক কাহ্‌ন, ডিক গুডউইন প্রমুখ সবাইকার ক্লাসে গিয়ে বসতাম; পরে এঁদের অনেকের সঙ্গেই নিবিড় সৌহার্দ্যসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মার্শাল লাইব্রেরিতেও নির্ঝঞ্ঝাট ব্যবস্থা, পাতার পর পাতা থিসিসের বয়ান লিখে যাচ্ছি, কেউ বিরক্ত করবার নেই। কিছু-কিছু ভারতীয় ছাত্র ফিসফিস আলাপ জমাতে আসতো, তাদের মধ্যে পরবর্তী কালে আমার অতি ঘনিষ্ঠ অজিত দাশগুপ্ত। অমর্ত্য সে-বছরই ট্রাইপোসে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছে, ওর ছাতা হাতে বিনীত চেহারা নিয়ে বৃষ্টির-জলে-ছপ্‌ছপ্ রাস্তায় সতর্ক হেঁটে যাওয়ার স্মৃতি এখনও চোখে ভাসে। আর একজনের নাম করতে পারি, শৈলা আম্বেগাওকর, সুশী-শান্তি জুন্নরকরদের মামাতো বোন, এখন কানাডায় কোথায় হারিয়ে গেছে।

ইওরোপে থাকাকালীন পাগলের মতো ঘুরে চিত্র ও ভাস্কর্য অবশ্যই দেখেছি প্রচুর, সেই সঙ্গে থিয়েটার-ব্যালেও, কিছু-কিছু হেগ শহরেই, লন্ডন, প্যারিস, অন্যত্রও। যেটা যোগ করতে আমার মোটেও কুণ্ঠা বোধ নেই, কাতারে-কাতারে ইওরোপীয় ও মার্কিন চলচ্চিত্রও। ইনস্টিটিউটে নৈশাহার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টাতেই সমাপ্ত, তারপর সপ্তাহে অন্তত দু'-তিন দিন বেরিয়ে পড়ে এখানে-ওখানে সিনেমা দেখা, এমন-এমন দিন গেছে দুপুর থেকেই সেই নেশায় বিহার শুরু, এক-একদিন তিন-চারটে করেও। এ যেন নিজের শৈশব-কৈশোরের

উপর প্রতিশোধ নেওয়া : জমে-থাকা চলচ্চিত্র-বুভুক্ষা এতদিনে তৃপ্তির আস্বাদ পেলো। ইতালিয় ও ফরাশি চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগ সেটা, তা ছাড়া বৃটিশ-মার্কিন ছায়াছবির সম্ভার। সকালে ক্লাসরুমে গিয়ে অধ্যাপকদের বক্তৃতার নোট টুকছি, দুপুরে এই গ্রন্থাগার-ওই গ্রন্থাগার চুঁড়ে থিসিসের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ঘাঁটছি, ফাঁকে-ফাঁকে আড্ডা, হুল্লোড়, তর্ক, আলোচনা। এবং খেয়াল চাপলেই, শীতের রাত্রি হলে ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে, চলচ্চিত্রগৃহের দিকে ধাবমান হওয়া। চলচ্চিত্র নায়কদের মধ্যে তখন বিখ্যাততম ফরাশি জেরার ফিলিপ ও মার্কিন হামফ্রে বোগার্ট, নায়িকাদের মধ্যে রূপের ও গমকের জৌলুসে-চোখ-ধাঁধিয়ে-দেওয়া জিনা লোলোব্রিজিদা ও ইনগ্রিড বেয়ার্গম্যান। তখনও সুইডিশ ছবির উন্মাদনা শুরু হয়নি।

ওলন্দাজ মনীষীদের মধ্যে টিনবার্গেন-হফ্‌স্ট্রার নাম আগেই করেছি; ওদেশী আরও বহু ঐতিহাসিক-রাষ্ট্রবিজ্ঞানী-দার্শনিক-সাহিত্যিক আমাদের ইনস্টিটিউটে বক্তৃতা দিয়ে গেছেন। ছোটো দেশ, কৌতুককথন ছিল, বিমানে জানালার ধারে বসে হল্যান্ড ঢোকবার মুহূর্তে জুতোর ফিতে আঁটো করবার লক্ষ্যে ক্ষণিকের জন্য নিচু হওয়ার পর ফের উঠে বাইরে তাকাতেই আবিষ্কার, দেশটা পেরিয়ে আসা হয়েছে। দেশের মানুষদের বহির্বাণিজ্য থেকে প্রধানত জীবিকা সংগ্রহ করতে হয়, তাই ইংরেজি, ফরাশি ও জর্মানের মতো ভাষা জানা অত্যাবশ্যক। চিত্রশালা বিহার করতে, হল্যান্ডের বিখ্যাত ফুলের সমাহার দেখতে, নিচু জমিতে বাঁধ বাধার প্রকৌশলের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা পেতে, বছর ভরেই দলে-দলে ট্যুরিস্টদের ভিড়। ছোটো দেশ, প্রথম সারির রাষ্ট্র নয়। নিজেদের সম্বন্ধে অত্যধিক বিনয়, তা হলেও আন্তর্জাতিকতার স্পর্শ অষ্টপ্রহর আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। হয়তো সেই কারণেই, আমাদের কারওরই তেমন ভালো করে ওলন্দাজ ভাষাটি শিখে ওঠা হলো না। পড়াশুনো থেকে শুরু করে সব ব্যাপারেই ভাষার জন্য কোনও-কিছু আটকাতো না, ইংরেজিতেই দিব্যি চালিয়ে যাওয়া যেত।

হল্যান্ড রাজারানীর দেশ, কিন্তু বিলিতি দেখানেপনা রাজ পরিবারে একেবারেই ছিল না। বেশ কয়েকদিন রানী জুলিয়ানা আমাদের সঙ্গে বসে লাঞ্চ বা ডিনার খেয়ে গেছেন, তাঁর কন্যা তিনজনও মাঝে-মাঝে আলাপ জমাতে আসতেন। দেশের মানুষগুলি দেখতে তেমন সুদর্শন নয়, তবে আন্তরিকতায় ভরপুর। আর ১৯৫২ সালে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মস্ত উত্তেজনা, ওলন্দাজ মেয়ে ব্লাঙ্কার্স কুন চার-চারটে সোনা জিতেছে, তাকে নিয়ে মাতামাতি। সেই তরুণীও একদিন খানিকক্ষণের জন্য দেখা দিয়ে গিয়েছিল আমাদের। মেয়ে-পুরুষ সবাই অসম্ভব পরিশ্রমী, ভোর রাত্রিতে উঠে মহিলাদের গৃহকার্য শুরু, মধ্য রাত্রির আগে তার বিরাম নেই। তার উপর বাইরে উপার্জনের জন্য খাটাখাটুনি তো আছেই, পুরুষদের সঙ্গে সমানে তাল রেখে। ফিলিপসের কারখানায়, ভাসা-ভাসা এখনও যা মনে পড়ে, শতকরা ষাট ভাগ কর্মীই মহিলা। দেশের খাবার জর্মান ঘেঁষা, একটু স্নেহপদার্থপ্রাধান্য, স্বাদ ঈষৎ বৈচিত্র্যহীন। তবে প্রচুর বিদেশি রেস্তোরাঁ সর্বত্র ছড়ানো। সদ্য-ছেড়ে-আসা ইন্দোনেশিয় সাম্রাজ্যের রেশ তখনও। প্রচুর ইন্দোনেশীয় খাদ্যের সমারোহ, অনেক ওদেশীয় রেস্তোরাঁ, যেখানে বিখ্যাত খাদ্য রাইসটাফেল, প্রাচ্যপ্রথায় বত্রিশ কি চৌষট্টি উপচার সাজিয়ে পরিবেশন, ভারতীয় রূপকথায়-রাজকাহিনীতে যেমনধারা বর্ণনা ছিল, ঝাল-তিক্ত-কষায়-মধুর সমস্ত-কিছু স্বাদের সম্মিলিত সাজানো অর্ঘ্য।

আমাদের আবাসনে ভারতবর্ষ-পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার ছাত্রছাত্রীর প্রাচুর্য হেতু কর্তৃপক্ষকে

উপরোধের ঠেলায় অস্থির করে বাধ্য করা হয়েছিল, পরিবেশিত খাদ্যে প্রাচ্যের আস্বাদ আমদানি করতে। অবশ্য আমাদের সহপাঠিনী মেয়েরাও অনেকেই রন্ধনশিল্পে ওস্তাদ, বিশেষ করে খুরশীদের নানা ধরনের মাংস রান্না করার অপূর্ব দক্ষতা। সুতরাং না-খেয়ে মারা যাইনি কেউই ওই দেড়-দু'বছর।

দিল্লি-কলকাতা-মুম্বইয়ের মতোই, ওলন্দাজ খবরের কাগজগুলিতে রাজনীতির আকাট প্রাধান্য। সকাল না হতেই লন্ডন-প্যারিস-বন-রোমের পত্রিকাদি পৌঁছে যেত, ওলন্দাজ খবরের কাগজের দিকে তাই বিশেষ তাকাতাম না। ওখানে রাজনীতির ধরনটাও একটু অন্যরকম। শ্রমিক শ্রেণীর দল অবশ্যই একটি ছিল, এবং তার প্রাধান্য তুচ্ছ করবার মতো নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে ধর্মের গন্ধ-ঘেঁষা একগাদা দল, ক্যাথলিক, মেথডিস্ট, প্রেসবাইটেরিয়ান ইত্যাদি। পালা করে প্রায় প্রত্যেক দলই, কিংবা বিভিন্ন দলের জোট, ক্ষমতার অলিন্দে পৌঁছে যেত, এখনও-যায়। তবে ইতিমধ্যেই দেশ যথেষ্ট উন্নত, শিল্পের-কৃষির সাফল্যে উপচে-পড়া বৈভব, রপ্তানির দৌলতে সবাই-ই মোটামুটি ভালোভাবে খেয়ে-পরে আছে সবাই, সুতরাং দলীয় ধর্মান্ধতার গন্ধ ছিল না, পারস্পরিক সহিষ্ণুতাই রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। একটি ছোট কমিউনিস্ট পার্টিও ছিল, অবশ্য কোনওদিনই তেমন দাগ কাটতে পারেনি। তার চাঁইরা মাঝে-মাঝে আমাদের সঙ্গে— ভারতীয়, পাকিস্তানি, ইন্দোনেশিয় ছাত্রদের সঙ্গে— আলাপ করে যেতে ভালোবাসতেন, আমরা বিশ্ববিপ্লবের অত্যাশু সম্ভাবনা নিয়ে বিভোর হতাম।

ইনস্টিটিউটে অন্যতম অধ্যাপক হ্বিলহেলম্ ভিটোভেইন, উদারনৈতিক দলের সদস্য, হঠাৎ ওদেশের অর্থমন্ত্রী বনে গেলেন। ভারি আড্ডাবাজ মানুষ, প্রায়ই সন্ধ্যার পর রটারডামে গিয়ে ওঁদের ফ্ল্যাটে ভিটোভেইন ও তাঁর হৃদয়বতী স্ত্রীর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আসতাম। পরে ইনি বছর পাঁচেকের জন্য ওয়াশিংটনস্থ আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের সর্বপ্রধান নিযুক্ত হয়েছিলেন। ভিটোভেইন নিজে যথেষ্ট রক্ষণশীল, কিন্তু চরিত্রঔদার্যে হ্রস্বতা ছিল না, আমাদের উগ্র বামপন্থী মতামত জানা সত্ত্বেও আলোচনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন না, যেমন নিতেন না অধ্যাপক টিনবার্গেনও, তবে তিনি তো সব ক্ষেত্রেই আরও বেশি নমনীয়। টিনবার্গেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা টিনেকে ও তাঁর যাজকবৃত্তি-গ্রহণ-করা অতি অমায়িক স্বামী প্রায়ই আমাদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে আসতো। টিনেকে পড়াশুনায় অসাধারণ প্রতিভাময়ী, প্রতি পরীক্ষায় প্রায় প্রতিটি বিষয়ে দশে দশ পেত, তাই তাঁর আদরের নামকরণ হয়েছিল 'টিন টিনেকে', ওলন্দাজ ভাষায় টিন মানে দশ।

পূর্ব ইওরোপের দেশে-দেশে ততদিনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তো মজবুত হয়ে গিয়েইছিল, পশ্চিম ইওরোপের প্রধান দু'টি দেশ ফ্রান্স ও ইতালিতেও কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা ক্ষমতা ছুঁই-ছুঁই পরিস্থিতি। কী করে তাদের ঠেকিয়ে রাখা যায় তা নিয়ে বাকি দলগুলির, এবং অবশ্যই ন্যাটোর-উপর-কর্তালি-করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, অহর্নিশ চিন্তা। সারা পৃথিবী জুড়েই, অন্তত তখন তা মনে হতো, বামপন্থী আদর্শের অপ্রতিরোধ্য বিস্তার, মাঝে-মাঝে লাতিন সহপাঠীদের কাছে তাদের নানা দেশে যুগপৎ সামন্ততন্ত্র ও মার্কিন পুঁজির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই কত জমজমাট হয়েছে, হচ্ছে, তার বিস্তৃত বৃত্তান্ত শুনতাম। ম্যাকার্থি-দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে ও ন্যাটোর জালবিস্তার প্রতিহত করতে পশ্চিম ইওরোপের প্রায় সব ক'টি দেশে চড়া মেজাজের আন্দোলন, যার ধাক্কা আমাদের রাজপ্রাসাদেও এসে ঠেকতো। আমরা যে ভারতীয় ছাত্রসংঘ গঠন করেছিলাম, তাতেও বামপন্থী উৎসাহের ঝোঁক। বিশ্ব শান্তি আন্দোলন, চার্লি চ্যাপলিনকে মার্কিন দেশ থেকে সপরিবার খেদিয়ে

দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে উত্তেজনা, ফরাশি কমিউনিস্ট শহিদ আঁরি মার্তাঁ-কে ঘিরে স্তবগান। তথাকথিত ঠান্ডা যুদ্ধ তখন তুঙ্গে, বেশ-কিছু উগ্র কমিউনিস্ট-বিরোধী পূর্ব ইওরোপ থেকে পালিয়ে পশ্চিমের দেশগুলিতে আশ্রয় নিয়েছে, আমাদের ইনস্টিটিউটেও একজন-দু'জন পাঠচর্চা করছে। মজার ব্যাপার, অথচ স্বাভাবিকও যা, সর্বক্ষণ নিজের দেশের সরকারের মুণ্ডপাত করছে, কিন্তু ফুটবলে বিশ্ব কাপ দখল করা নিয়ে প্রতিযোগিতা, বেতারে ধারাবিবরণী, সেই মুহূর্তে পালিয়ে আসা মানুষগুলি স্বদেশের দলের অন্ধ সমর্থক।

কোনও গ্রীষ্মের ঋতুতে ইরাক থেকে এক মহিলা আমাদের প্রাসাদে কয়েক সপ্তাহের জন্য থাকতে এলেন। জানলাম, ইরাক সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী, হল্যান্ডে একটি স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত পাঠক্রমে যোগ দিতে এসেছেন। একটু-আধটু আলাপের পর আমাদের খুব কাছাকাছি চলে এলেন। খানিক বাদে বোঝা গেল, মহিলা ইরাকে তখন-নিষিদ্ধ তুদেহ্ পার্টির সদস্য, গোঁড়া কমিউনিস্ট। হেগ শহরের সন্নিকট বনাঞ্চলে আমরা গ্রীষ্মের দীর্ঘ বিকেলে প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের দশা ওঁকে বলতাম, উনি বলতেন ওঁর দেশে সাম্যবাদী আন্দোলন কতটা এগোচ্ছে, ছড়াচ্ছে, তা নিয়ে। কিছুদিন বাদে উনি হেগ ছেড়ে চলে গেলেন, আমাকে বলে গেলেন, ওঁর নামে সবুজ রঙের চৌকো খামে যে-সব চিঠিপত্র আসবে, সেগুলি সুইজারল্যান্ডের একটি বিশেষ ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে। কয়েক বছর পর, আমি ততদিনে দিল্লিতে স্থিত, খবর পড়লাম ইরাকে বিপ্লব, বামপন্থী পার্টি ক্ষমতা দখল করেছে, আমার পরিচিতা সেই মহিলা, মাদাম দুলেমি, শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। দু'বছর বাদে ইরাকে প্রতিবিপ্লব, কমিউনিস্ট নায়কদের অনেককেই হত্যা করা হয়েছে, ফের খবর পড়লাম, মাদাম দুলেমিও নিহত।

ভারতবর্ষ থেকেও অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি এসে আমাদের সঙ্গে নর্ডেন্ডে রাজপ্রাসাদে কাটিয়ে গেছেন। যাঁর কথা সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে, তিনি কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়। আন্তর্জাতিক থিয়েটার সংঘের সম্মেলন দু'সপ্তাহব্যাপী, সেই সূত্রে এসেছেন, পুরোটা সময় আমাদের সঙ্গে ছিলেন। দেশের সমস্যা নিয়ে, বিদেশের ঘটনাবলী নিয়ে, সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, সংগীত, নৃত্যকলা অজস্র বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা। আমাদের রাজনৈতিক ঝোঁকের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল না, কিন্তু ক্ষমাসুন্দর চোখে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতেন। আচার্য নরেন্দ্র দেবকে ভালো চিনি জেনে আমাকে একটু বেশি প্রশ্রয় দিতেন। অমন মৃদুভাষিণী অথচ শান্ত, দৃঢ়মনস্কা, জ্ঞানসমৃদ্ধা মহিলা খুব কম দেখেছি, তাঁকে ঘিরে যেন শান্তি পরিব্যাপ্ত ছিল, অথচ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প থেকে শুরু করে দেশের খুঁটিনাটি নানা ক্ষেত্রে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। ওই ক'টা দিন তাঁর সাহচর্যের স্নিগ্ধতায় আপ্লুত হয়েছিলাম। পরে দেশে অনেকবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। এক সঙ্গে সরকারি বৈঠকাদি করেছি, নতুন দিল্লির ক্যানিং লেনে তাঁর বাড়িতেও গেছি, প্রতিবার স্নেহ ও প্রীতির কোমলতায় ভরিয়ে দিয়েছেন। যদি যথাস্থানে মনে পড়ে, এক দিশি রাজনৈতিক নেতা সম্পর্কে এক চমৎকার কাহিনী তিনি একদা আমাকে বলেছিলেন, সে ব্যাপারে বলবো।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তখন দেশের উপরাষ্ট্রপতি। তিনিও একবার হল্যান্ড সফরে এলেন, অন্যান্য গণ্যমান্যদের মতো আমাদের সঙ্গে কিছু সময় অতিবাহিত করে গেলেন, অনায়াসে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন ভারতের মহামহিম ঐতিহ্য নিয়ে। তা ছাপিয়ে আমাদের কাছে যা অধিকতর আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল, তা তাঁর, ইংরেজিতে যাকে বলে, 'রোভিং আই' : মেয়েদের দিকে একটু বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকা, ঘুরে-ফিরে তাকিয়ে থাকা, তিনি চলে

গেলে যা নিয়ে আমাদের মধ্যে প্রচুর হাসি-ঠাট্টা।

টিনবার্গেন আমেরিকা থেকে ফিরলেন, আমি কেমব্রিজ থেকে, আমার পাণ্ডুলিপি পড়ে তিনি খুশি, সুতরাং দেড় বছরের মাথাতেই আমার ধনবিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়ার উদ্যোগ শুরু হলো। ও দেশে, যেহেতু প্রথাগত ঐতিহ্য, সাধারণ মানুষের কাছে থিসিসের যা বক্তব্য তা বিলি করতে হবে, অন্তত পাঁচশো কপির প্রয়োজন, সুতরাং তড়িঘড়ি করে ছাপানোর ব্যবস্থা। মাত্র একানব্বুই পৃষ্ঠার থিসিস, ধনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ছোটো থিসিস, তবে পদার্থবিদ্যায় বা গণিত শাস্ত্রে এরকম হামেশাই হয়ে থাকে।

যেহেতু রটারডাম থেকে আমার ডিগ্রি পাওয়ার কথা, ওখানেই নির্দিষ্ট তারিখে দল বেঁধে ইনস্টিটিউট থেকে সবাই গেলাম। যা নিয়ম, থিসিসটি জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করে প্রার্থীকে বোঝাতে হয়, প্রথমে পরীক্ষকমণ্ডলী প্রশ্ন করবেন, তার জবাব দিতে হবে, পরে উপবিষ্ট জনগণের সঙ্গে সওয়াল-জবাবের পালা। আরও যা বিচিত্র নিয়ম, ডিগ্রিপ্রার্থীর সঙ্গে, তাঁকে ভরসা দেওয়ার জন্য, দুজন প্যারানিম্ফ থাকবেন, বাংলায় বলতে গেলে একটু রঙ্গ করে বলতে হয়, ডানা-কাটা পরী, তবে সাধারণত ছেলে পরীক্ষার্থীর সঙ্গে তার দুই সখাই প্যারানিম্ফ হিশেবে থেকে থাকে। এ ব্যাপারেও আমি ব্যতিক্রমী হলাম: আমার এক প্যারানিম্ফ খুরশীদ, অন্যজন আমার বন্ধু টোলন অধিকারীর বাগদত্তা কামিনী সাহনি, লখনউর সমাজতত্ত্ব বিভাগের বিখ্যাত ছাত্রী, হেগ শহরে এসেছে সমাজবিজ্ঞানে গবেষণা করবার লক্ষ্যে।

খেয়াল চাপায় ধুতি-পাঞ্জাবি-চাদর চাপিয়ে ডিগ্রি লভ্যার্থে গমন করেছিলাম। রাস্তায় লোক তাকিয়ে দেখলো, পরীক্ষামণ্ডপেও পরিবেশ স্বভাবতই হালকা হয়ে এলো। পরীক্ষকরা, যাঁদের মধ্যে টিনবার্গেন ও ভিটোভেইন দু'জনেই ছিলেন, মাত্র গুটিকয় প্রশ্ন করলেন, অতঃপর জনতার মধ্য থেকে কে যেন আমার সজ্জা নিয়ে কী এক কৌতূহল প্রকাশ করলেন, বিচারকমণ্ডলী তা নাকচ করে দিলেন, সভাভঙ্গ হলো। অর্থবিজ্ঞানে খেতাব লাভ করে নরডেন্ডে রাজপ্রাসাদে ফিরলাম, খানাপিনা হলো।

দিন কয়েক বাদে লন্ডন, টিলবেরি থেকে পি অ্যান্ড ও'র জাহাজ ধরা। সুয়েজে পৌঁছে দেখি নতুন দিল্লি থেকে পাঠানো এক তার অপেক্ষা করছে আমার জন্য। ভারত সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জয়ন্তীলাল আঞ্জারিয়ার বার্তা, আমি যেন মুম্বই থেকে প্রথমে কলকাতা না গিয়ে সটান দিল্লি চলে আসি, তিনি আমার জন্য একটি কাজের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

কচি বয়স তখন, টেলিগ্রাম ইত্যাদিকে সম্মান করতাম। আঞ্জারিয়া সাহেবের তলব পেয়ে মুম্বই থেকে বিমানে দিল্লি, আমার পক্ষে তখন অকল্পনীয় বেশি মাইনেতে অর্থমন্ত্রকে কাজের প্রস্তাব। তা গ্রহণ করে লখনউতে ইস্তফা দিয়ে একবার কলকাতা ঘুরে সপ্তাহ দুই বাদে সরকারি যূপকাষ্ঠে গলা বাড়ানো। পরে অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্ত অনুযোগ করেছিলেন, যদি তাড়াহুড়ো না করে আরও কয়েকটি দিন অপেক্ষা করতাম, অর্থমন্ত্রকেই আমার উচ্চতর পদ জুটতো। কী আর করা, কোনও দিনই তো তেমন হিশেব কষতে শিখলাম না।

দশ

দ্বিতীয়বার দিল্লি। সব মিলিয়ে এই দফায়ও ছিলাম উনিশ-কুড়ি মাস, অধিকাংশ সময়ই পতৌদি হাউসে। আমার লখনউর বন্ধু অংশু দাশগুপ্ত ইতিমধ্যে বৈদেশিক মন্ত্রকে কাজ নিয়ে দিল্লি চলে এসেছে, তার সঙ্গে ভাগাভাগি করে পতৌদি হাউসে একটি ঘরে। তবে আড্ডা দেওয়ার প্রধান জায়গা পাণ্ডারা রোডে আমাদের বরিষ্ঠ বন্ধু বলবন্ত দাতর-এর ফ্ল্যাটে, নয়তো কনস্টিটিউশন হাউসে। নতুন দিল্লিতে সে এক অদ্ভুত সময়, হাওয়াতে উন্মাদনা, সদ্য স্বাধীন দেশ, আমাদের মতো যুবকদের মনে দেশের দ্রুত আর্থিক উন্নতি নিয়ে অনেক আশার বালুচর গড়া। শাসকদলের কর্তাব্যক্তিরা সবাই উচ্চবিত্ত শ্রেণীভুক্ত, ব্যবসাদার, পুঁজিপতি, জমিদার-জোতদারদের প্রতিনিধি, কিন্তু অন্তত জওহরলাল নেহরু সমাজতন্ত্রের মন্ত্র নামতার মতো করে সকাল-বিকেল উচ্চারণ করছেন, মহা উৎসাহে যোজনা কমিশন গঠন করেছেন, অনেক তরুণ অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকে যোগ দিচ্ছেন। সোভিয়েট দেশের সঙ্গে সম্প্রীতির সম্পর্ক আগে থেকেই তো ছিল, এখন চীনের সঙ্গে সৌভ্রাত্রের ঋতু শুরু হলো বলে অনেকেই ধরে নিয়েছেন। চু এন লী চুয়ান্ন সালের মাঝামাঝি খর গ্রীষ্মে নতুন দিল্লি সফর করে গেলেন, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির উচ্ছ্বাস-ভরা বাণীর বন্যা। আমার সমবয়সী যাঁরা নতুন দিল্লিতে এসে জড়ো হয়েছিলাম, নিজ-নিজ ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বিশ্বাস যা-ই থাকুক না কেন, সবাই ধরে নিয়েছিলাম দেশটা এবার এগোবে, ভূমি সংস্কার ঘটবে, কৃষি ও শিল্পের দ্রুত বিকাশ প্রায় অপ্রতিরোধ্য, যুগ-যুগ ধরে লাঞ্ছিত-শোষিত-অপমানিত দরিদ্রশ্রেণীর এখন থেকে একটু হিল্লে হবে।

দাতরজীর ফ্ল্যাটে আমরা যারা আড্ডা দিতাম, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সমাগত ভিড়—মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কেরল, অন্ধ্র, তামিলনাডু, পশ্চিম বাংলা এ-সমস্ত রাজ্য থেকে—, বয়সোচিত হুল্লোড় করতাম, ঠাট্টাবিদ্রূপ-অট্টহাসিতে মাতোয়ারা হতাম, বয়োজ্যেষ্ঠদের স্বভাবমুদ্রাদোষ নিয়ে অবশ্যই একটু-আধটু বিজ্ঞ বা নাস্তিক মন্তব্যের ঝুড়িঝুড়ি। তবে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর মাত্র ছ'-সাত বছর গত হয়েছে, বিশ্বাসে ভরপুর আমরা, ভারতবর্ষ যে ঝটপট এগিয়ে যাবে তা নিয়ে কারওরই ন্যূনতম সংশয় ছিল না। সে জন্যই হয়তো, আপাততারল্য সত্ত্বেও, কর্তব্যকর্মে ভীষণরকম নিষ্ঠানিমগ্ন ছিলাম ; ভারতবর্ষের প্রগতি সমাজতান্ত্রিক পথ ধরে ঘটবে, সরকারের ভূমিকা তাই মস্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেই ভূমিকা পরিপালনে আমাদের অপরিসীম দায়িত্ব। দশটা-পাঁচটা ব্যাকরণে তাই আমরা নিজেদের আবদ্ধ রাখিনি, সকাল-সকাল দপ্তরে চলে যেতাম, আলোচনায়-তর্কে-লেখায়-সভায় প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত হতো, ডেরায় ফিরতাম প্রায় প্রত্যেক দিনই সন্ধ্যা গড়িয়ে রাতের গভীরে পৌঁছুলে। অথবা আদৌ ফিরতাম না, হয় দাতরজীর ওখানে চলে যেতাম দঙ্গল বেঁধে, ওখানেই নৈশাহার, নৈশাহারের সঙ্গে অনবচ্ছিন্ন দেশচর্চা। কোনও-কোনও দিন হয়তো বা কনস্টিটিউশন হাউসে ধাওয়া করা, আমাদের মধ্যে কেউ সেখানে ঘর পেয়েছে, তা ছাড়া

আরও বিভিন্ন স্তরের অনেক সরকারি কর্মচারী, যাঁরা ওই মুহূর্তে বাংলো কিংবা ফ্ল্যাট পাননি, তাঁরা অবস্থান করছেন, বেশ-কিছু সংসদ সদস্যও সেই সঙ্গে। সুতরাং নতুন-নতুন আলাপ-পরিচয়ের অধ্যায়, দেশের নানা সমস্যা নিয়ে গাঢ় থেকে গাঢ়তর মত বিনিময়-প্রতিবিনিময়, পাশাপাশি যথারীতি হুল্লোড়-আড্ডা। জাতীয় সংহতিতে সেই মুহূর্তে নিশ্চয়ই গভীর আস্থা রাখতাম, ওরকম আস্তিক সময় জীবনে আর আসেনি।

দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্সে আমার সমবয়সি কিংবা বয়সে সামান্য-একটু বড়ো তীক্ষ্ণবুদ্ধি অর্থনীতিবিদদের ভিড়, তদ্রূপ ভিড় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকে। তখনও দিল্লি-নতুন দিল্লি মিলিয়ে জনসংখ্যা তেমন ভয়ংকর আকার ধারণ করেনি। সুতরাং, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঈষৎ ভৌগোলিক দূরত্ব সত্ত্বেও, আমাদের মেলামেশায় আদৌ অসুবিধা হয়নি। বিভিন্ন মন্ত্রকে যারা ছিলাম, সপ্তাহে অন্তত একদিন দিল্লি স্কুলে যেতাম, দিল্লি স্কুলে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও আমাদের সামীপ্যে চলে আসতেন। প্রায় সবাই-ই এদেশের-ওদেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টাটকা গবেষণা সেরে জড়ো হয়েছি ; ধনবিজ্ঞান পৃথিবীকে, এবং আমাদের দেশের চেহারাকে, আমূল পাল্‌টে দিতে পারে, সেই বিশ্বাস মনের গহনে প্রোথিত।

অথচ সামান্য একটু প্রতিযোগিতার পরিবেশও ছিল। যেমন প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা শ্রীযুক্ত আঞ্জারিয়া, যুগপৎ অর্থমন্ত্রক ও যোজনা কমিশনে পরামর্শদাতা, তাঁর সহকর্মী আমরা প্রায় সবাই-ই অর্থমন্ত্রকে। অন্যদিকে যোজনা পরিষদে ইতিমধ্যেই প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রধান সংখ্যাতাত্ত্বিক পরামর্শদাতা হিশেবে যোগ দিয়েছেন। খানিক বাদে তিনি পরিষদের খোদ সদস্যও মনোনীত হলেন, যার মানে মন্ত্রী পর্যায়ে স্থিত হলেন। এমনিতেই তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তার উপর প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে অতি নিবিড় সম্পর্ক। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা তথা অবিসংবাদী প্রধান পুরুষ, তিনি ইনস্টিটিউটের একটি শাখা খুললেন নতুন দিল্লিতে। তরুণ অর্থনীতিবিদ ও পরিকল্পনাবিদদের ঢালাও জড়ো করলেন কলকাতা ও নতুন দিল্লির দুই শাখায়, পরিকল্পনার রূপরেখা নিয়ে প্রধান মন্ত্রীকে প্রায় প্রত্যহ শরবর্ষণ। আঞ্জারিয়া কিছুদিনের মধ্যেই একপাশে পড়ে রইলেন। তাঁর মাথার উপর তখন অর্থমন্ত্রী চিন্তামন দেশমুখ, ব্রিটিশ আমলের সিভিলিয়ান, সব বিষয়েই যথেষ্ট রক্ষণশীল, মহলানবিশ যতই এগিয়ে যেতে চাইছেন, দেশমুখের ততই রাশ ধরবার প্রয়াস। আঞ্জারিয়াকে প্রধানত অর্থ মন্ত্রীর বচন-উপদেশই শুনতে হতো, পরিকল্পনা পরিষদেও তিনি অর্থমন্ত্রকের মতামতই জ্ঞাপন করতেন, তদুপরি তিনি লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স থেকে পাশ-করা ধনবিজ্ঞানী ; ব্রিটিশ ঐতিহ্যে ধীরে-চলা নীতি মজ্জাগত, তা-ও আঞ্জারিয়ার মানসিক গঠনকে অনেকটা প্রভাবিত করেছিল। তবে, তাঁর রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও, ভদ্রলোক অতি চমৎকার মানুষ, তাঁর স্ত্রীও অতি করুণাবতী। আমরা যাঁরা আঞ্জারিয়ার সঙ্গে কাজ করতাম, তাঁর ঘরের মানুষ হয়ে গিয়েছিলাম। তবু মহলানবিশ তাঁর উদ্ধত সাহসিকতা দিয়ে আমাদের অন্যদিকে টানলেন।

দুশো বছর ধরে বিদেশীদের দ্বারা শোষিত হয়েছি, কৃষিতে-শিল্পে-বাণিজ্যে আমাদের কোনওভাবে উন্নত হতে দেওয়া হয়নি, অথচ দেশে খনিজ-বনজ-জলজ সম্পদের অভাব নেই। একটা হিশেব অনুযায়ী, মার্কিন দেশের পর ভারতবর্ষেই বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, আমরা কেন তা হলে স্বনির্ভরতার ভিত্তিতে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারবো না? প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, যা দিল্লিতে আমার হাজির হওয়ার আগেই আঞ্জারিয়া মশাই আরও কয়েকজনের সঙ্গে মিলে রচনা করেছিলেন, তাতে আর্থিক বিকাশের

হার বড্ড ঢিমে তাল, ওই হারে এগোলে আমরা যুগযুগান্ত ধরে পিছিয়েই থাকবো। আমাদের যা চমৎকৃত করলো, অধ্যাপক মহলানবিশ সোভিয়েট রাষ্ট্রে গিয়ে গসপ্ল্যান-এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিশদ আলোচনা সেরে এসেছেন, তাঁদের ধাঁচে একটি স্বয়ম্ভর অর্থব্যবস্থার গাণিতিক মডেল দাঁড় করিয়েছেন, যার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ। অন্য একটি ব্যাপারও ছিল, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সম্মান তখন তুঙ্গে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কৃষ্ণ মেনন বক্তৃতা দিয়ে ফাটিয়ে দিচ্ছেন। ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোজে শান্তি স্থাপনে ভারতীয় কূটনীতিকদের অগ্রণী ভূমিকা গোটা পৃথিবী মেনে নিয়েছে। সন্নিকট সময়ে বান্‌ডুঙে আফ্রো-এশীয় সম্মেলন, চু এন লী-টিটো-নাসের-এর সঙ্গে জওহরলাল নেহরুর সমপর্যায় স্তবস্তুতি, জাতীয় আত্মবিশ্বাস শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছুনো। এই অবস্থায় সাহসী পরিকল্পনার সপক্ষে জনসমর্থন এবং বিজ্ঞজনসমর্থন দুই-ই স্বতঃসিদ্ধ বলে বিবেচিত হলো, রক্ষণশীলরা পিছু হটলেন। প্রধানত অধ্যাপক মহলানবিশের অনুপ্রেরণায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাঠামো রচনা, তাতে বহির্বাণিজ্যের প্রসঙ্গ তুচ্ছাতিতুচ্ছ, স্বয়ম্ভর অর্থব্যবস্থাভিত্তিক মডেলের সূত্র ধরে বিভিন্ন আর্থিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, গড় বৃদ্ধির হার ও গড় কর্মসংস্থানের হার নিরূপণ। যোজনা পরিষদের মঞ্জুরী পাওয়ার পর দেশের একুশ জন গণ্যমান্য অর্থনীতিবিদ্‌দের কাছে সেই খসড়া পেশ করা হলো। আমাদের দেশের ধনবিজ্ঞানীরা বড়ো বেশি সরকারের কাঁধ-শোঁকা, সরকার যদি বলে জল উঁচু, তাঁরাও বলেন জল উঁচু, সরকার যদি বলে জল নিচু, ওঁরাও বলেন জল নিচু। সুতরাং এই সাক্ষীগোপাল অর্থনীতিবিদ্‌দের দ্বারা স্বয়ংভর অর্থব্যবস্থার রূপরেখা অনুমোদন করিয়ে নিতে কোনও বেগই পেতে হলো না।

হঠাৎ সারা দেশ পরিকল্পনা নিয়ে বাঙ্ময়, যোজনা পরিষদ থেকে অনুদান পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে-কলেজে-স্কুলে উত্তম-মধ্যম-অধম ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পরিকল্পনা সংক্রান্ত গবেষণা-রচনাদি লেখা শুরু হলো।

গভীর তৃপ্তির দিন ছিল দিল্লিতে সেই কয়েক মাস, গভীর আনন্দের দিন। সমবয়সী বন্ধুবান্ধব, দাতরজীর ফ্ল্যাটে জড়ো হওয়া সুহৃদসম্প্রদায়, সেই সঙ্গে আমার রাজনৈতিক বিশ্বাসের সঙ্গে সাযুজ্যসম্পন্ন অজিত দাশগুপ্ত, মোহিত সেন প্রমুখ বন্ধুরা। সবাই মিলে বড়ে গোলাম আলির গান শুনতে যেতাম, কিংবা সদ্য-উদিত রবিশঙ্করের সেতার বা আলি আকবরের সরোদ, অথবা বালাসরস্বতীর নৃত্য। কিংবা 'বহুরূপী'-র রোমাঞ্চ-জাগানো 'রক্তকরবী' সপ্রু হাউসের মঞ্চে। পূর্ব ইওরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে আমাদের তখন প্রচণ্ড মাখামাখি, সে-সব দেশ অথবা চীন থেকে প্রায়ই ব্যালে বা অপেরা দলের আগমন ঘটতো, দিনের বেলা অর্থনীতির চর্চায় আবদ্ধ, তবে সন্ধ্যা হলেই দল বেঁধে এ-সমস্ত অনুষ্ঠানে জমাট হওয়া। সে-সব বন্ধুদের অনেকে এখনও আছেন, অনেকে বিগত, যাঁরা আছেন তাঁরাও নানাদিকে ছড়িয়ে, নানা দেশে, নানা শহরে তাঁদের জীবনের গতি ও প্রকৃতি বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে, মনের গড়নও অনেকের বদলে গেছে হয়তো। দাতরজী কিছুদিন আগে প্রয়াত হয়েছেন, তাঁকে বাদ দিলে যাঁদের কথা বারবার মনে পড়ে, তাঁদের মধ্যে অবশ্য উল্লেখনীয় ইন্দ্রপ্রসাদ (আই.জি.) প্যাটেল, কাক্কড় নন্দলাল রাজ, কাদুর শামান্না কৃষ্ণস্বামী, হিতেন ভায়া ও তাঁর স্ত্রী অ্যাঞ্জেলা, অরুণ ঘোষ ও তাঁর পত্নী হাটখোলার দত্তদুহিতা ডালিয়া, রামদাস হোনাভার ও তাঁর একদা-ব্যাডমিন্টনে-পটীয়সী স্ত্রী চন্দ্রা উল্লাল, ধর্মা কুমার ও তাঁর স্বামী লবরাজ কুমার, মুরলী ও উমা রাও, লতিকা ও চঞ্চল সরকার, নীলাঞ্জনা ও সুভাষ ধর, মোহিত সেন ও বনজা আয়েঙ্গার। এঁদের মধ্যে কেউ-কেউ

বেসরকারি দফতরে কর্মরত ছিলেন, আর মোহিত তো কমিউনিস্ট পার্টিতে সর্বক্ষণের কর্মী।

ঘোর-লাগা সময়, আমরা বন্ধুরা সৌরমণ্ডলের নিয়ামক, পরস্পরে জড়িয়ে আছি, আমরাই সৃষ্টি-প্রলয় উপভোগ-অনুভবের মধ্যবিন্দুতে, অন্য সব-কিছু অবান্তর, প্রক্ষিপ্ত। এই অহংবোধ এক সায়ংসমাবেশে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। আঞ্জারিয়া তাঁর বাড়িতে কোনও ছুটির দিনে আমাদের সবাইকে নৈশাহারে ডেকেছিলেন। হুল্লোড়, চিৎকার, মস্করা, হাসি-ঠাট্টা, রাত গভীরের দিকে, পল্লী কাঁপিয়ে আমাদের যূথবদ্ধ আত্মরতিবিলাস। হঠাৎ খেয়াল হলো আঞ্জারিয়ার অশীতিপর বৃদ্ধ পিতৃদেব ঘরের এক কোণে চুপচাপ বসে আছেন। কাছে গিয়ে একটি-দু'টি সৌজন্যসূচক কথা ওঁর সঙ্গে বলা ন্যূনতম কর্তব্য বলে মনে হলো। চমৎকার মানুষ, আলাপ জমলো। ভদ্রলোক সহসা আমার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, 'ইয়ং ম্যান। আমার একটা উপদেশ শোনো, আমার মতো বেশি বয়স পর্যন্ত বেঁচে থেকো না। বার্ধক্যের চেয়ে বড়ো অভিশাপ নেই।' বিনয়ে গলে গিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে আমার উক্তি : 'কেন এ কথা বলছেন? এই তো আপনি আমাদের মধ্যে আছেন, আমাদের কত আনন্দ হচ্ছে।' '—ইয়ং ম্যান, তা হলে শোনো। আজ তো ছুটির দিন ছিল, ভোরবেলা আমার ছেলে তার স্ত্রীকে নিয়ে কোনও সভায় গিয়েছিল, আমার নাতিও বাবা-মা'র সঙ্গে গেল। বেলা এগারোটা নাগাদ সাইকেলে চেপে এক ছোকরা এসে বেল বাজালো। "সাব হ্যায়?" বললাম বাড়ি নেই। "মেমসাব হ্যায়?" না, মেমসাবও নেই। "বাবা হ্যায়?" না, বাবাও নেই। ছোকরাটির কাতর আর্তনাদের মতো প্রশ্ন, "কোই ভি নেহি হ্যায়?" এই যে আমি জলজ্যান্ত ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আমি কেউ না। তাই বলছি, ইয়ং ম্যান, বেশি বয়স পর্যন্ত বাঁচতে নেই।'

তবে আমরা তখন মধ্যযৌবনের গর্বিত কেন্দ্রে এ ধরনের হঠাৎ-থমকে-যাওয়ার অবকাশ বা বিনয় বা ধৈর্য তেমন ছিল না।

আমার দিল্লি পৌঁছুবার কয়েক মাসের মধ্যে অংশু ভিয়েতনাম চলে গেল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শান্তিসালিশি সংক্রান্ত কাজে, পতৌদি হাউসের ঘরটি আমার পুরোপুরি দখলে এলো। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থায় একটু অসুবিধা দেখা দিচ্ছিল, কিন্তু তখন থেকেই তো সব মুশকিলের অবসানকর্তা অরুণ ঘোষের অভিভাবকত্বে আমার জীবনধারণ। অমন প্রাণোচ্ছল স্বভাবপরোপকারী মানুষ গণ্ডায়-গণ্ডায় জন্মগ্রহণ করেন না। স্নেহের ফরমান হলো, পতৌদি হাউসের মূল দালানে ওঁদের ফ্ল্যাট, ওখানে গিয়ে প্রতিদিন আমাকে অন্নগ্রহণ করতে হবে, আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা সেই হুকুম অগ্রাহ্য করি।

নতুন করে সামান্য সমস্যা দেখা দিল যখন ডালিয়া ও অরুণ ঘোষ কিছুদিনের জন্য ফ্ল্যাট বন্ধ করে ব্যাংকক চলে গেলেন। তবে ওই বয়সের যুবকদের পরিত্রাতা-ত্রাত্রী স্বতই জুটে যায়। ঠিক উল্টোদিকে থাকতেন সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্রী শীলা ও তাঁর ছোটো ভাই প্রদীপ, সুভাষচন্দ্রের মধ্যম অগ্রজ সুরেশচন্দ্র বসুর সন্তান। শীলা কোনও সরকারি দপ্তরে কাজ করতেন, যা ছিল আমার দপ্তরের লাগোয়া : পুরনো জঙ্গি ব্যারাক, রাষ্ট্রপতি ভবন ও নর্থ ব্লকের প্রায় গা ঘেঁষে, বলা হতো পি-ব্লক। সেই ঘরগুলির এখন আর অস্তিত্ব নেই, সেখানে সংসদ-সদস্যদের জন্য গাড়ি রাখার ব্যবস্থা হয়েছে।

শীলা বুঝতে পারছিলেন, আমার ভোজনং যত্রতত্রং সমস্যা, একদিন ফতোয়া জারি করলেন, এখন থেকে ওঁদের সঙ্গে আমাকে খেতে হবে। সেই আদেশ পালন করতে আমার কোনও অসুবিধাই হয়নি, এবং ওই কয়েক মাস প্রচুর আরামে ছিলাম। শীলা গল্প-পরচর্চায়

চৌখশ ছিলেন, বিশেষ করে নিজেদের পরিবার নিয়ে কেচ্ছাবিবরণে। প্রদীপ তখন থেকেই রাজনৈতিক তত্ত্বাদি নিয়ে যুগপৎ আগ্রহী ও মনোযোগী, সব দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করে বেড়াতেন, পরে বেশ কিছুদিন ভিয়েনাতে সোস্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ওখানেই কর্মরতা এক ইংরেজ মহিলার সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। এখন দিল্লিতে, যদিও বহুদিন আমার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। শীলাও ইতিমধ্যে পদবী বদলেছেন, সংসার রচনা করেছেন, তিনিও দিল্লিতে।

দুটো কথা যোগ করার তাগিদ অনুভব করছি। প্রথম, আমি ক্ষীণাহারী মানুষ, শীলা আহারান্তে প্রায়ই অনুযোগ করতেন, 'আপনাকে খাইয়ে সুখ নেই'। দ্বিতীয় যে-কথা উল্লেখ করতে হয়, শীলা বাংলার বিখ্যাততম রাজনৈতিক পরিবারের দুহিতা, কিন্তু পুরোপুরি নাক-সিঁটকোনো ভাববর্জিত। ভদ্রমহিলা ওই মাসগুলিতে আমাকে অনেক কাহিনী শুনিয়েছিলেন, একটি তাঁর এক নিকটাত্মীয়াকে নিয়ে, তা এখনও মনে গেঁথে আছে। ওই আত্মীয়ার প্রসঙ্গ উঠতে শীলার অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য : 'ওর তো বিয়ে হবে না'। তারপর একটু থেমে তাঁর সংযোজন, 'মাত্র বাইশ গজ পর্যন্ত পৌঁছুনো গেছে, তাতে কী আর বিয়ে হয়'। হেঁয়ালি বুঝতে পারলাম না, আমার দিক থেকে প্রশ্নবোধক চিহ্ন, এবার শীলার উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ার পালা: 'তবে শুনুন, ওর (অর্থাৎ আত্মীয়াটির) ধনুর্ভঙ্গপণ, যে-বাড়িতে বিয়ে করবে তার দেউড়ি থেকে দরদালান কমপক্ষে যেন একশো তিপ্পান্ন গজ দূরবর্তী হয়; গত পাঁচ বছরের চেষ্টায় সবচেয়ে খাশা যে-বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে তার দেউড়ি-দরদালানের মধ্যে দূরত্ব মাত্র বাইশ গজ, সুতরাং ওর বিবাহ-সম্ভাবনা দূর অস্ত্'।

পতৌদি হাউসের অনতিদূরে ফিরোজশাহ রোডে সংসদ-সদস্যদের জন্য নির্ধারিত কুঠুরিতে ভূপেশ গুপ্ত থাকতেন, তাঁর বাসগৃহের কমিউনে অজিত দাশগুপ্ত ও তাঁর সদ্য-পরিণীতা স্ত্রী শিপ্রা, আর থাকতেন দ্বিজেন নন্দী, যিনি ভারত-চীন মৈত্রী সঙ্ঘের সম্পাদক হিশেবে একদা বিখ্যাত ছিলেন, পরে বিখ্যাততর হয়েছিলেন অন্য-একটি কারণে যা যথাস্থানে উল্লেখিত হবে। (দ্বিজেন নন্দী শেষের দিকে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গিয়েছিলেন, এতটাই যে 'পরিচয়' পত্রিকার স্বত্বাধিকারীদের মধ্যে যাঁদের মূলধন ন্যূনতম এক শতাংশ, নিয়মমোতাবেক তাঁদের তালিকা বছরে একবার প্রকাশ করতে হয়, গত বছর দশেক তিনি সেখানে 'প্রয়াত' বলে চিহ্নিত হয়ে এসেছেন, যদিও ভদ্রলোক মারা গেছেন অতি হালে, বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে।) আরও থাকতেন হুগলি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য তুষার চট্টোপাধ্যায়, নির্ভেজাল ভালো মানুষ, আদর্শে স্থির, স্বভাববিনয়ে মুগ্ধ করতেন সবাইকে। বেশ কিছুদিন হলো তিনিও প্রয়াত।

কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ আরও গভীর হয়ে উঠলো। ভূপেশবাবুর আগ্রহে এবং মোহিত ও অজিতের উৎসাহে মাসিক ও সাপ্তাহিক নিউ এজ-এ অর্থনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে আমার লেখা শুরু হলো। সরকারি কাজ করছি, কমিউনিস্ট পত্রিকায় স্বনামে লেখায় অনেক সমস্যা, ভূপেশবাবু আমার জন্য একটি ছদ্মনাম বাছাই করে দিলেন : চারণ গুপ্ত। সেই নামে আমি এক যুগ বাদে 'নাউ' ও 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকায় দেদার লিখেছি।

ভূপেশবাবুর কমিউন সব অর্থে কমিউনিস্ট ধর্মশালা, কলকাতা ও অন্যত্র থেকে নেতা ও কর্মীরা আসছেন-যাচ্ছেন, ওখানেই অজয় ঘোষ, ই এম এস নাম্বুদ্রিপদ ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ, যদিও জ্যোতি বসু-প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে না। কলকাতা থেকে কখনও বিদেশগামী কোনও প্রতিনিধিদল দিল্লিতে এসে ওই কমিউনে উঠতেন, একবার

চীনযাত্রী কোনও প্রতিনিধি গোষ্ঠীতে জর্জ বিশ্বাস ছিলেন, আমাদের এন্তার গান শুনিয়েছিলেন, *রবীন্দ্রনাথের গান থেকে শুরু করে গণনাট্যের গান পর্যন্ত। মেজাজে থাকলে* জর্জ বিশ্বাসের, প্রতিবারই লক্ষ করেছি, উৎসাহে ভাটা পড়তো না, গানের প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে যেতেন। তবে খেয়ালি মানুষ, অভিমানী মানুষ, আত্মসম্মানবোধ তীব্র, অন্যমনস্কতাহেতুও কারও তাঁর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপে সামান্যতম ঘাটতি ঘটলেই তিনি রেগে কাঁই, অবশ্য শান্ত হতেও সময় নিতেন না। চু এন লী-র সঙ্গে চীনে তাঁর ভালো আলাপ হয়েছিল, তাঁকে চীনের প্রধানমন্ত্রী বিশেষ পছন্দ করতেন, জর্জ বিশ্বাস বারবার একথা জানাতেন। আরও জানাতেন, একবার নাকি চু এন লী কলকাতা সফরে এসেছেন, নাগরিক অভ্যর্থনা, তিনি মঞ্চে উপবিষ্ট, জর্জ বিশ্বাস শ্রোতৃমণ্ডলের মধ্যে মাঝামাঝি সারিতে, হঠাৎ চু এন লী-র নজর পড়লো, মঞ্চ থেকে সোজা নেমে এসে জর্জ বিশ্বাসকে জড়িয়ে ধরলেন : 'সিঙ্গার, তুমি এখানে!' দেবব্রত বিশ্বাসের উত্তর : 'মাননীয় প্রধান মন্ত্রী, এটাই আমার শহর।' কোথায় কার দুর্বলতা থাকে, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। জর্জ বিশ্বাস লজ্জের মতো প্রতিবার কাহিনীটি বিবৃত করতেন।

কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিলেন ই এম এস। বরাবরই তাঁর কথায় জড়তা, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, বুদ্ধির দীপ্তি, চিন্তার প্রাখর্য, আদর্শের গভীরতা, সব দিক দিয়েই তিনি আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন। অথচ তাঁর রসবোধও সমান অসামান্য, তাঁর ব্যঙ্গোক্তির প্লাবনে প্রায়ই আমরা হেসে কুটোপাটি হতাম। ই এম এস-এর রসিকতাবোধের একটি অতি সামান্য উদাহরণ মনে পড়ছে। ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাস, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জিতে কমিউনিস্ট পার্টি কেরলে মন্ত্রিসভা গঠন করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম, কাতারে-কাতারে দেশ-বিদেশ থেকে সাংবাদিকরা নতুন দিল্লি-তিরুবনন্তপুরমে জড়ো হয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপদকে চাক্ষুষ দেখতে, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে। নতুন দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক চলছে, এক বিদেশী সাংবাদিক উঠে দাঁড়িয়ে ই এম এস-কে প্রায়-নির্বোধ প্রশ্ন ছুঁড়লেন : 'মহাশয়, আপনার বাক্-জড়তা লক্ষ্য করছি, আপনি কি সব সময়ই তোতলান?' ই এম এস-এর সহাস্য ক্ষিপ্র জবাব : 'আজ্ঞে না। আমি তোতলাই একমাত্র যখন কথা বলি।' আরও যা যোগ করতে চাই, তাঁর চেয়ে অধিকতর গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব কমই দেখেছি : বয়সে প্রায় কুড়ি বছরের বড়ো, কিন্তু আলাপ-আলোচনা-তর্ক করতেন সমবয়সী বন্ধুর মতো, আমাদের মতামতকে প্রভূত সম্মান জানিয়ে।

কমিউনিস্ট আন্দোলন গোটা দেশে তখন প্রচণ্ড আশার মগডালে। রণদিভে সাধারণ সম্পাদক থাকবার সময় দেশ জুড়ে যে-সশস্ত্র বিদ্রোহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তা অবশ্য অসফল, ততদিনে নির্বাপিত। তা হলেও তার পরবর্তী কয়েক বছর কমিউনিস্ট পার্টির সম্মান ও সম্ভ্রম তুঙ্গেই থেকে গেছে। জাতীয় কংগ্রেসের পর দেশে কমিউনিস্ট পার্টি অবিসংবাদী দ্বিতীয় দল, লোকসভায় গোপালন, দাঙ্গে, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়রা তাঁদের স্বদেশপ্রেম, লোকপ্রেম, আন্তরিকতা ও বচনবৈদগ্ধ্যে সকলের দৃষ্টি কাড়ছেন, রাজ্যসভায় ভূপেশ গুপ্তরও সমান দাপাদাপি। লোকসভায় জওহরলাল নেহরু কমিউনিস্ট নেতাদের প্রতি খানিকটা অনুকম্পায়ী, রাজ্যসভার সভাপতি রাধাকৃষ্ণন অনুরূপ প্রশ্রয়দাতা। তা ছাড়া ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী উচ্চারণের পাশাপাশি হিন্দি-চীন ভাই-ভাইয়েরও মরশুম সেটা। তেলেঙ্গানার সংগ্রাম কোনও অর্থেই বিফলে যায়নি, প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তেলেঙ্গানা

অঞ্চল থেকে কমিউনিস্ট প্রার্থীরা বহু সংখ্যায় নির্বাচিত হয়েছেন, কেউ-কেউ প্রদত্ত ভোটের এমনকি শতকরা নব্বুই ভাগ পেয়ে। পশ্চিম বাংলায় তেভাগা আন্দোলন গ্রামাঞ্চলে তার অম্লান সাক্ষ্য রেখে গেছে, কৃষক সভার শক্তি ক্রমশ দ্রুত বাড়ছে প্রতিটি জেলায়। এটাও না মেনে উপায় নেই, ঊনবিংশ শতকের রামমোহন-মাইকেল- বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর-কেশবচন্দ্র-কেন্দ্রিক প্রথম বাঙালি উজ্জীবনের ষাট-সত্তর বছর পর, কমিউনিস্ট পার্টির অনুপ্রেরণায়, বিংশ শতাব্দীর মধ্যঋতুতে, চমকে দেওয়ার মতো দ্বিতীয় বাঙালি উজ্জীবন, গানে, কবিতায়, নাট্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পর্বে তারাশঙ্কর কমিউনিস্টদের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে গেছেন, কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টিতে যোগদান সেই ক্ষতি পুষিয়ে দিয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'পরিচয়' পত্রিকা তাঁর কমিউনিস্ট একদা-সখাদের হাতে অর্পণ করে নিজের নাস্তিকতা নিয়ে অপসৃত হয়েছেন, তবে রবীন্দ্রনাথকে ধুইয়ে দেওয়ার অসহিষ্ণু একাগ্রতা-জড়ানো 'পরিচয়'-এর বালখিল্যতার ঋতুও উত্তীর্ণ ; সবচেয়ে প্রতিভাবান নবীন লেখক সমরেশ বসু, তখনও পর্যন্ত পার্টির প্রতি আনুগত্যে অটুট। 'পরিচয়'-এর পাশাপাশি 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকাও কয়েক বছর বামপন্থী সাহিত্য আন্দোলনকে উচ্চকিত করে রাখলো। এবং এখানেই তো শেষ নয়। একদিকে গণনাট্য সঙ্ঘ-শম্ভু মিত্র-বিজন ভট্টাচার্য-উৎপল দত্তদের উদ্দাম সৃষ্টির বন্যা, অন্যদিকে নিমাই ঘোষ, ঋত্বিক ঘটক, খানিক বাদে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, এঁদের সবাইকে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্রে সামাজিক বাস্তবতার অপ্রচ্ছন্ন প্রকাশ, পাশাপাশি লোকসংস্কৃতির উৎসসন্ধানে নিরন্তর অধ্যবসায়, সেই সঙ্গে জর্জ বিশ্বাস-সুচিত্রা মিত্রদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনের সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠ থেকে বাইরে টেনে এনে বাংলার গ্রাম-শহরময় আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া, তাপস সেনের আলো নিয়ে পরীক্ষা, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নবজীবনের গান'-'মধুবংশীর গলি', ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে সুনীল জানার বাংলার পল্লীতে-অরণ্যে খাঁটি নারী-পুরুষের অন্বেষণ, খালেদ চৌধুরীর মঞ্চসজ্জা, এক দঙ্গল নবীন শিল্পীর ছবি আঁকায়-পাথর খোদাইয়ে মেতে ওঠা। এঁরা সবাই-ই, হয় প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে নয় তো তির্যক প্রেরণার ছোঁওয়ায়, কমিউনিস্ট আন্দোলন দ্বারা কম বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। সামান্য উৎক্ষিপ্ত মনে হলেও মন্তব্য করতে ইচ্ছা হয়, কাকতালীয় হোক না হোক, ঠিক সেই ঋতুতেই দিলীপ গুপ্ত বাংলার প্রকাশন ব্যবস্থাপনায় বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। ভুলেই যাচ্ছিলাম বলতে, গণনাট্য সঙ্ঘ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সেতার-সাধনায়-নিমগ্ন রবিশঙ্কর পরাকাষ্ঠার পর উচ্চতর পরাকাষ্ঠার শীর্ষে নিজেকে তখন উত্তীর্ণ করছিলেন, এমনকি, লোকপ্রবাদ যাই-ই হোক না কেন, উদয়শঙ্করও ফুরিয়ে যাননি, কয়েক বছর আগে চলচ্চিত্র নিয়ে তাঁর আশ্চর্য নিরীক্ষা 'কল্পনা'-র পর ছায়ানৃত্যের আঙ্গিক নিখুঁত করতে তিনি ব্যস্ত।

অথচ, এই মস্ত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পটভূমিতেই, দেশভাগের তমিস্রা, পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ-লক্ষ উদ্বাস্তুর শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে, তা ছাপিয়ে কলকাতার নানা উপকণ্ঠে, তা-ও ছাপিয়ে বিভিন্ন জেলায়, তাঁদের বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে পড়া। উদ্বাস্তুদের সঞ্চিত অভিমান, অপমান ও নিঃস্বতাবোধের জ্বালা থেকে সারা রাজ্য জুড়ে আগুন জ্বলতে পারতো, কিন্তু এখানেও কমিউনিস্ট পার্টির প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব অসাধ্য সাধন করলেন, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের হলাহল থেকে উদ্ধার করে শরণার্থীদের কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীরা জনগণের আন্দোলনের প্রাঙ্গণে নিয়ে এলেন : ছাত্রদের, যুবাদের, মহিলাদের, সরকারি-সদাগরি কর্মীদের, ভূমিহীন কৃষক-ভাগচাষীদের, কারখানার শ্রমিকদের, ব্যাপ্ত-বিশাল-গভীরতর-হতে-থাকা

জনচেতনার অবয়বে লীন হয়ে গেল উদ্বাস্তুদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম। ভোটের নিরিখে পঞ্চাশের দশকে পশ্চিম বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি তখনও ঠিক সাবালক অবস্থায় পৌঁছয়নি, কিন্তু সূচনার নান্দীমুখ অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

দিনের বেলা নতুন দিল্লিতে অর্থমন্ত্রক কিংবা পরিকল্পনা কমিশনে আড্ডা দিই, তর্ক জুড়ি, ঘুরে বেড়াই। সকাল-বিকেল কখনও নিখাদ বাঙালি আড্ডা, কখনও কমিউনিস্ট নেতা-কর্মী-সখাদের সাহচর্যে প্রহরযাপন। মাঝে-মাঝে ছুতো পেলেই কলকাতা ঘুরে যাই। দাতরজীর বাড়ির মশগুল মজলিসে আরও ঘন হয়ে আসি। যাদের প্রসঙ্গে বিশেষ করে বলতে চাই তাদের সর্বাগ্রে হিতেন ভায়া ও তাঁদের সর্বাগ্রে গোয়া-জাতা স্ত্রী অ্যাঞ্জেলা। আঞ্জুর গোয়ার পূর্বসূরিত্ব প্রায় লুপ্ত; বাঙালি সামাজিকতা, বাঙালি গৃহবধূর দায়িত্বের সঙ্গে সে নিজেকে আশ্চর্য মানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তা বলে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি, যার সঙ্গে মিশ্রিত একটি চিমটি-কাটা কৌতুকপ্রিয়তা, আদৌ অনুচ্চারিত নয়।

সাহিত্যিক আড্ডা অব্যাহত, কিন্তু এখানেও নতুন-নতুন সখ্য বিস্তার, পার্টির কাছাকাছি মানুষদের সঙ্গে। কলকাতায় কবিতাভবনে গিয়ে আর তেমন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি না, বুদ্ধদেব বসু ক্রমশ মার্কিন মুগ্ধতার মৌতাতে স্থবির, কিছু সমধর্মী বয়স্যও তাঁর জুটেছে ইতিমধ্যে। তাঁর সঙ্গে সোচ্চারে তর্ক করি, তবে তাঁকে তেমন আঘাত দিয়ে কথা বলতেও ঈষৎ জড়তাবোধ। যদিও একটু-আধটু শখের কবিতা মকশো তখনও চলছিল, ততদিনে ভালো করেই বুঝে গেছি আমার কবি-ভবিষ্যৎ কিছুই নেই। বুদ্ধদেব কিন্তু আমার গদ্যভঙ্গির তারিফ করেন, প্রায়ই অনুযোগ করেন, আরও বেশি গদ্য লিখি না কেন। সেই লগ্নে আমি যুগপৎ অর্থশাস্ত্র কপচাচ্ছি ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আনুগত্যে একনিষ্ঠ হচ্ছি। এই অবস্থায় সুকান্তর অনুকরণ করেই বলতে পারতাম, 'কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি'।

জীবনানন্দের সঙ্গেও কলকাতায় এলে নিয়মিত দেখা হতো, তিনি ক্রমশ উদ্‌ভ্রান্ত, ক্রমশ আত্মবিশ্বাসরহিত। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্র, যেমন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সচ্ছলতার মুখ দেখেছেন, তাঁর ধারণা বুদ্ধদেব বসু-বিষ্ণু দে প্রভৃতিও দেখেছেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রসঙ্গ না হয় উহ্যই রইলো, অথচ তিনি নিজে একটি ভদ্রগোছের অধ্যাপনার কাজ পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারছেন না। পরিচিত এঁকে-তাঁকে ধরেও কোনও ফল হচ্ছে না, আমরা যাঁরা তাঁর অনুরক্ত শুভানুধ্যায়ী তাঁরাও কিছু করে উঠতে পারছি না। একদিন, বর্ষার ম্লান সন্ধ্যা, রাসবিহারী এভিনিউর প্রায় মোড়ে ল্যান্সডাউন রোডের গলিতে তাঁর একতলার ফ্ল্যাটের বহির্দুয়ার দিয়ে সদ্য ঢুকেছি, হঠাৎ আমাকে টেনে এক কোণে, নিচু নিমগাছের ডালের আড়ালে, নিয়ে গেলেন, কানে-কানে তাঁর অস্ফুট প্রশ্ন : 'আচ্ছা, আপনি কি জানেন, বুদ্ধদেববাবুর নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকার ফিক্সড ডিপোজিট আছে?' বুদ্ধদেবের আর্থিক অবস্থা তখন কিন্তু আদৌ ভালো নয়, কিন্তু জীবনানন্দ এতটাই তিমিরে অবগাহিত, যে অলীক লোকপ্রবাদও তাঁর কাছে ধ্রুব সত্য বলে প্রতিভাত। যেখানে তিনি নিজে কোনওদিন পৌঁছতে পারবেন না, সেখানে তাঁর বন্ধু ও পরিচিতরা কীরকম অমোঘ নিয়মে পৌঁছে গেছেন; তখনকার নিরিখে কোনও সাহিত্যিকের পক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকার সঞ্চয় অবশ্যই বিস্ময়ে অবাক করার মতো।

জীবনানন্দের তৎকালীন বিষণ্ণতার ঈষৎ আলাদা এক আজব কারণ ছিল। অর্থাভাব, দিলীপ গুপ্ত সিগনেট প্রেস থেকে প্রচুর আগ্রহভরে 'বনলতা সেন'-এর নতুন সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন, বেশ কিছু টাকা জীবনানন্দকে আগাম দিয়েছেন, কলেবর বৃদ্ধির

প্রয়োজনে 'পূর্ব্বাশা' থেকে পূর্ব-প্রকাশিত 'মহাপৃথিবী' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি কবিতা 'বনলতা সেন'-এর সিগনেট সংস্করণে জীবনানন্দ ঢুকিয়ে দিয়েছেন, তা নিয়ে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে সামান্য মন-কষাকষি, কিন্তু তা ছাপিয়ে আরও বড়ো বিরক্তি-বিষণ্ণতা : দিলীপ গুপ্ত সত্যজিৎ রায়ের উপর চড়াও হয়ে তাঁকে দিয়ে 'বনলতা সেন'-এর সিগনেট সংস্করণের প্রচ্ছদ আঁকিয়েছেন, যা জীবনানন্দের আদৌ পছন্দ হয়নি, কিন্তু তা মুখ ফুটে দিলীপ গুপ্তকে বলতে পারছেন না, শুধু আমাদের কয়েকজনকে সন্তর্পণে কাছে ডেকে এনে নালিশ জানাচ্ছেন : 'এ কোন বনলতা সেন, এটা তো কৈকেয়ী বুড়ি!' 'বনলতা সেন'-এর 'কবিতাভবন' সংস্করণের প্রচ্ছদের ছবি এঁকেছিলেন শম্ভু সাহা, ভারি মায়ালু দেখতে ছিল সেই প্রচ্ছদ, যার শোক জীবনানন্দ ভুলতে পারছিলেন না।

ক'মাস বাদেই সেই ভয়ংকর ট্রাম দুর্ঘটনা, যা আমাদের অনেকের কাছে কেন যেন প্রায় অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হয়েছিল, যে-আশঙ্কার উৎসে তাঁর চকিত চাহনি, সতর্ক-ঘাবড়ানো-অতর্কিত পদক্ষেপ, তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তিকেই যা মনে করিয়ে দিত, 'সতত সতর্ক থেকে তবু/ কেউ যেন ভয়াবহভাবে পড়ে গেছে জলে'। জীবনানন্দ জলে পড়ে যাননি, পড়লেন ট্রামের তলায়, তবে সর্বনাশের এই বিকচনটি সম্বন্ধে তিনি যেন আগে থেকেই জ্ঞাত ছিলেন। যেদিন তিনি প্রয়াত হলেন সেদিনই সন্ধ্যায় আমি কলকাতা পৌঁছুলাম, স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে কী একটা কাজে। কয়েক ঘণ্টা আগে এসে কেন পৌঁছুলাম না, তা নিয়ে এক বছর-দুই বছর মনোকষ্টে ভুগেছিলাম, তবে তা তো নেহাতই বাষ্পাতুরতা।

এখন অর্ধশতাব্দী গত, তাঁর জীবদ্দশায় যে-প্রাপ্য তিনি সমাজ থেকে পাননি, তা হাজার-লক্ষ গুণ অধিক মাত্রায় অর্পণ করা হচ্ছে তাঁকে, সেই জীবনানন্দ দাশকে, যিনি পঞ্চাশের দশকের প্রারম্ভিক বছরগুলিতে দু'শো-আড়াইশো টাকা মাস মাইনের একটি কাজ পেলে বর্তে যেতেন। এখন সম্মান ও প্রাপ্তির জলপ্রপাত উন্মত্ত গতিতে প্রবহমান, জীবনানন্দ নেই, তাঁর স্ত্রীও জীবিত নেই, পুত্র-কন্যাও না, এখন যা হচ্ছে তা নেপোয় মারে দই। আমি একাধিক জায়গায় উল্লেখ করেছি, আরও একবার করতে কোনও দ্বিধা নেই, বর্তমান পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করে জীবনানন্দের সেই নিকষ পঙ্‌ক্তিটি মনে পড়ে যায় আমার : 'মানুষটা মরে গেলে যদি তাঁকে ওষুধের শিশি/ কেউ দেয়, বিনি দামে, তাতে কার লাভ, এই নিয়ে ভীষণ সালিশি'। আমার অধৈর্যকে হয়তো অন্য কেউ-কেউ যুক্তিহীন বলে বর্ণনা করবেন; তাঁরা বলবেন, ইতিহাসের এটাই তো নিয়ম, কবিদের মহত্ত্ব যুগ ও কালের পরিধি অতিক্রম করে, আমার মতো মান্ধাতা আমলের মানুষদের তো বরঞ্চ কৃতার্থ বোধ করা উচিত, তাঁর সমসাময়িক প্রজন্ম তাঁকে যে স্বীকৃতি দিতে প্রত্যাখ্যান করেছিল, পরবর্তী প্রজন্মসমূহ তা সুদে-আসলে পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণতর করেছে। খোলা বাজারের সুযোগ নিয়ে কিছু ধড়িবাজ মানুষ তাঁকে নিয়ে যদিও ব্যবসা করছে, কিন্তু, কী আর করা, জীবনানন্দ নিজেই তো বলে গেছেন : 'পৃথিবীতে নেই কোনও বিশুদ্ধ চাকরি'। তবে এটা যুক্তির ব্যাপার নয়, ইতিহাসের অবিচার যুক্তিগ্রাহ্য হলেও তা অবিচার-ই থেকে যায়।

এগারো

আপাতত জীবনানন্দ প্রসঙ্গ মুলতুবি রেখে নতুন দিল্লিতে ফিরি। ওখানে হঠাৎ একটু গোলমাল দেখা দিল, আমার চোখের দৃষ্টি বরাবরই অতি ক্ষীণ, যে কারণে লখনউ থাকাকালীন একবার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় লোভনীয় কাজের প্রস্তাব পেয়েও শেষ পর্যন্ত যোগ দেওয়া হয়নি ব্যাঙ্কের স্বাস্থ্য পরীক্ষকের আপত্তি হেতু। তা অবশ্য ভালোই হয়েছিল। অর্থমন্ত্রকেও একই ফ্যাকড়া, ক্ষীণ দৃষ্টির জন্য আমাকে নাকি সরকারের পাকা কাজে যোগ দিতে অনুমতি দেওয়া যাবে না, তবে আমি বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার হিশেবে চালিয়ে যেতে পারি। সেরকমই ব্যবস্থা হলো, কিন্তু মনে যথেষ্ট চিড় ধরে গেল। ইতিমধ্যে অর্থমন্ত্রক থেকে সপ্তাহে এক দিন-দু'দিন, একদা যাকে ছেড়ে পালিয়েছিলাম, সেই দিল্লি স্কুলে, অধ্যাপক ভি কে আর ভি রাওয়ের আগ্রহেই, ইকনোমেট্রিক্স্ পড়াতে শুরু করেছি। পড়াতে ভালোই লাগছিল, ছেলেমেয়েরা পছন্দও করছিল। এরই মধ্যে একদিন রাও সাহেব দিল্লি স্কুলে পাকাপাকি অধ্যাপক হিশেবে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। অর্থমন্ত্রকে ওই আধাখ্যাঁচড়া অবস্থা, দিল্লি স্কুলে লোভনীয় জ্ঞানচর্চার পরিবেশ, প্রায় মনস্থির করে ফেলেছিলাম। হঠাৎ খটকা লাগলো। যে-ভদ্রলোকের সঙ্গে পাঁচ-ছ' বছর আগে মনের মিল হয়নি, তাঁর সঙ্গে এবারও যে সঘন দোস্তি ঘটবে, তার ভরসা কি? মনের এমন অবস্থায় হঠাৎ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যাংকক-স্থিত এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য আর্থিক কমিশন থেকে তার পেলাম, ওঁরা ওখানে আমাকে চাইছেন। ইংরেজি সাহিত্যের অনার্স ক্লাসে ভর্তি হতে গিয়ে যেমন অর্থনীতি বিভাগে নাম লিখিয়ে এসেছিলাম, এবারও তেমনই দিল্লি স্কুলকে এড়িয়ে আমার উল্লঙ্ঘনযোগ, উড়ো জাহাজে চড়ে ব্যাংকক গমন। নাম্বুদ্রিপদের কাছে অনুমতি চাইলাম, পেলাম। তিনি বললেন, 'ভালোই তো, অভিজ্ঞতার প্রসার ঘটবে'। মাসে-মাসে পার্টিকে কী পরিমাণ চাঁদা পাঠাবো, সেই অঙ্কটাও তিনি নির্দিষ্ট করে দিলেন। ব্যাংককে ঘনিষ্ঠ বন্ধু অর্থনীতিবিদ অরুণ ঘোষ সপরিবারে অধিষ্ঠিত; ওখান থেকে আমার আমন্ত্রণপত্র-ঘটিত ষড়যন্ত্রের জন্য তিনিই প্রধানত দায়ী। অরুণ ঘোষ ও ডালিয়ার কাছে আমি আজীবন বিভিন্ন ব্যাপারে যে কত প্রকারে ঋণী তা বোঝানো সম্ভব নয়। ব্যাংককে ওঁদের সঙ্গে ওঁদের বড়ো মেয়ে অদিতি, তখন তার বয়স আড়াই বছর। আমি পৌঁছুবার ঠিক আগের দিন ওঁদের দ্বিতীয়া কন্যা, জয়তী, জন্মগ্রহণ করে ব্যাংককের হাসপাতালে।

সব মিলিয়ে ব্যাংককে চোদ্দো-পনেরো মাস ছিলাম, পুরোটা সময়ই একদিক থেকে অপব্যয়িত অধ্যায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠনে যৎসামান্য কাজ করে, কিংবা কিছুই না করে, এককাঁড়ি পয়সাকড়ি যদিও পাওয়া যায়, তার বাইরে মরুবাসপ্রতিম অভিজ্ঞতা। এশিয়া ও দূর প্রাচ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাথায় একজন ভারতীয় পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু ততদিনে তিনি অর্থশাস্ত্র ভুলে মেরে দিয়েছেন, প্রশাসনিক দক্ষতায় অবশ্য অতিশয় সুষ্ঠু। অর্থনীতিবিদ কিংবা অন্য বিশেষজ্ঞ আর যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন-দু'জন চীনে

পণ্ডিত ছাড়া বাকিরা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। চীনে ভদ্রলোকেরা এমনিতে অমায়িক, কিন্তু তাঁদের আনুগত্য চিয়াং কাইশেকের প্রতি, তাইওয়ান দ্বীপই যেন ভূমধ্যমণি: তাই তাঁদের সঙ্গে যদিও সম্প্রীতি ছিল, হৃদ্যতা ছিল না। এঁদের মধ্যে একজন আমাকে তাইওয়ানের কী একটা সমস্যা বোঝাতে গিয়ে শুরু করলেন, 'তুমি তো জানো, চীন হচ্ছে একটি দ্বীপ।' পালাবার পথ পাই না আমি। এই ভদ্রলোকই দক্ষ গাড়ি-চালানো বিষয়ে আমাকে মহামূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন: 'গাড়ি নিয়ে এক ব্যস্ততম চৌরাস্তায় এসে দেখলে, সামনে লালবাতি; কী করবে জানো, প্রথমে দু'-চোখ বন্ধ করবে, তারপর ডান পা দিয়ে অ্যাকসিলারেটর ·জোরে চেপে ধরবে, দেখবে গাড়ি পক্ষীরাজ ঘোড়ার বেগে অন্যপ্রান্তে পৌঁছে গেছে'।

ব্যাংককে গিয়েই সর্বপ্রথম বিশ্বব্যাপী মার্কিন দৌরাত্ম্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হলো। থাইল্যান্ড, আমাদের প্রাচীন সংজ্ঞায় শ্যামদেশ, সেখানে নামকাওয়াস্তে এক রাজা আছেন; ওঁদের মতো করে ওঁরাও রামভক্ত দেশ, রাজাদের নামের তালিকা রাম এক, রাম দুই, রাম তিন ইত্যাদি। তবে আসলে জঙ্গি সর্বাধিনায়কত্ব। যে-সৈন্যাধ্যক্ষ শাসন চালাচ্ছিলেন তাঁর নাম বিপুলসংগ্রাম। প্রথম পর্বে শ্যামদেশের ভাষা পালির খুব কাছাকাছি ছিল, এখন মঙ্গোলিয় ভাষার অনেক মিশেল ঢুকেছে, তা হলেও ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে যেমন, একটু মাথা খাটালে নামগুলির সংস্কৃত আদিরূপ উদ্ধার করা সম্ভব। যেমন বিপুলসংগ্রাম, যেমন নকরপথন, অর্থাৎ নগর প্রথম, যেমন আয়ুথিয়া, অর্থাৎ অযোধ্যা। আরও যা চমৎকৃত করেছিল, তা রামায়ণের শ্যামদেশীয় বয়ান : শ্রীমান হনুমান নির্বাসিতা রানী সীতার প্রগাঢ় প্রণয়ী। বজরঙ্গ দলওলারা যদি সঙিন উচিয়ে আসেন, আমি নিরুপায়।

রাজপ্রাসাদের সম্মুখবর্তী রাস্তার নাম 'রাজবীথি'; যে রাস্তার উপর আমাদের দপ্তর, তার পরিচয় 'রাজ্যদমন এভিনিউ'। ভারতীয় সংস্কৃতি, প্রধানত উদারচরিত বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে, একদা কতটা পরিব্যাপ্ত ছিল, তার প্রমাণ পেলাম ব্যাংককে থাকাকালীনই অন্য এক প্রসঙ্গে। এক আফগান সহকর্মী, হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে বিস্ময়াবিষ্ট হলাম, দেবনাগরী হরফ আমার চেয়ে অনেক দ্রুত ও অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে পড়তে পারেন। আমি কৌতূহলাপন্ন হলে তিনি জানালেন, প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ওঁর সময়ে আফগানিস্তানে সংস্কৃতপাঠ বাধ্যতামূলক ছিল, যেহেতু পুস্তুর গঠনবিন্যাস সংস্কৃতের খুব কাছাকাছি।

ব্যাংককে আমার দফতরে কাজ করতেন এক মহিলা, আজও তাঁর অনাবিল সুন্দর নামটি ভুলতে পারিনি : উদমা সিন্দুসবন্ন, অর্থাৎ উত্তমা সিন্ধুস্বপ্ন; আরেক জনের সুভাব যশোধরা। এমন চমৎকার নামযুক্তা সুন্দরী মহিলাদের সান্নিধ্য, খাশা থাকা যাচ্ছে, ব্যাংকক জুড়ে প্রচুর আহার্যের বৈচিত্র্য, বিশেষত চীনে-খাবারের সম্ভার। তখনও পর্যন্ত একটি-দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপস্থিতি সত্ত্বেও অথচ মনীষা বা বুদ্ধির চর্চা প্রায় শূন্যের কোঠায়। বড়ো কষ্টে দিন কাটাতে হয়েছিল ওই কয়েক মাস। অবশ্য মাঝে-মাঝে এখান-ওখান থেকে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদরা বক্তৃতা দিতে বা গবেষণাপত্র তৈরি করতে হাজির হতেন। যেমন, জাপানের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ, শিগেতো ৎসুরু, মাস তিনেক আমাদের সঙ্গে ছিলেন, দপ্তরে আমারই ঘরসঙ্গী হয়ে। তরুণ বয়সে হার্ভার্ডে ছাত্র থাকাকালীন ঘোর বামপন্থী, পল সুইজিদের সমসাময়িক। বামপন্থী রেশ ৎসুরুর তখনও পুরো কাটেনি, আমার সঙ্গে তাই জমতো ভালো, পরে তিনি মহলানবিশ মহাশয়ের আমন্ত্রণে দিল্লি ও

কলকাতা ঘুরে গেছেন। ব্যাংককে তাঁর সঙ্গে অনেকটা সময় কাটতো আমার। জাপানের সমস্যা নিয়ে, এশিয়া ও ভারতবর্ষ নিয়ে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে, সোভিয়েতে ও পূর্ব ইওরোপ জড়িয়ে অনেক আলোচনা। ৎসুরু সম্বন্ধে দুটি মজার কাহিনী এখানে না হয় ব্যক্ত করা যাক। একদিন সকালে দপ্তরে বসে লিখছি, ৎসুরু একটু দেরি করে এলেন, আমার পার্শ্ববর্তী টেবিলে আসীন, কিন্তু কাজে ঠিক মনঃসংযোগ করতে পারছেন না যেন। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে তাঁর উক্তি, 'জানো অশোক, কাল রাত্তিরে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। এক রেস্তোরাঁয় জনৈকা মহিলার সঙ্গে নৈশভোজনে গিয়েছিলাম, পানাহারের পর তাঁর সঙ্গে নাচতে শুরু করলাম, তারপর আর কিছু মনে নেই'। আমি কথা না বাড়ানোই বুদ্ধিমত্তা বলে বিবেচনা করলাম।

মন-মাতানো দ্বিতীয় গল্পটি নিম্নরূপ। কাল ১৯০০ সাল, স্থান মস্কো হাওয়াই আড্ডা। সরকারি কাজে দিল্লি থেকে লন্ডন যাচ্ছি, মস্কোতে বিমান বদলানোর উদ্দেশ্যে অপেক্ষমাণ। ৎসুরু সস্ত্রীক প্যারিস বা ভিয়েনা বা অন্য কোথাও থেকে টোকিও ফিরছেন, ওঁরাও মস্কোতে বিমান পাল্টাচ্ছেন, প্রতীক্ষাশালায় দেখা। 'কোথায় গিয়েছিলেন?', ৎসুরুকে আমার প্রশ্ন। উনি মজা করে বললেন, 'আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবিদদের সংগঠন দ্বারা আহূত এক বৈঠক ছিল, আলোচ্য বিষয়—"অর্থব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি : পাশ্চাত্য বনাম প্রাচ্য".' তারপর একটু মুচকি হেসে ৎসুরু যোগ করলেন, 'পাশ্চাত্যের অর্থব্যবস্থার মাহাত্ম্য নিয়ে সবচেয়ে ওজস্বিনী বক্তৃতা দিলেন দুই ভারতীয়'। নাম দুটো বললেন, একটু হাসাহাসি হলো আমাদের। ইঙ্গিতবিদ্ধ উভয় অর্থনীতিবিদই এখন মার্কিন দেশে পাকাপাকি বাস করছেন, মার্কিন নাগরিকও। তবে নিয়ম করে শীতের মরশুমে দু'এক সপ্তাহ ভারতভ্রমণে আসেন, বিশ্বায়ন নিয়ে আমাদের শাসকবর্গকে ঢের বাণী দিয়ে যান, শাসকবর্গ ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে শোনেন।

আমি ব্যাংককে থাকাকালীন সময় স্ত্রী ক্ল্যারিসকে নিয়ে নিকি কালডরও এসেছিলেন কয়েকদিনের জন্য। তাঁর সঙ্গে কেমব্রিজে প্রথম আলাপ, পরে দিল্লিতেও। ব্যাংককে তাঁর বিশেষ কাজ নেই, আমারও নেই, সুতরাং ক'টা দিন দু'জনের, জীবনানন্দীয় ভাষায়, শিশির-ভেজা আড্ডা। অর্থনীতি চর্চা যত হতো, তার চেয়ে ঢের বেশি পরিচিত অর্থনীতিবিদদের নিয়ে সকলুষ পরচর্চা, তাঁদের স্ত্রীদের নিয়েও। নিকি কালডর আদতে হাঙ্গেরির অধিবাসী, নাৎসি দৌরাত্ম্যের সময় ইংল্যান্ডে চলে এসেছিলেন, দীর্ঘদিন বিলেতে পড়িয়েছেন, বৃটিশ নাগরিকত্ব নিয়েছেন, পরবর্তী কালে লর্ড খেতাবে ভূষিতও হয়েছেন। ব্যাংককে একটি হাঙ্গেরিয় খাদ্য পরিবেশন-করা সরাইখানা ছিল, নাম 'নিকস্ ইন' ; এক সন্ধ্যায় সেখানে কালডর ও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলাম। 'নিকস্ ইন'-এ ঢুকে কেমব্রিজের নিক মহা খুশি।

এরকম ছুটকো-ছাটকা রসালো অভিজ্ঞতার বাইরে ব্যাংককে দিনযাপন সত্যিই দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। মার্কিন প্রকোপ, প্রতিটি সরকারি দফতরে মার্কিন পরামর্শদাতারা বসে আছেন। জঙ্গি বাহিনীর বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার সঙ্গে মার্কিনিদের ঘনিষ্ঠ আদানপ্রদান, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েও মার্কিন অধ্যাপক। থাইল্যান্ড তখনও, এমনকি ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনার বিচারে পর্যন্ত, অনুন্নত, চাল-কাঠের কিছু রফতানি, ব্যাংকক শহরের বাইরে, যেমন অযোধ্যা শহরে কিংবা অন্যত্র, এবং পল্লীঅঞ্চলে, সর্বসমাচ্ছন্ন দারিদ্র্য। গ্রাম থেকে গরিব কৃষক-ঘরের মেয়েদের লোভ দেখিয়ে ব্যাংককে এনে তাদের ম্যাসাজ পার্লারে বা অন্য

কোনও ধরনের গণিকাগারে নির্বাসন, তা থেকেও দেশের শাঁসালো বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন। মার্কিন কেতা, মার্কিন পোশাক, মার্কিনিদের দ্বারা নির্দেশিত পররাষ্ট্রনীতি। পুরোপুরি ভজ মার্কিন, নমো মার্কিন, লহো মার্কিন নাম রে-গোছের অবস্থা। প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে আমরা যে অবস্থানে পৌঁছুচ্ছি, থাইল্যান্ডে তার যেন পূর্বচ্ছায়া দেখেছিলাম।

এখানে আর যা সম্ভবত উল্লেখনীয়, মাঝখানে দু'তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়ে কলকাতায় আমার বিয়ে করে যাওয়া। সেই বিয়ের বিশেষ কোনও স্মৃতি আর অবশিষ্ট নেই, শুধু আবছা মনে পড়ে একঝাঁক কবি-সাহিত্যিক বরযাত্রী গিয়েছিলেন : অরুণকুমার সরকার, নরেশ গুহ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গৌরকিশোর ঘোষ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, আতোয়ার রহমান, নৃপেন্দ্র সান্ন্যাল, মুরারি সাহা, অবশ্যই সুরঞ্জন সরকার। সঞ্জয় ভট্টাচার্য যাননি, কিন্তু সত্যপ্রসন্ন দত্ত ছিলেন। কনুদা, কমলকুমার মজুমদার, বরযাত্রী গিয়েছিলেন কি না খেয়াল নেই, তবে বিয়ের ক'দিন আশেপাশে তাঁর সরব উপস্থিতি। মাস্টার মশাই অমিয়বাবু কাশী থেকে এসেছিলেন, লখনউ থেকে বিনয় দাশগুপ্ত মশাই। সবচেয়ে যা স্মরণীয়, স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু, শৌখিন সিল্কের পাঞ্জাবি-শোভিত, লাজুক-লাজুক মুখ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, যেন তিনিই বিয়ে করতে গেছেন। পরে শুনেছি, গৌরকিশোর ঘোষের বরযাত্রীসজ্জা ছিল মাথায় তিব্বতি টুপি, চোখে কালো চশমা, গায়ে দাশু পাগলা-সদৃশ ছেঁড়া আলখাল্লা, পায়ে উঁচু বুট জুতো। গাড়ির-ভিড়-সামলাতে-আসা এক পুলিশকর্মী ওর দিকে একটু কৌতুকাপন্ন দৃষ্টিতে তাকাতে গৌর বীরদর্পে এগিয়ে ডায়লগ বললো, 'কেয়া দেখতা হ্যায়? জানতা হ্যায় হাম জজ সাহাবকা দামাদকা দোস্ত হুঁ? সমঝে?'

যোগ করা উচিত না অনুচিত জানিনা, বিবাহের আমন্ত্রণলিপিটি রেখাচিত্রাঙ্কিত করেছিলেন সত্যজিৎ রায়।

থাইল্যান্ডের শেষ মাসটা জোড়া উত্তেজনার ঘোরে কাটলো : রুশ সৈন্যদলের ঝাঁকে-ঝাঁকে হাঙ্গেরিতে অনুপ্রবেশ, কয়েকদিন বাদে ইংরেজ-ফরাশিদের সুয়েজ আক্রমণ। দুটো ঘটনা যেন কাটাকুটি খেলার রূপ পরিগ্রহ করলো আরও যা মনে দাগ কেটে আছে, ব্যাংকক থেকে দিল্লির পথে যেদিন কলকাতায় নামলাম, সেদিনই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

কুটনিকাটিয়েরা বলেন, অন্তত একটি ক্ষেত্রে আমি বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছি : কাজে যোগ দিয়েছি, দু'দিন বাদে পদত্যাগ করেছি, ফের অন্য কাজে যোগ দিয়েছি, আর একদফা পদত্যাগ করেছি, পুনর্বার নতুন কাজে যোগদান, অতঃপর ফের পদত্যাগ, এমনি করে অসংখ্যবার। এমনধারা মন্তব্যপ্রয়োগকারী মানুষদের বিশ্বনিন্দুক বলে অভিহিত করতে পারি না। ব্যাংককে আমার প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান ছিলেন যে তামিল অর্থনীতিবিদ, তিনি অবসরান্তে দিল্লিতে একটি নতুন আর্থিক-গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্তা হয়ে যোগ দিচ্ছিলেন। তিনি উপরোধ জানালেন, যেহেতু আমিও দেশে ফিরে যেতে মনস্থ করেছি, তাঁর ওখানে যোগ দিতে সম্মত আছি কিনা। সৌজন্যবশতই, রাজি হয়ে গেলাম।

কয়েক মাস যেতে-না-যেতে সিদ্ধান্তের ভুল সম্যক বুঝে ওঠা গেল। উক্ত ভদ্রলোকের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে সামন্ততান্ত্রিক চেতনা। সেই আমলের আরও অনেক দিশি কর্তা-ব্যক্তির মতো, কোনও প্রতিষ্ঠানের শীর্ষপদে আসীন হয়েছেন যেহেতু, ধরাকে চট করে সরা জ্ঞান করে নেওয়া অভ্যাস। অতি দ্রুত উপলব্ধি করলাম এই প্রবীণ ভদ্রলোকের সঙ্গে মিলিয়ে চলা অসম্ভব। কারণ খোলসা হবে তাঁর ব্যবহার-আচরণের একটি দৃষ্টান্ত যদি পেশ করি।

ভদ্রলোক পারিবারিক কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মাসখানেকের জন্য দক্ষিণে চলে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে আমাকে চিঠি, 'প্রিয় ডক্টর মিত্র, আমি ভীষণ ব্যস্ত আছি নানা ঝামেলায়। অমুক জায়গায় আমাকে আগামী মাসে একটি বক্তৃতামালা উপস্থাপন করতে হবে, একেবারে সময় পাচ্ছি না, তুমি যদি বক্তৃতাগুলির চুম্বক দয়া করে ওদের পাঠিয়ে দাও, অনুগৃহীত বোধ করবো'। ভদ্রতাসূচক জবাব পাঠালাম, 'চুম্বক তৈরি করে পাঠাতে আমার তেমন অসুবিধা নেই, কিন্তু তা তৈরি করতে গেলে বক্তৃতাগুলির পুরো পাঠ আমার দেখে নেওয়া প্রয়োজন। দয়া করে পাঠিয়ে দেবেন কি?' তড়িৎগতিতে প্রত্যুত্তর এলো, 'প্রিয় ডক্টর মিত্র, আপনি তো বুঝতেই পারছেন, আমি সময় পাচ্ছি না, দয়া করে যদি বক্তৃতাগুলিও আপনি লিখে দেন, ভারি ভালো হয়'। বলা বাহুল্য তাঁকে অনুগ্রহ করার মতো মানসিকতা ওই মুহূর্তে আমার মধ্যে উদয় হলো না। ঝামেলার শুরু সেখান থেকে ; তারপর নানা খিটিমিটি লেগেই রইলো।

তবে ভুল যখন করেই ফেলেছি, চক্ষুলজ্জার খাতিরে অন্তত খানিকটা সময় তো কাটাতেই হয়। তা ছাড়া দিল্লিতে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে আমার বন্ধু-বান্ধবের অভাব নেই, তাঁদের সঙ্গে আড্ডা-বিতর্ক-আলোচনা। এমনকি এই নতুন গবেষণা-প্রতিষ্ঠানেও দু'একজন মনের মতো মানুষ পাওয়া গেল। কয়েক মাস বাদে মাস্টারমশাই অমিয় দাশগুপ্তও কাশী থেকে এসে এই প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ-দিলেন। তাঁর বাড়িতে নিত্যক্ষণ আড্ডার জন্য যাওয়া, স্বামী-স্ত্রী আমাদের দু'জনেরই।

দিল্লির এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন আমার অন্য যে-সৌভাগ্য, ড্যানিয়েল থর্নারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপন। ম্যাকার্থি-ম্যাকনামারার তাড়া-খাওয়া থর্নার পরিবার ১৯৫৩ সাল থেকে ভারতবর্ষে স্থিত, এখানে তাঁদের অজস্র বন্ধু, কিন্তু না-ড্যানিয়েলের, না-অ্যালিসের, নিশ্চিত উপার্জনের ব্যবস্থা করা সহজ ছিল না। মাস ছয়েকের জন্য নতুন দিল্লির ওই গবেষণা কেন্দ্রে ড্যানিয়েল যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তামিল অর্থনীতিবিদ তাঁর সঙ্গেও সমান দুর্ব্যবহার করে যাচ্ছিলেন। পরস্পরকে সমবেদনা জ্ঞাপন দিয়ে যে নৈকট্যের সূত্রপাত, তা বরাবর অবিচ্ছেদ্য থেকেছে। পঁচিশ বছরের উপর হলো ড্যানিয়েল বিগত, কিন্তু অ্যালিস নিয়ম করে প্রতি বছর শীতে আমাদের সঙ্গে কলকাতায় অন্তত এক সপ্তাহ কাটিয়ে যায়।

ভূপেশবাবুর কমিউনের তখনও সড়গড় অবস্থা, সেখানেও আমার জড়ো হওয়া ঘনঘন। মোহিত সেন-অজিত দাশগুপ্ত দু'জনেই দিল্লিতে, কয়েক মাস না কাটতে ই এম এস পৃথিবীতে সর্বপ্রথম তথাকথিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন জিতে কমিউনিস্ট পার্টির সরকার গঠন করলেন কেরলে। ওখান থেকে তলব এলো কমিউনিস্ট সরকারের প্রথম বাজেট তৈরির কাজে সাহায্য করতে, পত্রপাঠ তিরুবনন্তপুরম্ যেতে হবে। প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নির্মল বিবেকে কলকাতায়-অমুক-গুরুজন-গুরুতর-অসুস্থ এই অনৃতভাষণ জ্ঞাপন করে কেরলের পথে পাড়ি দিলাম। বিমানে চেপে নাগপুর-মাদ্রাজ হয়ে তিরুবনন্তপুরম্ পৌঁছুবার রাস্তায় যে নানা রোমহর্ষক সমস্যা তথা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলাম, তার বিবরণ অন্যত্র দিয়েছি।

সারা দেশে হইহই, দুশ্চিন্তা-ত্রাসের রইরই, কী সর্বনাশ, কমিউনিস্টরা অবাধ নির্বাচনে জয়লাভ করেছে একটি রাজ্যে, এবার অন্যান্য রাজ্যেও তাদের ষড়যন্ত্র বিস্তার লাভ করবে, এই ধরনের গুঞ্জন। পার্টির অভ্যন্তরেও আনন্দের সঙ্গে ঈষৎ ভ্যাবাচ্যাকা বোধ,

এরা সত্যিই কি আমাদের টিকতে দেবে? এই অনুভূতি যে বাস্তবতা-বহির্ভূত ছিল না তা তো দু' বছরের মধ্যেই প্রমাণিত হয়েছিল।

তিরুবনন্তপুরম্ পৌঁছে দেখি একটু ঢাকঢাক গুড়গুড় পরিস্থিতি। আমাকে শহরের ঘনবসতি অঞ্চলের বাইরে অপেক্ষাকৃত ঈষৎ নির্জন এক ডাকবাংলোয় তোলা হলো, যাতে আমার উপস্থিতির কথা না রটে যায়, রটলেই খবরের কাগজে বড়ো-বড়ো করে শীর্ষসংবাদ ছাপা হবার আশঙ্কা: আন্তঃরাজ্য কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্রের প্রথম পর্ব। কেরলের পার্টি সম্পাদক গোবিন্দন নায়ার সেরকম ঝুঁকি নিতে একেবারেই রাজি নন।

ডাকবাংলোয় আগে থেকেই অপেক্ষমাণ অন্য এক অর্থনীতিবিদ, ইকবাল সিং গুলাটি, বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক, পাবলিক ফিনান্সে খুব পাকা মাথা, তখনও মার্কসীয় প্রজ্ঞায় তাঁর তেমন উৎসাহ বা আগ্রহ ছিল না। কিন্তু তাঁর অর্থশাস্ত্রীয় দক্ষতার কথা বিবেচনা করে আমাদের এক অনুকম্পায়ী বন্ধু তাঁকেও কেরলে হাজির করাবার বন্দোবস্ত করেছিলেন। সেই প্রথম সাক্ষাৎ, তারপর গত চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর সুখে-দুঃখে-বিষাদে-হরিষে জড়িয়ে থেকে আমরা আরও কাছাকাছি এসেছি। দেশের প্রথম কমিউনিস্ট সরকার, সে-সরকারের মুখ্যমন্ত্রী পরমশ্রদ্ধেয় ই এম এস, আমাদের উৎসাহের অন্ত নেই। হয়তো মাত্র দিন দশেক ছিলাম, কিন্তু সেই সীমিত সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলাম বলেই মনে হয়। কেরলের অর্থব্যবস্থা-সমাজব্যবস্থার আদ্যোপান্ত হিশেবনিকেশ ঘেঁটে বামপন্থী সরকারের প্রথম বাজেট রচনা: একদিকে তা যেন বাস্তবানুগ হয়, অন্যদিকে আদর্শ থেকে সামান্য বিচ্যুতিও গ্রহণীয় নয়। ওখানকার কমরেডদের সঙ্গে আলাপ জমলো, ভারতবর্ষ কত বৈচিত্র্যে ভরপুর তার অজস্র প্রমাণ পেলাম, মালয়ালি মানুষদের সঙ্গে আমাদের বাঙালিদের দৃষ্টিভঙ্গির কত সামীপ্য তারও পরিচয় মিললো। মনে পড়লো, এই স্বল্পকালীন তিরুবন্তপুরম বাসের সময়ই সাংবাদিক ডেভিড কোহেনের সঙ্গে শেষ দেখা। আশ্চর্য মানুষ ডেভিড, কলকাতার ক্ষয়িষ্ণু বনেদি ইহুদী পরিবারের প্রায় শেষ দীপশিখা, কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর মিশে যাওয়া। ১৯৫৭ সালেও পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তারপর কী হলো জানি না, উধাও হয়ে গেলেন। বহু বছর বাদে, টোকিও থেকে হংকং ছুঁয়ে কলকাতা আসছি, বিমানে ডেভিড কোহেন, হংকং-এ নেমে গেলেন, বিশেষ কথা হলো না।

অন্য একটি কৌতুকপ্রসঙ্গও উল্লেখ করতে হয়। ইকবাল গুলাটি তখনও শ্মশ্রুপাগড়িমণ্ডিত আপাতমস্তক শিখ, অচিরেই জানা গেল বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ-পড়ুনি এক তামিল ছাত্রীর সঙ্গে তার পূর্বরাগের পালা চলছে। সেই তরুণী প্রতিদিন দয়িতকে একটি করে চিঠি পাঠাচ্ছেন, তাতে আবার স্বরচিত ইংরেজি কবিতার ঠাসা ভিড়। বরাবরই ইকবাল অন্তত উদারমনা ব্যক্তি, মাঝে-মধ্যে আমাকে সেই চিঠিগুলির ভগ্নাংশ পড়তে দিত, ঠিক কী জবাব দেওয়া রীতিসম্মত হবে তা নিয়েও আমার পরামর্শ সোৎসাহে গ্রহণ করতো। কেরলের কমিউনিস্ট সরকারের প্রথম বাজেটের সঙ্গে ইকবাল-লীলার জমে-ওঠা প্রণয়কাহিনী আমার স্মৃতিতে তাই অঙ্গাঙ্গী মিশে আছে।

দিল্লিতে ফেরা, দিনের বেলা গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সকাল-সন্ধ্যা, গভীর রাত্রি পর্যন্ত, অন্য পরিবেশ, কমিউনিস্ট পার্টির আসফ আলি রোডের সদর দফতর, ভূপেশ গুপ্ত-কমল বসু-রেণু চক্রবর্তীদের ফ্ল্যাটে কমরেডদের কমিউন, নিউ এজ পত্রিকার জন্য হন্তদন্ত হয়ে লেখা তৈরি: এর বাইরে বাঙালি আড্ডা তো আছেই। তখন দিল্লিতে অমিয়বাবুরা ছাড়াও

দিল্লি কলেজে অধ্যাপক হিশেবে বৃত আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রাক্তন শিক্ষক মন্মথবাবু, যাঁর কথা আগে লিখেছি, অংশু এবং তাঁর স্ত্রী ইন্দ্রাণীও ইতিমধ্যে দিল্লিতে। ফের পরিচয়ের পরিধি ক্রমশ বৃহত্তর, আমাকে সেই গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের বাঁধনে বেঁধে রাখবে তেমন নিগড় তখনও উদ্ভাবিত হয়নি। সে সময় দিল্লিতে বাড়তি এক প্রাপ্তি বটুকদার—জোতিরিন্দ্র মৈত্রের—স্নেহসান্নিধ্য। তাঁর নিজের মতো করে এই মানুষটিও নিখাদ কমিউনিস্ট, সারাটা জীবন জনসমুদ্রের ঠিকানা খুঁজে বেরিয়েছেন, নিজের কথা ভাবেননি। দিল্লিতে যে-আধা সরকারি সংস্কৃতি কেন্দ্রে তিনি তখন কর্মরত, তার প্রধানা কর্ত্রী মহোদয়া সামন্ততান্ত্রিক শোষণের পরাকাষ্ঠায় পৌঁছুতে ব্যস্ত: বটুকদাকে উদয়াস্ত খাটিয়ে মারেন, খামখেয়ালের পর্বতমালায় সেই মহিলার বিহার করে বেড়ানো, উপহসনীয় পারিশ্রমিক বটুকদার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হতো। সম্ভবত ওই গোছের দিনযাপনের গ্লানির পীড়ন থেকে ক্ষণিক মুক্তি পেতে তিনি আমাদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে খানিকটা সময় কাটিয়ে যেতেন, গানে-গল্পে-স্নেহবর্ষণে মুগ্ধ করে। একদিনের কথা বিশেষ মনে পড়ে, আমাদের নিজামুদ্দিন পাড়ার ফ্ল্যাটের ছাদে বাড়িসুদ্ধু সবাইকে নিয়ে এসে গানের বন্যায় ভাসিয়ে সবাইকে ধন্য করে দিয়েছিলেন।

এমন নয় যে অর্থনীতিতে আমার আগ্রহ ততদিনে পর্যাপ্ত কমতে শুরু করেছে। গবেষণাপত্র ইত্যাদি যথারীতি লিখছি, সে-সব প্রচারিত হচ্ছে। অর্থমন্ত্রক থেকে আঞ্জারিয়া মহাশয় নতুন করে আমাকে তাঁর দপ্তরে পরামর্শদাতা হিশেবে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু ব্যাংকক থেকে যাঁর সঙ্গে দিল্লিতে ফিরেছিলাম, সেই মহাধ্যক্ষ মহোদয়ের সম্পত্তিচেতনা অতি প্রখর, কিছুতেই আমাকে ছাড়বেন না, আঞ্জারিয়াও খানিকবাদে ক্ষান্ত দিলেন। তবে গবেষণার গণ্ডিতে আমার মতো উড়নচণ্ডী কী করে আর বন্দী থাকে? অনেক সময় দুপুরবেলা গবেষণাগার থেকে বেরিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির দফতরে চলে যেতাম, নয়তো অর্থমন্ত্রকে সতীর্থদের ঢালাও আড্ডায়, দিনান্তে ফিরে এসে অধ্যক্ষকে জানাতাম গবেষণার রসদ সংগ্রহ করতে গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছি।

যে-কথা এতক্ষণ বলা স্থগিত রেখেছি, অথচ যা এখন না বললেই নয় : ইকনমিক উইকলি পত্রিকার সঙ্গে আমার পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে জড়িয়ে পড়ার বৃত্তান্ত। ওই পত্রিকার কথা বলতে গেলে তার আগে অবশ্য বিশ্রুতকীর্তি চৌধুরী ভ্রাতাদের কথা উল্লেখ করতে হয়। কাহিনীর প্রেক্ষাপটে কাহিনী, তার প্রেক্ষাপটে আরও কাহিনী।

পাবনা জেলার গ্রাম ভারেঙ্গা, দুই প্রধান জমিদার বংশ বহু যুগ ধরে পাশাপাশি বসবাস করেছেন। উভয় বংশই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত : একটি বংশ চৌধুরী, অন্যটি ঘটক। ভারেঙ্গা গিয়ে থেকে গিয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ঢাকা শহরে ওকালতি বৃত্তিসূত্রে বসবাস করতে শুরু করেন। প্রথম দিকে তিনি বাড়ি ভাড়া করেছিলেন আর্মেনিটোলা পাড়ায় আমাদের বাড়ির লাগোয়া রজনী বসু লেনে। এই গলির নামকরণেও একটি কৌতুককাহিনী জড়িত। হিন্দু উচ্চমধ্যবিত্ত আইনজীবী বীরেন্দ্রনাথ বসু এই ওয়ার্ড থেকে যেবার পুরসভার নির্বাচনে জয়লাভ করতেন, সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তার নামকরণ হয়ে যেত তাঁর বাবা রজনী বসুর নামে। আর যেবার আবুল হাসনাত জিততেন, রাতারাতি ভোল পাল্টে রজনী বসু লেন নামান্তরিত হতো মীর আতার গলিতে, সাধুপুরুষ হিশেবে ঢাকায় এই সন্তের প্রসিদ্ধি ছিল। সে যা-ই হোক, নরেন্দ্রনারায়ণবাবু আর্মেনিটোলা

পাড়ার পাকা বাসিন্দা হয়ে গেলেন, যদিও ভারেঙ্গা গ্রাম ও পাবনা জেলার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বরাবরই অটুট ছিল। বছর কুড়ি বাসের পর মীর আতার গলির বাড়িতে অকুলান হওয়ায়, নরেন্দ্রনারায়ণ ওই পাড়ারই অন্য প্রান্তে জিন্দাবাহার লেনে উঠে যান। নরেন্দ্রবাবুর আট সন্তান, চার পুত্র, চার কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র শচীন্দ্রনারায়ণ, দ্বিতীয় দেবনারায়ণ, তৃতীয় হিতেন্দ্রনারায়ণ, চতুর্থ নরনারায়ণ। চার কন্যার প্রথমা শান্তি, দ্বিতীয়া ধরিত্রী, তৃতীয়া শকুন্তলা, চতুর্থা স্বপ্নময়ী। এই পরিবারের সঙ্গে, বিশেষ করে ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে, আমার প্রায় গোটা জীবন জড়িয়ে গেছে। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার পরিমাণ অঙ্কের হিশেবের বাইরে। আমি যা হতে পেরেছি, হয়েছি, তার প্রধান ঋণভার যদি কোথাও অর্পণ করতে চাই, চৌধুরী ভাইদের প্রসঙ্গে বারবার ফিরে আসতেই হবে আমাকে।

ভাইবোনদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ শচীন্দ্রনারায়ণ, আমার চেয়ে পঁচিশ বছরের বড়ো, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কাকার সহপাঠী। এখানেও একটি গল্প বলার লোভ সামলাতে পারছি না। শচীনদা এবং আমার কাকা স্নাতকস্তরে এক সঙ্গে গণিতের ক্লাস করতেন, বাকিটুকু শচীনদার জবানিতেই বলছি : 'পরীক্ষার আগে তোমার কাকা বললেন, তুই তো গণিতে একটু কাঁচা আছিস, আয়, তোকে আমি কোচ করিয়ে দিই। তোমার কাকা এমন চমৎকার কোচ করালেন যে আমি স্বচ্ছন্দে পাশ করে গেলাম, আর তোমার কাকা ফেল করলেন'। পঞ্চাশের, অথবা ষাটের দশকে, মুম্বইতে-দিল্লিতে-কলকাতায় যখন শচীনদার সঙ্গে কোনও এঁড়ে তর্ক জুড়ে দিতাম, এবং আমার সঙ্গে উনি পেরে উঠতেন না, তখন অন্যায়ভাবে মোক্ষম গল্পটা ঝাড়তেন : 'তুমি তো সেই কাকারই ভাইপো'।

মাস্টারমশাই অমিয়বাবুরও সহপাঠী ছিলেন শচীন্দ্রনারায়ণ, দু'জনের আমৃত্যু বন্ধুত্ব। অমিয়বাবু বহুবার আমাকে বলেছেন, শচীনদার চেয়ে উজ্জ্বলতর ছাত্র তাঁদের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ ছিলেন না। দীর্ঘ অবয়ব, সুবেশ, বাক্‌চাতুর্যে যে-কাউকে হারিয়ে দিতে সক্ষম, সংস্কৃত-বাংলা-ইংরেজি সব ক'টি সাহিত্যে সমান দক্ষতা, ইতিহাস-দর্শনেও অফুরন্ত আগ্রহ, আর নিজের বিষয় অর্থনীতিতে তত্ত্বালোচনায় অথবা তথ্যবিবৃতিতে কেউই তাঁর সঙ্গে পেরে উঠতো না। গান্ধিজী সম্পর্কে মুগ্ধতাবোধের ঘোর দেশ জুড়ে তখন, শচীনদা সর্বদা খাদির ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন, কখনও-কখনও গায়ে মিহি চাদর জড়াতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে তাঁর বিজয়ী বীরের মতো বিচরণ। অথচ এম এ পরীক্ষার আগে হঠাৎ ঢাকা থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন, দু'তিন মাস কেউ তাঁর পাত্তা পেল না। পরীক্ষার ঠিক চারদিন আগে ঢাকায় ফিরে অমিয়বাবুর কাছে কিছু নোটস যাচ্ঞা করলেন। হাজার তুখোড় হলেও ওভাবে পরীক্ষায় ভালোভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, শচীনদা কোনওক্রমে তৃতীয় শ্রেণী পেলেন, হয়তো সেই লজ্জাতেই ফের ঢাকা থেকে উধাও। তারপর থেকে অনবচ্ছিন্ন বাউন্ডুলে অতিবিচিত্র জীবনযাপন। কখনও করাচি বা এলাহাবাদে কংগ্রেস দলের স্বেচ্ছাসেবক হয়েছেন, কখনও কলকাতায় তাঁর মামাতো ভাই, অমিয় চক্রবর্তীর অনুজ, অজিত চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রাইভেট টিউশনির টোল খুলেছেন। তাঁর সেজো ভাই হিতুবাবু মুম্বইতে স্থিত হলে তাঁর পরামর্শে শচীনদা কয়েক বছর ফাটকাবাজারে হাত পুড়িয়েছেন, এখনে-ওখানে ছুটকো সাংবাদিকতা করেছেন, অমিয়বাবু মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক দ্বারকানাথ ঘোষের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার পর দ্বারিকবাবুর সঙ্গে পি-এইচ. ডি ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে গবেষণায় নাম

লিখিয়েছেন যৎসামান্য বৃত্তিলাভের স্বার্থে, গবেষণার কাজ আদৌ এগোয়নি। তাতে কী, বহু বছর কোনও-না-কোনও দৈনিক পত্রিকার জন্য অর্থনীতি-সংক্রান্ত, ফাটকাবাজার-সংক্রান্ত, বা চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত, চুটকি মন্তব্য লিখেছেন চুটকি রোজগারের স্বার্থে।

ইতিমধ্যে মেজো ভাই দেবনারায়ণও মুম্বইতে স্থিত। উভয় অনুজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে আগলে থেকেছেন; বলতে তো কোনও গ্লানিবোধ নেই, তিরিশের-চল্লিশের দশকগুলির প্রধান সময় শচীনদা জীবনধারণের জন্য অনুজদ্বয়ের উপরই প্রধানত নির্ভরশীল ছিলেন। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে তাঁর পাকা ডেরা দেবুদার ওখানে নয়তো হিতুবাবুর আস্তানায়। হিতুবাবু তখনও অকৃতদার, দেবুদার স্ত্রী, আমাদের হেনাদি, শচীনদার সমস্ত ঝক্কি সামলেছেন। নিশ্চয়ই হিতুবাবুর দৌত্যে, হিমাংশু রায় ও দেবিকারানী শচীনদাকে একটা সময়ে বম্বে টকিজের খোদ জেনারেল ম্যানেজার হিশেবে আহ্বান করে নিয়ে গিয়েছিলেন; সেই কয়েক মাস শচীনদা ধুতি-পাঞ্জাবি থেকে মোহমুক্ত হয়ে চোস্ত স্যুট-টাইয়ে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। একবার ইওরোপও তাঁর ঘুরে আসা হয়েছিল কোনও ছুতোয়।

বারো

শচীনদার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভ্রাতার জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গে শচীনদার জীবনের পরবর্তী অধ্যায়গুলি অনেকটাই জড়িয়ে আছে। দেবনারায়ণ, আমাদের কাছে দেবুদা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় অত্যন্ত ভালো ফল করেছিলেন, এম. এসসি-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, কিন্তু অধ্যাপনা বা গবেষণায় আর নিজেকে নিবিষ্ট করেননি। বিদেশী সংস্থায় উঁচু মাইনের কাজে মুম্বই চলে যান। হিতেন্দ্রনারায়ণ, হিতুবাবু, পড়াশুনোয় কোনওদিনই আগ্রহবান ছিলেন না। অনিন্দ্যকান্তি, স্বপ্নালু চোখ, একটু বেঁটে, কিন্তু তাতে কী, পৃথিবীর যেখানেই গেছেন, নারীহৃদয় চিরকাল তাঁর দখলীকৃত। ঢাকাতে নাটক করে-সিনেমা দেখে বেড়াতেন, লীলা রায়ের শ্রীসঙ্ঘের সঙ্গেও যোগ ছিল হয়তো বা, কিন্তু আই. এ. পরীক্ষায় বসতে নারাজ, দাদার পথ ধরে তিনিও একদিন ঝটিতি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। ঘুরতে-ঘুরতে মুম্বই, দেবুদার আগেই। মুম্বইতে ওখানকার চাঁই-চাঁই রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলাপ, গণ্যমান্য আরও অনেকেরই সঙ্গে, সরোজিনী নাইডু মুম্বই এলেই হিতুবাবুকে ডেকে পাঠাতেন, কোথায় প্রথম আলাপ হয়েছিল আমার জানা নেই। হিতুবাবু গণ্যমান্য ব্যবসাদারদের পরামর্শদাতা, স্বদেশীর জন্য তাঁদের কাছ থেকে টাকা তুলছেন, ক্রমে চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা। কোনও এক সময়ে হিমাংশু রায়ের সঙ্গে সখ্য, যার সুবাদে, একটু আগে যা বলেছি, কয়েক বছর বাদে শচীনদার বম্বে টকিজের বড়ো কর্তা বনে যাওয়া। পৃথ্বীরাজ কাপুর, পৃথ্বীরাজের ছেলেরা, দিলীপকুমার, সবাইই হিতুবাবুর ভক্ত, আর সাধনা বসুর অভিনয়জীবন যখন ঘোর সংকটের মুখোমুখি, হিতুবাবু মাঝে-মাঝে গিয়ে তাঁকে অভয় দিতেন, প্রবোধ দিতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক সঙ্গে কাটাতেন। মুম্বই শহরে পঞ্চাশের দশকে হিতুবাবুর সঙ্গে কামিনী কৌশলের নাম জড়িয়ে বেশ-কিছু মুখরোচক গল্প চালু হয়েছিল। অনেক রাজস্থানী-গুজরাটি শিল্পপতি-পুঁজিপতির সঙ্গে মাখামাখির সূত্রে হিতুবাবু ব্যবসাপত্তরে ঢুকে গিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় টাকার মুখ দেখলেন। সেই টাকার বড়ো অংশ চলচ্চিত্রে খাটালেন, প্রচুর লাভ করলেন, প্রচুর ক্ষতিও। ওঁর মতো সহৃদয় উদার মানুষ পৃথিবীতে যে-কোনও যুগে বিরল, সারাজীবন অঢেল পয়সা উপার্জন করেছেন, বিন্দুতম হিশেব না-করে অঢেল খরচ করেছেন, সম্ভবত সেজন্যই শেষ জীবনে কিছুটা আর্থিক অসুবিধার মধ্যে পড়েছিলেন।

দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুম্বইতে জমিয়ে বসেছেন, একজন চাকরিতে, অন্যজন ব্যবসায়ে, শচীনদা দুই ভাইয়ের গৃহে পালা করে থাকতেন, বেশির ভাগ সময়ই দেবুদার ওখানে, কারণ অবিবাহিত হিতুবাবুর কিছুটা অগোছালো জীবনযাপন।

নিজের প্রতিভার প্রাখর্যে শচীনদা সর্বত্র সম্মানিত, সংবর্ধিত, কেতাবি কৃতিত্ব না থাকলেও অর্থশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য উচ্চপ্রশংসিত, লেখার মুনশিয়ানা জনে-জনে তারিফ কুড়িয়েছে। তা হলেও, উদ্দেশ্যহীন, এক বৃত্তি থেকে তাঁর অন্য বৃত্তিতে বিচরণ, অনিশ্চিত উপার্জন। এমন

লগ্নে জীবনের ধারা একটি প্রায়-অবিশ্বাস্য বাঁক নিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েক মাস পরে হিতুবাবু একটি বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মার্কিন দেশে ঘুরতে গেলেন, ভারতীয় রফতানির সম্ভাবনা সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে দেখবার উদ্দেশ্যে। পূর্বোল্লিখিত সেই প্রবীণ তামিল অর্থনীতিবিদ, যিনি ব্যাংককে আমার কর্তা ছিলেন, দিল্লিতেও আমার ঘাড়ে চেপেছিলেন, তিনিও দলভুক্ত। প্রায় দু'-তিন মাস তাঁরা এক সঙ্গে মার্কিন দেশ চষে বেড়িয়েছেন, ওই অর্থনীতিবিদকে হিতুবাবু কাছ থেকে খুব ভালো করে দেখেছেন, ওঁর কথাবার্তা ও আচরণে বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন, দেশে ফিরেই শচীনদাকে উদ্ব্যস্ত করে তুললেন, 'দাদা, এই গোছের ওঁছা অর্থনীতিবিদরা দেশে কল্কে পাচ্ছেন, বিদেশেও পাচ্ছেন, এই অবস্থা সহ্য করা যায় না। আপনি একটা অর্থনীতিবিষয়ক কাগজ বের করুন, আমি ব্যবসায়ীদের ধরে-পড়ে টাকার ব্যবস্থা করে দেবো, আপনার সম্পাদিত পত্রিকা দু'দিনেই গোটা দেশে স্বীকৃতি পাবে'। বলা উচিত তাঁর পরের তিন ভাই, এবং বোনেরাও, শচীনদাকে বরাবর 'আপনি' সম্বোধন করতেন, পুরনো জমিদারি প্রথা অনুযায়ী।

হিতুবাবু লেগে থাকলেন, দেবুদাও সমান উৎসাহ দিলেন, কাশী থেকে বন্ধু অমিয় দাশগুপ্তও লিখে অভিমত ব্যক্ত করলেন, এর চেয়ে ভালো কিছু শুধু শচীন চৌধুরীর ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেই নয়, দেশের অর্থশাস্ত্রের পক্ষেও হতে পারে না। টাকার ব্যবস্থা হলো, দফতরের ব্যবস্থা হলো, সাংবাদিক মহলে শচীনদার অনেক চেনাজানা মানুষ, তাঁদের কেউ-কেউ বিনা পারিশ্রমিকে কিংবা নামমাত্র দক্ষিণায় লিখতে সম্মত হলেন, তা ছাড়া, যেটা শচীনদার এবং ইকনমিক উইকলির মস্ত সৌভাগ্য, পত্রিকার একেবারে গোড়া থেকেই মুম্বইয়ের অসংখ্য তরুণ অর্থনীতিবিদ, যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত, কিংবা অতি সদ্য অধ্যাপনায় ব্রতী হয়েছেন, অথবা রিজার্ভ ব্যাংকে গবেষকের কাজ নিয়ে ঢুকেছেন, একেবারে গোড়া থেকেই ইকনমিক উইকলি-র আত্মীয় হয়ে গেলেন। শচীনদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁরা সম্পাদকীয় লিখতেন, কাঁচা হাতের খসড়া লেখা মেরামতি করতেন, প্রুফ দেখতেন, বিজ্ঞাপন সংগ্রহের ব্যাপারেও তাঁদের অখণ্ড নিমগ্নতা। দেবুদা-হিতুবাবু দু'জনেরই ব্যবসায়ী ও সরকারি-বেসরকারি মহলের সঙ্গে যোগাযোগ, সুতরাং কিছু-কিছু বিজ্ঞাপন প্রায় প্রথম থেকেই আসছিল। তবু সাপ্তাহিক পত্রিকা, যার শুভ বা অশুভ আরম্ভ ১৯৪৯ সালের প্রথম দিবসে, বরাবরই দীন-দরিদ্র কুটিরশিল্প থেকে গেছে। দিন আনি-দিন খাই পরিবেশ, বেশির ভাগ লেখককেই টাকা দেওয়ার প্রশ্ন নেই, আর যাঁরা বাঁধা মাইনেতে কাজ করতেন তাঁরা পেতেন অতি সামান্য, তা-ও মাঝে-মাঝে বাকি পড়তো। এঁদের মধ্যে অনেকে পাকা চাকরি করতেন অন্যত্র, সপ্তাহে দু'-তিন দিন ইকনমিক উইকলি-র দফতরে এসে প্রয়োজনীয় কাজ করে তরিয়ে দিতেন। এক দিনের কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে, কোন সাল ঠিক মনে নেই, হঠাৎ মুম্বই গেছি, ইকনমিক উইকলি-র দফতরে হাজির হয়েছি, শচীনদা কোনও কথাবার্তা না বলে আমার পকেট হাৎড়াতে শুরু করলেন, একটি সুন্দরপানা মার্কিন মহিলাকে লাঞ্চ খাওয়াতে নিয়ে যাবেন বলে তিনি প্রতিশ্রুত, অথচ তাঁর কোনও রেস্ত নেই, ইকনমিক উইকলি-র খাজাঞ্চিখানা পর্যন্ত ঠনঠন।

আগেই বলেছি, ঢাকায় আমাদের বাড়ির লাগোয়া গলিতে শচীনদারা একদা থাকতেন, এর পরে কিছুদিন আর্মেনিটোলা-সংলগ্ন জিন্দাবাহার অঞ্চলে চৌধুরী পরিবার বসবাস করেছেন, কিন্তু আমি তখন নিতান্তই বালক। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ অর্থমন্ত্রকে যোগ দেওয়ার খানিক বাদে, মহলানবিশ মশাইয়ের খসড়া পরিকল্পনা নিয়ে মশগুল

আলোচনার মধ্যমুহূর্তে। অবশ্য শচীনদার কথা জানতাম অনেক আগে থেকেই, তিনিও আমার কথা শুনেছেন অমিয় দাশগুপ্ত ও অন্যদের কাছে। তারপর সেই চুয়ান্ন সাল থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের অজস্র দেখাশোনা, অফুরন্ত তর্ক, ইকনমিক উইকলি নিয়ে এলোমলো অফুরন্ত স্বপ্ন বোনা, সেই সব স্বপ্নের, হয়তো যথা নিয়মে, ঝরে যাওয়া। তাঁর মুম্বইয়ের আস্তানা, তাজমহল হোটেলের ঠিক পিছনে মেরেওয়েদার রোডে অবস্থিত চার্চিল চেম্বারস, যে কারও সেখানে অবারিত আনাগোনা। দেশের অন্যত্র থেকে, কিংবা বিদেশ থেকে, কেউ হাজির হলেই, তিনি সমাজবিজ্ঞানীই হোন, বা অন্য কোনও জ্ঞানবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত, এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধতার মতো ছিল, বিনা নোটিসে চার্চিল চেম্বারসে প্রবেশ করার তাঁর অধিকার আছে, যত খুশি ততদিন অতিথি থাকবেন, একমাত্র দক্ষিণা যা দেয়, তা শচীনদার সঙ্গে অহোরাত্র আলাপ, তর্ক, ঘড়ির দিকে না তাকিয়ে, তারিখের দিকে না তাকিয়ে। চার্চিল চেম্বারসের সেই ফ্ল্যাট তেমন-কিছু প্রশস্ত ছিল না, তার উপর দেবুদার দুই পুত্র, খোকন, অরূপ, ও ছোটু, স্বরূপ, ওখানে থেকে ইস্কুলে পড়তো। তবে শচীনদার চিরন্তন দর্শন, যদি হয় সুজন, তেঁতুলপাতায় ন'জন : পরিচিত, অর্ধ-পরিচিত, প্রায়-সম্পূর্ণ-অপরিচিত অতিথির নিত্য সমারোহ, তাঁরা রাত্রিবেলা ওই অপরিসর ফ্ল্যাটে কোথায় শোবেন, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই কারও, শচীনদার সব-সময়ের-কাজের-লোক পরেশ রান্না করছে, খাবার দিচ্ছে, চা যোগাচ্ছে, উষ্ণতর পানীয়ের ব্যবস্থা করছে এক হাতে।

পরেশ মেদিনীপুর-সন্তান, তারও প্রতিভা বহুব্যাপ্ত। রোমান্টিক চরিত্রলক্ষণ : জনশ্রুতি, গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া অঞ্চলে পরিচারিকা মহলে তার অনুরাগিণীরা, তার একক দখলদারির জন্য, পরস্পরে সহিংস কলহে সদালিপ্ত। ষাটের দশকের গোড়ায় বিদ্যাধর নাইপাল একবার চার্চিল চেম্বার্সে গ্যাঁট হয়ে বসে কিছুদিন কাটিয়ে ছিলেন, পরেশের পরিচর্যায় মুগ্ধ হয়ে ফিরে গিয়ে ওকে নিয়ে একটি গল্প লিখেছিলেন, যা তাকে বিখ্যাত করে দেয়। শেষ খবর যা শুনেছি, পরেশ এখন লস এঞ্জেলস্ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি রেস্তোরাঁর মালিক, তার বহুবল্লভপ্রসিদ্ধিও নাকি অটুট।

চার্চিল চেম্বারসের ভাড়াটেদের সঙ্গে মালিকদের অনেকদিন ধরেই মন কষাকষি, কেউই ভাড়া বাড়াতে চান না, সুতরাং মালিকপক্ষেরও ফ্ল্যাটগুলির প্রয়োজনীয় সংস্কারে বা সৌকর্যসাধনে কোনও গা নেই, লিফটটিও, প্রথম থেকেই যা নড়বড়ে ছিল, ক্রমে একটা সময়ে একেবারে অচল হয়ে যায়। (দেবিকারানী স্বয়ং কোথায় যেন লিপিবদ্ধ করেছেন, চার্চিল চেম্বারসের সেই লিফটে তিনি একবার শচীনদার সঙ্গে নামা বা ওঠার অর্ধপথে আটকা পড়েছিলেন। শচীনদা ওই অসাধারণ সুন্দরী মহিলাকে সে সময় কী মনোমোহিনী বাক্যাবলী শুনিয়েছিলেন, কিংবা মহিলা নিজেই অস্ফুট উচ্চারণে শচীনদাকে কোন অনুরাগবাক্যে মোহিত করেছিলেন, তা অবশ্য দেবিকারানী খুলে জানাননি।)

চার্চিল চেম্বারসের ফ্ল্যাটে একটি ছোট্ট চানের ঘর, তার তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে মস্ত টব। মুম্বইতে বরাবরই প্রচণ্ড জলাভাব, ওই চারতলার ফ্ল্যাটে একেবারেই জল উঠতো না, চানের ঘরের তাই অবর্ণনীয় অবস্থা। আমি অবশ্য তাজমহল হোটেলের কিছু বেয়ারার সঙ্গে ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম, যে ক'দিন মুম্বইতে থাকা হতো, ভোরবেলা হোটেলে গিয়ে নিত্যকৃত্যাদি সম্পন্ন করে আসতাম, অন্যরা কী ব্যবস্থা করতেন জানি না। তা হলেও শচীনদার ফ্ল্যাট সর্বক্ষণই ভিড়াক্রান্ত। ঢুকেই যে-স্বল্পায়তন বসবার ঘর, তাতে সদ্যপরিচিতরা এসে জড়ো হচ্ছেন, অথবা রামমনোহর লোহিয়া কিংবা ইউসুফ মেহেরালি, নয়তো শান্তি সাদিক আলি, নয়তো অচ্যুত পট্টবর্ধন, নয়তো অরুণা আসফ আলি। কিংবা ওই ভিড়েই জড়সড় হয়ে এক

কোণে মুখ নিচু করে বসে কোনও দেহাতি-কলেজ-থেকে-আসা অর্থশাস্ত্রবিদ-যশোপ্রার্থী : সে হয়তো শচীনদাকে একটি মস্ত লেখা পাঠিয়েছে ইকনমিক উইকলি-তে ছাপা হবে এই আশা নিয়ে, শচীনদা হয়তো তার একটি অনুচ্ছেদে কিয়ৎ পরিমাণ প্রতিভার সন্ধান পেলেন, তাকে উৎসাহ দিয়ে দু'টো কথা লিখলেন, যদিও প্রবন্ধটি ছাপালেন না, কিন্তু তাতেই ছেলেটির-দেখা পৃথিবীর রং পাল্টে গেল, কোনও উপলক্ষ্যে মুম্বাই পৌঁছে সে ঠিকানার হদিশ করে সোজা চার্চিল চেম্বারসে হাজির।

পরের অপেক্ষাকৃত বড়ো ঘরটায়, যা শচীনদার শয়নকক্ষও, আমার মতো তিন-চার জন ছেলেছোকরা বসে হয়তো পত্রিকার সম্পাদকীয় লিখছি, কিংবা কোনও কপি সংশোধন করছি, কারখানার মতো কাজ চলছে, মাঝে-মধ্যে উঠে এসে বাইরের খুপরি ঘরটাতে আড্ডায় যোগ দিচ্ছি, পরেশ-পরিবেশিত চায়ের আস্বাদ নিচ্ছি। পাশে আরও একটি ঘর, কিন্তু তার কোনও জানালা নেই, সারাদিন নিকষ অন্ধকার। মুম্বইতে কাজ নিয়ে এসে খোকনদের বড়োমামা কিছুদিন ওই ঘরে ছিলেন, তবে আমাদের দাপটের সামনে তিনি ভয়ে কেঁচো, চোরের মতো ঢুকতেন, চোরের মতো বেরিয়ে যেতেন। ওই ঘরে শচীনদা একবার দু'জন বিলিতি সমাজবিজ্ঞানীকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, যাঁদের বিশেষ কোনও ব্যক্তিগত কলহ হেতু পারস্পরিক কথা বলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, অথচ, উপায় নেই, শচীনদার নিদান, ওই ঘরেই তাঁদের দিনের পর দিন এক সঙ্গে থাকতে হবে, রাতের পর রাত, এবং উভয়কেই ইকনমিক উইকলি-র জন্য বিজ্ঞ প্রবন্ধ রচনা করতে হবে।

শচীনদা জওহরলাল নেহরুর উৎসাহী ভক্ত, সেই সঙ্গে গান্ধিজীরও, তাঁদের যুগে যা অস্বাভাবিক ছিল না। তাঁর লেখালেখিতে গণতন্ত্র তথা সমাজতন্ত্র নিয়ে অনেক উচ্ছ্বাস, যে-উচ্ছ্বাসের উৎসে গভীর বিশ্বাস, অথচ আমাদের মতো উচ্চিংড়েদের প্রতীপ মতামত সম্পর্কে অফুরান সহনশীলতা তাঁর। স্বভাব মাধুর্যে ঠাসা, স্নেহপ্রবণ, অতিথিপরায়ণ, ঘর-বাহির তাঁর পক্ষে সদাসর্বদা একাকার। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বলতে হয়, তাঁর রক্তে-ধমনীতে ভারেঙ্গা গ্রামের জমিদারি আভিজাত্য, চলনে, বলনে, খদ্দরের ভূষণে। বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে প্রথম যেবার মুম্বই গেলাম, চার্চিল চেম্বারসে প্রায় উৎসবের পরিবেশ, নববধূবরণ। শচীনদা টেলিফোনে এঁকে-ওঁকে-তাঁকে খবর দিচ্ছেন, এঁকে-ওঁকে-তাঁকে জড়ো করছেন, এখানে-ওখানে খেতে নিয়ে যাচ্ছেন, নববধূর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এঁকে-ওঁকে-তাঁকে নেমন্তন্ন করে আনছেন, জমিদারবাড়ির কর্তামশাই যেমনধারা করে থাকেন। নববধূকে মুম্বই শহর ঘুরিয়ে দেখাতে হবে, কাকে যেন টেলিফোন করলেন, একটু বাদে এক মস্ত মার্কিন গাড়ি, ক্যাডিলাক বা অন্য-কিছু, দুয়ারে উপস্থিত, সঙ্গে চালক, তাঁর নাম গোবিন্দ। শচীনদার সামনে গোবিন্দ এত সন্ত্রস্ত, এত শশব্যস্ত, আমি ধরে নিলাম গাড়িটি শচীনদার কোনও পরিচিতজনের, এবং গোবিন্দটি তাঁর মাইনে-করা ভৃত্য। আমাদের দু'জনকে নিয়ে গাড়িতে চড়ে শচীনদা নিখুঁত জমিদারি ঢঙে গোবিন্দকে বকতে শুরু করে দিলেন, এলিফ্যান্টা গার্ডেনসে প্রথম নিয়ে গেলে না কেন, এই বাজে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছো কেন, বান্দ্রা পৌঁছুতে দু'ঘণ্টা লাগিয়ে দিলে, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না, ইত্যাদি। কয়েকদিন পরে আবিষ্কার করলাম গাড়িটি স্বয়ং গোবিন্দেরই, যে গোবিন্দ শচীনদাদের আত্মীয়, যাঁর ভালো নাম অভি ভট্টাচার্য, বিখ্যাত চলচ্চিত্রশিল্পী। (নিয়তির অমোঘ লিখন, চিত্রতারকাদের বিষয়ে আমার ও আমার স্ত্রীর অজ্ঞতার জবাব পরের প্রজন্ম অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দিয়েছে। কয়েক মাস বাদে কলকাতায়, একদিন কবিতাভবনে গেছি, রুমি-সম্প্রদায়

উত্তেজিত-উল্লসিত-উচ্ছ্বসিত। কী ব্যাপার? কোনও সিনেমা পত্রিকায় অভি ভট্টাচার্যের আস্ত ছবি বেরিয়েছে, প্রচ্ছদচিত্র, তিনি কুর্সিতে হেলান দিয়ে কবিতাভবন-প্রকাশিত গ্রীষ্মবার্ষিকী 'বৈশাখী'-র পাতা ওল্টাচ্ছেন। এর চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য কবিতাভবন-ললনাদের আর কী হতে পারে, ওই নায়ক যেন কবিতাভবনকে ধন্য করে দিয়েছেন। বুদ্ধদেব আস্তে বললেন, 'হয়তো হিতুর কাছ থেকে কপি পেয়েছে'। বাবা বুদ্ধদেব বসু কী বললেন তা ফ্যালনা, জয়তু অভি ভট্টাচার্য।)

অবশ্য শচীনদা শুধু বিখ্যাত গোবিন্দকে কেন, কাউকে ছেড়ে কথা কইবার মানুষ নন, এমন কি নববধূদেরও না। আমার স্ত্রীর রুটি খাওয়ার ধরনটা একটু অদ্ভুত, টেবিলে টোস্ট পৌঁছুলে শক্ত চারদিক তিনি নির্মম ছেঁটে ফেলে মধ্যিখানের জায়গাটুকু মাখন মেখে খান। শচীনদা একদিন নজর করলেন, দু'দিন নজর করলেন, তৃতীয় দিন আর ছাড়ান নেই। তাঁর নাকি গলায় নববধূর দিকে মন্তব্য ছুঁড়লেন : 'তোমার রুটি খাওয়া তো বড়ো রাজসিক'। কেউ-কেউ অনুদ্ধারণীয়, উক্ত ভদ্রমহিলার সেই রাজসিক অভ্যাস এখনও অব্যাহত।

একটু পিছিয়ে যাই, শচীনদার সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হলো, তাঁর ও ইকনমিক উইকলি-র প্রতিষ্ঠা তখন তুঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অর্থমন্ত্রী পর্যন্ত সবাই পত্রিকাটি পড়েন, তাঁরা পড়েন বলে প্রধান-প্রধান আমলারাও পত্রিকাটি পৃষ্ঠপোষকতা করতে বাধ্য বোধ করেন, একটু-একটু করে বিজ্ঞাপনের কুঁড়ি ফুটছে, সরকারি-বেসরকারি অর্থনীতিবিদরা সবাই নিয়মিত লিখছেন, সরকারকে গাল পাড়বার ইচ্ছা অনুভব করলে সরকারি অর্থনীতিবিদরা কোনও ছদ্মনামের আড়ালে লিখছেন, সেই সঙ্গে লিখছেন সমাজবিজ্ঞানীরা, রাষ্ট্রনীতিবিদরা, ঐতিহাসিকরা, এমন কি আইনবিদরা পর্যন্ত : শচীনদা নিজে উদারচরিত, পত্রিকাটিও তাই। উজ্জ্বল রচনা হলেই হলো, মতামত নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই, ইকনমিক উইকলি-তে তা জায়গা পাবেই। একদা ড্যানিয়েল থরনার-এর উৎসাহ ও তত্ত্বাবধানে নিয়মিত এন্তার কার্টুন ছাপা হলো, সমররঞ্জন সেন ও আমি রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদদের চিমটি কেটে ছড়াও ছাপিয়েছি বেশ কয়েকবার।

সব মিলিয়ে সে এক আশ্চর্য সময়, প্রশান্ত মহলানবিশ ও তাঁর সহচর পীতাম্বর পন্থ মিলে দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহসিকতা দিয়ে সরকারি দালানকোঠা কাঁপিয়ে তুলছেন, শচীনদা ইকনমিক উইকলি-র মধ্য দিয়ে বুদ্ধিজীবী মহলে অনুরূপ নাড়া দিচ্ছেন। দীর্ঘ সুঠাম শরীর, চশমার আড়ালে টেরচা চোখের দৃষ্টি, আপাদমস্তক খদ্দরের আচ্ছাদন, নতুন দিল্লির যে-কোনও মহলে তিনি ঢুকলেই চাপরাশি ও করণিককুল সসম্ভ্রমে তড়াক করে উঠে দণ্ডায়মান, মস্ত কোনও নেতাজী নিশ্চয়ই এসেছেন, শচীনদা কোনওদিন তাঁদের ভুল ভাঙাবার চেষ্টা করেননি, আমরাও করিনি।

ওই সময়ে মহলানবিশ মহাশয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে কলকাতায়, এবং সদ্য-খোলা দিল্লি শাখায়, উৎসাহে-টগবগ এক গাদা নবীন অর্থনীতিবিদ ও সংখ্যাতাত্ত্বিক যোগ দিয়েছেন, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকেও আমরা অনেকে আছি। দৃষ্টিবিভ্রম, কিংবা অন্য যে-বর্ণনাতেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, আমরা সত্যি-সত্যি আস্থাশীল ছিলাম, ক্ষণিক সময়ের জন্য হলেও ছিলাম, এখন থেকে দেশের অর্থব্যবস্থা অন্যদিকে মোড় নেবে, নেবেই, এতজনের তদ্গত সাধনা ব্যর্থ হতে পারে না। আমলাকুল নিশ্চয়ই অদৃশ্যে হেসেছিলেন।

যাদের-যাদের সঙ্গে তখন নতুন আলাপ হয়েছিল, তাদের মধ্যে অবশ্যই একজন অশোক

রুদ্র। মনে পড়ে অজিত দাশগুপ্ত তাঁকে একদিন কনৌট প্লেসের ইউনাইটেড কফি হাউসে হাজির করেছিল। তারপর প্রায় চল্লিশ বছর তার কথার খইতে আমাদের মনঃসংযোগ না-করে উপায় ছিল না। অশোক রুদ্রের ধরনটি ছিল স্বভাব-তার্কিকের। প্রথম ধাক্কাতে মনে হওয়া অবধারিত যে লোকটা ঝগড়া করার জন্য মুখিয়ে আছে। কথা বলতো অতি দ্রুত তোড়ে, এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে ঝট করে তার প্রস্থান, পৃথিবীতে এমন-কোনও বিষয় ছিল না যা নিয়ে অশোকের আগ্রহ ঈষৎ স্তিমিত। সে সংখ্যাতত্ত্বের ছাত্র, প্রথাগত অর্থনীতির পাঠ কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে নেয়নি, কিন্তু তাতে কী, সব ব্যাপারেই তাঁর মতামত চূড়ান্ত বলে মানতে হবে, এবংবিধ তাঁর প্রাথমিক মানসিকতা, না মানলে সে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে, তারপর কথার মধ্যবর্তিতায় মারামারি-কাটাকাটি; কত লোকের সঙ্গে অশোক ঝগড়া করেছে, মৌখিক গাল পেড়ে, লিখিতভাবে, তার ইয়ত্তা নেই। সংখ্যাতত্ত্ব থেকে অর্থবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান থেকে ইতিহাস, ইতিহাস থেকে গণিত, গণিত থেকে সমাজতত্ত্ব, সমকালীন রাজনীতি, সমর সেনের কবিতা, রবীন্দ্রনাথের গান, চলচ্চিত্র থেকে রন্ধনশিল্প, অশোক রুদ্রের বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণের পরিধি। সে বিভিন্ন গোষ্ঠীর নকশালপন্থীদের সঙ্গে আছে, নারীবাদীদের সঙ্গেও আছে, আশির দশকে একবার ইকনমিক উইকলি-র পাতায় সিমন দ্য ব্যোভোয়া সম্পর্কে একটু ঠেস দিয়ে কী যেন লিখেছিলাম বলে অশোক দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে সম্পাদকের কাছে কুপিত চিঠি পাঠিয়েছিল, আমাকে চরম ভাষায় গালিগালাজ করে, সম্পাদকের ঘাড়ে ক'টা মাথা চিঠিখানা ছাপাতে অস্বীকার করবেন। অথচ অশোকের মতো নরম হৃদয়ের মানুষ সত্যিই বিরল। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচণ্ড ভালোবাসতো, যাদের সঙ্গে ঝগড়া-তর্ক করতো, তাদের সম্বন্ধেও তার অন্তরের কন্দরে গভীর মমতাবোধ। একটি প্রশ্ন তবু থেকেই যায়। সে যখন ফরাশি দেশে পড়তে যায়, পঞ্চাশের দশকের গোড়ায়, অস্তিত্ববাদীদের তখন যশের পরাকাষ্ঠা। আমার নিজের ধারণা, অশোকের চরিত্রে তার রেশ বরাবর লেগে ছিল। যে তাকে নিবিড় ভালোবাসে, যে তাকে স্নেহে-প্রেমে-ভক্তিতে সর্বদা ঘিরে রাখতে চায়, তাকে সে ছাড়িয়ে যাবে, ছেড়ে যাবে। তার অস্তিত্ব কারও বশ্যতা স্বীকার করবে না, যে তার প্রতি মমতাময় বা মমতাময়ী, তাকে সে কশাঘাত করবে। আমার সন্দেহ, এই কারণেই ফরাশি স্ত্রীর সঙ্গে তার বিবাহবিচ্ছেদ, এবং পরবর্তীকালে যারাই তার সান্নিধ্যে এসে তাকে প্রীতি দিয়ে, স্নেহের ঔদার্যে আচ্ছন্ন করতে চেয়েছে, সে সদর্পে, কোনও-না-কোনও ছুতোয়, বা ছুতো ছাড়াই, সেই ব্যক্তিকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। বরাবরই সে চরমের ভক্ত তাপস। যে-কোনও দেশের সাবেক কমিউনিস্ট দল সম্পর্কে তার পুঞ্জিত ঘৃণা, অথচ এই ক্ষেত্রেও সে ভীষণ আঘাত পেয়েছে, তার একমাত্র সন্তানের কাছ থেকে। কয়েকদিনও হয়নি আমাকে গাল পেড়ে ভূত ভাগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তাতে কী, তার মৃত্যুর কিছুদিন আগে এক সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনে আমার কাঁধে হাত রেখে খোয়াইয়ের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে দুঃখের মর্মান্তিক কাহিনী অশোক ব্যক্ত করলো : তার ছেলে, অশোক রুদ্রের ছেলে, ফরাশি দেশে পড়াশুনো করছে, সে কিনা সাবেক ফরাশি কমিউনিস্ট পার্টিতে নাম লিখিয়েছে, এই দুঃখ অশোক কোথায় রাখবে?

অশোকের সেই সন্তান, অলোক, এখন নিশ্চয়ই প্রায় প্রাবীণ্যে পৌঁছনো ফরাশি যুবক, বাংলা ভাষা, ধরে নিচ্ছি, ভুলে গেছে। তার বাচ্চা বয়সের একটি কাহিনীর মাধুর্য এখনও মনে গেঁথে আছে। দিল্লিতে আমাদের বাড়িতে স-পুত্র অশোক-কোলেৎ ক'দিনের জন্য থাকতে এসেছে, সন্ধ্যাবেলা বাড়ির মাঠে বেতের চেয়ারে সবাই গোল হয়ে বসে আছি, আমার স্ত্রী

সস্নেহে অলোককে আহ্বান জানালেন, 'এসো, আমার কোলে এসে বোসো না একটুক্ষণ'। অশোক-নন্দনের, তার বয়স হয়তো তখন পাঁচ বছর, সঙ্গে-সঙ্গে শর্তসাপেক্ষ উত্তর : 'হ্যাঁ, তোমার কোলে গিয়ে বসবো, কিন্তু রাত্তিরে মুরগির ঠ্যাংটা আমাকে খেতে দিতে হবে'। খাদ্য প্রসঙ্গ যখন উঠলো, বলেই ফেলি, আমাদের ওখানে একদিন বিদ্যাচূড়ামণি অশোক রুদ্র ভাত দিয়ে পরিপাটি করে দই মাছ খেয়ে পরিতৃপ্তিসূচক প্রগাঢ় উক্তি করলো, 'ইলিশ মাছের ভাপে সেদ্ধটা খুব ভালো খেলাম'।

শচীনদার হঠাৎ-বিয়োগের ঠিক দু'দিন আগে কোনও কাজে মুম্বই গেছি, অশোক রুদ্র তখন ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক, রবিবার সকালে আমরা দুই অশোক মিলে পালি হিলে হিতুবাবুর বাড়িতে; শচীনদার কিছুদিন আগে হৃদরোগ দেখা দিয়েছে, তিনি ওখানে বিশ্রামে আছেন। সারাদিন আড্ডাগল্পগুজব, বিকেলে দিল্লিগামী বিমান ধরতে হবে আমাকে, ট্যাক্সি এসে গেছে, শচীনদা আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিম্ন স্বরে বললেন : 'আমার শরীরের যা অবস্থা, তাতে অশোক রুদ্রের সঙ্গে তর্ক করবার মতো আর সামর্থ্য নেই, তুমি মাসে অন্তত একবার এসো'। আটচল্লিশ ঘণ্টা না-যেতেই শচীনদা প্রয়াত হলেন।

তা তো পরের বৃত্তান্ত। বরঞ্চ এই মুহূর্তে বলি, মধ্য-পঞ্চাশের সেই কয়েকটা বছর আমাদের পক্ষে, ইকনমিক উইকলি-র প্রসাদে, অভাবনীয় আনন্দ ও চরিতার্থতার ঋতু। যারা তখনও বিভিন্ন মন্ত্রকে কর্মরত আছি, তারা নাম গোপন করে ইকনমিক উইকলি-র জন্য লিখতাম, অনেকেই লিখতাম, পরে ছাপা হয়ে বেরোলে নিজেদের মধ্যে আন্দাজ-অনুমানের পালা শুরু, কে কোনটা লিখেছে। এটা তো অম্লানবদনে পৌনঃপুনিকতার সঙ্গে স্বীকার করতে হয়, শচীনদা ওরকম লেখার স্বাধীনতা না দিলে আমরা কেউই লেখক হিশেবে পরিগণিত হতে পারতাম না; তাঁর কাগজে লেখার বউনি করেছি, তাঁর কাগজে অনেক দায়িত্বজ্ঞানহীন রচনা ছাপিয়েছি, কিন্তু তাঁর মনে কোনও দ্বিধা নেই, মতামত যা-ই হোক না কেন, লেখাটায় বুদ্ধি ও চতুরালির স্বাক্ষর থাকলেই হলো। সুখময়-অমর্ত্যরও প্রথম কয়েক বছরের অধিকাংশ রচনা ইকনমিক উইকলি-তেই জায়গা পেয়েছিল; সেই আরম্ভ থেকেই ক্রমশ তাদের লেখার বিভঙ্গ পরিপক্ব হলো, চিন্তায় ধৃতি আসল।

ব্যাংককে যাওয়ার আগে, এবং ব্যাংককের পালা চুকিয়ে সেই গবেষণা প্রতিষ্ঠানে দিল্লিতে ফের জড়ো হওয়ার পরে, শচীনদার পত্রিকার পাতায়, তাঁর ঔদার্যের সুযোগ নিয়ে, কখনও-কখনও, অল্প বয়স তখন, চরম হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছি, যা তখন কৌতুক বলে ভাবতাম। অর্থমন্ত্রকে কাজ করবার সময়কার একটি ঘটনা বলি : আমাদের কর্তাব্যক্তি আঞ্জারিয়া মহাশয় সতর্ক স্বভাবের মানুষ, দেশের আর্থিক গতিপ্রকৃতি নিয়ে, বা মুদ্রাব্যবস্থা সম্পর্কে এখন ঠিক মনে নেই, কোনও উদ্ধত তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে একটি নোট তাঁকে পাঠিয়েছি, তিনি সঙ্গে-সঙ্গে সেটা তাঁর সেক্রেটারিয়েট টেবলের ড্রয়ারে পাচার করেছেন, যেন ওটা পক্ব অবস্থায় পৌঁছুলেই তবে তার স্বাদ গ্রহণ করবেন। সপ্তাহ গড়িয়ে যায়, মাস গড়িয়ে যায়, আঞ্জারিয়া নির্বাক, আমার সঙ্গে আলোচনায় বসতে তিনি তখনও তৈরি নন। ধ্যাত্তোর বলে নোটটির একটি কপি শচীনদাকে মুম্বইতে পাঠিয়ে দিলাম, সঙ্গে-সঙ্গে তা সেই সপ্তাহের ইকনমিক উইকলি-তে প্রথম সম্পাদকীয় হিশেবে ছাপা হলো। দফতরে নিজের ঘরে বসে আছি, হঠাৎ আঞ্জারিয়ার উদ্‌ভ্রান্ত টেলিফোন : 'আরে ভাই, এক্ষুনি চলে এসো'। গেলাম। আঞ্জারিয়া ভীষণ বিচলিত, 'শচীন কী যেন লিখেছে। অর্থমন্ত্রী দ্রুত আমাদের মতামত চেয়েছেন। এসো, লেগে পড়ি, আঁটঘাট বেঁধে শচীনকে যথাযোগ্য জবাব দিতে হবে'।

তেরো

ব্যাংকক থেকে দিল্লিতে প্রত্যাবর্তনের পর উপলব্ধি হলো, ইকনমিক উইকলি-র খ্যাতি যদিও মধ্যগগনে, আর্থিক পরিকল্পনা নিয়ে উন্মাদনা অনেকটাই ডুবুডুবু। হঠাৎ অর্থমন্ত্রকসুদ্ধু গোটা আমলামহল আবিষ্কার করলেন, বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে আমাদের সংকট দেখা দিয়েছে, হু-হু করে ডলার-পাউন্ডের মজুত কমছে, বিপদসংকুল অবস্থা, সুতরাং, তাঁদের সরব অভিমত, পরিকল্পনা নিয়ে বিলাসিতা মুলতুবি থাকুক, মুলতুবি থাকুক স্বনির্ভরতা নিয়েও বাসনার লীলাকেলি। অধ্যাপক মহলানবিশ ও তাঁর আশা-ঝলমল পরিকল্পনার খসড়া মন্ত্রীশাস্ত্রীদের একাগ্রচিত্ততার আর মধ্যবিন্দু হয়ে রইলো না। রফতানি ছাড়িয়ে আমদানির মাত্রা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, কিছুদিনের মধ্যেই সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ড শূন্যতে গিয়ে ঠেকবে, এখন আর দেরি নয়, পরিকল্পনা শিকেয় তোলা থাক, মার্কিন সরকারের পায়ে গিয়ে আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়ি, হুজুর, মহানুভব, ধর্মাবতার, আমাদের তরিয়ে দিন। সেই লগ্নে, এবং পরেও, বহু আলোচনা হয়েছে, ভারতবর্ষের এই যে বহির্বাণিজ্যিক সংকট নিয়ে সহসা সরকারি মহলের এত উতল হওয়া, তা কি নেহাৎই কাকতালীয়, না কিছু-কিছু আমলার, এবং কিছু-কিছু রক্ষণশীল মন্ত্রীর, যুগ্ম ষড়যন্ত্রের ফসল। যদিও অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেশ তখন অনেকটাই বিবিধ নিয়ন্ত্রণের নিগড়ে, রাজনৈতিক দর্শন ও ভাবনার প্রেক্ষিতে পরিবেশ কিন্তু ভীষণ খোলামেলা, যে-কেউ আসছেন, যে-কেউ যাচ্ছেন, পূর্ব ইওরোপ এবং অন্যত্র থেকে পরিকল্পনা বিশারদদের যেমন আগমন ঘটছে, সেই সঙ্গে পরিকল্পনা-বিরোধী রথীমহারথীরাও নতুন দিল্লির যত্রতত্র বিহার করছেন, হরিজন-মহাজনদের কাছে পরামর্শ-উপদেশ বিলোচ্ছেন। আমার নিজের ধারণা, অর্থমন্ত্রকের কুচক্রী আমলারাই বোধহয় প্রধান কলকাঠি নেড়েছিলেন, পরিকল্পনা নিয়ে যে-দুরন্ত উৎসাহ সরকারি-বেসরকারি মহলে কয়েকমাস আগেও দাপাদাপি করে বেড়োচ্ছিল, তা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। মন্ত্রী, আমলাবর্গ ও তাঁদের পারিষদরা তখন থেকে ঘন-ঘন মার্কিন মুলুকে ছুটোছুটি শুরু করলেন, যোজনা পরিষদে অধ্যাপক মহলানবিশের প্রাক্তন প্রতিপত্তি অনেকটাই নির্বাপিত। পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে জওহরলাল নেহরুর যে-পরিমাণ স্বপ্নোচ্ছলতা ছিল, তদনুরূপ বাস্তবপ্রত্যয় ছিল না। সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খোলা হাওয়ার পালে আবেগ সংযোজিত হলো, আর খোলা হাওয়া মানেই তো মার্কিন কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ব ব্যাংক যা বলবেন হুবহু তা মেনে নেওয়া।

শচীনদা ইকনমিক উইকলি-র মধ্যবর্তিতায় খানিকটা সময় লড়াই চালিয়ে গেলেন, মন্ত্রী-আমলাদের বিদেশী সাহায্য পাওয়ার চাতকতৃষ্ণা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করলেন, কিন্তু সরকারি মহলে শ্রেণীস্বার্থের হাতছানি, স্বনির্ভর অর্থব্যবস্থার ব্রত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে গেলে অধ্যবসায়, চিকীর্ষা ও আত্মত্যাগের প্রয়োজন, বড়ো দীর্ঘ অকরুণ পথ তা, কী দরকার, তার চেয়ে মার্কিন সরকার ও বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে মিতালি করাই তো শ্রেয়, পায়ের উপর পা

তুলে দিব্যি আরামে কালাতিপাত করতে পারি আমরা তা হলে।

চিন্তাভাবনার স্তরে মেরুপরিবর্তন, যোজনা পরিষদের দাক্ষিণ্যে দেড়-দু'বছর আগে যেখানে স্বনির্ভর পরিকল্পনার মাহাত্ম্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে-বিশ্ববিদ্যালয়ে, গবেষণাকেন্দ্রে-গবেষণাকেন্দ্রে মস্ত-মস্ত বিশ্লেষণ-আলোচনা-প্রবন্ধ ফাঁদা চলছিল, সেখানে এখন বিপরীত ঋতুর প্রভাব, পরিকল্পনার সংকট নিয়ে দিস্তা-দিস্তা প্রবন্ধের চর্চা। শচীনদাকে তো তাঁর পত্রিকা টিকিয়ে রাখতে হবে, আমলামহল ও সেই সঙ্গে অর্থনীতিবিদকুল যখন উল্টো সুর গাইতে শুরু করলেন, ইকনমিক উইকলি-র একক প্রতিরোধও ক্রমশ মিইয়ে আসতে লাগলো। যাঁরা বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন, তাঁরা মলিন হেমন্ত-সন্ধ্যার বৈরাগী পরিপার্শ্বের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে শিখলেন। আসলে স্বনির্ভর পরিকল্পনার রাজনৈতিক ভিত্তিভূমি গোটা দেশে তখনও খুব দুর্বল সংস্থানে দাঁড়িয়ে, এমন কি কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও এই ব্যাপারে তেমন গভীর চিন্তার দোলা ছিল না। তথাকথিত বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের আড়ালে যে-আসল, বৃহত্তর সংকট, তা রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের কাছে প্রাঞ্জল করে ব্যাখ্যা করা কর্তব্য ছিল অর্থনীতিবিদদের, সেই কর্তব্য যথাযথ পালিত হয়নি। আমার এখনও বিশ্বাস, মধ্যপঞ্চাশের বছরগুলিতে পরিকল্পনা নিয়ে ভাবনা-চিন্তায় প্রাথমিক যে-জোয়ার এসেছিল, তা ধরে রাখতে পারলে, তার প্রায়োগিক সমস্যা নিয়ে সাধারণ মানুষজনকে সম্যক বোঝাতে পারলে, যে-বদ্ধ ডোবায় আমাদের অর্থব্যবস্থা গত চার-সাড়ে চার দশক ধরে আটকে আছে, তা থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব হতো। শ্রেণীস্বার্থের গুরুত্ব অস্বীকার করছি না, কিন্তু গণচেতনা যদি সর্বস্তরে ব্যাপ্ত করা যেত, হয়তো নতুন শ্রেণীসংশ্লেষণ ঘটতো, সেই ক্ষেত্রে আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-পুঁজিবাদী গোলকধাঁধা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারতাম।

অর্থনীতিতে আমি তখনও পর্যন্ত বিশ্বাস পুরোপুরি হারাইনি, তবে একটু-একটু করে উপলব্ধি করছি, অর্থনীতিই রাজনীতি, রাজনীতিই অর্থনীতি। সেই মুহূর্তে নিজের মনোনীত বৃত্তি ছেড়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতির মাঠে নেমে পড়ার জল্পনা মনে-মনেও শুরু করিনি। এদিকে ঝুঁকছি, ওদিকে ঝুঁকছি, রাজনীতির বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি, ধনবিজ্ঞানী বন্ধুদের সঙ্গেও, শচীনদা ও ইকনমিক উইকলি-র অলঙ্ঘনীয় মাধ্যাকর্ষণে প্রত্যহ আরও বেশি আবিষ্ট হচ্ছি, কলকাতাস্থ কবি-সাহিত্যিক বন্ধুদের সান্নিধ্যের মায়াবেষ্টনী তো অহরহ ঘিরে রেখেইছে। এই বছরগুলিতেই কলকাতায়, অনেকেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, এক দঙ্গল কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ : সুবীর রায়চৌধুরী, অমিয় দেব, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং অবশ্যই নবনীতা। দিল্লিতে পরিমলবাবু আর নেই, তিনি নিউ ইয়র্কে কয়েক বছর আগে প্রয়াত হয়েছেন, কিন্তু মন্মথবাবু আছেন, দাতরজির বাড়ির আড্ডার বন্ধুরা আছেন, সুশী-অমলেন্দু দাশগুপ্তরা আছেন। মাঝে-মাঝে কলকাতা থেকে 'বহুরূপী', 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' ইত্যাদি দিল্লি ঘুরে যাচ্ছেন, তাঁদের কুশীলবদের অনেকের সঙ্গে আস্তে-আস্তে আলাপ হচ্ছে। দেশের আর্থিক সংকটের চেহারা-চরিত্র যা-ই হোক, নতুন দিল্লির বহির্বৈভব থেকে তা কিছুমাত্র অনুমান করা সম্ভব নয়, বালাসরস্বতীদের নাচ, রবিশঙ্কর সম্প্রদায়ের বাদন, অপরিসর আইফ্যাক্স মঞ্চে, নয়তো সপ্রু হাউসে, বিদেশী কলাকুশলীদের ঘন-ঘন প্রতিভা-কুশলতা নিদর্শন-প্রদর্শন, 'টপ্পা-ঠুংরি' কবিতার ভাষায়, দিন কাটছিল যেন জিল্‌হাবিলম্বিতে।

ইতিমধ্যে সহসা বিস্ফোরণের মতো বাংলাদেশ জুড়ে জীবনানন্দ-বিহ্বলতা, তাঁর

জীবদ্দশায় তাঁকে যা দেওয়া যায়নি, এখন তা সুদসমেত পাইয়ে দেওয়ার আয়োজন, কিন্তু কাকে পাইয়ে দেওয়া, তা নিয়ে তেমন উদ্বেগ-আকুলতা নেই। সেই লগ্নে স্পষ্ট করে বলা নিশ্চয়ই ঈষৎ কুরুচিকর ঠেকতো, তবে আমার মনে হয় দুটো প্রবাহ মধ্যবিত্ত বাঙালি মানসিকতায় পাশাপাশি তখন বহমান, একটি জীবনানন্দের চেতনাবলয়ে প্রথম প্রবেশের অবাধ আবেগের মহাস্রোতস্বিনী, অন্যটি তাঁর ভাষার গহনে সোনা-রুপো-কাগজের খনি আবিষ্কারের গভীর সম্মোহ। কী আর করা যাবে, ইতিহাসধারাকে তো মেনে নিতেই হয়, তা যদি ভুল খাতে ধেয়ে চলে, তা হলেও।

এই সময়টাতেই অরুণকুমার সরকার অসাধারণ কিছু মহৎ কবিতা লিখে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি তো রাজনৈতিক পক্ষনিরূপণের বিচারে ঘরেও নহেন, পাড়েও নহেন, সাম্যবাদী মহলে তাঁকে নিয়ে আগ্রহ নেই, এবং কবিতাভবন ঘিরে তখন নবীন প্রজন্মের চঞ্চল সমাগম। এই শেষোল্লিখিত প্রজন্মের অন্তর্গত যাঁরা, কোনও পর্যায়েই তাঁদের আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল না, প্রথম থেকেই তাঁরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, ক প্রশস্তি গাইছেন খ-র, খ প্রশস্তি গাইছেন গ-র, গ প্রশস্তি গাইছেন ক ও খ উভয়ের। বুদ্ধদেব বসু বরাবরই একটু পরমত-নির্ভর, একদা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের তাগিদে যেমন সাম্যবাদী দলিল-দস্তাবেজে স্বাক্ষর দিয়েছেন, পঞ্চাশের দশকের শেষের প্রহর থেকে মার্কিন-অনুরক্ত প্রিয় বয়স্য ও কবিযশোপ্রার্থীদের তাড়নায় মধ্যবর্তী প্রজন্মের কবিদের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা প্রায় ভুলে থাক্‌লেন। আমি কোনও অভিযোগ তুলছি না, একটি ঐতিহাসিক সংঘটনার বিশ্লেষণপ্রয়াস করছি মাত্র।

নতুন দিল্লির গবেষণাগারের অধ্যক্ষের সঙ্গে আমার খুচখাচ মনোমালিন্য লেগেই ছিল, অব্যাহতি খুঁজছিলাম, সুযোগ এসে গেল : মার্কিন রাজধানী ওয়াশিংটন শহরের ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটে গিয়ে পড়ানোর প্রস্তাব। মাত্র কয়েক বছর আগে এই শিক্ষায়তনের পত্তন হয়েছে, বিভিন্ন অনুন্নত দেশ থেকে প্রশাসকদের জড়ো করে প্রতি বছর ছ'মাস করে তাঁদের ধনবিজ্ঞানে তালিম দেওয়ার পরিকল্পনা। যাঁরা পড়তে আসতেন তাঁরা অধিকাংশই প্রবীণ আমলা, পনেরো-কুড়ি-তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। ছোটো-ছোটো দেশ থেকে একজন-দু'জন মন্ত্রী পর্যন্ত অধ্যয়নচর্চায় আসতেন। তাঁদের জন্য একটু অন্য ধাঁচের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা : প্রথাগত বুলি ও তত্ত্ব কপচানো বাদ দিয়ে, সহজ অনাড়ম্বর ভাষায়, কিন্তু তত্ত্বের মূল কথাটি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে, সেই সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আর্থিক সমস্যালগ্ন তথ্যাদি নিয়েও আলোচনা। ইনস্টিটিউটের অর্থসংস্থান বিশ্ব ব্যাংকের কৃপায়। ব্যাংকের কর্তৃপক্ষের সম্ভবত উদ্দেশ্য ছিল, জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি গরিব দেশগুলির মন্ত্রী-আমলারা ব্যাংকের দর্শনচিন্তাকেও শ্রদ্ধা করতে শিখুক, এই পীঠস্থানে ঘুরে যাওয়ার কল্যাণে।

পড়াতে আসতেন মার্কিন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়াদি থেকে বাছা-বাছা অধ্যাপক, কখনও ইংল্যান্ড তথা ইওরোপ থেকেও, ক্বচিৎ-কদাচিৎ অন্যান্য মহাদেশের পণ্ডিতবর্গও। অবশ্য আমার ক্ষেত্রে তখন কোথায় যাচ্ছি তার থেকেও কোন জায়গা থেকে পালাতে পারছি সেই সমস্যাই বড়ো ছিল, কিন্তু যে-চার বছর ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউটে ছিলাম, বলতে বাধা নেই, নানা দিক থেকে উপকৃত হয়েছি। সারা পৃথিবী ছেঁকে—এমনকি পূর্ব ইওরোপ থেকেও—যাঁরা অধ্যয়নের জন্য আসতেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বিভিন্ন দেশের সমস্যাবলী সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান আহরণ সম্ভব হয়েছিল, কোন-কোন দেশগুলির সমস্যা-সমূহের মধ্যে ভাবসাদৃশ্য আছে, অন্য কোন-কোন দেশগুলির মধ্যে নেই,

এবং এই সাদৃশ্য ও সাদৃশ্যহীনতার কারণগুলি কী, সে-সমস্ত নিয়ে ক্রমশ চিন্তা প্রাঞ্জলতর হয়েছে। দ্বিতীয় যে লাভ, পৃথিবীর বাছা-বাছা ধনবিজ্ঞানীদের সঙ্গে ওখানে অধ্যাপনার সূত্রে পরিচয়, আগে থেকে যাঁদের সঙ্গে পরিচয় ছিল, যেমন কালডর কিংবা ৎসুরু বা মার্টিন ব্রনফেনব্রেনার, তাঁদের সঙ্গে গভীরতর সখ্য। আমার শিক্ষক টিনবার্গেনও একবার এসেছিলেন। ১৯৬০ সালের শেষের দিকে— অমর্ত্য-সুখময় তখন দু'জনেই ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে পড়াচ্ছে—অতি তরুণ অমর্ত্য এসে আমাদের প্রবীণ ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দিয়ে গিয়েছিল, ছাত্রকুল একটু ক্ষমাঘেন্নার সঙ্গেই যেন তার বক্তব্য শুনেছিলেন।

অন্য-কিছু ব্যক্তিগত শুভবর্ধনের কথাও উল্লেখ করি। চেনা-জানার পরিধি ওয়াশিংটন থাকাকালীন অনেক বাড়লো। যে-মস্ত অ্যাপার্টমেন্ট দালানে বাস করতাম, তাতে একজন-দু'জন মার্কিন সেনেটরও থাকতেন, তা ছাড়া রাজধানী শহর ওয়াশিংটন, তখনও পর্যন্ত অনেকটাই পল্লীর মদিরতা ছাওয়া, বিভিন্ন স্তরের রাজনীতিবিদ-অধ্যাপক-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল সে সময়, এমন কি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে পর্যন্ত এখানে-সেখানে মাঝে-মাঝে দেখা যেত, নিরাপত্তার অভেদ্য বলয়ের নির্মাণ ভবিষ্যতের গর্ভে।

ছ' মাস পড়ানো, বাকি ছ'মাস পড়ানোর জন্য তৈরি হওয়া, সুতরাং হাতে প্রচুর সময় থাকতো নিজের পড়াশুনোর, বিভিন্ন পত্রিকা ঘাঁটার, এখানে-ওখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বা অন্য কোনও শিক্ষা-কেন্দ্রে ঘুরে আসার। একটি রেওয়াজ ছিল, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কোনও অনুন্নত দেশে কিংবা উন্নত কোনও দেশের অনুন্নত অঞ্চলে গিয়ে, সপ্তাহ দুই-তিন ধরে, সে-দেশে বা সে-অঞ্চলে তন্ন-তন্ন বিহার করে, উন্নয়নমূলক সমস্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। সুযোগ ঘটেছিল ভেনেজুয়েলা, মেক্সিকো, ইতালির সিসিলি ও সার্ডিনিয়া ইত্যাদি জায়গায় যাওয়ার, এরও বাইরে ইনস্টিটিউট থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছিল জ্যামাইকা ও কোরিয়ায় বিশেষ পাঠক্রম পড়ানোর জন্য। আমি রঙ্গ করে মাঝে-মাঝে বলি, আমি সম্ভবত সেই বিরল মনুষ্যদের একজন, যারা একই সঙ্গে সার্ডিনিয়া, ভেনেজুয়েলা ও কোরিয়া সফর করেছে। অবশ্য এই কাজের সূত্র ধরেই আমেরিকা ও ইওরোপেও চষে বেড়িয়েছি কয়েকটি বছর।

পরে খানিকটা নিন্দামন্দ শুনেছি, ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট-এর ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্যোক্তা যেহেতু বিশ্ব ব্যাংক, আমার মতো বামপন্থীর ওখানে সময় কাটানো নৈতিক দ্বিচারিতার সাক্ষ্যবহন করছে। এ ব্যাপারেও কিন্তু আমার মনে কোনও দ্বন্দ্ব-বোধ নেই। বিশ্ব ব্যাংকের তহবিলে আমাদের সরকারেরও টাকা গচ্ছিত, তা ছাড়া আরও অনেক ভারতীয় অর্থবিজ্ঞানী, যেমন আমার বন্ধু কৃষ্ণস্বামী কিংবা রাজ, এই ইনস্টিটিউটে কিছু সময় কাটিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি, আমার বেলা উঠছে কেন? তার চেয়েও আমার বড়ো সাফাই, ওই চার বছর তদ্গতমন হয়ে বিভিন্ন উন্নতিশীল দেশ থেকে আসা বৃদ্ধ বা প্রায়-বৃদ্ধ ছাত্রদের পরমানন্দে সোভিয়েট দেশের ফেল্ডম্যান পরিকল্পনা মডেল বিস্তৃত করে পড়িয়েছি, সমাজতন্ত্রের উৎকর্ষ-উপযোগিতা সম্পর্কে যাতে তাঁদের মনে কোনও দ্বিধা আদৌ না থাকে: এটা অনেকটা সেই মার্কিন মহিলার উপহারদত্ত ডলার দিয়ে পিকাসোর শান্তি রুমাল-আঁকা রুমাল কিনে বিলোনো-সদৃশ আচরণ।

ওয়াশিংটনে কয়েক বছর বসবাস করা থেকে অন্য যে-অভিজ্ঞতা, তার রাজনৈতিক

ব্যঞ্জনাও তুচ্ছ নয়। পটোম্যাক নদী পেরিয়ে ভার্জিনিয়া রাজ্য, অন্য দিকে ওয়াশিংটন শহরকে বলা চলে মেরিল্যান্ড রাজ্যের একটি টুকরো। মার্কিন রাষ্ট্রে বর্ণবিভাজনের প্রায় ভৌগোলিক মধ্যরেখায় এই শহরের অবস্থান। ওয়াশিংটনের আভ্যন্তরীণ ভূগোলও ঠিক তাই-ই। শহরের উত্তর-পশ্চিম খণ্ডের ষোলো নম্বর স্ট্রিটের এদিকে শাদা মানুষদের ঘরবাড়ি, আর ওদিকে রাস্তার ক্রমিক সংখ্যা যত কমছে, ততই কৃষ্ণকায়দের ঘন থেকে ঘনতর বসতি, শহরের অন্যান্য খণ্ডগুলিও কৃষ্ণকায়দের জন্য বরাদ্দ। 'সভ্য' অংশে নানা অজুহাতে কালো মানুষদের সম্পত্তি কিনতে দেওয়া হয় না, তাঁদের ঠেলে দেওয়া হয় অন্যান্য অঞ্চলের প্রায়-ঘেটোগুলিতে। ষাটের দশকের গোড়া থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, সময় উত্তাল, মার্টিন লুথার কিং-এর নায়কত্বে সংঘবদ্ধ অহিংস উত্থান, যে-কোনও প্ররোচনায় যা হিংসার রূপ নিতে পারে। আন্দোলন-প্রতিরোধের চাপে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে একটু-একটু করে শ্বেতকায়দের অখণ্ড ক্ষমতা খর্ব হচ্ছে, ভোটের তাগিদে দু'টি প্রধান দলের মধ্যেও বর্ণসংমিশ্রিত রামধনু মিতালির লক্ষণ মাথা চাড়া দিচ্ছে; হাজার সামাজিক বাধাবন্ধ সত্ত্বেও, কৃষ্ণবর্ণদের মধ্যে শিক্ষার ঢেউও একটু-একটু আন্দোলিত হচ্ছে। অন্য আবর্তের অনুকম্পনও। আফ্রিকায় একটির-পর-আর-একটি কৃষ্ণবর্ণ-প্রধান দেশ পরাধীনতা থেকে মুক্ত হচ্ছে, লাতিন আমেরিকার বর্ণসৌষাম্যের কাহিনী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চুঁইয়ে ঢুকছে, অদূরবর্তী ক্যারিবিয়ান দ্বীপগুলিতে প্রধানত কৃষ্ণকায় মানুষদের ক্ষেত্রে যে-ধরনের সহজ সামাজিক উত্তরণ ঘটছে, যথা ত্রিনিদাদে, যথা জ্যামাইকায়, তা-ও মার্কিন মুলুকে অজানা থাকছে না। এমনিতেই জাজ-সঙ্গীতের মূর্ছনা সর্বশ্রেণীর মার্কিনিদের মধ্যে কয়েক দশক ধরে উন্মাদনার সঞ্চার করে আসছিল, তার উপর হালে জ্যামাইকা থেকে আগত হ্যারি বেলাফন্টের উদাত্ত কণ্ঠৈশ্বর্য গোটা দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, বর্ণবৈষম্যের ভূত আর কতদিন তাঁদের কাঁধে চেপে থাকবে? যা যোগ করতে হয়, আমি ও আমার স্ত্রী যে-বছর যে-মাসে আমেরিকা পৌঁছুলাম, সে-বছর সে-মাসে কিউবাতে ফিদেল কাস্ত্রোর নায়কত্বে ও প্রেরণায় গণবিপ্লব। চল্লিশ বছর ধরে মার্কিন রক্ষণশীল রাজনীতিবিদরা সেই বিপ্লবের বাস্তবতা অগ্রাহ্য করবার চেষ্টা করে এসেছেন, জন কেনেডির আমল থেকে শুরু করে বহুবার বহু ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত, কিন্তু কিউবা অনবদমিত। এখন আস্তে-আস্তে মার্কিন দেশের বিভিন্ন মহলে শুভবুদ্ধির উদয় হচ্ছে, তবে সেই প্রথম থেকেই দেশের কৃষ্ণকায়দের মধ্যে কিউবা বিপ্লবের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক লক্ষণাদি নিয়ে উতরোল আলোচনা। তাঁরা অশান্ত, সেই অশান্তির তরঙ্গ প্রতিহত করার প্রয়াসে মার্কিন কর্তাব্যক্তিরা পুরোপুরি অসফল। এরই সূত্র ধরে, ভিয়েতনামে যে-কলঙ্কময় সাম্রাজ্যবাদী সমরে মার্কিন প্রশাসন নিজেকে লিপ্ত করছিল, তার বিরুদ্ধে একটু-একটু করে প্রতিবাদ ও বিরোধিতার অযুত বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছিল, কয়েক বছরের মধ্যেই তা বিস্ফোরণের আকার নেয়।

অকপটেই বলতে হয় কথাটা। কট্টর মার্কিন-বিরোধী হিশেবে আমার মতো অনেকের নামে জনপ্রবাদ, কিন্তু সেই বিরোধিতা তো মার্কিন সরকারের নীতি ও নীতিপ্রয়োগ সম্পর্কে। যে-ক'বছর মার্কিন দেশে ছিলাম, প্রচুর শ্বেতকায় মার্কিন পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, সৌহার্দ্য হয়েছে, তাঁদের সৌজন্য ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছি। এমন নয় যে তাঁরা অনেকেই নিজেদের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের রীতিনীতি সম্পর্কে অসুখী নন, কেউ-কেউ অসুখী, কেউ-কেউ নন, কিন্তু যাঁরা অসুখী তাঁরা প্রথাগত রাজনীতি-সমাজনীতির ঘেরাটোপ থেকে সহজে বের হয়ে আসতে পারেন না। যদিও বুঝতে পারেন, সরকারের তরফ থেকে যা বলা হচ্ছে বা করা

হচ্ছে তাতে অনেক অনৈতিকতা, অসহায়ের মতো মেনে নেন তাঁরা। এই অসহায় মানসিকতার প্রতিবাদে অগুন্তি মার্কিন মধ্যবিত্ত পরিবারে ক্রমশ অসন্তোষের আগুন জ্বলেছে ষাটের দশকের গোড়া থেকে। অন্য একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। হয়তো, প্রাচুর্য, একটি সীমানা ছাড়িয়ে গেলে, সুখের চেয়ে অসুখের বেশি জন্ম দেয়। ছেলেরা-মেয়েরা শিশু বয়স থেকেই বিলাসে-ঐশ্বর্যে লালিত হয়েছে; ঘরময় ঠাসা সামগ্রীর সমারোহ, কোনও ইচ্ছাই তাদের অপূর্ণ থাকে না, ছবির মতো ঘরদালান, ছবির মতো গাড়ি-রাস্তাঘাট-পার্ক, সিনেমা-থিয়েটার, শৌখিনতার পর শৌখিনতার শোভাযাত্রা। বোধহয় একটা সময় আসে যখন উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের কিছুতে-কেন-যে মন লাগে না, অপরিতৃপ্তির কালো মেঘ পরিতৃপ্তিকে ঢেকে দেয়, অশান্ত তাদের মন, তারা বিদ্রোহের জন্য মুখিয়ে, বাবা-মার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সমাজপরিবেশ সম্পর্কে বীতরাগ, রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে তুড়ি মেরে উপেক্ষা করার উন্মত্ততা। তেষট্টি সালের গোড়ায় আমরা যখন মার্কিন দেশ ছাড়ি, তখন থেকেই বেশ বোঝা যাচ্ছিল, প্রহর অনিশ্চিত, শিগ্গিরই ভয়ংকর-কিছু ঘটতে যাচ্ছে। সেরকমই হলো, মাত্র কয়েক বছর বাদে।

একটি ব্যক্তিগত কবুলতিও সেই সঙ্গে করতে হয়। আমার জীবনে আমেরিকায় ওই ক'বছরই সম্ভবত অলস মায়ায় খেয়ালি ঝোঁকে বিহার-বিচরণের শেষ অধ্যায়। পড়াশুনোর পাশাপাশি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ঘড়ি না-মেনে আড্ডা দিয়েছি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় টইটম্বুর দিনযাপন। দেশ থেকে ছুটকো-ছাটকা উড়ো খবর পাই, কলকাতার রাস্তায় কাতারে-কাতারে কৃষক নিধন কংগ্রেসি প্রশাসনের নির্দেশে, অত দূর থেকে জেনে অস্থির বোধ করি। কিন্তু তা তো ক্ষণিকের বিবেকদংশন। কেরলে বামপন্থী সরকারকে ষড়যন্ত্র করে হটিয়ে দেওয়া হলো, তা নিয়ে উত্তেজনাবোধ, তবে তা-ও তো থিতিয়ে গেল। বছর দুই কাটতেই বন্ধু অরুণ ঘোষ, তাঁর স্ত্রী ডালিয়া, দুই কন্যা অদিতি ও জয়তী, ওয়াশিংটনে এসে হাজির, ভারতীয় দূতাবাসে অরুণ ঘোষের কোনও কাজের সূত্রে। বন্ধুদের মধ্যে আরও ছিলেন শাম্বমূর্তি ও তাঁর স্ত্রী উমা, শাম্বমূর্তিও তখন ভারতীয় দূতাবাসে, পরে নতুন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় জলবিদ্যুৎ কমিশনের সভাপতি হয়েছিলেন, তারও পরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ সচিব। অরুণ ঘোষের সুদক্ষ প্রশাসক হিশেবে প্রচুর নামযশ, কেন্দ্রীয় সচিব হিশেবে বিরাজ করেছেন বেশ কয়েক বছর, আমি রাইটার্স বিল্ডিং-এ থাকাকালীন পশ্চিম বঙ্গ পরিকল্পনা সংসদের কর্তাব্যক্তিরূপে যোগ দিতে ওঁকে রাজি করিয়েছিলাম। অসাধারণ ভালো কাজ করেছিলেন, পরে দিল্লিতে যোজনা পরিষদের সদস্য হন জনতা দলের স্বল্পকালীন মরশুমে। ডালিয়া, মনে হয় আগে বলেছি, হাটখোলার দত্তবাড়ির কন্যা, আভিজাত্যের সঙ্গে সহৃদয়তা তাঁর স্বভাবে অঙ্গাঙ্গী জড়িত, দিল্লিতে বহুদিন ওঁদের অতিথি ছিলাম, তবে নিকষ অতিথিরূপে নয়, ঘরের মানুষ হিশেবে সেই আতিথ্যগ্রহণ পর্ব আমার এখনও ঘোচেনি। অদিতি একটু পাগলাটে ধরনের মেয়ে, চঞ্চল, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারে তুখোড়, আই এ এস-এ ভালো ফল করে রাজস্থান রাজ্যে কর্মরতা, আপাতত দিল্লিতে, খানদানি বংশের একটি রাজস্থানী ছেলেকে বিয়ে করে চমৎকার সংসার পেতেছে, তার তিন কন্যা অনন্যা, আরাধ্যা, মেঘনা, আমাদের নাতনিস্বরূপা, তাদের সঙ্গে হুটোপাটিতে জীবনের প্রগাঢ় চরিতার্থতা আবিষ্কার করেছি। অন্যদিকে জয়তী শৈশব থেকেই অনেক বেশি পরিণত। কিছুদিন সমাজবিজ্ঞানের এঁদো ডোবায় চর্চারত থেকে পরে ধনবিজ্ঞানে চলে আসে, কেমব্রিজ থেকে তাক-লাগানো পি-এইচ. ডি খেতাব জড়ো করে,

এখন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক, বামপন্থী মহলে ঘোর সমাদর। বিয়ে করেছে আমার শিক্ষক সমররঞ্জন সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মানিককে, যে অভিজিৎ সেন নামে অর্থনীতি মহলে সমধিক পরিচিত। তাঁদেরও এক কন্যা, জাহ্নবী, দিল্লি গেলে যে আমাদের শাসনে রাখে।

চিঠিতে যোগাযোগ বরাবরই ছিল, ওয়াশিংটনে ফের দেখা হলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রী পাকিস্তানি কন্যা খুরশীদ হাসানের সঙ্গে। খুরশীদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কিছুদিন কাজ করেছে, তারপর পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতি নিয়ে বই লিখবে বলে গবেষণা করতে চলে এসেছে ওয়াশিংটনে, ওর দাদা পাকিস্তান দূতাবাসে উঁচু পদে বৃত। হ্যারি ট্রুম্যানের জমানায় পররাষ্ট্রসচিব ডিন অ্যাচিশনের সঙ্গে কোথায় কী সূত্রে যেন ওর আলাপ, খুরশীদকে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, তার গবেষণার কাজে পর্যাপ্ত সাহায্য করবেন। ওর দাদার বাড়ি আমাদের বাসস্থানের কাছেই, অচিরে খুরশীদ তার দাদার ওখানে যতটা সময় কাটাত, আমাদের ওখানেও ততটাই, কিংবা তারও বেশি। হল্যান্ড থাকাকালীনই খুরশীদ আমাকে তাদের বংশের-ঘরবাড়ির অনেক কথা শুনিয়েছিল। বাবা মাঝারি গোছের সরকারি কাজ করতেন দিল্লিতে, আটটি ছেলেমেয়ে, সাধু প্রকৃতির মানুষ, ধর্মভীরু, অমায়িক, সজ্জন। দিল্লিতে টোডরমল রোডে ওঁদের বাড়ি ছিল, দেশভাগের পর সবাই করাচি চলে আসেন। কিন্তু দিল্লি শহর নিয়ে খুরশীদের সমাচ্ছন্ন স্বপ্নমেদুরতা, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নানা কথা জিজ্ঞেস করতো, সরল মেয়ে, আমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিশেবে জ্ঞান করে সমস্ত-কিছু খুলে বলতো, তবে তেজি মেয়েও সেই সঙ্গে। ওর একটি কিশোরীপ্রেমের আখ্যান, এক বিদেশি তরুণের সঙ্গে, আমাকে চুপি-চুপি বলেছিল, যে-প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখ করেছি। যা হবার নয়, তা তো হতে পারে না, অতি ধর্মনিষ্ঠ সৈয়দ বংশের দুহিতা সে, বিদেশী ছেলেকে বিয়ে করার কথা কল্পনাতেও আনতে পারে না। ছেলেটি ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে যায়। তবে তাদের মধ্যে পত্র-বিনিময় চলতেই থাকে, তাতে খুরশীদের হৃদয়-দৌর্বল্যের উপশম না হয়ে তা বেড়েই চলে, প্রায়ই আমার কাছে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্না, 'আমার কী গতি হবে'।

ওয়াশিংটনে খুরশীদের সঙ্গে যখন ফের দেখা, জানতে পেলাম সেই কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে, ছেলেটি কী অসুখে ভুগে অতর্কিতে মারা গেছে। সেই শোক অনেকটা সে সামলে উঠেছে, কিন্তু সমস্যা, মনের ভার লাঘব করবার মতো মানুষ তার কাছে-পিঠে আদৌ নেই, আমাদের সঙ্গে ওয়াশিংটনে আবার দেখা হওয়াতে যেন খানিকটা স্বস্তি পেল। ইতিমধ্যে সাত-আট বছর গড়িয়ে গেছে, সে এখন সম্ভ্রান্ত বয়স্কা তরুণী, ভারত-পাকিস্তান সমস্যা নিয়ে আমাদের মধ্যে মাঝে-মধ্যে একটু খুনসুটি হয়, তবে সে-সব ছাপিয়ে খুরশীদের সারল্য উপচে ওঠে।

এরই মধ্যে শচীনদা সানফ্রান্সিসকোতে এক সম্মেলনে যোগ দিতে আমেরিকা এলেন। আমারও সেই সম্মেলন উপলক্ষ্যে পশ্চিম উপকূলের ওই মোহ-মাখানো শহরে উড়ে যাওয়া। সম্মেলন তো ছুতো, শচীনদার উপস্থিতি মানেই অহোরাত্র আড্ডা, দিনকে রাত করা আড্ডা, রাতকে দিন করা আড্ডা। মার্কিন দেশের বিদ্বজ্জন মহলেও ইকনমিক উইকলি নিয়ে প্রশংসার বন্যা, যে-বন্যায় অবগাহিত হতে শচীনদার বিন্দুমাত্র সংকোচ বা দ্বিধা নেই। সম্মেলনান্তে তিনি ক্রমান্বয়ে এ-শহর থেকে ও-শহর, ও-শহর থেকে সে-শহর, ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সবখানে তাঁর অনুরাগীজন, তাঁকে নিয়ে সভা-সম্মানপ্রদর্শনের অন্তহীন আয়োজন। হঠাৎ ফিলাডেলফিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন, অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন দেখা দিল, হাসপাতাল

থেকে বেরিয়ে সোজা ওয়াশিংটনে আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে, তাঁর শরীর তখনও দুর্বল, তবু তাঁকে ঘিরে আমাদের সত্যিই আনন্দনিষ্যন্দ আকাশ। ওয়াশিংটন উজাড় করে তাঁর অনুরাগী-অনুরাগিণীরা—অধ্যাপক-ছাত্র-গবেষক-প্রশাসক-কূটনীতিবিদ—দেখা করতে এলেন, কয়েকটা দিন আমাদের অফুরন্ত উত্তেজনার মাদকতায় কাটলো। একজন-দু'জন মার্কিন মহিলা, তখনই টের পাচ্ছিলাম, তাঁকে গাঁথবার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু ক্রান্তিমুহূর্তে চৌধুরী-ভ্রাতাদের আত্মরক্ষার আশ্চর্য প্রতিভা।

আক্রমণাত্মক মার্কিন মহিলাদের উল্লেখে অন্য একটি কাহিনী মনে পড়লো। সাতান্ন-আটান্ন সালে জনৈকা মার্কিন তরুণীকে কলকাতা এবং দিল্লিতে বহুবার এর-ওর-তার বাড়িতে দেখেছি। চোখে-মুখে কথা বলে, নাম গ্লোরিয়া স্টাইনাম। কলকাতা থেকে প্রথমবার আমেরিকাগামী প্লেনে চাপবো, মেয়েটির এক কলকাতাস্থ অনুরাগী, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, গ্লোরিয়ার কাছ থেকে অনুরোধ পেয়েছেন, ওর জন্য যেন একজোড়া হীরেমণিমাণিক্য-খচিত সোনার বালা পাঠিয়ে দেওয়া হয়, আমরা কি দয়া করে সঙ্গে নিতে সম্মত আছি। মদন-শর-বিদ্ধ বন্ধুর অনুরোধ, ঠেলি কী করে? ওয়াশিংটনে পৌঁছে ওর দিদির বাড়িতে গ্লোরিয়াকে ফোন করলাম, সে ত্বরায় ছুটে এলো, বালাজোড়া দেখে মহা খুশি হয়ে আমার দু' গালে চুমো খেল। ওর সঙ্গে আমেরিকায় আর তেমন দেখা হয়নি, দেশে ফিরে আসার কয়েক বছর বাদে হঠাৎ কাগজে পড়ি গ্লোরিয়া স্টাইনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় বিখ্যাততমা মহিলা, জ্যাকেলিন কেনেডির ঠিক পরেই, সে নাকি ওদেশে নারীবাদী আন্দোলনের পয়লা নম্বর নেত্রী। একটু ভয়ে-ভয়ে আছি, তার একদা-অলঙ্কার আসক্তির সংবাদ এখানে ফাঁস করলাম বলে, ভারতবর্ষের নারীবাদিনীরা আমার মাথা কাটতে আসবেন না তো!

চোদ্দো

যদিও শচীনদার পাশাপাশি দেবুদা ও হিতুবাবুর প্রসঙ্গ ইতিমধ্যে উত্থাপন করেছি, চতুর্থ ভ্রাতা স্বনামখ্যাত ভাস্কর শঙ্খ চৌধুরীর কথা এই বৃত্তান্তে এখন পর্যন্ত অনুচ্চারিত। নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তাঁর ছোটো ছেলের নাম কী ভেবে নরনারায়ণ রেখেছিলেন তা নির্ণয় করা মুশকিল, তবে সন্তানটি স্বয়ং নিশ্চয়ই গোড়া থেকেই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলেন, তাই প্রথম সুযোগেই নিজের ডাকনামটি পোশাকি নামে রূপান্তরিত করে নেন। প্রথম এবং তৃতীয় ভ্রাতার মতো শঙ্খ চৌধুরীরও অসম্ভব খেয়ালি চরিত্র, যা পুরোপুরি শিল্পীজনোচিত। শচীনদা যেমন খেয়ালের বশে তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে, বৃত্ত থেকে বৃত্তান্তরে, এক বৃত্তি থেকে অন্য বৃত্তিতে, এক আড্ডা থেকে অন্যতর আড্ডায় সতত বিহার করে বেড়িয়েছেন, হিতুবাবু যেমন একটি ব্যবসা ছেড়ে অন্য ব্যবসার ছক কেটেছেন, পরমুহূর্তে দ্বিতীয়টি ছেড়ে তৃতীয় উদ্যোগের আবর্তে ভিড়ে গিয়েছেন, কিংবা চলচ্চিত্রের এই নায়িকাকে তাঁর স্বপ্নালু চোখের ইশারায় ডুবিয়ে চকিত মুহূর্ত অতিক্রান্ত হলে দ্বিতীয়া কোনও নায়িকার মনোহরণ করেছেন, শঙ্খবাবুও তেমনই ছুটোছুটিতে সদা মত্ত। প্রতিভা বহুমুখী ধারায় উপচে পড়ছে, অনেক বছর পর্যন্ত, ভদ্রলোক এমনকি স্থির করতে পারেননি গান গাইবেন কি ছবি আঁকবেন কি স্থাপত্য গড়বেন। তাঁর বহুগুণবতী স্ত্রী ইরা, খাঁটি পার্শি পরিবারের মেয়ে, তবে শান্তিনিকেতনে বেড়ে-ওঠার ফলে ও চৌধুরীদের সঙ্গে সংশ্লেষণে তাঁর জাতিকাকাহিনী প্রায় পাথর-চাপা পড়েছে। ইরা শক্ত করে রাশ না-ধরলে শঙ্খবাবু, আমার সন্দেহ, বরাবরই হায়-গৃহহীন-হায়-পথহারা অবস্থায় পড়ে থাকতেন। শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থায় তাঁর উড়নচণ্ডী কাহিনী এখনও কিংবদন্তীর অঙ্গ হয়ে আছে। প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ, এই তিন ভাইয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বরাবরই আলাদা করে নিরূপণ করা যেত, তা হলেও কোথাও তিনজনেরই প্রকৃতিতে একটু সন্ন্যাসী-মনস্কতার সাযুজ্য। একমাত্র দ্বিতীয় ভ্রাতা, দেবুদা, সমান স্নেহশীল, সমান আড্ডাপ্রিয়, অথচ স্থিতধী, কোনওদিনই পাগলাটেপনায় ভোগেননি। সেজন্যই হয়তো ব্যবসায় সফল হতে পেরেছিলেন।

তাঁদের চার বোনের কথাও এখানে সামান্য উল্লেখ করি, নইলে পরে হয়তো আর সুযোগ ঘটবে না। বড়ো বোন শান্তি, শচীনদার ঠিক পরে, কিশোরী বয়সে গয়া শহরের সুপ্রাচীন বারেন্দ্র পরিবারে, পদবী খাঁ, বিবাহিতা, তারপর তিনি আর বাংলাদেশে তেমন ফেরেননি, গয়াতেই জমাটি সংসার। ভাইয়েরা-বোনেরা তাঁর কাছে মাঝে-মাঝে গিয়ে থেকে এসেছেন, তিনি নিজে খুব কমই ভাইদের বা বোনেদের সংসারে বিহার করে গেছেন। মাত্র একবার-দু'বারই তাঁকে মুম্বইতে চার্চিল চেম্বার্সে অথবা কলকাতায় সামান্য কিছুদিন কাটাতে দেখেছি। তাঁর নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই, শান্তিদি যেখানেই থাকুন শান্তি-আমন ছড়াতেন-ছিটোতেন, সেই সঙ্গে স্নেহের ফল্গুধারাও। দ্বিতীয় বোন ধরিত্রী, আমরা কমলাদি ডাকতাম, মণীশ ঘটকের সহধর্মিণী, ঋত্বিক ঘটকের বউদি, মহাশ্বেতা দেবীদের জননী, ছোটোখাটো মহিলাটি

মৃদুভাষী, সর্বংসহা। জীবনে কত শোকতাপ সহ্য করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। এক খেয়ালকুঞ্জ থেকে বিয়ের পর অধিকতর খেয়ালি, কিন্তু একই গ্রামের, ঘটককুলে তিনি নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। ঘটকদের প্রতিভার পরিসীমা নেই, তবে তাঁদের উদ্‌ভ্রান্তিউন্মুখতাও সীমাহীন। কমলাদি নিজেও এক সময়ে একটু-আধটু লিখতেন, সংসারের তাড়নায় সেই প্রবণতা উবে যায়, তারপর সারাজীবন একটির পর আর একটি সংকট ও শোকের মধ্য দিয়ে দিনাতিক্রম করেছেন। শেষের কয়েকটি বছর দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন, পৃথিবী সম্পর্কে তবু তাঁর কোনও দিন ন্যূনতম ক্ষোভ ছিল না, সমস্ত সত্তা থেকে করুণা উপচে পড়তো। তা হলেও একটি কৌতুকস্মৃতির কথা বলি। মাত্র একবারই কমলাদিকে সামান্য ধৈর্য হারাতে দেখেছি। শচীনদাকে সঙ্গ দিতে কয়েক সপ্তাহ মুম্বইতে চার্চিল চেম্বার্‌সে কাটাচ্ছেন, আমরাও তখন ওখানে। একদিন, সন্ধ্যা ঘন হয়ে এসেছে, ইকনমিক উইকলি-র দফতর থেকে শচীনদা আদরের বোনকে টেলিফোন করলেন, ঘণ্টা দেড়েক বাদে বাড়ি ফিরবেন, সঙ্গে আট-ন'জন থাকবেন, তাঁদের সকলের নৈশাহারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কমলাদি নিঃশব্দে শুনলেন, ফোনটা জায়গামতো রেখে দিলেন, আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বললেন, 'থাকতো বাড়িতে বউ, মজা বুঝিয়ে দিত'। তবে কমলাদি জাদুকরী মহিলা, দেড়ঘণ্টা-দু'ঘণ্টার মধ্যেই ষোড়শোপচার তৈরি করে অতিথিদের সামনে সাজিয়ে দিলেন।

তৃতীয় ভগ্নী, শকুন্তলাদি, বৃটিশ আমলের সিভিলিয়ান রঞ্জিত রায়ের স্ত্রী। মানুষের জীবনের মোড় হঠাৎ কীরকম ঘুরে যায়, শকুন্তলাদি, প্রথম জীবনে লীলা রায়ের অন্ধ ভক্ত ছিলেন, দীপালি সঙ্ঘ-শ্রীসঙ্ঘে তদ্‌গতপ্রাণা, লীলাদি যখন কারান্তরালে, অত্যন্ত সুষ্ঠুতার সঙ্গে 'জয়শ্রী' পত্রিকা পরিচালনা করেছেন, কোনও উপলক্ষ্যে রঞ্জিতবাবুর সঙ্গে দেখা হলো, পরিচয় থেকে অনুরাগ, অনুরাগ থেকে বিবাহ। আমার এখনও মাঝে-মাঝে প্রশ্ন জাগে, শকুন্তলাদি কি মেনে নিতে পেরেছিলেন এই পট-পরিবর্তন, তিনি কি সুখী হয়েছিলেন : বাইরে থেকে তো বোঝবার কোনও উপায় ছিল না। শকুন্তলাদির জ্যেষ্ঠা কন্যা, শাওন, ভালো নাম ইন্দ্রাণী, ইতিহাসের অত্যন্ত প্রতিভাময়ী ছাত্রী। ওরকম সুন্দরী, শান্তস্বভাবা, বিনতবাক্‌ নারী আমি কদাচ দেখেছি, হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ তাকে উজাড় করে দিয়েছিলাম। প্রায় কুড়ি বছর হতে চললো, সে মৃতা।

শচীনদাদের সর্বকনিষ্ঠা বোন স্বপ্নময়ী, কুচিদি, অন্য তিন বোনের মতো তিনিও এখন বিগতা, শিল্পনিপুণা, নৃত্যকুশলা ও বাক্‌বিদগ্ধা হিশেবে শান্তিনিকেতনে তাঁর খ্যাতি উপচে পড়তো। জনশ্রুতি, কোনও ঋতুতে রামকিঙ্কর বেইজ তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবে এখানেও তো যা হবার নয় তা হয় না। কুচিদির কন্যারাও আমাকে অনেক আনন্দের দিনে সঙ্গ দিয়েছে, যেমন দিয়েছে তাঁদের মামাতো-মাসতুতো ভাই-বোনেরা। আমার সংজ্ঞায় যা বৃহৎবৃত্ত চৌধুরী পরিবার, তার প্রসাদ না-পেলে আমি যা হয়েছি তা অনেকটাই হতে পারতাম না।

যেবার শচীনদা সানফ্রান্সিসকোয় সেই সম্মেলনে এলেন, বৈঠকান্তে কিছুদিন মার্কিন দেশের নানা প্রান্ত চষে বেড়ালেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকনমিক উইকলি ও তাঁর অনুরাগীর ইয়ত্তা নেই, সত্যি-সত্যিই সব ঠাঁই তাঁর ঘর আছে, ঘরগুলিকে খুঁজতেও হলো না, বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকরা তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতে লাগলেন। সাংবাদিক ও কূটনৈতিক মহলেও শচীনদার কদরের সীমা নেই, সে-সব জায়গা থেকেও তাঁর আহ্বান এলো। বাঁধছাড়া প্রাণীর মতো তাঁর দিনযাপন, এই অমিত এলোমেলো বিহারের ফলে

যা হবার তাই-ই ঘটলো, ফিলাডেলফিয়া শহরে, কয়েক অনুচ্ছেদ আগে উল্লেখ করেছি, খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হলো, কিছুদিন বিশ্রামে থেকে শরীর ঈষৎ সারিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে তাঁর ওয়াশিংটনে চলে আসা, আমাদের একশয্যাকক্ষ অ্যাপার্টমেন্টে তাঁকে বন্দী করে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা আমাদের তরফ থেকে। তবে তাঁকে শাসনে রাখতে পারি সেরকম প্রতিভা যথার্থই আমার স্ত্রী ও আমার আয়ত্তে ছিল না। নিজে বেরোতে না পারেন তাতে কী, অনুরাগীর দল সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা, মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ছেঁকে আসতো, বিশ্রামের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, শচীনদা বিরাট অট্টহাস্যে আমাদের অনুযোগ উড়িয়ে দিতেন। তাঁর জীবনদর্শনও এই সুযোগে খানিকটা বুঝিয়ে দিলেন আমাদের : 'তোমাদের দু'জনেরই বাবা-মা চাকরিজীবী ছিলেন, মাসান্তে মাইনে পেতেন, জীবনে তাই শৃঙ্খলার নিগড় ছিল। আমার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অন্যরকম। আমি অল্পবিস্তর জমিজমাওলা উকিল পরিবারের ছেলে, মাঝে-মাঝে হঠাৎ-হঠাৎ জমিদারি ও ওকালতি থেকে আহৃত উপার্জনের অর্থ আসতো, আবার হয়তো কয়েক মাস কোনও অর্থাগমই নেই, সুতরাং আমাদের বাড়িতে বেনিয়মই ছিল নিয়ম। আমরা ভাইয়েরাও সেরকম প্রকৃতির হয়েছি, শুধু দেবুর কথা ছেড়ে দাও, ও ওর গিন্নির ভয়ে গৃহী হতে বাধ্য হয়েছে'। এই দুরন্ত ব্যাখ্যার কাছে আমাদের পরাভূত হতেই হতো, সুতরাং যে-কয়েক সপ্তাহ ওয়াশিংটনে ছিলেন, আড্ডার দুর্ধর্ষ শ্রোতধারা অনবচ্ছিন্ন বয়ে গিয়েছিল। আসলে শচীনদা নিজেই হেনাদির ভয়ে তটস্থ থাকতেন। হেনাদি কোমলহৃদয় তথাচ জেদি মানুষ, সকলের অতি আদরের ভ্রাতৃজায়া, অনেকদিন পর্যন্ত চৌধুরী পরিবারে একমাত্র বধু, ব্যক্তিত্বে প্রখর। সারা জীবন শচীনদাকে সহবৎ শেখাতে বদ্ধপরিকর, শেষটায় বোধহয় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন।

মার্কিনবাসের তিন বছর গড়িয়ে গেছে, বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই, তা হলেও দেশে ফেরার জন্য মন উড়ু-উড়ু। ভিয়েতনামের বীভৎস কলঙ্কময় যুদ্ধ তখনও ঠিক শুরু হয়নি, যুদ্ধের পূর্বরাগ চলছে, তবে অন্য একটি অতি-তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি আজও মনে গেঁথে আছে। বাষট্টি সালের অক্টোবর মাস, ছাত্রদের নিয়ে আমরা ইনস্টিটিউটের কয়েকজন অধ্যাপক টেনিসি উপত্যকা অঞ্চলে 'শিক্ষামূলক' ভ্রমণে গেছি, হঠাৎ কিউবা নিয়ে সংকট, জন কেনেডি সম্মুখসমরে আপাতপ্রস্তুত, সোভিয়েট নেতৃবৃন্দও অনড়। দু'পক্ষের দাঁত-কিড়মিড়, অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেসামরিক বিমান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ। আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য নক্সভিল শহরে আটকা পড়েছি, আমাদের ডেরা শহরের সম্ভ্রান্ততম এ্যান্ড্রু জনসন হোটেল। কিন্তু বর্ণবৈষম্যের ভূত দূর হয়নি, আমাদের সঙ্গে গুটিকয় আফ্রিকা মহাদেশীয় ছাত্র, হোটেলের ঘরে তাঁদের থাকতে বাধা নেই, কিন্তু ভোজনকক্ষে নাকি ঢোকা চলবে না। সমস্ত যোগাযোগব্যবস্থা বন্ধ, অন্যত্র যাওয়ার উপায় লুপ্ত, বাধ্য হয়ে ওই হোটেলেই রইলাম, তবে যেহেতু ছাত্রদের প্রবেশের অধিকার নেই, কেউ-ই ওখানে অন্নগ্রহণ করলাম না, অদূরবর্তী একটি স্টেক হাউসে গিয়ে দু'বেলা সস্তায় মস্ত বড়ো রসালো টি-বোন স্টেক খেয়ে চারদিনে নিজেদের ওজন প্রচুর বাড়িয়ে নিলাম। ঘটনাটির কথা আরও বিশেষ করে মনে আছে আমাদের থাকাকালীন এক ঝাঁক হলিউড অভিনেতা-অভিনেত্রীও ওই হোটেলে, জেম্‌স্ অ্যালবি-র 'এ ডেথ ইন দি ফ্যামিলি'-র চলচ্চিত্রায়ন উপলক্ষ্যে তাঁরা নক্সভিলে। পরিস্থিতি-হেতু তাঁদের কাজকর্মও বন্ধ, আমাদের মতো তাঁরাও, উদ্দেশ্যহীন, লিফ্‌ট দিয়ে নিচে নামছেন, খানিক বাদে উঠছেন, ফের নামছেন, ফের উঠছেন। হঠাৎ নিজে থেকে এগিয়ে এসে নায়িকা ইংরেজ অভিনেত্রী জিন সিমন্‌স আলাপ করলেন, তারপর

প্রতিবার করিডোরে লিফটে দেখা হলে মুচকি হাসির বিনিময়।

ওই সংকটের অবসান, কিন্তু কয়েক সপ্তাহ বাদে গভীরতর সংকট। ভিয়েতনামে তাঁদের ক্রমশ-উদ্ঘাটিত নীতির ন্যায়হীনতা নিয়ে মার্কিন পরিচিতদের সঙ্গে একটু পিঠ-চাপড়ানো ভঙ্গিতে অহরহ উপদেশাদি বর্ষণ করছি, অথচ আমরা ভারতবর্ষের মানুষজনই হঠাৎ যুদ্ধোন্মাদনায় মেতে উঠলাম। বেশ কয়েক মাস ধরেই চীন সরকারের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে মন কষাকষি চলছিল, উত্তর-পূর্ব সীমান্তে একটি ছোটোখাটো সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে যায়, তবে তা বেশিদূর তখন গড়ায়নি; বাষট্টি সালে পুরো ব্যাপারটি অন্য চেহারা নিল। ভারতবর্ষের সংসদে স্বতন্ত্র পার্টির ছাপে বেশ কয়েকজন ধারওয়ালা ব্যক্তি নির্বাচিত হয়ে এলেন। তাঁরা ঘোর নেহরু-বিরোধী, ঘোরতর প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন-বিরোধী, ঘোরতম চীন-তথা কমিউনিস্ট আদর্শবিশ্বাস-বিরোধী। সীমান্ত নিয়ে চীনের সঙ্গে বিন্দুতম বোঝাপড়াও যাতে না হয়, তার জন্য তাঁরা মুখিয়ে। একটা সময়ে জওহরলাল নেহরুও অবিবেচনার শিকার হলেন। তাঁকে খুব বেশি দোষ হয়তো দেওয়া যায় না, নিরপেক্ষ দেশগুলির অন্যতম প্রধান নেতা হিশেবে পৃথিবী জুড়ে স্বীকৃতি লাভ করেছেন, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বৈঠকে কৃষ্ণ মেননের ভয়ে সবাই তটস্থ, বিশ্বময় ভারতবন্দনা। এই বন্দনার সারাবত্তা নিয়ে কোনও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ভারতীয়দের পক্ষ থেকে করতে হয়নি, অধিকাংশ ভারতীয়ই এটা ধরাধার্য জ্ঞান করতেন যে গোটা পৃথিবী তাঁদের পায়ে লুটিয়ে পড়তে উদ্‌গ্রীব, তাঁরা যে-ফতোয়া দেবেন তা-ই সবাই মেনে নিতে বাধ্য। নেতারাও ঠিক এমনটি ভাবতে শুরু করলেন, নিজেদের এবং নিজেদের দেশের ওজন ভালো করে না বুঝে নিয়ে।

ইংরেজ প্রভুরা ঊনবিংশ শতাব্দীতে সর্বশক্তিমান, ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছেন, আফিম খাইয়ে-খাইয়ে দুর্বল ছত্রভঙ্গ চীনে জাতিকে দুর্বলতর করেছেন, তারপর গায়ের জোরে চীনের ঘাড়ে একটি সীমান্তরেখা, ম্যাকমাহোন না কী যেন নাম, চাপিয়ে দিয়েছেন। নেহরু ও তাঁর পারিষদবর্গ স্থির করলেন, সাম্রাজ্যশাসিত সীমারেখা বিপ্লবোত্তর চীনকেও মেনে নিতে হবে। চীনের নেতারা ভারতবর্ষের সঙ্গে সৌহার্দ্যের স্বার্থে তা-ও মানতে সম্মত ছিলেন, কিন্তু একটি শর্তে : উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে, আকসাই চীন এলাকায়, দেশের দূরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে গমনাগমনের প্রয়োজনে যে-রাস্তা আবহমান কাল ধরে আছে, সেটা যদি আমরা তাঁদের দখলে ছেড়ে দিই, জনমানবহীন ওই অঞ্চল, শস্যসম্ভাবনাহীনও। চীনের প্রস্তাবে রাজি হলে আমাদের ব্যবহারিক কোনও ক্ষতি হতো না, কিন্তু সামন্ততান্ত্রিকতা-সমাচ্ছন্ন চেতনা, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা, ইংরেজরা চলে গিয়েছে তাতে কী, আমরা তো আছি, ইংরেজদের দ্বারা নির্দেশিত সীমানাই বলবৎ থাকবে, কোনও যুক্তির ঘ্যানঘ্যানানি আমরা কানে তুলবো না। এই পরিস্থিতিতে এক সময় চীনের সঙ্গে আলোচনা ভেঙে গেল, আমাদের প্রধান মন্ত্রী কড়া বক্তৃতা দিলেন, তাঁর সৈন্যদের তিনি হুকুম করেছেন চীনে অনুপ্রবেশকারীদের ঘাড়ে ধরে ম্যাকমাহোন লাইনের ওপারে পৌঁছে দিতে। এবংবিধ কড়া বিঘোষণা করে জওহরলাল নেহরু সিংহলে বেড়াতে চলে গেলেন।

ভারতীয় কর্তাব্যক্তিরা ভেবেছিলেন ইংরেজদের কাছে প্রত্যক্ষ সামরিক শিক্ষা নিয়েছি আমরা, ওই চ্যাপ্টা নাকওলারা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। যুদ্ধ বাধলো, পরিণাম ভয়াবহ। চীনেরা আমাদের দু'গালে চপেটাঘাত করে অরুণাচল-অসম ধরে অনেকটা এগিয়ে এলো, তারপর তাদের একপাক্ষিক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা। আমাদের অবস্থা ভগ্নজানু, ভগ্নউরু, কুরুক্ষেত্র-ফেরত কৌরবকুলের মতো। দু'-ধরনের প্রতিক্রিয়া দেশময় ছড়িয়ে

পড়লো। প্রথম, হিন্দি-চীনি ভাই-ভাই চুলোয় গেল, পরিবর্তে চীনেদের সম্পর্কে 'হীন' শব্দটি প্রধান প্রযোজ্য বিশেষণরূপে পরিগণিত হলো, চীনে মানেই নচ্ছার, ঘৃণ্য জীব। দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া, কৃষ্ণ মেনন তথা জওহরলাল নেহরু সম্পর্কে ব্যাপক ক্ষোভ, যা সামাল দিতে কয়েকদিনের মধ্যেই প্রধান মন্ত্রীকে মন্ত্রিসভা থেকে কৃষ্ণ মেননের পদত্যাগ ঘোষণা করতে হলো। দেশ জুড়ে অভিযোগ-বিসংবাদ : কতিপয় বিশ্বাসঘাতকের অবহেলা ও ষড়যন্ত্রে আমাদের জওয়ানরা ঠিক মতো লড়তে পারেনি, তাই এই পরাজয়। তবে আমাদের মহান আর্য সভ্যতা, পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন বীর্য-শৌর্য-ঐতিহ্য, চীনের ঘৃণ্য আক্রমণের আমরা সমুচিত জবাব অতি সত্বর দেবো। প্রতিরক্ষা খাতে বেপরোয়া খরচের হার এখন থেকে আরও বাড়িয়ে যেতে হবে, তা হলেই নাকি অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। চীনেদের তরফ থেকে যে-সংঘর্ষ অতি সামান্য সীমান্তবিরোধ বলে বর্ণিত, আমাদের পরিভাষায় তা আখ্যাত হলো মহা আক্রমণ, ভারতের বিভিন্ন ভাষায় যা লব্জ হয়ে দাঁড়ালো। পরিমিতিজ্ঞানের অভাবের জন্য ভারতবর্ষীয়রা বরাবরই বিখ্যাত, অতিনাটকীয়তা আমাদের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। চীনের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষের জের তাই গোটা জাতিকে দশকের পর দশক ধরে আচ্ছন্ন করে থেকেছে। পশ্চিম বাংলায়, কলকাতায় তথা মফস্বলে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দাঁত-কিড়মিড়-করা সমরসংগীত, 'অরাতি রক্তে করিব পান', তাঁর পুত্রের গাওয়া সেই গানের রেকর্ড, দাপাদাপি করে কিছুদিন বাজানো হলো, নির্বাচনে-উপনির্বাচনে দেওয়ালে ছড়া কাটা হলো, 'গড়তে দেশ রুখতে চীন, কংগ্রেসকে ভোট দিন'। কয়েক বছর বাদে জয়পুরে, মহারাজাদের পুরনো প্রাসাদ, যাত্রীশালায় রূপান্তরিত, রামগড় প্যালেস হোটেলে কী কাজে যেন গিয়েছি, হোটেল ম্যানেজার ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে পরম সমাদরে আমাকে আদ্যোপান্ত দেখাচ্ছেন, একটি মস্ত স্যুইটে নিয়ে গেলেন, দেওয়ালে চীনে চিত্র, দরজায়-জানালায় ঝুলন্ত ভারি চীনে রেশমের পর্দা, চীনে স্থাপত্যের বিবিধ নমুনা, কিন্তু, কুছ পরোয়া নেই, অকম্পিতচিত্ত ম্যানেজার সগর্বে জানালেন, 'এই স্যুইটকে আমরা আগে বলতাম চীনে কক্ষ, এখন বলি দূরপ্রাচ্য কক্ষ।'

চীনের সঙ্গে হামলা বাঁধার পর মাত্র মাস তিনেকই আমেরিকায় ছিলাম, কিন্তু কিছু মুশকিলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। এগারো হাজার মাইল দূরে মাতৃভূমি, তা বিদেশী দুশমন দ্বারা 'আক্রান্ত', ওয়াশিংটনস্থ ভারতীয় বন্ধুবান্ধব রাতারাতি উগ্র-অন্ধ দেশপ্রেমিক বনে গেলেন। যুদ্ধ নিয়ে সামান্য ঠাট্টা-মস্করা করতে গিয়ে অনেকের সঙ্গেই মন-কষাকষি, কেউ-কেউ সাময়িক কথা বন্ধ করে দিলেন। ইতিমধ্যে দেশ থেকে খবর পাচ্ছি, পরিচিত অনেকেই বিনা বিচারে আটক হয়েছেন, আমার মন খারাপ: দেশ জুড়ে অতি ভয়ংকর জাত্যান্ধতা।

একদিন পরিচিতদের মধ্যে কে কে ধরা পড়েছেন তার ফিরিস্তি জানবার চেষ্টা করছি, এক দয়াবতী মহিলা আমার পাশে এসে বসে সান্ত্বনা জানালেন, 'তুমি মনখারাপ কোরো না, ভালোই হয়েছে ওঁরা গ্রেফতার হয়েছেন, প্রাণে বেঁচে গেলেন, তা না হলে ওই কমিউনিস্টদের লোকেরা ছিঁড়ে-ফেঁড়ে খেত'। অবশ্য এই পর্বেই কমিউনিস্ট পার্টির দু' ভাগ হয়ে যাওয়ার উদ্যোগ শুরু।

ওয়াশিংটন থেকে যেবার জ্যামাইকা গিয়েছিলাম, ক্রিকেটে আমার দুরন্ত আগ্রহ, ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে ইনিংস-শুরু-করিয়ে অ্যালান রে-র সঙ্গে পরিচয় হলো, তিনি আমাকে খুব যত্ন করে কিংসটন ক্রিকেট মাঠ তথা প্যাভিলিয়ান ঘুরিয়ে দেখালেন। আমি তখন থেকেই সি. এল. আর. জেমস-এ নিমজ্জিত, তাঁর রচনাদি ছেনে ক্রিকেটের সঙ্গে জাতীয়তাবাদ ও সাম্যবাদের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আবিষ্কার করে মোহিত হচ্ছি, ক্যারিবিয়ান অঞ্চল নিয়ে আগ্রহ

গভীর থেকে গভীরতর। ওয়াশিংটনে থাকাকালীনই গায়নার জননায়ক ছেদি জগন একবার ঘুরে গেলেন। কিছুদিন আগে তিনি গায়নায় ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন, ইংরেজরা তাঁদের চিরাচরিত প্রথায় ভাগ-করে-শাসন-করো নীতি প্রয়োগ করে ওই রাষ্ট্রে, সাময়িকভাবে হলেও, ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ সম্প্রদায়ের বিসংবাদ খুঁচিয়ে তুলতে সাফল্য অর্জন করেছে। ছেদি জগন আপাতত ক্ষমতাচ্যুত, তাঁর দল দ্বিখণ্ডিত, আমাদের ছাত্র গায়নার এক বড়ো আমলার সঙ্গে এসে ঢালাও আড্ডা দিয়ে গেলেন, পৃথিবীর সর্বত্র শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত জনগণের সমস্যা নিয়ে অনেক কথা হলো, সামগ্রিকভাবে লাতিন আমেরিকার সমস্যা নিয়েও। বেশ কয়েক বছর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল।

চীনের সঙ্গে গোলমাল ঘটার অনেক আগেই মনস্থির করে ফেলেছি, দেশে ফিরবো, ফিরবোই। কলকাতায় ফেরার জন্য একটি আলাদা মনোবাঞ্ছা পুঞ্জিত ছিল। হঠাৎ দেশ থেকে কে টি চণ্ডী নামে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। নামে চিনতাম, হিন্দুস্থান লিভারের প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টরদের অন্যতম, আইন বিশেষজ্ঞ, তাঁর ব্যক্তিগত প্রাচীন ইতিহাসের খানিকটাও আমার জানা ছিল। ভদ্রলোক লন্ডনে ছাত্রাবস্থায় ঘোর কমিউনিস্ট ছিলেন, কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে ইন্ডিয়া লিগ করতেন, পাশাপাশি হ্যারি পলিট-রজনী পালমা দত্তদেরও শিষ্য, ভারতীয় ছাত্রদের কত দ্রুত লালে লাল করে ফেলা যায় তা নিয়ে চণ্ডীর উদয়াস্ত শ্রমসাধনা। হয় পরমেশ্বর হাকসার নয় জ্যোতি বসুর মুখে শুনেছি, লন্ডনে তখন যাঁরা সাম্যবাদসাধনা করতেন, তাঁদের মধ্যে চণ্ডীর গলার টাই সব চেয়ে উগ্র লাল।

সব পাখিই ঘরে ফেরে, চণ্ডীর মতো বেশ কয়েকজনও দেশে ফিরে গৃহপালিত শাবক বনে যান, লিভারের মতো বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে উঁচু পদের কাজ সংগ্রহ করে সুখী, সম্ভ্রান্ত জীবনযাপন। তবে ঈষৎ বিবেক দংশন, চণ্ডী মুম্বই শহরে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন, তাঁদের পয়সা-কড়িও জোগাড় করে দিতেন, যে-বন্ধুরা কমিউনিস্ট থেকে গেছেন তাঁদের সঙ্গে, অন্তত প্রথম দিকে, তাঁর মেলামেশা অব্যাহত ছিল। দু'-দু'বার কৃষ্ণ মেনন মুম্বই থেকে লোকসভার নির্বাচনে জিতেছিলেন, চণ্ডী তাঁর বয়স্যদের নিয়ে প্রাক্তন গুরুর হয়ে প্রচুর খেটেছিলেন।

হিন্দুস্থান লিভার থেকে শিগগিরই অবসর গ্রহণ করছেন, কেন্দ্রীয় সরকার আহমেদাবাদ ও কলকাতায় দুটো ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করবার উদ্যোগ নিচ্ছেন, কলকাতাস্থ ইনস্টিটিউটের জন্য চণ্ডী ডিরেক্টর মনোনীত হয়েছেন, তিনি মার্কিন দেশ সফরে এসেছেন নানা বিশ্ববিদ্যালয়-উচ্চ বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান ঘুরে তাঁর ইনস্টিটিউটের জন্য শিক্ষক সংগ্রহের তাগিদে। ছাত্রাবস্থায় লন্ডনে থাকাকালীন ড্যানিয়েল থর্নারের সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব, যা আজীবন অটুট ছিল, হয়তো থর্নারের কাছেই আমার কথা শুনেছেন, নয়তো অন্য কারও সূত্রে, ওঁর ভীষণ আগ্রহ আমার সঙ্গে দেখা করার। ক'দিন ধরে আমার শরীরে জলবসন্তের গুটি বেরিয়েছে—মার্কিন দেশটা মাটির, সেখানেও জলবসন্ত হয়—, আমি ওঁকে আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসা থেকে নিরস্ত করার অনেক চেষ্টা করলাম, চণ্ডী আসবেনই। দীর্ঘক্ষণ কথা হলো, অনেক সুবিধাদির আশ্বাস দিলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় নয়, ম্যানেজমেন্ট তত্ত্বে আমার আদৌ বিশ্বাস বা আগ্রহ নেই, কিন্তু আমরা কলকাতায় স্থিত হতে ব্যগ্র, স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম, পরীক্ষা করে দেখাই যাক না দু'-এক বছরের জন্য। চণ্ডী জলবসন্তের গুটিকার ছোঁয়া এড়িয়ে প্রসন্ন চিত্তে ফিরে গেলেন কলকাতায়, বরানগরের মরকতকুঞ্জে সদ্যস্থাপিত ইনস্টিটিউটে। পরের বছর পয়লা মার্চ যোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে

আবদ্ধ রইলাম।

জানুয়ারির মাঝামাঝি মার্কিন দেশ ছেড়ে ঢিমে-তালে দেশে প্রত্যাবর্তন, বিলেতে সপ্তাহখানেক, ফরাশি দেশে দিন দশেক, সুইৎজারল্যান্ডে কয়েকটা দিন, ইতালিতে আরও কয়েকটা, তারপর জেনোয়া থেকে লয়েড-ট্রিস্টিনোর জাহাজে চেপে মুম্বইমুখো। থর্নাররা ততদিনে প্যারিস চলে এসেছেন, ড্যানিয়েলের উপরোধে সরবনে একটা-দুটো ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা; সব জায়গাতেই প্রচুর বন্ধুবান্ধব ছড়ানো, দেশে ফেরার আগে দেড়মাস নিরবচ্ছিন্ন আড্ডার প্রবাহ। জেনোয়া থেকে মুম্বই যাত্রাপথে 'ভিক্টোরিয়া' জাহাজের এক রাত্রির জন্য করাচি বন্দরে অবস্থান। খুরশীদ করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা, ওঁর বাবা শহরে মস্ত বাড়ি তুলেছেন, বাবা-মা-ভাই-বোনে গমগম সুখী সংসার। আমাদের বন্দর থেকে গ্রেফতার করে বাড়ি নিয়ে গেল, বাবা-মা-ভাই-বোনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। খুরশীদের বাবা-মা দুজনেরই স্নেহ ও সৌজন্যের নির্ঝরে আমরা অভিভূত। ব্যবসাদার সপ্রতিভ এক ভদ্রলোককে খুরশীদের ফাইফরমাস খাটতে দেখলাম। দু'মাস বাদে কলকাতায় ওর চিঠি পেয়ে জানলাম, সেই রাজা হায়দারকেই সে শাদি করছে।

মুম্বইতে অবতরণ, চার্চিল চেম্বারস, ইকনমিক উইকলি-র আড্ডা, শচীনদার সম্মোহ। আতিথ্যে-স্নেহবিলোনোয় ন্যূনতম ত্রুটি নেই, কিন্তু খাজনা দিতে হতো, প্রায় প্রতিদিন ইকনমিক উইকলি-র জন্য বসবার ঘরের এক কোণে বসে সম্পাদকীয় রচনা তৈরি করা; এখন বুঝতে পারি সেরকম লেখা-লেখা খেলাতে মজানো হয়েছিল বলেই শেষ পর্যন্ত লেখকবৃত্তিতে খানিকটা উত্তীর্ণ হতে পেরেছি।

অবশেষে কলকাতা, চীনকে যুদ্ধে আহ্বানের জের তখনও চলছে, কেন্দ্রীয় বাজেটে বিস্ফারিত ঘাটতি, সমস্ত জিনিশপত্রের মূল্যমান ঊর্ধ্বগামী, প্রধান বিরোধী দল কমিউনিস্ট পার্টির বহু নেতাই যেহেতু কারারুদ্ধ, প্রতিবাদ-আন্দোলন স্তব্ধ, যে-কমিউনিস্টরা বাইরে আছেন তাঁরা অনেকেই সরকারকে তোয়াজ করতে সদা ব্যস্ত। দেশে ফেরার মাস দুয়েকের মধ্যে কী কাজে মধ্যে দিল্লি যেতে হয়েছিল, রাতের বিমানে কলকাতা ফিরছি। তখন নিশীথ বিমানডাকের পত্তন হয়ে গিয়েছে : দিল্লি-মুম্বই-কলকাতা-মাদ্রাজ থেকে চারটি বিমান ডাক নিয়ে মধ্যরাতে নাগপুর পৌঁছুতো, নাগপুরে চার শহরের ডাক বিনিময়-প্রতিবিনিময় করে যথাযথ বিমানে বস্তাবন্দী করা হতো, প্রত্যূষে বিমানগুলি নির্দিষ্ট শহরে ফিরতো। দিল্লি থেকে আমার সহযাত্রী এক বিখ্যাত সাংবাদিক, একদা-অধ্যাপক ও কমিউনিস্ট, তাঁর স্ত্রী সে সময় সংসদে পশ্চিম বাংলা থেকে নির্বাচিত সদস্যা, ভদ্রমহিলাও মুম্বই না মাদ্রাজ থেকে কলকাতা ফিরছিলেন, নাগপুর থেকে তাই আমরা এক সঙ্গে দমদম পৌঁছুলাম, গাড়ি করে তাঁদের বালিগঞ্জের বাড়িতে পৌঁছে দিলাম। তাঁরা দু'জনেই কট্টর দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট, কয়েক সপ্তাহ আগে বাঁকুড়া জেলায় বিধানসভার একটি উপনির্বাচন হয়েছে, তাতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল, ভূপেশ গুপ্ত নির্বাচনপ্রচারে গিয়েছিলেন। অনেক ভোটে কমিউনিস্ট প্রার্থী পরাজিত হয়েছেন, সাংসদ মহিলা আমাকে সুতীব্র কণ্ঠে জানালেন, এই বিপর্যয়ের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ভূপেশবাবু, তিনি প্রচারে গিয়ে প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি জানিয়েছেন, এর চেয়ে বড়ো অবিমৃষ্যকারিতা কিছু হতে পারে না। আমি নির্বাক হয়ে শুনলাম, কমরেডদের বন্দিত্ব থেকে মুক্তির দাবি জানানো কমিউনিস্ট নেতার পক্ষে মস্ত অকর্তব্য, এই প্রজ্ঞালাভের সঙ্গে আরও নানা দিকেও জ্ঞানের শলাকা উদ্দীপিত হলো।

বেকার সমস্যা ক্রমবর্ধমান, মূল্যমান চড়ছে, আন্দোলন স্তব্ধ, হাজার-হাজার রাজনৈতিক কর্মী বন্দী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, আর আমি কচিকাঁচাদের 'বাক্সওয়ালা' জীবনে পৌঁছে দেওয়ার ব্রত নিয়ে মাস্টারিতে যোগ দিয়েছি। এরকম স্ববিরোধিতা নিয়েই আমাদের ভারতবর্ষ। উঠতি ম্যানেজারদের পড়ানোর গ্লানি থেকে সামান্য রেহাই পেতে সপ্তাহে একদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে, মরকতকুঞ্জের প্রায় লাগোয়া যার অবস্থান, পড়াতে যেতাম, তাতে চিত্ত ভরতো না। স্বীকার করতে হয়, চণ্ডী কথার খামতি করেননি। পর্যাপ্ত বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করেছেন আমার জন্য, সেই সঙ্গে মধ্য-দক্ষিণ কলকাতায়, হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটে, মিন্টো পার্কের গা-ছোঁয়া চমৎকার বিশাল সরকারি ফ্ল্যাটের উপচার : অনেকগুলি ঘর, দক্ষিণে পার্কের পুকুর, গাছপালা, লিফট নেই, হেঁটে উঠতে হয়, কিন্তু চারতলাই শেষতলা বলে সিঁড়ি বেয়ে উঠে ছাতটার পুরো অধিকারও আমাদের।

ম্যানেজমেন্ট শাস্ত্রে আমার বরাবরই প্রবল অনীহা, যতই বছর গড়িয়ে গেছে, অর্থশাস্ত্র সম্পর্কেও প্রায় সমান বীতরাগ জন্মেছে। যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, পড়াতে আমার ভালোই লাগতো, এবং পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ সঞ্চার করতে মোটামুটি সফল হতাম, তবে অর্থনীতিবিজ্ঞান এত দ্রুত গত পঞ্চাশ বছরে চেহারা-চরিত্র পাল্‌টেছে, এবং এত বেশি গণিতভিত্তিক হয়েছে, যা আমাকে ক্রমশ তিতিবিরক্ত করে তুলছিল। একটি কিম্ভূত সূত্র কল্পনা করে, তার অবয়বে আরও আজব শাখাপ্রশাখা জড়িয়ে, প্রচুর অঙ্কের কণ্ডূয়ন সম্ভব, অনেক উদ্ভট সিদ্ধান্তেও পৌঁছুনো সম্ভব, কিন্তু আসল পৃথিবীর সমস্যাদির সঙ্গে এ ধরনের চর্চার সম্পর্ক অতীব ক্ষীণ। একটু-একটু করে আমার সন্দেহ গাঢ়তর হয়েছে, অসফল পদার্থবিজ্ঞানী বা গাণিতিকরা নতুন রোমাঞ্চের সন্ধানে অর্থনীতির প্রাঙ্গণে ইদানীং বেশি করে উপনীত হচ্ছেন, কোনও ছুতো ধরে পৃষ্ঠার-পর-পৃষ্ঠা জুড়ে অঙ্ক কষছেন, বাহবা কুড়োচ্ছেন, কম্পিউটার যন্ত্রের প্রসারের ফলে এধরনের ব্যসনে এখন ডাল-ভাতের মতো। কিন্তু এই গোছের অঙ্ককেলির সামাজিক সার্থকতা, জোর গলাতেই বলবো, প্রায় শূন্য। আরও যা সমস্যা দেখা দিয়েছে, অর্থনীতিবিদরা অনেকে একটি বিশেষ মুদ্রাদোষের শিকার হয়েছেন, তাঁরা জানেন বাস্তব জগতের সমস্যাদি গাণিতিক উপপাদ্যের মতো একমাত্রিক বা সহজ নয়, যে কোনও দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থব্যবস্থায় তথা বহির্বাণিজ্যে নানা জটিলতা ও অসামঞ্জস্য জড়ানো। যেহেতু অর্থনীতিবিদরা এই অনিশ্চিত অর্থব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারেন না, ধরে নেন আসল পৃথিবীর চেহারা যাই-ই হোক না কেন, তাঁরা কতিপয় অদ্ভুত-কিম্ভূত শর্তের উপর নির্ভর করে বিবিধ সিদ্ধান্তে পৌঁছুবেন : বাস্তবকে উপেক্ষা না করলে পণ্ডিতি ঠিক ফলানো যায় না। বরাবরই মনে হয়েছে এটা ছেলেখেলা, মেধা ও সময়ের অপচয়, শুধু তা-ই নয়, সমাজসুদ্ধু সবাইকে বিপথে পরিচালনা। তবে সেই যে মার্কস কবে মন্তব্য করে গিয়েছিলেন, সমাজব্যবস্থার চুড়োয় যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের মতামতই সর্ব মুহূর্তে গোটা সমাজের নিদান বলে মেনে না-নিয়ে উপায় নেই। গত দশ-বারো বছরের ঘটনাবলীর পরিণামে এখন মার্কিন প্রভুরা গোটা পৃথিবীর উপর মোড়লি করছেন, তাঁরা ভাণ করেন মুক্ত না কি অবাধ প্রতিযোগিতাই বসুন্ধরার সার সত্য, যদিও বাস্তবে আদৌ তা নয়। এই ভাণ নিষ্কাম সাধনা নয়, তা থেকে আখেরে পুঁজিপতি-ব্যবসাদারদের অঢেল সুবিধা। মার্কিন প্রভুরা তাঁদের তত্ত্ব আমাদের উপর চাপাচ্ছেন, দেশোয়ালি কর্তাব্যক্তিরা বিগলিত, সাধারণ মানুষের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা।

ষাটের দশকের গোড়া থেকেই, মুক্ত প্রতিযোগিতা তথা অবাধ বাণিজ্যতত্ত্ব সম্পর্কে আমি

মোহমুক্ত। প্রথম পর্বে কয়েক বছর যদিও প্রচুর গণিতচর্চার প্রয়াস করেছি, এবং অধ্যাপক টিনবার্গেনের অনুপ্রেরণায় ভেবেছি যে অঙ্কের মধ্যবর্তিতাতেই অর্থব্যবস্থার খোল-নল্চে পরিবর্তন সম্ভব, নেশা কাটাতে তেমন সময় লাগেনি। ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের প্রথাগত অর্থনীতিতে রপ্ত করাবার চেষ্টা করতাম, অথচ সঙ্গে-সঙ্গে এটাও বুঝতাম, এক ধরনের অসাধুতার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করছি। এই উপলব্ধিহেতুই সম্ভবত নিজেকে খুব বেশিদিন অর্থশাস্ত্র অধ্যাপনার গণ্ডিতে টিকিয়ে রাখতে পারিনি।

ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে ঢোকবার অন্যতম সুফল বা কুফল, কার্যসূত্রে এন্তার শিল্পপতি-ব্যবসাদারদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়, বেসরকারি মালিকানায় ম্যানেজাররূপে বৃত আছেন এমন অনেকের সঙ্গেও। কলকাতার ইনস্টিটিউটে তো পড়াতে হতোই, তা ছাড়া নানা সময়ে মুম্বই-বাঙ্গালোর-চেন্নাই-দিল্লি-শ্রীনগর ইত্যাদি শহরে শৌখিন পাঁচতারা হোটেলে স্বল্পমেয়াদি পাঠক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাক্সওলাদের কাছে বক্তৃতা দেওয়া। ভারতীয় অর্থব্যবস্থা যাঁদের কব্জায়, তাঁদের মতামত-মানসিকতা চাল-চলনের আঁটঘাট একটুতেই জানা হয়ে গেল। আমার শ্রদ্ধা বাড়লো না, বরং কমলো। এঁরা অবাধ প্রতিযোগিতার মন্ত্রে গভীর আস্থা রাখেন, কিন্তু তা তোতাপাখির চিরাচরিত বয়ানের অভ্যাস। আসলে এঁরা সর্বদাই চান সরকার তাঁদের সব-কিছু যুগিয়ে দেবেন, তারপর তাঁরা তেড়ে-মেরে ডাণ্ডা যাবতীয় বাধাবিঘ্ন করে দেবেন ঠান্ডা। ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন পাঠক্রমে কিছু-কিছু সরকারি শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থার ম্যানেজাররাও যোগ দিতেন, সুতরাং দুই শরিকের ম্যানেজারদের গুণাবলীর তুলনামূলক বিশ্লেষণের যথেষ্ট সুযোগ ঘটেছিল। যে-সিদ্ধান্তে সে সময় পৌঁছেছিলাম, তা পরিশোধনের আর দরকার হয়নি। এই চার দশক বাদেও প্রত্যয়শীল আছি, সরকারি সংস্থার ম্যানেজাররা বুদ্ধিতে, প্রতিভায় ও কর্মকুশলতায় কোনও অংশে বেসরকারি ম্যানেজারদের চেয়ে অপকৃষ্ট নন, তবে, হ্যাঁ, বেসরকারি মালিকানার ছত্রতলবর্তী ম্যানেজাররা মদ গিলতে অনেক বেশি ওস্তাদ, বেচারি সরকারি সংস্থার ম্যানেজাররা হয়তো তেমনধারা সুযোগ পেতেন না, এখনও পান না। আগেও যা ছিল, এখনও তাই, সরকার-পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পয়সাকড়ি না-ঢাললে, সরকার থেকে বরাত না-দিলে, বেসরকারি খাতেও বিনিয়োগ অবরুদ্ধগতি হতে বাধ্য, পুঁজিপতি হিশেবে বড়াই করেন যাঁরা, তাঁদের তো মুখ্য ভূমিকা পরের ধনে পোদ্দারির।

এখন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একটু বিবেকদংশনে ভুগছি, বাক্সওলাদের পড়াতে ওই ক'বছর কী পরিমাণ সময় আজে-বাজে কাজে নষ্ট করেছি, শিল্পপতি-গোছের ব্যক্তিবৃন্দের সঙ্গে অলস গল্পে, অর্থহীন খাওয়ায়-আলোচনায়, কখনও-কখনও স্রেফ তাস পিটিয়ে। তাসের নেশা বোধহয় বংশগত, নিজের বাবাকে পেশেন্স খেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহন করতে দেখেছি; আমার মধ্যেও কিছুদিন কন্ট্র্যাক্ট ব্রিজের নেশা চেপেছিল। ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে পড়ানোর চাপ থেকে অপব্যয়ের সময় অনেক বেশি, তাই সহযোগীদের সঙ্গে সকাল-দুপুর-সন্ধে তাসের আসর নিত্যকর্মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শিল্পব্যবসায়ী মহলের কেষ্টবিষ্টুদের সঙ্গেও প্রচুর খেলেছি কয়েকটা বছর, যেমন চরতরাম সম্প্রদায়ের সঙ্গে, কিংবা শান্তিপ্রসাদ জৈন ও তাঁর স্ত্রী, রামকৃষ্ণ ডালমিয়া-দুহিতা, রমা জৈনের সঙ্গে। ব্রিজের প্রতিভা দিয়ে যদি বিচার করতে হয়, ডালমিয়া-দুহিতা অতি সহজেই নিজের স্বামীকে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বিক্রি করে আসতে পারতেন। একবার শ্রীনগরে কী পাঠক্রমে পড়াতে

গিয়ে কর্ণ সিংহের সঙ্গে আলাপ, তিনি তখন ওখানকার রাজ্যপাল। ওঁর শখ হলো আমাদের কয়েকজনের সঙ্গে ব্রিজ খেলবেন বাজি ধরে। আমরা পুরনো পাপী, কর্ণ সিংহ বেচারি মানুষ : অনেক টাকা ওঁর কাছ থেকে জিতে এনেছিলাম, এতটুকু বিবেকদংশন হয়নি। তবে কর্ণ সিংহ নিপাট ভদ্রলোক; তখন থেকেই দাদা বলে সম্ভাষণ করেন, রাজ্যসভাতেও সেই অভ্যাস তাঁর বজায় ছিল।

পনেরো

কলকাতায় স্থিত হওয়ার প্রধান একটি আগ্রহ ছিল কবি-সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে বেশি করে মিলিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে বলে, সেই সঙ্গে বামপন্থী রাজনীতিক্রিয়াকর্মের সঙ্গে নিজেকে একটু-একটু সংযুক্ত করার। এখানেও এক ধরনের স্ববিরোধিতায় আমি বহুদিন ধরে আক্রান্ত। প্রথম জীবনে যে-সাহিত্যিক সুহৃদ্‌দের সঙ্গে সময় কাটাতাম, আড্ডা দিতাম, কবিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় উন্মুখর হতাম, তাঁদের মানসিকতায় তেমন বামপন্থী ছাপ ছিল না। এই পর্বে আমার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যাঁর কথা ইতিমধ্যেই একাধিকবার বলেছি, আতোয়ার রহমান, ১৯০৩ সাল থেকে পরের কয়েক বছর, 'চতুরঙ্গ' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব বলতে গেলে প্রধানত আমার উপর ছেড়ে দিলেন; বলা চলে ধাপে-ধাপে অবরোহণ, হুমায়ুন কবির থেকে আতোয়ার, আতোয়ার থেকে আমি। নতুন অনেক লেখককে 'চতুরঙ্গ'-এ হাজির করেছিলাম। অমলেন্দু বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন ইংরেজি সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক, বাংলা কবিতা ও চিত্রকলা নিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন 'চতুরঙ্গ'-এর পাতায়। সততঅস্থির অশোক রুদ্র নিজেকে সত্যিই সর্বকলাপারঙ্গম ভাবতো, হয়তো সেরকম ভাববার তার অধিকারও ছিল। সংখ্যাতত্ত্ব-অর্থশাস্ত্র পেরিয়ে 'চতুরঙ্গ'-এ সে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান নিয়ে প্রবন্ধ থেকে শুরু করে বিপ্লবের বারুদ-ছোঁয়া ইস্তাহার পর্যন্ত ছাপিয়েছে। লোকনাথ ভট্টাচার্যকে তাগিদ দিয়ে-দিয়ে ওর একরাশ প্রতীকী কবিতা, সেই সঙ্গে একটি গোটা উপন্যাসও, 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশ করতে পেরেছিলাম। আমার গুরু অমিয় দাশগুপ্ত মশাই প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে মাতৃভাষার আবশ্যকতা নিয়ে অতি প্রাঞ্জল একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন, 'চতুরঙ্গ'-এর তা মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল।

অন্তরঙ্গ সুহৃদ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভীর বিশ্বাসে, প্রগাঢ় অনুকম্পায়, সেই সঙ্গে বল্গাহীন অপব্যয়িতায়, নানা ক্ষুদে পত্রিকায় কবিতা দান করে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁকে পাকড়ে 'চতুরঙ্গ'-এর জন্য বেশ কয়েকবার জোর করে লিখিয়ে নিয়েছিলাম। সেই বছরগুলিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠতার মরশুম। মনে পড়ে গীতার একটি লম্বা নাটক ছাপিয়েছিলাম, তাতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সুন্দর একটি গীতিকবিতা, নিখাদ রোমান্টিক, অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে তখনই ঠাহর করতে পারছিলাম দক্ষিণায়ন শুরু হয়েছে। অন্তত একটি কবিতার কথা মনে পড়ে, যা সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'চতুরঙ্গ'-এর জন্য দিয়েছিলেন, যা হাতে পেয়ে তাঁর মুখের উপর বলেছিলাম, নিকষ প্রতিক্রিয়াপন্থী। আমার অভিমত জেনে গীতা-সুভাষ দু'জনেই দৃশ্যত মর্মাহত। তাঁদের কন্যা পুপে-কে খুব পছন্দ করতাম: কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠারা অনেকে তো এখন নিজেরাই অপরাহ্ণ ছুঁই-ছুঁই।

পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকেই 'চতুরঙ্গ'-এর বাঁধা আড্ডাবাজ হয়ে গিয়েছিলাম। লখনউ থেকে এসে মাঝে-মাঝে আতোয়ারের ফ্ল্যাটে থাকতাম, সুরঞ্জন সরকারের সঙ্গে ঘর

ভাগ করে নিয়ে, আতিকুল্লার তৈরি খাঁটি বাঙাল রান্না তারিফ করে খাওয়া। অবিবাহিত যুবকদের প্রায়-উচ্ছৃঙ্খল ডেরা, নরক গুলজার। বৈশাখ মাসের গুমোট-গরম রাত, হাওয়ার মৃদু সঞ্চালনে একটু স্নিগ্ধ হওয়ার আশায় শোবার ঘর ছেড়ে বাইরের ব্যাল্‌কনিতে আতোয়ারের নিদ্রাগমন, খালি গা, ভোরের দিকে লুঙ্গিতে গিঁট সামান্য শ্লথ হয়ে গেছে, সুরঞ্জনের হঠাৎ চোখে পড়েছে। প্রাতঃকালীন চায়ের টেবিলে সুরঞ্জনের সোচ্চার কাব্য-আস্ফালন : 'আতোয়ার শুয়ে আছে রেনোয়ার ন্যুডের মতন'। এমন আরও কত কাহিনী। ক্ষীরকদম্ব সম্পর্কে আমার ঈষৎ দুর্বলতা জেনে আতোয়ার প্রতিদিন এক বাক্স সেই মিষ্টি এনে হাজির করতেন। ভরদুপুরে আর এক দফা চায়ের আড্ডা, ওই পাড়ার সুস্বাদু টিকিয়া সহযোগে। এই পুরো সময়টা জুড়ে কমল মজুমদার গণেশ অ্যাভিনিউতে নিয়মিত হাজির থাকতেন, ফরাশি বাকচাতুর্যে আমাদের জবাই করতেন, মাঝে-মাঝে তাঁর রচিত বা রচিতব্য গল্প বর্ণনা করে শোনাতেন, আমরা রুদ্ধশ্বাস, বিমুগ্ধ। এমনই এক গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে তিনি 'মল্লিকাবাহার' গল্পের কাহিনীটি অনুপুঙ্খ শুনিয়েছিলেন। কোথায় যেন লিখেছিলাম, কাহিনীর, ও কমলদার বচনভঙ্গির, উৎকর্ষে আমরা এতটা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম যে একটি অশ্লীল শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারিনি। টুকরো-টুকরো করে কমলদা 'অন্তর্জলী যাত্রা'র বেশির ভাগ অংশও পড়ে শুনিয়েছিলেন। খেয়ালি মানুষ; যতদিন রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-তে ছিলেন, ওঁর নাগাল পাওয়া মুশকিল হতো না, প্রায়ই বাড়ি থেকে বাইরে ডেকে এনে মধ্যরাত্রি উত্তীর্ণ হয়ে গেলে ত্রিকোণ পার্কের পাশে ট্রাম লাইনের উপর বসে আড্ডা জুড়তাম আমরা। কমলদা ফরাশিতে যেমন চোস্ত ছিলেন, খিস্তি আওড়াতেও ততটাই। যাঁদের পছন্দ হতো না তাঁদের প্রতি মিহিন ভাষায় মিষ্টি করে এমন খিস্তি ঝাড়তেন, সেই ব্যক্তিবর্গ পালাবার পথ পেতেন না, আর এ-মুখো হতেন না। তখন মেরিডিথ স্ট্রিটের কফি হাউস সত্যজিৎ-প্রসাধিত, জমজমাট। কমলদা সাধারণত 'চতুরঙ্গ'-এ পৌঁছুতেন কফিহাউস থেকেই, ভর দুপুরবেলা। তাঁর প্রথম করণীয়, ঢ্যাঙাবাবুকে কায়দা করে কী ধোলাই দিয়ে এসেছেন, তার সবিস্তার বিবরণ প্রদান।

একষট্টি সালে যখন ওয়াশিংটন থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলাম, আতোয়ার রহমানের তখন বিবাহ-অনুষ্ঠান। আমার চেয়ে বয়সে দশ বছরের বড়ো হলেও, তাঁর বিয়েটা ঘটে আমার নিজের বিয়ের পাঁচ বছর বাদে। তাঁর ক্ষেত্রে কিছু-কিছু হৃদয়বিদারক কাহিনী বিবাহলগ্নকে পিছিয়ে দেয়, যা আমার ক্ষেত্রে অঘটিত ছিল। এ বিষয়ে অধিক কিছু না বলাই সম্ভবত নিরাপদ। তেষট্টি সালে যখন পাকাপাকি কলকাতায় বাসা বাঁধলাম, বিবাহিত আতোয়ারের আবাস 'চতুরঙ্গ'-র আস্তানা থেকে উঠে গেছে। তিনি স্ত্রী ও শিশুপুত্র টিটোকে নিয়ে শামসুল হুদা রোডে এক ফ্ল্যাটবাড়িতে ঘর গুছিয়েছেন; কিছুদিন বাদে কলকাকলিময়ী কন্যা বুড়ির আগমন। ৮এ শামসুল হুদা রোড হঠাৎ কলকাতার খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠিকানায় রূপান্তরিত হলো; দোতলার যে-ফ্ল্যাটে আতোয়ার রহমান থাকতেন, তার ঠিক উপরেই উৎপল দত্ত-শোভা সেনও তখন উঠে এসেছেন। অন্য দিকে গণেশ অ্যাভিনিউর ফ্ল্যাটবাড়িতে আরতি ও সুভো ঠাকুর, সঙ্গে তাঁদের ফুটফুটে কন্যা, যারও নাম পুপে, যতিপূরণ করলেন।

'চতুরঙ্গ'-এর আড্ডার স্বভাবতই একটু চরিত্র পরিবর্তন ঘটলো। দপ্তর এখন থেকে নিছকই দপ্তর, ঈষৎ অফিস-অফিস গন্ধ। ততদিনে সঞ্জয় ভট্টাচার্য-সত্যপ্রসন্ন দত্তও পাশের ফ্ল্যাট ছেড়ে এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত সুদূর সেলিমপুর রোডে চলে

গেছেন, যেখান থেকে নব পর্যায়ে 'পূর্ব্বাশা' প্রকাশ করবার জন্য সত্যপ্রসন্নবাবুর উদয়াস্ত প্রয়াস। অবর্ণনীয় কঠিন সময় তাঁকে তখন অতিক্রম করতে হয়েছে। হাতে পয়সাকড়ি নেই, সংসার-খরচের সংস্থান জোগাতেই প্রাণান্ত, তার উপর সঞ্জয়দা মাঝে-মাঝে গভীর বিষাদে ডুবে যান, তাঁর আশৈশব সুহৃদ সত্যপ্রসন্নবাবুকেই সেই সংকটের মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করে যেতে হয়, পয়সা বাঁচানোর জন্য এমনকি নিজের হাতে ছাপার টাইপে লেখা সাজাতে হয় পর্যন্ত। 'চতুরঙ্গ' অবশ্য, মোটামুটি নিয়মিতভাবেই, বছরে চারটি সংখ্যা, প্রকাশিত হতে থাকে। কয়েক বছর বাদে, হুমায়ুন কবিরের মৃত্যুর পর, আতোয়ার দিলীপকুমার গুপ্তকে রাজি করিয়েছিলেন সম্পাদনার ভার গ্রহণ করবার জন্য। ইতিমধ্যে সিগনেট প্রেসের ভগ্নদশা, ডি কে-র শরীর-মন ভেঙে পড়েছে। দু'তিন বছরের মধ্যে তিনিও প্রয়াত হলেন, তারপর কয়েক বছর আমাদের পুরনো দিনের বন্ধু বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য 'চতুরঙ্গ'-এর কার্যনির্বাহী সম্পাদক হিশেবে ঠেকা দিয়ে গেলেন, যদিও বেশির ভাগ দায়িত্বই, সম্পাদনার কাজ সুদ্ধ, আতোয়ারকে সামলাতে হতো। একটি পর্বে আতোয়ার আমাকে সম্পাদক হবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, অনেক ভেবে সম্মত হইনি। ওই পর্যায়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে রাজনীতির আড়াআড়ি অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। হুমায়ুন কবির-প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকলে অবশ্যই খানিকটা দৃষ্টিকটু দেখাতো। তবে প্রত্যক্ষ দায়িত্বের বাইরেও অনেক কিছু করা সম্ভব ছিল, যথাসম্ভব তা করবার চেষ্টা করেছি।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি মুহূর্তে চীনে যুদ্ধের ঘোর সাধারণ মানুষের মানসিকতা থেকে কেটে গেছে, বাঙালিদের মধ্যে আরও বিশেষ করে। বহু মহিলা পর্যন্ত অনুশোচনার সঙ্গে বলতে শুরু করেছেন, কী ভুলই তাঁরা করেছেন, তথাকথিত দেশপ্রেমিকদের তাড়নায় গয়নাগাঁটি-পয়সাকড়ি সরকারের হাতে সমর্পণ করে, 'উত্তুরে দুশমনদের' প্রতিরোধ করবার লক্ষ্যে। অধ্যাপনা করি, 'চতুরঙ্গ'-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে একটু-আধটু সাহিত্যিক উদ্যম। কিন্তু সব ছাপিয়ে ততদিনে আমাকে ছেয়ে ফেলেছে রাজনীতিমনস্কতা। গোড়া থেকেই কি কট্টর ছিলাম আমি, না কি পরিবেশ আমাকে কট্টর করে তুলেছিল? কমিউনিস্ট পার্টিতে আমার পুরনো পরিচিতরা অধিকাংশই দক্ষিণপন্থী। কলকাতায় ফিরে আমার যে-দিব্যজ্ঞান হলো, তাঁদেরই হাজার-হাজার পার্টি কমরেড বিনা বিচারে কারারুদ্ধ, অথচ তা নিয়ে তাঁদের কোনও হেলদোল নেই, যেন এটাই পৃথিবীর নিয়ম : কমরেডদের বড়ো অংশ জেলখানায় পচবেন, সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করবেন, আর যাঁরা বাইরে থাকবেন তাঁরা কংগ্রেসিদের সঙ্গে মিশে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কী উপায়ে আরও মজবুত করা যায় তা নিয়ে চিন্তাশীল হবেন, কিংবা লোকসভার সেই মাননীয়া সদস্যার মতো স্পষ্ট বলবেন, কমরেড বন্দীদের মুক্তি দাবি করার চেয়ে বড়ো হঠকারিতা কিছু হতে পারে না।

অবস্থা থমথমে। অনাবৃষ্টিহেতু খাদ্যশস্য ও সেই সঙ্গে অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের দাম চড়ছে, রাষ্ট্রীয় খাদ্যসরবরাহ ব্যবস্থা নড়বড়ে, গ্রামাঞ্চলে তো র‍্যাশনের ব্যাপারই নেই, চীনে যুদ্ধের দোহাই দিয়ে কারখানায় ন্যায়সঙ্গত মজুরিবৃদ্ধি আটকে রাখা হয়েছে। নেতারা কারান্তরালে, শ্রমিকরা যথেষ্ট দিশেহারা। তবে এই কুজ্ঝটিকার রেশ অচিরেই কাটলো, পরিস্থিতির চাপে নতুন-নতুন নেতা বেরিয়ে এলেন। তাঁদের আনুগত্য বামপন্থী কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের প্রতি। তেষট্টি সালের শেষের দিকে, চৌষট্টি সালের শুরুতে, কয়েকজন নেতা ছাড়া পেলেন। বর্ধমানের মহারানীর মৃত্যুহেতু বর্ধমান শহরের একটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী তখনও আত্মগোপন করে আছেন। জেলা কমিটির চাপে তাঁকেই রাজ্যের

তখনকার নেতৃত্ব পার্টির প্রার্থীরূপে মনোনয়ন দিতে বাধ্য হলেন, বিনয়দা বহু ভোটে জিতলেন। সেই উপনির্বাচনের ফল যেন কোনও দুর্দম আবেগমুক্তির মতো। পুলিশের চোখ-রাঙানোর তোয়াক্কা না করে কলকাতায়, শহরতলিতে, বিভিন্ন মফস্বল শহরে, গ্রামে, ফের সংগঠন প্রকাশ্যে মাথা উঁচিয়ে উঠলো। প্রতিদিন ছোটো-মাঝারি-বড়ো অজস্র প্রতিবাদের মিছিল। খবরকাগজগুলি অবশ্য সবচেয়ে রক্ষণশীল, সবচেয়ে ধামাধরা। তবে কাগজগুলির সম্পাদকবৃন্দ কল্পনাবিলাসে ভুগছিলেন। তাঁদের মতামত, তাঁদের সংবাদ নির্বাচন, সেই সংবাদ-বিন্যাস নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে গভীর বিবমিষাবোধ আদৌ তাঁরা টের পাচ্ছিলেন না। শিক্ষক এবং ছাত্র আন্দোলন, মহিলাদের আন্দোলন, সরকারি-সদাগরি কর্মীদের আন্দোলন, উদ্বাস্তুদের আন্দোলন; কৃষক সভা ও ট্রেড ইউনিয়নের শাখাপ্রশাখায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন করে ব্যূহ গড়বার, ব্যূহ আরও শক্তিশালী করবার, জোয়ার। যাঁরা শাসনব্যবস্থার হাল ধরে ছিলেন, তাঁরা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না কী ঘটছে চারপাশে।

অধ্যাপক সুশোভন সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রতি সপ্তাহে যে 'জনশিক্ষা পরিষদ'-এর বৈঠক বসতো, অধিকাংশ সময় চিন্মোহন সেহানবিশের বাড়িতে, তাতে আমি তখনও পর্যন্ত নিয়মিত হাজির থেকেছি। যেসব আলোচনা-কথাবার্তা হতো, অধিকাংশই আমার পছন্দ নয়, তর্ক করতাম, প্রশ্ন তুলতাম, অথচ সুশোভনবাবু সম্পর্কে প্রচুর শ্রদ্ধা থাকায় বৈঠকে যাওয়া বন্ধ করিনি। সে রকম অবস্থা ঘটলো মাস ছয়েক বাদে, তেষট্টি সালের সেপ্টেম্বর মাসে। পার্টির সরকারি কাগজগুলি রাজ্য কমিটির অস্থায়ী নেতাদের দখলে। বামপন্থীরা হাওড়ার একটি অবলুপ্ত পত্রিকা 'দেশহিতৈষী'-র স্বত্বাধিকার সংগ্রহ করে বিকল্প সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিলেন; কোনও নতুন নামে পত্রিকা বের করতে চাইলে অনুমতি না মেলবার আশঙ্কা। যতদূর মনে পড়ে, এই নবারব্ধ পত্রিকার উদ্যোগে ফের বহু মাস বাদে ময়দানে মনুমেন্টের পাদদেশে মস্ত সভার আয়োজন করা হলো, বন্দীমুক্তির দাবি জানিয়ে। পশ্চিম বাংলার নেতারা তখনও অনেকেই ছাড়া পাননি, কেরল থেকে এ. কে. গোপালন এলেন সভায় বক্তৃতা দিতে। সভা ভঙ্গ হলে মশাল জ্বালিয়ে প্রকাণ্ড মিছিল বেরোলো। সেই সন্ধ্যায় 'জনশিক্ষা পরিষদ'-এরও বৈঠক বসবার কথা, আমি তাই বক্তৃতার শেষে মিছিলে যোগ না দিয়ে তড়িঘড়ি ডক্টর শরৎ বাঁড়ুজ্যে রোডে হাজির। আরও যাঁদের আসবার কথা, অনেকেই এসে পৌঁছুতে পারেননি, মিছিলে আটকা পড়েছেন, সভা শুরু হতে পারছে না। আমরা যে-ক'জন উপস্থিত ছিলাম, এটা-ওটা-সেটা গল্পগুজব করছি, এমন সময় আরও একজন এলেন, সবিনয়ে জানালেন, মিছিলের জন্য দেরি হলো। হঠাৎ আলোচনাসভার উদ্যোক্তাদের একজন উচ্চ নিনাদে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'কাদের মিছিল, ওই গোপালন-গ্যাঙের বুঝি?' শোনামাত্র সভাস্থল ত্যাগ করে বেরিয়ে এলাম, তারপর আর কোনওদিন 'জনশিক্ষা পরিষদ'-এর সভায় যাইনি।

কয়েক সপ্তাহ বাদে সুশোভনবাবুর ফোন পেলাম, আমি যদি একটু কষ্ট করে কোনও সন্ধ্যায় ওঁর নাকতলার বাড়িতে যাই। গেলাম। সুশোভনবাবু ও তাঁর স্ত্রী সাদরে বসালেন, শোভন-সুন্দর আলাপ-আপ্যায়ন। তবে একটু বাদে মূল প্রসঙ্গ উত্থাপন। সুশোভনবাবু স্নেহভরেই বললেন, তিনি শুনতে পেয়েছেন আদর্শগত প্রশ্নে আমি একটু বিহ্বল, উগ্র বামাচারীদের দিকে ঝুঁকেছি, এটা যে কত ভুল অনেকক্ষণ ধরে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। সম্মাননীয় বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে আমি তেমন তর্কে পটু নই, বেশির ভাগ সময়ই প্রায় নীরবে তাঁর কথা শুনলাম, মাঝে-মাঝে একটু-আধটু মৃদু অন্য মত প্রকাশ। যখন বিদায় নেওয়ার

সময় হলো, বিনয়ের সঙ্গে হেসে বললাম, নিবিড় শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর বক্তব্য শুনেছি, কিন্তু আমি নিরুপায়, আমাকে বিপথগামী হতেই হবে। সুশোভনবাবু স্পষ্টতই হতাশ। তার পর আর তাঁর সঙ্গে বিশেষ দেখা হয়নি, তবে শিক্ষক ও ভাবুক হিশেবে দেশের বামপন্থী আন্দোলনে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা কী করে অস্বীকার করি।

মাঝে-মাঝে কর্মসূত্রে দিল্লি গমন। হয় ওখানে, নয় বিমানে যাতায়াতের সময়, প্রায়ই ভূপেশ গুপ্তের সঙ্গে দেখা হতো। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে মনে না হয়ে উপায় ছিল না যে তিনিও পার্টির আভ্যন্তরীণ বিতর্কে, অন্তত আদর্শের দিক থেকে, বামপন্থার দিকে ঝুঁকছেন। প্রায়ই দাঙ্গে-বিরোধী কথাবার্তা বলতেন, এটাও জানাতেন, দাঙ্গেকে তিনি বলে দিয়েছেন, তুমি দলের চেয়ারম্যান হতে পারো, কিন্তু পার্লামেন্ট-সংক্রান্ত ব্যাপারে তোমাকে আমি নাক গলাতে দেবো না, নিজের বিচার-বিবেচনা মতো চলবো। এই সময়েই সম্ভবত তিনি দু'শো পৃষ্ঠার একটি দাঙ্গে-বিরোধী দলিলও তৈরি করেছিলেন, তাঁর উইন্ডসর প্লেসের বাড়িতে যাঁরাই হাজির হতেন, তাঁদের ধরে সেই বৈকুণ্ঠের খাতাটি পড়ে শোনাতেন। আমার বন্ধু মোহিত সেন ঘোরতর দক্ষিণপন্থী, সে তখনই সশ্লেষে আমাকে বলেছিল, হ্যাঁ, পার্টি তো ভাগ হবেই, কিন্তু দেখো, ভূপেশবাবুর স্থূলে ভুল নেই, মস্কো যেদিকে ঝুঁকবে, তিনিও সেদিকেই থাকবেন। মোহিতের বিবেচনাশক্তিতে আমার তেমন আস্থা কোনওদিনই ছিল না, এখন আরও নেই, কিন্তু অন্তত এই ক্ষেত্রে তার ভবিষ্যদ্বাণী খাঁজে-খাঁজে মিলে গিয়েছিল।

ওই বছর অন্য-একটি অভিজ্ঞতা সামান্য কৌতুককর। একদিন এক ভদ্রলোক ফোন করলেন, নাম জানালেন সুকুমার দত্ত, বললেন, দিল্লির অশোক মিত্রের কাছ থেকে আমার ফোন নম্বর পেয়েছেন। সন্ধ্যাবেলা ভদ্রলোক আমাদের ফ্ল্যাটে এলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বুঝলাম ইনি 'হুগলী গ্রুপ'-এর সুকুমার দত্ত। কিশোর বয়স থেকেই নামটি জানতাম, ১৯৩৭ সালে অবিভক্ত বাংলার বিধান সভায় শ্রীরামপুর কেন্দ্র থেকে বিধান সভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। কংগ্রেস দলে 'হুগলী গ্রুপ' খুব প্রভাবশালী গোষ্ঠী, ওই মুহূর্তে অতুল্য ঘোষ যার প্রধান পুরুষ, মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন তাঁর ছায়াসঙ্গী। পরিধানে হাত-কাটা ফতুয়া, ডবল-ব্রেস্ট কোটের মতো আঁটো করে আড়াআড়ি আটকানো, ঈর্ষণীয় স্বাস্থ্য, সুকুমারবাবুকে অতি চমৎকার লাগলো। প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতাপুরুষদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে যা ধ্যানধারণা, তাঁর কথাবার্তা-আচার-আচরণের সঙ্গে আদৌ মেলানো সম্ভব নয়। অনেকরকম খোঁজখবর রাখেন, রাজনীতির বাইরে ইতিহাস-দর্শন-শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে সুচারু সুগঠিত মতামত, কোনো ব্যাপারেই মনে হলো তাঁর মধ্যে ছুৎমার্গের বালাই নেই। একটু আপ্লুত হয়ে বিনীত প্রশ্ন করলাম কেন তিনি কষ্ট করে এসেছেন, আমি তাঁর কী প্রয়োজনে আসতে পারি। তাঁর উত্তর শুনে প্রায় আঁৎকে উঠলাম: তিনি এসেছেন অতুল্য ঘোষের দৌত্য নিয়ে, অতুল্যবাবু-সুকুমারবাবুরা চান আমার মতো কিছু-কিছু নবীন 'জ্ঞানপ্রাপ্ত' বাঙালি কংগ্রেসে যোগ দিয়ে এই রাজ্যে দলের পুনর্জীবনে সাহায্য করি। বিনম্র কণ্ঠে জানালাম, ওঁরা বড্ড ভুল করছেন, আমি শুধু কট্টর বামপন্থী নই, আরও কিছু বেশি। স্পষ্টতই হতাশ হয়ে সুকুমারবাবু সম্ভাষণ জানিয়ে বিদায় নিলেন, ওঁর সঙ্গে পরে আর কোনোদিন দেখা হয়নি।

আসলে পশ্চিম বাংলার দুঃসাহসী তথা স্বপ্নবিভোর যে-ঐতিহ্য ছিল, তা কোনওদিনই হারিয়ে যায়নি। চীনের সঙ্গে প্রায় গলা চুলকে ঝগড়া বাধাবার পরিণামে দেশকে যে-অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন কর্তাব্যক্তিরা, তা থেকে বিরক্তি ও ক্রোধের দাবানল গোটা সমাজ জুড়ে জ্বলে উঠছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত তরুণ-তরুণী যুবক-যুবতী কিশোর-কিশোরীরা

সমাজ-বিপ্লবের প্রসঙ্গ, তখনও অন্তত, অবাস্তব অথবা অপ্রাসঙ্গিক বলে ভাবতে শেখেননি। ঠিক সেই মুহূর্তেই, চীনদেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রাক-মুহূর্তে, যে-ধরনের ভাবনা কেন্দ্র করে চিন্তা ও মননের উথালপাথাল চলছিল, তার ঢেউ পশ্চিম বাংলাকেও ছুঁয়ে গেল। তখনও দেশে পোশাকি ভাষায় জরুরি অবস্থা, কিন্তু কে আমল দেয় তাকে? গ্রামে-শহরে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ দিনের পর দিন ক্রমশ বর্ধমান। কৃষক সভার মেজাজ প্রচণ্ড জঙ্গি, তার প্রতিফলন গ্রামে-গ্রামে, জমি দখলের দুর্বার বন্যার দৈনিক পূর্বাভাস। লাঙল যার জমি তার পেরিয়ে শ্রম যার জমি তার, ফসলও তার, এই ধুয়োর আলোড়ন। কল-কারখানাতেও কর্মকর্তারা আর শ্রমিক নেতাদের দাবিয়ে রাখতে পারছেন না, দাবিয়ে রাখতে পারছেন না শ্রমিক শ্রেণীকেও। যুদ্ধের ভণিতা আর কাজ দিচ্ছে না, খেটে-খাওয়া মানুষ মজুরিবৃদ্ধি চায়, মূল্যমানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। পুঁজিপতিদের কাছে, সরকারের কাছে, অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের দাবিও তীব্র থেকে তীব্রতর হওয়ার উপক্রম। সরকারি তথা সদাগরি দফতরের করণিককুলও জরুরি অবস্থার পরোয়া না-করে রাস্তায় নেমে এসেছেন, তাঁদের মুখে বুলি, রাস্তাই একমাত্র রাস্তা। এই পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেরই মনে তখন ভাবনার কণা পুঞ্জীভূত হচ্ছিল যে গোটা ভারতবর্ষে যাই-ই হোক না কেন, অন্তত পশ্চিম বাংলায় বিপ্লবের প্রারম্ভমুহূর্ত শুরু হয়ে গেছে। কারও পক্ষে আশঙ্কা, কারও বিশ্বাস : এমনকি সচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্তরাও এরকম ধারণার দ্রুত শিকার হচ্ছিলেন।

ঠিক এই ঋতুতেই আমার সঙ্গে সমর সেনের যোগাযোগ। ছাত্রাবস্থায় তাঁর কবিতার অন্ধ ভক্ত ছিলাম; 'কয়েকটি কবিতা' থেকে শুরু করে 'গ্রহণ' পেরিয়ে 'নানা কথা' পর্যন্ত, প্রতিটি গ্রন্থের প্রতিটি কবিতা আমার কণ্ঠস্থ। পরবর্তী সময়ে 'কবিতা' পত্রিকায় ও অন্যত্র তাঁর যে-যে কবিতা বেরিয়েছে, সেগুলিও দুরন্ত আগ্রহে সংগ্রহ করে পড়েছি। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় বা অন্যত্র মাঝে-মাঝে তাঁর যে-সব নাস্তিকভাবাক্রান্ত প্রবন্ধ বেরোতো, তাদের নিহিত বক্তব্যও আমার রপ্ত। এর পর উনি মস্কোয় চলে গেলেন, সেখান থেকে 'ইকনমিক উইকলি'-র জন্য প্রায়ই আধা-রাজনৈতিক, আধা-অর্থনৈতিক মন্তব্য পাঠাতেন, সোৎসাহে পড়তাম। ধরে নিচ্ছি আমার যে-সব লেখা শচীনদা ছাপতেন, সমরবাবুও সেগুলি পড়তেন। তাঁর দুই প্রধান বামপন্থী কলমচির মধ্যে অথচ চাক্ষুষ পরিচয় পর্যন্ত নেই জেনে শচীনদার কৌতুকান্বিত বিস্ময়।

তেষট্টি সালে যখন দেশে ফিরলাম, সমর সেনও মস্কো থেকে ফিরে এসে আনন্দবাজার সংস্থার ইংরেজি দৈনিক 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক হিশেবে যোগ দিয়েছেন; নিরঞ্জন মজুমদার হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ছেড়ে 'ক্যাপিটাল' সাপ্তাহিকের সম্পাদক হয়েছেন, খুব সম্ভব সেই জায়গায়। 'চতুরঙ্গ'-এর আড্ডায় আমার বহুদিনের পরিচিত অগ্রজ বান্ধব ইন্দ্রদত্ত সেন, তিনিও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মরত, তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা করতে গেছি, তিনি নিয়ে গিয়ে সমরবাবুর সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ করিয়ে দিলেন। বরাবরই সমর সেন স্বল্পবাক মানুষ, প্রথম আলাপে একটি-দু'টি শিষ্টাচারযুক্ত বাক্য ছাড়া আর তেমন কিছু বিনিময়-প্রতিবিনিময় হলো না। আনন্দবাজারের প্রতিক্রিয়াদীর্ণ শ্বাসরোধকারী পরিবেশে কী করে টিকে আছেন, আমার এই কৌতূহলের জবাবে শুধু বললেন, কয়েক মাস আগে অবস্থা আরও ঢের বেশি খারাপ ছিল।

শচীনদার পরের ভাই দেবুদাও ততদিনে বিদেশী কোম্পানির চাকরি ছেড়ে স্বাধীন ব্যবসার উদ্দেশ্যে সপরিবারে কলকাতা চলে এসেছেন, তাঁর বড়ো দুই ছেলে—খোকন ও ছোট্টু—

মুম্বইতে শচীনদার কাছে থেকে স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করছে। সমাজে বিচরণ করলে আস্তে-আস্তে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বাড়ে। দু'দিন বাদেই আবিষ্কার করলাম, দেবুদা, সমরবাবু, নিরঞ্জন মজুমদার, সমরবাবুর দুই অগ্রজ—অমলদা ও গাবুদা—সবাই একই সান্ধ্য আড্ডার শরিক, যে-আড্ডায় এসে মাঝে-মধ্যে যোগ দেন কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রাধামোহন ভট্টাচার্য এঁরা। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ততদিনে লোকায়ত দর্শনে পুরোপুরি মজে গেছেন, তাঁকে এই আড্ডায় দেখিনি। আর এক নিত্য অতিথি বিজয় বসু নামে ছেলেবেলায় অমলদার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে দোস্তি-পাতানো এক অন্ধ্রদেশীয় ভদ্রলোক, শিকারপাগল, তাঁর একটি হাত একদা এক বাঘ খুবলে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অন্য হাতটি দিয়েই তিনি সমস্ত ক্রিয়া-কর্ম স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন করতে পারতেন। এই সান্ধ্য বৈঠকের বাঁধা খদ্দের আরও যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অবশ্যই উল্লেখ্য পশ্চিম বঙ্গ সরকারে তখন কর্মরত সংখ্যাতত্ত্ববিদ প্রদ্যোৎ গুহঠাকুরতা, এবং কখনও-কখনও দিল্লি থেকে এসে হঠাৎ খানিকটা সময় কাটিয়ে যাওয়া অন্য অশোক মিত্র, যিনি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সমরবাবুর সহপাঠী ছিলেন, তাঁদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য পরে গাভীর্যে গিয়ে পৌঁছয়। এক রবিবার সন্ধ্যায় অমলদার বাড়িতে গোনাগুণতি করেছিলাম, একুনে সতেরোজন উপস্থিত আছেন, আমাকে বাদ দিয়ে প্রায় প্রত্যেকেই জলপথে বিহার করতে অতি অভিজ্ঞ। একজন আসতেন, দেবুদার ঢাকাস্থ বাল্যবন্ধু, সুবোধ বসু, বাঙাল ভাষায় কথা বলতে পছন্দ করতেন। একবার এই বিখ্যাত আড্ডায় লন্ডন থেকে সুনীল জানা ও শোভা দত্ত এসে হাজির, নিরঞ্জন মজুমদারের মতোই এঁরা দু'জন ইংরেজিতে অনর্গল কথাবার্তা বলে আরাম পেতেন, অথচ পানের ব্যাপারে খাঁটি স্বদেশী, খালাশিটোলা-আসক্ত। তাঁদের অভ্যাস-আচরণ পর্যবেক্ষণ করে সুবোধদার প্রায়-হতভম্ব উক্তি : 'অরা কয় ইংরাজি, আর খায় বাংলা'।

পানসাগরের বিবরণে যেহেতু ভাসছি, সমরবাবু-সংক্রান্ত অন্য তিনটি গল্পও এই সুযোগে বলে ভারমুক্ত হই। কাহিনী এক : সেন-ভ্রাতাদের রাবিবারিক আড্ডা পালা করে অমলদা-গাবুদা-সমরবাবুর বাড়িতে হতো। কোনো এক রবিবার সন্ধ্যা, সমরবাবুর বাড়িতে আড্ডা জমেছে, পরম উৎসাহভরে সমরবাবু বোতল থেকে গেলাসে পানীয় ঢালছেন, অসতর্ক মুহূর্তে কিছুটা তরল পদার্থ মেঝেতে ছল্‌কে পড়লো, সুলেখা সেন মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না-করে স্বামীকে সম্বোধন করে বললেন, 'এবার উবু হয়ে বসে চাটো'। কাহিনী দুই : 'নাউ' পত্রিকায় কিছুদিন একটি বুদ্ধিমান ছেলে সম্পাদনার কাজে সাহায্য করেছিল। বুদ্ধিমান, তবে হৃদয়ঘটিত কোনও কাণ্ডে বেপথুমান, একটু বেশি পানাসক্ত। একদিন সমরবাবুর বাড়িতে সামান্য বেসামাল হয়ে পড়ে, ওর প্রস্থানের পর সুলেখা সেন নিন্দাব্যঞ্জক একটি মন্তব্য করেন। সমরবাবু হাসিমুখে বললেন, 'আহা, ওঁর মনে ব্যথা জমে আছে'। ভদ্রমহিলার ঝটিতি মুখঝাম্‌টা, 'ঝ্যাঁটা মারি অমন ব্যথার মুখে'। এবার তৃতীয় কাহিনী : তখন নকশালবাড়ি আন্দোলন নিয়ে টালমাটাল, কোনও সন্ধ্যায় স্নেহাংশু আচার্যের বাড়িতে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে সমরবাবুর সরোষ তর্কাতর্কি, হঠাৎ জ্যোতিবাবু সমরবাবুর দিকে তাকিয়ে তাঁর একান্ত নিজস্ব কাটা-কাটা ভঙ্গিতে বললেন, 'মশাই, হাতে হুইস্কির গ্লাস নিয়ে রাজনীতিচর্চা হয় না। রাত্তিরে ভালো করে ঘুমিয়ে সকালে সুস্থ হয়ে আসবেন, তখন কথা বলবো আপনার সঙ্গে'। বন্ধুর বাড়িতে জ্যোতিবাবু অতিথি, তিনিও, কী ভেবে সমর সেন নিঃশব্দ হয়ে গেলেন।

মিশ্র ভিড়। প্রায় প্রতি জনেরই রুচি-পছন্দ-অপছন্দ আলাদা। একমাত্র একই পানসাগরে

ঝাঁপ দিতে যূথবদ্ধ উৎসাহ। অথচ, সকলেই মধ্যশ্রেণীভুক্ত; কেউ একটু বেশি পয়সা কামাচ্ছেন, কেউ একটু কম। কিন্তু সামাজিক সংকটের হল্কা তাঁদের মনন ও চিন্তাকে প্রায় সমানভাবে ছুঁতে শুরু করেছে। প্রত্যেকেই বামপন্থার দিকে ঝুঁকতে উদ্যত। আড্ডার একটা বড়ো সময় জুড়ে কংগ্রেস দলের নিন্দাকীর্তন, কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন প্রসঙ্গ। সমরবাবুদের বেহালার বাড়িতে একদা রাধারমণ মিত্র অতিথি ছিলেন বহুদিন, রাধারমণবাবুর সূত্রে বঙ্কিম মুখুজ্যে মশাইয়ের সঙ্গেও সমরবাবুদের পারিবারিক পরিচয়, তাঁদের মারফতই হয়তো সমরবাবুর মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে আলাপ। কে আর এখন মনে রেখেছে, সমরবাবু তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কয়েকটি কবিতা' মুজফ্ফর আহমদকে উৎসর্গ করেছিলেন।

আমি পানাভ্যাসের ব্যাপারে নিকষ শাকাহারী। তবে আড্ডাতে যোগ দিতে তো বাধা নেই! ক্রমশ এই আড্ডার মধ্য দিয়েই সমরবাবুকে এবং তাঁর ভাইদের ভালো করে জানলাম, তাঁরা জানলেন আমাকে। হঠাৎ কলকাতার সাহিত্যিক-সাংবাদিক মহলে হুলস্থুল, উনিশ শো চৌষট্টি সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস, পূর্ব পাকিস্তানে ফের দাঙ্গা, ওখানকার ঘটনাবলীর যথাযোগ্য জবাব দিতে আনন্দবাজার পত্রিকা কলকাতার বুকে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধাবার জন্য প্রতিদিন সব ক'টি পাতা উজাড় করে বিষ ঢালছে। কর্তৃপক্ষের না কি ইচ্ছা, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডেও অনুরূপ নীতি গ্রহণ করা হোক। কার্যত সমরবাবুই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন, যদিও স্বত্বাধিকারীদের একজনের নাম সম্পাদক হিশেবে মুদ্রিত হয়। একদিন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রচুর কথা কাটাকাটি, আধঘণ্টা কাটতে না কাটতে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে সমরবাবু সুতারকিন স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে ধর্মতলার মোড়ে বালিগঞ্জের ট্রামে চাপলেন, আর কোনওদিন ফিরে গেলেন না। 'স্বাধীন সাহিত্য সংঘ' নামে যে কবি-সাহিত্যিক- সাংবাদিকের দল কমিউনিস্ট-বিরোধী জিগির তুলছিলেন, তাঁরা একটু বিব্রত হলেন, পরিচালকপক্ষ ও সম্পাদকের পারস্পরিক বাক্স্বাধীনতার লড়াইতে তাঁদের তো কর্তাব্যক্তিদের স্বাধীনতা সমর্থন না-করে উপায় ছিল না!

কাকতালীয়, কিন্তু কাছাকাছি সময়ে অন্য একটি ঘটনা। হুমায়ুন কবির তখন কেন্দ্রে মন্ত্রী, তবে পশ্চিম বাংলায় অতুল্য ঘোষ-প্রফুল্ল সেনদের যে-গোষ্ঠী কংগ্রেস দলকে কব্জা করে ছিল, তাদের সঙ্গে তাঁর আদৌ মাখামাখি নেই। মন্ত্রী হলেই পয়সাকড়ির ব্যবস্থা করা বোধহয় অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। দিল্লি-উত্তর প্রদেশ-মুম্বই অঞ্চলের অর্থবান পরিচিতজনদের কাছ থেকে হুমায়ুন কবির অর্থসংগ্রহান্তে কলকাতায় সদর দপ্তর স্থাপন করে একটি ট্রাস্ট গঠন করলেন, ট্রাস্ট থেকে 'নাউ' নাম দিয়ে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করার উদ্যোগ নেওয়া হলো। দৈনিক পত্রিকা ব্যয়সাপেক্ষ, আপাতত সাপ্তাহিক পত্রিকা দিয়েই অতুল্য ঘোষ-প্রফুল্ল সেনদের টিট করা যাবে এমন ধারা ভেবে নিয়েছিলেন হুমায়ুন কবির। জনশ্রুতি, আনন্দবাজার সংস্থার উগ্র সাম্প্রদায়িকতাহেতু সমরবাবু 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' ছেড়েছেন, আর এই সংস্থা অতুল্যবাবুদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, সুতরাং অগ্রপশ্চাৎ তেমন খতিয়ে না দেখেই হুমায়ুন কবির তাঁর প্রাক্তন ছাত্র সমরবাবুকে 'নাউ'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করবার আমন্ত্রণ জানালেন; এ ব্যাপারে আমার বন্ধু আতোয়ার রহমানেরও যথেষ্ট হাত ছিল। সমরবাবুকে দু'মাসের বেশি কর্মহীন থাকতে হলো না। 'চতুরঙ্গ' দফতরেই সমরবাবুর জন্য আলাদা ঘর বরাদ্দ হলো, তাই 'চতুরঙ্গ'-এর আড্ডা কিছুটা ঢলে পড়লো 'নাউ'-এর আড্ডার শরীরে, এবং, স্বভাবতই, 'নাউ'-এর আড্ডার খানিকটাও 'চতুরঙ্গ'-এর আড্ডার অবয়বে মিশে গেল। আতোয়ার প্রথম পর্বে কার্যত 'নাউ'-এরও প্রকাশক, আর লেখক হিশেবে জুটে

গেলেন সমরবাবুর বাছাই সাংবাদিক বন্ধুরা : নিরঞ্জন মজুমদার, অমলেন্দু দাশগুপ্ত, ততটা কাছের বন্ধু না-হলেও সমরবাবুর মতামতের প্রতি অনুকম্পাশীল শঙ্কর ঘোষ, সব শেষে সাংবাদিক না হয়েও উৎপল দত্ত ও আমি। প্রায় প্রত্যেকেরই অন্যত্র পাকা কাজ, 'নাউ'-এর জন্য আমরা স্রেফ শখের লেখাই লিখতাম, যদিও সাপ্তাহিকটির সচ্ছলতার অভাব যেহেতু ছিল না, সব লেখার জন্যই সম্মানদক্ষিণা দেওয়া হতো আমাদের। মাসিক ব্যবস্থা ছিল একমাত্র উৎপল দত্তের সঙ্গে। উৎপল সকাল ন'টার মধ্যে দফতরে পৌঁছে যেতেন, ঘণ্টা দেড়-দুয়েকের মধ্যে নিজের কাজ সম্পন্ন করে বেরিয়ে পড়তেন অন্য ভূমিকার পশ্চাদ্ধাবনে, তাঁর তো বহুমুখী প্রতিভা, বহুমুখী অন্বেষণ। উৎপল ঝড়ের বেগে লেখা তৈরি করতেন, তাঁর নানা চরিত্রের লেখার প্লাবনে 'নাউ'-এর ভেসে যাওয়ার উপক্রম : কখনও নিজের নাম ব্যবহার করছেন, কখনও ইউ ডট ডি ডট, কখনও খোদ ইয়াগো, কখনও বা রফিকুল ইসলাম।

প্রাথমিক প্রস্তুতির পর চৌষট্টি সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে 'নাউ'-এর আত্মপ্রকাশ। পঁয়ষট্টি সালের জানুয়ারি পর্যন্ত প্রথম তিন-চার মাসের সংখ্যাগুলি এখন যদি কেউ সংগ্রহ করতে পারেন, আবিষ্কার করবেন রাজনীতির প্রসঙ্গ গৌণ, চলচ্চিত্র-নাটক-সাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা, চিত্র প্রদর্শনীর বিবরণ, পুস্তক সমালোচনা, সামাজিক সমস্যা জড়িয়ে প্রবন্ধ, অতুল্য ঘোষ-প্রফুল্ল সেন সম্পর্কে একটি-দু'টি বক্রোক্তি, তাতেও তেমন ধার ছিল না। আসলে সেই প্রথম পর্বে 'নাউ'-এর সম্পাদকীয় চিন্তাভাবনার উপর নিরঞ্জন মজুমদারদের মতামতের খুব বেশি প্রভাব ছিল। নিরঞ্জন কায়দা করে ইংরেজি বলতেন, ইংরেজি লিখতেন, একটু হালকা হাওয়ায় ভেসে বেড়ানোর দিকে তাঁর প্রবণতা; কে বলবে এই ভদ্রলোকই একদা 'শীতে উপেক্ষিতা' নামে চমৎকার বাংলা বই লিখেছিলেন শৈলশহর দার্জিলিং নিয়ে, তবে ওই বইতেও ছত্রে-ছত্রে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ চতুরালি। সমরবাবু বরাবরই বন্ধুভক্ত মানুষ, সুতরাং নিরঞ্জনের মতো অন্তরঙ্গস্থানীয়রা পত্রিকাটির যে-চরিত্র দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, ঈষৎ-একটু সামাজিক প্রজাপতি মেজাজের, তাতে তাঁর তেমন আপত্তি ছিল না। উৎপলের লেখায় হয়তো খানিকটা উগ্রতা প্রকাশ পেত, কিন্তু ওঁর রচনা তো প্রধানত নাট্যচিন্তা বা পুস্তক সমালোচনা, সে-সব নিয়ে কে মাথা ঘামায়। হুমায়ুন কবিরের বোধহয় এই আপাত-রাজনীতি- বিবর্জিত প্রথমদিকের চেহারাটি পছন্দ ছিল, সাধারণ নির্বাচনের আরও দু'বছর বাকি, ধীরে-ধীরে মেজাজের পর্দা চড়ালেই চলবে, হয়তো মনে-মনে এমন ছক কষে রেখেছিলেন।

ষোলো

অর্থনীতি পড়ানো-পড়ানো খেলা, রাজনীতি আলোচনার আবর্তে ডুবে যাওয়া, 'নাউ' নিয়ে মাতামাতি, 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার বেসরকারি সম্পাদনাকর্মে মাঝারি মনোনিবেশ, এরই মধ্যে কিন্তু অন্যান্য আরও পরিচয়ের ঢেউ, ঢেউয়ের পরে ঢেউ। অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্তের সঙ্গে আগে থেকেই আলাপ ছিল, স্কুলজীবন তাঁর ঢাকায় কেটেছে, আমাদের চেনা-জানার বৃত্তে সাযুজ্য, এবার কলকাতায় স্থিত হওয়ার সূত্রে তাঁর সঙ্গে পরিচয় গাঢ় হলো, বরাবরই তাঁর কাছে সপ্রীতি প্রশ্রয় পেয়েছি।

সুখময় প্রেসিডেন্সি কলেজে অমর্ত্যর সহপাঠী, ছাত্রাবস্থাতেই ওর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি, এবং ওই বয়সেই পড়াশুনার ব্যাপ্তি চমকে দেওয়ার মতো। উনিশশো উনষাট সালের গোড়া থেকে যে চার বছর বিদেশে ছিলাম, তখনই ললিতা ও সুখময়ের সঙ্গে প্রথম আলাপ, যা, বছর যত গড়িয়ে গেছে, নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়েছে, বরাবর আমাদের জীবনকে নন্দিত করেছে তুলনাহীন সৌভাগ্যে।

তেষট্টি সালের গোড়ায় যখন কলকাতায় স্থিত হলাম, ততদিনে ওরা দিল্লিতে। ললিতার মেজো ভাই অমিত ভাদুড়ী কেমব্রিজ থেকে প্রচুর তারিফ কুড়িয়ে সদ্য ফিরেছে, সে-ও দিল্লি স্কুলে যোগ দিয়েছে, কিন্তু প্রায়ই কলকাতা ঘুরে যায়; প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তার মধ্যে ভালোত্ব ও মাধুর্যের সমাবেশ মুগ্ধ করে। ওদের শ্যামবাজারের বাড়িতে মাঝে-মধ্যে যাই, ললিতাদের বাবার কাছ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির আদিপর্বের বৃত্তান্ত শুনি।

বন্ধুত্বের পরিধি ক্রমশ বিস্তৃততর। ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে শিক্ষক নির্বাচনে চণ্ডী আমাকে অঢেল স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, তার পূর্ণতম সদ্ব্যবহার করেছিলাম। অর্থনীতি বিভাগে নির্মল চন্দ্র, রঞ্জিত সাউ, পরেশ চট্টোপাধ্যায়, সবাই বিভিন্ন প্রবাহের বামপন্থী অর্থনীতিবিদ, কিন্তু তাঁদের বামপন্থার আকাটত্বে কোনও ভুলচুক নেই, সবাইকেই ক্রমে-ক্রমে ইনস্টিটিউটের অধ্যাপকমণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হলো। তা ছাড়া, বরুণ দে'র আবির্ভাব ঘটলো; যদিও লেখার হাত চমৎকার, লিখতে তাঁর ঈষৎ অনীহা, কিন্তু বুদ্ধির দীপ্তিতে, বচনের চমৎকারিত্বে, সে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে পারতো, এখনও দেয়। আমাদের বাঙালি সমাজে এমনই চারিত্রিক উচ্চাবচতা : বরুণের সাক্ষাৎ মেসোমশাই জীবনানন্দ দাশ, বাইরের কাউকে এই তথ্যের সত্যতা বোঝাতে গিয়ে অথচ বহুবার আমাকে গলদ্‌ঘর্ম হতে হয়েছে। আমার ছোটোখাটো কৃতিত্বের মধ্যে গর্বের সঙ্গে যা তালিকাভুক্ত করি, লিখতে-অলস বরুণকে দিয়ে 'মহারানীর মৃত্যু' নামে একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, যদিও বিতর্কমূলক, প্রবন্ধ লিখিয়ে নিতে পেরেছিলাম, 'ইকনমিক উইকলি'-তে বেরিয়েছিল।

শংকু, সত্রাজিৎ দত্ত, অজিত দত্ত মশাইর দ্বিতীয় পুত্র, তাকে আগে থেকেই চিনতাম। সে-ও তখন 'মরকত কুঞ্জে' আমাদের সঙ্গে। ভাবুক, স্নেহার্দ্রহৃদয় শংকু ভিয়েতনাম পর্বে ঘোর বামপন্থী, পরে কানাডা চলে গিয়ে তার গবেষণা ও অধ্যাপনা, হঠাৎ অধ্যাত্ম চিন্তায়

সমাচ্ছন্নতা। এখন প্রায় নিঃসঙ্গ, বছরে একটি মাত্র চিঠি পাই। আরো যে-দু'জন মরকত কুঞ্জে' সহকর্মী হিশেবে প্রীতির নিগড়ে বাঁধলো, তারা তেলেগু-ভাষী কৃষ্ণজী ও মালয়ালম-ভাষী কৃষ্ণণ।

খানিক বাদে বাপ্পা—সব্যসাচী ভট্টাচার্য—পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের গোয়ালে ঢুকে পড়লো। যেমন ঢুকলেন নৃতত্ত্ববিদ সুরজিৎ সিংহ। তাঁর জীবনের মধ্যমুহূর্তে সুরজিৎ প্রাণ-মাতানো আড্ডায় ভাসিয়ে দিতেন, গলা ছেড়ে গানও গাইতেন অতি চমৎকার, যদিও অনুজা পূর্বা দামের ধারে-কাছেও না। ছাত্রাবস্থায় যে-কোনও বাঙালি যুবকের যেমন, সুরজিতেরও কবিতা লেখবার বাই ছিল। ওঁর সঙ্গে আলাপ হবার পর 'কবিতা'-র পুরনো সংখ্যা থেকে ওঁর রচিত 'সাঁওতাল' কবিতা আউড়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলাম : 'পাড়ায় পাড়ায় যাস, সকল পাড়ায় যাস, মেয়ের পাড়ায় যাস না রে ভাই, না'। দেশ অখণ্ড থাকলে, ও সেই সঙ্গে জমিদারি প্রথাও, ভাবা যায় সুরজিতের পোশাকি পরিচয় হতো ময়মনসিংহ জেলাস্থ সুষঙ্গ পরগনার মহারাজ হিশেবে। আর একবার বাঙালি সমাজের পরম্পরাগত বৈচিত্র্যের, উল্লেখ করতে হয় : তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর সাক্ষাৎ ভাগিনেয় জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বটুকদা, আর বটুকদার সাক্ষাৎ ভাগিনেয় সুরজিৎ সিংহ।

ষাটের দশকের মধ্য পর্বে ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যাপকের ভিড়ে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কেউ-কেউ পরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হয়েছেন, মন্ত্রী-শাস্ত্রী হয়েছেন, সরকারে ঢুকে বড়ো আমলা হয়েছেন, একজন-দু'জন সক্রিয় বিপ্লবী হওয়ার চেষ্টা করেছেন পর্যন্ত। প্রতিভার অমন সমাবেশ বিরল; চণ্ডীমশাইকে তারিফ জানাতে হয়। (তবে অনেক ঘাটের জল খেয়ে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি-প্রবণতার বিবর্তন ঘটে। চণ্ডী এমনিতে তাঁর অতীতদিনের হ্যারি পলিট-রজনী পালমা দত্ত মোহাবিষ্টতা নিয়ে আদৌ স্বল্পবাক্ নন, অন্তত আমাদের মতো কয়েকজনের কাছে তো ননই। তবে অনেক ক্ষেত্রেই যা মনে হয় আসলে হয়তো তা নয়। সম্ভবত চৌষট্টি সালের কোনও সময়, ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ গা ঢাকা দেওয়া অবস্থায় ক'দিনের জন্য কলকাতায় এসেছেন, খবর পেয়ে জ্যোতির্ময় বসুর পাসিয়াঁতে দেখা করতে গেছি, কথাচ্ছলে তাঁকে জানিয়েছি চণ্ডী আর আমি একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, শুনে ই এম এস বললেন, 'ওকে একদিন আমার সঙ্গে একটু দেখা করতে বলতে পারো?' বার্তাটি যে-মুহূর্তে চণ্ডীকে পৌঁছে দিলাম, ওঁর চেহারা পাল্টে গেল। কী রকম ভ্যাবাচ্যাকা ভাব, আমতা-আমতা করে আমার দিকে তাকিয়ে চণ্ডীর পরামর্শ ভিক্ষা : 'আচ্ছা, এমনটা কি হতে পারে, আমি গ্র্যান্ড হোটেলের লাউঞ্জে গেলাম একটা নির্দিষ্ট সময়ে, ই এম এস-ও তখন সেখানে চলে এলেন, অথবা এমনটাও কি হতে পারে, ই এম এস যখন মাদ্রাজের বিমান ধরতে দমদমে পৌঁছুবেন, আমিও তখন দিল্লির বিমান ধরতে ওখানে হাজির হবো, দেখা হয়ে যাবে।' বৃথাই বাল্যে-পড়া কবিতার সেই মোক্ষম পঙ্‌ক্তি : ভয়ে ভীত হয়ো না মানব। আমি চণ্ডীকে আর ঘাঁটালাম না, ই এম এস-কে জানিয়ে দিলাম, ওঁর অনুরুদ্ধ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না।)

বন্ধুসৌভাগ্যের প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করি। নির্মল চন্দ্রকে প্রথম আমার কাছে নিয়ে আসে ওর বন্ধু অনুজপ্রতিম-অনুজপ্রতিমা অমিয় ও রত্না, যশোধরা, বাগচী। অমিয় এখন ব্যস্ততম অর্থনীতিবিদ, পৃথিবীময় চরকিবাজি করছে; রত্নাও তথৈবচ, নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম সারির নেত্রী, ওদের দু'জনের সঙ্গে এখন, এই একবিংশ শতাব্দীতে, ক্বচিৎ-কদাচিৎ দেখা হয়। কিন্তু সেই যে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে নির্মল নিয়মিত আসা শুরু

করেছিল, সুখে-দুঃখে আনন্দে-সংকটে সঙ্গদান, তার কোনও যতিপাত ঘটেনি; বছর কুড়ি আগে অবধি একাই আসতো, তারপর থেকে নব-আহৃতা স্ত্রী রক্তবিজ্ঞানবিশেষজ্ঞা চিকিৎসক রুমা, যাঁর পোশাকি নাম শর্মিলা, তাকে নিয়ে। আমাদের নিবাসে এক সপ্তাহ ওদের অনুপস্থিতি ঘটলেই অস্থির হয়ে উঠি, টেলিফোনে-টেলিফোনে উত্ত্যক্ত করে তুলি।

অমিয়-নির্মলের দৌত্যেই নির্মাল্য আচার্যের সঙ্গে আমার সমীপবর্তী হওয়া, ওরা ছাত্রবয়সে কলেজে সমসাময়িক, কফি হাউসে আড্ডার শরিক, একেক জনের জীবনের প্রবাহ একেক খাতে প্রবাহিত হয়েছে, কিন্তু হৃদয়নৈকট্য বিঘ্নিত হয়নি তাতে। আমি অচিরে 'এক্ষণ'-এর আড্ডায়ও ভিড়ে গেলাম, সেই সুত্রেই পরিচয় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমলেন্দু চক্রবর্তীর সঙ্গে। একদা 'চতুরঙ্গ'-এর যে সংস্কৃতি-আভিজাত্য ছিল, যা আস্তে-আস্তে মিইয়ে যায় আতোয়ারের প্রয়াস সত্ত্বেও, তা নির্মাল্য 'এক্ষণ'-এর মধ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে নিবেদিত করে দিয়েছিলেন নিজেকে। নানা অসুবিধা, বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, আর্থিক অনটন, কিন্তু নির্মাল্য অবিচল, অবিকল। যাঁরা ঊনবিংশ শতকীয় বাঙালি উজ্জীবনের বড়াই করেন, তাঁদের কাছে আমার ঠ্যাটা জিজ্ঞাসা, বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, 'এক্ষণ' পত্রিকার উৎকর্ষের কাছাকাছি একশো বছর আগে 'বঙ্গদর্শন'ও কি পৌঁছুতে পেরেছিল? সময়বিচারের আপেক্ষিকতা মনে রেখেও এই প্রশ্ন করছি। তবে এখন তো নির্মাল্যও নেই, 'এক্ষণ'ও নির্বাপিত।

'নাউ'-তে গোড়া থেকেই নিয়মিত লিখতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু প্রথম পর্যায়ে তেমন আরাম পেতাম না। ইতিমধ্যে পশ্চিম বাংলায় রাজনীতির চেহারা যথেষ্ট পাল্‌টে গেছে, কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীরা একটু-একটু করে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন, প্রমোদ দাশগুপ্ত দক্ষিণপন্থীদের হটিয়ে দিয়ে ফের রাজ্য কমিটির হাল ধরেছেন, 'দেশহিতৈষী' ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। 'দেশহিতৈষী'-র অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা, সুধাংশু দাশগুপ্তের পাশাপাশি, সংখ্যাতত্ত্ববিদ, আমার প্রবীণ সুহৃদ, সত্যব্রত সেন। বিচিত্র জীবনযাপন করেছেন সত্যব্রতবাবু। বিখ্যাত রায়বাহাদুর দাদামশাইয়ের আদুরে নাতির শৈশব অপার বৈভবে কেটেছে বরিশাল শহরে। কিন্তু স্কুলজীবনেই অনুশীলন গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন, কলকাতায় পড়তে এসে সশস্ত্র বিপ্লবী অভ্যুত্থানের স্বপ্ন দেখেছেন সতত। মেছোবাজার বোমা-মামলায় গ্রেফতার হয়ে কয়েক বছর কারান্তরালে, ছাড়া পাওয়া মাত্র গুরুজন-আত্মীয়রা জোরজার করে বিলেতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেখানে সংখ্যাতত্ত্বে ডিগ্রি নিয়েছেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে দেশে ফিরে কলকাতায় প্রশান্ত মহলানবিশের সদ্যস্থাপিত ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের জোয়ালে বাঁধা পড়েছেন, বিদ্যা, প্রতিভা ও দক্ষতায় অধ্যাপক মহলানবিশের নজর কেড়েছেন, উনিশশো ছেচল্লিশ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ কাজে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু স্বভাব যায় না মলে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেছেন, তার প্রথম সভাপতি হয়েছেন। বছর তিনেক বাদে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন, অধ্যাপক মহলানবিশের সঙ্গে জাতীয় নমুনা সংখ্যাসংগ্রহের যজ্ঞে বৃত হওয়া। মহলানবিশ মহাশয়ের এতটা প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন সত্যব্রতবাবু যে বরানগরের চৌহদ্দিতে দুষ্টু লোকেরা তাঁকে আখ্যা দিয়েছিল 'যুবরাজ'। ফের বিদেশগমন, এবার ফিলিপিন্স দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ম্যানিলায়। ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা, সেই সঙ্গে স্থানীয় সংখ্যাতত্ত্ববিদদের নমুনা-সংখ্যাবিজ্ঞানের রহস্যে অনুপ্রবেশ করানো। বছর দু'-তিন বাদে কলকাতায় ফিরে পুনরায় ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট। অতঃপর প্রশান্ত মহলানবিশের সঙ্গে ভাব ঘুচে যাওয়া, কাজ

ছেড়ে দেওয়া, আংশিক সময়ের জন্য একটি প্রচার প্রতিষ্ঠানে সংখ্যাতত্ত্ব-পরামর্শদাতার পদগ্রহণ। পাশাপাশি সিদ্ধান্ত, সপ্তাহের অধিকাংশ সময় কমিউনিস্ট পার্টির কাজে ব্যয় করবেন। সত্যব্রতবাবু ছক কেটে নিয়েছিলেন, বিদেশে-জমানো সঞ্চয় কিছুটা পার্টিকে দেবেন, বাকিটুকু সংসার পরিচালনার্থ স্ত্রীর হাতে সমর্পণ করে সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী বনে যাবেন। তিনি প্রমোদ দাশগুপ্তের বাল্যবন্ধু, মুষ্টিমেয় যে-ক'জনকে 'তুমি' বলে প্রমোদবাবুকে সম্বোধন করতে শুনেছি, তিনি তাঁদের অন্যতম। ভাবনাদর্শের ছক দিয়ে বিচার করলে সত্যব্রত সেন অবশ্যই আধুনিক ভাষায় কট্টর উগ্রপন্থী, আরও যে-যে বিশেষণ এই প্রসঙ্গে ব্যবহার করা যায়, সব ক'টি তাঁর রাজনৈতিক প্রবণতার নিখুঁত বিশ্লেষণে পৌঁছুতে সাহায্য করবে। চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি সালে, এটা অবধারিতই ছিল, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যে দুটো গোষ্ঠী জন্ম নিল, সত্যব্রতবাবু সেই অবস্থায় বামপন্থীদের সঙ্গেই থাকবেন, তাঁদের অন্যতম প্রধান পরামর্শদাতা হিশেবে গণ্য হবেন। এই মানুষটিই অথচ সাহিত্যশিল্পরসসম্পৃক্ত, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের বন্ধু, অজিত দত্ত-শম্ভু সাহাদের সঙ্গে আড্ডায় মাততে ভালোবাসতেন : বাঙালি বহুমাত্রিকতা।

এক সঙ্গে অনেক কিছু হঠাৎ ঘটতে শুরু করলো। 'দেশহিতৈষী'-র বিক্রি হু হু করে বাড়লো, বোঝা গেল তরুণ এবং মধ্যবয়সের কমিউনিস্ট কর্মী ও সমর্থকরা, যাঁদের একটি বড়ো অংশ নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উঠে এসেছেন, তাঁদের সমর্থনের উন্মুখতা কোনদিকে। বামপন্থীদের সমর্থককুলে যোগ দিয়েছেন হাজার-হাজার শরণার্থী পরিবারের ছেলেমেয়ে; ওই মুহূর্তে দেশের হাল দেখে তাঁরা চরম থেকে চরমতর পদক্ষেপের জন্য তৈরি। এক ধরনের জমিদারি-বিলোপ আইন বেশ কয়েক বছর আগে কংগ্রেস দল কর্তৃক পশ্চিম বঙ্গ বিধানসভায় গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি; জমিদার-জোতদাররা বহাল তবিয়তে আছেন, দারোগাবাবুদের সঙ্গে তাঁদের নিবিড় দহরম-মহরম। কৃষক সভার কর্মীরাও অবশ্য হাত গুটিয়ে বসে নেই, সংগঠনের শাখাপ্রশাখা তাঁরা প্রতিটি জেলায় কম-বেশি বিস্তার করে যাচ্ছেন, প্রায়ই ছোটোখাটো সংঘর্ষ ও হামলার খবর দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠা জুড়ে। চীনের সঙ্গে বিসংবাদের ঋতুতে সোভিয়েট নেতাদের ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি আচরণ কমিউনিস্ট সভ্য ও সমর্থকদের অনেকটাই হতাশ করেছে। তাঁরা ক্রমশ চীন থেকে আমদানি-করা দলিল-দস্তাবেজ পড়ছেন, শরীরমন তাতিয়ে নিচ্ছেন। এরই কাছাকাছি সময়ে, লিন পিয়াও-এর গ্রাম-দিয়ে-শহর-ঘেরার তত্ত্ব ভারতবর্ষের, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার, আদর্শবাদীদের মন কাড়লো। ওই তত্ত্বের প্রয়োগ কবে থেকে আমাদের দেশে সম্ভব হবে, তা ভেবে তাঁরা চঞ্চল-উসখুশ। এমনকি বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা করার, প্রাথমিক প্রস্তুতি রচনা করারও যেন প্রয়োজন নেই, তার আগেই বুঝি গ্রামে-গ্রামে সাম্যবাদী সৈনিক তৈরি করে, তাদের ব্যূহবদ্ধ করে, কলকাতার মতো শহর ঘিরে ফেলা দরকার, বিপ্লবসাধনের প্রক্রিয়াই তো এক অর্থে খোলনল্‌চে উল্টে দেওয়ার পালা। লিন পিয়াও-সংকলিত সেই উত্তেজক দলিলটির একটি ছাপানো বয়ান একদিন সত্যব্রতবাবু আমার হাতে দিয়ে বললেন, অবিলম্বে আড়াইশো-তিনশো কপি প্রয়োজন। আমার বিবেকমুক্ত মন, সোজা ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে এসে বশংবদ টাইপিস্টদের দৌলতে স্টেনসিল কেটে নির্দিষ্টসংখ্যক কপি তৈরি করে ফেললাম।

আমার পূর্বপরিচিত, নতুন দিল্লিতে ভূপেশবাবুর-কমিউনে-অবস্থানরত দ্বিজেন্দ্র নন্দী, এরই মধ্যে বোমা ফাটালেন। রাজধানীস্থ মহাফেজখানায় তাঁর ঘন-ঘন যাতায়াত ছিল সেটা

জানতাম, কিন্তু কেন যেতেন তা বোঝা গেল যখন চৌষট্টি সালের গোড়ার দিকে তিনি সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করলেন শ্রীপদ অমৃত দাঙ্গে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় লম্বা শাস্তি পাওয়ার পরও কী জাদুতে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই কারামুক্ত হয়ে এসেছিলেন, সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনের সূত্র, দাঙ্গে মশাই ইংরেজ শাসকদের কাছে গোপন দাসখত লিখে দিয়েছিলেন, দ্বিজেনবাবুর সেরকম দাবি। চারদিকে হইহই, দাঙ্গে তখনও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান, পার্টির জাতীয় পরিষদের বৈঠকে প্রচণ্ড হট্টগোল। আদর্শগত, কৌশলগত পার্থক্য, পরিষদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সংখ্যাধিক্যের মর্জি না-মেনে বেরিয়ে এলেন। সরকারিভাবে কমিউনিস্ট পার্টি এপ্রিল মাসে দু'ভাগ হয়ে গেল। আমার পিতৃদেব তখন মৃত্যুশয্যায়। এই ভাঙনের খবরে সম্পূর্ণ বাইরের মানুষ হয়েও তিনি বাড়তি মনস্তাপে ভুগছিলেন। শ্বাসকষ্ট, প্রায়ই নাড়ি নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে, তবু এরই মধ্যে আমার দিকে কাতর নয়নে চেয়ে অস্ফুটে বললেন, দেশে কমিউনিজম আসা পঁচিশ বছর পিছিয়ে গেল। ভদ্রলোক ঠিক না বেঠিক বলেছিলেন তা আজও নির্ণয় করতে পারিনি।

সংসার ভাগ হলে গৃহশত্রুতা চরমে ওঠে। কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রেও তাই হলো। প্রথম দু'এক বছর মনে হয়েছিল হয়তো দু'দিকেই পাল্লা সমান। কিন্তু বিহার ও অন্ধ্র প্রদেশ বাদ দিয়ে অন্য সর্বত্র বামপন্থী কমিউনিস্টরা, যাঁরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) নামে পরিচিতি পেলেন, অতি দ্রুত সমর্থকসংখ্যা বাড়াতে সফল হলেন। তাঁরা আলাদা পার্টি কংগ্রেস আহ্বানের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। প্রথমে অন্ধ্র প্রদেশের তেনালি শহরে ছোটো একটি বৈঠক, স্রেফ নেতাদের নিয়ে। তারপর নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় কংগ্রেস, দক্ষিণ কলকাতার ত্যাগরাজ হলে। দিল্লি এবং পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস সরকার গোড়া থেকেই বুঝতে পারছিলেন কারা শত্রু কারা মিত্র, পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে তাঁরা আঘাত হানলেন। প্রথম সারির নেতাদের বিনা বিচারে আটক করা হলো, কোনও দুর্জ্ঞেয় কারণে একমাত্র জ্যোতি বসুকে বাদ দিয়ে। মাঝারি স্তরের নেতা এবং বহু সাধারণ কর্মী, যাঁরা লুকোতে পারলেন না আবার শ্রীঘরে গেলেন, মুক্তি পাওয়ার পর এক বছর না ঘুরতেই। গুলজারিলাল নন্দ তখন কেন্দ্রে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সংসদে ঘোর চেঁচামেচি হওয়াতে তিনি একটি বিস্তারিত 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করলেন : মাননীয় সংসদ সদস্যরা ধারণাও করতে পারবেন না বাম কমিউনিস্টরা কী ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাঁরা আমাদের শত্রুদেশ চীন থেকে প্রেরণা পাচ্ছেন; তার উপর চোরাগোপ্তা পথে চে গুয়েভারার লেখা গেরিলা যুদ্ধশাস্ত্রের কেতাব তোরঙ্গ ভর্তি করে আমদানি করছেন; সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য আঁটঘাট বেঁধে তৈরি হচ্ছিলেন তাঁরা, এই অবস্থায় তাঁদের বিষদাঁত ভেঙে দিয়ে, তাঁদের ফের কয়েদ না করে উপায় ছিল না! অন্য শরিকের কমিউনিস্টরা মহা খুশি, তাঁদের ধারণা হলো এবার ফাঁকা মাঠে গোল দিতে পারবেন! সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে আদৌ তাঁরা বুঝতে পারেননি সে সময়।

'নাউ' তখনও শৌখিন বুর্জোয়াদের জন্য শৌখিন নির্বিষ পত্রিকা। রাজনীতির, কিংবা কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনের, ছিটেফোঁটা নেই। ঝাঁকে-ঝাঁকে সি পি আই (এম) নেতাদের গ্রেপ্তার হওয়ার সপ্তাহে আমি ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের দপ্তরে বসে এক দুপুরবেলা ইত্যাকার গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে, সরকারকে প্রচণ্ড গালাগাল দিয়ে, এক প্রবন্ধ রচনা করলাম। সেটা হাতে নিয়ে সোজা সমর সেনের সম্পাদকীয় দফতরে। সমরবাবু একটু বিচলিত, একটু দোদুল্যমান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় পুরো লেখাটি

ছাপিয়ে দিলেন। হুমায়ুন কবিরের চক্ষুস্থির, কলকাতার বামপন্থী মহলে উৎসাহের ঢল। এক সপ্তাহে 'নাউ'-এর বিক্রি তিনগুণ বেড়ে গেল। দু'দিন বাদে বন্দীমুক্তির দাবি জানিয়ে সি পি আই (এম)-এর তরফ থেকে ময়দানে জমায়েত। সাধারণ লোকের মনে অনিশ্চয়তা, তা সত্ত্বেও যথেষ্ট ভিড়। প্রধান বক্তা জ্যোতি বসু, বলতে শুরু করার মিনিট দশেকের মধ্যেই তিনি 'নাউ' পত্রিকা থেকে আমার লেখা সেই সম্পাদকীয় নিবন্ধটি পুরো পড়ে শোনালেন, সঙ্গে-সঙ্গে তা বাংলাতেও অনূদিত হলো। জ্যোতিবাবু সবশেষে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে মন্তব্য জুড়ে দিলেন, 'শুনতে পাই পত্রিকাটির মালিক নাকি হুমায়ুন কবির'। পরদিন সমরবাবুর কাছে যখন জ্যোতিবাবুর মন্তব্যের উল্লেখ করলাম, তাঁর একটি বিরক্তিসূচক রূঢ় শব্দের উচ্চারণ। হয়তো সমরবাবু আশঙ্কা করছিলেন, তেমন বেশি মাতামাতি-কানাকানি হলে হুমায়ুন কবির অচিরেই রাশ টানবেন।

কবির সাহেবের চিন্তান্বিত হওয়ার যথার্থ কারণ ছিল। আমি আগল খুলে দিলাম, সমরবাবু নিজেও এখন থেকে গরম-গরম রাজনৈতিক মন্তব্য-ঠাসা সম্পাদকীয় লেখা শুরু করলেন, আমার লেখা তো অব্যাহত ছিলই। কিছুদিনের মধ্যেই প্রতি সপ্তাহে একটি করে কলকাতা ডায়েরিও লিখতে শুরু করলাম, নিজের নামের ইংরেজি আদ্যাক্ষর এ এম ব্যবহার করে। পরে কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর উনিশশো বাহাত্তর সালে ডায়েরিটির 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি'-তে পুনর্জন্ম হয়। তার আয়ু এখনও ঠিক ফুরিয়ে যায়নি, তবে, আমার সন্দেহ মহীনের বুড়ো ঘোড়াদের মতো এখন তার হাল।

কাকতালীয় হতে পারে, না-ও পারে, যে কারণেই হোক, 'নাউ' যতই উগ্র বামপন্থী চেহারা নিল, বিক্রি ততই বাড়লো। ক্রমে দশ হাজার ছাড়িয়ে গেল। কোথায় তিনি খুশি হবেন, হুমায়ুন কবিরের কপালে ভাঁজ। তিনি পুরোপুরি আশা তখনও ছাড়েননি, হয়তো ভেবেছিলেন সমরবাবুর সাময়িক বিপথগমন, শুধরে নেবেন। এটা তো মানতেই হয়, হুমায়ুন কবির অতীব ভদ্রলোক ছিলেন, তদুপরি সমরবাবু তাঁর সাক্ষাৎ ছাত্র, অতি প্রিয় ছাত্র। সমরবাবুর ঠোঁটকাটা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর তো পরিচয় ছিল, পর্যাপ্ত ভয়ই পেতেন প্রিয় ছাত্রটিকে।

নেতারা অধিকাংশই কারান্তরালে, কয়েক সপ্তাহ বাদে জ্যোতিবাবুকেও কয়েদ করা হলো। কিন্তু সি পি আই (এম)-এর ক্রমবর্ধমান প্রভাব বোধ করা গেল না। চীন যুদ্ধের সময় ও তার পরবর্তীকালে যে-কংগ্রেস সরকার পশ্চিম বঙ্গে প্রশাসনের দায়িত্বে ছিল, তা সর্ব অর্থে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। প্রত্যন্ত গ্রামেও ক্রমবর্ধমান অশান্তি, কলকাতা, শহরতলি ও মফস্বলে, গ্রামে-শহরে। অগুন্তি মিছিলের ঠাসা সমারোহ, সাধারণ মানুষের প্রতিবাদী ঝোঁক উঁচু মাত্রায় উঠে যাওয়া। এমনটা না হলেই প্রকৃতিবিরুদ্ধ হতো; নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিশপত্রের দাম নিত্য বাড়ছে, খাদ্য সরবরাহে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ঘাটতি, গ্রামে জোতদার-পুলিশের যৌথ বিক্রম।

এই পটভূমিকাতেও অথচ, কেউ-কেউ বলবেন অবধারিত, কমিউনিস্টদের অর্ন্তদ্বন্দ্ব। এক পক্ষে, ক্রুশ্চেভের প্রতিধ্বনি তুলে, স্ট্যালিন-নিন্দা, অন্য পক্ষে কিন্তু স্ট্যালিন-বন্দনা অব্যাহত। আদর্শবৈষম্যের সঙ্গে ক্রমে ব্যক্তিগত সংঘাতের সংযোজন। বামপন্থীরা স্ট্যালিনের এতটুকু অসম্মান হতে দেবেন না, দক্ষিণপন্থীরা উগ্র স্ট্যালিনবিরোধী। একমাত্র ব্যতিক্রম অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তিনি বরাবর দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে আছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে স্ট্যালিনভক্তিতেও অবিচল।

ওই বাজারে বামপন্থী কমিউনিস্টরা যেহেতু চীনের সঙ্গে সীমান্তসংঘর্ষ

আলাপ-আলোচনান্তে মিটিয়ে আনতে আগ্রহবান, সরকারের পেটোয়া খবর কাগজমহলের মতে তাঁরা আসলে 'দেশদ্রোহী'। সম্ভবত পঁয়ষট্টি সালের এক বসন্তসন্ধ্যা, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে সংবাদপত্র জগতের এক কেষ্টবিষ্টুর সঙ্গে আলাপ হলো, ভালোই লাগলো আলাপ করে। ক'দিন বাদে অরুণকুমার সরকারের সঙ্গে দেখা, উক্ত ভদ্রলোক অরুণকে বলেছেন, 'তোমার বন্ধু অশোক মিত্রের সঙ্গে পরিচয় হলো। এমনিতে তো ভদ্রই ঠেকলো, তবে দেশদ্রোহী কেন?'

পঁয়ষট্টি সালের মার্চ মাসে, সদ্য-স্বাধীন আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার শহরে ওদেশের কর্তৃপক্ষ একটি অ্যাফ্রো-এশীয় আর্থিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করলেন, অনেকটা সেই আটচল্লিশ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলনের ধাঁচে: সারা পৃথিবীর কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট-ভাবাপন্নদের মিলনোৎসব। ঘোষিত উদ্দেশ্য আলজেরিয়ার যুদ্ধজয়কে, স্বাধীনতালাভকে, বন্দনা জানানো। এই স্বাধীনতা তো মুফতে আসেনি, অনেক রক্ত ঝরেছে, নারী-পুরুষ-শিশুর অনেক আত্মাহুতি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলজেরিয়ার টগবগে আরব প্রজাকুল খোলা আকাশের নিচে স্বাধীন নিঃশ্বাস নেওয়ার অধিকার অর্জন করেছেন। উপনিবেশবিলাসী ফরাশি বাসিন্দারা কেউ-কেউ ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করেছেন, কারও-কারও মরোক্কো বা ট্যানজিয়ার্সে প্রস্থান; অনেকে পালিয়ে গিয়েছেন সংগোপন গ্রামে। এখন নব অরুণোদয়ের জয় ঘোষণা, সেই উদ্দেশ্যেই সম্মেলনের উদ্যোগ, পৃথিবীব্যাপী উপনিবেশ-বিরোধী বিপ্লবী সংগ্রামের দুন্দুভি সূচনা। এই সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি যে-ছয় জন গিয়েছিলাম, তাঁদের দলপতি আমার শিক্ষক অমিয় দাশগুপ্ত মহাশয়। বাকি পাঁচজন প্রত্যেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত, অথবা পার্টির কাছাকাছি। ইতিমধ্যে সোভিয়েট-চীন রেষারেষি চরমে গিয়ে ঠেকেছে। সম্মেলনে পৌঁছে দেখা গেল, চীনে প্রতিনিধিরা যা বলছেন, সোভিয়েট প্রতিনিধিরা সঙ্গে-সঙ্গে তার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, যুক্তির সারবত্তা সে-প্রতিবাদে থাকুক না থাকুক, কিছু যায় আসে না। ভারতবর্ষ থেকে যাঁরা গেছেন, মাস্টারমশাই ও আমাকে বাদ দিয়ে, সবাই সোভিয়েট-অনুসারী, আমার সঙ্গে খুচখাচ দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। তবে এ সমস্ত বিসংবাদ ছাপিয়ে আমাদের চেতনা জুড়ে নবলব্ধ স্বাধীনতা নিয়ে আলজেরিয়দের উল্লাসের উন্মাদনা। বিদেশী অতিথিদের প্রতি তাঁদের চুঁইয়ে-পড়া সম্প্রীতি। অর্থনৈতিক সম্মেলন নয়, যেন আমরা এক মহোৎসবে যোগ দিয়েছি। মেয়ে-পুরুষ সবাই আশ্চর্য সুন্দর, কিছু-কিছু মহিলা তখনও বোরখার আড়ালে, কিন্তু স্বাধীন দেশ, তাঁরাও জানেন এখন থেকে মুক্তির নিঃশ্বাসে তাঁদের সমান অধিকার, বোরখার আড়াল থেকে তাঁদের সহাস্যমুখ বেরিয়ে আসছে। দৃপ্ত হাত আকাশের দিকে উঠছে, নামছে; বোরখার নিম্নপ্রান্ত থেকে যে-সুডৌল পায়ের আভাস, তাতেও উচ্ছল হরিণীর গতি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান হোতা ও নব-নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি, বেন বেল্লা, আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এলেন। চমৎকার ভাষণ দিলেন, আমরা অভিভূত। অভিভূত হওয়ার আরও কিছু বাকি ছিল : হঠাৎ সম্মেলনের বিশাল কক্ষে গুঞ্জন, খবর এসেছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কিউবার প্রতিনিধিবৃন্দ এসে পৌঁছুবেন, তাঁদের নেতা স্বয়ং চে গুয়েভারা। আমরা চমকিত, আমরা আলোড়িত। একটু বেশি রাত্রে গুয়েভারা এলেন, মঞ্চময় হর্ষধ্বনি। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, আগাগোড়া সৈনিকের ফিকে সবুজ পরিধেয়। সৌম্য মুখমণ্ডল, গালময় একটু-একটু হাল্কা দাড়ি। চে দু'ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিলেন। কিউবা যুদ্ধ আর আলজেরিয়ার যুদ্ধ যে একই সংগ্রাম, গোটা পৃথিবীতে নিপীড়িত মানুষের যুদ্ধের যে কোনও দেশবিভাগ

নেই, সে বিষয়ে বিস্তৃত হলেন। পৃথিবীময় মার্কিন অর্থনৈতিক শোষণের চিত্র বিশ্লেষণ করলেন, সভাকক্ষময় ঘন-ঘন উচ্ছ্বাসমন্দ্রিত করধ্বনি, ঘন-ঘন লাল সেলামের বজ্রমুষ্টি উত্তোলন। গুয়েভারার ভাষণ শেষ, প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হলো, তাঁরা সার বেঁধে মঞ্চে যাবেন, গুয়েভারার সঙ্গে করমর্দন করে কৃতার্থ হবেন। তিনি সানন্দে রাজি।

আমার যখন পালা এলো, আমার মাথা তাঁর ঘাড়েরও নিচে, হঠাৎ অমিত শক্তশালী তিনি আমাকে দু'হাতে শূন্যে ছুঁড়ে সঙ্গে-সঙ্গে ধরে ফেলে আলিঙ্গনবদ্ধ করলেন। তারপর যা বললেন, তার সারমর্ম : 'আমি শুনতে পেলাম তোমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমার সম্বন্ধে কীসব ভয়াবহ উক্তি করেছেন, আমি নাকি কীসব খারাপ কথাবার্তা লিখে তোমাদের কুপরামর্শ দিয়েছি, তোমাদের খারাপ জিনিশের জোগান দিয়েছি। দোহাই, তুমি দেশে ফিরে তাঁকে বোলো, আমার মতো নির্দোষ শান্তিপ্রিয় মানুষ হয় না, তুমি নিজেই তো দেখছো, আমার দশটা হাত-দশটা পা নেই'। সেই সঙ্গে অট্টহাস্য।

আলজেরিয়া থেকে ফিরে আসার এক মাসের মধ্যেই দুটো মস্ত খবর আমাদের কাছে পৌঁছুল, অবসন্ন বোধ করলাম। প্রথম খবর, আলজেরিয়ায় অভ্যুত্থান ঘটে গেছে, বেন বেল্লা আর রাষ্ট্রপতি নন, তাঁর জায়গায় অন্য একজন ক্ষমতা দখল করেছেন, যাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তখনও তেমন স্পষ্ট নয়। অন্য যে সমাচার সারা পৃথিবীকে যুগপৎ বিভ্রান্ত ও মোহিত করলো, চে গুয়েভারা আর কিউবাতে নেই, তিনি লাতিন আমেরিকার দেশে-দেশে বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্ব সূচনার তাগিদে উধাও হয়ে গেছেন, পাহাড়ে-জঙ্গলে তখন থেকে তাঁর প্রব্রজ্যা, সঙ্গে মাত্র গুটিকয় বিশ্বস্ত কমরেড। এখন ভেবে বিস্ময় লাগে, যে-ক'জন মুষ্টিমেয় ভারতীয় চে গুয়েভারার সঙ্গে করমর্দন করেছেন, আলিঙ্গনবদ্ধ হয়েছেন, আমি তাঁদের অন্যতম। বয়স গড়িয়ে গেছে, আমি বার্ধক্যের দরজায় উপনীত, তবু বারংবার মনে হয়, এই সৌভাগ্যের তুলনা নেই।

সতেরো

কলকাতায় বামপন্থী আন্দোলনের ক্রমশ সবল থেকে সবলতম হয়ে ওঠা, সি পি আই (এম)-এর ব্যূহ গঠন অব্যাহত। প্রতিদিন রাজপথে-জনপথে শ্রমজীবী মানুষ-সরকারি-সদাগরি কর্মচারীদের অকুতোভয় মিছিল, লেখক ও শিল্পী সংঘও ফের নতুন উদ্যমে চঞ্চল। সম-পরিমাণ বেশি আলোড়ন উৎপল দত্ত ও তাঁর লিটল থিয়েটার গ্রুপকে ঘিরে। উৎপল 'অঙ্গার' ও 'ফেরারী ফৌজ' পেরিয়ে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করেছেন। নাটক নিয়ে তাঁর নানা পরীক্ষায় অন্তহীন আগ্রহ, প্রসেনিয়াম থেকে একটি সরু লম্বা পাটাতন বের করে প্রেক্ষাগৃহকে দ্বিখণ্ডিত করে চমক সৃষ্টির রচনায় আপাতত তিনি মগ্ন। এই প্রয়াসের একটি প্রায়-দার্শনিক ব্যাখ্যা নিয়েও তিনি প্রস্তুত। সেই সঙ্গে তাপস সেনের আলোর জাদু। 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ অভিনয় করতে বিজন ভট্টাচার্যকে ধরে-পড়ে উৎপল নিয়ে এসেছেন, নির্মলেন্দু চৌধুরীকেও, গানের জোয়ারে ভাসিয়ে দিতে। তবে কলকাতার দর্শক বড়ো বেশি শহরমন্যতা-রোগজীর্ণ, 'তিতাস একটি নদীর নাম' পছন্দ করলেন না। পরোয়া নেই, উৎপলের অদম্য উৎসাহ, দু'মাসের মধ্যেই 'কল্লোল' নাটকের পাণ্ডুলিপি তৈরি। এই নাটকের বক্তব্যের সঙ্গে কলকাতার মধ্যবিত্ত নাগরিক মানসিকতার অদ্ভুত সাযুজ্য ঘটলো। প্রধান চরিত্রে শেখর চট্টোপাধ্যায়, খলনায়ক ইংরেজ নৌসৈনাধ্যক্ষ উৎপল নিজে। নাটকে মহিমাময়ী মাতার ভূমিকায় শোভা সেনের ধাঁধা-লাগানো অভিনয়, বিদ্রোহী রেইটিংদের অন্যতম চরিত্রে নির্মল ঘোষের স্বচ্ছন্দ কলা-নৈপুণ্য এখনও চোখের সামনে ভাসছে। উৎপলের সাহসের তো অবধি নেই, তাপস সেনের সঙ্গে পরামর্শ করে কোথা থেকে এক তরুণ মঞ্চ-স্থপতিকে জোগাড় করে আনা হলো, লিটল থিয়েটার গ্রুপের সাবেক মঞ্চসজ্জা-নির্দেশক নির্মল গুহরায় কোনও বৃত্তি নিয়ে তখন ফরাশি দেশে। এঁরা তিনজন, উৎপল, তাপস সেন, সুরেশ দত্ত, একটা গোটা খাইবার জাহাজের প্রতিরূপ মঞ্চে উপস্থাপন করলেন। বিদ্রোহের মুহূর্তে মঞ্চের আধো-অন্ধকারে বিদ্যুৎক্ষেপণের পরিষঙ্গে লাল ঝাণ্ডার আস্তে-আস্তে উপরে উঠে যাওয়া, সেই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের অনির্বচনীয় মূর্ছনা। দর্শককুল ঠিক যেন বুঝতে পারছিলেন না, তাঁরা নাটক দেখছেন, না কি বিপ্লবের সক্রিয় দোসর হচ্ছেন। প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে করধ্বনি, হর্ষধ্বনি, এমনকি লাল ঝাণ্ডাকে অভিবাদন জানিয়ে স্তুতিনাদ, সব-কিছুর একসঙ্গে মিলে যাওয়া, মিশে যাওয়া।

ভিড় ভেঙে পড়ছে, মিনার্ভা থিয়েটারের বাইরে ভোর থেকে লম্বা লাইন। গ্রাম থেকে, মফস্বল থেকে নাট্যামোদীরা আসছেন, টিকিট সংগ্রহ করতে না পেরে আদর্শবাদীরা হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন, ফের আসছেন, অবশেষে মনস্থির করে দুই কি তিন সপ্তাহ বাদে কোনও অভিনয়-তারিখের টিকিট কেটে বিদায় নিচ্ছেন। বাইরের কলরোল, মিনার্ভা প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরে লাল ঝাণ্ডার আস্ফালন, পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অবশ্যম্ভাবী আশু বিপ্লবের

নান্দীমুখ ঘোষণা করছে যেন।

শাসককুল চিন্তান্বিত, উৎপল দত্তের বাড়াবাড়ি সি পি আই (এম)-কে বাড়তি মদত দিচ্ছে দিনের পর দিন। বামপন্থী কমিউনিস্টদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে যে লিটল থিয়েটার গ্রুপ এসব ফিচকেমি করছে, তাতে, তাঁদের কাছে অন্তত, সন্দেহের অবকাশ নেই। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নীলদর্পণ নাটক যে আইনের আশ্রয় নিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তা প্রয়োগ করতে তবু ঈষৎ দ্বিধা ও লজ্জাবোধ। একটি নতুন আইনের খসড়া তৈরি হলো, যার ধারাগুলিও সমান প্রতিবাদ-অসহিষ্ণু। কারা তখন শাসক মহলের প্রধান-প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন, তা আজ পর্যন্ত ঠিক জানা যায়নি। ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো, বাংলার জনগণের স্বদেশপ্রেমের আবেগে ঝাঁকুনি দিয়ে আবেদন করতে হবে, 'কল্লোল' দেশদ্রোহীদের নাটক, দেশকে নিন্দাবাদ করা হয়েছে এই নাটকে, সমস্ত দেশবাসীর কর্তব্য 'কল্লোল' থেকে দূরে থাকা, উৎপল দত্তকে ভাতে মারা। একটি মাত্র দৈনিক বাদ দিয়ে অন্য সমস্ত সংবাদপত্র 'কল্লোল'-এর প্রচারবিজ্ঞপ্তি ছাপা বন্ধ করে দিলেন। কংগ্রেস দল, এবং সেই সঙ্গে, আমার সন্দেহ, দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট বন্ধুদের পক্ষ থেকে নাট্য-সমালোচকদের উৎসাহ দান করা হলো 'কল্লোল' নাটকের এক ঝাঁক বিরূপ সমালোচনা প্রকাশ করতে। কিন্তু 'কল্লোল' স্তব্ধ হলো না। সাধারণ মানুষের গোঁ চেপে গিয়েছিল, লিটল থিয়েটার গোষ্ঠীরও। বোধহয় তাপস সেনের মাথাতেই প্রথম ভাবনাটির উদয় হয়, ছোট্ট একটি হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে লক্ষ-লক্ষ কপি, কলকাতা শহরময় এবং মফস্বলে, দেওয়ালে দেওয়ালে, গাছের গুঁড়িতে, রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, যাত্রীবাহী বাসের পৃষ্ঠদেশে ছড়িয়ে পড়লো: 'কল্লোল' চলছে, চলবে। পশ্চিম বাংলার সর্বত্র প্রতিধ্বনি রণিত: 'কল্লোল' চলছে, চলবে। পরশ্রীকাতর ও চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্র শুধু ব্যর্থই নয়, সেই সঙ্গে 'চলছে, চলবে' এই দ্বিশব্দবন্ধনী বাংলা ভাষায় প্রচলিত বুকনির অবধারিত অঙ্গে পরিণত হলো।

থমথমে অবস্থা, সব-কিছু জড়িয়ে মানুষের মনে পুঞ্জিত বিক্ষোভ, গ্রামাঞ্চলেও জমির লড়াই-মজুরির লড়াই ধীরে-ধীরে সংহততর হচ্ছে। সামনের দিকে তাকিয়ে সত্যিই বোঝা যাচ্ছিল না অতঃপর কী হতে যাচ্ছে। ঘোরের মধ্যে আছি, এরই মধ্যে আর এক দফা বিদেশ ঘুরতে যাওয়া। উনিশশো পঁয়ষট্টি সালের অগস্ট মাস, বেলগ্রেডে রাষ্ট্রসংঘ আহূত বিশ্ব-জনসংখ্যা সম্মেলন। গবেষণাপ্রবন্ধ পড়বার নিমন্ত্রণ ছিল আমার। এ সমস্ত সম্মেলনে সাধারণত যা হয়, মোচ্ছবের পরিবেশ, নানা দেশ থেকে জড়ো হওয়া পণ্ডিত-পণ্ডিতম্মন্যদের প্রায় উদ্দেশ্যহীন ভিড়। অবশ্য ঠিক উদ্দেশ্যহীনও নয়: আমি তোমার আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করে দিয়েছি, এবার অন্য কোনও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তুমি আমার আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করবে, এই গোছের বোঝাবুঝি। সুতরাং সম্মেলনের বিভিন্ন বৈঠকে যা আলোচনা হতো তা গৌণ, জড়ো-হওয়া পণ্ডিতদের পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার সমারোহই প্রধান উপলক্ষ্য। ওয়াশিংটনে আমার এক প্রাক্তন ছাত্র যুগোশ্লাভিয়ার জাতীয় বিনিয়োগ ব্যাংকে সর্বোচ্চ পদে সমাসীন। সে হাঙ্গেরির সীমান্তবর্তী এক বনে আমাদের কয়েকজনকে সপ্তাহান্ত কাটাবার ব্যবস্থা করলো। নির্জন নিভৃত বন, চমৎকার থাকবার জায়গা, সকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত প্রহরের পর প্রহর জুড়ে পানাহারের আয়োজন। আমার বার-বার মনে পড়ছিল বিষ্ণুবাবুর ব্যঙ্গ-শাণিত উক্তি, 'আর্কেডিয়া কী বুঝবে তাই'।

সম্মেলনের ঢক্কানিনাদ সহকারে সমাপ্তি ঘোষণা। আমি আর আমার এক মার্কিন বন্ধুর একটি গাড়ি ভাড়া করে যুগোশ্লাভিয়া থেকে দেশের পর দেশ পেরিয়ে আমস্টারডাম পর্যন্ত

ঘুরতে-ঘুরতে পৌঁছুনো। দু'জনে পালা করে গাড়ি চালাচ্ছি, যেখানে খুশি থামছি, জাদুঘর দেখছি, চিত্রশালা দেখছি, রাত্রি যাপন করছি, মিউনিখ কিংবা স্টুডগার্টে অর্কেস্ট্রা শুনছি, অটোবানের মসৃণ সুখবিলাস। দিন দশেক বাদে আমস্টারডামে গাড়ি জমা দিয়ে বন্ধুটি আমেরিকার প্লেনে চাপলো। ফ্রান্সের ব্রিটানি অঞ্চলে খটোমটো কী একটি অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে বিশেষজ্ঞ বৈঠকে আমার যোগ দেওয়ার পালা এবার। সেই বৈঠক শেষে, আগে থেকেই খুরশীদকে জানানো ছিল, প্যারিস থেকে প্লেনে চেপে করাচি পৌঁছে কয়েকটা দিন ওদের সঙ্গে কাটাবো। খুরশীদ সদ্য-বিবাহিতা। তার নতুন-পাতা সংসারের আমেজে স্নিগ্ধ হবো, মনে এরকম ইচ্ছা।

ভোরবেলা করাচিতে বিমান থেকে নেমে সব কিছু একটু যেন অন্যরকম লাগলো, আমার টিকিটে-পাসপোর্টে-ভিসায় কোনও গোলমাল নেই, পরিখার এপার থেকে দেখতে পাচ্ছি ওপারে খুরশীদের স্বামী হায়দরভাই আমার জন্য অপেক্ষমান, তবু অভিবাসন কর্মচারী ও পুলিশ প্রহরীদের কী যেন বলতে গিয়ে থেমে যাওয়া, মিনিট পনেরো-কুড়ি বাদে পাসপোর্টে সিলমোহর পড়লো, তা আমাকে প্রত্যর্পণ করা হলো, পরিখার ওপারে গেলাম, মালপত্রসুদ্ধু হায়দরভাইয়ের সঙ্গে গাড়িতে উঠলাম। হাওয়াই আড্ডা থেকে নিষ্ক্রমণ, চওড়া মসৃণ পথ, গাড়িতে যেতে-যেতে হায়দরভাই রহস্যটি ভাঙলেন : আগের রাতে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় বাহিনী এদিকে ঢুকেছে, সীমান্তের অন্য কোনও অংশে পাকিস্তান বাহিনী ভারতে ঢুকেছে, অনেক বলে-কয়ে ওঁরা প্লেন থেকে নামবার মুহূর্তে আমাকে যাতে আটক না-করা হয় সে-ব্যবস্থা করেছেন, এখন যে করেই হোক আমাকে ভারতবর্ষে ফেরত পাঠাতে হবে। জল্পনা করতে-করতে খুরশীদদের বাড়িতে পৌঁছুলাম, অভ্যর্থনার উচ্ছ্বাসে হ্রস্বতা নেই, তা হলেও দুশ্চিন্তার একটি কালো ছায়া সকলেরই চোখে-মুখে। আমাকে আশ্বস্ত করা হলো, চিন্তার কোনও কারণ নেই, খুরশীদের ছোট বোনের স্বামী পাকিস্তানের খোদ আইনমন্ত্রী, তিনি লেগে আছেন, একটা ব্যবস্থা হবেই, রাত বারোটা নাগাদ কে এল এম-এর একটি বিমান নামছে, করাচি থেকে ফের উড়ে সেটা মুম্বই যাবে, আমাকে সেই বিমানে তুলে দেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকারের সর্বোচ্চ মহলে কলকাঠি নাড়া হচ্ছে। আমি নিরুদ্বিগ্ন, দায়িত্ব তো আমার নয়, যাঁদের অতিথি তাঁদের, সুতরাং আবহাওয়া হালকা করতে প্রয়াসী হলাম, দিনভর সবাইকে নিয়ে কৌতুকে মেতে থাকা, খুরশীদদের বাবা-মাকে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে আসা, বিকেল চারটে নাগাদ খবর পাওয়া গেল মুশকিল আসান, ওই বিমানে আমার যাওয়ার অনুমতি মিলেছে। রাত সাড়ে দশটায় অন্যদের কাছে বিদায় নিয়ে হাওয়াই আড্ডায় প্রত্যাবর্তন, সঙ্গে খুরশীদ ও হায়দারভাই। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ অন্য যাত্রীরা উঠবার আগে আমাকে এক জঙ্গি অফিসার বিমানে বসিয়ে দিয়ে শুভেচ্ছাজ্ঞাপন করে বিদায় নিলেন, ইতিমধ্যে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আরও জমে উঠেছে।

মুম্বই পৌঁছে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চার্চিল চেম্বার্স, শচীনদার ফ্ল্যাটে, ওই ফ্ল্যাটে তো তিথি মেনে কেউই কোনওদিন যায় না, সুতরাং আমিও নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন। পৌঁছে দেখি শচীনদা বিছানার উপর বসে আছেন, আমাকে দেখে যেন একটু কুণ্ঠিত, তাঁর সেই গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া-কাঁপানো উচ্চকণ্ঠ হাসি অনির্গত। কয়েক মুহূর্ত বাদে জানতে পারলাম, দিন কুড়ি আগে শচীনদার গুরুতর হৃদ্‌রোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছে, কোনওক্রমে সামলে নিয়েছেন, এখন বেশ কয়েক সপ্তাহ সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে, সবরকম আড্ডা বরবাদ। শচীনদার

কুণ্ঠার কারণও সেটা, চিকিৎসকদের নির্দেশ অমান্য করতে ঠিক সাহস পাচ্ছেন না, অথচ আমি মুম্বইতে, চার্চিল চেম্বার্সে, কিন্তু আড্ডার প্রসঙ্গ উহ্য, এ তো অভাবনীয় পরিস্থিতি! যা-ই হোক, তিন-চার দিন ওঁর সঙ্গে কাটিয়ে, ওঁকে যথাসম্ভব কথা না বলতে দিয়ে, আমার দিক থেকে একপেশে কথা চালিয়ে অতঃপর কলকাতায় ফেরা। কলকাতায় পৌঁছে আবিষ্কার করলাম, থমথমে ভাব আদৌ কমেনি, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধহেতু আরও বেড়েছে, নতুন করে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ধরপাকড় শুরু হয়েছে, ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক নিয়ে 'দেশহিতৈষী'-র শারদ সংখ্যায় উৎপল দত্ত-র কী একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে, তা ছুতো করে উৎপলকে জেলে পোরা হয়েছে, যদিও আসল কারণটি স্পষ্ট : উৎপলবিহীন 'কল্লোল'-এর অভিনয় নিজে থেকেই, আশা, বন্ধ হয়ে যাবে। তবে মাত্র কয়েক বছরে সমাজের মেজাজ আদ্যোপান্ত পাল্টে গেছে। যুদ্ধের ভণিতা লোকমানসে কোনওই দাগ কাটতে পারছে না, বরঞ্চ উৎপল ও অন্যান্য বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে সরকারের বুজরুকি যেন সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্টতর। উৎপলের সঙ্গে জোছন দস্তিদারকেও ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সমস্ত নাট্যগোষ্ঠী এক কাট্টা, একশো চুয়াল্লিশ ধারার পরোয়া না-করে প্রতিদিন প্রতিবাদ মিছিল বেরোচ্ছে, নাট্যশিল্পী ও কর্মীদের মিছিলের সঙ্গে সর্বস্তরের নাগরিকদের প্রতিবাদী পদধ্বনিও একসঙ্গে রণিত। লিটল থিয়েটার গ্রুপের একদা-সম্পাদক, বাউন্ডুলে মার্কসবাদী, বিপ্লবের জন্য, লোকপরিবাদ, সব সময়ই দু'-পা এগিয়ে থাকা রবি সেনগুপ্তের সঙ্গে সৌহার্দ্য ঘনতর হলো, প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই শোভা সেন, তাপস সেন, রবি সেনগুপ্ত ও আমার মধ্যে শলাপরামর্শ, উৎপল ও অন্যান্য বন্দীদের মুক্তির দাবি জানিয়ে বিবৃতির খসড়া তৈরি, এঁর-ওঁর-তাঁর কাছ থেকে সই সংগ্রহ। লিটল থিয়েটার গ্রুপ ও ব্রেশট সোসাইটির পক্ষে অনেককে নিয়ে প্রতিবাদসভা-মিছিল, সেই উপলক্ষ্যে মন্মথ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ।

ইতিমধ্যে 'নাউ' পত্রিকার জঙ্গি ঝোঁকও প্রতি সপ্তাহে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর। ততদিনে সমর সেন আমার মতামতের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে গেছেন, দু'জনে প্রতি সপ্তাহে যে-সব উগ্র মেজাজের সম্পাদকীয় লিখতাম, তা পাঠান্তে নাকি ঘোর কমিউনিস্ট মহলেও ঈষৎ পুলকমিশ্রিত উদ্বেগ, হুমায়ুন কবিরের মনের অবস্থা তো কল্পনাই করা যেত। 'নাউ'-এর এমন চরিত্র পরিবর্তনে নিরঞ্জন মজুমদাররা তেমন প্রীত হচ্ছিলেন না হয়তো, নিরঞ্জন তো প্রায়ই প্রকাশ্যে অনুযোগ জানাতেন, ইংরেজি খোলশ ছেড়ে নিরেট বাংলায় : 'অশোকটা সমরকে জেলে পাঠাবে'। তবে রবি সেনগুপ্ত যেটা স্পষ্ট ব্যক্ত করলেন : সমরবাবু তো নাবালক নন, বুঝে-সুঝেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।

'নাউ'-এর প্রচার প্রতি সপ্তাহে লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়ছে। তরুণ সম্প্রদায় প্রতিটি সংখ্যার জন্য চাতকের মতো অপেক্ষা করে থাকে, সম্পাদকীয় মন্তব্য ও কলকাতা ডায়েরি উভয়েরই মেজাজের পারদ দ্রুত ঊর্ধ্বমুখী, দিল্লি-কলকাতার দুই সরকারকেই প্রতি সপ্তাহে প্রহারেণ ধনঞ্জয় করা হচ্ছে। ব্যাপারস্যাপার দেখে সমরবাবুর 'অ-রাজনৈতিক' বন্ধুরা যদিও চিন্তিত, সমরবাবু নিজে কিন্তু নির্বিকার। এই ঋতুতেই প্রমোদ সেনগুপ্তের সঙ্গে আমার মোলাকাত। উনি থাকতেন বেকবাগান পেরিয়ে লোয়ার সার্কুলার রোডের এক গলির মোড়ে, প্রায়ই গুটি-গুটি পায়ে হেঁটে আমাদের হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে চলে আসতেন। গোঁড়া রাজনৈতিক মতাবলম্বী, অথচ ভারি ঠান্ডা প্রকৃতির মানুষ প্রমোদবাবু। তাঁর অতীত বৈপরীত্যে ঠাসা, নাম-লেখানো কমিউনিস্ট, কিন্তু যুদ্ধের সময় জার্মানিতে সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ সরকারেও ছিলেন। জর্মান স্ত্রী, যিনি কলকাতার হিন্দুস্থান স্টিল সংস্থার দফতরে

কাজ করতেন, প্রধানত অনুবাদের কাজ; কোথায় যেন শুনেছিলাম তিনি এঙ্গেলসের সাক্ষাৎ নাতনি, তবে এটা বোধহয় নেহাৎই জনশ্রুতি। প্রমোদ সেনগুপ্ত, আমার যতদুর জানা ছিল, পুরোটা সময়ই সক্রিয় রাজনীতিতে। চৌষট্টি সাল থেকে সি পি আই (এম)-এ, তারপর সাতষট্টি সাল-পরবর্তী ধোঁয়াশায় নকশালপন্থীদের কোন গোষ্ঠীলগ্ন ছিলেন, বুঝতে পারিনি। আমার লেখা পড়েই হয়তো তাঁর আলাপ করবার আগ্রহ, ছেষট্টি সালের শেষের দিকে আমার দিল্লি চলে যাওয়ার পর পরিচয় শিথিল হয়ে যায়, বাহাত্তর সালে ফিরে আর তাঁকে পাইনি। তাঁর, বা তাঁর স্ত্রীর, শান্তিনিকেতনে একটি বাড়ি ছিল, প্রমোদবাবুর মৃত্যুর পর ভদ্রমহিলা জর্মানি ফিরে যান, বাড়িটা প্রমোদবাবুর আত্মীয়দের কাছ থেকে পরে কিনে নেন 'এক্ষণ' সম্পাদক নির্মাল্য আচার্যের পরম সখা, আমাদের বিখ্যাত উড়নচণ্ডী বন্ধু, 'সুবর্ণরেখা'-স্বত্বাধিকারী ইন্দ্রনাথ মজুমদার। ইন্দ্রনাথকে যাঁরা জানেন, তাঁরা এটাও জানেন, তাঁর ক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্পর্ক একটু প্রতীপমুখী। প্রায় হলফ করেই বলতে পারি, বাড়িটা কিনেছিলেন বলেই ইন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'সুবর্ণরেখা'-র একটি শাখা বিপণি খুলে বসেন, দোকানটা চালাতে সুবিধা হবে ভেবে বাড়িটা কেনেননি। শান্তিনিকেতনে গেলেই ইন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয়, স্বতই প্রমোদ সেনগুপ্তের কথা মনে পড়ে।

পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি সালে ফিরে যাই, সেই পঁয়তিরিশ বছর আগেকার কথায়। কলকাতায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি বড়ো অংশ সমাজবিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও ঘুরতে শুরু করেছে। মার্কিনরা তখনও ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিরূপ, অস্ত্রশস্ত্র ও সাধারণ পৃষ্ঠপোষকতা আমাদের সরকার পাচ্ছিলেন একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ থেকে। যে কারণেই হোক, দুই সোভিয়েট নেতা, বুলগানিন-কোসিগিন, পাকিস্তান-ভারত হানাহানি পছন্দ করছিলেন না, তাঁদের হয়তো চিন্তা হলো এ-সমস্ত ঘটনাবলী পাকিস্তানকে আরও পশ্চিমের দেশগুলির দিকে ঠেলে দেবে। কলকাঠি নড়লো, যুদ্ধে যদিও ভারতীয় সেনানী একটু সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল, নতুন দিল্লির সরকার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন, কয়েক সপ্তাহ বাদে তাসখন্দ। বেচারি প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দে সোভিয়েট নেতাদের কাছ থেকে, আবার সন্দেহ, এত ঝাড়াই খেলেন যে ওখানেই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু। হঠাৎ কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে সংঘাত-বিভাজনের ঈষৎ সম্ভাবনা মাথা চাড়া দিল। জানুয়ারির শেষে নতুন প্রধান মন্ত্রী নির্বাচনে কংগ্রেস সাংসদীয় দলে ভোটাভুটি, ইন্দিরা গান্ধি মোরারজি দেশাইকে গোহারা হারিয়ে দিলেন। কংগ্রেস সংগঠনে রাজ্যে-রাজ্যে যাঁরা ক্ষমতা দখল করে ছিলেন, তাঁরা অধিকাংশই প্রাচীনপন্থী, রক্ষণশীল, সুতরাং প্রথম থেকেই ইন্দিরা গান্ধির একটু ভয়ভীত কোণঠাসা অবস্থা। তাঁর শক্তিসংগ্রহ প্রয়োজন, দেশবাসীর কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন জরুরি। সে সময় তাঁর যাঁরা পরামর্শদাতা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই কৃষ্ণ মেননপন্থী, তা ছাড়া একদা-কমিউনিস্ট ছিলেন, এখন-কোনও-দলের-ছাপ নেই, এমন কিছু রাজনৈতিক কর্মী ও সাংবাদিক, যেমন 'সেমিনার' পত্রিকার সম্পাদক রমেশ থাপর। সব চেয়ে বড়ো কথা, মোরারজী দেশাই সম্পর্কে বেশির ভাগ সাধারণ মানুষের মনে যথেষ্ট বীতশ্রদ্ধ ভাব। প্রতিক্রিয়াজর্জর, গোঁয়ার, পুঁজিপতি-ঘেঁষা ইত্যাদি বিশেষণে তিনি তখন অহরহ ভূষিত হতেন। মোরারজী যদিও ইন্দিরা গান্ধির মন্ত্রীসভায় উপপ্রধান মন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী হতে রাজি হলেন, সকলেই ধরে নিলেন এটা সাময়িক বোঝাপড়া, গুজরাটি ভদ্রলোক সুযোগ খুঁজছেন পরিস্থিতি কখন মোড় ফেরে, তখন ঝোপ বুঝে কোপ মারবেন।

এই পটভূমিকায় কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক আচরণ-বিচরণে ঈষৎ পরিবর্তনের আভাস, ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতাদের অঙ্গুলিনির্দেশে মাত্র বছরখানেক আগে বামপন্থীদের দেশদ্রোহিতা নিয়ে যে-সমস্ত গালগল্প রচিত হয়েছিল, সব উপেক্ষা করে নীতির নববিধান। ছেষট্টি সালের এপ্রিল-মে মাস থেকে দেশ জুড়ে বামপন্থী কমিউনিস্টরা মুক্তি পেতে শুরু করলেন। ঐ সময়েই কেরলে যে-বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল, ই এম এস-সুদ্ধু অধিকাংশ সি পি আই (এম) নেতৃবৃন্দ হয় কারারুদ্ধ নয় আত্মগোপন করে থাকা, তা সত্ত্বেও দল রাজ্যের অবিসংবাদী প্রধান শক্তি হিশেবে আত্মপ্রকাশ করলো, বন্দী নেতা ও কর্মীরা তারপর থেকে একটু-একটু করে মুক্ত হলেন।

পশ্চিম বাংলায় পরিস্থিতি আরও অনেক বেশি টালমাটাল। মধ্যবিত্তদের প্রকাণ্ড বড়ো অংশ মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপে জেরবার, দৈনিক পত্রিকাগুলির বিরূপতা সত্ত্বেও সি পি আই (এম)-এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, শহরে-গ্রামে-গঞ্জে সংগঠনের শাখাপ্রশাখা ব্যাপ্ততর হচ্ছে, কারও-কারও এমনও ভ্রান্তিবিলাস আরম্ভ হলো যে হাত বাড়ালেই বিপ্লবকে এবার বুঝি ছোঁয়া যায়। কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে উৎপল-জোছনরা কারামুক্ত, সর্বস্তরের শিল্পীদের-কর্মীদের রাজনৈতিক মেজাজ উচ্চগ্রামে উঠছে, দক্ষিণ তরফের কমিউনিস্টরা যেন প্রায় একঘরে। উৎপল দত্তের ছাড়া পেতে তখনও কয়েক সপ্তাহ বাকি, সোভিয়েট দেশ থেকে বলশয় ব্যালে দলের কিছু প্রতিনিধি কলকাতায় উপস্থিত, দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা কোনও হল খুঁজে পাচ্ছেন না যেখানে সোভিয়েট নৃত্য দলকে সংবর্ধনা দিতে পারেন, বলশয় দলের নৃত্যপ্রদর্শনী দেখতে পাবেন, বাধ্য হয়ে তাঁরা লিটল থিয়েটার গ্রুপ-এর শরণাপন্ন, দয়া করে যদি মিনার্ভা হল ছেড়ে দেওয়া হয়। উৎপলের অনুপস্থিতিতে তাপস সেন এল.টি.জি.-র সভাপতি, নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে দক্ষিণপন্থীদের অনুরোধ রক্ষা করা হল। তবে সভাপতি হিশেবে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে তাপস সেন লম্বা বক্তৃতা ফাঁদলেন, তাতে এক কাহন ভারত সরকারের নিন্দা, ভারত সরকারের চীন-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভপ্রকাশ, এই সরকার কত যে প্রতিক্রিয়াশীল তার প্রমাণ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নট-নাট্যকার-নাট্য প্রযোজক উৎপল দত্তকে বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়েছে, আরও হাজার-হাজার বামপন্থী নেতা-কর্মী কারারুদ্ধ, বলশয় দল দেশে ফিরে গিয়ে তাঁদের মহান সমাজতান্ত্রিক সরকারকে যেন অনুগ্রহ করে আমাদের নিবেদন পৌঁছে দেন, ভারতবর্ষের এই চরম প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের সঙ্গে তাঁরা যেন কোনও সম্পর্ক না রাখেন। সেজে-গুজে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা ঝেঁটিয়ে বলশয় নৃত্য দেখতে এসেছেন, তাঁরা রেগে কাঁই, অথচ কিছু বলবার সাহস নেই, তা হলে হয়তো লিটল থিয়েটার গ্রুপ মিনার্ভা হলে নৃত্যপ্রদর্শনী বন্ধ করে দেবে।

বাংলা খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলা হয় অগ্নিগর্ভ, ঠিক সে রকম অবস্থায় পশ্চিম বাংলা পৌঁছে গেল। সে বছর যদিও শস্যে টান পড়েছিল, রাজ্য সরকার জমিদার, জোতদার ও ব্যবসাদারদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহের পরিমাণ কেন্দ্রের নির্দেশে বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। অজয় মুখোপাধ্যায়ের মতো বহু আজন্ম-কংগ্রেসীর মনে অনেক অসন্তোষ জমা ছিল অতুল্য ঘোষ-পরিচালিত, প্রফুল্ল সেনের নেতৃত্বে গঠিত রাজ্যের কংগ্রেস সরকার সম্পর্কে। জোতদার-জমিদারদের একটি প্রভাবশালী অংশ অজয়বাবুর সঙ্গে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এলেন। হুমায়ুন কবির, যিনি ইন্দিরা গান্ধির মন্ত্রীসভায় ঠাঁই পাননি, তিনিও বেরিয়ে এসে অজয়বাবুর সঙ্গে হাত মেলালেন, অর্থাৎ পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস দল দ্বিখণ্ডিত,

পাশাপাশি র‍্যাশনে অপরিমিত সরবরাহ, মজুতদাররা তাঁদের চিরাচরিত ধর্ম পালন করছেন, বুভুক্ষাশঙ্কিত মানুষজন রাস্তায় বেরিয়ে এসে বিক্ষোভ জানাচ্ছেন যত্রতত্র, বিশৃঙ্খলা, অরাজকতার পূর্বলক্ষণ, নদীয়া জেলার নানা জায়গায় পুলিশের গুলিতে মিছিলে-সামিল-হওয়া কয়েকটি অবোধ শিশুর মৃত্যু, জনসাধারণের মেজাজ আরও চড়লো, 'নাউ' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমরা আরও-আরও আগুন ঝরিয়ে দিতে লাগলাম।

রাজ্য সরকার কিছুটা পিছুপা হলেন, একটু-একটু করে রাজনৈতিক কর্মী ও নেতারা ছাড়া পেতে শুরু করলেন, উৎপল-জোছনরাও সেই সঙ্গে। 'কল্লোল'-এর সাফল্য গগনস্পর্শী, বাড়তি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেও দর্শকদের আগ্রহ মেটানো যাচ্ছে না, তাঁরা তো দর্শক নন, তাঁরা যেন বিপ্লবের অগ্রদূত। নাট্যশিল্পী ও কর্মীদের সংঘবদ্ধতা আরও জোরদার হলো, উদ্দামতার মধ্যে সবাই। সি পি আই (এম)-এর পলিটব্যুরো সদস্যরা সবাই প্রায় একসঙ্গে বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেলেন, তখনও কেন্দ্রীয় কমিটির দফতর কলকাতায়, লেক প্লেসে, মুক্তির পর পলিটব্যুরোর প্রথম বৈঠক বসলো কলকাতাতেই। উৎপলের নাটকীয়তার অভাব কোনও দিনই ছিল না। কলকাতার জনগণের পক্ষ থেকে পলিটব্যুরোর সদস্যদের ময়দানে অভিনন্দন জানানো হলো, লিটল থিয়েটার গ্রুপ থেকে সিদ্ধান্ত, 'কল্লোল'-এর উদ্দীপক-উত্তেজক দৃশ্যগুলির একটি-দু'টি ময়দানের সেই সভায় উপস্থাপন করা হবে। সে এক আশ্চর্য মনোমোহন দৃশ্য, সারি দিয়ে নেতারা সামনে বসে আছেন, বাইরের আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে, গোটা মঞ্চ জুড়ে খাইবার জাহাজের উদ্ধত উপস্থিতি, রেইটিংদের উচ্চনাদ, নো স্যারেন্ডার, লাল ঝাণ্ডা কেঁপে-কেঁপে একটু-একটু করে আকাশের দিকে উঠছে, আন্তর্জাতিক সংগীত, তার সঙ্গে হাজার-হাজার যূথবদ্ধ জনতার কণ্ঠ মেলানো।

কলকাতার দখল পুরোপুরি যেন বামপন্থীদের হাতে চলে গেছে, সরকার ম্রিয়মাণ, প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। খাদ্যের দাবিতে, বাড়তি মজুরির দাবিতে, বন্ধ কারখানা খোলার দাবিতে সপ্তাহে-সপ্তাহে হরতাল-ধর্মঘট, কলকাতার প্রতিটি অঞ্চলের স্তব্ধ হয়ে আসা, সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ঘটনা সেপ্টেম্বর মাসে আটচল্লিশ ঘণ্টাব্যাপী ধর্মঘট ঘোষণা বাম দলগুলির পক্ষ থেকে। অমন নিঃশব্দ রূপ মহানগরী এর আগে কোনওদিন পরিগ্রহ করেনি, পরেও না। জননেতা হিশেবে জ্যোতি বসুর প্রখ্যাতি তুঙ্গে।

স্কটিশ চার্চ কলেজে ছাত্রাবস্থা থেকে সমর সেনের সঙ্গে স্নেহাংশুকান্ত আচার্যের বন্ধুত্ব, স্নেহাংশুবাবু কয়েকমাস আগে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন, 'নাউ' পত্রিকায় চে গুয়েভারার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিবরণ পড়ে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন, সমরবাবু বলামাত্র আলাপ করিয়ে দিলেন। পঁয়ষট্টি সালের মাঝামাঝি থেকে সাতাশ বেকার রোডে আমার নিয়মিত যাওয়া-আসা, কখনও সমরবাবুর সঙ্গে, কখনও একা। স্নেহাংশু ও সুপ্রিয়া আচার্য তাঁদের আতিথেয়তার জন্য সুবিখ্যাত, তার উপর 'নাউ' পত্রিকায় এবং অন্যত্র আমার রচনাদি পড়ে তাঁরা বুঝে নিলেন অনুকম্পায়ী একজনকে পাওয়া গেছে। আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ ছিলেন স্নেহাংশু আচার্য। ময়মনসিংহের মহারাজকুমার, বিখ্যাত ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর দৌহিত্র, আভিজাত্য তাঁর রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। অথচ সর্বস্তরের সবরকম লোকজনের সঙ্গে অক্লেশে মিশতে পারতেন। মজলিশি মানুষ, যে-কোনো আড্ডার প্রাণপুরুষ, খিস্তে-খেউড়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক। যে-কোনও ক্রীড়াচর্চায় একেবারে সামনের সারিতে, সংগীতের আসরেও সমান ওজনদার। মানব মনের প্রক্রিয়া দুর্জ্ঞেয়, এই মানুষটিই ছাত্রাবস্থায় স্বাদেশিকতায় অনুপ্রাণিত হয়ে 'যুগান্তর' গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছিলেন, সেখান

থেকে, অতল জলের আহ্বান, কমিউনিস্ট পার্টিতে অভিযাত্রা। আদর্শের প্রতি আনুগত্যে তাঁর সামান্যতম খামতি ছিল না। সর্ব ঋতুতে উদার হৃদয়, পরিচিত-অপরিচিতদের বিপন্ন মুহূর্তে টাকা-পয়সা দিয়ে, আইনি পরামর্শ দিয়ে, অন্যান্য বিবিধ উপায়ে যেমন সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, পার্টিকে সাহায্যের ক্ষেত্রেও তাই। দার্জিলিঙে এবং অন্যত্র উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি পার্টির হাতে তুলে দিয়েছেন, দলের পত্রিকা চালানোর জন্য ছাপাখানা কিনে দিয়েছেন, দলের কর্মী-সমর্থকদের জেল থেকে মুক্ত করে আনার প্রতিজ্ঞায় মামলার পর মামলা লড়েছেন, একাই যেন পূর্বপুরুষের পুঞ্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন করবেন। তাঁর কারাবাসের ডায়েরি এক অত্যাশ্চর্য গ্রন্থ, বাইরেকার আচরণে যাঁর লঘুতা-চটুলতার ছটা, তাঁর অন্তঃস্থিত আদর্শ-আনুগত্যের পরিচয় পেয়ে অবাক হতে হয়। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের যে তিন কন্যা—সুজাতা, সুপ্রিয়া, সুচিত্রা—ছাত্র ফেডারেশনের বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন, সেই বৃত্তান্ত কুড়ি বছর আগে ঢাকা শহরে জানতে পেয়ে উদ্দীপ্ত বোধ করতাম, তাঁদের মধ্যে যিনি দ্বিতীয়, তিনিই আচার্য-জায়া, এই তথ্যও আমার কাছে নতুন করে রোমাঞ্চদ্যোতক।

ক্রমে স্নেহাংশুবাবুর বাড়িতে আরও অনেক বামপন্থী নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলো, বিশেষ করে জ্যোতি বসু ও প্রমোদ দাশগুপ্ত উভয়ের সঙ্গেই। জ্যোতিবাবু বরাবরই স্বল্পবাক্, স্নেহাংশুবাবুর কথার তোড়ে তেমন কোনও যতিপাতের সম্ভাবনা নেই বলে আরও, তবে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে স্নেহাশুবাবুর তিরিশ বছরের দোস্তি, খুব খোলামেলা সম্পর্ক। প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে একটু আলাদা ঘনিষ্ঠতা, তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা ও সমীহ করতেন আচার্য-দম্পতি। আরও একটি জিনিশ নজরে এলো : স্নেহাংশুবাবুদের প্রচুর বই, জ্যোতিবাবু বেছে নিতেন হাল্কা মেজাজের কোনও গ্রন্থ, অন্যদিকে প্রমোদবাবু সব সময়ই তত্ত্ব বা নীতি বিষয়ক বই টুঁড়ে বের করে বগলদাবা করতেন। দলের শীর্ষ নেতৃদ্বয়ের সঙ্গে পরিচয় স্নেহাংশুবাবুর দৌত্যে ক্রমে গভীরতর হতে লাগলো। ওঁরা প্রথম-প্রথম হয়তো ভাবতেন, আমি প্রায়-সরকারি চাকরি করছি, ওঁদের সঙ্গে মেশামেশিতে আমার ক্ষতিও হতে পারে : ওঁদের সেই জড়তা ভাঙতে মাঝে-মাঝে প্রমোদবাবুকে কিংবা সস্ত্রীক জ্যোতিবাবুকে নৈশাহার অন্তে আমার গাড়িতে বাড়ি পৌঁছে দিতাম।

'নাউ' এবং সমরবাবুকে নিয়ে কী করবেন, হুমায়ুন কবির মনস্থির করতে পারছিলেন না। কেন্দ্রীয় সরকার-বিরোধী লেখা বেরোচ্ছে, তা অতি উত্তম, কিন্তু এমন প্রচণ্ড বামঘেঁষা মতামত, যে-কারণে তাঁর যে-বন্ধুবান্ধব পত্রিকা প্রতিষ্ঠার জন্য কবির সাহেবকে টাকা জুগিয়েছিলেন, তাঁরা কুপিত; তিনি নিজেও সমান চিন্তিত। অথচ তখনও সমরবাবুকে খুব ঘাঁটাতে সাহস পাচ্ছিলেন না, আমরা তাই পরম আনন্দে বিপ্লব ভজনা করছিলাম 'নাউ' পত্রিকার পৃষ্ঠায়।

হঠাৎ একটু ব্যক্তিগত সমস্যায় পড়া গেল। ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে চণ্ডীর পরেই পদমর্যাদার দিক থেকে আমার স্থান সবচেয়ে এগিয়ে। ইতিমধ্যে কথা পাকা হয়ে গেছে, চণ্ডী দিল্লি চলে যাবেন সদ্য-গঠিত ভারতের ফুড কর্পোরেশনের সর্বাধ্যক্ষ হয়ে। ইনস্টিটিউটে তাঁর পদে কে বৃত হবেন তা নিয়ে জল ঘোলা শুরু। ইনস্টিটিউটের পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি পদাধিকারবলে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, তাঁর সিদ্ধান্তই প্রধান। ইতিমধ্যে বাজারে রটে গেছে, এই লোকটা, অশোক মিত্র, যদিও পড়ায় ভালো, কিন্তু পাক্কা কমিউনিস্ট, ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের মতো সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠানে তাঁকে অধ্যক্ষ করা হলে সর্বনাশ হবে:

কর্তাব্যক্তিদেরও তেমন মতামত। কর্তৃপক্ষের এই বার্তাটি আমার গোচরে আনলেন অমৃতবাজার-যুগান্তর পত্রিকার সুকমলকান্তি ঘোষ, যাঁর সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় ছিল, তিনি নিজেও ছিলেন পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য।

একই সময়ে অন্য পট পরিবর্তন। তাঁর অসুখের পর শচীনদা এমনিতেই 'ইকনমিক উইকলি-র কাজে তেমন নজর দিতে পারতেন না, তার উপর যাঁরা পত্রিকার মূলধনের প্রধান অংশীদার, সেই গোষ্ঠীর কোনো একজনের একটি মন্তব্যে তিনি ঈষৎ অপমান বোধ করলেন, রেগে পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দিলেন। বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে আলোচনা-পরামর্শ চললো, যে করেই হোক আমাদের নিজস্ব পত্রিকা চাই, সুতরাং নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে, অন্য অনেকের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে, একটি অছি পরিষদ গঠনের কথা পাকা হলো। অনেক অর্ধপরিচিত-অপরিচিত মানুষও এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করেছিলেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, বিদেশী টাকার ফাঁদে পড়বো না, যদিও অনেক বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত বাক্সওলা নিজেদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে টাকা দিয়েছিলেন, আমরা গ্রহণ করেছি। শচীনদা একই সঙ্গে সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী অছি,-সুপ্রিম কোর্ট থেকে সদ্য-অবসর-গ্রহণ-করা প্রধান বিচারপতি গজেন্দ্রগড়কর মহাশয় অছি সংসদের সভাপতি। ট্রাস্টের নিয়মাবলীতে স্পষ্ট নির্দেশ লিপিবদ্ধ করা হলো, অছি পরিষদের কিংবা অন্য কারওরই সম্পাদকীয় নীতির উপর ছড়ি ঘোরানোর অধিকার থাকবে না, নতুন পত্রিকার নাম হবে ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি। ইকনমিক উইকলি বন্ধ হওয়ার মাস ছয়েকের মধ্যেই ছেষট্টি সালের অগস্ট থেকে নতুন পত্রিকার যাত্রা শুরু ।

শচীনদার শরীর ভালো না। কথা উঠলো, আমি মুম্বই গিয়ে নতুন পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক হতে পারি কি না, শচীনদা একটি পোশাকি চিঠিও দিলেন এ ব্যাপারে। আমার মনে দ্বিধা, আমার স্ত্রীর মনে আরও বেশি, কারণ মুম্বইতে কোথায় গিয়ে থাকবো, এবং পত্রিকার প্রাথমিক অবস্থায় ব্যয়সঙ্কোচ যেখানে অতি প্রয়োজনীয়, সেখানে আমাকে মাইনেপত্তর দেওয়াও একটি বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

এই মানসিক জটিলতার মধ্যে অন্য এক ঘটনার উদ্ভব। দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যম্ দূত পাঠালেন, নব-প্রতিষ্ঠিত কৃষিপণ্য মূল্য কমিশনে আমাকে তিনি সভাপতি করতে আগ্রহী, যদি দয়া করে সম্মতি জানাই। অন্য সূত্রে খবর পেয়েছিলাম, আগ্রহটি কৃষিমন্ত্রীর নয়, প্রধান মন্ত্রী ও তাঁর অনুচরবর্গের। ইন্দিরা গান্ধি তখন আশেপাশে, বোধহয় কৌশলগত কারণেই, অনেক বামপন্থী মানুষজন জড়ো করছিলেন, বামপন্থীরাও হয়তো কৌশলগত কারণেই তাঁর আশেপাশে জড়ো হচ্ছিলেন, এই বুঝি সুযোগ ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ করবার, সেই সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীলদের রুখবার।

প্রিয়জনদের সঙ্গে কথা বললাম, বিশেষ করে হরেকৃষ্ণ কোঙার-সহ রাজনৈতিক দু'-একজন নেতাস্থানীয়ের সঙ্গে। তাঁরা মত দিলেন, দিল্লি চলে যাওয়াই শ্রেয়, ই পি ডব্লিউ তো আমাদের হাতেই রইলো, দিল্লি থেকেও আমি শচীনদাকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবো, কেন্দ্রীয় সরকারে অনুপ্রবেশ করা আরও অনেক বেশি জরুরি।

শচীনদা একটু হতাশ হলেন, চণ্ডী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, আমাকে ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ করা না-গেলেও মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, আমি তার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ পদে দিল্লি যাচ্ছি। এটাও মজার ব্যাপার, কমিউনিস্ট বলে প্রফুল্ল সেন

আমাকে ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর বানালেন না, অথচ ইন্দিরা গান্ধি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব পদের সমপর্যায়ভুক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে আহ্বান জানালেন। অনেকে তখন অবশ্য এরই মধ্যে তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন : প্রফুল্ল সেন দক্ষিণগামী, ইন্দিরা গান্ধি বামের দিকে ঝুঁকছেন।

অতএব ছেষট্টি সালের পয়লা নভেম্বর দিল্লিতে কৃষিপণ্য মূল্য কমিশনের সভাপতি হিশেবে যোগ দিলাম, আমার বয়স তখন সবে আটতিরিশ; সম্ভবত এর আগে বা পরে এত কম বয়সে কেউ কোনও সরকারি কমিশনের মাথায় বসেননি।

আঠারো

ঠিক ক'দিন অথবা ক'মাস দিল্লিতে টিকতে পারবো, তা নিয়ে মনে অবশ্য গভীর সন্দেহ। তাই কলকাতায় হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটের ফ্ল্যাট স্ত্রীর জিম্মায় রইলো সমস্ত লটবহরসুদ্ধু, আমি একা গিয়ে সরকারি পান্থনিবাস ওয়েস্টার্ন কোর্টে একটা বড়ো ঘর নিয়ে রইলাম। তখনও ওয়েস্টার্ন কোর্টের দুর্দশা তেমন চরমে পৌঁছয়নি, ঘরগুলির যত্নআত্তি নেওয়া হতো, যে-ঠিকেদারের হাতে খাদ্য পরিবেশনের দায়িত্ব, তাঁর বোধহয় সংসদ সদস্য তথা রাজপুরুষদের বিষয়ে সামান্য সমীহের ভাব অবশিষ্ট ছিল, যা খাদ্য সরবরাহ করা হতো তা অন্তত অকহতব্য স্তরে পৌঁছয়নি। যা সংযোজনযোগ্য, ওয়েস্টার্ন কোর্টে সে সময় অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষ থাকতেন, সংসদ সদস্যদের বাদ দিয়েও। যাঁদের কথা বিশেষ মনে পড়ে তাঁদের অন্যতম শকুন্তলা পরাঞ্জপে, প্রথিতযশা সমাজসেবক, হালে-বিখ্যাত- চলচ্চিত্রনির্মাতা সই পরাঞ্জপের মাতা। শকুন্তলা দেবী সে-সময় রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য, ভোরবেলা এক টেবিলে বসে প্রাতরাশ সারতাম, আমাকে প্রায় বালক ভেবে প্রচুর স্নেহ করতেন, তাঁর ব্যস্ত বিচিত্র জীবনের অনেক ঘটনা গল্প বলার মতো করে বর্ণনা করতেন। আরও একজন ছিলেন, সাহেব সিং সোখে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ভারতীয় সৈন্যদলে মেডিকেল জেনারেল, পরে মুম্বইতে হফকিন গবেষণা ইনস্টিটিউটের সর্বাধ্যক্ষ, দেশকে যাতে ওষুধপত্র তৈরির ব্যাপারে স্বনির্ভর করা যায় তা নিয়ে বহু বছর প্রয়াস চালিয়েছেন। বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী শিরিন ভাজিফদার একদা জেনারেল সোখের স্ত্রী ছিলেন। তবে তার চেয়েও বড়ো শোরগোলের কারণ সাহেব সিং সোখের প্রবল সোভিয়েট-প্রীতি। আমার সঙ্গে বোধহয় আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন হিতেন চৌধুরী; জেনারেল সোখের বয়স তখন আশি বছর ছুঁই-ছুঁই, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির চমৎকারিত্ব, বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে, বলতে শুরু করলে তাঁকে আর থামানো যেত না।

ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত বরাবরই তো তাঁর সাংসদ জীবন ওয়েস্টার্ন কোর্টে কাটিয়ে গেছেন, তখনও ছিলেন। আরো বিশেষ করে মনে পড়ে মুরশিদাবাদের সৈয়দ বদরুদ্দোজাকে। অতি সজ্জন, উদারচরিত, সর্ব অর্থে নিখাদ বাঙালি, প্রাতরাশের টেবিলে উজাড় করে নিজের মনের কথা বলতেন। ১৯০৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের ডামাডোলে কংগ্রেস সরকার তাঁকে ওদেশের গুপ্তচর অপবাদ দিয়ে বেশ কয়েক মাস কয়েদ করে রেখেছিল; সে-প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বদরুদ্দোজা সাহেব অভিমানে উদ্বেল হয়ে উঠতেন।

অস্থায়ী অনেক আগন্তুক আসতেন-যেতেন। অত্যন্ত আকর্ষণীয় অতিথি-আলয় ছিল তৎকালীন ওয়েস্টার্ন কোর্ট, একজন-দু'জন অপ্রিয় মানুষও যে মাঝে-মাঝে হাজির হতেন না তা অবশ্য নয়। জনৈক জনসংখ্যাবিদ, বাড়ি তামিলনাডুতে, অনেক বছর মার্কিন দেশে কাটিয়েছিলেন, পরে দেশে ফিরে কংগ্রেস দলে যোগ দিয়ে কিছুদিনের জন্য কেন্দ্রে মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন, গলা চুলকে ঝগড়া করতে ভালবাসতেন।

ওয়েস্টার্ন কোর্ট থেকে কৃষিভবন তেমন কিছু দূর ছিল না, আমি পৌঁছে যেতাম সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে; ভোরবেলা হেঁটে যেতে, এমনকি গ্রীষ্মকালেও, অসুবিধা হতো না, আর বিকেলে তো এর-ওর সঙ্গে আড্ডা দিতে চলে যাওয়া। পুরোনো বাঙালি-অবাঙালি বন্ধুরা তো ছিলেনই, তা ছাড়া কয়েকমাস বাদে দিল্লিতে কার্যসূত্রে কিরণময় রাহা পৌঁছে গেলেন, তাঁর সান্নিধ্য ও সৌহার্দ্যে বরাবর আপ্লুত থেকেছি। কিরণবাবু আয়কর বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু সেই পরিচয় ধর্তব্যের মধ্যে নয়, তিনি নাট্য-চলচ্চিত্র-সাহিত্যে মজে-থাকা মানুষ। তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর অতিথিপরায়ণতাও প্রবাদপ্রতিম। নতুন করে আরও আলাপ হলো কবিদম্পতি শরৎকুমার-বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। উঠতি যুগের কবিদের সম্পর্কে আমার মনে পুঞ্জিত ভয়; তাঁরা সম্ভবত নিজেদের নিয়েই বিভোর, সমাজভুক্ত অবশিষ্টদের নিরাসক্ত অন্যমনস্কতায় পাশ কাটিয়ে যান! শরৎ-বিজয়ার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুবাদে সেই ভয় খানিকটা ঘুচলো। বিজয়া অমলেন্দু দাশগুপ্তের অনুজা, হয়তো সেই কারণেই ওঁদের কাছে খানিকটা প্রশ্রয় পেয়েছি।

কৃষিমন্ত্রকের কেষ্টবিষ্টুরা আমার মতো অতি-নবীন যুবককে তাঁদের সমপর্যায়ের পদে বসানো হয়েছে, তা নিয়ে প্রচুর মনোক্ষোভে ভুগছিলেন, প্রথম দিকে তাই তাঁদের কাছ থেকে সহযোগিতা পেতে সামান্য অসুবিধা হচ্ছিল, কিন্তু কৃষিমন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যম সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন, সবচেয়ে বড়ো কথা, কয়েকদিনের মধ্যেই পরমেশ্বর হাকসার প্রধান মন্ত্রীর প্রধান সচিব হিশেবে যোগ দেওয়াতে আমার মস্ত সাচ্ছল্যবোধ। হাকসার আমার পূর্ব-পরিচিত। লন্ডনে ছাত্রাবস্থা থেকে থরনার ও চঞ্চীর বন্ধু। তখন ঘোর কমিউনিস্ট ছিলেন, দেশে ফিরেও কিছুদিন মধ্যপ্রদেশে সাতনা, না অন্য কোথাও, গুজব শুনেছিলাম, পার্টির স্থানীয় কমিটির সম্পাদক ছিলেন। সম্ভবত পারিবারিক উপরোধে রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম বিসর্জন দিয়ে প্রথমে এলাহাবাদে আইনজীবী বৃত্তিতে, পরে বিদেশ মন্ত্রকে যোগ দিয়েছিলেন, নানা জায়গায় রাষ্ট্রদূত হিশেবে কাজ করেছেন, জওহরলাল নেহরুর খুব স্নেহাস্পদ। ইন্দিরা গান্ধি উনিশশো ছেষট্টির জানুয়ারি মাস থেকে প্রধান মন্ত্রী, কিন্তু সদাশিব পাতিল-অতুল্য ঘোষ গোছের নেতারা এক দিকে দলে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন, অন্য দিকে ধড়িবাজ বুড়ো-বুড়ো আমলারা তাঁকে কব্জা করার ছক কষছেন। মহিলা অথৈ জলে, কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর পিতার অতি-বিশ্বস্ত হাকসারকে দেশে ফিরিয়ে এনে নিজের সচিব পদে বসালেন। হাকসারের সম্পর্কে পরে আমাকে বেশ কয়েক কাহন বলতেই হবে, অতএব আপাতত ক্ষান্ত দিচ্ছি।

কৃষিপণ্য মূল্য কমিশনের প্রধান হিশেবে প্রাথমিক সমস্যাদি আমি সহজেই যে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম, তার অন্যতম কারণ অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের এক সময়ে প্রধান কৃষি অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞ, আমার পুরনো মাস্টারমশাই সমররঞ্জন সেন, তখন যোজনা কমিশনে সমাসীন, আমলাতন্ত্র তাঁকে প্রচুর সমীহ করে, তিনি যথাযথ জায়গায় বার্তা পাঠিয়েছিলেন, আমার প্রতি বীতরাগ ক্রমশ দূর হলো। বিশেষ ব্যক্তিগত বন্ধু, তীক্ষ্ণবুদ্ধি অর্থনীতিবিদ, ধরম নারায়ণ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অফ ইকনমিক গ্রোথে গবেষক-অধ্যাপক, আমার অনুরোধ ঠেলতে না পেরে আংশিক সময়ের জন্য কমিশনের সদস্য রূপে যোগ দিতে সম্মত হলেন। চার বছর ওখানে ছিলাম, নিবিড় স্বস্তিসুখ, চরিতার্থবোধ ও সম্প্রীতির মধ্যে।

ইন্দিরা গান্ধি সাময়িকভাবে বাঁয়ে হেললেও তা তো নিছক কৌশলগত কারণে, কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রেণী-চরিত্র তো পাল্টাবার নয়, পুঁজিবাদী-ব্যবসাদার-ধনী কৃষক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বসংকুল কংগ্রেসের উপর তলার নেতৃত্ব। সেই বিশেষ মুহূর্তে উচ্চফলনশীল

শস্যের বাণী ভারতবর্ষের কর্তাব্যক্তিদের সমীপে পৌঁছে গেছে, ফোর্ড ফাউন্ডেশন গণ্ডায়-গণ্ডায় বিশেষজ্ঞ পাঠাচ্ছেন বোঝাতে ভারতবর্ষকে কী করে কৃষিক্ষেত্রে অত্যাধুনিক করে তোলা যায়: শুধু উন্নত বীজের ব্যবস্থা হলেই তো চলবে না, সেচের জলের মাপমতো ব্যবহার চাই, নানা ধরনের প্রতিষেধক কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করতে হবে, যথেষ্ট প্রসারিত বর্গক্ষেত্র না হলে জলসেচন অসুবিধাজনক, সুতরাং গমের উন্নত বীজশস্য জড়িয়ে যে-তথাকথিত 'সবুজ' বিপ্লবের সূচনা, তা সফল করতে হলে জমিজমাওলা ধনী কৃষকদেরই পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বাছাই করতে হবে, সেই সঙ্গে তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত কৃষি ঋণেরও ব্যবস্থা। তাঁদের সমীপে উন্নত বীজশস্য পৌঁছে দেওয়া যেমন কর্তব্য, সেচের জল প্রয়োগের যথাযথ ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণও সমকর্তব্য। সুতরাং যা হবার তা-ই হলো, 'সবুজ' বিপ্লব থেকে প্রথমে গম, পরে চাল, তারও পরে তুলোর উৎপাদন বাড়লো দেশ জুড়ে, কিন্তু বাড়লো প্রধানত ধনী কৃষকদের বড়ো-বড়ো ক্ষেতখামারে, কৃষিক্ষেত্রে আর্থিক বৈষম্য উৎকীর্ণতর। ধনী কৃষককুলের তবু ভরিল না চিত্ত, তাঁদের দাবি, এবং বাঘা-বাঘা মার্কিন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, প্রতিটি কৃষিপণ্যের জন্য উদার হারে ন্যূনতম সহায়ক-মূল্য ঘোষণা করতে হবে : যদি বাজারে উৎপাদন আধিক্যহেতু দাম নিম্নমুখী হয়, তা হলে পূর্বঘোষিত সহায়ক-মূল্যে সরকারকে কৃষক ও ব্যবসাদারদের কাছ থেকে কৃষিপণ্য কিনতে হবে, এই দামে যে-পরিমাণ উৎপন্ন শস্য বিক্রয় করতে তাঁরা উৎসুক, পুরোটাই। কৃষিপণ্য মূল্য কমিশনের দায়িত্ব বিভিন্ন শস্যের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সহায়কমূল্য নির্ধারণ। তবে, তখন পর্যন্ত, বাজারে শস্যপ্রাচুর্যের চেয়ে শস্যের অনটনের ইতিহাসই জনমানসে মুদ্রিত। তদনুরূপ পরিস্থিতির সম্ভাবনা সরকারের পক্ষে উপেক্ষা করা সহজ ছিল না, সুতরাং কমিশনকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হলো, প্রতি মরশুমে বিভিন্ন শস্যাদি কৃষক ও ব্যবসাদারদের থেকে সরকার কোন সংগ্রহ-মূল্যে কিনবেন, এবং কত পরিমাণ কিনবেন, সে-সব নিয়ে সুপারিশ জ্ঞাপন। এই সংগ্রহ-মূল্য বাজারে চালু মূল্য থেকে যদিও কম হবে, ঘোষিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্য থেকে অবশ্যই বেশি। সহায়ক-মূল্য, বলা বাহুল্য, কৃষকদের খরচ পুষিয়ে দেবে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়, ন্যূনতম ব্যয়ের উপর যথাযোগ্য লাভের একটি অংশও জুড়ে দিতে হবে, এবং সংগ্রহ মূল্য নির্ধারিত হবে আরও মগডালে।

ততদিনে দেশের উচ্চবিত্ত কৃষককুল জ্ঞানশলাকার স্পর্শ পেয়েছেন, মার্কিন দেশে কৃষকদের কী পরিমাণ তোয়াজ করা হয় তা তাঁরা জেনে গেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যার বড়ো জোর চার শতাংশ কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, অন্যেরা সবাই শিল্প-পরিষেবা থেকে জীবন নির্বাহ করেন। এই অতি স্বল্পসংখ্যক কৃষিজীবীদের তাই তুষ্ট না-রেখে মার্কিন দেশের উপায় নেই। ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ অন্য সমস্যা : আমাদের জনসংখ্যার শতকরা দুই-তৃতীয়াংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল, তাঁদের অধিকাংশই হয় ভূমিহীন কৃষক নয় ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্রের মালিক নয়তো ভাগচাষী। ভাগচাষী অথবা ক্ষুদ্রায়তন কৃষিভূমির স্বত্বাধিকারীদের উদ্বৃত্ত শস্য থাকে না, আর ক্ষেত-মজুরদের তো ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় পুরো খাদ্যশস্যই খোলা বাজার থেকে কিনতে হয়। অনটনের বছরে বাজারদর ক্রমশ চড়ে, চড়া দরে শস্য কেনা গরিব কৃষকদের পক্ষে সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় শহরের গরিব মানুষদেরও। সুতরাং সরকারি সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্যবর্তিতায় দরিদ্রজনকে সস্তায় খাদ্যশস্য পৌঁছুনোর প্রয়োজন দেখা দেয়। আমাদের কমিশনের উপর বাড়তি দায়িত্ব চাপানো হলো, বিভিন্ন খাদ্যশস্যের সংগ্রহ-মূল্য সুপারিশ করবার।

সংগ্রহ-মূল্য সাধারণত যদিও সহায়ক-মূল্যের চেয়ে বেশি হবে, ভীষণরকম বেশি হলে সমস্যা, রাষ্ট্রীয় সরবরাহ রববরাহব্যবস্থার মারফত তো গরিবদের খাদ্যশস্য পৌঁছনো মুখ্য উদ্দেশ্য, সরবরাহ-মূল্য তেমন চড়া হলে তাদের সাধ্যের বাইরে চলে যাবে। বাণিজ্যিক শস্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সমস্যা : ন্যূনতম সহায়ক-মূল্য নির্ণয় করা জরুরি, অন্যথা গরিব কৃষকরা মারা পড়বেন; কিন্তু তা খুব উঁচু স্তরে বাঁধা হলে কার্পাসজাত বা পাটজাত পণ্যাদি বিদেশে রফতানি করতে অসুবিধা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা।

দেশে ওই বছরগুলিতে আকীর্ণ খাদ্যসমস্যা। স্বাভাবিক কারণে জাতীয় রাজনীতিতে সচ্ছল কৃষককুলের প্রভাব ক্রমবর্ধমান। তাঁরা প্রধানত পঞ্জাব-হরিয়ানা-পশ্চিম উত্তর প্রদেশে কেন্দ্রীভূত, গোটা দেশকে তাঁরা খাদশস্য জোগাচ্ছেন, তাঁদের হামবড়া ভাবের শেষ নেই। কমিশনে থাকাকালীন আমাকে ভারতবর্ষের সব ক'টি রাজ্য চষে বেড়াতে হয়েছে, প্রত্যন্ততম অঞ্চলে পর্যন্ত। যেখানেই গেছি, সর্বত্র ধনী শ্রেণীভুক্ত কৃষকদের বর্ধমান ক্ষমতার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা হয়েছে। এঁদের দখলে বৃহৎ বিস্তৃত কৃষিবর্গক্ষেত্র, এঁদের জন্য ঢালাও উন্নত বীজশস্যের ব্যবস্থা, সরকার থেকে সস্তা দরে সেচের জল-সার-কীটনাশক ইত্যাদি এঁদের সরবরাহ করা হচ্ছে, সুতরাং এঁদের গড় উৎপাদনব্যয় তুলনাগতভাবে অন্য শ্রেণীভুক্ত কৃষকদের খরচপাতির চেয়ে কম হওয়ারই কথা। কিন্তু এই যুক্তি কে মানবেন, সম্পন্ন কৃষককুলের ভাবটা এরকম : অধিক ফলন ফলিয়ে তাঁরা দেশকে কৃতার্থ করে দিয়েছেন, তাঁদের দাবিকৃত চড়া দাম মঞ্জুর না করে সরকার যাবে কোথায়। তখনকার পরিভাষায় এঁদের 'প্রগতিশীল' কৃষক বলে অভিহিত করা হতো, 'প্রগতিশীল' এই কারণে যে তাঁরা কৃষিতে নতুন প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ বরণ করে নিয়েছেন। মনে পড়ে, নানা অনুদান ও অন্যান্য সুবিধাদি পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর কর্ষিত শস্যের উৎপাদন ব্যয় এত বেশি কেন, সেই প্রশ্ন এক ধনবান পঞ্জাবি কৃষককে করাতে, সেই ভদ্রলোকের সম্যকরূপে ক্ষিপ্ত উত্তর: অবশ্যই তাঁর উৎপাদনব্যয় অধিক হবে, তিনি যে প্রগতিশীল কৃষক। আমাকে নিরুত্তর থাকতে হলো; এঁরা হাতে মাথা কাটবেনই, দেশকে মুখের খাবার জোগাচ্ছেন তো এঁরা। প্রগতিশীলতার সংজ্ঞা যে নতুন প্রযুক্তির সাহায্য উৎপাদন কমিয়ে আনা কে বোঝাবে এঁদের?

বিচিত্র সব ব্যাপারস্যাপার। হায়দরাবাদ গেছি, অন্ধ্র প্রদেশের তদানীন্তন কৃষি মন্ত্রী, থিম্মা রেড্ডি, নেলোর না কুনুর জেলার কুলককুলপতি, প্রচুর আপ্যায়ন করলেন। দেশের স্বার্থে শস্যোৎপাদনে তাঁরা যে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের উৎপাদন ব্যয় অতএব যে ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী, সহায়ক ও সংগ্রহমূল্য নির্ধারণে আমি যে সে-সমস্ত কথা বিবেচনা করবো, তা নিয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। যথাসময়ে আমাদের প্রতিবেদন দাখিল করলাম, প্রতিবেদন আলোচনার জন্য মুখ্যমন্ত্রীদের দিল্লিতে আহ্বান জানানো হলো, থিম্মা রেড্ডি-ও এলেন : আমার সঙ্গে বিজ্ঞানভবনের লবিতে দেখা, নমস্কার-প্রতিনমস্কারের পর মন্ত্রীমশাইয়ের সক্ষোভ উক্তি, 'আপনার সঙ্গে যখন আলাপ হয়েছিল, ভেবেছিলাম আপনি অতি সহৃদয় ভদ্রলোক। এখন দেখছি আপনি একটি অ্যাটম বোমা'!

তবে অন্যরকম শিক্ষালাভও হচ্ছিল। গুজরাটে সফর, বরোদাতেই বোধহয় এক সদাশয় বৃদ্ধ খামারের মালিক, আমাকে অনুতাপের ভঙ্গিতে উপদেশ বিতরণ করলেন, 'তোমাদের বাঙালিদের দিয়ে পয়সাকড়ি করা হবে না। তোমরা পঁচিশ একর জমি পেলে সারি দিয়ে শত-শত আম গাছ পুঁতবে, আম গাছে সহজেই পোকা ধরে, প্রচুর পরিচর্যা করতে হয়, তা সত্ত্বেও তিন-চার বছর বাদেই এক একটা গাছ মরে যায়, বলতে গেলে তোমাদের টাকা প্রায়

জলে যায়। অন্য পক্ষে আমাদের, গুজরাটিদের, দ্যাখো, ওরকম জমি পেলে আমরা আম গাছ লাগাই না, সজনে বাগানের ব্যবস্থা করি। সজনে গাছের কোনও পরিচর্যা করতে হয় না, একটা গাছ একশো-দু'শো বছর পর্যন্ত বাঁচে। সাধে কি আর আমাদের টাকার পাহাড় জমে, তোমাদের কিস্যু না'। ধনী কৃষকদের আয়কর দেওয়ার দায় নেই, সরকার থেকে বিবিধ ভরতুকি দিয়ে তাঁদের উৎপাদনব্যয় হ্রাস করার ব্যবস্থা হয়েছে, সরকার যথেষ্ট দরাজ হাতে সহায়ক ও সংগ্রহ-মূল্যের উদ্যোগ নিয়েছেন, এটা তাই প্রায় অবধারিতই ছিল যে, শীততাপনিয়ন্ত্রিত খেতখামার দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে সেই সঙ্গে দক্ষিণ দিল্লিতে 'দীনদরিদ্র' কৃষকদের পয়সায় বিরাট-বিরাট প্রাসাদ।

আসলে শুধু কংগ্রেস দলের নেতাদের মধ্যেই কেন, বামপন্থী মহলেও তখন কৃষিপণ্য মূল্য সম্পর্কে যথেষ্ট বিভ্রান্তি। কৃষিপণ্যের মূল্য বাড়লে অধিকাংশ কৃষিজীবীর লাভ নেই, বরঞ্চ ক্ষতি, এটা অনেককেই বোঝানো যাচ্ছিল না। গোটা দেশে অন্তত চার-পঞ্চমাংশ কৃষিজীবী খাদ্যশস্যে স্বনির্ভর নন, তাঁদের বাজার থেকে ধান-চাল-গম-বাজরা ইত্যাদি কিনতে হয়, মূল্যবৃদ্ধিতে সম্পন্ন চাষিদের পৌষমাস, গরিব কৃষকদের সর্বনাশ, কিন্তু অনেক বামপন্থী নেতাই অতটা গভীরে যেতে চাইতেন না : কৃষিজাত পণ্যের মূল্যমান বৃদ্ধি পেলে, তাঁরা ধরেই নিতেন, ছোটোচাষী-ভাগচাষীদেরও সুবিধা, হয়তো ক্ষেতমজুরদের উপার্জনও বৃদ্ধি পাবে। তাঁরা যে ভুল ভাবছেন, তথ্যের হিশেব দাখিল করেও বিশেষ লাভ হতো না সেই ভুল সংশোধনের জন্য গরজ কারো মধ্যেই তেমন দেখা যেত না। সাতষট্টি সালের গ্রীষ্ম, আট বছর বাদে ইএমএস ফের কেরলে মুখ্যমন্ত্রী, তিনি মহা উৎসাহে পঞ্জাব মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে গমের সংগ্রহমূল্য অনেকগুণ বাড়াবার প্রস্তাবে সায় দিয়ে যাচ্ছেন। ত্রিবান্দ্রমে তাঁকে গিয়ে ধরলাম : 'আপনার রাজ্য কেরলে এক রত্তি গমও উৎপন্ন হয় না, আপনারা প্রতি বছর বারো লক্ষ টন গম পঞ্জাব-হরিয়ানা থেকে আমদানি করেন, যদি ক্যুইন্টাল প্রতি একশো টাকা দাম বাড়ে, আপনারা কেরল থেকে প্রতি বছর আরও একশো কুড়ি কোটি টাকা পঞ্জাব-হরিয়ানার জমিদার-জোতদার-ব্যবসাদারদের হাতে তা হলে তুলে দেবেন, সেই টাকায় ওরা দক্ষিণ দিল্লিতে শৌখিন মস্ত অট্টালিকা বানাবে, কেরলের জনগণ আরও একটু শোষিত হবেন'। বৃথাই আমার চ্যাঁচানো, পার্টির সর্বভারতীয় নীতি অন্য কথা বলে, ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরলাম।

সেই মুহূর্তে দলীয় নেতৃত্ব উত্তর ভারতের গ্রামাঞ্চলে প্রভাব বাড়াবার জন্য আঁকুপাঁকু। শ্রেণী বিভাজনের তত্ত্ব প্রয়োগে আদৌ সুরাহা হচ্ছে না, হয়তো কোনও-কোনও নেতা ভাবছিলেন, কৌশলগত কারণেই ভাবছিলেন, চরণ সিংহ-গোছের ধনী কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতিভূদের প্রসাদে যদি অবস্থার মোড় ফেরানো যায় মন্দ কী, অতএব চোখ-কান বুঁজে চরণ সিংহের কৃষিপণ্য মূল্যনীতি তাঁরা সমর্থন করতে প্রলুব্ধ হচ্ছিলেন। সেই মোহ কাটতে অনেক দিন লেগেছিল, এখনও পুরোপুরি কেটেছে তা বলতে পারি না। আমি কৃষিপণ্য মূল্য কমিশনের দায়িত্বে থাকাকালীন এ-সমস্ত সমস্যা নিয়ে হরেকৃষ্ণ কোঙারের সঙ্গে প্রচুর আলোচনা হতো; উনি দিল্লি এলে যোগাযোগ করতেন, তখন হতো, নইলে আমি মাঝে-মধ্যে কলকাতায় গেলে। বুঝতে পারতাম তাঁর মনেও দ্বিধা। তবে যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাঁর অভিজ্ঞতার ও প্রজ্ঞার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি।

১৯৬৭ সালের গোড়ায় দেশ জুড়ে সাধারণ নির্বাচন, কংগ্রেস দল হারতে-হারতে কোনওক্রমে লোকসভায় সংখ্যাধিক্য পেলো, কিন্তু কামরাজ-সহ বহু নেতাকে পরাজয় বরণ

করতে হলো। কৃষিমন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যম্ অনেক ভোটে হারলেন; তাঁর সঙ্গে দেখা করে মৌখিক সমবেদনা জ্ঞাপনের চেষ্টা করছি, হঠাৎ দেখি দরদর করে মন্ত্রীমশাইয়ের চোখ দিয়ে জল ঝরছে, আমি বিব্রত, কী বলবো ভেবে পাই না। কৃষিমন্ত্রকে নতুন মন্ত্রী এলেন জগজীবন রাম। পিছিয়ে-পড়া শ্রেণীভুক্তদের প্রতিভা ও বুদ্ধি সম্পর্কে আমাদের সমাজে অনেক অবজ্ঞাসূচক তির্যক মন্তব্য বর্ষিত হয়, জগজীবন রামের সঙ্গে পরিচয় ঘটলে সে ভুল ভাঙতো। চর্মকার শ্রেণীতে জন্ম, বেশি লেখাপড়ার সুযোগ পাননি, কোনওক্রমে বোধহয় ওকালতি পাশ করেছিলেন, তারপর পুরোটা সময়ই কংগ্রেস আন্দোলনে থেকেছেন, ছেচল্লিশ সাল থেকে একাদিক্রমে মন্ত্রী, শুধু কামরাজ পরিকল্পনায় বছর চারেকের জন্য বাদ পড়েছিলেন। ক্ষুরধার বুদ্ধি, যে-কোনও পালিশ-করা অর্থনীতিবিদের চাইতেও প্রগাঢ়তর যন্ত্র-তন্ত্র জ্ঞান, ইংরেজি ভাষার উপর দখলও চমৎকার। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে কেন্দ্রে ও রাজ্যে কম মন্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত হইনি, দক্ষতার দিক দিয়ে জগজীবন রামকে আমার বিবেচনায় একেবারে শীর্ষস্থানে রাখবো, তার মানে এই নয় যে, তাঁর নীতিজ্ঞান বা ব্যক্তিগত জীবনচর্যা সম্বন্ধে সমপরিমাণ শ্রদ্ধা পোষণ করবো। আপাত-অপ্রয়োজনীয় তথ্য, তবু এখানে উল্লেখ করতে মজা লাগছে : জগজীবনবাবু সব সময় দামি বিলিতি সিগারেট খেতেন, কিন্তু খেতেন খাঁটি দেহাতি বিভঙ্গে, সিগারেটটা ঠোঁটের পাশে হুঁকোর মতো ধরে।

কৃষিমন্ত্রকের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন, কিছুদিন বাদেই বুঝতে পারলেন, কৃষিপণ্য মূল্য কমিশনের সভাপতিটি ধানি লঙ্কা; তাঁরা ধনী কৃষকদের সঙ্গে দিব্যি দহরম মহরম চালিয়ে যাচ্ছিলেন, বাগড়া দেবার জন্য এই লোকটি এল কোত্থেকে, ফোর্ড ফাউন্ডেশনের মন যুগিয়ে কথা বলে না, মন্ত্রীদের কথাও শিরোধার্য করে না, শাঁসালো কৃষককুলের কথাবার্তা উপেক্ষা করে। তবে খানিক বাদে তাঁদের ধারণা হলো, প্রধান মন্ত্রীর দফতরে, যে কারণেই হোক, আমার খুঁটি বাঁধা, আমাকে চিমটি কেটে আপাতত তেমন সুবিধা হবে না। যে-দু'জন কৃষিমন্ত্রীর জমানায় কাজ করেছি, কোনও সময়ই তাঁদের সৌজন্যের অন্তত অভাব হয়নি, আমার পরামর্শ মানুন না-মানুন। কে জানে, তার কারণও হয়তো ওই একই।

যে-সাড়ে তিন বছর-চার বছর কমিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, দেশের অর্থব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কেও। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কার্পাস নিগম কর্তৃক তুলো কেনা হবে, পাট নিগম থেকে কৃষকদের কাছ থেকে পাট। অথচ আমরা যে ন্যূনতম সহায়ক-মূল্য কমিশনের তরফ থেকে স্থির করে দিতাম, অনেক বছর তার দ্বিগুণ দাম দিয়েও কার্পাস নিগম কর্তৃক কৃষককুলের কাছ থেকে তুলো কেনা হতো। কারণ স্পষ্ট: তুলো উৎপাদনকারী কৃষক ও তুলোর ব্যাপারীরা সবাই রাঘব-বোয়াল, সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে সুদক্ষ; তুলোর দাম অস্বাভাবিকরকম বেশি হলে কার্পাস বস্ত্র রফতানি করতে অসুবিধা দেখা দেবে, সেই যুক্তিও গ্রাহ্য হতো না; বরঞ্চ কার্পাস বস্ত্রাদি রফতানির ক্ষেত্রে সরকার থেকে অঢেল ভর্তুকির ব্যবস্থা, সুতরাং দু' দিক থেকেই তুলোর ব্যাপারীদের লাভ। অথচ পাটের প্রসঙ্গে চলে আসুন, পাট চাষিরা পশ্চিম বাংলা-বিহার-ওড়িশা-অসমে বিক্ষিপ্ত, অধিকাংশই ছোটো জমির মালিক, তাঁরা ফড়ে ও ব্যাপারীদের পদতললুণ্ঠিত, তাঁদের কথা সরকারকে ভাববার দরকার নেই : এমনকি অধিক ফসলের বছরে পর্যন্ত, ন্যূনতম সহায়ক-মূল্যেও সরকারের তরফ থেকে পাট কেনবার কোনও উদ্যোগ দেখা যেতো না, বাজার দর সহায়কমূল্যের অনেক

অনেক নিচে নেমে গেলে তখনই পাট নিগমের টনক নড়তো। এই ঐতিহ্য এখনও বহমান।

ভারতের পাট নিগম কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সংস্থা; সংস্থাটির নির্লিপ্ততা রাজ্য সরকার অসহায় দৃষ্টি নিয়ে একমাত্র নিরীক্ষণই করতে পারেন। রাজ্য সরকার নিজের অধীন কোনো ক্রয়সংস্থা খুলে গরিব চাষীদের কাছ থেকে সহায়ক-মূল্যে যথেষ্ট পরিমাণ পাট কিনবেন, তারও উপায় নেই, ব্যাংকগুলিও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন, নতুন দিল্লির অনুমতি ব্যতীত তারা পাট কেনবার জন্য রাজ্যসরকারকে টাকা ধার দেবে না।

অন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করি। তুলোর সহায়ক মূল্য নির্ণয় করার মরশুম, আমি মুম্বইতে টেক্সটাইল কর্পোরেশনের দফতরে সমাসীন; তুলো চাষ ও কার্পাস শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি। সকাল সাড়ে দশটায় এলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কটন কর্পোরেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ রুইয়া; সংগঠনটি প্রধান-প্রধান তুলো ব্যবসাদারদের প্রতিনিধিস্থানীয়। রামনারায়ণজীর সঙ্গে আলোচনা সমাপ্ত হলে ঠিক দ্বিপ্রহরবেলায় এলেন শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ রুইয়া; পরিচয়: সভাপতি, ইন্ডিয়ান কটন মিলস ফেডারেশন, আহমেদাবাদস্থ বস্ত্র-শিল্পের দুঁদে চাঁইদের সংগঠন। রাধাকৃষ্ণজী রামনারায়ণজীর মধ্যম অনুজ। বেলা আড়াইটায় এলেন কৃষককুলের তথাকথিত নেতৃবৃন্দ, গুজরাট রাজ্য কোঅপারেটিভ কটন গ্রোয়ার্স সোসাইটি, তুলোচাষিদের ডাকসাইটে প্রতিনিধিসংস্থা, এই সংস্থার প্রধান রামনারায়ণজীর আর এক অনুজ, নাম, যতদূর মনে পড়ে, লক্ষ্মীবিলাস রুইয়া। ওয়াজেদ আলি সাহেব যা লিখে গিয়েছিলেন, তা যেমন ভারতবর্ষের সামাজিক পরম্পরার প্রতিবিম্ব, রুইয়া ভ্রাতাদের পরস্পরের সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকাও তেমনই ভারতবর্ষের সমাজ-কাঠামোর অন্য এক রূপ: যে-খাতেই টাকা গড়াক না কেন, শেষ পর্যন্ত রুইয়াদের মতো মাত্র কতিপয় গোষ্ঠীর তা কুক্ষিগত হবে।

খানিকটা নেশা ধরে গেল। ভারতীয় অর্থব্যবস্থার কলকাঠি কারা নাড়ছেন, কেন নাড়ছেন, কী পদ্ধতিতে নাড়ছেন, জানবার এমন সুযোগ আর কখনও আসবে না, সুতরাং ক্ষণিকের অতিথি হয়ে এসেছি তাতে কী, অন্তত যে-প্রতিবেদনগুলি পেশ করতাম, সরকার তাদের বক্তব্য মানুন না-মানুন, সেগুলি তো ছাপা হতো, জনে-জনে পড়ার সুযোগ পেতেন, স্পষ্ট কথা স্পষ্ট করে বলতাম, ধরমনারায়ণ আমার ছায়াসঙ্গী।

কৃষিপণ্যে মূল্য কমিশনে যোগ দেওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই বিচিত্র অপর এক অভিজ্ঞতা। হিন্দু সাধু সমাজ কিংবা ঐ নামের কোনো গোষ্ঠীর অনুপ্রেরণায় এক দঙ্গল শরীরে-ছাই-মাখাহাতে-ত্রিশূল রক্তচক্ষু সাধু ছেষট্টি সালের নভেম্বর মাসের এক দিবসে সংসদ ভবনে চড়াও হলেন, তাঁদের দাবি, অবিলম্বে সারা দেশে গো-হত্যা বন্ধ করতে হবে, অন্যথা তাঁরা তাঁদের হিংসা দিয়ে সরকারের পতন ঘটাবেন। ইন্দিরা গান্ধি সদ্য প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন, নিজের উপর তখনও আস্থা উপার্জন করতে পারেননি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ ভক্ত মানুষ, তাঁর পরামর্শে প্রধান মন্ত্রী বিষয়টি বিশদে দেখার জন্য এক কমিটির কথা ঘোষণা করলেন। ওরকম বহু-আঁশলা কমিটি ইতিহাসে সত্যিই বিরল। সুপ্রীম কোর্ট থেকে প্রধান বিচারপতি হিশেবে সদ্য অবসর গ্রহণ করেছেন, বাগবাজার পাড়ার বনেদি বাসিন্দা, মজলিশি মানুষ—স্নেহাংশুবাবুর ওখানে প্রচুর আড্ডা দিয়েছি ওঁর সঙ্গে—অমলকুমার সরকার মশাই কমিটির সভাপতি; ভারত সাধু সমাজের তরফে খোদ গুরু গোলওয়ালকর, পুরীপীঠের জগৎগুরু শঙ্করাচার্য ও রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; অন্যদিকে বিশেষজ্ঞ হিশেবে বর্ণিত আমরা তিনজন: 'আমুল'-এর প্রতিষ্ঠাতা-প্রাণপুরুষ ভার্গিজ কুরিয়েন, ভারত

সরকারের তৎকালীন পশুপালন সর্বাধ্যক্ষ অতি সজ্জন বাঙালি ভদ্রলোক পুণ্যব্রত ভট্টাচার্য, অর্থনীতিবিদ হিশেবে আমি; তা ছাড়া একজন-দু'জন বিভিন্ন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রীরাও কমিটিতে ছিলেন, তবে তারা তেমন নিয়মিত বৈঠকে আসতেন না। তা হলেও কমিটি অচিরে বিস্তীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হলো। অমল সরকার সুচতুর নম্রতা ও সৌজন্যের আদর্শ স্থাপন করে যাচ্ছেন, একদিকে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা-সর্বস্ব প্রতিনিধিগণ, প্রতিপক্ষ আমরা তিন যুক্তিবাদী বিজ্ঞানবিশ্বাসী। প্রতি পদে তর্ক-বাধা দেওয়া-প্রশ্ন তোলা, যাঁরা সমস্যাটির উপর আলোকপাত করার উদ্দেশে কমিটির কাছে আলোচনার জন্য আসতেন, তাঁরা মুহূর্তে গৌণ হয়ে যেতেন, কমিটির আভ্যন্তরীণ আচরণিক-মানসিক বিভাজনই সামনে চলে আসতো। সনাতনপন্থীদের প্রতিনিধিবৃন্দ প্রথম থেকেই উগ্রপরমত-অসহিষ্ণু, সব সময় ধড়ে মাথা কাটছেন, অন্যদের কথা শোনবার প্রয়োজন তাঁরা ধর্তব্যের মধ্যে আনছেন না। সবচেয়ে ঝাঁঝালো পুরীর শঙ্করাচার্য মহারাজ, ধরাকে সরা জ্ঞান করেন, অন্য কে কী বললো তাতে কিছু যায় আসে না, তিনি জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ বাণীবাহক, আদেশ করছেন, সঙ্গে-সঙ্গে মানতে হবে, বাড়তি কোনো কথা নয়, যুক্তি-ফুক্তি অপ্রয়োজনীয়-অপ্রাসঙ্গিক, এই মুহূর্তে গো-নিধন বন্ধ করতে হবে। এঁকে দেখেই স্পষ্টতম উপলব্ধি করি, ধর্মান্ধতা কী ভয়ংকর রূপ নিতে পারে। আরো যা হতভম্ব করলো তা আর্যাবর্তের বোধবুদ্ধিরহিত ধর্মাপ্লুতা: শঙ্করাচার্য কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে কৃষিভবনের বর্হিদ্বারে গাড়ি থেকে নামলেন, শান্ত্রী-পুলিশের ত্রস্ত অভিবাদন-অভ্যর্থনা, করিডোর দিয়ে জগৎগুরু সভাকক্ষের দিকে ক্রমশ এগোচ্ছেন, করণিককুল ও অন্যান্য কর্মচারীরা দু'পাশে সারিবদ্ধ দাঁড়ানো, যে-মুহূর্তে ধর্মীয় ভদ্রলোক তাঁদের পাশ দিয়ে গেলে, সমবেত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। জগৎগুরু সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন, অফিসারবৃন্দ সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমে সঙ্গে-সঙ্গে দণ্ডায়মান, তিনি যতক্ষণ ব্যাঘ্রছাল পেতে আসন গ্রহণ না করছেন, তাঁরা দণ্ডায়মানই আছে; তাঁর প্রতিটি বাগাড়ম্বর তাঁদের কাছে দৈববাণীস্বরূপ।

রমাপ্রসাদবাবুও সমান সরব। আচারে তিনি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, হয় স্ব-পাক, নয় গৃহিণীর রান্নার বাইরে তাঁর রুচি নেই। তখন অল্প বয়স আমাদের, উদ্ভট-মতামতসম্পন্ন প্রবীণদের একটু-আধটু চিমটি কেটে মজা পেতাম। আশুতোষের জ্যেষ্ঠ তনয় এমনিতে অত্যন্ত স্নেহশীল, প্রায়ই মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতেন, কিন্তু তাতে কী, কমিটির বৈঠক চলাকালীন তাঁর গো-ভক্তি-মদির উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য নিরীক্ষণ করে পাশ থেকে একটি-দুটি কুটনি কাটতাম, যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হতেন, তাঁর একদা-ছাত্র আমার শ্বশুর মহাশয়ের কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন, 'তোমার জামাতা বাবাজীবন প্রতিভাবান, কিন্তু অতিশয় দুর্বিনীত।'

যেটা কারো-কারো কাছে মস্ত আশ্চর্য মনে হবে, যদিও এটা সর্ববিদিত গুরু গোলওয়ালকর গো-হত্যা প্রতিরোধ আন্দোলনের পালের গোদা, কমিটির সভাগুলিতে প্রায় পুরোটা সময়ই তিনি নিঃশব্দ থাকতেন, তাঁর শিষ্যসামন্তরাই তো দিব্যি কার্য সমাধা করেছে, তিনি স্বয়ং কেন অপ্রয়োজনীয় অসি ঘোরাবেন। ক্ষুরধার বুদ্ধি, সুবিনয়ী, মৃদুভাষী, অন্তত চোদ্দো-পনেরোটা ভাষা জানেন, আমার সঙ্গে সর্বসময় সুপরিচ্ছন্ন বাংলায় কথা বলতেন।

তবে হাড়-মাস জ্বালাতে জগৎগুরু একাই একশো। আমরা মনস্থ করলাম, ওঁকে লক্ষ্য করে আমাদের তীর ছুঁড়বো, নানা ছুতোয় ওঁকে ক্ষেপিয়ে তুলে প্রচণ্ড মানসিক অস্থৈর্যের মধ্যে ফেলবো। গুজরাটে কুরিয়েন-প্রতিষ্ঠিত আনন্দ দুগ্ধ প্রকল্পের সব-কিছু ঘুরে দেখতে গোটা কমিটির সফর। জগৎগুরু পনির খেতে খুব পছন্দ করেন, এই সমাচার শোনা-মাত্র কুরিয়েন আমূলে-প্রস্তুত কুড়ি-পঁচিশ বাক্সো পনির গুরুজীর ঘরে পাঠিয়ে দিলেন, জগৎগুরু

মহা খুশি। পরদিন আলোচনার ছলে হঠাৎই যেন কুরিয়েনের জ্ঞানদায়ী মন্তব্য: আমূলে উৎপাদিত পনিরে নধর বাছুরের পঞ্চম না সপ্তম পাকস্থলীস্থ চর্বি ব্যবহৃত হয়। শুনে জগৎগুরু মহলে ত্রাস; আমাদের, বলা বাহুল্য, উল্লাস।

কমিটির কাজ শেষই হচ্ছে না, সাধু সমাজের সর্বাধিনায়কেরা ক্রমশ অধিকতর অধৈর্য, ইতিমধ্যে ইন্দিরা গান্ধি তাঁর গদি অনেকটা সামলে নিয়েছেন, গো-বলয়ের আস্ফালনে আর ততটা উদ্বিগ্ন নন, তিনিও আর তেমন গা করছেন না, তিতিবিরক্ত হয়ে একটা সময়ে ভারত সাধু সমাজের তিনি বাঘা প্রতিনিধি কমিটি থেকে বেরিয়ে গেলেন, কমিটির নিশ্চিন্ত অপমৃত্যু ঘটলো, সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন, সবাই, অর্থাৎ সনাতনপন্থীরা ছাড়া অন্য সবাই।

এই বিচিত্র কাহিনীরও একটি বিচিত্রতর উপসংহার আছে। কয়েক মাস বাদে ট্রেনে করে ভূপাল না ঝাঁসি কোথায় যাচ্ছি, আবিষ্কার করলাম একই কামরায় আমার সহযাত্রী গুরু গোলওয়ালকর। গোলওয়ালকরের সৌজন্যপ্রকাশে কোনো ঘাটতি নেই, পরস্পরে কোলাকুলি হলো, এক কাঁড়ি গল্পগুজব। ট্রেনের গতি যখন বাড়লো, দু'জনেই ব্যাগ থেকে বই বের করে নিয়ে পড়তে মনোনিবেশ করলাম। হঠাৎ চোখে পড়লো, গোলওয়ালকর পড়ছেন হেনরী মিলারের একটি রসালো উপন্যাস। মেলানো যায় না, কিছুতেই মেলানো যায় না; দেশকে প্রতিক্রিয়ার গভীরতম গহ্বরে বিসর্জনের উদ্যোগে যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তিনিই অবসর সময় হেনরী মিলার চেখে-চেখে পড়ছেন, রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় ভারতবর্ষ।

উনিশ

দিল্লিতে নিজেকে ব্যস্ত রাখছি, অথচ অস্বীকার করার উপায় নেই, মনটা কলকাতায় পড়ে থাকতো। বিভিন্ন সুযোগে যখন-তখন কলকাতায় চলে যেতাম, প্রথম দিকে কমিশনের কাজের ছুতোয়, ব্যাংক জাতীয়করণের পর বাড়তি ভণিতার সুযোগ ঘটলো, কলকাতায় প্রধান দফতর স্থিত এমন একটি-দু'টি ব্যাংকের সরকার-মনোনীত ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে।

কৃষিপণ্য মূল্য কমিশনে যোগ দেওয়ার দু'মাসের মধ্যেই অবশ্য মস্ত ধাক্কা খেয়েছিলাম। মুম্বই গেছি কমিশনের কী কাজে, এখন মনে নেই। রবিবার সকালে যে-সরকারি অতিথিনিবাসে ছিলাম, অশোক রুদ্র দেখা করতে এলো, দু'জনে পালি হিলে হিতুবাবুর প্রাসাদোপম বাংলোয় শচীনদার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, রোগের জের আদৌ কাটিয়ে উঠতে পারেননি, কণ্ঠস্বর দুর্বল, দেখাশোনা করবার জন্য কলকাতা থেকে ওঁর ভাগিনেয়ী আনা, কুচিদির কন্যা, গেছে। শচীনদাকে প্রফুল্ল রাখবার জন্য সারাদিন ধরে আমরা গল্পে-আড্ডায় মেতে রইলাম; তিনি নিজে ঈষৎ স্তিমিত, প্রায় নিঃশব্দ। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ দিল্লির বিমান, পাঁচটা-সওয়া পাঁচটায় শচীনদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে চাপলাম। এখনও স্পষ্ট মনে আছে, বেতারে ক্রিকেট টেস্টের ধারাবিবরণী চলছিল, কোনও বিদেশি দলের সঙ্গে টেস্ট খেলা, অপরাহ্নকালে ভারতীয় ইনিংস শুরু করতে নেমে ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার ধুমধাড়াক্কা পেটাচ্ছিলেন। শচীনদা, যে-কাহিনী আগেই একবার বলেছি, আমাকে একটু পাশে ডেকে নিম্নস্বরে বললেন : 'আমার শরীরে আর সে সামর্থ্য নেই যে অশোক রুদ্রের সঙ্গে একা তর্ক করতে পারি। তুমি মাসে অন্তত একবার করে এসো'। আটচল্লিশ ঘণ্টাও পেরোলো না, দিল্লিতে খবর পেলাম মঙ্গলবার দুপুরে; শচীনদা এক প্রবাসী ভারতীয় দম্পতিকে খেতে বলেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে হঠাৎ ফের গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন, অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ।

টিকিট জোগাড় করে সন্ধ্যার বিমানে মুম্বই ফিরে গেলাম। চৌধুরী ভাইয়েরা সবাই এসে গেছেন, বোনেরা কেউ যেতে পারেননি, তবে খোকন, ছোট্টু ও একজন-দু'জন ভাগ্নে-ভাগ্নি মুম্বইতে ছিল, দেবুদার সঙ্গে হেনাদিও কলকাতা থেকে চলে এসেছেন। কয়েকটা দিন ঘোরের মধ্যে কাটলো, ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি-র জন্য সম্পাদকীয় লিখলাম : এখন থেকে শচীন চৌধুরীহীন ভূমণ্ডল। পারিবারিক বৃত্তের বাইরে এমন নিবিড় করে আর-কাউকে এতটা কাছে পাইনি, আমার জীবনের একটি অধ্যায় সমাপ্ত।

শচীনদার অবর্তমানে সমীক্ষা ট্রাস্ট পুনর্গঠিত হলো, আমি অন্যতম সদস্য। ফের একবার কথা উঠলো, সম্পাদক হিশেবে আমি যোগ দিতে পারি কিনা, সেই প্রস্তাব বেশিদূর এগোলো না, বোধহয় কোনও ট্রাস্ট সদস্যের আপত্তি ছিল, তা ছাড়া আমার পক্ষে জোর সওয়াল করবার জন্য শচীনদা তো আর নেই। যিনি সম্পাদক হয়ে এলেন, বছর খানেক বাদে রিজার্ভ ব্যাংকে চলে গেলেন, তারপর থেকে আমাদের অনেক কনিষ্ঠ কৃষ্ণরাজ সম্পাদনার

দায় বইছে, পরমাশ্চর্য নিষ্ঠার সঙ্গে, ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি আজ যে-প্রতিষ্ঠায় পৌঁছেছে, তার কৃতিত্ব প্রায় পুরোপুরি তাঁর একার, আমরা তো নিমিত্ত মাত্র। একেবারে হালে, সম্ভবত বিশ্বায়নের প্রকোপে, কৃষ্ণরাজ একটু ডাইনে হেলেছে, যা আমার মতো অনেকের অপছন্দ, কিন্তু সম্পাদকীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ তো অকল্পনীয়।

সাতষট্টি সাল থেকেই রাজনীতির দ্রুত পট পরিবর্তন, কলকাতায়, দিল্লিতেও। পশ্চিম বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে দুই কমিউনিস্ট দল মিলতে পারলো না, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বিভিন্ন গোষ্ঠীর একটি মিশ্র নির্বাচনী জোট, দক্ষিণীপন্থী পার্টির নেতৃত্বে আর একটি, যার সঙ্গে অজয় মুখোপাধ্যায়-হুমায়ুন কবিরদের বাংলা কংগ্রেসও যুক্ত। তা সত্ত্বেও স্বাধীনতার পর এই প্রথম রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রস দল সংখ্যাধিক্য হারালো। যথাযোগ্য মূল্যে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁট বাঁধলে সংখ্যাধিক্য হয়তো ফিরে পাওয়া যেত, তবে অতুল্য ঘোষ সেই মূল্য দিতে রাজি হলেন না, আগেভাগেই ঘোষণা করে দিলেন, কংগ্রেস দল পুনর্বার সরকার গড়তে আগ্রহী নয়। দুই বাম তথা কংগ্রেস-বিরোধী জোটের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ আলোচনায় বসলেন। কিছু দরকষাকষি হলো; যদিও ভোটের ও বিধায়কের সংখ্যার বিচারে বামপন্থী কমিউনিস্টরাই প্রধান দল, বাংলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অজয় মুখোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী হলেন, জ্যোতি বসু যুগপৎ উপমুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী। অজয়বাবুর দায়িত্বে স্বরাষ্ট্র বিভাগ। অবশ্যই সবচেয়ে উপযুক্ত মন্ত্রী নির্বাচন হয়েছিল ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের ক্ষেত্রে, হরেকৃষ্ণ কোঙার। দুই গোষ্ঠীর মিলিত সত্তার নাম দেওয়া হলো যুক্তফ্রন্ট। জ্যোতিবাবু কলকাতা ট্রাম কোম্পানি অধিগ্রহণ, কর্মচারীদের জন্য বেতন কমিশন নিয়োগ ইত্যাদি কিছু-কিছু চমক-লাগানো কাজ করেছিলেন, তবে হরেকৃষ্ণবাবু ভূমিহীন কৃষক ও ভাগচাষীদের জমি দখলের যে-আহ্বান জানিয়েছিলেন, তার পরিণামে অচিরে, যুক্তফ্রন্টের ঊনিশ মাসের মধ্যেই, পশ্চিম বাংলার সমাজবিন্যাসে গুণগত পরিবর্তন ঘটেছিল অনেক। যদি হুমায়ুন কবির নিজের রাজনৈতিক প্রভাবের ভিত্তিভূমি পশ্চিম বাংলায় প্রতিষ্ঠার জন্য অত অস্থির হয়ে না উঠতেন, এবং প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয় পরিণত বার্ধক্যে আর একবার মুখ্যমন্ত্রী হবার জন্য অতটা উদ্‌গ্রীব না হতেন, সম্ভবত যুক্তফ্রন্ট সরকার এলোমেলো চেহারা নিয়ে আরও কিছুদিন টিকে থাকতে পারতো। কিন্তু ভয়ের মধ্যে ভয়, সমস্যার মধ্যে সমস্যা। অজয় মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হিশেবে আদৌ সড়গড় নন, বয়সের পীড়নে প্রায়ই মন্ত্রিসভার বৈঠকে ঘুমে ঢলে পড়েন। তাঁর অনুজ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় মন্ত্রিসভায় সি. পি. আইয়ের অন্যতম প্রতিনিধি, জ্যোতি বসু বা হরেকৃষ্ণ কোঙার তখন তাঁকে ঠেলা দিয়ে বলেন : 'ও মশাই, আপনার ছোড়দাকে জাগিয়ে তুলুন'।

আরও অনেক সমস্যা জড়ো হয়ে এলো। মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক প্রভাব সমাজের সর্বস্তরে দ্রুত বাড়ছে, বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে অনেকেই সন্ত্রস্ত। তাঁরা দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, ইন্দিরা গান্ধি বাংলার দখলদারি ফিরে পেতে উৎসুক, আশু ঘোষ নামে এক ফড়ে, কলকাতায় অনেক বাড়িঘরের মালিক, ঠিকেদার হিশেবে কাজে নেমে পড়লেন, আটষট্টি সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে তেরো-চোদ্দো জন বিধায়ক বাংলা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এলেন প্রফুল্ল ঘোষের নায়কত্বে। অতুল্য ঘোষকে জব্দ করবার জন্য ইন্দিরা গান্ধি সোৎসাহে এগোলেন, অতুল্যবাবুকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করলেন না। রাজ্যপাল ধরমবীরকে দিয়ে অজয়বাবুকে বরখাস্ত করানো হলো, রাতের অন্ধকারে প্রফুল্ল ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী পদে বৃত হলেন। পরিণাম কিন্তু আখেরে আদৌ সুবিধার হলো না। তিন-চার মাসের মধ্যেই যাঁরা

প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে গিয়েছিলেন, অথচ মন্ত্রী হতে পারেননি, তাঁরা বিগড়ে গেলেন, আশু ঘোষের সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল, প্রফুল্ল ঘোষ পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এবার রাষ্ট্রপতির শাসন, কলকাতা ও পশ্চিম বাংলাকে অনেক মিষ্টিমধুর কথা শোনানো হলো দিল্লি থেকে, এই আশায়, যদি যুক্তফ্রন্টকে আসন্ন নির্বাচনে হারিয়ে দেওয়া যায়।

পৃথিবীতে কৌতুককাহিনীর শেষ নেই। প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রিসভার শেষ লগ্নে ইন্দিরা গান্ধি অন্তিম আলোচনার জন্য প্রফুল্ল ঘোষ-আশু ঘোষ-পূরবী মুখোপাধ্যায় সবাইকে দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছেন। ভোরের বিমানে দিল্লিগামী সবাই, সেই বিমানে ভূপেশ গুপ্তও আছেন, আমিও আছি। বিমান প্রায় লখনউর আকাশে পৌঁছেছে, হঠাৎ শুনি ভূপেশবাবু গলা উঁচু পর্দায় তুলে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করছেন: 'এ প্লেইনলোড অফ সিন, বিমান-বোঝাই পাপ যাচ্ছে, বিমান-বোঝাই পাপ'।

ঘটনাসমাচ্ছন্ন বছর, আরও অনেক কিছু ঘটলো। সি. পি. আই. '(এম)-এর মধ্যে একদল বিপ্লবউন্মার্গী, চীনদেশের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দৃষ্টান্তে অভিভূত, পশ্চিম বাংলা যে ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্য মাত্র, তা তাঁদের সেই মুহূর্তে খেয়ালে এলো না, তাঁরা ধরেই নিলেন চীনের মতো এখানেও মৃত্তিকা প্রস্তুত, বিপ্লবটি ঘটিয়ে ফেললেই হলো। বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজভুক্ত অনেক ছাত্র-যুবক তাঁদের ডাকে সাড়া দিলেন। দার্জিলিং জেলায় হিমালয়ের সানুদেশে নকশালবাড়ি থানা অঞ্চলে রাজ্য পুলিশের সঙ্গে উৎসাহীদের একটি অংশের সংঘর্ষ, কয়েকজন আদিবাসী কৃষক নিহত হলেন, কয়েকজন মহিলাও, উত্তেজনার পর্দা হঠাৎ উঁচুতে চড়ে গেল। শিলিগুড়ির বিদ্রোহী নেতা চারু মজুমদারকে দল থেকে বহিষ্কার করা হলো, কিন্তু আগুন নেভবার কোনও লক্ষণ নেই, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব অথচ বেড়েই যাচ্ছে, দলত্যাগীদের জন্য তেমন-কিছু আপাতত কোনও অসুবিধা হলো না, বিশেষ করে হরেকৃষ্ণ কোঙার গ্রামাঞ্চলে যে জমিদখলের বীজমন্ত্র ছিটিয়ে দিয়েছিলেন, তা থেকে মস্ত উপকার হচ্ছিল পার্টির।

আরও যা ঘটলো, সমর সেন-সুদ্ধু সবাই সদলে 'নাউ' পত্রিকা থেকে বিতাড়িত হলাম। একটু-একটু করে হুমায়ুন কবিরের বিরক্তি বাড়ছিল, সমরবাবুর সঙ্গে এই সম্পাদকীয়-সেই সম্পাদকীয় এই প্রবন্ধ-ওই প্রবন্ধ নিয়ে প্রায়ই খিটিমিটি। কে না জানে, কবির সাহেবের অভিযোগের যাথার্থ্য নিয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। হুমায়ুন কবির আশু ঘোষের প্রয়াসে সক্রিয় সাহায্য করেছিলেন, সংঘাত চরমে গিয়ে ঠেকলো প্রফুল্ল ঘোষের মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণকে 'নাউ'-য়ের এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এক লোলচর্ম বৃদ্ধের সদ্যোভিন্নাযৌবনা ষোড়শীর প্রতি লালসা রূপে বর্ণনায়। আমি দিল্লি থেকে চারণ গুপ্ত ছদ্মনামে 'নাউ'-তে কলকাতা ডায়েরি চালিয়ে যাচ্ছিলাম, কেন্দ্রীয় সরকারি কমিশনের সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও; তারও সাময়িক মুলতুবি। তবে কয়েকদিনের মধ্যেই কোম্পানি গড়ে বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে টাকা তোলা হলো, নতুন সাপ্তাহিক পত্রিকার উদ্যোগ সম্পূর্ণ, 'ফ্রন্টিয়ার'। কলকাতা ডায়েরিও নতুন কাগজে স্থানান্তরিত হলো, সমরবাবুর সুহৃদ্‌কুল ও অনুরাগীদের উৎসাহের শেষ নেই, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউর অদূরে মট লেনে নতুন পত্রিকার দপ্তর। ঘোর বামপন্থী বন্ধু রবি সেনগুপ্ত, ততদিনে তিনি আপাদমস্তক নকশালপন্থী, পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার, বিপ্লবের আর যেন একটুও বাকি নেই। রবিবাবুকে যদি কেউ রঙ্গ করে প্রশ্ন করতো : 'আপনি খড়িবাড়ি না নকশালবাড়ি', তাঁর হয়ে উত্তর যোগাতাম : 'উঁহু, উনি পুরোপুরি ফাঁসিদেওয়া'।

সমর সেনের সঙ্গে আমার মতান্তরের তখন থেকেই একটু-একটু শুরু। যে-কোনও

বাঙালি মধ্যবিত্তের মতো, বিপ্লব সম্পর্কে আমারও তখন ঈষৎ রোমান্টিক ধ্যানধারণা, নকশালবাড়ি আন্দোলনের সমর্থনে প্রথম পর্যায়ে বেশ কিছু সম্পাদকীয় লিখেছি 'নাউ' ও 'ফ্রন্টিয়ার'-এ। মাঝে-মাঝে স্নেহাংশু আচার্যের বাড়িতে জ্যোতি বসুর সঙ্গে দেখা হতো, কখনও-কখনও সমর সেনও থাকতেন। সমরবাবু ততদিনে উগ্র মতামত ধারণ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন, প্রায়ই জ্যোতিবাবুর সঙ্গে তাঁর তিক্ত কথাবার্তা, স্নেহাংশুবাবু ও আমি দু'জনেই একটু বিব্রত।

এখন তো স্বীকার করতে সংকোচ নেই, এই পর্বে অদমনীয় স্বপ্নবিলাসিতায় ভুগছিলাম আমরা অনেকেই। স্বপ্ন দেখার সামাজিক সার্থকতা আছে, পৃথিবীর বিভিন্ন ঋতুতে দেশে-মহাদেশে যে-সমাজ পরিবর্তন ঘটেছে, মানুষের ইতিহাস যে এগিয়ে গেছে, তা কেউ-কেউ মাঝে-মাঝে স্বপ্ন দেখতেন বলেই, স্বপ্ন থেকে সঞ্জাত অঙ্গীকার, অঙ্গীকার থেকে আলোড়ন, আলোড়ন থেকে বিপ্লব। মুশকিল হলো নিছক বাষ্পের সংস্থানে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন থেকে বিপ্লবে উত্তরণ অসম্ভব। স্বপ্নকে পরিপার্শ্বের কাঠ-খড়-রোদের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়, মিলিয়ে নিতে হয় রূঢ় বাস্তবের প্রতিটি অণু-পরমাণুর সঙ্গে। যা কল্পনায় সুন্দর করে আঁকা যায়, সেই চিত্রকল্পকে নদী-প্রস্তর-পর্বতসংকুল পৃথিবীতে ততটা অবলীলায় আঁকশি দিয়ে টেনে আকাশ থেকে নামানো যায় না। বিবেচনা প্রয়োজন, পরিচিকীর্ষা প্রয়োজন, প্রতীক্ষা প্রয়োজন। কখনও-কখনও স্বপ্নকে একটু কাটছাঁট করেও নিতে হয়, সম্ভপরতার প্রেক্ষিত থেকে বিচার করে। এই প্রক্রিয়াকেই বোধহয় সাধারণ ভাষায় বলা হয় সাধ ও সাধ্যের সংশ্লেষণ। একটি বিশেষ প্রতীতিতে এখনও আমি অবিচল। নকশালপন্থীরা যদি ওসময় হুট করে দল ছেড়ে না দিয়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আনুগত্য রক্ষা করে চলতেন, তাতে সমাজের সার্বিক উপকারই হতো। এই রাজ্যে ক্ষমতায় পৌঁছে মাঝে-মাঝে ওই দলে যে-ধরনের দুর্বলতা ও বিচ্যুতি চোখে পড়ে, তা হয়তো তা হলে রোধ করা সম্ভব হতো। সুশীতল রায়চৌধুরী-সরোজ দত্তদের তিতিক্ষা তা হলে হয়তো অন্য মাত্রা পেতো, সময়ের ফেরে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যে-লড়াই দলের অভ্যন্তরে এখনও চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এঁরা যদি পার্টিতে থাকতেন, লড়াইয়ে জেতা অনেক বেশি সহজ হতো। মার্কসীয় বীক্ষণে আস্থা রাখি বলে ললাটলিখনে খুচরো বিশ্বাস আরোপ হয়তো ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ নয়। তবে যে যা-ই বলুক, দেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি বিশেষ পর্যায়ে নকশালবাড়ি আন্দোলনের মতো অকস্মাৎ-উপগ্রহ, কে জানে, বোধহয় কিছুতেই অনাবির্ভূত থাকতো না।

একটি ব্যাপারে আমার মনে কোনও দ্বিধা ছিল না, তখনও ছিল না, এখনও নেই। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায়, বামপন্থী জনতা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দলের প্রতি যে-আনুগত্য ঘোষণা করেছে, তা চট করে শিথিল হবার নয়। সুতরাং যাঁরা বামপন্থী তথা বিপ্লবী আন্দোলনের মোড় ঘোরাতে চান, গুণগত পরিবর্তনের ছক আঁকেন, তাঁদের এই বৃহত্তম বামপন্থী দলের বাইরে চলে যাওয়া অসার্থক। তাঁরা এই দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে বামপন্থী জনতার কাছ থেকেও বিশ্লিষ্ট হবেন, তাঁদের শৌর্য ছুটকো-ছাটকা এখানে-ওখানে প্রিয়জনদের মোহিত করবে, কিন্তু সামগ্রিক আন্দোলনের কোনও কাজে আসবে না। নকশালপন্থী বন্ধুদের তাই তখন বহুবার অনুরোধ জানিয়েছি, তাঁরা বিদ্রোহ জারি রাখুন, কিন্তু পার্টির মধ্যে থেকে রাখুন। ঘটনাবলী অবশ্য অন্যদিকে মোড় নিল। এখনও আমার মনে হয়, নাগি রেড্ডি ও তাঁর সমর্থক-অনুরাগীরা যদি পার্টিতেই থেকে যেতেন, সাময়িক বোঝাপড়া করে, তা হলে দেশের-সমাজের-আন্দোলনের বিপুল সুবিধা হতো, পার্টির মধ্যে

সংশোধনবাদী ঝোঁক নিয়ে মাঝে-মাঝে যেসব আকুলি-বিকুলি শোনা যায়, সেগুলি সম্ভবত একটু কম করে উচ্চারিত হতো।

নাগি রেড্ডির প্রসঙ্গে ভারতীয় উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজের বিচিত্রগামিতার প্রসঙ্গে আর একবার পৌঁছে যেতে হয়। সত্তরের দশকের উপান্তে সঞ্জীব রেড্ডি দেশের রাষ্ট্রপতি; তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজশেখর রেড্ডি অন্ধ্রপ্রদেশে সি পি আই-এর সম্পাদক; এবং তাঁদের ভগ্নীপতি নাগি রেড্ডি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দল থেকে দূরে সরে ক্রমে নকশালপন্থীদের নেতৃত্বে অবস্থান করছেন। শুধু তাই-ই নয়, সঞ্জীব রেড্ডির সহধর্মিণী নাগি রেড্ডিরই সাক্ষাৎ ভগিনী।

সাতষট্টি সালের গ্রীষ্মের শেষের দিক, ওই অশান্ত সময়ে কয়েকদিনের জন্য দিল্লি থেকে কলকাতায় এসেছি। হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটে আমাদের চারতলার ফ্ল্যাটের ঠিক নিচে আই এ এস-ভুক্ত জনৈক মহিলা আমলা থাকতেন, তাঁর পিতামহ ঢাকা জেলার পুরনো দিনের কংগ্রেস নেতা বীরেন্দ্র মজুমদার, উনিশশো উনচল্লিশ সালে মাজদিয়া রেল দুর্ঘটনায় মারা যান। মহিলাটির মা জর্মান, অতি শান্ত, সৌজন্যবতী, করুণাময়ী। আমাদের প্রতিবেশিনীর ছোটো বোনের স্বামীও আই এ এস-এ, সেই মুহূর্তে দার্জিলিং জেলার ডেপুটি কমিশনার, তাঁর তত্ত্বাবধানে নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতাদের— কানু সান্যাল, সৌরেন বসু, খোকন মজুমদার, এঁদের— হন্যে হয়ে পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষ থেকে খোঁজা হচ্ছে। তাঁর দুই কন্যা ও এক জামাতা-সহ জর্মান মহিলাকে আমরা নৈশাহারে বলেছি। টেবিলে গোল হয়ে বসে খাচ্ছি, আলাপ করছি, হঠাৎ দরজায় বেল। খুলে দেখি রবি সেনগুপ্ত, সঙ্গে আমার অচেনা এক ভদ্রলোক। রবিবাবু নিচু গলায় বললেন : 'ইনি সৌরেন বসু, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন'। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়, এর চেয়ে বড়ো সংকট আর কী হতে পারে, খাবার ঘরে সৌরেনবাবুকে যিনি গ্রেফতার করবেন সেই ডেপুটি কমিশনার মশাই বসে আছেন, আর সৌরেন বসু নিজে দরজায় দাঁড়ানো। দ্রুত তাঁদের দু'জনকে রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে শোবার ঘরে নিয়ে গেলাম, খাবার জায়গায় গিয়ে সমাগত অতিথিদের বললাম : হঠাৎ দু'জন দেখা করতে এসেছেন, ওঁদের সঙ্গে একটু কথা বলতে হচ্ছে, মাফ চাইছি কিছুক্ষণের জন্য। সৌরেন বসুর সঙ্গে নকশালবাড়ি-উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা ; তিনিই বলছেন, আমি প্রধানত নির্বাক শ্রোতা। আলোচনাক্রমে আমি একবার বোধহয় বলেছিলাম, 'সমস্যা ক্রমশ ঘনীভূত হবে বুঝছেন তো; নকশালবাড়িতে, দেখে মনে হচ্ছে, শিগগিরই ফৌজ নামানো হবে, আপনারা কী করবেন তখন?' সৌরেনবাবু দ্বিধাহীন, তাঁর উচ্ছ্বাস বেড়ে গেল, ঝটিতি জবাব দিলেন : 'আমাদের কাছে খবর, নকশালবাড়িতে একটি মারহাট্টা রেজিমেন্ট আসবে। ওরা তো মহারাষ্ট্রের দেহাতি মানুষ, প্রায় সবাই গরিব কৃষক। যে মুহূর্তে জানতে পারবে আমরা জমির জন্য লড়াই করছি, গরিব কৃষককুলের জন্য লড়াই করছি, সঙ্গে-সঙ্গে ওরা ওদের বন্দুককামান-সহ আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে'। আমি আর কথা বাড়ালাম না; রোমান্টিকতা নমস্য, কিন্তু তা তো হঠকারিতারও জনক। এর কিছুদিন বাদে সৌরেনবাবু লুকিয়ে চীন চলে যান, চু এন লী-র সঙ্গে দেখা হয়, চীনের প্রধান মন্ত্রী তাঁকে কী বুদ্ধি-পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন জানি না, তবে সৌরেনবাবু দেখা করতে না এলে এত তাড়াতাড়ি হয়তো আমি নিজে নাস্তিক বনে যেতাম না।

শুনেছিলাম, 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' তাঁদের ভারতীয় অনুরাগীদের এই স্লোগানে উদ্বেল হওয়াতে চীনের নেতারা সৌরেনবাবুর কাছে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন,

বলেছিলেন ওটা কাণ্ডজ্ঞানহীন। অবশ্য কলকাতার রকে তখন যুক্তি কপচানো হয়েছিল, ১৯৪২ সালে হীরেন মুখুজ্যে মশাই তো উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, হ্যাঁ, বলবো, শত বীণাবেণু রবে বলবো, সোভিয়েট দেশ আমার পিতৃভূমি; তা হলে সিকি শতাব্দী বাদে চারু মজুমদার কী এমন অন্যায় করেছেন? মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে যে-কমরেডরা বিদ্রোহের ঝাণ্ডা ওড়ালেন, তাঁদের অভিযোগ সংশোধনবাদ রুখতে বেজিং বেতারে প্রত্যহ যে-যে উপদেশাবলী বর্ষিত হচ্ছে এখানকার নেতারা সে-সব কিছুই মানছেন না। শ্লেষবিচ্ছুরণে জ্যোতিবাবু তুলনাহীন, প্রসঙ্গটি উঠতে একদিন সঙ্গে-সঙ্গে মন্তব্য করলেন : 'সম্পূর্ণ বাজে কথা, আমাদের চেয়ে বড়ো চীনে ভক্ত কে? বিশের দশকের শেষের দিকে, তিরিশের দশকের গোড়ায় সোভিয়েট পার্টি লম্বা-লম্বা নির্দেশ-উপদেশ পাঠাত চীনে পার্টিকে। চীনে কমরেডরা তা শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়তেন, পড়ে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখতেন। আমরাও তো ঠিক তাই করছি চীনে বেতারের উপদেশাবলী নিয়ে।'

কয়েক মাস গত হলে 'ফ্রন্টিয়ার'-এ আমার লেখা বন্ধ হয়ে গেল। সমরবাবুর উগ্রতর সুহৃদরা নালিশ জানাতে শুরু করলেন, অশোক মিত্রের লেখাগুলি বড়ো বেশি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি-ঘেঁষা, পত্রিকার পবিত্রতা নষ্ট করছে। মত-কষাকষি চরমে উঠলো উনসত্তর সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে। দ্বিতীয় যুক্ত ফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে, অজয় মুখোপাধ্যায় পুনর্বার মুখ্যমন্ত্রী, বিধান সভায় সি পি আই (এম) সর্ববৃহৎ দল হওয়া সত্ত্বেও জ্যোতিবাবু ফের উপমুখ্যমন্ত্রী, অবশ্য এবার তিনি অর্থ দপ্তর নয়, স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্বে। প্রায় গোড়া থেকেই বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে জ্যোতিবাবুদের বিসংবাদ শুরু, অনেক নাটক-যাত্রা হলো, ইন্দিরা গান্ধি ইতিমধ্যে প্রচুর অঙ্ক কষেছেন, সত্তর সালের শুরুতে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ফের ভাঙলো। বাংলা কংগ্রেসের সুপারিশে তৎকালীন রাজ্যপাল আর-এক দফা পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করলেন। আট-দশ মাস বাদে, লোকসভা নির্বাচনের পাশাপাশি, রাজ্য বিধানসভার পুনরায় নির্বাচন, চার বছরের মধ্যে তৃতীয় বার। সি পি আই (এম)-এর সঙ্গে কয়েকটি বামপন্থী দল রইলো, অন্যদিকে সি পি আই ও ফরোয়ার্ড ব্লক বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে। বরানগর কেন্দ্রে কংগ্রেস; বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং নকশালপন্থীদের সর্বসম্মত একক প্রার্থী অজয় মুখোপাধ্যায় জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে। 'ফ্রন্টিয়ার'-এ সম্পাদকীয় বেরোলো অজয় মুখোপাধ্যায়কে সমর্থন জানিয়ে ; আমি তা পড়ে বিমূঢ়। জ্যোতি বসু অবশ্য অনেক ভোটে এবারও জিতেছিলেন। একটি ঘটনা ঘটলো, এখন হাসির উদ্রেক করে। আমার বহুদিনের বন্ধু হিতেন ও অ্যাঞ্জেলা ভায়া তখন কলকাতায়, হিতেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের অধ্যক্ষ পদে সমাসীন, আলিপুরের নিউ রোডে ওদের বাড়িতে আমাদের, সমরবাবুদের এবং আরও কয়েকজনকে খেতে বলা হয়েছিল এক সন্ধ্যায়, বরানগরের নির্বাচনী ফল যেদিন বেরোবার কথা। সমরবাবুর অনুরোধে রেডিও খোলা হলো, আমরা সংবাদ শুনলাম, অজয়বাবু ভীষণভাবে হেরে গেছেন। সমরবাবুর মেজাজ সহসা খিঁচড়ে গেল। বরাবরই দেখেছি, সামান্য জলপথে বিহার করলে ওঁর মুখ থেকে নিখাদ খাঁটি কথা বেরোয়। জ্যোতিবাবুর জয় ও অজয় মুখোপাধ্যায়ের পরাজয় নিয়ে ওই সন্ধ্যায় আমাদের দু'জনের মধ্যে প্রথমে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, পরে রীতিমতো কড়া বাক্যাবলীর বিনিময়। সমরবাবু থেমে-থেমে, গভীর তিক্ততার সঙ্গে জানালেন, আমি পর-পর তাঁর দুটো পত্রিকারই— 'নাউ' এবং 'ফ্রন্টিয়ার'-এর— সর্বনাশ করেছি, সি পি আই (এম)-এর প্রতি আমার ধারাবাহিক পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন দ্বারা, তাঁর, ও

পত্রিকাদ্বয়ের, বদনাম হয়েছে। এর পর সমরবাবুর কাগজে আমার পক্ষে লেখা চালিয়ে যাওয়া সত্যিই অসমীচীন হতো। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ইংরেজি প্রবন্ধসংকলনের একটি আলোচনা সমরবাবুর কাছে ইতিমধ্যে গচ্ছিত ছিল, আর ফেরত চাইনি, ওটা ছাপা হয়ে গেল। তবে আর কোনওদিন 'ফ্রন্টিয়ার'-এ লিখিনি, যদিও সমরবাবুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যসম্পর্কে আদৌ চিড় ধরেনি, আমাদের মেলামেশা অব্যাহত থেকেছে, সমরবাবু যতদিন বেঁচে ছিলেন, শেষ পর্যন্ত।

কলকাতায় উনিশশো উনসত্তর-সত্তর-একাত্তর জুড়ে আরও অনেক কিছু ঘটছিল। রবি সেনগুপ্ত তখন দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য নকশাল সমর্থক, সমর সেনের সঙ্গে রাজযোটক। আমি লেখা বন্ধ করলে কী হবে, আগুন-ঝরানো রচনা-লেখকের অভাব ছিল না কলকাতা শহরে, তাঁরা 'ফ্রন্টিয়ার'-এ আসর জমিয়ে রইলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোনো আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অত্যন্ত প্রতিভাবান ছাত্র নয়ন চন্দ তাঁদের অন্যতম ; নয়ন এখন বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক। অবশ্য অন্য দিকে ইতিমধ্যেই অন্তত উৎপল দত্তের অত্যুৎসাহী বিপ্লবী অধ্যায় সমাপ্ত। কিছুদিন পর্যন্ত উৎপল, ও সেই সঙ্গে লিটল থিয়েটার গ্রুপ, নকশালবাড়ি আন্দোলনের উজ্জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে মোহিত। উৎপল ও তাপস সেন শিলিগুড়ির গোপন ডেরায় চারু মজুমদারের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন, তখনই বোধহয় উৎপলের মোহাচ্ছন্নতা একটু কমেছিল, তা হলেও মস্ত কুচকাওয়াজ করে 'তীর' নাটক লেখা হলো, অভিনব মঞ্চস্থাপনা, বিভিন্ন কাট-আউটে জ্যোতি বসু-প্রমোদ দাশগুপ্ত-হরেকৃষ্ণ কোঙারের মুখের প্রতিচ্ছবি, তাঁদের মুখ দিয়ে অনেক প্রগাঢ় প্রতিক্রিয়াশীল বচন শোনানো, নকশালবাড়ি লাল সেলামের জয়ধ্বনিতে মিনার্ভা মঞ্চ তিন ঘণ্টা জুড়ে কম্পমান।

একটু বাদেই অকস্মাৎ যবনিকা পতন। জেমস আইভরি-ইসমাইল মার্চেন্ট জুটি অনেক ভারতীয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে, প্রধানত মুম্বইতে, এক চলচ্চিত্রের শ্যুটিং করছেন, উৎপলকে, অনুমান করছি, অনেক টাকার বিনিময়ে, প্রধান ভূমিকায় বেছেছেন। সেই মাহেন্দ্রমুহূর্তে উৎপল দত্ত পুনরায় গ্রেফতার, ঠিক কী মামলায় জড়িয়ে প্রথমে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, তখনও প্রফুল্ল ঘোষের স্বল্পায়ু মুখ্যমন্ত্রিত্ব চলছে। মার্চেন্ট আইভরিদের মাথায় হাত, তাঁদের ছবির মুক্তি পিছিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা, তাতে প্রচুর ব্যবসায়িক ক্ষতিরও ঝুঁকি। পর্দার অন্তরালে ঠিক কী ঘটেছিল বোঝা মুশকিল, কিন্তু একদিন শুনলাম, উৎপল মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে বিমানে চেপে মুম্বইমুখো শ্যুটিঙের উদ্দেশ্যে।

তখনও আমি 'ফ্রন্টিয়ার'-এ লেখা ছাড়িনি, দিল্লিতে প্রতি সপ্তাহে সমরবাবু চিঠি দিতেন, কে কী লিখছেন, আমার কাছ থেকে পরবর্তী সংখ্যার জন্য কী লেখা আশা করছেন, এ-সমস্ত জানিয়ে। উৎপল-কাহিনী সমাপ্ত হবার পর এরকম এক পোস্টকার্ড, একটি-দু'টি কেজো কথাবার্তার পর সমরবাবুর স্বাক্ষর : ইতি সমর। হঠাৎ একটি পুনশ্চ সংযোজন : 'উৎপলের কাণ্ডটা দেখলেন?' উৎপল দত্ত অবশ্য পরে তাঁর লেখা এক ইংরেজি গ্রন্থে মুচলেকা দেওয়ার ব্যাপারটাকে লঘু করে বর্ণনা করেছেন: শ্রেণীশত্রুদের সঙ্গে শঠতায় অপরাধ নেই, তাদের উজবুক বানিয়ে যদি কারান্তরাল থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ থাকে, তা কেন গ্রহণ করা হবে না।

কুড়ি

দিল্লিতে আমার অবস্থানেও ইতিমধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে। সত্তর সালের গোড়ার দিকে কৃষিপণ্য মূল্য কমিশনের সভাপতিত্ব ছেড়ে ভারত সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিশেবে যোগ দিয়েছি। পশ্চিম বাংলায় যুক্ত ফ্রন্টকে ভদ্রমহিলার উত্ত্যক্ত করা হওয়া সত্ত্বেও, তখনও বামপন্থীরা ইন্দিরা গান্ধি সম্পর্কে আশা পোষণ করে যাচ্ছিলেন। উনসত্তর সালের মাঝামাঝি কংগ্রেস দু'ভাগ হলো, লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করতে ইন্দিরা বামপন্থীদের দ্বারস্থ হলেন, কয়েক মাস বাদে রাজন্যভাতা বিলোপ, ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার জাতীয়করণ ঘোষণা, সারা দেশে উত্তেজনা, হুলুস্থুল। এই পরিস্থিতিতে শুভানুধ্যায়ীদের তথা রাজনৈতিক বন্ধুদের উপদেশ-অনুরোধ-উপরোধ : মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পদগ্রহণের যে-আহ্বান আমার কাছে এসেছে, তা যেন প্রত্যাখ্যান না করি। তাঁদের যুক্তি, সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অর্থমন্ত্রকে বসেন, সেই মন্ত্রক প্রতিক্রিয়াশীল আমলাবৃন্দে সমাচ্ছন্ন, আমি ঢুকতে পারলে গেলে সম্ভবত ভিতর থেকে কলকাঠি নেড়ে দক্ষিণপন্থীদের চক্রান্ত অন্তত খানিকটা ব্যর্থ করতে পারবো। ইন্দিরা গান্ধি মোরারজী দেশাইকে অর্থমন্ত্রীর আসন থেকে বিচ্যুত করেছেন, নিজে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, যাঁরা আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখতে ভালবাসেন তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন, সমাজবিপ্লবের তেমন আর দেরি নেই, বিশেষ করে একদা হ্যারি পলিট-রজনী পালমা দত্ত-ভক্ত পরমেশ্বর হাকসার যেহেতু প্রধান মন্ত্রীর দফতরে সর্বেসর্বা।

অবস্থানভিত্তিক কুহেলিকায় আমার মতো নিকষ নাস্তিকও কিছুটা বিলাসকল্পনায় তখন মজে গিয়েছিলাম। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হলো, এবার গরিবদের, বেকার ছেলেদের, ছোটো চাষী-ভাগচাষীদের ব্যাঙ্ক থেকে নামমাত্র সুদে টাকা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, এমন সব ফন্দি আঁটছিলাম; নতুন বছরের বাজেটে কুলককুলসুদ্ধু ধনী পরিবারের উপর কড়া হারে সম্পত্তিকর বসানোর প্রস্তাবও ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। তবে কোনওই লাভ হলো না, স্বতন্ত্র পার্টির কথা ছেড়েই দিলাম, কংগ্রেস দলের মধ্যেই ভূস্বামী সম্প্রদায়ের রাঘব-বোয়াল প্রতিনিধি, তাঁরা সরোষ প্রতিবাদ জানালেন, এমনকি, আমাকে যা ভীষণ আশ্চর্য করলো, সি পি আই-এর পক্ষ থেকেও প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বিবৃতি। ক'দিন বাদে কী কাজে অচ্যুত মেনন নর্থ ব্লকে আমার ঘরে এলেন, তিনি তখন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী কিনা মনে আনতে পারছি না, তাঁকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর দল থেকে এমন বিবৃতি বেরোলো কেন, আমরা খুব অসহায় বোধ করছি। অচ্যুত মেননের সততার-সাধুতার তুলনা নেই, ঈষৎ বিব্রতবোধ করে একটু ক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন : 'বিহার ও অন্ধ্র প্রদেশের কমরেডদের প্রবল আপত্তি ছিল'। সহজেই বুঝে নিলাম, দলের প্রতি অনুগত মধ্যচাষীরা অনেকেই ইতিমধ্যে ধনী কৃষকে রূপান্তরিত হয়েছেন।

নতুন পদে আমার যোগ দেওয়ার চার মাসের মধ্যেই ইন্দিরা গান্ধি অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব

যশোবন্ত রাও চ্যবনকে ছেড়ে দিলেন, তবু অন্তত ওই ক'মাস তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রীকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। ছেষট্টি সালে উনি প্রধান মন্ত্রী হিশেবে শপথ নেওয়ার পর প্রথম দিকে বেশ কয়েকবার ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে বৈঠক করতে গিয়েছি। উনি নিমন্ত্রণ জানাতেন, বিভিন্ন বিষয়ে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা থেকে জ্ঞানান্বিত হবার জন্য। আমার ধারণা, তখন যাঁরা তাঁর আশেপাশে প্রধান পরামর্শদাতা রূপে বিরাজ করতেন, তাঁদেরই উৎসাহে এ-সমস্ত বৈঠক ডাকা হতো, প্রধান মন্ত্রীর জনসংযোগ যাতে উন্নত স্তরে পৌঁছয়, সেই লক্ষ্যে। ইন্দিরা গান্ধিকে তখন হালকা মেজাজের চঞ্চলা হরিণী বলেই মনে হতো : সভায় বসে সর্বক্ষণ এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন, পাশে উপবিষ্ট আমলামশাইয়ের সঙ্গে অহরহ ফিসফাস কথা বলছেন, আলোচনার বিষয়ে আদৌ যেন আগ্রহ নেই। সত্তর সালে মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিশেবে যখন ফের তাঁর সঙ্গে আলাপ হলো, দেখলাম সম্পূর্ণ অন্য মানুষী। প্রচুর পরিশ্রম করতে শিখেছেন, এক ধরনের জেদ সমস্ত চেতনা অধিকার করে, প্রতিটি বিষয়ের খুঁটিনাটি সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহ, শুধু নিজেই খাটছেন না, তাঁর চারপাশে যাঁরা আছেন, তাঁদেরও খাটাচ্ছেন। তাঁর একাগ্রচিত্ততার দু'টি উদাহরণ পেশ করছি। সংসদের অধিবেশন চলাকালীন প্রতিটি মন্ত্রীকে সপ্তাহে একদিন লোকসভায় ও একদিন রাজ্যসভায় এক ঘণ্টা ধরে সদস্যদের পেশ-করা 'তারকাখচিত' প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দিতে হয়, লিখিত উত্তরের সংযোজন-পরিপূরণ হিশেবে। সংসদের বৈঠক বসে সকাল এগারোটায়, ইন্দিরা গান্ধি আমাদের মতো চার-পাঁচজন সচিব-পরামর্শদাতাদের নিয়ে দু'দিনই সকাল সাড়ে ন'টা থেকে শুরু করে এগারোটা পর্যন্ত বৈঠক করতেন। আমাদের দিকে সম্ভাব্য 'অতিরিক্ত' প্রশ্ন ছুঁড়তেন, আমরা তার জবাব দেবো, হয়তো আমাদের কারও দেওয়া উত্তরই তাঁর পছন্দ হলো না, কিংবা আমার উত্তর পছন্দ হলো না, আমার পাশে বসা রাজপুরুষকে তাঁর মতো করে উত্তর দিতে বললেন, হয়তো সেই উত্তরের সূত্র ধরে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, তার উত্তর পছন্দ না হলে ফের প্রশ্ন, প্রশ্নবাণে আমরা জর্জর, কিন্তু এই পদ্ধতিতে প্রতি সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে দু'দিন নিয়মিত বৈঠক করার ফলে, তাঁরও যেমন সংসদে সদস্যদের মৌখিক প্রশ্নের তাৎক্ষণিক জবাব দিতে সপ্রতিভতা এলো, অনুরূপ আমাদেরও জ্ঞানের প্রসার ঘটলো। তাঁর বর্ধমান মনোযোগের আর একটি দৃষ্টান্ত : বাৎসরিক কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হয়েছে, তা নিয়ে সংসদে বিতর্ক চলছে, বিতর্কের জবাব দেবেন প্রধান মন্ত্রী, কয়েকটি কর প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশোধনী প্রস্তাব-সহ তাঁর জবাবি বক্তৃতার খসড়া প্রস্তুত, তাতে একটি বিশেষ কর-সংশোধনী উল্লেখ করা হয়নি, আমাদের কাছে সেটা তেমন জরুরি বলে ঠেকেনি, যেহেতু পণ্যদ্রব্যটির রাজস্বসংগ্রহের দিক থেকে তত গুরুত্ব নেই, যদিও সঙ্গে-পেশ-করা কাগজপত্রে তার উল্লেখ ছিল। যেদিন জবাবি ভাষণের তারিখ, পূর্ববর্তী সন্ধ্যায় বক্তৃতার খসড়া প্রধান মন্ত্রীর বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, সাতসকালে টেলিফোনে তলব : প্রধান মন্ত্রী যথাশীঘ্র যেতে বলেছেন। আমাদের ওই বাদ দেওয়ার ব্যাপারটি তাঁর সতর্ক দৃষ্টি এড়ায়নি, তাঁকে বুঝিয়ে বলতে হলো।

উদ্ধত ইন্দিরা গান্ধি, অত্যাচারিণী ইন্দিরা গান্ধি, স্বৈরাচারিণী ইন্দিরা গান্ধি তখনও যবনিকার আড়ালে, আমাদের সঙ্গে খুব খোলামেলা আলাপ করতেন। এখন যা অবিশ্বাস্য *ঠেকবে, মাঝে-মাঝে রাতের শো'তে চলচ্চিত্র দেখতে যেতেন পর্যন্ত, প্রধানত রিভোলি* সিনেমাঘরে, কোনও সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত ছবি সম্বন্ধে আমাদের মতামত জানতে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে বক্র-মন্তব্যে তাঁর উৎসাহ অন্তহীন। এক নেতা,

যিনি পরে কিছুদিনের জন্য প্রধান মন্ত্রীও হয়েছিলেন, তাঁর বিষয়ে ইন্দিরা গান্ধির প্রবল বিতৃষ্ণা, আমাকে দু'-একদিন ঠাট্টা করে বলেছেন : 'ওর মধ্যে তুমি কী এমন মহামূল্য গুণাবলী দেখতে পাও? জানো না, ও অমুক ব্যবসাদারের কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা পায়'।

তবে, স্বীকার করতেই হয়, অত্যন্ত দ্রুত তিনি কূটকচালিও শিখছিলেন। সেই বছরের বাজেটে আমরা তালাচাবি-সিন্দুক-আলমারির উপর খুব কড়া হারে অন্তঃশুল্ক চাপাবার প্রস্তাব রেখেছিলাম। হয়তো গোদরেজ গোষ্ঠীর কেউ, বা অন্য-কোনও শিল্পপতি, তাঁর কাছে এসে দরবার করে গেছেন, আমাদের ডেকে পাঠিয়ে ইন্দিরা গান্ধি, প্রতিভাধারিণী, গল্প ফাঁদলেন, 'জানো, আমাদের বাড়ির সিন্দুক-দেরাজ-আলমারির সব চাবি আমার কাছে গচ্ছিত থাকতো, একবার হলো কী, বাড়িতে এক বিয়ে, বিয়ের সমস্ত শাড়িগয়না আলমারিতে পোরা, চাবি আমার কাছে, আমার বাচ্চা ছোটো ছেলে চাবির গোছা নিয়ে খেলতে গিয়ে কোথায় হারিয়ে ফেললো, অনেক মিস্ত্রি ডেকেও আলমারি খোলা গেল না, শেষ পর্যন্ত মুম্বই থেকে গোদরেজের লোক এসে সেই আলমারি খুললো। ওরা এত ভালো-ভালো, এত চমৎকার-চমৎকার জিনিশপত্র তৈরি করছে, ওদের উপর করের বোঝা একটু কমিয়ে দাও না কেন?'

যেটা দুঃখের, তাঁর এই মানসিকতা কিংবা আচরণিক মাধুর্য তেমন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি; তার কারণ, হেঁয়ালির মতো ঠেকলেও আমি বলবো, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ব্যাংক জাতীয়করণ, অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা ধরনের বাজেট, রাজন্যভাতা বিলোপ, গরিবি হঠাও সামগান ইত্যাদি তাঁকে ও তাঁর নবগঠিত কংগ্রেস দলকে একাত্তর সালের লোকসভা নির্বাচনে জিততে প্রভূত সাহায্য করেছিল। ওই সচ্ছল সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও ইন্দিরা গান্ধি হয়তো এমনিতে বেপরোয়া হয়ে যেতেন না। সত্তর সালের শেষের দিকেই যদিও কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল, শিল্পপতিদের উপর চাপ দিয়ে তিনি পয়সাকড়ি সংগ্রহ করছেন, তবে তা তো প্রথাগতভাবে সব প্রধান মন্ত্রীই করে থাকেন। দৃষ্টিকটু পটপরিবর্তন একাত্তর সালের নির্বাচনের পর। তাঁর কাছে বামপন্থীদের প্রয়োজন ততদিনে ফুরিয়েছে, কিন্তু সেই মুহূর্তেও তাঁর মাথা ততটা ঘুরে যায়নি। ঘুরলো খানিক বাদে; বাংলাদেশের যুদ্ধবিজয়, এবং পাকিস্তানকে সেই যুদ্ধে নাস্তানাবুদ করা, থেকেই পরবর্তী ভয়ংকর ইতিহাসের সূচনা। সত্তর সালের প্রথমার্ধ থেকে বামপন্থীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শিথিল হতে থাকে, খানিকটা আঁচ করতে পারছিলাম হাকসারের ছুটকো-ছাটকা মন্তব্য থেকে। লন্ডনে ছাত্রাবস্থায় জ্যোতি বসু ও হাকসার কাছাকাছি ছিলেন, দু'জনেরই চোখে ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। তিন-চার দশকে পরস্পরের ব্যক্তিগত অবস্থান আমূল পাল্টে গেছে, জ্যোতি বসু জননেতা, হাকসার দেশের সর্বোত্তম রাজপুরুষ হলেও তিনি আমলাই। যতদূর মনে আনতে পারি, দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানায় শ্রমিক অশান্তি নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, কোনও বিরক্ত মুহূর্তে জ্যোতি বসু নাকি মন্তব্য করেন, 'এটা রাজনৈতিক ব্যাপার, আমি রাজনৈতিক স্তরেই আলোচনা করবো।' পরের দিন হাকসার আমাকে তির্যক ইঙ্গিতে বললেন, 'আমি তো ব্লাডি সিভিল সার্ভেন্ট, কারণে-অকারণে জ্যোতি তা হলে আমাকে টেলিফোন করে কেন?' অবশ্য আজ পর্যন্ত এই ব্যাপারে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা করিনি।

অবস্থার যে মোড় ফিরছে তার ছুটকো-ছাটকা ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে আসছিল। আমি প্রস্তাব উত্থাপন করলাম, ব্যাংক জাতীয়করণ হয়েছে, এবার ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়ার হারে

বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানো হোক: বড়ো পুঁজিপতি-ব্যবসাদার-ধনী চাষীদের উপর ঋণের হার বাড়িয়ে পঁচিশ-তিরিশ শতাংশ করা হোক, অন্য পক্ষে দরিদ্র কৃষক-খেতমজুর-ভূমিহীন কৃষক-ব্যবসাদার-কারিগর-বেকার যুবক ইত্যাদির জন্য ঋণের হার অনেকটাই কমানো হোক, এমনকি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বিনা সুদে যোগ্য পাত্র-পাত্রীদের টাকা ধার দেওয়া হোক। (এটাও যোগ করেছিলাম, প্রতিভাবান কবি-সাহিত্যিকদের বই ছাপাবার জন্য নামমাত্র সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হোক, কিংবা নাট্যদলকে নাটক করার জন্য।) ব্যাংকের কেষ্ট-বিষ্টুদের মাথায় হাত। আমার প্রস্তাব বিবেচনার জন্য কমিটি গঠন করা হলো, উদ্দেশ্য সময়কে গড়াতে দেওয়া, ইতিমধ্যে ইন্দিরা গান্ধির পূর্ববঙ্গ বিজয়; গরিবদের কথা ভাববার আর দরকার নেই, কমিটির প্রতিবেদন বেরোলো, তাতে কার্যত প্রস্তাবের নিধন ঘোষণা।

অন্য কারণেও বুঝতে পারছিলাম হাওয়া ক্রমশ ঘুরছে। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়-সম্প্রদায় ইন্দিরা গান্ধিকে ঊনসত্তর সালে এক দফা বুঝিয়েছিলেন পশ্চিম বাংলার নতুন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ভালোভাবে জিতবে, তাঁদের সেই ভবিষ্যদ্বাণী খাটেনি, কিন্তু একাত্তর সালের নির্বাচনে অজয় মুখোপাধ্যায় সি পি আই-ফরোয়ার্ড ব্লক ইত্যাদিকে কংগ্রেসের সঙ্গে মেলাতে পেরেছিলেন, সুতরাং তাঁরা এবার প্রায় নিশ্চিন্ত। নিশ্চিন্ততার আরও হেতু অবশ্যই কলকাতায় ও পশ্চিম বাংলার অন্যত্র মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও সমর্থকদের সঙ্গে নকশালপন্থীদের ক্রমবর্ধমান সশস্ত্র হানাহানি। তখনই কিছু-কিছু অনুমান করা যাচ্ছিল, পরে তার নানা সাক্ষ্য পাওয়া যায়, নকশালপন্থীদের ভিড়ে পুলিশের অনেকরকম লোক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল; এ ব্যাপারে প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন পুলিশের এক বড়ো কর্তা, যিনি নিজেও ঢাকা শহরের ছেলে, পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে সুশোভন সরকারের কাছে পড়েছেন, একসময় ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে ঈষৎ মাখামাখি ছিল, মাঝে-মাঝে তাঁকে সমরবাবুর আড্ডাতেও দেখতে পেতাম, সদ্য-প্রকাশিত বহু বিদেশি বইয়ের নাম আওড়াতেন।

এই ভদ্রলোককে তারিফ করতে হয়, পরস্পরকে গুপ্তহত্যার বীজ বামপন্থীদের মধ্যে অনেক গভীরে ছড়িয়ে দিতে সফল হয়েছিলেন। কিছু আদর্শবাদী খাঁটি নকশালপন্থী যুবক, আবার কিছু নকশাল বকলমে ছদ্ম-কংগ্রেসী, কিছু বা নকশাল বকলমে ছদ্ম-পুলিশ : সব যেন ওই এলেবেলে ঋতুতে একাকার হয়ে গেল। খুনোখুনি বাড়তেই থাকলো। কয়েক মাস বাদে কলকাতায় নানা কিসিমের মিলিটারি পুলিশ নামানো হলো, পাড়া ধরে-ধরে চিরুনি আক্রমণ, হাজার-হাজার ছেলেমেয়েকে ধরে নিয়ে যাওয়া, এদের মধ্যে কেউ-কেউ নিকষ নকশালপন্থী, কেউ-কেউ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট কর্মী। আরও একটি পুলিশি প্রকরণের গল্প লোকের মুখে ছড়িয়ে পড়লো। গভীর নিশীথে পুলিশ ভ্যানে করে কতিপয় বন্দীকে শহরের বাইরে অনেক দূরে লোকালয়হীন অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে বলা হতো, এখন ছেড়ে দিচ্ছি, এখন থেকে সহবত মেনে চলবে, তোমাদের তো যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, বাড়ি ফিরে সুবোধ বালকের মতো থেকো, অন্যথা কিন্তু ভালো হবে না। ছেলেরা ভ্যান থেকে নেমে কয়েক পা এগোতেই পিছন থেকে তাদের গুলি করে মারা হতো, ভোরবেলা মানুষ দেখতে পেতেন খুন-হওয়া কয়েকটি ছেলের শব এখানে-ওখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

এসব ঘটনার কিছুদিন আগেই নকশালপন্থীদের একটি বড়ো অংশ সংঘবদ্ধ হয়ে কলকাতার ময়দানে সরকারিভাবে তাঁদের দল-গঠনের কথা বিজ্ঞাপিত করেন। তবে সেই দলীয় সংহতি বেশিদিন টেকেনি। বিপ্লবের পদ্ধতি ও প্রণালী নিয়ে, বিপ্লব শহরে শুরু করা হবে কিংবা গ্রামে, মধ্যবিত্ত দুর্বলচিত্ততা ঘোচাবার লক্ষ্যে বিদ্যাসাগর প্রমুখ নেতা-মনীষীদের

মূর্তির শিরশ্ছেদ করা হবে কি হবে না, ট্র্যাফিক কনস্টেবলদের কোতল করা কতটা যুক্তিসঙ্গত, বিপ্লবের পূর্বসূরী হিশেবে সন্ত্রাস কতটা ছড়িয়ে দেওয়া উচিত, এলোমেলো একে-ওকে-তাকে হত্যার সার্থকতা কী : সমস্ত-কিছু নিয়েই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল বাগবিতণ্ডার শুরু। কিছু-কিছু নকশালপন্থী চারু মজুমদারের প্রতি একনিষ্ঠ থাকলেন, অন্যরা তাঁকে পাগল ঠাউরে বিকল্প সংগ্রামপদ্ধতি নিয়ে চিন্তা শুরু করলেন। এই অবস্থায় আমার হঠাৎ জ্যোতি বসুর একটি কথা মনে পড়লো, চারু মজুমদার সম্পর্কে, বছর তিনেক আগে যা আমাকে বলেছিলেন, 'বহু বছর থেকে প্রমোদবাবুকে বলে আসছিলাম, এই কমরেডটি বদ্ধ উন্মাদ, যথাশীঘ্র দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিন। তখন শুনলেন না কথা, এখন বুঝুন ঠ্যালা'।

দিল্লিতে বসে কলকাতা ও পশ্চিম বাংলার হানাহানির প্রাত্যহিক বিবরণ পড়ি: সন্ধ্যার পর এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় যেতে গা ছমছম, এক অঞ্চলে পুলিশ খুন হয়েছে, সমস্ত ঘরবাড়ির জানালাদরজা বন্ধ, রাস্তায় যানবাহন স্তব্ধ, অন্য-এক অঞ্চলে হয়তো একদল বামপন্থী আর একদল বামপন্থীর উপর চড়াও হয়েছে, তাদের কাছে তা সশস্ত্র বিপ্লবের প্রথম পর্ব, অথবা সেই বিপ্লবযুদ্ধে হাতেখড়ির মহড়া। কলকারখানাতেও ঘেরাও-বন্‌ধ-হরতালের ফুলঝুরি, গ্রামাঞ্চলে জোতদারনিধনের পালা। একটি বিপ্লবী পত্রিকায় তখন এক লোমহর্ষক বিবরণ পড়েছিলাম, মনে করলে এখনও গা শিউরে ওঠে : 'বিপ্লবী কমরেডরা অন্য অস্ত্রের অভাবে কয়েকটি রাম দা নিয়ে এক জোতদারের বাড়ি ঘেরাও করে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেন। তারপর, যদিও সেই রামদাগুলি যথেষ্ট ভোঁতা ছিল, নিপুণতার সঙ্গে সেগুলিই ব্যবহার করে শ্রেণীশত্রু নিধনের পবিত্র কর্তব্য সম্পন্ন করা হয়।' যে জবাই হলো, আর যে জবাই করলো, উভয়েই আসলে নিরেট ছাপোষা, শ্রেণীদ্বন্দ্বের বোঝা তাদের উপর চাপানো শোচনীয় পণ্ডশ্রম।

জাতীয় পরিস্থিতির ভুল বিশ্লেষণ, কে আসল শত্রু কে নিরীহ পথচারী, তা বুঝতে করুণ অসফলতা, যেন নৈরাজ্যসৃষ্টির জন্যই নৈরাজ্য। এখন বুঝতে পারি বিশের-তিরিশের দশকের দেশপ্রেমান্ধ বোমা-পিস্তলের দুর্মর ঐতিহ্য, এবং সেই ঐতিহ্যসঞ্জাত প্রেরণা, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর বাদেও বাঙালি মধ্যবিত্ত ধমনী ও রক্তে সমান প্রবহমান ছিল। যে ছেলেগুলি মারা পড়লো, আর যারা মারলো, তাদের কারওরই আদর্শে ন্যূনতম ঘাটতি ছিল না, তাদের সাহস অতুলনীয়, তাদের কাছে সত্যিই জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। তারা ভুল কারণে একদা-বন্ধুদের মেরেছে, তারা নিজেরাও ভুলের শিকার হয়েছে, সেই সঙ্গে কুচক্রী পুলিশের শিকারও, এখন ইতিহাস অনেক দূর গড়িয়ে গেছে, মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত-হতদরিদ্র পরিবারের এসব ছেলেমেয়েদের আত্মত্যাগের স্মৃতি তবু এখনও মন ভারাক্রান্ত করে তোলে।

ভয়ংকর কাণ্ডকারখানার খবরাখবর দিল্লিতে প্রতিদিন পাই। প্রতি মাসে একবার-দু'বার কলকাতা আসাও হয়, চেনাজানা অনেক ছেলেমেয়ের সম্পর্কে দুঃসংবাদ পাই, কিন্তু সেই মুহূর্তে শুভ ও অশুভর মধ্যে তফাত খুঁজতে কেউ রাজি নন, শুভবুদ্ধি ও অশুভবুদ্ধির মধ্যেও পৃথগীকরণ সমান সুকঠিন।

এরই মধ্যে খবর পেলাম রবি সেনগুপ্তকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে নকশাল বিবেচনা করে। আমার সন্দেহ, কোনও প্রকাশ্য জায়গায় গিয়ে বৈপ্লবিক রাজা-উজির মারছিলেন, পুলিশ পাকড়েছে। কলকাতা থেকে উৎকণ্ঠার নানা বার্তা। প্রধান মন্ত্রীর দফতরে গিয়ে জানালাম, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর উপর হেনস্তা হয়েছে, এরকম পরিস্থিতিতে আমার পক্ষে কাজকর্মে মনঃসংযোগ করা মুশকিল। তার আগের সপ্তাহেই অনুযোগ জানিয়েছিলাম, মানিকতলা

হাউসিং এস্টেটে জঙ্গি পুলিশ ঢুকে বীভৎস অত্যাচার চালিয়েছে, এভাবে তো চলতে দেওয়া যায় না। যাই-ই হোক, হাকসারের দফতর থেকে কলকাতায় কড়া নির্দেশ পাঠানো হলো, অশোক মিত্রর শ্যালককে পুলিশ পরম অবিবেচনার সঙ্গে গ্রেপ্তার করেছে, তাঁকে অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়া হোক। আসলে সেই সপ্তাহে আমার স্ত্রীর একটি সম্পর্কিত ভাইও ধরা পড়েছিল, তা-ও বোধহয় কোনও সূত্রে হাকসার বা পৃথ্বীনাথ ধর জানতে পেরেছিলেন। রবি সেনগুপ্ত অচিরেই ছাড়া পেলেন, তাঁকে কেউ-কেউ অতঃপর রঙ্গ করে মাঝে-মধ্যে নেপথ্যে 'শালাবাবু' বলে ডাকতেন।

পরের ঘটনা অর্থনীতিবিদ পরেশ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে। তাঁকে উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাকড়ে এনে ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে ঢোকানো হয়েছিল। বিপ্লবের তাত্ত্বিক বিষয়াবলী ও কূটকৌশল নিয়ে লম্বা-লম্বা প্রবন্ধ লিখতে পরেশের জুড়ি নেই, বাকি সব-কিছু শাদামাটা। তিন মাসের জন্য দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্সে অতিথি অধ্যাপক হিশেবে একবার দেশের রাজধানীতে এসেছিলেন, আমাদের সঙ্গেই ছিলেন, তখনও তিনি বিবাহ করেননি, আমার স্ত্রীকে ব্যাখ্যা করে বলতেন, তাঁর যিনি সহধর্মিণী হবেন তাঁর এক হাতে রাইফেল থাকবে, অন্য হাতে একই সঙ্গে বোমা ও মাওয়ের-চিন্তাধারা সংবলিত রক্ত-পুস্তিকা। পরে তিনি সাবিত্রী আয়েঙ্গার নামে এক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপিকার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। সেই তামিল মহিলাকে নিজের অনুজার মতোই স্নেহ করতাম। তাঁদের উত্তর-বিবাহ জীবনের কাহিনী অত্যন্ত মর্মন্তুদ, পরে হয়তো বলার সুযোগ ঘটবে।

দিল্লিতে খবর পৌঁছুলো, পরেশ চট্টোপাধ্যায়কেও গ্রেফতার করা হয়েছে। কলকাতায় যিনি রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব, দিল্লি থেকে ফোন করে তাঁকে জানালাম, নিরীহ অধ্যাপক, তাঁকে জেলখানায় পুরে আপনাদের কোনও স্বার্থসিদ্ধি হবে না। তিনি একটু কায়দা করে জবাব দিলেন, 'খোঁজখবর নিয়েছি, ইনি ভীষণ ব্যক্তি, বিপ্লবের তত্ত্ব কষেন, সুতরাং মাফ করবেন আমাকে, আগুনে যখন ভদ্রলোক হাত দিয়েছেন, হাত পুড়বেই'। বাধ্য হয়ে অন্য কলকাঠি নাড়তে হলো, পরেশকেও ছাড়িয়ে আনা গেল।

তবে এরই মধ্যে দুঃসহ বিবেকপীড়ন। যেহেতু সরকারে গুরুত্বপূর্ণ পদে আছি, নিকটজনদের কিংবা বন্ধুদের কারাকক্ষ থেকে বের করে আনতে পারছি, কিন্তু আমার এই আচরণ কি যুগপৎ স্বার্থপরতা ও কাপুরুষতার চূড়ান্ত নিদর্শন নয়? হাজার-হাজার কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, প্রবীণ-বৃদ্ধ পুলিশের জালে ধরা পড়ছেন, প্রশাসনের খামখেয়ালে অত্যাচারিত হচ্ছেন, তাঁদের জন্য একটু মন খারাপ করা ছাড়া আর তো কিছুই করতে পারছি না। সরকারের নীতি-আচরণ-ব্যবহার বরদাস্ত করা সম্ভব হচ্ছে না, ইন্দিরা গান্ধির বামপন্থী ঝোঁক সম্বন্ধে যাবতীয় প্রত্যাশা মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেছে, পশ্চিম বঙ্গে যা চালু হয়েছে তা যথার্থই বর্গীর শাসন। তা হলে কেন এখনও দিল্লিতে ক্ষমতার অলিন্দে বেহায়ার মতো ঝুলে থাকা? কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যুক্ত আছি বলে একজন-দু'জনকে অত্যাচার-অনাচারের খপ্পর থেকে মুক্ত করতে পারছি, সুতরাং থাকা যাক, এর চেয়ে হাস্যকর অজুহাত কিছু হতে পারে না, এভাবে মনকে চোখ ঠারার চেয়ে অধিকতর নিন্দনীয় কিছু নেই। যদি নিজের কাছে বুজরুক বলে প্রমাণিত না হতে চাই, আমার উচিত অবিলম্বে সম্মানীয় সরকারি পদের মোহ ছুঁড়ে ফেলে কলকাতায় ফিরে যাওয়া।

মানসিক অবস্থা কিছুতে-কেন-যে-মন লাগে না, ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করবো কিনা অহরহ ভাবছি। হেমন্ত-বসু-হত্যার-জন্য-দায়ী এই প্রত্যক্ষ অভিযোগ ও দিল্লি

থেকে আরো অনেক কারসাজি সত্ত্বেও একাত্তর সালের নির্বাচনেও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিম বাংলার প্রধান দল হিশেবে আত্মপ্রকাশ করলো। কিন্তু নতুন দিল্লি থেকে নির্দেশ, কংগ্রেস ও তার সঙ্গে জোড়াতালি দেওয়া আর যে-ক'টি দলের সম্মিলিত গোষ্ঠী, তাদেরই মন্ত্রিসভা গঠন করতে অতএব রাজ্যপালের তরফ থেকে আহ্বান। মুখ্যমন্ত্রী এবারও অজয় মুখোপাধ্যায়, কিন্তু সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় দিল্লি থেকে প্রকৃতপক্ষে কর্তালি করছেন, এবার পুরোদমে বামপন্থী সংহারে পুলিশ, সৈন্যবাহিনী ও কংগ্রেস-আশ্রিত সমাজবিরোধী সম্প্রদায় এক সঙ্গে নেমে পড়ল।

একাত্তর সালের বসন্ত ঋতু, মনস্থ করে ফেলেছি কলকাতায় ফিরবো, এমন সময় পূর্ব পাকিস্তান উথাল-পাতাল, শেখ মুজিবুর রহমানের সত্তা-কাঁপানো ভাষণ, 'এবারকার যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ, এবারকার লড়াই স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লড়াই'। চব্বিশে-পঁচিশে মার্চ মধ্যরাত্রে তাঁকে কয়েদ করে করাচি না লাহোরে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো, যেই সন্ধ্যার অন্ধকার নামলো, গোটা পূর্ববঙ্গ জুড়ে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী সক্রিয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলি আক্রমণ করে শত-শত ছেলেদের নির্বিচারে গুলি করে হত্যা। আরও কয়েক হাজার ছেলেকে বন্দী করা হলো, অধ্যাপকনিবাসগুলি, একটির পর একটি, প্রচুর পরিকল্পনা-সহযোগে আক্রান্ত। অধ্যাপকদের সম্পর্কে প্রচণ্ড আক্রোশ, তাঁরাই নাকি পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণকে বিপথগামী করেছেন। যাঁরা-যাঁরা পালাতে পারলেন না, তাঁরা খুন হয়ে গেলেন। এই ধরনের হত্যালীলা পূর্ববঙ্গের প্রতিটি শহরেই অনুষ্ঠিত হলো। অনেকে আত্মগোপন করতে পারলেন, আবার অনেকে পারলেন না। যাঁরা সফল হলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ ত্রিপুরার সীমান্ত দিয়ে ভারতবর্ষে ঢুকলেন, নয়তো পাকিস্তানি সীমান্তরক্ষীদের প্রহরা এড়িয়ে বনগাঁ দিয়ে। গোটা প্রদেশ জুড়ে মানুষের মনে আতঙ্ক, হাহাকার, বিক্ষোভ, প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা।

দিল্লিতে খানিকটা-খানিকটা খবর পাচ্ছিলাম, তবে খবর ছাপিয়ে নানা গোছের গুজব। কলকাতায় খাঁটি খবর সামান্য একটু বেশি করে আসছিল, কিন্তু সেখানেও গুজবের ঘাটতি নেই। চেতনা জুড়ে অস্বস্তি, কী হচ্ছে সীমান্তের ওপারে, আমাদের কী করণীয় তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না, মানসিক দোলাচলের মধ্যে আছি।

তারিখটা বোধহয় দোসরা এপ্রিল, নর্থ ব্লকে অর্থমন্ত্রকে নিজের ঘরে বসে কাজকর্ম করছি, সকাল এগারোটা হবে, হঠাৎ একটি টেলিফোন এলো অমর্ত্যর কাছ থেকে। অমর্ত্য তখন দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিকসে অধ্যাপনা করছে, কিন্তু ফোন করছে লোদি এস্টেটে আমার বাড়ি থেকে, 'অশোকদা, আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে আমাদের দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছেন, জরুরি সমস্যা, দয়া করে আধ ঘণ্টার জন্য একটু আসবেন?' নতুন দিল্লির মসৃণ পথ, লোদি এস্টেটে পৌঁছুতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগে না, গিয়ে দেখি অমর্ত্যর সঙ্গে আনিসুর রহমান ও রেহমান সোভান, পূর্ব পাকিস্তানের দুই খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ। এঁদের সঙ্গে আমার পুরনো হৃদ্যতা। সে এক বিচিত্র, কৌতুককর কাহিনী। অর্থনীতিবিদদের আন্তর্জাতিক সংস্থা, ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশন অনেকদিন ধরে বলে আসছিলেন ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে এই যে প্রথম থেকেই অপ্রীতিকর সম্পর্ক, তাতে আর্থিক উন্নতি দু' দেশেই ব্যাহত হচ্ছে, উভয় দেশের অর্থনীতিবিদদের কর্তব্য এই ব্যাপারে অগ্রণী হওয়া, পরস্পরের সঙ্গে আলোচনায় বসা, আলোচনায় বসে অন্তত আর্থিক বিকাশের ক্ষেত্রে মূল সমস্যাদি সম্পর্কে কতগুলি ঐক্যমতের সূত্র খুঁজে বের করা, যা থেকে রাজনৈতিক

বোঝাপড়ারও একটি পটভূমিকা তৈরি হতে পারে। অনেক কথাবার্তার পর স্থির হলো ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশন উনসত্তর সালের মাঝামাঝি সময়ে সিংহলে—সিংহল তখনও শ্রীলঙ্কা হয়নি—শৈল শহর কান্ডিতে এক বৈঠকের ব্যবস্থা করবে, আলোচ্য বিষয় বলা হবে দক্ষিণ এশিয়ার আর্থিক বিকাশের সমস্যা। ভারত-পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদের পাশাপাশি জনা তিনেক সিংহলি বন্ধুদেরও আমন্ত্রণ জানানো হবে, তবে সেটা নামকাওয়াস্তে, আসলে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ভারতীয় ও পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদদের পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের সূত্র অন্বেষণ। যথা সময়ে রমণীয় কাণ্ডি শহরে আমরা হাজির দিন দশেকের বৈঠকে। এগারোজন ভারতীয়, এগারোজন পাকিস্তানি, কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আবিষ্কার করে চমৎকৃত হলাম, একাদশ ভারতীয়ের মধ্যে আমরা চারজন বাঙালি, আর ওই সংখ্যক পাকিস্তানিদের মধ্যে সাতজনই বঙ্গভাষী। সুতরাং প্রকৃতির নিয়মে ত্রি-ধারা তৈরি হয়ে গেল, সাতজন ভারতীয়, চারজন পাকিস্তানি, এগারোজন বাঙালি। সম্মেলনের আয়োজকদের মাথায় হাত। চুলোয় যাক ভারত-পাকিস্তান সমস্যা, চুলোয় যাক আগের থেকে ছক-করা সম্মেলনের বিষয়-তালিকা, আমরা এগারোজন বাঙালি আড্ডার স্রোতে ভেসে গেলাম, বিশেষ করে যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অনেকেরই বন্ধনের ঐতিহ্য। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বাঙালিদের মধ্যে রেহমান সোভান কী কারণে যেন ছিল না, তবে তাকে আমি কেমব্রিজে দেখেছি, ছাত্রাবস্থায় অমর্ত্যর সমসাময়িক, ঢাকার 'হলিডে' সাপ্তাহিকে ঘোর জঙ্গি রচনা লিখনরত। কাণ্ডিতে আনিসুর রহমানের উপস্থিতিতে আমি উৎফুল্ল। আনিসুর অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিশ্লেষণপ্রিয় ধনবিজ্ঞানী, স্বপ্নালু চোখ, নীতিনিষ্ঠ, স্বল্পবাক্, আশ্চর্য গানের গলা, রবীন্দ্রনাথের গানে সব সময়েই বিভোর, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি করেছে, ললিতা-সুখময় চক্রবর্তীদের কাছে ওর কথা অনেক শুনেছি। রেহমান-আনিস দু'জনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক। লোকপ্রবাদ যা-ই হোক, বাঙালি উদ্যমের তুলনা নেই, অচিরে কান্ডির সেই হোটেলে একটি হারমোনিয়ম-গোছের বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করতে সফল হলাম, তারপর এক মস্ত ঘরে সারাদিন জুড়ে রবীন্দ্রনাথের গানের ঢেউয়ের পরে ঢেউ। অন্য ভারতীয় বন্ধুরা চটে লাল, পাকিস্তানিরাও তথৈবচ, সম্মেলনের সংগঠকদের তো কথাই নেই।

দিল্লিতে আনিস ও রেহমানকে দেখে আমার খুশি ধরে না, কিন্তু ওরা তো মস্ত বিপর্যয় মাথায় করে এসেছে। সমস্ত বিবরণ শুনলাম। চব্বিশে-পঁচিশে মার্চ মধ্যরাত্রিতে মুজিবর রহমানকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করে দেওয়ার পর সারা দেশ জুড়ে অত্যাচার-হত্যালীলা। পঁচিশ তারিখের সূর্যাস্তমুহূর্ত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলি এবং অধ্যাপকনিবাসসমূহ পাকিস্তানি ফৌজ দ্বারা আক্রান্ত। এক হাজার-দেড় হাজার ছাত্র সেই রাত্রে খুন হয়ে যান, সেই সঙ্গে দশ-পনেরোজন অধ্যাপক, অনেকেই আমার চেনা। আনিস ও রেহমান কোনওক্রমে ঢাকা থেকে পালিয়ে কুমিল্লা জেলার সীমান্ত পেরিয়ে আগরতলা পৌঁছয়, পথে অনেক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, তাদের ছেঁড়াখোড়া মলিন জামাকাপড়, রেহমানের চশমার বাঁদিকের কাচ আড়াআড়ি ফাটা, কোথায় দেওয়াল টপকাতে গিয়ে নাকি আঘাত পেয়েছিল। আগরতলায় ভারতীয় নিরাপত্তারক্ষীদের সৌজন্যে তাঁরা কলকাতায় বিমান পাল্টে সোজা দিল্লি পৌঁছেছে পয়লা এপ্রিল গভীর রাতে। কলকাতায় ওদের তেমন জানাচেনা নেই, দিল্লিতে আমরা আছি, অথচ দিল্লিতে আমাদের ঠিকানা আদৌ জানা ছিল না। পালম বিমান বন্দরে পৌঁছে ভারতীয় রক্ষীবাহিনীকে অনুরোধ জানানোয় তাদের

বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া হয়। অমর্ত্যর বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়নি, সেখানে রাত্রিযাপন করেছে, পরদিন ভোরে ওদের নিয়ে অমর্ত্য আমার লোদি এস্টেটের বাড়িতে। প্রাথমিক কোলাকুলির পালা সাঙ্গ হলে মন্ত্রণা সভা বসলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে ওদের পরিচিত বেশ কয়েকজন আছেন, পূর্ব পাকিস্তানে পরিস্থিতি কোনদিকে গড়াবে তা নিয়ে কোনও নিশ্চয়তা নেই, সুতরাং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো ওরা আপাতত আমার বাড়িতে থাকবে, গা-ঢাকা দিয়ে, ছদ্ম নাম গ্রহণ করে। আমার স্ত্রী ওদের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন, ওদের জন্য বাড়ির একটি সামান্য-বিশ্লিষ্ট অংশ ছেড়ে দেওয়া হলো, তবে খাওয়া-দাওয়া আমাদের সঙ্গেই, অতি সাধারণ ভাত-ডাল। রেহমান আদতে কাশ্মীরি বংশোদ্ভূত, কিন্তু মানসিকতা ও সত্তার নিরিখে পুরোপুরি বাঙালি, যদিও বাংলা বলে আর্যাবর্তের ঢঙে। সে সর্বদা উৎসাহে টগবগ করছে, পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাযুদ্ধে সে নিজেকে ইতিমধ্যেই সেনাপতি ঠাউরেছে, সগর্বে তাঁর ঘোষণা, এখন থেকে সে মোহনলাল, পলাশি যুদ্ধের মোহনলাল! আনিসও নিজের নামের ইংরেজি আদ্যাক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে অশোক রায় নাম গ্রহণ করলো। পরে এ নিয়ে সামান্য বিপদ হয়েছিল। দিন দশেক বাদে প্যারিস থেকে লোকনাথের স্ত্রী, ফ্রাঁস, আমাদের সঙ্গে থাকতে এলো। একই টেবিলে বসে খানা খেতে হয়, মোহনলাল ও অশোক রায় হিশেবে ফ্রাঁসের কাছে তাঁরা পরিচিত হলো। কিন্তু গোল বাধালো ফ্রাঁস। বাংলা সাহিত্য-পুরাণ-সমাজ-ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর অদম্য আগ্রহ, কলকল করে বাংলা বলে। একদিন সন্ধ্যায় আমি ও আমার স্ত্রী বাড়ি নেই, আনিসকে সে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করতে শুরু করলো, 'আপনি তো রায়, কিন্তু ব্রাহ্মণ না কায়স্থ না বৈদ্য সন্তান?' আনিসের তোতলানো ছাড়া গতি ছিল না। ফ্রাঁস বুদ্ধিমতী মেয়ে, অনুমানে-অনুভবে কিছুটা আঁচ করেছিল, আমাদের কাছেও তা ভাঙেনি।

যেদিন ওরা আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিল, সন্ধ্যাবেলা রেহমান ও আনিসকে রেসকোর্স রোডে হাকসারের বাড়িতে নিয়ে গেলাম। এই ইতিহাস বাইরে কারও আদৌ জানা নেই : সেই সন্ধ্যা থেকেই বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে সহায়তায় ভারত সরকারের সংগোপন প্রত্যক্ষ ভূমিকার শুরু, আমাদের বন্ধুদ্বয়ের মারফত হাকসারের আওয়ামি লিগের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগে যার সূচনা।

একুশ

ঘটনাক্রম অতি দ্রুত এগিয়ে গেল। কয়েকদিনের মধ্যে আওয়ামি লিগের সবচেয়ে স্থিতধী নেতা, তাজউদ্দিন আহমেদ, দিল্লি পৌঁছে গেলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে আপাতত লিপ্ত না হয়েও ভারতবর্ষ কোন ধরনের কী পরিমাণ সাহায্য করতে পারে, তার বিশদ ফিরিস্তি তৈরি হলো। আমার দিল্লিস্থ সুহৃদ, অতি চমৎকার ব্যক্তি, বিশ্বনাথ সরকার, তখন সেনাবাহিনীর কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল, কিন্তু একেবারেই জঙ্গিপনা নেই, আমার লেখার ভক্ত, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করতেন, ঘন-ঘন আমার বাড়িতে তাঁর যাতায়াত, ভারত সরকার থেকে তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হলো পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতা যোদ্ধাদের সহায়তার স্বার্থে গুপ্তবাহিনী তৈরির উদ্যোগ সংগঠনের। তিনি কলকাতা চলে গেলেন, ততদিনে কাতারে-কাতারে বাঙালি সীমান্ত পেরিয়ে পালিয়ে এসেছেন, তাঁদের মধ্য থেকে বাছাই করে মুক্তিবাহিনী গঠিত হলো, তাঁদের অস্ত্রশিক্ষা প্রদান, তাঁরা অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হলেন, তাঁদের পালা করে বিভিন্ন জেলার সীমান্ত দিয়ে পূর্ববঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো, যুদ্ধ।

অচিরে আমাদের লোদি এস্টেটের বাড়ি পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত অর্থনীতিবিদ ও অন্য অতিথিদের ডেরা হয়ে উঠলো, বাড়ি ঘিরে রক্ষীবাহিনীর পরিখা, অপরিচিত কেউ ঢুকলেই সঙ্গে-সঙ্গে প্রধান মন্ত্রীর দফতরে খবর পৌঁছয়, মিনিট কয়েকের মধ্যে হাকসারের টেলিফোন, 'ওই অচেনা লোকটা কে? কেন তোমার বাড়িতে ঢুকেছে?' মুশকিল হতো রেহমান সোভানকে নিয়ে। সে চঞ্চল, সে বহির্মুখী, তার ক্লান্তিহীন উৎসাহ, পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানি বিভীষিকার কথা সে পৃথিবীকে জানাতে অদম্য উৎসাহী, তাই নিষেধ না-মেনে একে-ওকে-তাকে টেলিফোন করে বসতো। একদিন নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক সাংবাদিক, সামান্য দাড়ি ছিল, নামটা ভুলে গেছি, বাড়িতে ঢুকে পড়লো রেহমানের আমন্ত্রণে। হাকসার রেগে কাঁই, তখনও কৌশলগত কারণে সব-কিছু চেপে রাখতে ভারত সরকারের আগ্রহ।

মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টার কাজকর্ম মাথায় চড়লো, স্থগিত রইলো মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার বাসনা, পরের কয়েক মাস প্রায় পুরো সময়টাই পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা যুদ্ধের সমস্যায় নিয়োজিত। আনিস-রেহমান তো ছিলই, ক্রমে-ক্রমে পূর্ববঙ্গ থেকে আরও অনেকে এলো, যেমন ওয়াহিদুল হক, যে পরে কিছুদিনের জন্য বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী হয়েছিল, যেমন, খুব কম সময়ের জন্য হলেও, আজিজুর রহমান খান, যার বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ও স্বভাবের মাধুর্যের তুলনা হয় না। তার মতো চৌকস অর্থনীতিবিদ যে কোনও দেশেই খুঁজে পাওয়া ভার, তবে আমাকে আজ পর্যন্ত মুগ্ধ করে রেখেছে তার মুক্তোর মতো বাংলা হস্তাক্ষর, সেই সঙ্গে তার বাংলা গদ্যরচনায় সহজ স্বাচ্ছন্দ্য। ওদের মধ্যে সবচেয়ে নামী অর্থনীতিবিদ, নুরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক ক্লাস নিচে পড়তো, বাংলাদেশে স্বাধীনতালাভের পর রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা পরিষদের প্রধান হয়েছিল, বেশ কয়েক

দিন সে-ও লোদি এস্টেটের বাড়িতে তখন থেকে গেছে। এসেছিল হাসান ইমাম-ও, যে এখন ওয়াশিংটনে নির্লিপ্ত জীবনযাপন করছে, মস্ত প্রাসাদ বানিয়েছে মেরিল্যান্ড উপকণ্ঠে, প্রতি ঘরে বিদ্যুৎযন্ত্রের সাহায্যে প্রতিনিয়ত রবীন্দ্র সংগীতের মূর্ছনা। হাসান ইমামের ছদ্মনাম মনে পড়ে না, তবে ওয়াহিদুল হক পরিচিত হয়েছিল বাদল হালদার নামে, আর নুরুল ইসলামের বিকল্প নাম নির্মল সেন। একদিন নুরুল দিল্লি থেকে কাকে যেন কলকাতায় টেলিফোন করছিল, হঠাৎ, উদ্‌ভ্রান্ত, আমার দিকে তাকিয়ে কাতর প্রশ্ন : 'আমার নামটা কী যেন, নামটা কী যেন?'

হাকসার-পৃথ্বীনাথ ধরদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, এই অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের পশ্চিম ইওরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্বজ্জন মহলে অনেক চেনাজানা আছে, দিল্লিতে গা-ঢাকা দিয়ে থাকার বিশেষ সার্থকতা নেই, কয়েক সপ্তাহ বাদে-বাদে বেনামি ভারতীয় পাসপোর্ট ও যথেষ্ট বিদেশী মুদ্রা সঙ্গে দিয়ে তাদের সবাইকে পছন্দমতো দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, মার্কিন মুলুকে কিংবা নরওয়ে, সুইডেন, ইংল্যান্ড, জর্মানি, ফ্রান্স, নয়তো কানাডা-তে, সেখানে পৌঁছে তারা পাকিস্তানের অনাচারের বিরুদ্ধে, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সপক্ষে, প্রচার করবে, সমর্থন সংগ্রহ করবে, এখানে-ওখানে বক্তৃতা দেবে, প্রবন্ধ লিখবে। রেহমান সোভান, আনিসুর রহমান, নুরুল ইসলাম, এদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা হলো। ইওরোপের বিমানগুলি দিল্লি থেকে সাধারণত শেষ রাত্তিরে ছাড়ে। প্রায় নিয়ম দাঁড়িয়ে গেল, মধ্যনিশীথে ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর কেউ আসবেন, আমার অতিথিকে টিকিট ও পয়সা-কড়ি বুঝিয়ে দেবেন, নিঃশব্দে গাড়িতে তুলবেন, ইওরোপ বা আমেরিকাগামী বিমানে তুলে দেবেন, বিমান নির্বিঘ্নে ছেড়েছে জেনে বাড়ি ফিরে ঘুমোবেন।

কাহিনীর মধ্যেও কাহিনী। একটু পিছিয়ে যেতে হয়। কাণ্ডির সেই বৈঠকে পাকিস্তান থেকে যে সাত বাঙালি উপস্থিত ছিল, তাদের একজনের সম্মেলন শেষ হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে দিল্লির পাকিস্তানি দূতাবাসে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হয়ে আগমন। আমার বাড়িতে তার আনাগোনা শুরু হলো, তার সঙ্গীরূপে আরও দুই-একজন দূতাবাসে-কর্মরত বাঙালি। সবাই বাচ্চা ছেলে, অনেকেই অবিবাহিত, সুতরাং আমার স্ত্রী তাদের পরম স্নেহের সঙ্গে আপ্যায়ন করতেন, প্রায়ই খাওয়ার নেমন্তন্নও, গানের জলসা তো অফুরান! কিছুদিন বাদে, আমি তখনও কৃষিপণ্য মূল্য কমিশনের সভাপতি, দফতরে এক পুলিশকর্তা দেখা করতে এলেন। আমার খানিকটা বিস্ময়বোধ, ওঁরও একটু জড়োসড়ো অবস্থা, সরকারের সচিব পর্যায়ের একজনের কাছে এসেছেন, কথা প্রায় জড়িয়ে যাচ্ছে, ভদ্রলোক বাঙালি। এটা-ওটা ভণিতার পর হাত কচলে হঠাৎ তাঁর আকুল জিজ্ঞাসা, 'স্যার, যদি অপরাধ না নেন, একটা প্রশ্ন করতে পারি? পাকিস্তানি দূতাবাসের লোকজনেরা এত ঘন ঘন কেন আপনার বাড়িতে আসে?' হেসে ফেললাম। হেসে-হেসেই বললাম, 'এরা অনেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কেউ-কেউ আমার পরিচিতজনের পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র, রবীন্দ্রনাথের গান ভালবাসে, বাঙালি রান্না ভালবাসে। আপনাদের আপত্তির কারণ কী?' ভদ্রলোক মুখ নিচু করে চলে গেলেন, ওই অধ্যায়ের ওখানেই ইতি।

তবে যা বলছিলাম, কাহিনীর মধ্যেও কাহিনী। পূর্ববঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ, লোদি এস্টেটের বাড়ি পূর্ববঙ্গীয় অতিথিবৃন্দে বোঝাই। একদিন মধ্যরাতে ভারতীয় গোয়েন্দাবাহিনীর নিঃশব্দ গাড়ি আমার বাড়িতে এসে থামলো। ওয়াহিদুল হককে কানাডাগামী বিমানে তুলে দিতে পুলিশের

লোক এসেছেন, টিকিট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিকসুদ্ধু। হঠাৎ ওয়াহিদকে-বিমানে-পৌঁছুতে-আসা পুলিশ অফিসারটি দুই জুতো জুড়ে শব্দ করে আমাকে স্যালুট জানালেন, তাকিয়ে দেখি কৃষি ভবনে তদন্তে-আসা সেই অফিসারটি। মজা করে তাঁকে বললাম, 'এবার তো বুঝতে পারছেন, পাকিস্তানি দূতাবাসের লোকজনেরা কেন আমার বাড়ি আসা-যাওয়া করতো?'

সবচেয়ে বেশিদিন ছিল মঈদুল হাসান। এক সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীর জামাতা হওয়ার সুবাদে সে সম্ভবত পত্রিকাটির কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল, পরে অবশ্য তার বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যায়। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে, কথাবার্তায় আলাপ- আপ্যায়নে তুখোড়, দেশ-বিদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তাজউদ্দিনের খুব কাছের মানুষ। ততদিনে বনগাঁ সীমান্তে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার সংগঠিত হয়ে গেছে, রাষ্ট্রপতি পূর্ব পাকিস্তানে বন্দী শেখ মুজিব, উপ-রাষ্ট্রপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সমসাময়িক সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ। প্রায় প্রতি সপ্তাহে, দুর্গাপ্রসাদ (ডি. পি.) ধর ও হাকসারের সঙ্গে পরামর্শের উদ্দেশ্যে তাজউদ্দিনের দূত হিশেবে মঈদুলের দিল্লি আগমন; থাকতো আমাদের সঙ্গে, আনিস-রেহমানের মতোই আমাদের ঘরের লোক হয়ে গিয়েছিল। চমৎকার ছেলে, বিশেষ করে মহিলাদের আকর্ষণ করবার মতো অনেক গুণ ওর ছিল। আমাদের পক্ষে একটি দুঃখজনক ঘটনা, এই ডামাডোলের সময়ে সে আমার এক বন্ধুপুত্রের স্ত্রীর সঙ্গে মায়ায় জড়িয়ে পড়ে, পরে তাকে বিয়েও করে, বন্ধুপুত্রটির জীবন তার পরই ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়।

উনিশশো একাত্তর সাল প্রায় পুরোটাই এভাবে কাটলো: বাংলাদেশে স্বাধীনতাযুদ্ধ, কয়েক মাস গড়ালে ভারত বাহিনীর প্রকাশ্য সক্রিয় সমর্থন, ভারতীয় সেনাদের পূর্ববঙ্গ অভিযান, ইন্দিরা গান্ধির সমর বিজয়, তাঁর প্রখ্যাতি দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত, মার্কিনদের নাক ঘষে দিয়েছেন তিনি, তাঁর সাহস, প্রতিজ্ঞা ও কল্পনাশক্তিকে হেলা করার আর কোনও কারণই নেই। তবে, ইতিহাসে যে-কথা লেখা থাকবে না, পাকিস্তানকে পরাভূত করার জন্য প্রধান কৃতিত্ব আসলে বর্তায় পরমেশ্বরনারায়ণ হাকসারের অগাধ বুদ্ধি ও কলাকুশলতার উপর।

ষোলোই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পণ করলো, ইন্দিরা গান্ধির জয়যাত্রার রথ অপ্রতিরোধ্য। মাত্র কয়েক মাস আগে 'গরিবি হটাও'-এর উপর ভর করে লোকসভায় পর্যাপ্ত সংখ্যাধিক্য পেয়েছেন, তারও কিছুদিন আগে বুড়ো-বুড়ো কংগ্রেসিদের কুপোকাৎ করেছেন, বামপন্থী সাহায্যেরও তাঁর আর এখন থেকে দরকার নেই। পশ্চিম বাংলা থেকে কমিউনিস্টদের নিশ্চিহ্ন করতে এখন তিনি প্রচণ্ড আগ্রহী। হাকসারের মনোভাব ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে স্নেহাংশু আচার্য একবার দিল্লি এসেছিলেন, তখন ইন্দিরার দুই প্রধান পরামর্শদাতা দুর্গাপ্রসাদ ও পৃথ্বীনাথ ধরকে আমার বাড়িতে আহ্বান করে তাঁর সঙ্গে বৈঠকে বসিয়ে দিয়েছিলাম। স্নেহাংশুবাবু ধরদের যা বলেছিলেন তার সারাৎসার, 'আপনারা শত চেষ্টা করেও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে পশ্চিম বাংলা থেকে উৎখাত করতে পারবেন না, সুতরাং মহিলাকে নিবৃত্ত হতে বলুন।' পরে বোঝাই তো গেল এ সব কথায় কোনও কাজ হয়নি, ইন্দিরা গান্ধি সেই ঋতুতে পুরোপুরি সিদ্ধার্থশঙ্করময়। নকশালপন্থীদের মধ্যে ঢুকে গিয়ে পুলিশ কর্তৃক গুপ্তহত্যার বহর ক্রমশই বিকট আকার ধারণ করছিল। বোধহয় পূর্ব পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছিল, যে করেই হোক মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের আর পশ্চিম বাংলায় ক্ষমতায় ফিরতে দেওয়া হবে না; পুলিশবাহিনী, গুপ্তচরবাহিনী ও সমাজবিরোধীদের সম্মিলিত আক্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছিল, যার সামান্যতম খবরও বামপন্থীদের কাছে পৌঁছুচ্ছিল না।

বাংলাদেশ যুদ্ধ সমাপ্তির মাসখানেক বাদে বাহাত্তর সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি একটি ভারতীয় অর্থনৈতিক প্রতিনিধিদলের নেতা হিশেবে ঢাকা গেলাম। গেলাম অনেক বছর বাদে, পুরনো ঢাকাকে আর চেনা যায় না, শহরের চেহারা আমূল বদলে গেছে, বিমানবন্দরে স্নেহাকুল অভ্যর্থনা, আনিস এবং রেহমান দু'জনেই উপস্থিত, ওরা ইতিমধ্যে বাংলাদেশ পরিকল্পনা পরিষদের সদস্য মনোনীত হয়েছে, মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মান, নুরুল ইসলাম পরিষদ-প্রধান। তা ছাড়া অন্যান্য বন্ধুরা, নূরজাহান ও স্বদেশ বসু, আমার স্কুলসহচর ওয়াসেক হক, এনায়েত ও হোস্না। প্রথম সন্ধ্যাতেই আমার স্কুল শিক্ষক শামসুদ্দিন স্যারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে পুরানা পল্টনে পিতৃবন্ধু কাজী সাহেব, কাজী মোতাহার হোসেনকে শ্রদ্ধা জানাতে। গিয়ে দেখি কন্যা সন্‌জীদা বসে আছেন, কাজী সাহেব নেই। অসম্ভব দাবার নেশা, কোন্ দাবা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে যিনি মার্চ মাসে করাচি গিয়েছিলেন, সেখানে আটকা পড়ে গেছেন।

দাওয়াতের ছড়াছড়ি, অভ্যর্থনার অত্যাচারে হাঁসফাঁস অবস্থা। তবু বুঝতে পারছিলাম এরই মধ্যে হাওয়া একটু-একটু ঘুরতে শুরু করেছে, তার জন্য বাংলাদেশের কর্তাব্যক্তিদের সন্দেহবাতিক যতটা দায়ী, আমাদের এদিককার মানুষজনের, এমনকি পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের একটি অতুচ্ছনীয় অংশের, আদেখলেপনাও কম দায়ী নয়। বাঙালি হিন্দু জমিদারদের অনাচারহেতু চল্লিশের দশকে পূর্ববঙ্গে মুসলিম লিগের হু হু করে প্রভাব বিস্তার, সেদিনের ক্লেদাক্ত রক্তাক্ত দিনের স্মৃতি চট করে মুছে যাওয়ার নয়, তার উপর তুলনাগতভাবে ভারতবর্ষ এত শক্তিশালী দেশ, পাকিস্তানকে পর্যন্ত পর্যুদস্ত করেছে। ভারতের সাহায্য নিয়েই যদিও তাদের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, তা হলেও বাংলাদেশের জনগণের মনে ভয়, ভারতবর্ষ প্রায় জুজুবুড়ি। ওই সময়ে আমি ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি-তে ছদ্মনামে একটি প্রবন্ধ ছাপিয়েছিলাম, তার সারাংশ নিম্নরূপ : বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, ভারতবর্ষের সহায়তাতেই স্বাধীন হয়েছে। তবু এই নতুন দেশ সম্পর্কে ভারতবর্ষের উচিত অনুকম্পায়ী অন্যমনস্কতাযুক্ত নীতি গ্রহণ করা। ইতিহাস তো চট করে ভোলা যায় না, বাংলাদেশীদের স্বাধীন হতে সাহায্য করেছি বলেই তারা আমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়বে না; আমরা যদি এখন থেকে নিজেদের সন্তর্পণে সামান্য সরিয়ে রাখি, খুব বেশি ওদের ব্যাপারে নাক না-গলাই, তাতেই উভপাক্ষিক মঙ্গল।

কে শোনে কার কথা। ডি পি ধর সপ্তাহে-সপ্তাহে দিল্লি থেকে ঢাকা উড়ে যেতে লাগলেন, বিশ্বনাথ সরকার ভারতে ঢাকাস্থ দূতাবাসে সামরিক পরামর্শদাতা, ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর আর্থিক, সামরিক ও অন্যান্য বৈষয়িক সাহায্য বাংলাদেশ পেতে শুরু করলো, কিন্তু সাহায্যের পরিমাণ যত বাড়লো, বাংলাদেশীদের সন্দেহের পরিমাণও সমান তালে। বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় পূর্ববঙ্গ থেকে যাঁরা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলেন, তাঁদের অনেকের মানসিকতা এমন দাঁড়ালো যেন জমিদারি ফিরে পেয়েছেন, এবার মাঠভরা ধান, নদীতে ছাওয়া ইলিশের সন্ধানে শনৈশনৈ গেলেই হয়। উনিশশো বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর সালের মধ্যে ভারত-বিদ্বেষ হঠাৎ যে উদগ্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, এ সবই তার প্রধান কারণ। আমাকে জনৈক বন্ধু একটি কাহিনী শুনিয়েছিলেন। ঢাকা বিমানবন্দরে তিনি একটি রিকশা ভাড়া করেছেন, রিকশা চলতে শুরু করতেই চালক এক কাহন অভিযোগ পেশ করলো মধু-ঝরা বাঙাল ভাষায়, যার মর্মার্থ : 'বসুন, ইন্ডিয়া থেকে এসেছেন বুঝি? আপনাদের ইন্ডিয়ার কথা আর বলবার নয়, সৈন্য পাঠিয়েছেন, তারা লুটপাট করে, ঘরবাড়ি জবরদখল

করে, মহিলাদের ইজ্জত নষ্ট করে। কিছু ধান-চাল পাঠিয়েছেন, তাতে পোকা কিলবিল করছে, তার উপর কাঁকরে-পাথরে ঠাসা। সামান্য কিছু শাড়ি-কাপড় পাঠিয়েছেন, সব ছেঁড়াফাঁড়া-গর্তে-ভরা। আর যা-ও একটা কবি পাঠিয়েছেন, সেটাও বদ্ধ পাগল'। ভীষণ ব্যথা পেয়েছিলাম, নজরুলকে ইঙ্গিত করে এমন উচ্চারণে, কিন্তু এটাও আমাদের কর্মফল।

বুঝতে পারছিলাম, দিল্লির পালা এবার সত্যিই ফুরিয়েছে। আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন এক বহু-অভিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিকে ঢাকায় রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু কলকাঠি নাড়া হতো দিল্লি থেকে। যুদ্ধজয়ের পরের দিনই সংসদে অটলবিহারী বাজপেয়ী ইন্দিরা গান্ধিকে 'মা ভগবতী' রূপে সম্বোধন করেছেন, পল্লীতে-নগরে-বন্দরে অভিভূত প্রশস্তি গাথা। ওরকম বিবমিষা-উদ্রেককারী বিদূষণার পরিবেশে আমার মানসিক গঠন নিয়ে টিকে থাকা অসম্ভব।

প্রধান মন্ত্রী সম্মান ও ক্ষমতার মগডালে, সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে। লন্ডনের 'ইকনমিস্ট' পত্রিকায় খেতাব দেওয়া হলো, ভারতসম্রাজ্ঞী। দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারা রাতারাতি চুনোপুঁটি বনে গেলেন। একটি ঘটনার উল্লেখ করি। কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, কয়েকজন বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং একজন-দু'জন উঁচুমহলের আমলা নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল, ভূমিসংস্কারের পরবর্তী কর্মসূচী নিয়ে দিগনির্দেশের জন্য। সেটা বোধহয় বাহাত্তর সালের জানুয়ারি মাসের শেষ দিক। কৃষি ভবনের কমিটি কক্ষে বৈঠক বসলো। বৈঠক কয়েক মিনিট এগোতে না এগোতেই জনৈক মুখ্যমন্ত্রী আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন : 'ডক্টর সাব, এত আলোচনার কী দরকার? ম্যাডাম যা চাইছেন, তাই-ই আপনি লিখে দিন না কেন?' অন্ধ দেবীপূজার অন্য একটি উদাহরণ : রাজ্যসভা না লোকসভায় জনৈক সংসদ সদস্য প্রশ্ন করেছেন, 'এটা কি সত্য যে, গত বছরের তুলনায় এ বছর শিল্পসংঘাত অনেক কম ও অনেক কম শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে? এরকম হয়ে থাকলে তার কারণ কী?' মন্ত্রীর সহর্ষ উত্তর : 'হ্যাঁ, মহোদয়। গত বছরের তুলনায় এ বছর শিল্পসংঘাত যথেষ্ট হ্রাসপ্রাপ্ত ; এই আশ্চর্য জাদু ঘটেছে মহিমাময়ী প্রধান মন্ত্রীর অনির্বচনীয় নেতৃত্বের শুভ পরিণামে।'

শুধু অভাবে স্বভাব নষ্ট হয় না, ক্ষমতাধিক্যেও হয়। দিল্লি ঘিরে তোশামোদের হাওয়া, গা ঘিনঘিন করে। খানিক বাদে নিছক গল্প নয়, অনেক যথার্থ কাহিনীও শোনা যেতে লাগলো, ইন্দিরা গান্ধি এবং তাঁর রাজনৈতিক পার্শ্বসহচররা এবার দু'-হাতে টাকা তুলছেন, একে-ওকে-তাকে চোখ রাঙিয়ে ; ভক্তিতে না হলেও ভয়ে-ভয়ে অনেকে স্বেচ্ছায় উপুড় করে টাকা দিচ্ছেন। আর্থিক নীতি-রীতিতে সহসা পরিবর্তনের সূচনা। বড়ো শিল্পপতি, বড়ো ব্যবসায়ী, বড়ো জমিদার-জোতদাররের কাছ থেকে টাকা তুলছেন প্রধান মন্ত্রী, সুতরাং গরিবদের বিপক্ষে, বড়োলোকদের স্বার্থে, নীতি প্রয়োগ না-করে গত্যন্তর নেই।

পশ্চিম বাংলায় আরেক দফা নির্বাচন, পুলিশ দিয়ে, গুপ্তচর বাহিনী নিয়ে, গুণ্ডা লাগিয়ে নির্বাচন। এমনকি জ্যোতি বসুকেও জিততে দেওয়া হলো না। বুথ দখলের, জাল ভোট দেওয়ার, ভয় দেখিয়ে ভোটদাতাদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার বহু কাহিনী মুখে-মুখে রটিত। এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া, সোদপুরের বাসিন্দা, বিলাপ করে জানালেন কীভাবে ছুরি দেখিয়ে তাঁকে ভোটকেন্দ্র থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মনঃস্থির করে ফেললাম, বোধহয় গুড ফ্রাইডের ছুটি ছিল সেদিন, হাকসারের কাছে গিয়ে দিল্লি ত্যাগের সিদ্ধান্ত জানালাম। পরদিন পদত্যাগপত্র দাখিল করে মালপত্রসুদ্ধু কলকাতায় প্রত্যাবর্তন : আপাতত লম্বা ছুটিতে, মাসখানেক বাদে একদিনের জন্য ফিরে গিয়ে পুরোপুরি। হাকসার নিজে কিছু

বললেন না, নিকটস্থ-দূরস্থ অনেক পরিচিত ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা আমি এক কথায় মস্ত বড়ো কাজ ছেড়ে দিচ্ছি জেনে বাক্‌রহিত, অনেকে প্রচুর উপদেশ-পরামর্শ দিয়ে যথারীতি বিফল হলেন। একমাত্র অশোক রুদ্রের আনন্দ ধরে না ; সে আমার সিদ্ধান্ত পূর্ণ সমর্থন করে, যেন আমাকে শিরোপা দিতেই, দুপুরবেলা আমাদের সঙ্গে খেতে এলো।

অন্য পক্ষে, কলকাতায় ফিরে হরেকৃষ্ণ কোঙারের সঙ্গে যখন দেখা করতে গেলাম, এক প্রস্থ বকুনি খেলাম, 'মশাই, আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করে আপনি হুট করে কাজটা ছেড়ে এলেন! দিব্যি ছিলেন ওখানে, আপনার মারফৎ ভিতরের খবর পাচ্ছিলাম, আপনি কেঁচে গণ্ডুষ করে দিলেন।' ভর্ৎসনা মুখ বুঁজে মেনে নিতে হলো আমাকে।

বাইশ

কলকাতায় প্রত্যাবর্তন, তবে জীবিকার কথাও তো একটু ভাবতে হয়! মুশকিল আসান করে দিলেন ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদের কর্ণধার জয়ন্ত নায়ক। আমি পরিষদের প্রতিষ্ঠামুহূর্ত থেকে পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম, হয়তো চক্ষুলজ্জাবশত, হয়তো করুণাবশত, দিল্লি ছাড়ার প্রাক্‌মুহূর্তে পরিষদের জাতীয় ফেলোশিপ গ্রহণ করার জন্য নায়ক আমাকে অনুরোধ জানালেন। কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর দত্ত সুযোগ গ্রহণ করলাম, বন্ধু— ও রাজনৈতিক বৈরী— মোহিত সেনের মেজদা পোটলার সৌজন্যে কলকাতায় গৃহসমস্যারও একটি সন্তোষজনক নিরসন ঘটলো। পোটলা হায়দরাবাদস্থ্ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ অফ ইন্ডিয়ার অধ্যক্ষ, ওদের কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়া ছিল, আমি ব্যবহারের জন্য পেলাম এই শর্তে যে, বছরে বার কয়েক হায়দরাবাদে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে আসবো। হিতেন চৌধুরী তখন ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি-র স্বত্বাধিকারী সমীক্ষা ট্রাস্টের কার্যনির্বাহী অছি, সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন প্রতি সপ্তাহে যেন ই. পি. ডাবলিউ-র জন্য কলকাতা ডায়েরি লেখা শুরু করি, সেই সঙ্গে একটি-দু'টি সম্পাদকীয় মন্তব্য। সুতরাং কলকাতায় সময়ের ফাঁক বলে কিছু রইলো না। তবে কংগ্রেসি রাজত্ব, হাজার-হাজার রাজনৈতিক কর্মী বিনাবিচারে বন্দী, অনেকে পাড়া ছাড়া, ঘর ছাড়া, প্রতিপক্ষ কোনও রাজনৈতিক দলের সভা-মিছিল করার অধিকার নেই, সংবাদপত্রগুলি কেন্দ্র এবং রাজ্যের কংগ্রেসি সরকারের ধামা ধরে আছে, একমাত্র সমর সেন 'ফ্রন্টিয়া'র-এ তির্যক বিদ্রূপ ও কষাঘাতের ফুলঝুরি ছড়িয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু প্রধান প্রতিপক্ষ দল সম্পর্কেও তাঁর তো সমান অনীহা। একটি-দু'টি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা, যেমন হীরেন বসু-র 'দর্পণ', প্রতিবাদে মুখর, কিন্তু ক'জন আর সেগুলি পড়েন?

এই প্রথম ছাত্রাবস্থার পর রাজনীতির অঙ্গনে যথার্থ সক্রিয় হয়ে উঠলাম। জ্যোতিবাবু-প্রমোদবাবুদের সঙ্গে ঘন-ঘন দেখা হয়, আলাপ-আলোচনা-পরামর্শ, এঁরা দু'জনেই সেই সময় নিয়মিত ই পি ডব্লিউ পড়ছেন, আমার বদমেজাজি প্রবন্ধাদি পাঠ করে ভারি খুশি। সত্যব্রত সেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী তথা নেতা, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলি, পার্টির বিভিন্ন গণসংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত থাকি। জীবনযাপনকে কয়েকটি ভাগ করে নিতে কোনও অসুবিধা হতো না। সমাজবিজ্ঞান পরিষদের জন্য দেশের হালের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে তত্ত্বের মিশেল-দেওয়া বই লিখছি, সপ্তাহে একদিন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে পড়াতে যাচ্ছি, রাজনীতির তখন-খুব-অনিশ্চিত ভিড়ে জুটছি। সাহিত্যিকদের সামীপ্যেও আলাদা ঘোরাফেরা-মেলামেশা।

পুরনো অনেক রাজনৈতিক বন্ধু দূরে সরে গেছেন, নতুন সৌহার্দ্য ঘটছে। যাঁরা সরে গেছেন তাঁদের হয়তো পাল্টা অভিযোগ দায়ের করতে পারতেন, আমিই আস্তে-আস্তে গোঁড়া সংকীর্ণতাবাদীরূপে পরিণত হচ্ছি। তবে, এখনও বলবো, আমার দিক থেকে

রাগ-বিরাগের পর্যাপ্ত কারণ ছিল। একটি ঘটনার কথা বলি। একাত্তর সালের মার্চ মাস হয়তো বা, বিধানসভার নির্বাচনের তারিখ অত্যাসন্ন, আমি দিল্লিতে, কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে ভোট দিতে কলকাতায় এসেছি, একদিন দক্ষিণপন্থী এক কমিউনিস্ট কবির গৃহে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পার্টির বহুদিনের পুরনো একনিষ্ঠ সদস্য, আমাকে কাতর অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন: আমি ভারত সরকারে ভালো জায়গায় আছি, তাঁর ধারণা তাঁকে সাহায্য করতে পারবো। তিনি নিজে যদিও ঘোর দক্ষিণপন্থী, তাঁর ছেলে উগ্র নকশালপন্থী, কোথায় বোমা ছুঁড়ে দেওয়াল টপকে পালাতে গিয়ে পুলিশের কাছে ধরা পড়েছে। আপাতত আদালতের জিম্মায় আছে, তবে যে-কোনও দিন পুলিশ আর্জি জানালে বিচারক সম্ভবত তাঁকে পুলিশের হেফাজতে তুলে দেবেন ; পুলিশ এমন অকথ্য প্রহার শুরু করবে যে তাঁর ছেলে মারা যাবে, নয়তো চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে থাকবে। ভদ্রলোকের একান্ত প্রার্থনা, আমি যদি সরকারি মহলে প্রভাব খাটিয়ে তাঁর সন্তানকে আদালতের জিম্মায় রেখে দেওয়ার ব্যাপারটা পাকা করতে পারি। সাধুজনরা তো বলেন, মানুষের উপকার করতে হয়। রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব, যিনি তখন অতিরিক্ত মুখ্যসচিবও, তাঁকে গিয়ে বললাম, কাজ হলো, ছেলেটি আদালতের জিম্মাতেই রইলো। পিতা ভদ্রলোক আমাকে অনেক ধন্যবাদ জানালেন, তবে ভোটের দিন সন্ধ্যাবেলা সেই কবির বাড়িতে বসে আছি, ভদ্রলোকের শুভাগমন, একগাল হেসে বললেন : 'জানেন, এবার ভোটটা কংগ্রেসকেই দিলাম'। কবি হয়তো নিমিত্তমাত্র, তা হলেও তাঁর বাড়িতে আর কোনওদিন পা রাখিনি।

'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় নিয়মিত লিখি, অরুণকুমার সরকারের প্রাত্যহিক সান্নিধ্য পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করি, পুরনো বন্ধু সুরঞ্জন এখন খুব কাছাকাছি থাকেন, সমরবাবুর বাড়িতেও সপ্তাহে এক দিন-দু' দিন নিয়ম করে যাই, ওঁর দাদারা আসেন— অমলদা, গাবুদা, অমলদার মতো পরোপকারী মানুষ জীবনে দেখিনি— অনেক খোশগল্প হয়। সমরবাবু আমাকে লিখতে বলেন না, জানেন অনুরোধ করে কোনও লাভ হবে না, তবে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক অটুট। দিল্লিতে থাকার শেষ বছর ওঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা বীথি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে, আমরা খানিকটা দেখাশুনো করি, সমরবাবু ও সুলেখা সেন তা নিয়ে আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ, সুতরাং সুইনহো স্ট্রিটে আমার আড্ডা অব্যাহত, রাজনৈতিক মতপার্থক্য যাই-ই হোক না কেন। অবশ্য, যে কথা আগেও উল্লেখ করেছি, তরল-গরল গলাধঃকরণ করলে সমরবাবু অত্যন্ত কড়া-কড়া কথা বলতেন, আমার রাজনৈতিক ঝোঁক নিয়ে ব্যঙ্গ করে, আমার গায়ে লাগতো না।

ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটে : বই লেখার কাজ করছি, প্রতি সপ্তাহে ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি-র জন্য কলকাতা ডায়েরি ও সম্পাদকীয় মন্তব্য, বহু ধরনের কর্মসূচি, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতির বার্ষিক অধিবেশনের জন্য সভাপতির ভাষণ মকশো করছি, আতোয়ার রহমানকে 'চতুরঙ্গ'-এর সম্পাদনায় সাহায্য যোগাচ্ছি, নানা রাজনৈতিক-আধারাজনৈতিক সভাতে গিয়ে বক্তৃতা কপচাচ্ছি, এন্তার গ্রুপ থিয়েটারের নাটক দেখে বেড়াচ্ছি, অর্থনীতিবিদ্ ও অন্যান্য ব্যক্তিগত বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ।

কয়েক মাসের ব্যবধানে কিছুদিন ফের দিল্লিতে কাটিয়ে এলাম, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিয় অর্থনীতিবিদ বন্ধুদের আমন্ত্রণে। তাঁরা আমি যে-বইটি লিখছি, অধ্যায় ধরে-ধরে তার ব্যাখ্যাবিশ্লেষণসহ একপ্রস্থ বক্তৃতার ব্যবস্থা করলেন। আমার সীমিত চৌহদ্দির অর্থনীতিতে রাজনীতির মিশেল, ইতিহাস-দর্শনেরও, সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় ছেঁকে

ছেলেমেয়েরা শুনতে আসতো, ব্যাপক অংশগ্রহণ সব মহলের। খুব আনন্দে কেটেছিল ওই ঋতুটি, সেই সঙ্গে বিনোদনেও। মানসিকতার দিক থেকে নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুরা অধিকাংশই আমার কাছাকাছি, তাঁরা আদরে ঘিরে রেখেছিলেন। প্রভাত পট্টনায়ককে আগেই চিনতাম, এই পর্বে তাঁকে জানা হলো। ওর কথা পরে অবশ্যই আরো বলতে হবে: অর্থনীতিবিদ হিশেবে অবশ্যই সে সর্বোত্তম পর্যায়ভুক্ত, কিন্তু ভালোমানুষ হিশেবেও তার তুলনা নেই। সকাল-সন্ধ্যা বন্ধুরা সবাই এক সঙ্গে ঘুরতাম, একসঙ্গে খেতাম, আনন্দ করতাম, পরচর্চায় নিয়োজিত হতাম। অমিত ভাদুড়ী ও তাঁর স্ত্রী মধু ভাল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি-নিবাস থেকে ভালোবাসার জোর খাটিয়ে আমাকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে তুললো, পরম বিলাসে ছিলাম সেই ক'সপ্তাহ। ভোরবেলা প্রাতরাশের টেবিলে আমার আনাড়িত্ব আঁচ করে মধু ছোটো বোনের আদর ঢেলে আমার জন্য বরাদ্দ আধাসেদ্ধ ডিম ভেঙে দিত, স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করতাম। অসাধারণ প্রতিভাবতী অর্থনীতিবিদ, কৃষ্ণা ভরদ্বাজ, রাগসংগীতচর্চায়ও সমান পারদর্শিনী, ততদিনে সে-ও জওহরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। কৃষ্ণা ও তার কন্যা সুধার সান্নিধ্যও সমান আনন্দ দিয়েছে ওই এক মাস-দেড় মাস।

কলকাতাস্থ অনেক বন্ধুরই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমার দুস্তর তফাত, কিছুমাত্র ক্ষতি হতো না তাতে। রবিবার সকালে আমাদের ফ্ল্যাটে ভিড়-ঠাসা আড্ডা, কবি-সাহিত্যিক ছাড়াও অনেক গোত্রের মানুষ আসতেন। যাঁর কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে, তিনি কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রভাবে তিনি চল্লিশের একটি বিশেষ সময়ে কিছু 'সাম্যবাদী' কবিতা যদিও লিখেছেন, আসলে তিনি অত্যন্ত সরল মানুষ, রাজনীতির আপাতজটিলতায় পথ খুঁজে পাওয়া তাঁর সাধ্যের বাইরে। প্রথম জীবনে মস্ত সাহিত্যকীর্তির যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল, তা বিবিধ কারণে মিলিয়ে যায়। জীবনে ব্যর্থ ব্যক্তিদের প্রতি আমার বরাবরই কেন যেন অতল সহানুভূতি, হয়তো নিজেও ব্যর্থ বলে; কামাক্ষীপ্রসাদকে বরাবরই খুব কাছের মানুষ মনে হতো। ব্যর্থতার অভিশাপ তাঁর দিনযাপন ঘিরে, তা হলেও অমন সরল স্বচ্ছ মানুষের সঙ্গে পরিচয় হওয়া যে-কারও পক্ষেই সৌভাগ্যের। কামাক্ষীপ্রসাদও গত হয়েছেন দীর্ঘ পঁচিশ বছর হলো, কিন্তু তাঁর স্ত্রী একদা-অসামান্যা-সুন্দরী পরম সৌজন্যবতী রেখা ও মেয়ে রুনুর সঙ্গে যথাসম্ভব যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি।

সবচেয়ে বেশি আড্ডা দিতাম অবশ্য স্নেহাংশু আচার্যের ওখানে। স্নেহাংশুবাবুর গল্পের ভাণ্ড অফুরন্ত, হেসে পেটে খিল ধরে যেত, তা ছাড়া, পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তিনি এবং সুপ্রিয়া আচার্য সমপরিমাণ অতিথি-বৎসল। বাইরে হাসি-মস্করা যতই করুন না কেন, স্নেহাংশুবাবু রাজনৈতিক বিশ্বাসে অব্যয়-অচঞ্চল, জ্যোতি বসু ও প্রমোদ দাশগুপ্ত উভয়েরই মস্ত অবলম্বন। এই দুই নেতার মধ্যে প্রকৃতিগত অনেক তফাত ছিল, অথচ স্নেহাংশুবাবুর সঙ্গে দু'জনেরই সমান নৈকট্য। বেকার রোডের ওই বাড়িতে অবশ্য বিচিত্র চরিত্রের আরও নানা মানুষ আসতেন, বিচারক-ব্যারিস্টার থেকে শুরু করে ডাক্তার-কবিরাজ, কবিয়াল-সঙ্গীতজ্ঞ, খেলোয়াড়-ধড়িবাজ, কে না। একমাত্র যাঁদের দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট বলে সন্দেহ করতেন, স্নেহাংশুবাবু দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না তাঁদের।

অন্য দু'একজন বন্ধুর কথা বলি। আগে থেকেই ছুটকো-ছাটকা দাঁতের মেরামতির জন্য ওয়াটারলু স্ট্রিটে গোপাল বাঁড়ুয্যের কাছে যেতাম, এবার নতুন করে কলকাতায় স্থিত হয়ে ওঁর বাড়ি তথা চেম্বার অন্যতম প্রধান আড্ডাস্থল হয়ে উঠলো। বিখ্যাত দন্তচিকিৎসক বঙ্কিম

মুখোপাধ্যায় তাঁর দুই ভাগিনেয় গোপাল বাঁডুয্যে ও বারীন রায়কে তাঁর চেম্বার-এর উত্তরাধিকার অর্পণ করে যান। উভয় ভাগিনেয়ই মামার মতো উদারপ্রাণ, নম্র, পরোপকারী। তাঁর মাসতুতো দাদার প্রতি বারীনের প্রায় লক্ষ্মণসুলভ ভক্তি। শুধু দন্তসংক্রান্ত নয়, যখনই যে-সমস্যা নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হয়েছি, অভয় মিলেছে। গোপাল বাঁডুয্যে খাওয়াতে ভালবাসতেন, বেশ কয়েক বছর হলো তিনি প্রয়াত, বারীন কিন্তু তাঁর দাদার ঐতিহ্য সসম্মানে বজায় রেখেছেন। ওই চেম্বারের সঙ্গে অন্য যাঁরা কর্মরত, তাঁদের সবাইকেও আত্মার আত্মীয় বলে মনে হয়। তিন ওয়াটারলু স্ট্রিটের আড্ডার চরিত্র যথার্থই বহুমাত্রিক। তাঁদের বৃত্তির সূত্রেই গোপাল-বারীনদের সমাজের বহু অংশের, বহু স্তরের ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মিশতে হতো এবং হয়, বিভিন্ন কিসিমের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা যেমন আসেন, তেমনি আসেন অভিনেতা-অভিনেত্রী-কবি-সাহিত্যিক-ঔপন্যাসিক-গল্পলেখক-সম্পাদক-শিল্পী-ভাস্কর-সঙ্গীতজ্ঞ। এখানে উৎপল দত্ত-শোভা সেনকে দেখা যেত, দেখা যেত শম্ভু মিত্র-তৃপ্তি মিত্রকেও, এখন যেমন দেখা যায় শাঁওলিকে। আসতেন পাহাড়ী সান্যাল, চারুপ্রকাশ-জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়, অন্যদিকে সমর সেন পর্যন্ত। এক সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে, সম্ভবত ছেষট্টি সাল, চেম্বারের দুই এলায়িত চেয়ারে দুই অশোক মিত্রের দাঁতের পরিচর্যায় ব্যস্ত সর্বজনপ্রিয় গোপাল ডাক্তার ; এমন সমাপতন নিশ্চয়ই বিরল। ঘোর বিপ্লবী রবি সেনগুপ্ত, গোপাল বাঁডুয্যের হরিহরআত্মা বন্ধু, ওখানে নিয়মিত হাজির থাকতেন, থাকতেন অন্য বিপ্লবী সুহৃদ অমর রাহাও ; তবে তাঁদের রাজনীতি ওয়াটারলু স্ট্রিটের বাসিন্দারা, আমার ধারণা, তেমন ধর্তব্যের মধ্যে আনতেন না। মাসতুতো দাদা বিগত, বারীনের ওখানে অন্য সকলের সঙ্গে 'দেশ'-'আনন্দবাজার' পত্রিকার লোকজনও সদা উপস্থিত, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

কলকাতার তরুণতর অর্থনীতিবিদ বন্ধুরাও অবশ্য অহরহ সঙ্গ দিত : অমিয় বাগচী, নির্মল চন্দ্র, সঞ্জিত বসুদের বাইরেও অনেকে। তবে বহু ক্ষেত্রে তাঁদের প্রধান আগ্রহের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটাতে বেগ পেতে হতো আমাকে। তাঁরা অর্থনীতিতে বিভোর, অন্য পক্ষে আমার ওই বিষয়ে তেমন আগ্রহ কোনওকালেই ছিল না, প্রথাগত পরীক্ষায় বরাবর উৎরে গেছি, তা স্রেফ আকস্মিকতা। আমার বিবেচনায়, ইতিমধ্যেই যা বলেছি, যা রাজনীতি তা-ই অর্থনীতি, অর্থনীতিই রাজনীতি। অর্থনীতিবিদরা তাঁদের প্রজ্ঞার প্রভাব খাটিয়ে সমাজের অবস্থা পাল্টাতে পারেন না, রাজনীতিবিদরা তাঁদের কর্ম-অকর্ম দিয়ে পারেন। প্রতিটি অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তেরই আসলে একটি রাজনৈতিক দিক আছে। গণিতসমুদ্রে ভেসে অর্থশাস্ত্রে যে-তত্ত্ব-তথ্য-বিশ্লেষণের ঘোর এখন দৃশ্যমান, তা, আমি বল্‌বো, অপরিমেয় অপচয়। বড়োলোক দেশে সে ধরনের ব্যভিচার তা-ও বোঝা যায়, তাদের সামর্থ্য অঢেল; গরিব দেশের পক্ষে কিন্তু অনুরূপ চর্চা অমার্জনীয় বিলাসিতা। সমাজবিজ্ঞান পরিষদের জন্য আমি যে বই দাঁড় করালাম, তাতে অর্থনীতি-রাজনীতি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। এই প্রসঙ্গে পরে হয়তো আরও কিছু বলবার উৎসাহ জাগবে।

বাহাত্তর সালের মাঝামাঝি থেকে পঁচাত্তর সালের মধ্যমুহূর্ত পর্যন্ত দিন কাটছিল উচ্ছল ব্যস্ততায়, তবে ঈষৎ অনিশ্চয়তায়ও। জিনিশপত্রের দাম সমানে বাড়ছে, পশ্চিম বাংলাতেও শস্যের অনটন, গাঁয়ের মানুষ খরার মরশুমে অন্ন ও কর্মের সংস্থানে কলকাতায় জড়ো হচ্ছেন, হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন, দিনমজুরির হার বাড়ছে না, নামমাত্র একটি ভূমিসংস্কার আইন প্রায় দুই দশক আগে বিধানসভায় গৃহীত হয়েছিল, অথচ ভাগচাষী ও ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থার তেমন হেরফের হয়নি, যদিও কৃষকসভার সংগঠন ক্রমশ মজবুত হচ্ছে। শহরে

অশান্তি বাড়ছে, পল্লী অঞ্চলেও অস্থিতির লক্ষণ, জগদ্দল পাহাড়ের মতো কেন্দ্রে ও রাজ্যে কংগ্রেসি দুঃশাসন। ভারতবর্ষের অন্যত্রও একটু-একটু করে অসন্তোষের পর্দা চড়ছে।

গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পরিবেশ গোটা রাজ্যে নেই। যে-নাটকে অতি সামান্য বামপন্থী গন্ধ আছে, তা-ও ভারতবর্ষের প্রধান রাজনৈতিক দলের চেলাচামুণ্ডারা জোর করে বন্ধ করে দিচ্ছে। কে অস্বীকার করবেন, ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে পরের কয়েক বছর বাংলা নাটকের উজ্জ্বলতম ঋতু। শম্ভু মিত্র ক্রমশ প্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত সত্তায় নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেছেন, শেষ পর্যন্ত 'বহুরূপী' থেকেও তিনি বিশ্লিষ্ট। অথচ, এরই মধ্যে, গ্রীক পুরাণ বা অন্য-কোনও সূত্র থেকে উপাখ্যানের উপকরণ সংগ্রহ করে নাটকের পর নাটক মঞ্চস্থ করে গেছেন। এক বিচারে তিনি সমাজের বাইরে, অথচ নাটক মঞ্চস্থ করছেন তো সমাজকে নন্দিত করবার উদ্দেশ্যেই। কাছাকাছি সময়ে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'নান্দীকার' গোষ্ঠীর নির্ভরে পর-পর অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য নাট্যপ্রয়াস মঞ্চায়িত করেছেন। অবশ্য এখানেও প্রেরণার সূত্র এখান-ওখান থেকে খুবলে-আনা বিদেশী নাটকাদি। অজিতেশের নিজের ও কেয়া চক্রবর্তীর অভিনয়প্রতিভা কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজকে মুগ্ধ করেছে, বিশেষ করে ব্রেশটের 'তিন পয়সার পালা'-র প্রযোজনা-নৈপুণ্য বহু যুগ ধরে মনে রাখার মতো। বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ', বিভাস চক্রবর্তীদের 'চাক ভাঙা মধু' বার-বার করে দেখেছেন মধ্যবিত্ত বাঙালি দর্শক। এই লগ্নে মায়া ঘোষের অভিনয়কলাও সবাইকে আবিষ্ট করেছে ; আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারিণী এই মহিলা, কিন্তু কেমন যেন বরাবর আড়ালেই থেকে গেলেন।

উৎপল দত্তের মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আসা জড়িয়ে যে-ঝামেলার সৃষ্টি, তার জেরে লিটল থিয়েটার গ্রুপ উঠে গেল, কিন্তু উৎপলের উৎসাহে ভাঁটা নেই, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে পিপল্‌স্ লিট্‌ল থিয়েটারের উন্মেষ। এখন আর ঠিক মনে পড়ছে না, সম্ভবত আটষট্টি সালের শেষের দিক সেটা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবিদ্বেষ সমস্যা নিয়ে যে-নাটক তিনি মঞ্চস্থ করেছিলেন, 'মানুষের অধিকারে', তার প্রযোজনা-উৎকর্ষ অভাবনীয় ; আমার মতে অন্তত, এই নাটকে উৎপল দত্তের অভিনয়প্রতিভাও তাঁর আগের ও পরের সমস্ত প্রয়াসকে ছাপিয়ে গেছে। তবে উৎপল তো আরও এগিয়ে গেলেন। বাংলা নাটকের হৃদয়-মোচড়ানো ইতিকথা 'টিনের তলোয়ার' মস্ত আলোড়ন তুললো সত্তর-একাত্তর সালের ডামাডোলের মুহূর্তে। পশ্চিম বাংলায় জরুরি অবস্থার আগেই জরুরি পরিস্থিতি : সভাসমিতি নিষিদ্ধ, খবরের কাগজে বিপক্ষ দলের খবর নেই, দেশ জুড়ে মূল্যবৃদ্ধি ও আর্থিক দুর্গতি, অথচ কারও টুঁ শব্দটি করবার অধিকার নেই, কিন্তু উৎপল বেপরোয়া, পর পর একাধিক নাটকে স্বৈরাচারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-মুখর হলেন : 'ব্যারিকেড', 'এবার রাজার পালা', 'দুঃস্বপ্নের নগরী'। ততদিনে মিনার্ভা থিয়েটারের বন্ধকি শেষ হয়ে গেছে, বামপন্থীদের ব্যবসায়িক মঞ্চগুলি ব্যবহারের অধিকার নেই, পিপল্‌স্ লিট্‌ল থিয়েটরের নাটক ইতস্তত এখানে-ওখানে হল ভাড়া করে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, দর্শকের ভিড় উপচে পড়ছে। ওই একই লগ্নে অন্য এক নাট্যগোষ্ঠী, 'চেতনা', নতুন প্রকরণচাতুর্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে 'মারীচ সংবাদ' নামে একটি নাটক প্রযোজনা করে প্রচুর বাহবা কুড়িয়েছিল। হাওয়া যে গরম হচ্ছে, এত সমস্ত নাট্যপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। এই প্রসঙ্গে একটি-দু'টি চলচ্চিত্রেরও আমি হয়তো উল্লেখ করতে পারি, কিন্তু বিষয়ের চেয়ে বিভঙ্গ বাড়তি জায়গা নিয়ে নেওয়াতে সামাজিক অভিভাবসঞ্চারে সেগুলি তত সফল হতে পারেনি।

আরও যা বোঝা যাচ্ছিল, নকশালপন্থী আবেগে ভাঁটা এসেছে, তবে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে কেন্দ্র করে বামপন্থী প্রতিবাদ ঘনায়িত হচ্ছে। সভা নেই, উল্লেখ করার মতো পত্র-পত্রিকা নেই, তবু পার্টির ব্যূহরচনা নিঃশব্দে পরিণতির দিকে এগোচ্ছে, হয়তো গ্রামে ও শহরতলিতে একটু বেশি করে এগোচ্ছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তেও মানুষ, ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছেন, বিক্ষিপ্ত, অসংগঠিত প্রতিবাদের ছোটো-বড়ো ঢেউ, ইন্দিরা গান্ধি ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত ক্ষমতা নিজের দপ্তরে কুক্ষিগত করেছেন, রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্রীড়নক, মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যরাও তাই।

মূল্যমান অপ্রতিহত বাড়ছে, শ্রেণীগত উপার্জনবিন্যাস সব অঞ্চলেই দরিদ্রদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, পুলিশের সঙ্গে প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই জনসাধারণের নিত্য সংঘর্ষ। আর্থিক সমস্যার সূত্র ধরেই সংঘর্ষগুলি যে সব সময় ঘটছে তা নয় ; মানুষের মন যেখানে বিষিয়ে আছে, নানা ধরনের অভিযোগ অবলম্বন করে বিদ্রোহের লক্ষণ চারদিকে দেখা দিতে বাধ্য। প্রধান মন্ত্রীর অসহিষ্ণুতা প্রতি পদে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, তাঁর অহমিকাও সেই সঙ্গে। চুয়াত্তর সালে রেল ধর্মঘট নিয়ে সারা দেশে ব্যাপক অশান্তি, নির্মম হস্তে তা দমন করা হলো, হাজার-হাজার রেলকর্মচারী খারিজ হয়ে গেলেন, অত্যাচারিত-নিপীড়িত হলেন আরও বহু সহস্র, তাঁদের মধ্যে অনেককে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাবন্দী করে রাখা হলো, বরখাস্ত হলেন অনেকে, নানা জায়গায় রেলকর্মচারীদের বাসগৃহে পুলিশ মধ্যরাত্রিতে ঢুকে পরিবারের পর পরিবার উৎখাত করলো।

পশ্চিম বাংলায় অবশ্য এ ধরনের অত্যাচার-অনাচার সত্তর সালের শুরু থেকেই অব্যাহত, এবার অন্যান্য রাজ্যের সাধারণ মানুষ তার কিছুটা আঁচ পেতে শুরু করলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে দেশ জুড়ে এক ধরনের গণ অভ্যুত্থানের সূচনা, যা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বিস্ফোরণের চেহারা নিল। পঁচাত্তর সালের জুন মাসের গোড়ায় কলকাতায় বামপন্থী ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলির উদ্যোগে ব্রিগেড প্যারেড মাঠে সভার আয়োজন, জ্যোতিবাবু একদিন সকালে আমাদের বাসস্থানে এসে জানালেন, সব ক'টি দল ঐক্যমতে পৌঁছেছেন যে ওই সভায় উত্থাপিতব্য প্রস্তাবটি আমাকে দিয়ে পাঠ করানো হবে। বহু দিন বাদে কলকাতায় বিরাট মাপের হতচকিত-করা রাজনৈতিক সভা, সাধারণ মানুষের উৎসাহ উদ্বেল। আমি প্রস্তাব পড়লাম, জয়প্রকাশ নারায়ণ, জ্যোতিবাবু এবং, যতদূর মনে পড়ে, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করলেন, তারপর ব্রিগেড প্যারেড মাঠ পরিক্রমান্তে মস্ত মিছিলের সমারোহ।

দু'দিন বাদে বাড়িতে গোয়েন্দা শাখার পুলিশ চড়াও, বাড়ির বাইরেও চব্বিশ ঘণ্টা গুপ্তচর বহাল, যাদের সহজেই চেনা যেত। পুলিশের যে-লোকেরা দেখা করতে এলেন, বলতেই হবে অত্যন্ত ভদ্র : 'স্যার, আপনার কি আগামী এক-দুই সপ্তাহ অন্য কোথাও বক্তৃতা দেবার কথা আছে?' তাঁদের বলা হলো, কথা থাকলেও তার বিশদ বিবরণ দিতে আমি বাধ্য নই। তাঁরা একটু দমে গেলেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে একজন, আবিষ্কার করলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, তাঁদের চা খাইয়ে বিদায় করা গেল, কথাবার্তায় মনে হলো, তাঁদের হার্দ্যিক সহানুভূতি আমাদের দিকেই, কিন্তু গোলামি করতে হয়, কী করবেন। অনেক পরে, কংগ্রেস জমানায় তখন মুখ্যমন্ত্রীর যিনি আপ্ত সহায়ক ছিলেন, তাঁর লেখা বই থেকে জানতে পারি, আমাকে যে ওই সভায় প্রস্তাব-উত্থাপক হিশেবে স্থির করা হয়েছে, পুলিশ তা আগে থেকেই জানতো, বিরোধী দলগুলির গোপন বৈঠকে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ অতি তৎপর, সঙ্গে-সঙ্গে সরকারকে জানিয়েছেন।

তেইশ

যবনিকা অনেকদিন ধরেই কম্পমান ছিল, জুন মাসের মাঝামাঝি এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারকের রায়ে অনিশ্চয়তা ঘুচে গেল। নির্বাচনসংক্রান্ত অপরাধ, তার দায়ে ইন্দিরা গান্ধির, পাঁচ বছরের জন্যই বোধহয়, নির্বাচনে দাঁড়ানো নিষিদ্ধ, একাত্তর সালে লোকসভায় তাঁর নির্বাচনও সেই সঙ্গে খারিজ। হই হই ব্যাপার, সারা দেশে চাপা উত্তেজনা, হর্ষপ্রকাশও সঙ্গে-সঙ্গে ; এবার মহিলা সত্যিই খুব ফাঁপরে পড়েছেন, নিজেকে উদ্ধার করবেন কী করে, তা নিয়ে জল্পনা। এই প্রথম আমরা প্রধান মন্ত্রীর দ্বিতীয় পুত্র সম্পর্কে কানাঘুষো সর্বত্র ছড়িয়ে, সে নাকি প্রবীণ রাজনৈতিক নেতাদের সরিয়ে দিয়ে, বাঘা-বাঘা আমলাদের দূরে রেখে, জননীর প্রধান পরামর্শদাতা হিশেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তার হুকুমেই নাকি ভারতবর্ষ চলছে, সে হাতে গলা কাটে, তার অনেক সমাজবিরোধী সাঙ্গোপাঙ্গ, তারা দিল্লিতে দৌরাত্ম্য করে বেড়াচ্ছে, কারও টুঁ শব্দটি করবার সাহস নেই। অনেক গুজব শোনা যেতে লাগলো। ইন্দিরা গান্ধির দ্বিতীয় পুত্রের গোড়ায় নাকি নামকরণ হয়েছিল সঞ্জীব, রাজধানীতে কোনও গাড়ি চুরির ঘটনায় সে গ্রেফতার হয়, পুলিশের খাতায় নাম ওঠে, যথা নিয়মে তাঁকে ছাড়িয়ে আনা হয়, তবে দাগী আসামী হিশেবে একবার চিহ্নিত হলে নানা ধরনের অসুবিধা, সেজন্যই, জনশ্রুতি, তার নাম পাল্‌টে রাখা হয় সঞ্জয়। একটি ছোটো ঘটনার কথা হঠাৎ আমার মনে এলো। কী কারণে যেন একাত্তর সালের কোনও সময় ইন্দিরা গান্ধি আমাকে অর্থমন্ত্রক থেকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সাউথ ব্লকে তাঁর দফতরে পৌঁছে শুনি, ভিতরে হাকসার ও শিল্পোন্নয়ন সচিব ভৈরবদত্ত পাণ্ডে—বছর দশেক বাদে যিনি পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল হয়েছিলেন—প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনারত, আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। প্রায় এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, তা-ও ওঁরা বেরুচ্ছেন না, প্রধান মন্ত্রী তলব করেছেন, দেখা না-করে ফিরেও আসতে পারি না, অবশেষে তাঁরা দু'জনে যখন নিষ্ক্রান্ত হলেন, উভয়েরই মুখ থমথমে। ইন্দিরা গান্ধির ঘরে ঢুকে আবিষ্কার করি তিনিও উত্তেজিত। মুখ লাল, আমাকে দেখেই সুতীক্ষ্ণ প্রশ্ন, প্রশ্ন না বলে অভিযোগ বলাই ভালো : 'তুমি বলো তো, আমলারা আমার ছেলেকে এত অপছন্দ করে কেন?' রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসংগীত-পরিবেশিত উপদেশ ধারণ করে আমি অবশ্য নিরুত্তর রইলাম। পরে হাকসারের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ পেলাম, কিন্তু টুকরো-টুকরো, ঠিক বিবরণও নয়, আভাস : হাকসার কখনও ভুলক্রমেও ভিতরের কথা বাইরে বলতেন না, আমাদের মতো নিকটজনকেও না। যতটুকু শুনতে পেলাম, প্রধান মন্ত্রীনন্দনের শখ হয়েছে, সে সরকারি অর্থে, কিন্তু তার নিজের একচ্ছত্র ব্যবস্থাপনায়, উত্তর প্রদেশে একটি গাড়ি তৈরির কারখানা খুলবে, গাড়ির নামও ঠিক হয়ে গেছে—মারুতি—কিন্তু পাণ্ডে বিবেকবান রাজপুরুষ, তাতে সম্মত হননি, হাকসারের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রধান মন্ত্রীকে বলতে গিয়েছিলেন, আপাতত গাড়ি তৈরির প্রস্তাবটি মুলতুবি থাকুক, সঞ্জয়কে স্কুটার্স ইন্ডিয়া, দ্বিপদবিশিষ্ট চালকযন্ত্র তৈরি করার কারখানা, বরঞ্চ

উপঢৌকন দেওয়া হোক। ছেলেরা তাঁর চোখের মণি, প্রধান মন্ত্রী রাজপুরুষদের কথা শুনে ক্রোধে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য, অতি তীক্ষ্ণকণ্ঠে নাকি ভর্ৎসনা করেছিলেন হাকসার ও পাণ্ডেকে, শাণিত বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছিলেন।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বেরোবার পরমুহূর্ত থেকে সঞ্জয় গান্ধি তার মাতার একমাত্র উপদেষ্টা, সঙ্গে অবশ্য ফেউ ছিল প্রচুর। সঞ্জয় মাকে জানালো, এসব রায়-ফায় তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার, বিচারকরাও তাঁর জননীর শত্রুপক্ষের সঙ্গে ভিড়ে গেছে, পুলিশকর্তা ও সেনাধ্যক্ষদের তিনি ডাকুন, তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হোক যেন প্রতিপক্ষীয়দের, বিচারকমণ্ডলীসুদ্ধ, ঠান্ডাই-মাণ্ডাই সহযোগে জীবনের মতো স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। প্রধান মন্ত্রী তখনও অব্যবস্থিতচিত্ত, কংগ্রেস দলের মধ্যে অনেকেই তাঁকে, কিছুটা ভয়ে-ভয়ে, অন্য পরামর্শ দিচ্ছেন, বিচারব্যবস্থাকে হেলাফেলা করা অনুচিত ও অসাংবিধানিক হবে এমনধারা কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলে। তাঁর অন্যতম প্রধান পরামর্শদাতা, ডি পি ধর, অনেকদিন থেকে কর্কট রোগে ভুগছিলেন, এলাহাবাদ আদালতের রায় যেদিন বেরোলো, সেদিনই মারা গেলেন। পরমেশ্বর হাকসার ততদিনে যোজনা কমিশনে নির্বাসিত; তাঁর সঙ্গে, সম্ভ্রমের সঙ্গে হলেও, কেউ তর্ক জুড়বে তা ইন্দিরা গান্ধি একেবারেই পছন্দ করছিলেন না, তাঁর কাম্য নিষ্কলুষ জো-হুকুম রাজ, হাকসারকে তাই সরিয়ে দিয়েছিলেন, কিংবা ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র হাকসার হয়তো নিজে থেকেই সরে গিয়েছিলেন।

কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতাবৃন্দের পরামর্শে প্রধান মন্ত্রীজী হয়তো বা একটু থমকে গেলেন, এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে প্রার্থনা জ্ঞাপন করলেন, সর্বোচ্চ আদালতে তখন গ্রীষ্মাবকাশ শুরু হয়ে গেছে, অবকাশকালীন বিচারক কৃষ্ণ আয়ার, তাঁর ধরি মাছ-না ছুঁই পানি রায়, বিষয়টি পরে সুপ্রিম কোর্টে বিশদ আলোচনা হবে, আপাতত ইন্দিরা গান্ধি প্রধানমন্ত্রী থেকে যেতে পারবেন, কিন্তু লোকসভায় ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে না তাঁর।

এরকমই একটি সুযোগ খুঁজছিলেন ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর বিদূষকবৃন্দ। তাঁর ঘনিষ্ঠ আইনজ্ঞরা দিল্লিতে জড়ো হলেন, সংবিধানের জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ধারাগুলি চুলচেরা বিচার করা হলো, জরুরি অবস্থা ঘোষণার খসড়া প্রস্তুত, ২৫-২৬ জুন মধ্যরাতে বশংবদ রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ্ তাতে সই করলেন, মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকা হলো ভোররাতে। তবে তার আগেই গোটা দেশ জুড়ে ধরপাকড় শুরু হয়ে গেছে। সংবাদপত্রগুলির দফতর দিল্লির যে-অঞ্চলে, সেখানে বিদ্যুৎব্যবস্থা কেটে দেওয়া হলো, যাতে খোদ রাজধানীতেও কোনও খবর না বেরোয়, দেশের অন্যান্য জায়গাতেও খবর পৌঁছুলো অনেক দেরিতে। সারারাত ধরে দেশময় পঞ্চাশ হাজার কি এক লক্ষ, ঠিক কত, তথাকথিত ইন্দিরাবৈরীদের ধরপাকড় করা হয়েছিল, তখনও হিশেব ছিল না, এখনও নেই। শুধু এটা বলা চলে শত্রু বাছতে ইন্দিরা গান্ধির অনুচরবর্গ কোনও পক্ষপাত দেখাননি, এমনকি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একজন-দু'জন সদস্যকে পর্যন্ত জেলে পুরে দিয়েছিলেন।

মন্ত্রিসভার বৈঠক তো নেহাতই দায়সারা ব্যাপার, মন্ত্রীদের মধ্যে এমন একজনও ছিলেন না যিনি প্রধান মন্ত্রীর মুখের উপর কথা বলতে পারেন। আর ইংরেজদের শিখিয়ে দেওয়া নিয়মনিষ্ঠার ধারাবাহিকতা, আমলাতন্ত্র তো সর্ব ঋতুতেই সাষ্টাঙ্গপ্রণত।

প্রায় বিকৃত, কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে প্রভাতকালে জাতির উদ্দেশে ইন্দিরা গান্ধি ভাষণ দিলেন: ষড়যন্ত্র চলছিল, দেশের সংবিধান উৎখাত করার বন্দোবস্ত হচ্ছিল, তিনি ঠিক সময়ে ধরতে

পেরেছেন, এখন নিজেদের স্বার্থে জাতিকে অনুশাসন পর্বের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, বিভেদকারী রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম বন্ধ রাখতে হবে, যারা ষড়যন্ত্র করছিল তাদের ইতিমধ্যেই কিছু-কিছু গ্রেফতার করা হয়েছে, আগামী কয়েকদিনে আরও করা হবে, এই ভয়ংকর মুহূর্তে ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাক্‌স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদি দেশের স্বার্থের পক্ষে হানিকর, তাই সর্বক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে, সবাইকে শৃঙ্খলা ও নিয়ম মেনে চলতে হবে, নির্দিষ্ট সময়ে দফতরে আসতে হবে, দফতর থেকে যেতে হবে; যারা এসব অনুশাসন মানবে না, তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই।

পশ্চিম বাংলায় তেমন একটা হেরফের বোঝা গেল না, চার-পাঁচ বছর ধরে এখানে এমনিতেই জরুরি অবস্থা। হাজার-হাজার নারী-পুরুষ বিনা বিচারে কারাকক্ষে নিক্ষিপ্ত, সামলে-সুমলে মিটিং-মিছিল করতে হতো, অবশ্য মাঝে-মধ্যে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে মিছিল বের হয়েছে, কিন্তু সে-সব তেমন বড়ো আকারে না-হওয়াতে সরকারের পক্ষ থেকে দৃক্‌পাত করা হয়নি। প্রথম সারির রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এ সমস্ত মিছিলে যোগ দিতেন না, কৌশলগত কারণে প্রধান-প্রধান বামপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরাও অনুপস্থিত, যাঁরা নিয়মিত আসতেন তাঁদের মধ্যে থাকতেন, এখন যা মনে পড়ছে, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হীরেন বসু গোছের মানুষেরা, এবং কিছু-কিছু অধ্যাপক-শিক্ষকবৃন্দ।

তবে ছাব্বিশে জুন থেকে সব মিছিল বন্ধ, সব সভাও। বই বা যে-কোনও রচনা ছাপবার আগে সরকারি অনুমতি নিতে হবে। দৈনিক পত্রিকার প্রতিটি পৃষ্ঠার প্রতিটি কোলামে সেন্সরের অনুমতি ছাড়া কোনও-কিছু ছাপা চলবে না। লোকসভার সদস্য জ্যোতির্ময় বসুর উপর ইন্দিরা গান্ধির বিশেষ রাগ ছিল, তিনি প্রথম দফাতেই ধরা পড়লেন, ধরা পড়লেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বহু নেতা, একমাত্র কয়েকজন বাইরে, অন্যান্য বিরোধী দলেরও বেশ কয়েক হাজার নেতা-কর্মী গ্রেফতার হয়ে গেলেন। তিন দশক বাদে ভারতবর্ষের কারাগারগুলিতে আর একবার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল। তখনও দূরদর্শন তেমন চালু হয়নি, বেতার ভরসা, তাতে শুধু সরকারের গুণকীর্তন, খবরের কাগজগুলি সেন্সরের কবলে, সরকারবিরোধী যে-কোনও সংবাদ প্রকাশিত হবার উপায় নেই। এই পরিস্থিতিতে যা হওয়া স্বাভাবিক, তাই-ই ঘটতে শুরু করলো, মুখে-মুখে গুজব ছড়ালো, সে সব গুজব কী পরিমাণ সাচ্চা, কী পরিমাণ অলীক, নির্ণয় করার উপায় নেই। জরুরি অবস্থা ঘোষণার দু'-একদিনের মধ্যেই একটা খবর বেরোলো, এলাহাবাদ হাইকোর্টের জনৈক বিচারকের দুর্ঘটনায় মৃত্যু, নাম মুকুন্দবিহারী লাল বা ওরকম কিছু, তিনিই ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন কিনা, এবং সেই হেতু তাঁর অপমৃত্যু কিনা, তা নিয়ে জনে-জনে জটলা।

ঠ্যাটা স্বভাব, চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলতে কোনওদিন তেমন পিছুপা হইনি, যে-কারণে জীবনে অনেক ধাক্কা খেয়েছি, জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর দেশে কী ভয়ংকর পরিবেশ, বর্ণনা করে লন্ডনের ইকনমিস্ট পত্রিকায় রেজিস্ট্রি করে হাওয়াই ডাকে চিঠি পাঠালাম, কোনও রাখা-ঢাকা নেই, সরকারকে ঢালাও সমালোচনা-নিন্দা করে, শেষ পঙ্‌ক্তি জুড়ে দিলাম, 'এই চিঠি লেখার জন্যই হয়তো ইন্দিরার পুলিশ মাঝরাত্রিতে আমার দরজার ধাক্কা দেবে'। আমার চিঠিপত্র টাইপ করতেন যে-ভদ্রলোক, তিনি ভীষণ শঙ্কিত, 'আর একবার ভেবে দেখুন স্যার, চিঠিটা নিজের নামে পাঠাবেন কিনা'।

পরে আই সি এস থেকে অবসরপ্রাপ্ত এক ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন, ওই শেষ

পঙ্‌ক্তিটি লিখেছিলাম বলেই কয়েদ হওয়া থেকে বেঁচে গেলাম, তবে সেই চিঠি নানা দেশে বহু লোক পড়লেন, ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর কনিষ্ঠ তনয়ের প্রতি বিরূপ মনোভাব সর্বত্র গভীরতর, 'পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র' স্বৈরাচারের অন্ধকারে ডুবে গেল, তা নিয়ে বিবিধ আক্ষেপ।

দেশের প্রকৃত কর্তা এখন থেকে সঞ্জয় গান্ধি, সে শৃঙ্খলার পক্ষে, নিয়মানুবর্তিতার পক্ষে, বড়ো লোকদের পক্ষে, দরিদ্রদের বিপক্ষে। নতুন দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে যে-গরিব উদ্বাস্তুরা তাঁবু খাটিয়ে কিংবা কোনওক্রমে একচালা-দোচালা-চারচালা তুলে দিনযাপন করছিলেন, অকস্মাৎ ট্যাংক-বুলডোজার চালিয়ে সেগুলি ধূলিসাৎ করা হলো, আর-একবার-উদ্বাস্তু-হওয়া মানুষদের ট্রাকে চাপিয়ে রাজধানীর সীমানার বাইরে কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূরে ছেড়ে দেওয়া হলো, সেখানে পড়ে মরুক গে তারা। গরিবরা বেশি বাচ্চা বিয়োয়, তা নিয়েও সঞ্জয়ের ক্রোধ, ইতস্তত দরিদ্র নারী-পুরুষ, হাজার-লক্ষ, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধরে নিয়ে এসে হাসপাতালে পুরে নির্বীজকরণ করা হলো, এ সমস্ত কীর্তিকর্মে সঞ্জয়ের প্রধান সহচর যে-রাজপুরুষ, এখন তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির মস্ত নেতা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সার্বিক লক্ষ্য ছিল ত্রাস সৃষ্টি, তাতে প্রধান মন্ত্রীর কীচকবর্গ যথেষ্ট সফল হলো, তবে তারা ভুলে গিয়েছিল, ইন্দিরা গান্ধিও স্বয়ং ভুলে থেকেছেন, যে ত্রাস-ভয়-আতঙ্ক চিরকালীন অনুভূতি নয়, সে-সব ছাপিয়ে একটা সময়ে বিরক্তির উদ্রেক হয়, বিরক্তি রাগে পরিণত হয়, সেই রাগ আরও কিছুকাল গড়ালে অপ্রতিরোধ্য আবেগের রূপ নেয়, তারপরে সারা দেশের মানুষের সমন্বিত বিস্ফোরণ।

কত মানুষজনের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার হয়েছে সে-সময়, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলনায় অতি তুচ্ছ। ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি-তে কলকাতা ডায়েরি সপ্তাহে-সপ্তাহে লিখে আসর জমিয়েছিলাম, ক্রুদ্ধ সব লেখা, কিন্তু নিছক আবেগসর্বস্ব নয়, আবেগের সঙ্গে সম্ভবত কিছুটা যুক্তির সংশ্লেষ, যে-নকশালপন্থীরা প্রতি সপ্তাহে খুন বা নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে, তাদের নিয়ে লেখা, সি পি আই এম-সহ অন্যান্য বামপন্থীদের যে অত্যাচার করে শেষ করা যাবে না, সে সম্পর্কে লেখা, কখনও, স্বাদ বদলাবার জন্য, কাব্য-সাহিত্য নিয়ে রচনা অথবা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বা শিল্পী-ক্রীড়াবিদদের নিয়ে, সে-সব লেখায় ইতস্তত অর্থনীতি থাকতো, কৃষিসমস্যা নিয়ে হয়তো আলোচনা থাকতো, কিংবা শিল্পসংকট বিষয়ে বিস্তৃত হতাম মাঝে-মাঝে, তা ছাড়া সদ্য প্রয়াত কোনও বন্ধু-নায়ক-সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক-ধনবিজ্ঞানীদের নিয়েও আবিষ্ট প্রবন্ধ। কলকাতায় কোনওদিনই ই পি ডাব্লিউ-র তেমন কদর নেই, কলকাতা ডায়েরিরও নেই কিন্তু দিল্লি-মুম্বই-চেন্নাই-বাঙ্গালোর-তিরুবন্তপুরমে অনেক পাঠক-পাঠিকা লেখাটি নিয়মিত পড়তেন, বিদেশেও অনেকে। অনেক বন্ধু রঙ্গ করে বলতেন, ক্যালকাটা ডায়েরির কল্যাণে খুব শিগগিরই দেশ জুড়ে অশোকের ফ্যান ক্লাব তৈরি হবে। এটা অবশ্য আংশিক ঠিক: যাঁরা আমার বক্তব্য পছন্দ করতেন না, তাঁরাও কলকাতা ডায়েরি-র জন্য প্রতি সপ্তাহে প্রতীক্ষায় থাকতেন, রাজনৈতিক নেতা, ভারি-মাপের আমলা, শিল্পপতি প্রমুখ। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, জাতীয় যোজনা পরিষদের সদস্য ছিলেন, পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত হয়ে যান, গগনবিহারীলাল মেহতা, প্রথম জীবনে বহুকাল কলকাতায় কাটিয়েছেন, তাঁর তিন কন্যা গড় গড় করে বাংলা বলে, দু'জন বাঙালি বিয়েও করেছে, জ্যেষ্ঠ কন্যা নীলাঞ্জনা আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, একবার দেখা হতে গগনবিহারীলাল মজা করে বলেছিলেন : 'তুমি যা লেখো আমার

ঘোর অপছন্দ, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে তোমার লেখা না-পড়ে থাকতে পারি না'।

জরুরি অবস্থার প্রথম সপ্তাহে কলকাতা ডায়েরিতে কী লিখবো, কেমন করে লিখবো, ভেবে পাচ্ছিলাম না, হঠাৎ একটি মতলব মাথায় এসে গেল, সেই সপ্তাহের লেখাটি শুরু করলাম এভাবে, : আসুন, একটু মুখ বদলানো যাক, ধ্রুপদী সাহিত্য থেকে আমাদের অনেক কিছু জানবার-শেখবার আছে। এই গৌরচন্দ্রিকার পরেই লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি, অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদ, স্বৈরাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আগাপাশতলা কশাঘাত। মুম্বই শহরের সেন্সরের পক্ষে ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করা সোজা হলো না, মার্কসের গ্রন্থাবলী ক'জনের পড়া, তিনি ছাড়পত্র দিয়ে দিলেন, মহা উৎসাহে কৃষ্ণরাজ ই পি ডাব্লিউ-তে তা ছাপালো, পত্রিকা বেরিয়ে বিলি হতে দিন দুই সময় লাগলো, তারপর দিল্লি-মুম্বইয়ের কর্তাব্যক্তিদের চক্ষুস্থির, তাঁরা তো ভয়ে কাঠ, সঞ্জয় গান্ধির লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না, তবে ইন্দিরা গান্ধি তো পত্রিকাটি দেখেন, শচীন চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, সুতরাং পরের সপ্তাহ থেকে কলকাতা ডায়েরির প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল, ইন্দিরা গান্ধি আমাকে নীরব করে দিলেন।

আরও মজা ঘটলো কয়েক সপ্তাহ বাদে। আমার বিশিষ্ট বন্ধু কৃষিবিশেষজ্ঞ ওল্‌ফ্‌ লাডিজেনস্কির প্রয়াণের খবর পেলাম। লাডিজেনস্কির জন্ম রাশিয়াতে, কোন সালে কী অবস্থায় তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছেছিলেন, সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন, ইত্যাদি আমার জানা নেই, কিন্তু দরিদ্র জনগণের প্রতি সমমর্মিতায় তাঁর জুড়ি দেখিনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জেনারেল ম্যাকার্থার লাডিজেনস্কিকে জাপানে নিয়ে গিয়েছিলেন, যুদ্ধোত্তর জাপানে যে আমূল ভূমিসংস্কার, যার ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে ওই দেশের ক্ষিপ্রতম গতিতে আর্থিক উন্নয়ন, তা সম্পূর্ণ লাডিজেনস্কির প্রতিভা-পরামর্শ-প্রসূত। মার্কিন সরকার তাঁকে ইরানেও পাঠিয়েছিলেন, ওদেশেও অনুরূপ ভূমিসংস্কারের ব্যবস্থার জন্য। শাহ্‌ পেহলভি ভদ্র ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু লাডিজেনস্কির একটি কথাও শোনেননি ; যদি শুনতেন, হয়তো তাঁকে সিংহাসনচ্যুত হতে হতো না। ষাটের-সত্তরের দশকে লাডিজেনস্কি বিশ্ব ব্যাঙ্কের তরফ থেকে কিছুদিন ভারতবর্ষে কাটিয়ে গিয়েছিলেন, বিশ্ব ব্যাঙ্কের মতামতের সঙ্গে তাঁর আদৌ সাযুজ্য ছিল না, তবে তাঁর অনেক গুণগ্রাহী ব্যাঙ্কের আশেপাশে ছিলেন, আর ভারতবর্ষের ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর নিজের আগ্রহও ছিল, তাই নিছক পরামর্শদাতা হিশেবে ওঁদের আতিথ্যে এ দেশে এসেছিলেন। গোটা দেশ চষে বেড়িয়েছেন, ভারতবর্ষের অনগ্রসরতার প্রধান কারণ যে ভূমিসংস্কারের অনুপস্থিতি তা নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। বিশেষত বিহারের বাতাইদার—আমাদের পরিভাষায় ভাগচাষী—সম্প্রদায়ের উপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার জমিদারশ্রেণী যুগ-যুগ ধরে করে গেছেন, সে-সম্পর্কে একটি অবিস্মরণীয় প্রতিবেদন লাডিজেনস্কি রচনা করেছিলেন, যা এখনও মাঝে-মাঝে পেড়ে পড়ি।

জরুরি অবস্থা ঘোষণার মাসখানেক বাদে লাডিজেনস্কির মৃত্যুসংবাদ পেলাম, অনেক বয়স হয়েছিল, সুতরাং তাঁর প্রয়াণের খবরে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কৃষ্ণরাজের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হলো, ই পি ডাব্লিউ-র জন্য লাডিজেনস্কির উপর একটি ছোটো লেখা লিখে পাঠালাম। এখানেই মুশকিল ঘটলো। পশ্চিম বঙ্গের কৃষিসমস্যা ও কৃষি আন্দোলন নিয়ে লাডিজেনস্কি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, যতবার আমি দিল্লি থেকে কলকাতায় এসেছি, আমাকে বলতেন খোঁজ নিতে মুজফ্‌ফর আহমদ অথবা হরেকৃষ্ণ কোঙারের কোনও নতুন

বই বেরিয়েছে কিনা, বেরিয়ে থাকলে আমি যেন নিয়ে আসি, বাংলায় লেখা হলেও ক্ষতি নেই, তিনি কাউকে দিয়ে সারাংশ উদ্ধার করে নেবেন। ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি-র জন্য যে-স্মরণিকা লিখলাম, তার এক জায়গায় মন্তব্য জুড়ে দিলাম, 'হি ওয়াজ নো আইডিয়োলগ, বাট হি ওয়াজ নট অ্যাফ্রেড অফ আইডিয়োলজ আইদার'। এটাও উল্লেখ করলাম যে কলকাতা থেকে তিনি আমাকে দিয়ে প্রায়ই মুজফ্‌ফর আহমদ ও হরেকৃষ্ণ কোঙারের লেখা বইপত্তর আনিয়ে নিতেন। মুম্বাইয়ের সেন্সরের কাছ থেকে লেখাটি ফিরে এলে দেখা গেল 'হি ওয়াজ নো আইডিয়োলগ, বাট হি ওয়াজ নট...' এর পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলি নির্মমভাবে কাঁচি চালিয়ে ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরে লাডিজেনস্কির সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশ করা হয়। সম্পাদক তাঁর মুখবন্ধে আমার লেখাটির যতটুকু ছাপা হয়েছিল পুরোপুরি তুলে দিয়েছেন, সেই গ্রন্থ খুলে যে-কেউ এখন আবিষ্কার করতে পারেন আমার রচনা, 'হি ওয়াজ নো আইডিয়োলগ, বাট হি ওয়াজ নট...' মন্তব্যের কপালে কী জুটেছিল। কী আর করা যাবে, ইন্দিরা গান্ধি স্বাধীন চিন্তা-ভাবনাকে যে অপছন্দ করতেন। জরুরি অবস্থায় রবীন্দ্রনাথকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু শান্তিনিকেতনে স্থিত তাঁর পদলেহনকারী সম্প্রদায়ের তাতে কোনও ভাববিকার হয়নি।

অমর্ত্যের উৎসাহে ও-বছরের এপ্রিল মাসে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিঠি পেয়েছিলাম ওখানকার ইন্সটিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে এক বছরের জন্য অতিথি অধ্যাপক হয়ে যেতে রাজি আছি কি না, আমন্ত্রণ গ্রহণও করেছিলাম। ইতিমধ্যে ইন্দিরা গান্ধির জরুরি কাণ্ড, আমি যে-ধরনের লেখালেখি করি দেশে তার সুযোগ বন্ধ। জ্যোতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি জানালেন আমি ও সময়ে বিলেত গেলে তাঁদের সুবিধাই হবে, দেশে আমি বক্তৃতা দিতে পারবো না, লিখতেও পারবো না, বরঞ্চ বিলেতে-ইওরোপে জরুরি অবস্থার অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে-আন্দোলন, তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারবো। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে বিলেত চলে গেলাম, সস্ত্রীক। জ্যোতিবাবু পার্টি-সংক্রান্ত কিছু নথিপত্র সঙ্গে দিলেন।

সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় খোদ ব্রাইটন শহরের একটু উপকণ্ঠে, আমরা বাড়ি খুঁজে নিলাম আরও একটু দূরে, রিংমার নামে এক মনোমোহিনী গ্রামে। বাড়িওলা বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষক, এক বছরের জন্য অস্ট্রেলিয়া না নিউজিল্যান্ড কোথায় যাচ্ছেন পড়াতে, গাড়ি-সহ বাড়ি পেলাম, পরিবহন সমস্যাও মিটলো। সাসেক্স অঞ্চল নিসর্গ সৌন্দর্যে ঠাসা, সমুদ্র আছড়ে পড়ছে গোটা উপকূল জুড়ে, সবুজে-সমাচ্ছন্ন নিচু মালভূমির পর মালভূমির ঢল, লন্ডনের হতকুচ্ছিত গোমড়ামুখ বৃষ্টি-কুয়াশাও নেই, বরফ তিন কালে একবার পড়ে। ওখানে থাকা এক হিশেবে তাই ভারি আরামদায়ক ছিল। পুরনো বন্ধু রণজিৎ গুহকে নতুন করে পেলাম, অনুজপ্রতিম প্রমিত চৌধুরীও ওখানে; তা ছাড়া ওই একবছর অঢেল সাহায্য করেছিল অতি-প্রতিভাবান তরুণ অর্থনীতিবিদ দীপক নায়ার ও তার স্ত্রী রোহিণী। দীপক এখন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, তাদের দু'জনের সৌজন্য এখনো বহমান। সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর বিদেশী ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের সমাগম, শৌখিন ইওরোপীয় বামপন্থার একটা আমেজ অনেকের মধ্যে, প্রচুর নতুন পরিচয় হলো। তা হলেও গোটা পরিবেশ আমাকে স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে অস্বাচ্ছন্দ্যই বেশি দিয়েছে। ইংরেজ জাতির মধ্যে ক্রমশ কূপমণ্ডূকতা অনুপ্রবেশ করেছে, এমনকি মস্ত উদারচরিত নারী-পুরুষরা পর্যন্ত তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহ্যের কথা ভুলতে যথেষ্ট সময় নিচ্ছেন। সহকর্মীদের মধ্যে দিল্লি ও

ব্যাংককে আমার পূর্ব-পরিচিত, একদা-জর্মান, বর্তমানে বৃটিশ পাসপোর্ট-নেওয়া প্রবীণ অর্থনীতিবিদ হান্স সিঙ্গারের সাহচর্য অবশ্য অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছিল। কেমব্রিজ-অক্সফোর্ড-লন্ডন-গ্লাসগো-ব্রিস্টল-নরউইচ ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েও মুখ বদলানোর খানিক সুযোগ পেয়েছিলাম।

তবে বেশির ভাগ সময়ই ওই ক'টা মাস কেটেছে রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে। ভালো লেগেছিল উত্তর ইংল্যান্ডে ইয়র্কশায়ার-ল্যাঙ্কশায়ার অঞ্চলে ভারতীয় শ্রমজীবী মানুষদের কাছে গিয়ে। শাদামাটা সরল মানুষ, বামপন্থী, আদর করে তাঁদের ঘরে তুলেছেন, শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুরাগ মিশিয়ে, সেরকম অতিথিরূপে রাত্রিবাসের একটি-দু'টি স্মৃতি এখনও মনের পটে উজ্জ্বল। এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রবাসী ভারতীয়দের, এবং ইংরেজ জনসাধারণকে, সম্যক বোঝাতে। আমাদের দেশের সভা-সমিতির তুলনায় ওখানে মিটিংয়ের আকার ক্ষুদ্র, সেই কারণে, ঘন-ঘন, অনেক জায়গায় বলতে হতো, অপেক্ষাকৃত ছোটো-ছোটো জমায়েতে, এখানে-ওখানে গিয়ে।

বিশেষ চমৎকৃত হয়েছিলাম লন্ডনে ক্যাক্সটন হলে বক্তৃতা দিয়ে। এখানেই সেই উনিশশো চল্লিশ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিশোধ হিশেবে উধম সিংহ পঞ্জাবের তৎকালীন গর্ভনর ও'ডায়ারকে হত্যা করেছিলেন। আরও একটি কারণে ক্যাক্সটন হলের সভার কথা এখনও মনে আছে। সভা-অন্তে এক বন্ধুর বাড়িতে গেছি, খানিক বাদে পাশের ঘর থেকে এক মহিলা বেরিয়ে এলেন, বার্ধক্যের ছাপ সারা শরীরে, মনের দিক থেকেও হয়তো মহিলা ক্লান্ত, কেমন নিঃঝুম হয়ে বসে রইলেন। শিহরিত হলাম জেনে ইনি কারমেল ব্রিঙ্কম্যান, যাঁকে সেই আটচল্লিশ সালে ঢাকা ও কলকাতায় বেশ কয়েকদিন ধরে দেখেছিলাম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলেন উপলক্ষে। কারমেলের ইংল্যান্ড থেকে ইন্দোনেশিয়ায় গমন পঞ্চাশের দশকের গোড়ায়, সেখানে এক ইন্দোনেশিয় কমরেডের পাণিগ্রহণ, পঁয়ষট্টি সালে দুজনেই মার্কিন-নির্দেশিত ফৌজি অভ্যুত্থানের শিকার, দশ বছর কারান্তরালে কাটিয়ে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত কারমেল, পুরনো পরিচিতদের সঙ্গে দেখা করতে ইংল্যান্ডে কয়েক দিনের জন্য, অচিরে ইন্দোনেশিয়ায় ফিরে যাবেন। তার স্বামী তখনও ছাড়া পাননি, দু'জনকেই জেলখানায় প্রচুর অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে কিন্তু মার্কসীয় প্রজ্ঞা থেকে অপসরণ অকল্পনীয়। কারমেল জানালো, এখন ইন্দোনেশিয়াই তার স্বদেশ, সেখানে অবস্থান করে বে-আইনি কমিউনিস্ট পার্টির জন্য কাজ করে যাবে, যতদিন না ফের পুলিশ ও জঙ্গিবাহিনীর নজরে পড়ে।

যা দেশে থাকতে আদৌ অভ্যাস ছিল না, বিলেতে সংবাদপত্রের লোকজনদের ডেকে সাক্ষাৎকার দিতে শুরু করলাম। দেশের ভয়ংকর অবস্থা পৃথিবীর মানুষকে জানাতে হবে, তাই মিটিং-মিছিল যথেষ্ট নয়, যদিও হাইড পার্ক থেকে মিছিল করে ট্রাফালগার স্কয়্যার পর্যন্ত গিয়েছি স্বৈরাচারী ইন্দিরা গান্ধির বিনাশ কামনা করে। এই সংবাদপত্র-ওই সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকারের বন্যা বইয়ে দিলাম, লোকমত সঞ্চারের ক্ষেত্রে কিছুটা সাহায্য হয়তো হয়েছিল তাতে। লন্ডনে তখন আমাদের হাই কমিশনার ইন্দিরা গান্ধির জ্ঞাতি ব্রজকুমার (বি.কে) নেহরু, আমার সঙ্গে অতীতে সামান্য পরিচয় ছিল, লন্ডন থেকে ব্রাইটনে এক বন্ধু দেখা করতে এলেন, তাঁর সঙ্গে বি. কে. নেহরু কী ভেবে একটি উপদেশ-বাণী পাঠালেন : আস্ক অশোক টু একজামিন হিজ হেড। শুনে প্রচুর কৌতুক হলো।

পঁচিশে জুন জরুরি অবস্থার বর্ষপূর্তি। ইকনমিস্ট পত্রিকা থেকে অনুরোধ জানানো হলো,

এই ভয়ঙ্কর সময়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি প্রবন্ধ পত্রিকাকে দিতে পারি কিনা। সম্মত হলাম, প্রবন্ধের খসড়া তৈরি করলাম, জরুরি অবস্থা দৃশ্যত ঘোর অপছন্দ করেন এমন-কিছু প্রবাসী ভারতীয়দের কাছ থেকে খসড়ার বয়ানের ত্রুটি-বিচ্যুতি-অসম্পূর্ণতা-অস্পষ্টতা সম্পর্কে অভিমত চাইলাম, কোনও-কোনও ক্ষেত্রে তাঁদের অভিমত বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণও করলাম। হঠাৎ খেয়াল হলো প্রবন্ধটি নিছক আমার নামে না-ছাপিয়ে এই ক'জন বন্ধুবান্ধদেরও যদি লেখক হিশেবে স্বাক্ষরযুক্ত করতে পারি, বক্তব্য আরও জোরালো হবে। ও হরি, তাঁরা নানা ওজর দেখিয়ে সই করা থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখলেন, কারণগুলি এতই বালখিল্য যে আমার প্রায় হাসি পাচ্ছিল। তবে এ ব্যাপারে তেমন নিন্দামুখর হওয়ার যৌক্তিকতা নেই, অনেকেই আমরা ছাপোষা সংসারী মানুষ, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করতে ভালোবাসি।

দেশ ছাড়ার অব্যবহিত আগেও অনুরূপ একটি ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলাম। ত্রিবান্দ্রম থেকে জনৈক বন্ধু, খ্যাতনামা সমাজবিজ্ঞানী, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যও ছিলেন, অগস্ট মাসে আমাকে একটি আবেদনের খসড়া পাঠালেন, আবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে : তিনি সমস্ত দিক বিবেচনা করে অবিলম্বে জরুরি অবস্থার ঘোষণা যেন অনুগ্রহ করে প্রত্যাহার করে নেন। বন্ধুটির অনুরোধ, আমি নিজে যেন সই করি, এবং সত্যজিৎ রায়ের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে যেন সাহায্য করি। টেলিফোন করে এক সকালে বিশপ লেফ্রয় রোডের ফ্ল্যাটে গেলাম, ওঁর যা চিরাচরিত নিয়ম, সত্যজিৎবাবু নিজে এসে দরজা খুলে দিলেন, সাদরে বসালেন, আগমনের কারণ খুলে বললাম, খসড়াটি ওঁকে পড়তে দিলাম। সেদিন ওঁর ব্যবহার ও আচরণ অতি চমৎকার লেগেছিল। পাঠান্তে আমার দিকে তাকিয়ে সত্যজিৎবাবু স্পষ্ট বললেন : 'মশাই, আমার যে-বৃত্তি তাতে সরকারের উপর একান্ত নির্ভর করতে হয়, কাঁচা ফিল্মের জন্য তদ্বির করতে হয়, সেন্সরে ছাড় পাওয়ার জন্যও। সিনেমা হলের মালিকরাও সবাই-ই সরকারের বশংবদ। এই অবস্থায় এক কাজ করুন, আপনি রবিশঙ্কর বা আলি আকবরের কাছ থেকে একটা সই জোগাড় করে নিয়ে আসুন, তা হলে আমিও দ্বিধাহীন চিত্তে স্বাক্ষর জুড়ে দিতে পারি।' এই খোলামেলা কথা আমাকে মুগ্ধ করেছিল, কারণ ওই সময়েই একজন-দু'জন কলকাতাস্থ ভদ্রলোকের কথা জানতাম, যাঁরা পুরোপুরি দু নৌকোর কাণ্ডারী, মুখে বিপ্লবী বাণী কপচাতেন, অথচ সরকারি প্রতিনিধিদলের সদস্য হয়ে রাশিয়া-আমেরিকাও ঘুরে বেড়াচ্ছেন, জরুরি অবস্থা ঘোষণা ও লক্ষ-লক্ষ নাগরিককে সরকারের তরফ থেকে জেলে পোরার পরেও।

এই বিশেষ জীবদের আমি 'বহুরূপী' আখ্যা দিয়েছিলাম : এঁরা টালিগঞ্জে নকশাল, কালীঘাটে সি পি আই এম, ভবানীপুরে দক্ষিণী কমিউনিস্ট, চৌরঙ্গীতে কংগ্রেস, বড়োবাজারে জনসংঘী। তখনও দিল্লিতে অবস্থান করছি, সত্তর-একাত্তর সালের রক্তাক্ত পরিস্থিতি, এক ভদ্রলোক কী কাজে দেশের রাজধানীতে এসে টালিগঞ্জ পাড়ায় বীভৎস পুলিশি অত্যাচারের ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক বর্ণনা শোনালেন। আমি সম্যক বিচলিত, ভদ্রলোককে বললাম, আমার সঙ্গে একটু প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে চলুন, আসল জায়গায় এই কথাগুলি আপনি বলুন, যাতে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া যায়। ভদ্রলোক মহা খুশি, সাউথ ব্লকে ক্ষমতার কেন্দ্রস্থলে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে। কী আশ্চর্য, ভদ্রলোক আসল জায়গায় পুলিশি অত্যাচার নিয়ে একটা কথাও বললেন না, ক্ষমতার সামীপ্যে গদগদ, একগুচ্ছ চাটুকারিতা দৃষ্টান্তিত করে এলেন।

সত্যজিৎ রায়কে সেদিন নমস্কার জানিয়ে চলে এসেছিলাম। আমার পক্ষে অবশ্য

রবিশঙ্কর বা আলি আকবরের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, ওঁদের সঙ্গে পরিচয় ছিল না বলে, বিশপ লেফ্রয় রোডে তাই আর প্রত্যাবর্তন করা হয়নি। নিজের সই-সম্বলিত খসড়া আবেদনপত্রটি ত্রিবান্দ্রমে বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দিলাম, সঙ্গে এটা যোগ করলাম, আবেদনপত্রে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, রাষ্ট্রপতি আমাদের অনুরোধ রক্ষা করতে অক্ষম হলে আমরা যাবতীয় সরকারি কমিটি বা কমিশন, যার সদস্য আছি, সমস্ত-কিছু থেকে পদত্যাগ করবো। কৌতুককর হতে পারে, হৃদয়বিদারকও হতে পারে, বন্ধুটির কাছ থেকে ওই চিঠির কোনও জবাব পেলাম না, আবেদনপত্রটির ভাগ্যে কী ঘটলো তা-ও অবগত হতে অসমর্থ হলাম। আমি অবশ্য তখন একমাত্র বাণিজ্যমন্ত্রকের অন্তর্গত বোর্ড অফ ট্রেডের সদস্য ছিলাম। জরুরি অবস্থার পরের দিন ছাব্বিশে জুনই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে লিখে আমার পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলাম। এটা উল্লেখ না-করা অসমীচীন হবে, বাঙালি মন্ত্রীমশাই অত্যন্ত ভদ্র জবাব দিয়েছিলেন, আমার বোর্ড অফ ট্রেড ছেড়ে দেওয়াতে তিনি আন্তরিক দুঃখিত, তবে মৎউল্লিখিত পদত্যাগের কারণ নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে অপারগ।

ইকনমিস্ট-এ প্রবন্ধ পাঠানোর প্রসঙ্গে ফিরে যাই। আর কেউ তাঁদের নাম যুক্ত করতে সম্মত না-হওয়ায় লেখাটি একা নিজের নামেই পাঠিয়ে দিলাম, নির্দিষ্ট তারিখে পত্রিকায় ছাপা হলো, পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী আমার নামের নিচে পরিচয় বসিয়ে দিলেন—প্রাক্তন মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, ভারত সরকার।

জরুরি অবস্থা ঘোষণার ঠিক পরবর্তী মুহূর্তে পাঠানো চিঠি নিয়ে যথেষ্ট শোরগোল হয়েছিল, এবার হলো আরও ব্যাপকভাবে। নতুন দিল্লির নির্দেশে, ইকনমিস্ট ওই সংখ্যার সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত করবার ব্যবস্থা হলো, তা সত্ত্বেও কিছু-কিছু কপি ততদিনে দেশের মধ্যে এখানে-ওখানে অনেক লোকের চোখে পড়লো। বহু শুভানুধ্যায়ী আমাকে চিঠি লিখে পাঠালেন, জরুরি অবস্থা তো সহজে ঘুচবে না, আমার দেশে ফেরার পথ আমি নিজেই বন্ধ করে দিলাম। এ ধরনের ভর্ৎসনায় অবশ্য তেমন চিন্তার উদ্রেক হলো না।

বিলেতে এমন নামী পত্রিকায় প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছে, যেন হাই কমিশনারেরই দায় এটা, কেন তিনি ইকনমিস্ট-কে ইত্যাকার অসভ্যতা থেকে বিরত করতে পারেননি, হয়তো দিল্লি থেকে এমন বার্তা এসেছিল। আমার প্রবন্ধের যথাযোগ্য উত্তর দিতে অতএব হাই কমিশন থেকে মহা আড়ম্বরে একটি খসড়া তৈরি করা হলো, তারপর তাতে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান। দুয়েক সপ্তাহের মধ্যেই জানতে পেলাম, অভিযান ব্যর্থ, বিলেতে অবস্থিত কোনও ভারতীয় অর্থনীতিবিদ বা সমাজবিজ্ঞানী ওই খসড়াতে সই করে আমার মতের প্রতিবাদ জানাতে সম্মত হননি, এমনকি আমার বামপন্থী চরিত্র যাঁরা অপছন্দ করেন, তাঁরাও না। হাল ছেড়ে দিয়ে হাই কমিশন থেকে তখন এক প্রবীণ প্রাক্তন ইংরেজ আই.সি.এস অফিসারকে পাকড়ানো হলো, তিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ভারতবর্ষে থেকে গিয়েছিলেন, অনেক উঁচু-উঁচু পদে আসীন ছিলেন, কারও সুপারিশে জওহরলাল নেহরু যোজনা পরিষদের সদস্য করে নিয়েছিলেন তাঁকে। রক্ষণশীল মতামত ভদ্রলোকের ; কপাল খারাপ, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ যখন কার্যত যোজনা কমিশনের সর্বেসর্বা, ভদ্রলোককে তাড়িয়ে দিলেন। বিতাড়িত ইংরেজ ভদ্রলোকটি অতঃপর ভাগ্যান্বেষণে প্রাক্-কেনিয়েত্তা যুগে কেনিয়া সরকারের উপদেষ্টা হয়েছিলেন, পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্ব ব্যাংকের অন্যতম ভ্রাম্যমাণ উপদেষ্টা, যাঁরা প্রচুর অর্থ উপার্জনের বিনিময়ে অমুক অনুন্নত দেশে-তমুক অনুন্নত দেশে বিহার করে মার্কিন সরকারের জোগানো উপদেশ বিলিয়ে বেড়ান। যেহেতু ভদ্রলোকের

মহলানবিশ মশাইয়ের উপর রাগ ছিল এবং, জনশ্রুতি, আমিও মহলানবিশ মশাইয়ের মতো নিরেট বামপন্থী, তিনি সানন্দে হাই কমিশন-রচিত সেই চিঠির খসড়ায় সই করলেন। আমার সুবিধাই হলো, এক বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী আমলা ইন্দিরা গান্ধির দুরাচারকে সমর্থন করছেন, তাতে তো আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

দ্রুত দশ-এগারো মাস কেটে গেল, সাসেক্স-এ অধ্যাপনার মেয়াদ প্রায় শেষ, হঠাৎ আমেরিকা থেকে তিন মাসের জন্য একটি নিমন্ত্রণপত্র এলো। নিমন্ত্রণটি গ্রহণের খেয়াল চাপলো ; আমার তো মার্কিন দেশে অনেক চেনা-জানা, ওই ক'টি মাস জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে কিছু প্রবন্ধ লেখা, সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার, সভাসমিতিতে অংশগ্রহণ ইত্যাদি কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করতে পারবো, এই আশায়। প্রায় বারো বছর বাদে আমেরিকা গেলাম, এবং রাজধানী ওয়াশিংটন শহরেই। প্রবাসী ভারতীয়দের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে সাদর অভ্যর্থনা পেলাম, কিন্তু ইংল্যান্ডের ভারতীয়দের চেয়েও তাঁদের অনেক বেশি ভয়-খাওয়া অবস্থা। সুতরাং সভা-টভা বিশেষ হলো না, তবে কথা বললাম বহু মার্কিন নীতিনির্ধারকের সঙ্গে, রাজনীতিবিদ, আমলা, অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতিবিদ, ধনবিজ্ঞানী, সাংবাদিক এমন-এমন অনেকের সঙ্গে। ওয়াশিংটন পোস্টে সাক্ষাৎকার বেরোলো, এবং নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ আমার লেখা প্রবন্ধ। মার্কিন দেশেও ইন্দিরা গান্ধির সমর্থন রিপাবলিকান-ডেমোক্রাটিক উভয় দলের মধ্যেই যে ক্রমশ ক্ষীয়মাণ, সেটা সহজেই বোঝা গেল।

ছিয়াত্তর সাল ফুরোবার উপক্রম। অক্টোবরে আমার স্ত্রী দেশে ফিরে গেলেন, কলকাতায় কয়েক বছর আগে নতুন ফ্ল্যাটের জন্য টাকা জমা দেওয়া হয়েছে, খবর এলো নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ, ফ্ল্যাটের দখল নিয়ে ভিতরের ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করতে হবে, সুতরাং আমাদের মধ্যে একজনের অবিলম্বে প্রত্যাবর্তন প্রয়োজন। আমার নিজের কী গতি হবে তা কেউই জানি না, বন্ধুবান্ধবরাও না। বড়োদিনের সপ্তাহে আমেরিকা থেকে দেশে রওনা হলাম, লন্ডন-ব্রাইটনে কয়েক দিন কাটিয়ে মুম্বইমুখো। মুম্বই বিমানবন্দরে পুলিশ তুলে নেবে কিনা কোনও ধারণাই নেই। কিছুই হলো না অথচ। বিমানবন্দরে নেমে কাস্টমস ও অভিবাসনের বেড়া ডিঙোলাম, ট্যাক্সি চেপে পালি হিলে হিতেন চৌধুরীর বাংলোতে। ওই সপ্তাহে আমি তাঁর দ্বিতীয় অতিথি, প্রবোধকুমার সান্যাল দু' দিন আগে থেকেই ছিলেন, তাঁর সঙ্গে সেই-ই আমার প্রথম আলাপ। একদা 'মহাপ্রস্থানের পথে,' 'প্রিয় বান্ধবী' এবং 'আলো আর আগুন' পড়ে রাতের পর রাত উন্মাদনায় কাটিয়েছি, ওই বই তিনটি থেকে দিস্তায়-দিস্তায় মুখস্থ বলতে পারতাম পর্যন্ত। কিন্তু সব পাখিই ঘরে ফেরে, সব আগুন নির্বাপিত হয়, প্রবোধবাবুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তেমন-কোনও আবেগে ভেসে গেলাম না।

কয়েক মাস আগে, যখন আমেরিকায় ছিলাম, হিতেনবাবুও গিয়েছিলেন কোনও কাজে, তাই ওঁর সঙ্গে আর নতুন করে আমার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন হলো না। একটা সময়ে ইন্দিরা গান্ধিকে তিনিও চিনতেন, আমিও চিনতাম, কিন্তু এই ঘোর-লাগা অবস্থায় আমার ক্ষেত্রে কী ঘটতে পারে তা নিয়ে আমাদের সংশয় অপরিবর্তিতই রইলো। সাতাত্তর সালের দ্বিতীয় দিবসে সকালের বিমানে কলকাতায়, এখানেও কোনওরকম অন্য-কিছু ঘটলো না, আমি সোজা নিউ আলিপুরে মাতৃগৃহে। আমার মা একেবারেই চাইছিলেন না, এই পরিস্থিতিতে আমি দেশে ফিরি। কেউ আমাকে গ্রেফতার করতে এলো না দেখে উনি একটু আশ্চর্য, সরলমনা মহিলার মন্তব্য, 'ওরা বোধহয় ঠিকমতো খবর পায়নি'।

আমার ব্যাখ্যা অন্য রকম। জরুরি অবস্থার প্রায় দেড় বছর কেটে গেছে, ইন্দিরা গান্ধিরও সম্ভবত দম ফুরিয়ে এসেছে, যদিও তাঁর তনয়ের যায়নি, তা ছাড়া এসব ক্ষেত্রে যা হয়, প্রধান মন্ত্রী মহোদয়ার খবরের সূত্রগুলি তখন একমাত্র নিজের বিদূষকমহলে পর্যবসিত, তাঁরা ভালো-ভালো যে-কথাগুলি মহিলা শুনতে চাইতেন, তাই-ই আওড়াতেন। ভদ্রমহিলা হয়তো দৃঢ় বিশ্বাসে পৌঁছেছিলেন, জরুরি অবস্থার জন্য আপামর জনসাধারণ তাঁকে সাধুবাদ দিচ্ছে, এবার জরুরিত্ব ঘুচিয়ে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হলে তিনি বিপুল ভোটে জয়ী হবেন, তাঁর শত্রুরা আর ট্যা-ফোঁ করতে পারবে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কোন্ ওঁচা অর্থনীতিবিদ কোন্ বিদেশী কাগজে কী লিখেছে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী দরকার, তাকে কয়েদ করারই বা কী দরকার! সঞ্জয় গান্ধির মতামত নিশ্চয়ই অন্যরকম হতো, কিন্তু সে পড়াশুনোর ধার ধারতো না, পত্রিকা-টত্রিকা পড়ার ব্যাপারে সমান অনাগ্রাহী। অনেকের ধারণা, হাকসারের মতো দিল্লিস্থ শুভানুধ্যায়ীদের চেষ্টাতেই আমি বিপদ এড়াতে পেরেছিলাম, তবে এই অনুমান তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়, কারণ কয়েক মাস আগে সঞ্জয়ের নির্দেশে হাকসারের খুড়োমহাশয়, কনৌট প্লেসের বিখ্যাত শৌখিন বস্ত্রসামগ্রীর সমাহার পণ্ডিত ব্রাদার্সের কর্ণধার, সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিতজীকে অতি সামান্য ছুতোয় কোমরে দড়ি বেঁধে কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধি স্বয়ং পণ্ডিতজীকে চিনতেন, হাকসারের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কও জানতেন, কিন্তু পুত্রকে বকুনি দিয়ে পণ্ডিতজীর দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করেননি। সঞ্জয়ের রাগ ছিল, সরকারি অর্থে ওর মারুতি কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা হাকসার-কর্তৃক গুবলেট করে দেওয়া হয়; তার বোধহয় প্রতিশোধ নিল সে।

চব্বিশ

দেশে ফিরেছিলাম বেকার হিশেবে। বন্ধুদের পক্ষেও সেটা লজ্জাজনক ব্যাপার, সুতরাং তেমন বেশিদিন আমাকে কর্মহীন থাকতে হলো না। সুরজিৎ সিংহ তখন বিশ্বভারতীর উপাচার্য। কলকাতায় ফেরার এক সপ্তাহের মধ্যে সিংহমশাই এসে হাজির, আমাকে বিশ্বভারতীর অর্থনীতি বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে। মামুলি একটি সম্মতিপত্র পাঠিয়ে দিলাম সঙ্গে-সঙ্গে, তবে দ্বিধা ঘুচলো না; কলকাতা ছেড়ে যাওয়া, শান্তিনিকেতনে গিয়ে ধাতস্থ হতে পারবো কিনা, এসব নিয়ে মনে গভীর সন্দেহ, আমার নিজের, আমার স্ত্রীরও। কয়েক দিনের মধ্যেই মুশকিল আসান হলো, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকেও অধ্যাপকপদ গ্রহণের আমন্ত্রণ পেলাম। জানুয়ারির চতুর্থ সপ্তাহে আলিপুরের নতুন ফ্ল্যাটে সংসার পাতা; ওখান থেকে বরানগর অনেকটাই দূর, তা হলেও তো কলকাতার চৌহদ্দির মধ্যে। সুরজিৎ সিংহের কাছে প্রচুর ক্ষমাপ্রার্থনা অন্তে, যতদূর মনে পড়ে, পয়লা ফেব্রুয়ারি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে কাজে যোগ দিলাম।

স্বীকার করা ভালো, ওই বিশেষ মুহূর্তে লেখাপড়া-পড়াশুনো সম্পর্কে আমার আগ্রহ প্রায় শূন্যে গিয়ে ঠেকেছে। কয়েক দিন বাদে ইন্দিরা গান্ধি জরুরি অবস্থা বাতিল করলেন, নানা গুজবের গুঞ্জন, প্রমোদবাবু-জ্যোতিবাবুর সঙ্গে ঘন-ঘন দেখাসাক্ষাৎ, স্নেহাংশুবাবুর বাড়িতে উজাড়-করা আড্ডা, সে-আড্ডার কেন্দ্রবিন্দুতেও রাজনীতিচর্চা, আমি যদিও তখন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নাম-লেখানো সদস্য নই, সদস্য হওয়ার জন্য নেতৃবৃন্দ বলেনওনি, কিন্তু সব মিলিয়ে দলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছি। চেতনা জুড়ে রাজনীতির সম্মোহন, তাই একটু বিবেকদংশন থেকেও ভুগছিলাম, রাজনীতিসর্বস্ব দিনযাপন, লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্কহীন, অধ্যাপনার কাজে যোগ দেওয়া একটু অসাধুতা হলো না কি? বিবেককে হয়তো ওই ঋতুতে প্রধানত ঘুম পাড়িয়েই রেখেছিলাম।

গৌরকিশোর ঘোষ জরুরি অবস্থা ঘোষণার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে কয়েদ হয়েছিল; ততদিনে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। ইন্দিরা গান্ধির স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই আমাদের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে, অনেক দিন বাদে ফের নিয়মিত দেখাশোনা হয়, তারই আগ্রহে আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় 'মতান্তর' শিরোনামে প্রধানত রাজনৈতিক, কিছুটা অর্থনীতি-মিশ্রিত, প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলাম, জ্যোতিবাবু-প্রমোদবাবুর সম্মতি নিয়েই। আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত আর এক বন্ধু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ওঁদের কাগজে আমার লেখার সিদ্ধান্তে খুশি, মেরিডিথ স্ট্রিটের কফি হাউসে বসে লেখার পাণ্ডুলিপি প্রতি শুক্রবার তাঁকে দিয়ে পড়িয়ে ভাষাশৈলী মঞ্জুর করিয়ে নিতাম।

জরুরি অবস্থার অবসান, লোকসভার নির্বাচন ঘোষণা, সদ্যগঠিত জনতা দলের সঙ্গে বামফ্রন্টের নির্বাচনী আঁতাত, পশ্চিম বাংলার বিয়াল্লিশটি আসনের অর্ধেক, অর্থাৎ একুশটিতে, জনতা দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, বাকি একুশটিতে বামফ্রন্ট। ফ্রন্টের শরিকদের

মধ্যে আসন বাঁটোয়ারা করতে জ্যোতিবাবু কয়েক দিন ভীষণ ব্যস্ত। আগেও ওঁর বহু ন্যাড়াপোঁচা রসিকতার পরিচয় পেয়েছি, এই সূত্রেও পেলাম। তখনও সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার বামফ্রন্টে আছেও, নেইও। সেই দলের নেতারা অম্লানবদনে জ্যোতিবাবুকে এসে বললেন, বামফ্রন্টের জন্য বরাদ্দ ওই একুশটি সিটের অন্তত তেরোটি তাঁদের চাই। জ্যোতিবাবু, অবিকৃত মুখ, তাঁদের সবিনয়ে জানালেন : 'দেখুন, আপনারা বরং সোজা জনগণের কাছেই চলে যান, তাঁরাই আপনাদের তেরোটি আসন পাইয়ে দেবেন'। মন ভার করে এস ইউ সি আই পুরোপুরি ফ্রন্ট পরিত্যাগ করলো, এখনও তারা সেই দূরস্থানেই আছে।

জরুরি অবস্থা উঠেছে, সাধারণ মানুষের মনে তবু অনিশ্চয়তা, ইন্দিরা গান্ধি সত্যি-সত্যিই নির্বাচন হতে দেবেন কিনা, নাকি পুরোটাই এক বৃহৎ কারসাজির অঙ্গ, তা নিয়ে ফিসফাস কথাবার্তার অন্ত নেই। বামফ্রন্টের একুশজন প্রার্থীর নাম জানিয়ে ময়দানে অনেক দিন বাদে বড়ো সভা, অথচ জনসাধারণের আড়ষ্টতা কাটে না, সকলেরই মনে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। প্রমোদবাবু পার্টির কর্মীদের জনে-জনে ডেকে সতর্ক করে দিলেন, নির্বাচনের জন্য পরিশ্রম করতে হবে ঠিকই, কিন্তু একটু রেখে-ঢেকে, যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে, গোপন ডেরাগুলির খবর পুলিশ যেন না জানতে পারে।

সংশয়ের বাঁধ ভাঙলো কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে জগজীবন রামের নাটকীয় পদত্যাগে এবং যুগপৎ বিরোধীদের সঙ্গে মিলে-মিশে তাঁর নির্বাচনে লড়বার অভিপ্রায় ঘোষণায়। মনের কুয়াশা কেটে গেল, ট্রামে-বাসে উচ্চকিত আলাপ-রঙ্গ-তামাশা, ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর পুত্রকে গালাগাল পেড়ে সাধারণ মানুষ মুখের সুখ মেটালেন। মার্চ মাসের শেষের দিকে যখন লোকসভার নির্বাচনী ফলাফল বেরোতে শুরু করলো, প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনাসম্পাত, ইন্দিরা গান্ধি নিজেও অনেক ভোটে কুপোকাত, গোটা আর্যাবর্তে কংগ্রেসের একটি আসনও জোটেনি, দক্ষিণে দলের ফল তুলনাগতভাবে সামান্য ভালো, কিন্তু সম্মিলিত প্রতিপক্ষের আসনসংখ্যা তিনশো ছাড়িয়ে গেছে, পশ্চিম বাংলাতেও মাত্র কয়েকটি আসন বাদ দিলে জনতা দল ও বামফ্রন্টের জয়জয়াকার; যে-ক'টি আসনে বিরোধীরা পরাজিত, প্রতিটির ক্ষেত্রেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে।

আমার যে-বন্ধু, জেনারেল বিশ্বনাথ সরকার, বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, ততদিনে সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় বসবাস করছেন। প্রায়ই আমার কাছে আসেন, কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত পাঠাগারে গিয়ে দেশের সর্বত্র-প্রকাশিত খবরের কাগজ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়েন। তিনিও আমাদের সকলের মতো জরুরি অবস্থার ঘোর বিরোধী ইন্দিরা-বিরোধী, আমাকে প্রায়ই বলতেন, 'দেখবেন, নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধি কচুকাটা হবেন'। ঠিক তাই-ই হলো। কয়েক প্রহর চিন্তাভাবনার পর ইন্দিরা গান্ধি পদত্যাগই শ্রেয় বলে বিবেচনা করলেন, যদিও সঞ্জয়ের নাকি ঘোর আপত্তি ছিল, সে পুলিশ-মিলিটারি জড়ো করে জোর করে ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকার জল্পনা আঁটছিল। জনতা দলে তিন জন প্রধান মন্ত্রী-পদপ্রার্থী : মোরারজী দেশাই, চরণ সিংহ ও জগজীবন রাম। পাকা সিদ্ধান্তের ভার দেওয়া হলো জয়প্রকাশ নারায়ণ ও আচার্য কৃপালনীর উপর। তাঁরা মোরারজীকেই পছন্দ করলেন। চরণ সিংহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, জগজীবন রাম প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, পশ্চিম বাংলা থেকে প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র শিক্ষামন্ত্রী। জর্জ ফার্নান্ডেজ প্রথমটায় যোগাযোগ মন্ত্রী, সেটা পছন্দ না-হওয়ায় সপ্তাহ দুই বাদে শিল্পমন্ত্রী ; যাঁকে সর্বপ্রথম এই মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাঁকে কী কারণে যেন মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিতে হলো। একদা কেন্দ্রীয় অর্থসচিব, এইচ

এম প্যাটেল, অর্থমন্ত্রী মনোনীত হলেন, প্রধান মন্ত্রীর অতি কাছের লোক।

অস্থির সময়, স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে সপ্তাহে চার-পাঁচ দিন করে যাচ্ছি, কিন্তু অন্য সব মাথায় উঠেছে, সারাক্ষণ রাজনীতি নিয়ে চিন্তা, প্রত্যক্ষ রাজনীতির মাঠে পুরোপুরি নেমে পড়া। আর কোনও বাধাবন্ধ নেই, কলকাতা শহর, শহরতলি ও মফস্বল জুড়ে সভা-সমিতি, যত্রতত্র বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি, প্রত্যহ রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি নিয়ে মিছিল-আন্দোলন। রাজনীতির পারদ দ্রুত উপরে চড়লো, এশিয়ার মুক্তিসূর্যটিকে বাছা-বাছা বিশেষণে বিদ্ধ করে তুলোধোনা, শহরে-গঞ্জে ঠাসা গুজব, ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর দুই পুত্র বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন। কয়েক সপ্তাহ গেলে জনতা সরকার রাজ্যে-রাজ্যে সরকার ভেঙে দিয়ে নতুন বিধান সভা নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। এই সিদ্ধান্তে যৌক্তিকতা নিয়ে কিছু কথা চালাচালি হয়েছে। কোনও-কোনও নীতিবাগীশ বলেছেন, লোকসভার নির্বাচন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে গেছে, তো কী হয়েছে, রাজ্য মন্ত্রিসভাগুলিকে ভেঙে দেওয়ার আদৌ কোনও কারণ ছিল না; ইন্দিরা গান্ধি যেমন স্বেচ্ছাচারী মানসিকতা প্রদর্শন করেছিলেন দু'বছর আগে, এই বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জনতা দলের সরকারও তাই করছেন। আমি অন্তত এই ধরনের যুক্তিতর্কের তেমন সার্থকতা খুঁজে পাই না। ইন্দিরা গান্ধি গায়ের জোর খাটিয়ে সংবিধান সংশোধন করে বিধানসভাগুলির পাঁচ বছরের মেয়াদ ছ'বছরে রূপান্তরিত করেছিলেন। সেটা অন্যায়, আমি বলবো সংবিধানের প্রকৃতি-বহির্ভূত, সুতরাং ওই এক বছর ছেঁটে দিয়ে জনতা সরকার ঠিক কাজই করেছিলেন। দিল্লিস্থ বহুদিনের বন্ধু রাজ ও রমেশ থাপর, একদা ইন্দিরা গান্ধির খুব কাছের মানুষ ছিলেন, জরুরি অবস্থা ঘোষণার প্রতিবাদে 'সেমিনার' প্রকাশ বন্ধ রেখেছিলেন, ইন্দিরার পতন ঘটায় তাঁদের আনন্দ ধরে না। কী উপলক্ষ্যে দিল্লি গিয়ে তাঁদের আনন্দ-উৎসবের ভাগিদার হয়ে এলাম। ইন্দিরা-পতনমুহূর্তে ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি-তে যে-প্রবন্ধ লিখেছিলাম, তার প্রশংসা তাঁদের মুখে।

গোটা দেশ এমনিতেই উন্মাদনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তার উপর এবার বিধান সভাগুলির নির্বাচন, উত্তেজনা আরও তুঙ্গে। সবাই ধরেই নিয়েছিলেন লোকসভার নির্বাচনে বোঝাপড়ার মতো পশ্চিম বাংলায় বিধান সভা নির্বাচনেও জনতা দল ও বামফ্রন্টের মধ্যে আসন সমান-সমান ভাগাভাগি হবে, অর্থাৎ ৫০ : ৫০। এটাও ধরে নেওয়া হয়েছিল, বয়োজ্যেষ্ঠ প্রফুল্লচন্দ্র সেনই মুখ্যমন্ত্রী হবেন, জ্যোতিবাবু উপমুখ্যমন্ত্রী। এরই মধ্যে বৃত্তিগত কারণে মুম্বই যেতে হলো, সেখান থেকে তিরুবন্তপুরমে। ওখানকার সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট স্টাডিসে কী একটা কাজ ছিল, ইন্ডিয়ান স্কুল অফ সোসাল সায়েন্সেস-এর স্থানীয় শাখার তরফ থেকে আমার উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা। বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখি ইএমএস শুনতে এসেছেন। পার্টির কেন্দ্রীয় দফতর তখন কলকাতায়, তিনি সেদিনই সকালে কলকাতা থেকে এসে পৌঁছেছেন। ওঁর কাছে খোঁজ নিলাম, জনতা দলের সঙ্গে আসন বোঝাবুঝির কী অবস্থা, উনি জানালেন ৫০ : ৫০-এর বদলে জনতা দল ৫৫ : ৪৫ শর্তে ফ্রন্টকে রাজি হতে বলেছেন, অর্থাৎ ওদের পঞ্চান্ন ভাগ, ফ্রন্টের পয়তাল্লিশ। ফ্রন্টের পক্ষ থেকে পাল্টা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৫২ : ৪৮ ; ওদের বাহান্ন, ফ্রন্টের আটচল্লিশ। ইএমএস-এর বদ্ধমূল ধারণা এই অত্যন্ত উদার প্রস্তাবে জনতা দল রাজি না-হয়েই পারে না, বিশেষ করে যেহেতু প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে মুখ্যমন্ত্রী হিশেবে মেনে নেওয়া হয়েছে।

এপ্রিলের কোন তারিখ ঠিক মনে পড়ে না, পরের দিন তিরুবন্তপুরম্ থেকে রওনা হয়ে

একটু বেশি রাত্রিতে কলকাতা, বাড়ির থেকে কেউ নিতে আসেনি, ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বাসে চেপে লোয়ার সার্কুলার রোডের এক হোটেলে, সেখানে ট্যাক্সি মেলে না, অনেক কাণ্ডকারখানা করে মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হলে আলিপুরের ফ্ল্যাটে প্রত্যাবর্তন। সঙ্গে-সঙ্গে স্ত্রীর কাছ থেকে খবর পেলাম, স্নেহাংশুবাবু টেলিফোনে রঙ্গ করে জানিয়েছেন 'আপনাদের সর্বনাশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে' ; জ্যোতিবাবুও নাকি ফোন করেছিলেন, তিনি চাপা মানুষ, কিছু বলেননি, শুধু অনুরোধ জানিয়েছেন ফিরেই যেন ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করি, দরকারি কথা আছে। পরদিন জ্যোতিবাবুর সঙ্গে ওঁর হিন্দুস্তান পার্কের বাড়িতে দেখা করতে গেলাম। বললেন, জনতা দল বাহান্ন : আটচল্লিশ শর্তেও রাজি হচ্ছে না, সেদিন আর এক দফা বৈঠক হবে, ওঁর ভারি আশ্চর্য লাগছে সামান্য একটা জেদের জন্য ওরা নির্বাচনী আঁতাত ভেঙে দিতে চায়। হয়তো লোকসভা নির্বাচনে এত ভালো ফল হয়েছে বলে জনতা দলের কর্তাদের মাথা ঘুরে গেছে, বামপন্থী দলগুলিকে আদৌ আর আমল দিতে চায় না ; একের পিঠে শূন্য থাকলেই দশ, এক না থাকলে শূন্য যে শূন্য, ওরা বুঝতে পারছে না। জ্যোতিবাবুর তখনও আশা, শেষ পর্যন্ত একটা ফয়সালা হবে, বাহান্ন-আটচল্লিশেই মতৈক্য। তবে জনতা দল যে-সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুক, পার্টির ইচ্ছা আমি নির্বাচনে দাঁড়িয়ে বিধানসভায় যাই, গিয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করি। আমার জন্য জ্যোতিবাবুরা আপাতত দুটো আসন কলকাতায় বেছে রেখেছেন, রাসবিহারী ও আলিপুর। জ্যোতিবাবুর বিবেচনায় দুটোই যথেষ্ট ভালো আসন, জিততে কোনওরকম অসুবিধা হবে না, তবে আমার যদি পছন্দ মফস্বল বা গ্রামাঞ্চল থেকে দাঁড়ানোর, তা হলে সেই ব্যবস্থাও করা সম্ভব। ওঁর অনুরোধ কী হতে পারে সে সম্পর্কে আগেই আঁচ ছিল। প্রাথমিক সম্মতি জানিয়ে স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে কর্তব্য পালন করতে গেলাম। ওখানে অনেক দিন থেকে অধ্যাপক, আমার রাজনৈতিক বন্ধু নির্মলকান্তি চট্টোপাধ্যায়কে জ্যোতিবাবুর বার্তার বিষয়ে বললাম, উনি মুচকি হেসে মন্তব্য করলেন, 'ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ তো দেখেননি। প্রার্থী হয়ে এই ভরা গ্রীষ্মে এক মাস প্রচারান্তে আপনার শরীর আদ্ধেক হয়ে যাবে'। মাত্র একটা-দুটো দিনের অপেক্ষা, জনতা দলের সঙ্গে আলোচনা ভেস্তে গেল, বামফ্রন্টের একাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সিদ্ধান্ত। আমার জন্য রাসবিহারী কেন্দ্রই স্থির হলো, এক সন্ধ্যায় শচীন সেন-অশোক বসু এসে প্রার্থী হবার জন্য যে-প্রাথমিক সই-টই করার ব্যাপার থাকে, বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। পরদিন থেকে পার্টির স্থানীয় নেতারা জড়ো হতে থাকলেন, প্রতিটি ওয়ার্ডে বৈঠকের, পথসভার, মিছিলের, পোস্টার সাঁটার, দেওয়াল লিখনের আয়োজন।

নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছি, কথাটা জানাজানি হবার পর ঘোর-লাগা অবস্থা, শুধু আমার নয়, পরিচিত-প্রিয়জনদেরও। দেবুদার দুই ছেলে, খোকন-ছোটু, তাদের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ব্যবসা, নিজেদের দোকান থেকে উজাড় করে বৈদ্যুতিক চোঙা, মাইক্রোফোন ইত্যাদি এনে হাজির করলো। কয়েকজন ব্যক্তিগত বন্ধু, যেমন শান্তি চৌধুরী, ভীষণ উৎসাহিত, তাঁরা জানালেন আলাদা করে পোস্টার ইত্যাদি ছাপবেন। যেহেতু কয়েক বছর ধরে নকশালপন্থী বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে লিখেছি, বলেছি, মিছিলে হেঁটেছি, একদল নকশালবাদী তরুণও এসে বললেন, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁদের তাত্ত্বিক ব্যবধান আছে, তাঁরা আমার জন্য আলাদা হয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক। কাউকেই নিরাশ করবার ইচ্ছা ছিল না আমার, নিরাশ হলেনও না কেউ। সমাজের সবচেয়ে ভীতিপ্রদ জন্তু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, তাঁরাও এসে জড়ো হলেন। আমার সমর্থনে অধ্যাপক, ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, পদার্থবিদ,

রসায়নবিদ, ভূতত্ত্ববিজ্ঞানী, দর্শনের-সাহিত্যের অধ্যাপক, সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার, এঁদের সবাইকে দিয়ে সই করানোর জন্য নিজেদের গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে অনেক বুদ্ধিজীবী কলকাতাময় ঘুরে বেড়ালেন। একজন-দু'জন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অবশ্য স্বাক্ষর দিতে রাজি হলেন না, তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার ভাব বেড়ে গেল। কঠিনতম পরীক্ষা ছিল, যখন বুদ্ধিজীবীরা কোনও শৌখিন বাড়িতে সমবেত হয়ে আমাকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করতেন ঘণ্টা দুয়েক ধরে, আমার জ্ঞানের পরিধি তাঁদের জ্ঞানের সীমা, পরিসীমাকে ছুঁতেও পারতো না।

আগুনের কী গুণ আছে কে জানে : খর গ্রীষ্ম, তার মধ্যে, উদ্‌ভ্রান্ত, নিজেকে সরেস প্রমাণ করানোর উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ানো। তবে অসাধারণ অভিজ্ঞতা পাড়ায়-পাড়ায়, বস্তিতে-বস্তিতে পরিক্রমা। অতি সাধারণ মানুষ, জ্ঞান বা বুদ্ধির ভারে তাঁরা প্রপীড়িত নন, তাঁরাও জরুরি অবস্থার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন, স্পষ্ট উপলব্ধি করেছেন স্বৈরাচার ও স্বাধীনতাহীনতার কী বিষময় পরিণাম, উপলব্ধি করেছেন গত দু' বছরের, দু' বছরের কেন, গত বেশ কয়েক বছরের জানা-শেখার প্রেক্ষিতে। মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা, বস্তি উন্নতির সমস্যা, পানীয় জলের সমস্যা, বর্ষায় জলনিকাশের সমস্যা, পরিবহনের সমস্যা, কাজ-কারবারের সমস্যা, সন্তানদের শিক্ষাসমস্যা, সব কিছু নিয়েই তাঁদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি আছে, তাঁরা এসব বিষয়ে নির্বাচনি প্রার্থী ও তাঁর দলের মতামত ও পরিকল্পনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে চান। সদ্য-ফোটা ভোরে শুরু করে ঘোর দুপুর পর্যন্ত ছোটো-ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে বাড়িতে-বাড়িতে ঘোরা, বস্তিতে গিয়ে সেখানকার আকীর্ণ নানা সমস্যা নিয়ে আলাপ, কোনওক্রমে দ্বিপ্রাহরিক আহার সেরে নির্বাচনী দপ্তরে গিয়ে প্রচার কোথায় এগোলো, কতটা এগোলো, কোথায় আদৌ এগোয়নি, সে সব নিয়ে কমরেডদের সঙ্গে আলোচনা, কখনও পার্টির জেলা দফতরে যাওয়া, কখনও বা রাজ্য দফতরে। বিকেল এবং সন্ধ্যা বরাদ্দ সভা ও শোভাযাত্রার জন্য। কোনও ওয়ার্ডের কোনও পাড়া বাদ দেওয়া চলবে না, সভার ব্যবস্থা করতে হবে, গান বা পথনাটিকার জন্য স্কোয়াডের ব্যবস্থা, বক্তাদের তালিকা স্থির করতে হবে। অঞ্চলের বক্তা দিয়ে চলবে না, প্রার্থী নতুন, তাঁর পরিচয়ও তেমন ব্যাপক নয়, সুতরাং সভাদিতে দলের নেতৃবৃন্দকে চাই, কখনও ফ্রন্টের অন্য শরিকদের নেতাদের। অবশ্য প্রার্থীকেও মাঝে-মাঝে অন্য পাড়ায় গিয়ে বক্তৃতা করতে হয়, অন্যান্য কেন্দ্রেও তাঁর সম্বন্ধে ঈষৎ কৌতূহল, প্রার্থী নতুন বলেই।

ওই চার-পাঁচ সপ্তাহ খাটতে হয়েছিল প্রচুর, তা ছাড়া একেবারে গোড়ার দিকেই, একটু আগে বৃষ্টি-ঝড় হয়ে গেছে, ডোভার লেনে শচীন সেনের বাড়ির সিঁড়িতে এক সন্ধ্যায় পা পিছলে পড়ি, সারারাত ব্যথায় অসহ্য কাতর হয়ে সকালে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া, তিনি এক্স-রে করে দেখলেন গোড়ালির কাছে হাড় ভেঙেছে, পরিস্থিতি বিবেচনা করে এমনভাবে প্লাস্টার বেঁধে দিলেন যাতে হাতে লাঠি নিয়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে অন্তত অলিগলিতে হাঁটতে পারি। বিরোধী কংগ্রেসী প্রার্থী পুরো ব্যাপারটা বুজরুকি বলে মনে করেছিলেন, বাড়ি-বাড়ি গিয়ে বলেছিলেন, 'লোকটা যে কত অসাধু, এ থেকেই তো বুঝতে পারছেন; ওঁর কিছু হয়নি, আপনাদের সহানুভূতি আদায়ের জন্য ব্যান্ডেজ বেঁধে হাতে লাঠি নিয়ে খোঁড়াচ্ছেন'।

নির্বাচনের মরশুমে সত্যিই বিচিত্র নানা ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়। একদিন ভর দুপুরে কালীঘাট পাড়ায় গেছি, ওখান থেকে মিছিল বেরোবার কথা, পৌঁছে দেখি আমার তরফেরই এক স্বেচ্ছাসেবক টুলের উপর উঠে দাঁড়িয়ে তেজস্বী বক্তৃতায় রত : 'কমরেডস, বন্ধুগণ,

প্রতিপক্ষ বলে বেড়াচ্ছে আমাদের প্রার্থী নাকি মার্কিন গুপ্তচর। আমি পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বলছি, তিনি মার্কিন গুপ্তচর নন'। বাংলা ভাষায় যাকে বলে আত্মঘাতী গোল, তাই আর কী। আরও এক কাহিনী আমার স্মৃতিতে মজুত। জনৈক প্রার্থী, তাঁর দলের বামপন্থী বলে বাজারে রটনা, তাঁর পক্ষ থেকে ছাপিয়ে কেচ্ছা বিলি করা হলো : আমার স্ত্রী বর্তমান থাকতে আমি নাকি এক জর্মান উপপত্নী গ্রহণ করেছি, পুরীর বি এন আর হোটেলে তাকে নিয়ে রগড় করতে দেখা গেছে আমাকে। কাহিনীটির উদোর-পিণ্ডি-বুধোর-ঘাড়ে গোছের মিশ্রিত-বিকৃত একটি ভিত্তি ছিল, তবে, পরম পরিতাপের কথা, আমার স্ত্রী পর্যন্ত গল্পটি বিশ্বাস করলেন না।

আমার হয়ে বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে গেলেন ই এম এস নাম্বুদ্রিপদ-প্রমোদ দাশগুপ্ত-জ্যোতি বসু সবাই, অন্যান্য অনেকে তো ছিলেনই। মস্ত লাভ হলো, নির্বাচনের মাসে উদয়াস্ত নির্বাচনী কেন্দ্রে এবং কেন্দ্রের বাইরে বক্তৃতা দেওয়া ও অন্য উপলক্ষ্যে ঘুরে বেড়ানোর ফলে রাজনৈতিক অনেক ব্যক্তিত্ব, যাঁদের সঙ্গে ইতিপূর্বে সামান্য আলাপ ছিল, তাঁদের সঙ্গে পরিচয় গাঢ়তর হলো, যাঁরা অপরিচিত ছিলেন তাঁদের নৈকট্যে এলাম। সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি, অতি সাধারণ মানুষ, যাঁদের আমরা গম্ভীর উচ্চারণে বলি জনগণ বা জনসাধারণ, তাঁদের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ কী করে সম্ভব, সে ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন। এমন একজনের কথা অন্যত্র লিখেছি, মণ্টু ভঞ্জ, প্রতাপাদিত্য রোড এলাকায় টাইপিং শেখাবার একটি স্কুল চালাতেন, দলের সব সময়ের কর্মী নন, কারণ সাংসারিক দায়িত্ব আছে, অথচ অতীতে বিভিন্ন আন্দোলনে জেল খেটে এসেছেন, পার্টির প্রতি তদ্গতপ্রাণ; তার চেয়েও যা বড়ো কথা, নিখাদ ভালো মানুষ, এমন আদর্শবান ভালো মানুষ পশ্চিম বাংলার শহরে-গ্রামে-গঞ্জে হাজারে-হাজারে ছড়িয়ে আছেন। এঁরাই আসলে পার্টির মেরুদণ্ড। এঁদের বাদ দিয়ে আন্দোলন হয় না, নির্বাচনে সফলতাও আসে না। এঁদের নাম ইতিহাসের পাতায় কোনওদিন লেখা হবে না, তা হলেও এঁরাই কিন্তু ইতিহাস রচনা করেন। পার্টির সাফল্যে এঁরা উদ্বেল হয়ে ওঠেন, অথচ কমরেডদের সঙ্গে ভাগ করে সামান্য মিষ্টান্ন ভোগের বাইরে এঁদের অন্য কোনও আকাঙ্ক্ষা বা দাবি নেই, থাকে না। পার্টি কোনও কারণে কোথাও ধাক্কা খেলে নেতাদের চেয়েও অনেক বেশি-বেশি মুষড়ে পড়েন এঁরা। নেতারা বিবিধ উচ্চাবচতার মধ্য দিয়ে গেছেন, দার্শনিকতা তাঁদের অনেকের ক্ষেত্রেই সুদৃঢ় বর্ম, বহু ঘা খেয়ে-খেয়ে তাঁদের সত্তার কিয়দংশ জুড়ে এক ধরনের অখণ্ড নাস্তিকতা। সাধারণ স্তরের কর্মীদের মানসিকতা নেতাদের দর্শনচিন্তার যোজন-যোজন দূরে; দলের বড়ো বিপদ সমাগত হলে সাধারণ কর্মীদের হৃদয়ই সর্বাগ্রে আপন্ন হয়। এই মানুষগুলি প্রণম্য।

অন্য যাঁদের কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতে হয়, তাঁরা শহরে-গ্রামে ছিটিয়ে থাকা মাঝারি পর্যায়ের নেতা-নেত্রীবৃন্দ : অতীতে, স্বাধীনতার আগে ও পরে, তাঁরা বছরের পর বছর বিনা বিচারে কারাকক্ষে কাটিয়েছেন, জেলে থাকা-কালে মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়েছেন, বিগত কয়েক দশক বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন বহু বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে গেছে, কিন্তু তাঁরা বিশ্বাসে অটল থেকেছেন। অনেকেরই নিজেদের পরিবারের সঙ্গে সংযোগ বহু বছর আগে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, অনেকেই সংসার করেননি, রাজ্য কমিটি, জেলা কমিটি, আঞ্চলিক কমিটি বা স্থানীয় কমিটির দপ্তরই তাঁদের পাকা ঠিকানা। রাত্রিবেলা একটি খাটিয়া পেতে ঘুমোন, সকালে কোথাও তা উঠিয়ে রাখা হয়, পার্টি দফতরে হাজার মানুষের জটলা, পার্টির কমিউনে তাঁদের স্নান-খাওয়া-বিশ্রাম, দল থেকে তাঁদের হয়তো কোনও বিশেষ শাখায় কাজের ভার দেওয়া হয়েছে, কৃষক সংগঠনের ক্ষেত্রে অথবা ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে, কিংবা শিক্ষক, ছাত্র

বা কোনও কর্মচারী সংগঠনের দায়িত্বে। বহু বছর পর্যন্ত তাঁরা অতি সামান্য মাসোহারা পেতেন পার্টির কাছ থেকে, প্রতিটি পয়সা অতএব হিশেব করে ব্যয় করতে হতো, জামাকাপড় নিজেরা কাচতেন, যাঁদের কমিউনে থাকার সুবিধা ছিল না তাঁরা নিজেদের জন্য রান্না পর্যন্ত করতেন। অতি সম্প্রতি এসব নেতা-কর্মীদের মাসোহারার হার কিছুটা বেড়েছে, তবে বাজারে যে-সমস্ত কল্পকাহিনী এই প্রসঙ্গে প্রচারিত, তার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে আত্যন্তিক অভাবের মধ্যেই কমিউনিস্ট পার্টি বড়ো হয়ে উঠেছিল বলেই হয়তো, কমরেডদের মধ্যে একটি মিলিত সংসারের পরিবেশ। সবাই এক সঙ্গে কাজ করছেন, খাচ্ছেন, ঘুমোচ্ছেন, গল্প করছেন, পার্টির কর্মসূচি নিয়ে চিন্তা করছেন, পরস্পরের নানা নিরন্তর সমস্যা নিয়ে ভাবিত হচ্ছেন, সমস্যা নিরসনের জন্য পরস্পরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন, এমন নিষ্পাপ কলুষহীনতার মধ্যে তাঁদের দিনযাপন ঘটেছে বলেই সদাচার ও কপটতার মধ্যে, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সীমাভেদ নির্ণয় তাঁদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। ছেলেবেলা থেকে কমিউনিস্ট দফতরের যে-ছবি আমার মনে আঁকা আছে, সেই চিত্ররূপ এই এতগুলি বছর অতিক্রান্ত হলেও বিশেষ পাল্টায়নি : কোনও প্রায় ভেঙে-পড়া বাড়ির একতলা বা দোতলার জরাজীর্ণ ঘর, দেওয়াল থেকে ঝুল নেমেছে, নিচু তক্তপোশের উপর ময়লা চাদর বিছনো, হয়তো একটা-দুটো হাতলহীন দ-আকারের কাঠের চেয়ার, একটি কিশোর এসে মাঝে-মাঝে কেতলি থেকে ঢেলে খুরি করে চা দিয়ে যাচ্ছে, বিকেলে সবাইয়ের গোল হয়ে বসে বাদাম-বা আলু-মিশ্রিত চিঁড়ে বা মুড়ি ভাজা চিবনো, পূর্ববঙ্গীয় পটভূমি থাকলে সঙ্গে কাঁচালঙ্কা। গত দুই দশকে পার্টির এই নিসর্গ বর্ণনা সামান্য বদলেছে, তবে, ফের বলি, বাজারে যে-ইতিবৃত্ত প্রচারিত তা একেবারেই বাস্তবতাহীন।

এমন কিছু-কিছু নেতা-কর্মী হয়তো নির্বাচনে জিতেছেন, দল থেকে সরকার গঠন করা হয়েছে, তাঁদের মন্ত্রী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁরা অথৈ জলে পড়েছেন। অনেককে জানি, যাঁরা মন্ত্রী হওয়ার পরেও, বেশ কয়েক সপ্তাহ বা মাস, দলের কমিউনেই বসবাস চালিয়ে গেছেন, রাত্রিবেলা খাটিয়ার আশ্রয়। এক দিক থেকে দেখলে এটা বোধহয় বাংলার বিশেষ ঐতিহ্য, কংগ্রেস আমলে নানা ধরনের অনাচারের খবর বাজারে ছড়াতো, সে-সব বৃত্তান্তের ষোলো আনাই মিথ্যে ছিল না। তবে একজন-দু'জনের কথা বাদ দিলে, এমনকি কংগ্রেসি মন্ত্রীরাও তেমন-কিছু জাঁকজমকের মধ্যে থাকতেন না, কেউ-কেউ খুব বেশি হলে রাজভবন-সংলগ্ন মাঝারি বা ছোটো ফ্ল্যাটে উঠে আসতেন, নয়তো শহরে কোনও ভাড়া-করা ফ্ল্যাটে। কেরল-ত্রিপুরা বাদ দিয়ে অন্য যে কোনও রাজ্যে গিয়ে দেখুন, পুরো মন্ত্রী নন, বড়ো জোর উপ-অথবা অর্ধ-মন্ত্রী, তাঁদের জন্যও সরকার থেকে বিরাট-বিরাট প্রাসাদের ব্যবস্থা। আশির দশকের গোড়ায় একবার ঢিটিক্কার পড়ে গেল, পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর জন্য বরাদ্দ আতিথেয়তা ভাতা তিন হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে বছরে ছয় হাজার করা হয়েছে, কী লজ্জা, কী লজ্জা, জ্যোতি বসুর লজ্জাহীনতায় খবরের কাগজগুলির বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হয়ে এলো। অন্যান্য রাজ্যে কী অবস্থা আমি একটু খোঁজ নিতে শুরু করলাম, জেনে চমৎকৃত হতে হলো, মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য বরাদ্দ আতিথেয়তা ভাতা বছরে ছয় লক্ষ টাকা, অন্যান্য মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে চার লক্ষ।

পঁচিশ

ফিরে যেতে হয় সাতাত্তর সালের নির্বাচন-ঋতুতে। জরুরি অবস্থার কেলেঙ্কারিহেতু কংগ্রেসের অনেকটাই গুটনো অবস্থা, কিন্তু জনতা দলের রমরমা, কেন্দ্রে তাঁদের সরকার, প্রফুল্ল সেন মশাইরা এতটাই আত্মবিশ্বাসী যে বিধানসভা নির্বাচনে আটচল্লিশ শতাংশ আসনও বামফ্রন্টকে ছেড়ে দিতে রাজি নন। তবে প্রচারে নেমে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে আমরা প্রায় নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম, নির্বাচনে বামফ্রন্টই জয়ী হবে, ভোট শেষ হওয়ার পরও দুশ্চিন্তার লেশমাত্র নেই আমাদের। অথচ মাত্র তিন মাস আগে অবস্থা পুরোপুরি অন্যরকম ছিল : এখন মনে পড়লে হাসিই পায়, লোকসভা নির্বাচনের ভোটপর্ব শেষ, দু'দিন বাদে ভোট গোনা হবে, ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রের ভোট বাক্সগুলি হেস্টিংস হাউসে রাখা আছে, জ্যোর্তিময় বসুর নায়কত্বে আমরা ক'জন ওখানে, রাত একটা অথবা দুটো, নৈশপ্রহরা দিচ্ছি, ইন্দিরা গান্ধির দল যাতে কোনো ফষ্টি-নষ্টি না-করতে পারে।

বিধান সভা নির্বাচনে ভোটের ফলাফল আমাদের প্রতিপক্ষ দলগুলিকে হতভম্ব করে দিল। জনতা দল ও কংগ্রেস উভয়েই কুড়ি-পঁচিশটি করে আসন পেল, সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার তিনটি, মুসলিম লিগ ও গোরখা লিগ একটি করে, রাজ্যময় বাকি সমস্ত আসন বামফ্রন্টের দখলে। জনতা দলের গরীয়সী নেতারা যে হিশেবে কত ভুল করেছিলেন, তা নিয়ে তাঁরা আশ্চর্য হয়েছিলেন কি না জানি না, আমরা অন্তত হইনি। নির্বাচনী প্রচার শুরু হতেই পার্টি ও বামফ্রন্টের পক্ষে যেন সমর্থনের ঢল নামলো। বোঝা গেল একটা মস্ত পরিবর্তন ঘটাতে পশ্চিম বাংলার মানুষ তৈরি। সন্ধ্যাকালীন সভাগুলিতে অকল্পনীয় ভিড়; কোনও সভায় বক্তৃতা করছি, হঠাৎ সমবেত শ্রোতাদের মধ্য থেকে কেউ চেঁচিয়ে বললেন, দু'দিন আগে হাজরা পার্কের ওই মিটিংয়ে যা বলেছিলাম তা যেন এখানে আর একবার বলি, যেন তাঁরাই ঠিক করে দেবেন কী বলবো।

মুখে-মুখে আগে থেকেই জল্পনা চলছিল, বামফ্রন্ট ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি জিতলে জ্যোতি বসু তো মুখ্যমন্ত্রী হবেনই, সেই সঙ্গে অশোক মিত্র অর্থমন্ত্রী। জ্যোতিবাবু এর কাছাকাছি সময়েই কৌতুক করে আমাকে বলেছিলেন : 'আপনার-আমার পোর্টফোলিও তো জনগণই ঠিক করে দিল'। নিয়মশৃঙ্খলায় বাঁধা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, মন্ত্রিসভার তালিকা মঞ্জুর করার অধিকার পলিটব্যুরোর, সুতরাং আগে থেকে না প্রমোদবাবু, না জ্যোতিবাবু, আমাকে কিছু জানালেন। সব ফল বেরিয়ে যাওয়ার পর জ্যোতিবাবু একদিন সকালে ডেকে বললেন, সরকার গঠনের ব্যাপারে ও ভোট অন অ্যাকাউন্ট নিয়ে আলোচনার জন্য বিকেলের দিকে রাজ্যের মুখ্যসচিব ওঁর বাড়িতে আসছেন, আমিও যেন উপস্থিত থাকি। গেলাম। মুখ্যসচিবকে অনেকদিন ধরে চিনি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে কৃতী ছাত্র ছিলেন, যদিও আমার চেয়ে বয়সে অনেকটাই বড়ো। জ্যোতিবাবু বরাবর কম কথার মানুষ, শপথ গ্রহণের আয়োজন সম্পর্কে একটি-দু'টি বিষয় আলোচনার পর

মুখ্যসচিবকে বললেন, 'শপথ নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তো বিধান সভা ডেকে ভোট অন অ্যাকাউন্ট বাজেট পেশ করতে হবে। খুব সম্ভব ডক্টর মিত্রকে আমাদের অর্থমন্ত্রী মনোনীত করা হবে, আপনি বাজেটের বিশদ ব্যাপারগুলি ওঁর সঙ্গে আলোচনা করে নেবেন'। রাজ্য প্রশাসনে আমার হাতেখড়ি ঘটলো।

দু' দিন বাদে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। তারিখটি, একুশে জুন, রাজভবনের প্রাঙ্গণে মস্ত শামিয়ানা খাটানো, তা হলেও মাত্র কয়েকশো জনের জায়গা করা সম্ভব হলো তার তলদেশে। বাইরে জনতার বাঁধভাঙা জোয়ার। একশো চুয়াল্লিশ ধারা উধাও, রাজভবনের উত্তর ও পুব দ্বার থেকে শুরু করে কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট ধরে বিবাদী বাগ-রাইটার্স বিল্ডিং পর্যন্ত উদ্দাম মানুষের ভিড়। আমার বাড়ির লোকেরা আলাদা করে গেলেন, আমি জ্যোতিবাবুর সঙ্গে তাঁর হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ি থেকে। ওই তারিখে মাত্র পাঁচজন মন্ত্রী শপথ বাক্য ও মন্ত্রগুপ্তি উচ্চারণ করলেন : মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি থেকে জ্যোতি বসু, কৃষ্ণপদ ঘোষ ও আমি, ফরোয়ার্ড ব্লকের কানাইলাল ভট্টাচার্য, আর এস পি-র যতীন চক্রবর্তী। যে-চারজন সেদিন জ্যোতিবাবুর সঙ্গে শপথ নিয়েছিলাম, তাঁদের মধ্যে একমাত্র আমিই এখন ধরাধামে আছি।

প্রায় পরমোৎসব অনুষ্ঠান, গাম্ভীর্য ছাপিয়ে স্নেহাংশুবাবুর কলোচ্ছ্বাস, ভদ্রলোক নিজের জন্য নির্দিষ্ট আসনে থোড়াই বসছেন, উঠে দাঁড়িয়ে একবার এদিকে যাচ্ছেন, একবার ওদিকে, হাস্য-বিদ্রূপ-মস্করার বিনিময় এঁর-ওঁর সঙ্গে। আমরা পাঁচজন রাজ্যপালের সঙ্গে মঞ্চে সমাসীন, রাজ্যপাল অ্যান্টনি ডায়াস আমার পুরনো পরিচিত, যখন কৃষিপণ্য মূল্য কমিশনের সভাপতি ছিলাম, উনি তখন কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য সচিব, যথেষ্ট হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। মঞ্চের সামনে বাঁদিকে গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বসে। শান্তশিষ্ট অজয় মুখোপাধ্যায়, গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি পরণে, অতি নিরীহ ভঙ্গিতে বসে আছেন; হঠাৎ নাটকীয়তার সঙ্গে খাঁটি বিলিতি স্যুট-টাইভূষিত হয়ে হাতে ওয়াকিং স্টিক নিয়ে অন্য এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর আবির্ভাব। যেন তিনিই নির্বাচনে জিতেছেন, সোজা মঞ্চে উঠে এলেন। জ্যোতিবাবুর সঙ্গে একটু হাসিঠাট্টা করলেন, তারপর একটু উঁচু গলায় : 'হয়্যার ইজ অশোক মিত্র?' অনিচ্ছাসত্ত্বেও করমর্দন করতে হলো।

শপথগ্রহণ ও চা-চক্র অনুষ্ঠানান্তে কাতারে-কাতারে মানুষ জ্যোতিবাবুর গাড়ি ছেঁকে ধরে, ওরকম স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের ব্যঞ্জনা কচিৎ দেখা যায়, মুখ্যমন্ত্রীকে জনতা প্রায় শোভাযাত্রা করে রাইটার্স বিল্ডিঙে পৌঁছে দিল। ভিড়ের প্রকোপে অনেকেই বিচ্ছিন্ন, কিছু পরে কার যেন গাড়ি চেপে বিমান বসু ও আমি মহাকরণে পৌঁছুলাম। জ্যোতিবাবু দোতলার অলিন্দ থেকে জড়ো-হওয়া সরকারি কর্মচারী ও জনতার উদ্দেশে ভাষণরত : 'আমরা জনতার নির্বাচিত সরকার, জনতার অনুশাসন অনুসারে এই সরকার চলবে, রাইটার্স বিল্ডিঙে বসে নয়, জনতার সঙ্গে মিশে গিয়ে, জনতার নির্দেশে, জনতার প্রেরণায় এই সরকারের প্রতিটি সিদ্ধান্ত নিরূপিত হবে'।

মুখ্যসচিব মন্ত্রীদের স্ব-স্ব ঘর দেখিয়ে দিলেন, একটু বাদে সবাই মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে সমবেত হলাম। মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক, দশ মিনিটের কিংবা তারও কম সময়ের জন্য, দু'টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো, জ্যোতিবাবুর প্রস্তাব অনুযায়ী। প্রথম, সমস্ত রাজবন্দীদের অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তি; দ্বিতীয়, স্নেহাংশুকান্ত আচার্যকে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল হিশেবে মনোনয়ন।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে করিডোরে বেরিয়ে দেখি জনকল্লোল রাইটার্স বিল্ডিঙের দোতলা পর্যন্ত ছুঁয়েছে, অসংখ্য-অগণিত মানুষ, এই দিনটি তাঁদের, জনগণের, তাঁদের আনন্দ ধরে না। চেঁচাচ্ছেন, গাইছেন, নাচছেন, পরস্পরকে ঠেলছেন, হঠাৎ তাকিয়ে দেখি আমার এক নিকটাত্মীয়া জ্যোতিবাবুর বাড়ির লোকদের সঙ্গে পরম নিশ্চিন্তে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন : রাইটার্স বিল্ডিঙে পরিভ্রমণ তাঁর বোধহয় সেদিনই প্রথম ও শেষ।

প্রথম ক'টা দিন নিজের গাড়ি নিজেই চালিয়ে মহাকরণে গেলাম, তবে বুঝতে পারলাম সেটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা সম্ভব নয়, সরকারের গাড়ি বরাদ্দ আছে, চালক বরাদ্দ আছে, নিয়ম ভাঙতে গেলে হরেকরকম সমস্যা। সুতরাং রণে ভঙ্গ দিতে হলো। সপ্তাহ খানেক বাদে বাকি মন্ত্রীরা শপথগ্রহণ করলেন। তার আগে বিধান সভার অস্থায়ী অধ্যক্ষ হিশেবে বিনয়দা, বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করালেন। বিধান সভার প্রথম অধিবেশনও সঙ্গে-সঙ্গে বসলো, মাস শেষ হবার আগে ভোট অন অ্যাকাউন্ট মঞ্জুর করিয়ে নেওয়ার তাড়া। সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লা সর্বসম্মতিক্রমে অধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন। বামফ্রন্টের সদস্যরা বিধানসভা কক্ষের তিন কূল ছাপিয়ে, ক্ষীণাবয়ব জনতা দলগোষ্ঠী, অধিকতর ক্ষীণাবয়ব কংগ্রেস দল। কংগ্রেসের হয়ে বর্ধমান জেলার ভাতার থেকে কোনওক্রমে প্রাক্তন মন্ত্রী ভোলানাথ সেন জিতে এসেছেন। তিনি প্রবেশ করা মাত্র বামফ্রন্টের আসনগুলি থেকে চিৎকৃত উল্লাস : 'ভোলাবাবা পার করেগা'। এই সম্ভাষণ ভোলাবাবু অবশ্য খুশি মনেই নিয়েছিলেন সেদিন।

বামফ্রন্টের সেই প্রথম মন্ত্রিসভায় উল্লেখনীয় বেশ কয়েকজন ছিলেন। তবে অন্য শরিক দলের মন্ত্রীদের মধ্যে অনেকেই একটি বিশেষ সমস্যায় ভুগতেন। তাঁরা মনে-মনে জানতেন তাঁদের মন্ত্রিত্ব প্রধানত মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দলের দ্রুত প্রভাববিস্তারের ফলে, অথচ তা স্বীকার করতে তাঁদের অস্বাচ্ছন্দ্য। তাঁদের কারও-কারও গলা চুলকে ঝগড়া বাধাবার প্রবণতা, নিজেদের দুর্বলতা ঢাকবার জন্য। কিন্তু অতি অমায়িক ছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লকের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শম্ভুচরণ ঘোষ, আস্তে-আস্তে কথা বলতেন, স্মিত হাসির সঙ্গে, কোনওদিন আমার সঙ্গে বাচনিক সংঘাত পর্যন্ত ঘটেনি। সমপরিমাণ শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছি স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলের ননী ভট্টাচার্য সম্পর্কেও : অনুশীলন দলের প্রাচীন সদস্য, অকৃতদার, পার্টি দফতরেই জীবনযাপন, নিজের পার্টির প্রতি অক্ষয় আনুগত্য, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে চাপা বিক্ষোভ, তবে কোনওদিনই তাঁকে শিষ্টাচারের বাইরে যেতে দেখিনি। অন্য দলের মন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন আর সি পি আই-র সুধীন কুমার, কফি হাউসে এক সময় একসঙ্গে প্রচুর আড্ডা দিয়েছি, আমার অনেক বন্ধু তাঁরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু, একদা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্যত্ব করতেন, অতি শৌখিন মানুষ, সংগীত-সাহিত্য-ক্রীড়াতে প্রবল আগ্রহ, ওঁর সঙ্গে আলাপচারী হয়ে সুখ পাওয়া যেত।

দলের মন্ত্রীদের মধ্যে বিনয়দার উপদেশ-পরামর্শের একাধিক উল্লেখ পরে আমাকে করতেই হবে, ইতিমধ্যে অন্য কয়েকজনের কথা বলি। প্রথমেই বলতে হয় তখনই অতি বৃদ্ধ-নিখাদ ভালোমানুষ প্রভাস রায়ের কথা। চব্বিশ পরগনা অঞ্চলে যাঁরা একদা তিল-তিল করে কমিউনিস্ট পার্টি গড়েছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম, তেভাগা আন্দোলনের প্রবাদপুরুষ, বহু বছর কংগ্রেসে ছিলেন, প্রাদেশিক কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ পদেও, তবে তখন থেকেই মনে-প্রাণে মার্কসবাদী, বাইরে থেকে অথচ বোঝবার উপায় ছিল না। পুরনো আমলের কংগ্রেস নেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর খুব কাছের মানুষ ছিলেন প্রভাসদা; প্রায়ই বলতেন,

পোশাকিভাবে যেদিন কংগ্রেস দল ত্যাগ করে প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন, ওঁকে জড়িয়ে ধরে বিপিন গাঙ্গুলী নাকি কেঁদে আক্ষেপ করেছিলেন : 'ওরে, তোরা যদি সবাই চলে গেলি, আমাকে সঙ্গে নিলি না কেন?'

সবচেয়ে বেশি সৌহার্দ্য ছিল বন ও পর্যটন মন্ত্রী পরিমল মিত্রের সঙ্গে। পার্টির প্রতি আনুগত্য ছাড়া বহির্বিচারে তাঁর সঙ্গে আমার কোনওই মিল ছিল না : তেমন বেশি দূর লেখাপড়া করেননি, স্থূলকায়, মাথায় মস্ত টাক, জলপাইগুড়ি জেলায় বহুদিন ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করেছেন, তাঁর পিতৃদেব বোধহয় জলপাইগুড়িতে রেলের স্টেশন মাস্টার ছিলেন, পরিমলবাবু ছাত্রাবস্থা থেকেই কমিউনিস্ট পার্টিতে, প্রথম জীবনে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন সংগঠন করেছেন। মজা করে বলতেন, সেই পর্বে জ্যোতিবাবু অতিশয় হতকুচ্ছিত বক্তৃতা দিতেন। পরিমলবাবু তিরিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলার তরাই অঞ্চলে চা-শ্রমিক আন্দোলনের দায়িত্বে। সি পি আই এম-এর জন্মের প্রথমাবস্থা থেকেই ওই জেলার সামগ্রিক নেতৃত্বে ছিলেন, সুবোধ সেন ও গোবিন্দ কুণ্ডুর সঙ্গে। তিনজনই অল্পতে চটে যেতেন, কিন্তু তিনজনই নিকষ ভালোমানুষ, পার্টি-অন্ত প্রাণ। তিনজনের কেউই বিয়ে করেননি, পার্টিই সংসার। এখন এঁদের মধ্যে একমাত্র গোবিন্দ কুণ্ডুই আছেন, তা-ও অসুস্থ। পরিমলবাবু স্পষ্ট কথা বলতেন, আমার সঙ্গে তাই সহজে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। মন্ত্রী থাকাকালীন রাজ্য জুড়ে বৃক্ষরোপণের যে-উদ্যোগ তিনি নিয়েছিলেন, তার সুফল এখন পশ্চিম বঙ্গের মানুষ ভোগ করছেন।

বেশ কয়েক বছর রাইটার্স বিল্ডিঙে এটা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিকতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আমি সকাল সাড়ে আটটায় মহাকরণে পৌঁছে দু' ঘণ্টার মধ্যে জমা ফাইল দেখা ও অন্যান্য বকেয়া কাজ সেরে নিতাম, সাড়ে দশটা নাগাদ মন্থর গতিতে হেলে-দুলে দরজা ঠেলে পরিমল মিত্রের প্রবেশ, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঢুকতেন সত্যব্রত সেন। সপ্তাহে ছ'টা দিন সকাল সাড়ে দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত ত্রয়ী আমাদের নির্ভেজাল আড্ডা, যার সঙ্গে যুক্ত হতো নানা প্রসঙ্গে মতবিনিময়-প্রতিবিনিময়, চা-কফির সামান্য সমাহার।

প্রশান্ত শূরকেও সমান পছন্দ করতাম, সম্পূর্ণ অন্য কারণে। উদ্বাস্তু আন্দোলনে বহু বছর তিনি সময় উজাড় করে দিয়েছেন, সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের সঙ্গেও একদা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন, পার্টির প্রতি নিঃশেষ অঙ্গীকার। সারাদিন, সারা রাত ধরে অসম্ভব পরিশ্রম করতে পারতেন। তাঁর সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য লড়ে যাওয়ার ক্ষমতা, যে কোনও কাজে একাগ্রতা। তিনিই বোধহয় বামফ্রন্টের একমাত্র মন্ত্রী—পশ্চিম বঙ্গের সমগ্র ইতিহাসেও একমাত্র মন্ত্রী— যিনি মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সমাজবিরোধীদের হাতে নির্দয় ভাবে প্রহৃত হয়েছেন, সেই প্রহারের ফলে তাঁর মুখের আদলে ঈষৎ বিকৃতি ঘটেছিল, এখনও পুরো মিলিয়ে যায়নি। পার্টির স্বার্থ প্রসারিত হলেই হলো, নিজের প্রতিষ্ঠার কথা তিনি কোনওদিন ভাবেননি, কর্তব্যপালনে ভয়ভীতিজড়তাদ্বিধাশূন্য। বিশেষ করে যা মনে পড়ে, তিনি নগরোন্নয়নের দায়িত্বে থাকাকালীন আমরা দু'জন একবার দিল্লিতে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সচিবদের সঙ্গে বৈঠক করতে যাই, বিদ্যাসাগর সেতুর কাজ কিছুতেই কেন এগোচ্ছে না, তা নিয়ে আলোচনা করতে। রাজ্য থেকে হেঁদিপেঁজি মন্ত্রীরা এসেছে, কাজ কেন এগোচ্ছে না, সে-বিষয়ে কেন্দ্রের বড়ো আমলাদের ওজরের অন্ত নেই, একটা কিছু বলে এই গেঁয়ো মন্ত্রীদের যেন বিদায় দিলেই হলো। হঠাৎ প্রশান্তবাবু মেজাজের বিস্ফোরণ ঘটালেন, সচিবব্যাঘ্ররা মুহূর্তের মধ্যে মিনমিনে বেড়াল বনে গেলেন। তারপর থেকে দ্রুত

কাজ এগোলো। যখন বিদ্যাসাগর সেতু সমাপ্ত, সেতুর উদ্বোধন অনুষ্ঠান, প্রশান্তবাবু তখন আর সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রী নন, ওঁকে একটি নিমন্ত্রণপত্র পাঠাতেও কারও মনে পড়লো না, তবে এটাই তো পৃথিবীর নিয়ম।

মহম্মদ আমিন বরাবরই মিতবাক, এমন সাচ্চা মানুষ যে-কোনও সমাজে বিরল। উত্তর প্রদেশ থেকে চটকল কর্মী হিশেবে প্রায় কিশোর বয়সে কাঁকিনাড়া অঞ্চলে এসেছিলেন, সারাটা জীবন পার্টির কাজে তারপর থেকে উৎসর্গিত, তাঁর সঙ্গে মহাকরণে কাজ করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছি। অপেক্ষাকৃত তরুণ মন্ত্রীদের মধ্যে অবশ্যই ভালো লাগতো আইন মন্ত্রী হাসিম আবদুল হালিমকে, চোখে-মুখে বুদ্ধি ও সৌজন্যের ছাপ।

মূল বৃত্তান্ত থেকে কি দূরে সরে যাচ্ছি? আদৌ না, যে-পরিবেশে রাইটার্স বিল্ডিঙে আট-ন' বছর কাজ করেছি, তার একটি পূর্বাভাস দেওয়া প্রয়োজন বলেই আমি মনে করি। তবে আমার তো আরও কিছু কথা বলার আছে মহাকরণে প্রবেশের আদি মুহূর্ত নিয়ে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সমর সেনের সঙ্গে যখন প্রথম দেখা, তিনি সর্বদা অল্প কথার মানুষ, শুধু বললেন, 'অশোকবাবু, মস্ত ভুল করছেন'। আমি নিরুত্তরই রইলাম। অন্য পক্ষে গৌরকিশোর ঘোষের মতো কয়েকজনের মস্ত উৎসাহ, আতোয়ার রহমানেরও। আতোয়ার কোথায়-কোথায় ঢুঁড়ে নির্বাচনের রেস্ত মেটাবার জন্য প্রচুর টাকা তুলে দিলেন। রবি সেনগুপ্ত, অজিত গুপ্ত এবং 'পানীয়ন' আড্ডার পুরো গোষ্ঠী প্রচারে নেমে হিন্দুস্থান পার্ক চষে বেড়ালেন। অরুণকুমার সরকার রাসবিহারী এভিনিউ-র বাসিন্দা, প্রতিবেশীদের অনুরোধে-উপরোধে প্রত্যহ অস্থির করে তুললেন। মজা হলো নরেশ গুহকে নিয়ে। নরেশ সাত্ত্বিক, নৈতিক মানুষ, সত্যেন দত্ত রোডে তাঁর ফ্ল্যাটের ঠিক নিচে ও পাড়ার ভোটকেন্দ্র, নির্বাচনের দিন সকাল থেকে নরেশ দ্বন্দ্বের যন্ত্রণায় বিদীর্ণ, অশোককে তো ভোট না-দিলেই নয়, অথচ ব্যক্তিস্বাধীনতায় প্রত্যয়শীল তিনি, কী করে কাস্তে-হাতুড়ি-তারাতে ছাপ দেবেন? ভোট শেষ হওয়ার আধ ঘণ্টা আগে অরুণকুমার সরকারই বকে-ঝকে ধাক্কা মেরে নরেশকে বুথের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।

তখন পর্যন্ত অর্থনীতিবিদ মহলে আমার তেমন বেশি দুর্নাম রটেনি। তাঁদের মধ্যে কলকাতাস্থ অনেকে আমাকে সমর্থনের আবেদনপত্রে স্বাক্ষরদান করলেন, এমন একজন-দু'জন যাঁরা আমার নাম শুনলে পরে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতেন, তাঁরা পর্যন্ত। একমাত্র আমার মাস্টারমশাই অমিয় দাশগুপ্ত বরাবরই সন্দিহান থেকে গেছেন, তাঁর প্রিয় ছাত্র কোথায় পড়াশুনো করবে, তা নয়, বাজে ধান্দায় মিশে গিয়ে নিজেকে নষ্ট করছে। কিন্তু যে যা-ই বলুক, মহামতি মার্কসের বচন তো মিথ্যে হবার নয়, পরিবেশের ছাপ জীবনধারাকে কিছু-না-কিছু মাত্রায় প্রভাবিত করেই। অমিয়বাবুরা নির্বাচনী প্রচারের তুঙ্গ মুহূর্তে এক সপ্তাহ আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে গেলেন। হই রই রই রই, লোক আসছে-যাচ্ছে, টেলিফোন বাজছে, ভিড়, চেঁচামেচি, কথোপকথন, মিছিল, স্লোগান, উত্তেজনায় মাতোয়ারা : শেষের দিকে অমিয়বাবুও যেন একটু-একটু মজা পেতে শুরু করলেন। অরুণ ঘোষ-ডালিয়া ঘোষের দুই কন্যা, অদিতি-জয়তী, প্রথম জন আই এ এস পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে, দ্বিতীয় জন কেমব্রিজে গবেষণারত, তাঁরাও এসে হাজির, যেন বাড়িতে বিয়ে লেগেছে। অদিতি-জয়তীও প্রচারে নামতে বদ্ধপরিকর। গম্ভীরভাবে তাদের জানালাম, তাদের ট্যাঁস-ঘেষা বাংলা উচ্চারণ নিয়ে যদি তারা আমার জন্য প্রচারে বেরোয়, আমার ভোট বাড়বে না, কমবে। ভেবেচিন্তে তাদের চৌরঙ্গী কেন্দ্রে ঠেলে দেওয়া হলো।

নির্বাচনের ফল বেরোবার পরের দিন সকালবেলা, লঘু মুহূর্ত, নায়িকা অদিতি। কেউ নিঃস্বার্থ আনন্দে অভিনন্দন জানাতে, কেউ আগে-ভাগে খোশামোদের রাস্তা সুগম করতে; অজস্র লোকের ভিড়, টেলিফোন বাজার বিরাম নেই, ঘণ্টায় প্রায় একশো ফোন। একটা সময়ে তিতিবিরক্ত হয়ে অদিতিকে বললাম, 'পরের বার ফোনটা যখন বাজবে, যদি তা তুলে সঙ্গে-সঙ্গে বলতে পারো, দুঃখিত, অশোক মিত্র এইমাত্র মারা গেছেন, সঙ্গে-সঙ্গে তোমাকে প্রতীকী উপঢৌকন হিশেবে দশটা টাকা দেবো'। বাজির অঙ্ক সামান্য, তবে কুছ পরোয়া নেই, অদিতির ভয় কাহারে, দিল্লিস্থ মিরান্ডা হাউসের চালু মেয়ে সে, যে-মুহূর্তে ফোন বেজে উঠলো, কলকাতার এক ডাকসাইটে নাগরিক, 'ডক্টর মিত্রের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?' অদিতির ঝটিতি জবাব, 'না, পারেন না।' ভদ্রলোকের ভ্যাবাচ্যাকা-খাওয়া অবস্থা : 'পারি না?' 'না, পারেন না, কারণ উনি একটু আগে মারা গেছেন।' ভদ্রলোকের অবস্থা ভ্যাবাচ্যাকাতর, 'তা হলে এখন কী হবে?' অদিতি দমবার পাত্রী নয়, 'কী আর হবে, আমাদের হয়তো এই বাড়িটা ছেড়ে দিতে হবে।' ফোন যে-মুহূর্তে নামিয়ে রাখা হলো, আমার পকেট থেকে একটি কড়কড়ে নোট অদিতির হাতের মুঠোয়। শুনতে পেয়ে পরে অবশ্য ডালিয়া তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যাকে প্রচুর বকেছিলেন।

রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ঢোকার প্রথম সপ্তাহে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বাড়িতে বিশাল নৈশাহারের ব্যবস্থা করলেন। মন্ত্রীরা, পার্টির অনেকে, সবাইকে ছাড়িয়ে যথাবিহিত স্নেহাংশুবাবুর ঠাট্টা-মস্করা, আনন্দের প্রহর উপভোগে টইটম্বুর। আরও অনেক জায়গায় সে-সময় নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হয়েছিল, সবচেয়ে তৃপ্তি পেয়েছিলাম 'পানীয়ন' গোষ্ঠীর বন্ধুরা ওই অঞ্চলের বহুপরিচিত প্রবীণ পার্টি-সমর্থক বলবাবুর বাড়িতে যে-আনন্দসন্ধ্যার আয়োজন করেছিলেন, তাতে যোগ দিয়ে। হিন্দুস্থান পার্কের যুবসম্প্রদায়ের অতি প্রিয় ভাইদা-সহ সবাই উপস্থিত, গল্প, আড্ডা, গান, কোলাকুলি, খাওয়াদাওয়া। যাঁরা আমাকে অভিনন্দন জানালেন বিন্দুতম স্বার্থানুসন্ধানের মানসিকতা তাঁদের মধ্যে নেই, বন্ধুর কৃতিত্ব তাঁদেরও কৃতিত্ব, বন্ধুর সাফল্য তাঁদেরই যেন সাফল্য।

সঙ্গে-সঙ্গে ভোট অন অ্যাকাউন্ট নিয়ে ব্যস্ত হতে হলো, হাতে মাত্র কয়েকটা দিন। ভোট অন অ্যাকাউন্টের হিশেব, প্রায় প্রথা দাঁড়িয়ে গেছে সর্বত্র, সামান্য গোঁজামিল দিয়ে, খানিক অনুমানের ভিত্তিতে তৈরি হয়। কোনও নতুন কারিকুরি যোগ করবার সুযোগ তখন আমার ছিল না। তবে রাজপুরুষদের তৈরি মন্ত্রীর ভাষণের খসড়া পাশে সরিয়ে রেখে নিজেই তৈরি করলাম, জ্যোতিবাবুকে একবার দেখিয়ে নিয়ে, উনি খুশি। বিধানসভায় দু'দিনের বিতর্ক হলো, পার-করেগা-ভোলাবাবু আমাকে একটু ঠেসলেন, আমিও তাঁকে নিরাশ করলাম না, জ্যোতিবাবু বলতে উঠে কংগ্রেস দলকে ধুইয়ে দিলেন, তখন বোধহয় তিনি শ্লেষান্বিত ঘৃণা-প্রকাশ শক্তির তুঙ্গে।

অর্থ দফতরের দায়িত্ব, সেই সঙ্গে উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা দফতরেরও। ফাউ হিশেবে আমাকে আবগারি বিভাগও দেখতে হতো। অন্য দুই দফতরের কাজ বুঝে নিতে কোনও অসুবিধা হয়নি, কিন্তু আবগারি দফতরের ফাইল চালাচালি করতে গিয়ে আমার ভয়াবহ অবস্থা। ফাইল আসছে, একটার উপর আর একটা ফাইল জড়ো হচ্ছে, খুলে পড়ে আমি হতভম্ব, ছত্রে-ছত্রে আই এম এফ এল এবং এফ এম এফ এল, কী গূঢ় রহস্য এই শব্দসংকেতে জড়িত তা আমার অজানা, ফাইল তাই নড়ে না। সপ্তাহখানেক বাদে এক গোপন কৌশলে মর্মোদ্ধার হলো, আই এম এফ এল হচ্ছে দেশে তৈরি বিলিতি মদ, ইন্ডিয়া-

মেইড ফরেন লিকার, অন্য পক্ষে এফ এম এফ এল বিদেশে তৈরি বিদেশী মদ, ফরেন-মেইড ফরেন লিকার। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো আমার।

রাইটার্স বিল্ডিং-এ কাজের পরিবেশ নিয়ে বহু বছর ধরে সাতকাহন লেখা হয়েছে, এখনও লেখা হয়। সবিনয়ে নিবেদন করি, কলকাতার সংবাদপত্রাদির সৌজন্যে করণিকরা কর্মবিমুখ, বহুল-প্রচারিত এই অভিযোগ হয়তো আংশিক সত্য, কিন্তু একমাত্র তাঁরা দায়িত্বজ্ঞানহীন, অন্যরা নন, এই দাবি সত্যিই অসার, উঁচু পদের আমলারাও কিছু কম আয়েসি ছিলেন না অতীতে, এখনও নন।

মন্ত্রীদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, তাঁদের মন্ত্রিগিরি বৃহত্তর রাজনৈতিক দায়িত্বের একটি টুকরো মাত্র। তাঁদের ক্ষেত্রে খানিকটা পূর্ব অভিজ্ঞতার অভাবের সমস্যাও থাকে। মহাকরণে কম সময় থেকেও ঝটপট অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব, যদি কোনও অনুশীলন পর্বের মধ্য দিয়ে মন্ত্রীরা এসে থাকেন, তা হলে। ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলে লাভ নেই, বামফ্রন্টের অধিকাংশ মন্ত্রীরই এ ব্যাপারে খানিকটা অসুবিধা ছিল। তবে পশ্চিম বঙ্গের প্রশাসন থেকে কর্মসংস্কৃতি কিছুটা উধাও হওয়ার সবচেয়ে বড়ো কারণ, আমার বিবেচনায়, ঐতিহাসিক। কংগ্রেস দলের দীর্ঘ রাজত্বে বিধান রায় মহাশয়ের অখণ্ড প্রতাপ, তাঁর সঙ্গে অন্যান্য মন্ত্রীদের ব্যক্তিত্বের দুস্তর তফাত। বাকি মন্ত্রীরা প্রায় সকলেই কেঁচো হয়ে থাকতেন, তাঁদের দফতরের কাজকর্ম বেশির ভাগ সময় বিধানবাবুই দেখতেন, তাঁর বিশ্বস্ত একজন-দু'জন সহচর ও রাজপুরুষদের সঙ্গে নিয়ে। ক্রমশ মন্ত্রীরা কাজ করার অভ্যাসটি ভুলে গেলেন, অধিকাংশ আমলারাও তাই। করণিকদের কাছ থেকে অন্যরকম আশা করা অর্থহীন। সেই বিশেষ ঐতিহ্য, আমার সন্দেহ, এখনও বহমান। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ঢোকার এক বছর-দু'বছর পরেও দেখেছি কোনও-কোনও বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত বড়ো সচিব ধীরে-সুস্থে এগারোটা-সাড়ে এগারোটা নাগাদ দফতরে ঢুকছেন, দেড়টা-পৌনে দুটোয় দ্বিপ্রাহরিক আহারের জন্য নির্গত হচ্ছেন, সওয়া তিনটে-সাড়ে তিনটে নাগাদ প্রত্যাবর্তন করছেন, সাড়ে চারটে বাজতে-না-বাজতে কোনও মিটিং-এর ছুতো করে দিনের মতো দফতর থেকে বিদায় নিচ্ছেন। এঁদের সম্পর্কে খবরের কাগজে আদৌ লেখালেখি হতো না, হয় না, মন্ত্রীদের সম্পর্কে হয়, আর করণিকরা তো সর্বদোষে দুষ্ট!

তা হলেও বলি, দীর্ঘসূত্রিতার এই এলিয়ে-দেওয়া ঐতিহ্যের শিকার হওয়া বামপন্থীদের পক্ষে গ্লানিকর। আমার ব্যক্তিগত অভিমত, বামফ্রন্ট থেকে যদি প্রথম থেকেই কড়া হাতে হাল ধরা হতো, অবস্থার আদ্যন্ত রকমফের তখনই সহজে ঘটানো যেত। ফ্রন্টের পক্ষে অভাবনীয় বিপুল জনসমর্থন, আমলাতন্ত্র ভয়ে কাঁপছে, মাঝখানে দুই দফায় এক বছর-দু'বছর বাদ দিয়ে আটাশ বছরের মৌরসিপাট্টা এবার ভাঙবে, এই আশঙ্কায় রাজপুরুষরা ঘোর উদ্বিগ্ন, তাঁদের প্রাথমিক আচরণে সেই উদ্বেগের ছায়া স্পষ্ট। কিন্তু সুযোগটি বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে ব্যবহার করা হলো না। মন্ত্রীরা প্রায় কংগ্রেসি কায়দায় যাওয়া-আসা শুরু করলেন, আমলারাও দু'দিনের মধ্যে বুঝে নিলেন চিন্তার কারণ নেই, এই মন্ত্রীদেরও বশে আনা যাবে, এবং যেমন করে তিন দশক দিন গেছে তেমনই ভবিষ্যতেও কাটানো যাবে। আমাকে বস্তুনিষ্ঠ হতেই হবে, অধিকাংশ দক্ষিণী আই এ এস অফিসাররা মন দিয়ে এবং পরিশ্রম করে কাজ করতেন, তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ এমনকি বাংলাতেও ফাইলে মন্তব্য লিখতেন। অন্য পক্ষে—সম্মানীয় ব্যতিক্রম নেই তা একেবারেই বলছি না—বাঙালি রাজপুরুষদের অনেকের মধ্যে কাজ ফেলে রাখার প্রবণতা একটু বেশি লক্ষ্য

করেছি : ঈষৎ আলস্যপরায়ণ, তার উপর একজন-দু'জন হয় নাস্তিক, নয় সবজান্তা, তাঁদের কাজ শেখাতে গেলেও তাঁরা মনঃসংযোগ করবেন না, অধস্তন কর্মচারীদের গাল পাড়া তো অতি সোজা। ভরসার কথা, একেবারে হালের প্রজন্মের বাঙালি রাজপুরুষদের মধ্যে অন্য ধরনের মানসিকতা চোখে পড়ছে, তাঁরা অনেক বেশি চলবলে।

অন্য একটি বিষয়ও উল্লেখ করতে হয়। একজন-দু'জন শরিকি মন্ত্রীদের মধ্যে যেমন, মুখ্য রাজপুরুষদের মধ্যেও বেশ কয়েকজন খবরের কাগজে রোজ তাঁদের নাম ছাপা হোক তা পছন্দ করতেন, সাংবাদিকদের হাতে তাঁদের খুশি রাখবার উপকরণ, বিনিময়ে সরকারের গোপন খবর তাঁদের মারফত পাওয়া সহজ। পুলিশের বড়ো আমলাদেরও সেই একই দুর্বলতা। পুলিশের রাম-শ্যাম-যদুও প্রতিদিন সংবাদপত্রে খবরের অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকতেন : বিধানবাবুর আমল থেকেই, কিংবা হয়তো ইংরেজ আমল থেকেই, এই সংস্কৃতির প্রবহমানতা। কবি নন, অধ্যাপক নন, সংস্কৃতিবান কেউই নন, কলকাতার অভিজাতমহল মানেই আমলা ও পুলিস সাহেবরা। ভারতবর্ষের অন্য কোথাও এবংবিধ কলাকৃতি ঠিক চোখে পড়ে না।

যা বলছিলাম, বামফ্রন্টের বিপুল জনসমর্থন, জ্যোতিবাবুর অসামান্য ব্যক্তিত্ব, আমলার দল ত্রাসে-ভয়ে সেই প্রথম এক মাস-দু'মাস কম্পমান, তখন ইচ্ছা করলেই প্রশাসনের চেহারা খোলনল্‌চে পাল্টে দেওয়া সম্ভব হতো, অন্তত আমার তাই তখন ধারণা ছিল, এখনও সেই ধারণা থেকে খুব বেশি সরে আসিনি। অথচ হলো অন্যরকম। বামপন্থী মন্ত্রীরাও বাঁধা-ধরা ছকে ধরা পড়ে গেলেন। একজন সতীর্থ মন্ত্রী, সারা জীবন শ্রমিক আন্দোলন করেছেন, শ্রমের মর্যাদা তো তাঁকে কেউ শেখাতে পারবে না, অথচ একদিন চোখে পড়লো, মন্ত্রিসভার বৈঠকে যোগ দিতে সেই মন্ত্রী করিডোর দিয়ে এগোচ্ছেন, সঙ্গে বেয়ারার হাতে এক চিলতে ফাইল, তাঁকে বোধহয় বোঝানো হয়েছে নিজের হাতে ফাইল বইলে মন্ত্রীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে বাধ্য।

ছাব্বিশ

গত পঁচিশ বছরে পশ্চিম বাংলার সামগ্রিক রাজনৈতিক-সামাজিক কাঠামোয়, সবাই মানুন না মানুন, অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে; জ্যোতিবাবুর ব্যক্তিত্ব তথা নেতৃত্বের মহীরুহপ্রতিম উপস্থিতি ব্যতীত তা অসম্ভব ছিল। আরও যা হতে পারতো তা কেন পুরোপুরি হলো না, আমার কাছে তার দু'টি ব্যাখ্যা আছে, উভয় ব্যাখ্যার সঙ্গেই অথচ জ্যোতিবাবুর অভিজ্ঞতাসঞ্জাত বিবেচনা জড়ানো। লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' বইটি জ্যোতিবাবু আদ্যোপান্ত পড়েছেন, মার্কসীয় ধ্রুপদী সাহিত্যের আরণ্যক ভিড়ের মধ্যে এই গ্রন্থখানার কথাই তিনি বহুবার উল্লেখ করেছেন। অথচ যা ঈষৎ হেঁয়ালি, রাজপুরুষদের স্বভাবচরিত্র বিচারে লেনিনের মন্তব্য অনেকটা পাশ কাটিয়ে জ্যোতিবাবু এ ব্যাপারে খাঁটি বৃটিশ ধাঁচের উদারনৈতিক। আমলাদের আলাদা কোনও পছন্দ বা প্রবণতার কথা আমল দিতে বরাবরই তাঁর ঈষৎ অনীহা; মন্ত্রীরা যে-নির্দেশ দেবেন, রাজপুরুষ সম্প্রদায় তা পুত্তলিকাবৎ মেনে নিয়ে পালন করবেন, এটাই যেন তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস, এখনও তিনি সম্ভবত সেই বিশ্বাসে অটল আছেন। তাই ১৯০৭ সালের নির্বাচনে অভূতপূর্ব জনসমর্থন সত্ত্বেও প্রশাসনিক সংস্কার নিয়ে মাথা ঘামাতে তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না; আমরা-যা-বলবো-ওরা-তাই-শুনবে গোছের মানসিকতায় তিনি অবিচল।

দ্বিতীয় কারণ আর-একটু জটিল; কেউ যদি বলেন তা আমার মানসকল্পিত, তর্কে নামবো না। হয়তো জ্যোতিবাবু মনে-মনে ভেবেছিলেন, দুই যুক্তফ্রন্টের সময়কালে হরেকৃষ্ণ কোঙার গ্রামাঞ্চলে ভূমিবিন্যাস পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটু যেন বেশি দ্রুত এগিয়ে গিয়েছিলেন, যার পরিণাম সর্ব অর্থে দলের পক্ষে শুভফলপ্রসূ হয়নি। যাঁরা ভূমিচ্যুত হলেন তাঁরা ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন, সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ মুখর হয়ে উঠলো, এমনকি যাঁরা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির দিকে সহানুভূতি-আপ্লুত হয়ে এগোচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও কেউ-কেউ সাময়িকভাবে পিছিয়ে গেলেন, সব মিলিয়ে মহাকরণে সর্বাত্মক আধিপত্য স্থাপনের ক্ষেত্রে দলকে প্রায় দশ বছর আরও অপেক্ষা করতে হলো। দ্বিতীয়বার সেরকম ভুল করতে জ্যোতিবাবু, আমার ধারণা, রাজি ছিলেন না, তাঁর প্রতিজ্ঞা চুলচেরা বিচার করে প্রতিটি সিদ্ধান্ত নেওয়া, হঠকারিতায় ভীরু দ্বার ভেঙে দেওয়ার দঙ্গলে তিনি নেই। প্রশাসনে শ্লথতা আছে তো কী আর করা যাবে, আপাতত তা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই : উপর মহলের আমলাদের মন থেকে বামফ্রন্ট সম্বন্ধে সন্দেহ-দ্বিধা সর্বাগ্রে দূর করতে হবে। এই সতর্কতা জ্যোতিবাবু অনেক ক্ষেত্রেই আকারে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত করছিলেন সেই সময়।

এমন নয় যে সমস্যার আকীর্ণতা সম্পর্কে তিনি আদৌ ভিন্ন মত পোষণ করতেন, বরঞ্চ তাঁর বিশ্লেষণক্ষমতা ও দূরদর্শিতাবোধ অন্য অনেককে ছাড়িয়ে। সাতাত্তর সালে বামফ্রন্ট সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্ববর্তী দীর্ঘ পনেরো বছর জুড়ে পশ্চিম বাংলায় বিদ্যুৎ

উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আদৌ কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। উনসত্তর সালে, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের স্বল্পকালীন ঋতুতে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কাতর আবেদন পাঠানো হয়েছিল প্রধান মন্ত্রী তথা যোজনা কমিশনের সভানেত্রীর কাছে। ইন্দিরা গান্ধি অল্প কথায় জবাব দিয়েছিলেন, পশ্চিম বাংলার চিন্তার কারণ নেই, রাজ্যে বিদ্যুৎ ঘাটতি দেখা দিলে, দেশের অন্যত্র-উৎপাদিত বিদ্যুৎ থেকে তা পূরণ করা হবে। প্রতিশ্রুতিই সার : বছরের পর বছর, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কলকাতায়, মফঃস্বলে, নিকষ অন্ধকারের রাজত্ব। সাতাত্তর সালে সরকারে প্রবেশের পর প্রথম কয়েক মাস, জ্যোতিবাবু হয়তো কোনও সভা করতে হুগলি বা হাওড়া বা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় গিয়েছিলেন, সন্ধ্যা একটু গাঢ় হলে ফেরার পথে মাঝে-মাঝে খানিকক্ষণের জন্য আমাদের ফ্ল্যাটে বসে যেতেন, সখেদে, চিন্তায় আকুল হয়ে বলতেন : 'কুড়ি-পঁচিশ মাইল এলাম, পুরোটা অন্ধকার।' ওরই কাছাকাছি সময়ে এক অপরাহ্ণে দিল্লির হাওয়াই আড্ডার সুসজ্জিত অপেক্ষাকক্ষে দু'জনে বসে আছি, কলকাতার বিমান ধরবো, হঠাৎ তিনি মুচকি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : 'এই যে বিরাট আরামের মধ্যে এই ঘরে আমরা দু'জন ডুবে আছি, ভাবুন তো একবার, কল্পনা করুন আপনি বামফ্রন্টের মন্ত্রী নন, কংগ্রেসের মন্ত্রী; তাহলে রাজ্যে কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, লক্ষ-লক্ষ বেকার, এত বিদ্যুৎসংকট, এত দারিদ্র্য-বুভুক্ষা, এ সমস্ত কোনও কিছু নিয়েই আপনাকে চিন্তা করতে হতো না'।

বিদ্যুৎসংকট নিয়ে অত ভাবিত ছিলেন বলেই জ্যোতিবাবু সংশ্লিষ্ট দফতরটি নিজের হাতে রাখা সাব্যস্ত করেছিলেন, তেমন পরামর্শ বোধহয় ওঁর আশেপাশে স্থিত শুভানুধ্যায়ীদের দেওয়া। সিদ্ধান্তটি মনে হয় যথার্থ ছিল না। মুখ্যমন্ত্রীর হাজার রকম দায়িত্ব, কাতারে-কাতারে মানুষজন আসছেন, তাঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, প্রশাসনের সার্বিক দায়ভার, আইনশৃঙ্খলা ও পুলিশি ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান, তার উপর দলের অন্যতম প্রধান নেতা হিশেবে আরও অগণিত কর্তব্য; এই অবস্থায় বিদ্যুৎ দফতরের বাড়তি চাপ ঠিক বাঞ্ছনীয় ছিল না। অনেক বছর ধরে রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতার প্রসার অবরুদ্ধ, কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ও রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ডের মধ্যে সুষ্ঠু বোঝাপড়া স্থাপনের প্রশ্ন, মফঃস্বল ও গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎপ্রবাহ বিস্তারের অগুনতি সমস্যা, বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য অর্থ বরাদ্দ যথাযথ হলো কিনা সেদিকে নজর রাখা, বিদ্যুৎশিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিককুলের প্রত্যাশা পূরণের সমস্যা : কোনও-কিছুই হেলাফেলা করবার ব্যাপার নয়, মুখ্যমন্ত্রীকে সে সমস্ত কিছুর সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের আবদার জানানো অসমীচীন। একটু দেরিতে হলেও জ্যোতিবাবু সম্ভবত তা বুঝতে পেরেছিলেন। বিরাশি সালে ফের নির্বাচনে জিতে যখন নতুন বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হলো, বিদ্যুৎ দফতরের দায়িত্ব আলাদা করে পাখি—প্রবীর—সেনগুপ্তকে দেওয়া হলো। পাখি সেনগুপ্ত এখন প্রয়াত, তাঁর নাম অনেকেরই ভুলে যাওয়ার উপক্রম। কিন্তু যে ক'বছর পাখি বিদ্যুৎ দফতরের দায়িত্বে ছিলেন, প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন, গোঁড়া কমিউনিস্টের মতো আগাপাশতলা গোঁয়ার, অধ্যবসায় ও দৃঢ়চিত্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তিনি—এবং পরে শঙ্কর সেন—বিদ্যুৎ উৎপাদনে চমকপ্রদ উন্নতি ঘটিয়েছিলেন, সেই হেতুই পশ্চিম বাংলায় সামগ্রিক বিদ্যুৎ পরিস্থিতি ভারতবর্ষের প্রায় অন্য যে কোনও অঞ্চলের চেয়ে এখন ঢের, ঢের ভাল।

সাতাত্তর সালে প্রত্যাবর্তন করি। ভোট অন অ্যাকাউন্টের পর বছরের পাকা বাজেট তৈরির দিকে মনঃসংযোগ করতে হলো। বিভাগীয় সচিবদের সঙ্গে আলাদা করে কথা

বললাম, মন্ত্রীদের সঙ্গেও। তখনও বিদেশী ভাষায় যাকে বলা হয় মধুচন্দ্রিমা মুহূর্ত, তার যবনিকা পড়েনি, কোনওদিক থেকেই বরাদ্দ নির্ধারণের ক্ষেত্রে তেমন অসুবিধা দেখা দিল না। দিল্লি গিয়ে যোজনা কমিশনের সঙ্গে ঝুলোঝুলি করে রাজ্যের বার্ষিক পরিকল্পনার আয়তনও অনেকটা বাড়িয়ে নিয়ে এলাম। বৃত্তিতে আমার সতীর্থ, যদিও বয়সে অনেকটা বড়ো, অধ্যাপক লাকড়াওয়ালা কমিশনের কার্যকরী সভাপতি, অন্য অনেকেই চেনা-জানা, একজন অর্থনীতিবিদকে পশ্চিম বাংলায় অর্থ বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সবাই বেশ খুশি, ঝড়ঝাপ্টার মরশুম তখনও অনাগত।

বরাদ্দ বাড়ালেই তো হয় না, প্রধান কাজ সরকারের উপার্জন বাড়ানো। স্বাধীনতার পর থেকেই রাজ্যে ঢিলেঢালা প্রশাসন, গা-ছাড়া ভাব। প্রথম বার, যখন দিল্লিতে পরিকল্পনা-বরাদ্দ নিয়ে বৈঠক করতে যাই, কলকাতায় দফতরের এক উপসচিব, মনে করলেন খুশি করবার মতো রসিকতা করছেন, বললেন : 'স্যার, দিল্লি থেকে পরিকল্পনা-বরাদ্দ দয়া করে বেশি বাড়িয়ে আনবেন না, বরাদ্দ বাড়লেই আমাদের বেশি খাটতে হবে'। আমাদের যুদ্ধ তো এ ধরনের মানসিকতা-সংস্কৃতি-আচরণের বিরুদ্ধে। সংবিধানের নিগড়ে বাঁধা আমরা, বাজার থেকে যত টাকা ঋণপত্র ছেড়ে কেন্দ্রীয় সরকার সংগ্রহ করে, তার এক-দশমাংশও তিরিশটি রাজ্য মিলিয়ে পায় না। আবগারি বাদ দিয়ে অন্য সবরকম উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে অন্তঃশুল্ক আরোপের অধিকার কেন্দ্রের এক্তিয়ারে। আয়করের নিয়মকলা নিরূপণ করে কেন্দ্র; অন্তঃশুল্ক ও আয়কর থেকে সংগৃহীত রাজস্বের একটি অংশ যদিও রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়, কী হারে কর বসবে তা স্থির করে নতুন দিল্লির সরকার। কোম্পানির উপর কর, আমদানি ও রপ্তানির উপর কর, দুই-ই কেন্দ্রের আওতাভুক্ত। রাজ্যগুলির সাংবিধানিক অধিকার প্রধানত ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর বসানোয়, সেই সঙ্গে আমোদপ্রমোদের উপর কর, এমনধারা আরও অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ একটি-দু'টি করপ্রয়োগের দায়িত্ব। যদিও তাদের কৃষি কর বসানোর অধিকার আছে, বৃটিশ শাসনের নির্দয় শোষণের অধ্যায় স্মরণ করে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে একেবারে গোড়া থেকেই কৃষিভূমির উপর রাজস্ব অনেকটাই হ্রাস করে দেওয়া হয়েছিল, সেই ধারা অব্যাহত।

কোনওদিনই অপ্রিয়ভাজন হতে আমার অসুবিধা নেই, প্রথম থেকেই রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধির কর্তব্যে একাগ্রচিত্ত হলাম। প্রথমে বেছে নিলাম বিক্রয় করের চৌহদ্দি; সেই সঙ্গে দিশি-বিদেশী মদ ও গাঁজার উপরও বাড়তি রাজস্ব চাপানো হলো। কৃষি করের সমস্যাটি রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর; জমিদার-জোতদারদের উপরই শুধু চাপ পড়বে, ছোটো চাষী-ভাগচাষীদের উপর পীড়ন কম হবে কিম্বা আদৌ হবে না, এরকম ব্যবস্থা গ্রহণ তত সহজ নয়, হাজার-হাজার গ্রাম থেকে এই রাজস্ব সংগ্রহে নানা কার্যকরী সমস্যাও থাকে। এসব সমস্যা নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছে ইকবাল গুলাটি, তাকে আমন্ত্রণ করে কলকাতায় নিয়ে এলাম, প্রমোদ দাশগুপ্ত ও জ্যোতিবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলাম, গুলাটি তার মতো করে কৃষিকর ও ভূমিরাজস্বের সংগ্রহসম্ভাবনা ও প্রশাসনগত খুঁটিনাটি তাদের বুঝিয়ে বললো। যে ক'বছর অর্থমন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলাম, বার্ষিক বাজেটের আগে বুদ্ধিপরামর্শের জন্য ইকবাল গুলাটিকে ডেকে পাঠাতাম, ওটা প্রায় রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি এম জি কুট্টি-কেও। কুট্টি আই এ এস অফিসার, যদিও তথাকথিত সিনিয়ারিটিতে একটু পিছিয়ে ছিলেন, তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও

পরিশ্রমক্ষমতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁকে অর্থসচিব পদে নিয়োগ করা হলো। সাতাত্তর সাল থেকে ছিয়াশি সাল, মোটামুটি এই দীর্ঘ সময়, শেষ দিকটা বাদ দিয়ে, কুট্টি অর্থবিভাগের প্রশাসনিক দায়িত্বে থেকে আমাকে সাহায্য করেছেন। মন্ত্রীকে যথাযথ সম্মান দিতে তাঁর দিক থেকে কোনও ত্রুটি ছিল না, তা সত্ত্বেও আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ক্রমে-ক্রমে বন্ধুত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল, তাঁর অকালপ্রয়াণে মর্মন্তুদ আঘাত পেয়েছিলাম। আমার মেয়াদের শেষ দেড় বছর-দুই বছর যিনি অর্থসচিব ছিলেন, প্রদ্যোৎ সরকার, স্থিতধী মানুষ, তাঁর কাছ থেকেও অঢেল সাহায্য পেয়েছি।

এক ধরনের বোঝাপড়ার মতো হয়ে গিয়েছিল জ্যোতিবাবুর সঙ্গে। অর্থমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রককে কেউই বিশেষ পছন্দ করেন না, পৃথিবীর ইতিহাসে জনপ্রিয় অর্থমন্ত্রী বিরল জীব। যে-কোনও দেশেই অর্থমন্ত্রী সাধারণত কয়েক বছরের বেশি টেকেন না, আমাদের দেশেও তার তেমন ব্যতিক্রম ঘটেনি। জ্যোতিবাবুকে বললাম, অর্থমন্ত্রীকে গালমন্দ দিলে ক্ষতি নেই, মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রে অবশ্য অন্য কথা ; অন্যায় বা অযৌক্তিক উপরোধ-অনুরোধ এলে আমি প্রত্যাখ্যান করবো, পরে বৃহত্তর স্বার্থে তাদের একটি-দু'টি যদি মঞ্জুর করতে হয়, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তা করবেন। অন্য একটি কথাও এই সুযোগে যোগ করা কর্তব্য মনে করছি। রাইটার্স বিল্ডিঙে ঢোকার কয়েকদিনের মধ্যেই জ্যোতিবাবু আমাকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আমার নাম করে চেনা-জানা, কিংবা সম্পূর্ণ অচেনা যে-কেউই যদি আপনার কাছে কোনও দরবার করেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেই আবদার বাতিল করে দেবেন।'

মহাকরণে মনঃসংযোগ সহকারে কাজ করার অসুবিধা দেখা দিল অন্য দিক থেকে। উদাহরণ-সহ বোঝাচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে বাজেটের কোনও জটিল সমস্যা নিয়ে নিভৃতে হয়তো কথা বলছি, এমন সময় ঝড়ের মতো দরজা ঠেলে জনৈক মন্ত্রীর প্রবেশ, তিনি এক শরিক দলের, বাজারে কোনওদিনই তাঁর ঠিক সুনাম নেই, তাঁর দলেও নেই, কিন্তু অনেক বছর ধরে জ্যোতিবাবুর কাছে প্রশ্রয় পেয়ে এসেছেন, জনশ্রুতি, মন্ত্রীর পদ অপব্যবহার করে তিনি প্রচুর টাকা তুলছেন, খানিকটা ভাগ নিজের দলকে দিচ্ছেন, দলও তাই তেমন অখুশি নয়। মন্ত্রীপ্রবর ঢুকলেন, সঙ্গে খেলার জগতের এক চাঁই, সর্বযুগের সর্বোত্তম ফুটবল খেলোয়াড় নাকি কলকাতায় আসছেন, তাঁকে কী-কী রাজকীয় সম্বর্ধনা দেওয়া যায় তা নিয়ে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় ইচ্ছুক, বাজেটের জটিল সমস্যা নিয়ে আমার সঙ্গোপন প্রশ্নাবলী শিকেয় তোলা থাক। কে জানে, আমার এ ধরনের অসন্তোষ-অভিযোগই সম্ভবত বাড়াবাড়ি। রাজনীতির প্রাঙ্গণে যাঁরা দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন, লঘু ও গুরুর মধ্যে মিহিন পার্থক্য টানতে তাঁদের নানা ব্যবহারিক অসুবিধা; আমার কাছে যা দৃষ্টিকটু, তাঁদের কাছে তা স্বাভাবিক। গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বৈঠকে বসেও দেখেছি, আধঘণ্টা আলোচনা হয়েছে কি হয়নি, হঠাৎ বিভিন্ন দিক থেকে শোর উঠলো : 'চা কোথায়, মিষ্টি কোথায়!' শুধু শরিক দলের ওই মন্ত্রীকে একা বাণবিদ্ধ করে লাভ নেই, ব্যাধিটি প্রায় সর্বব্যাপী। তবে ওই ভদ্রলোক সম্বন্ধে এটুকু অন্তত বলা চলে, তিনি ছিলেন ঊর্ধ্বহিতাহিত, ন্যায় ও অন্যায়, ভালো ও মন্দ, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে প্রভেদ টানতে পারতেন না। একেবারে হালে আরও একজন-দু'জন মন্ত্রীকে দেখেছি, বাম ফ্রন্টের প্রধান দলের মধ্যেও দেখেছি, যাঁরাও এই বিভক্তিকরণে সম্পূর্ণ অপারগ।

ফ্রন্ট সরকারের প্রথম পর্বে অপর এক অভিজ্ঞতার কথাও বলি। কোনও বিষয়ে মন্ত্রীদের মধ্যে আলোচনা চলছে, মুখ্যমন্ত্রীও উপস্থিত, খেলার মাঠে বা অন্য কোথাও ভি আই পি

ব্লকের কথা উঠলো, সবিনয়ে বললাম, আমাদের সরকার বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী, সাম্যবাদে বিশ্বাসী, ভি আই পি-নামা এই কলোনিয়াল বস্তুটি এবার তুলে দেওয়া যাক, জনসাধারণ তা পছন্দ করবেন, আদর্শের প্রতি আমাদের আস্থাশীলতারও আমরা প্রমাণ দাখিল করতে পারবো। যেন মৌচাকে ঢিল পড়লো, বেশ কয়েকজন মন্ত্রী আমার আহাম্মকির নিন্দায় মুখর হলেন। সবচেয়ে উচ্চ বজ্রনিনাদ এক শরিক দলের মন্ত্রীর, বাজারে তখন তাঁর ঘোর বিপ্লবী—প্রায়-নকশাল— বলে পরিচিতি। আমার নটে গাছটি মুড়োলো, ভি আই পি-উপাসনা গত পঁচিশ বছরে তো বহুগুণ প্রসারিততরই হয়েছে।

সমান খারাপ লাগতো মন্ত্রীদের আলো জ্বালিয়ে, ভেঁপু বাজিয়ে, রক্ষী-পরিবৃত হয়ে গাড়িতে পরিভ্রমণ। যে ক'বছর মহাকরণে ছিলাম, দায়ে না পড়লে গাড়ির চালককে কোনওদিনই আলো জ্বালাতে বা ভেঁপু বাজাতে দিইনি, আর রক্ষী তো আমার কোনওকালেই ছিল না ; একমাত্র 'সঞ্চয়িতা' পর্বে— যে-কাহিনীতে পরে আসছি— প্রমোদবাবু গাড়িতে রক্ষী নেওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তবে সেই নির্দেশ ছ'মাসের বেশি পালন করিনি, ততদিনে ওই বিশেষ উপদ্রবটিও থিতিয়ে এসেছিল।

একমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রে নিয়মের কড়াকড়ি বুঝতে পারি, অন্য মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে আলো বা ভেঁপুর প্রয়োজন আদৌ আছে বলে এখনও মনে হয় না। হিশেব করে দেখেছি, কলকাতার রাস্তায় পাঁচ মাইল অতিক্রম করতে গেলে আলো বা ভেঁপুর প্রয়োগ না করলে বড়ো জোর পাঁচ মিনিট বাড়তি সময় লাগে গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে, সেটা এমন কিছু গুরুতর ক্ষতি নয়, পাঁচ মিনিট আগে বেরোলেই তো হয়। সম্প্রতি এক মন্ত্রীর কথা শুনতে পাই, তিনি প্রাতঃভ্রমণে বেরোন, সামনে দুই কনস্টেবল, পিছনে আরও দুই। যা আরও মারাত্মক কথা, মন্ত্রী মশাই বেড়ানোর ফাঁকে-ফাঁকে মাঝে-মাঝে থেমে গিয়ে একটু ডন-বৈঠক করেন, তখন নাকি ওই চার কনস্টেবলও তাঁকে অনুসরণ করে ডন-বৈঠকে ব্যাপৃত হন। ওয়াজেদ আলি সাহেব সাধে কি আর লিখেছিলেন, অনাদি অনন্ত ভারতবর্ষ, ঐতিহ্যের উপসংহার নেই।

এখন অবশ্য ধুয়ো উঠেছে মন্ত্রীরা সন্ত্রাসের শিকার হতে পারেন, অতএব সুরক্ষা চাই। আমার সারা অন্তঃকরণ জুড়ে আপত্তি : যদি জনগণের মন্ত্রী বলে নিজেদের দাবি করি, প্রহরার ঘেরাটোপ সম্পর্কে বিতৃষ্ণার ভাব পোষণ করাই তো স্বাভাবিক; যদি তার অন্যথা ঘটে, তা হলে বৃথাই জনগণের সঙ্গে মাছের মতো মিশে যাওয়ার অঙ্গীকার। তবে, ধরেই নিচ্ছি, আমার সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন না।

ওই কয় বছর জ্যোতিবাবুকে খুব কাছে থেকে দেখেছিলাম বলে একটি-দু'টি অন্য প্রসঙ্গও উত্থাপন করতে চাইছি। জননেতা হিশেবে তাঁর এন্তার বক্তৃতা বহুদিন ধরে শুনেছি, কাটা-কাটা অর্ধসমাপ্ত বাক্য, শ্লেষের ফুলঝুড়ি, অন্যকে হাসান, নিজে কখনও হাসেন না, অথচ সব মিলিয়ে পুরো ভাষণে যুক্তির গ্রন্থন আবিষ্কারান্তে তৃপ্ত হতেই হয়। মহাকরণের অলিন্দে ওঁর বলার আদল একটু অন্যরকম, তা সে বাংলাতেই হোক বা ইংরেজিতে। শ্লেষ-বিদ্রূপের লেশমাত্র নেই, যে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে তার নির্যাসটুকু স্বচ্ছন্দ বাক্যবন্ধে তুলে আনছেন, তাঁর এই অনায়াসসাচ্ছল্য প্রতিবার মস্ত বিস্ময়জনক বলে ঠেকতো। আলোচ্য বিষয় নিয়ে হয়তো তাঁর কোনও পূর্বচর্চা নেই, কিছুই যায় আসে না তাতে। অর্থনীতি-সংক্রান্ত বিষয় হোক, কিম্বা সেচের প্রসঙ্গ, জল নিকাশের বা রাস্তা তৈরির ব্যাপার, তিনি সঙ্গে-সঙ্গে সমস্যার গভীরে চলে যেতে পারেন, যা আমার কাছে অন্তত বারবার প্রমাণ করতো, সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের বাইরে বিশেষ বিষয়াশ্রিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন তেমন জরুরি নয়, অন্তত

ফলিত রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে, কেন্দ্রে এবং অন্যান্য রাজ্যে, বিভিন্ন দলের অনেক রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে, জ্যোতিবাবুর তুল্য বুদ্ধির প্রাখর্য কারও মধ্যেই তেমন লক্ষ্য করিনি; ব্যতিক্রম, অনেকে হয়তো শুনে একটু অবাক হবেন, মধ্য-পর্যায়ের ইন্দিরা গান্ধি ও জগজীবন রাম, মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে রাজস্থানের মোহনলাল সুখাড়িয়া।

অনেক বিষয়ে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে মতে মিলতো, অনেক বিষয়ে মিলতোও না। ওঁর প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা-প্রদর্শনে আমার দিক থেকে কোনওদিন ব্যত্যয় ঘটেনি, তা হলেও যখন মতদ্বৈধতা প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে হয়েছে, করেছি, তর্ক করেছি, ফাইলে কড়া নোটও পাঠিয়েছি কখনও-কখনও। কিন্তু যে-ক্ষেত্রে, যে-কারণেই হোক, বিশদ আলোচনায় তিনি অনাগ্রহী, খানিক দূর গিয়ে আর এগোনো সম্ভব হতো না। তথাচ বলি, আমার চেয়ে বয়সে তেরো-চোদ্দ বছরের বড়ো, তবু ব্যক্তি হিশেবে আমাকে সম্ভ্রম জানাতে কদাপি তাঁর বিন্দুতম ত্রুটি ঘটেনি। একটি বিশেষ ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির দুস্তর ব্যবধানের জন্য ছিয়াশি সালের জানুয়ারি মাসে মহাকরণ ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসে থাকা যখন মনস্থ করলাম, তারপরও কিন্তু পারস্পরিক শ্রদ্ধানিবেদনে বিচ্যুতি ঘটেনি, একদিনের জন্যও না।

তার মানে এই নয় যে জ্যোতিবাবু আমাকে ছেড়ে কথা কইতেন। একদিনের কথা মনে পড়ে : দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক, কী একটা সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য আমাকে ডাকা হয়েছে, জ্যোতিবাবুর এক মত, আমার সম্পূর্ণ ভিন্ন, অন্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই নির্বাক শ্রোতা, ঘণ্টাখানেক ধরে তর্ক চলছে, আমি নাছোড়বান্দা, সকলেই উসখুস, হঠাৎ জ্যোতিবাবু অতি নাটকীয় ভঙ্গিতে আমার দিকে ফিরে অভিবাদনের ছলে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে তীক্ষ্ণ উচ্চারণে বললেন : 'আমি আপনার কাছে অনেক অনেক ক্ষমা চাইছি, ভুলে গিয়েছিলম যে আপনি বুদ্ধিজীবী, আমরা সাধারণ মানুষ যা তিরিশ সেকেন্ডে বুঝতে পারি, আপনার মতো ইনটেলেকচুয়ালদের সেটা বুঝতে দেড়ঘণ্টা পেরিয়ে যায়।' এতটুকু বিরক্ত না হয়ে আমি হেসে ফেলি।

ফের পিছিয়ে যাই। সাতাত্তর সালের বাজেট পেশ করা হলো, সম্ভবত এই প্রথম ইংরেজি ও বাংলাতে বাজেটের ভাষ্য মন্ত্রী স্বয়ং রচনা করলেন। তখনও আমরা স্বপ্নের ভেলায় ভেসে বেড়াচ্ছি, অনেক উদ্যোগের কথা বলছি, অনেক অঙ্গীকারের কথা, বিশেষ করে গ্রামীণ পরিকল্পনা নিয়ে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুরোপুরি পাল্টে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মধ্যবর্তিতায় ত্রিস্তর পরিকাঠামো সক্রিয় করা নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে, তার কিছু ইঙ্গিত বাজেট ভাষণে ছিল, ক্রয়-বিক্রয় করের পুনর্বিন্যাস করে বাড়তি রাজস্ব সংগ্রহের কথাও বলা হয়েছিল।

বাজেটের একটি প্রস্তাব নিয়ে কলকাতার চলচ্চিত্র পরিচালকদের এক মহল আমার উপর বিশেষ কুপিত হয়েছিলেন : টিকিটের হার, শাদা-কালো ছবির ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য, রঙিন ছবির ক্ষেত্রে তা থেকে অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমার যুক্তি ছিল শাদা-কালো ছবি প্রধানত মফঃস্বলে-গ্রামাঞ্চলে প্রদর্শিত হয়, সেখানে প্রমোদ করের বোঝা বাড়ানো অনুচিত, কিন্তু শহরের উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষ হলিউডের বা মুম্বাই-মাদ্রাজের নর্তন-কুর্তনসংপৃক্ত রঙিন ছবি দেখছেন, তাঁদের উপর কেন একটু বেশি ভার চাপানো চলবে না। যে-পরিচালকরা আপত্তি করছিলেন, তাঁদের আশঙ্কা, তাঁরা সদ্য-সদ্য রঙিন ছবি তৈরির কাজে হাত লাগিয়েছেন, টিকিটের দাম চড়া হলে লোকেরা দেখতে আসবে না। সেই যুক্তি

মানতে পারিনি, তবে তাঁদের মান ভাঙাবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রঙিন ফিল্ম কলকাতাতেই যাতে দ্রুত পরিস্ফুটন সম্ভব হয়, সেই উদ্দেশ্যে একটি অত্যাধুনিক রাসায়নিক কারখানা সরকারি ব্যয়ে প্রস্তুত করে দেওয়া হবে। এই ঝামেলার সময় দল এবং চলচ্চিত্রকলাকুশলী কর্মীদের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছিলাম।

বাজেটের ব্যাপারে অন্য একটি সমস্যাও মাঝে-মাঝে দেখা দিত। বাজেট পেশের আগে কর আরোপের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা অবশ্যপালনীয়, সুতরাং অর্থমন্ত্রী হিশেবে আমার যা-যা বলার, অথবা পরামর্শ ও উপদেশ নেওয়ার, জ্যোতিবাবুকেই শুধু বলতাম, তাঁর কাছ থেকেই নিতাম। বিভাগীয় মন্ত্রীরা একটু ব্যথিত হতেন হয়তো, কিন্তু উপায় ছিল না। ১৯০৮-০৯ সালের বাজেটে বেকার ভাতা চালু করা হলো, গোটা ভারতবর্ষে সেই প্রথম, মাসিক অঙ্কের পরিমাণ অতি সামান্য, কিন্তু কর্মসংস্থানহীনদের প্রতি সমাজের যে দায়িত্ব তা স্বীকৃতি পেলো। আমার মনে উচ্চাশা ছিল ওই ভাতার বিনিময়ে বেকার যুবক-যুবতীরা কোনও সরকার-অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পে যোগ দেবেন, সপ্তাহে দু'দিন বা মাসে আট দিন। অন্যান্য বিভাগীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে এ-ব্যাপারে আগে থেকে আলোচনা করতে পারলে নিশ্চয়ই প্রকল্পটির সুষ্ঠুতর রূপ দেওয়া সম্ভব হতো, কিন্তু আমাকে কথা বলতে হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে ধোঁয়াটে ভাষায়, আমার সন্দেহ তাতে তাঁরাও খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, আমারও পরিতৃপ্তির অভাব ঘটেছিল।

আরও কিছু সমস্যা-অস্বাচ্ছন্দ্যের প্রসঙ্গে আসি। মন্ত্রিসভায়, বিশেষ করে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে যাঁরা মনোনীত হয়েছিলেন, তাঁরা পূর্ববর্তী গোটা জীবনই কাটিয়েছেন কৃষক বা শ্রমিক আন্দোলনে, বছরের পর বছর ধরে জেলে অতিবাহিত করেছেন, কিংবা পুলিশের তাড়া খেয়ে ফিরেছেন, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা। অনেকেরই মহাকরণে ঢুকে ধাতস্থ হতে সময় লেগেছিল। তাঁদের এই আড়ষ্টতাবোধের কারণেই মনে হয় মহাকরণের কাজকর্ম তাঁদের তেমন আকৃষ্ট করেনি, বেশ কয়েকজন আস্তে-আস্তে তাই উঁচু মহলের রাজপুরুষদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন, অথবা অধস্তন সরকারি কর্মচারীদের একজন-দু'জন, যাঁরা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে কাছাকাছি, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতেন। দু'দিক থেকেই সংকট দেখা দিল : উপরতলার আমলাদের কথা বেশি শুনলে কর্মচারী সমিতির বন্ধুরা অসন্তুষ্ট হতেন, আর শেষোক্তদের অভিমতে সায় দিয়ে ফাইলে সই করলে উঁচুতলার আমলারা চটতেন। অনেকের ক্ষেত্রে তাই এমন হয়েছে রাজনৈতিক নেতা হিশেবে চমৎকার, শ্রমিক বা কৃষক নেতা রূপে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন, কিন্তু মন্ত্রী হিশেবে সামান্য অসফল।

জ্যোতিবাবুর সঙ্গে এসব বিষয়ে বিশদ করে আলোচনায় অসুবিধা ছিল। তিনি হয়তো শুনতেন, তবে বিস্তৃত আলোচনায় যেতে চাইতেন না, তার কারণ বুঝতে পারি, যাঁদের সম্বন্ধে আমি খুব সাবধানে ঘুরিয়ে উক্তি করছি, তাঁরা রাজনীতির বিচারে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। বরঞ্চ আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে গিয়ে প্রমোদবাবুর সঙ্গে অনেক বেশি খোলামেলা আলোচনার সুযোগ থাকতো। প্রমোদবাবু কোনওদিন মহাকরণের চৌহদ্দিতে পা রাখেননি, অথচ প্রশাসনিক সমস্যাগুলি চট করে ধরতে পারতেন; ঠোঁট-কাটা মানুষ, যে কোনও মন্ত্রীকে ডেকে তাঁর বিভাগের কাজকর্ম নিয়ে সমালোচনামুখর হতে দ্বিধা বোধ করতেন না, প্রয়োজন মনে করলে আমাকেও ঝাড়তেন। একমাত্র জ্যোতিবাবুর সঙ্গে কিছু-কিছু ব্যাপারে

খোলাখুলি কথা বলতে প্রমোদবাবুরও, আমার সন্দেহ, সামান্য জড়তা ছিল, মনে প্রশ্ন থাকলেও কোনও তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি ছাড়া রাজ্য প্রশাসনের খুঁটিনাটি নিয়ে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কথা বলতেন না, দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকের জন্য অপেক্ষা করতেন। মুখ্যমন্ত্রীর মূল্যবান সময় আমার বিবেচনায় নানা অকাজে ব্যয়িত হচ্ছে, তিনি যে-কোনও সুবিধাবাদী মানুষের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজেবাজে জায়গায় যাচ্ছেন, অথচ প্রায়ই অনেক জরুরি ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার সময় আমরা পাচ্ছি না: এ সমস্ত সমস্যায় ভাবিত হয়ে একবার প্রমোদবাবুকে একগুচ্ছ প্রস্তাব দিয়েছিলাম, কী করে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে আরও কিছু শৃঙ্খলা প্রবর্তন করা যায় ; কোনও এক বিশেষ শরিকি মন্ত্রীর অত্যাচার থেকে জ্যোতিবাবুকে কী করে পরিত্রাণ দেওয়া যায়; কী করে উন্নয়নের কাজে জোয়ার আনা সম্ভব; কোন-কোন প্রকরণের সাহায্যে অন্তর্বিভাগীয় সংযোগ নিবিড়তর করা চলে। প্রমোদবাবু আমার সঙ্গে দ্বিমত হলেন না, কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবার জন্য উল্টে আমাকেই অনুরোধ করলেন, ইঙ্গিতটি ধরে ফেলে আমিও পিছিয়ে এলাম। স্নেহাংশু আচার্য প্রমোদবাবু ও জ্যোতিবাবুর সমান কাছাকাছি ছিলেন, জ্যোতিবাবুর কাছে কোনও স্পর্শকাতর ব্যাপারে কথা পাড়তে হলে প্রমোদবাবু কখনও-কখনও স্নেহাংশুবাবুকে দূত হিশেবে ব্যবহার করতেন; অন্তত সেরকমই আমার অনুমান।

অবিভক্ত পার্টিতে জ্যোতিবাবু স্বয়ং বেশ কয়েক বছর রাজ্য সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু পার্টি বিভক্ত হওয়ার পর দলের আয়তন ও সাংগঠনিক চরিত্র অনেক পাল্টেছে, জেলায়-জেলায় নতুন কর্মীরা এসেছেন, দলের গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। যে কারণেই হোক, জ্যোতিবাবুর সঙ্গে দলের অন্যান্য নেতা ও কর্মীদের বরাবরই যথেষ্ট সামাজিক দূরত্ব, যা প্রমোদবাবুর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। প্রমোদবাবু হাজার-হাজার দলের কর্মীদের আক্ষরিক অর্থেই চিনতেন, প্রত্যন্ত জেলার অখ্যাত গ্রামের সাধারণ স্তরের কর্মীদেরও, তাঁদের ব্যক্তিগত তথা সাংসারিক সমস্যার খবরাখবর রাখতেন, মুখগুলি চিনতেন, নামগুলি জানতেন। জ্যোতিবাবুর এ ব্যাপারে অদক্ষতা পার্টির মধ্যে কারও কাছে অজানা নয়, পুরনো দিনের কমরেডদের সঙ্গে চমৎকার আদান-প্রদান, অথচ নতুন প্রজন্মের অনেকেই তাঁর অপরিচিত। একদিন বিধানসভায় তাঁর পাশে বসে আছি, কক্ষের অন্য প্রান্ত থেকে একজন সদস্য বিতর্কে যোগ দিয়ে বক্তব্য রাখছেন, হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে জ্যোতিবাবুর প্রশ্ন : 'যিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন, তিনি কোন দলের?' কুণ্ঠায় জড়োসড়ো হয়ে জানাতে হলো, যিনি বলছেন তিনি তাঁরই দলের বিধায়ক, তাঁর কমরেড।

বিস্ময় বোধ করতাম অন্য একটি তথ্য আবিষ্কার করে। খুব গুছোনো মানুষ জ্যোতিবাবু, গ্রামে-শহরে সভাসমিতিই হোক কিংবা বিধানসভার অভ্যন্তরে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণই হোক, প্রতিটি বক্তৃতার জন্য তিনি এক-দুই-তিন করে বক্তব্য বিষয়ের ক্রমানুক্রমিক সাংকেতিক সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করে নিতেন, যাতে কোনও জরুরি কথা বলবার সময় ভুলে না যান। একদিন লক্ষ্য করলাম, কয়েক মিনিট বাদে যে-বক্তৃতা দিতে উঠবেন, তার প্রধান বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এক টুকরো কাগজে লিখছেন, ধরে-ধরে ইংরেজি ভাষায়। আমি একটু অবাক হয়ে তাকানোয় সবিনয়ে হেসে বললেন : 'কী করবো বলুন, আমার শিক্ষা-দীক্ষা তো আপনাদের মতো সম্পূর্ণ নয়।' বিস্ময়ের ঘোর তবু কাটলো না; একটুও না থেমে শাণিত বাংলায় প্রহরের পর প্রহর বলে যাচ্ছেন, অথচ তা ইংরেজি নোট দেখে।

আরও যা উল্লেখনীয়, বাইরে থেকে জ্যোতিবাবুকে গাম্ভীর্যের মুখোশ পরে থাকতে দেখা

যায়, কিন্তু যাঁদের সঙ্গে সামান্যতম আন্তরিকতা, তাঁদের সঙ্গে গল্প করতে, হালকা প্রসঙ্গ নিয়ে সোচ্চার হতে, তিনি প্রচুর আরাম বরাবরই পেতেন, এখনও পান। প্রত্যেকটি মানুষকে, সে মানুষের বাইরের আভরণ-আচ্ছাদন-আচরণ যাই-ই হোক না কেন, তিনি সম্মান দিতে জানেন, কেউই বলতে পারবেন না জ্যোতিবাবুর কাছ থেকে, কোনও বিরল মুহূর্তেও, অসৌজন্য পেয়েছেন। এটা শুধু বাঙালি ভদ্রতার ব্যাপার নয়, যে-কোনও মানুষের প্রতি পর্যাপ্ত সম্ভ্রম জানানোর প্রবৃত্তি তাঁর মজ্জাগত। সাংবাদিকদের কৃপায় কথাটা ভীষণ ছড়িয়েছে যে জ্যোতিবাবু একমাত্র শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের সঙ্গেই খানাপিনা করতে পছন্দ করেন। এর চেয়ে অনৃতভাষণ কিছু হতে পারে না, যাঁরা এধরনের কথাবার্তা বলেন, জ্যোতিবাবুর সামগ্রিক জীবনপ্রবাহের কোনও ধারণাই তাঁদের নেই। জ্যোতিবাবু সব ধরনের খাবার পছন্দ করেন, বিলিতি খানা থেকে শুরু করে শাদামাটা বাঙালি খাদ্য, এমনকি দরিদ্রতম শ্রমিক বা কৃষক পরিবারের জীর্ণ কুটিরে গিয়ে ডাল-নুন-কাঁচালঙ্কা-মাখা আকাঁড়া ভাতও। যেখানেই খেতে বসেছেন, প্রচুর তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছেন, কোনওরকম দ্বিরুক্তি বা আপত্তি না জানিয়ে। এখন তো আর সেটা সম্ভব নয়, কিন্তু বছর পনেরো আগেও দেখেছি, বিয়ে বা অন্নপ্রাশনের পঙ্‌ক্তিভোজনে বসে তিনি পরম তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছেন।

প্রমোদবাবুর সঙ্গে তাঁর চরিত্রগত তফাত অবশ্য বরাবরই ছিল। জ্যোতিবাবু স্বভাবঅন্তর্মুখী, বাইরে আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ হ্রস্ব, সম্ভবত একটি বিশেষ পারিবারিক গণ্ডিতে বড় হওয়ার ফল। অন্য পক্ষে প্রমোদবাবু ধাপে-ধাপে পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বে পৌঁছেছিলেন, সাধারণ বাঙালি ঘরের সন্তান, কিশোর বয়স থেকেই স্বদেশীতে মজে যাওয়া, প্রথম জীবনে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে কাটিয়েছেন, সাংসারিক বন্ধন গোড়া থেকেই প্রায় ছিন্ন, পার্টির কমিউনে বছরের পর বছর দিনযাপন, পার্টিই তাঁর সংসার, বিভিন্ন স্তরে পার্টি কর্মীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের নিবিড়তা তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো, তবে তার অনুসরণ সম্ভব নয়। জ্যোতিবাবু সচ্ছল পরিবারের সন্তান, ছেলেবেলায় লোরেটোয়—হ্যাঁ, এক বছরের জন্য লোরেটোয়—ও সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়েছেন, পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে, সেখান থেকে বিলেত চলে গেছেন, ব্যারিস্টারি পড়ার পাশাপাশি হ্যারি পলিট ও রজনী পালমা দত্তের কাছ থেকে সাম্যবাদে দীক্ষা, তবে মনের পলিমাটি, জ্যোতিবাবু অন্তত বলেন, কলকাতাতেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাঁর এক জ্যেঠামশাই এতই ইংরেজভক্ত ছিলেন যে বিদেশী প্রভুরা তাঁকে সামান্য মুনসেফ পদ থেকে উন্নত করে খোদ হাইকোর্টের বিচারকের আসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন। বোমা-পিস্তল-ছোঁড়া যুবকদের বিচারের জন্য ট্রাইবুনাল গঠিত হয়েছিল তিরিশের দশকের মধ্য-সময়ে, তিনি সেই ট্রাইবুনালের দায়িত্বে। যুবকদের আস্তানা থেকে বাজেয়াপ্ত-করা নানা সাম্যবাদী আদর্শ-ঠাসা বই জ্যেঠামশাই বাড়িতে নিয়ে আসতেন। লুকিয়ে-চুরিয়ে সেগুলি পড়েই নাকি, জ্যোতিবাবু সামান্য গর্বের সঙ্গে দাবি করতেন, তিনি কমিউনিস্ট হয়ে যান মনের দিক থেকে, যা প্রকটতর রূপ পায় বিলেতে।

মহাকরণ ও বামফ্রন্ট-সংক্রান্ত অন্য বিষয়াদিতে প্রবেশ করবার আগে একজনের কথা বিশেষ করে অবশ্যই বলতে হয়, তিনি সত্যব্রত সেন। কৈশোর থেকেই প্রমোদ দাশগুপ্তের খুব ঘনিষ্ঠ সত্যব্রতবাবু, ধ্যানধারণায় অতিশয় গোঁড়া, সুতরাং ষাটের দশকে পার্টি যখন ভাগ হলো, তখন থেকে তিনি অবধারিতভাবেই সি পি আই এম-এ। পার্টির কেন্দ্রীয় দফতর সে সময় কলকাতায়, পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র 'পিপলস ডেমোক্রাসি' কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হতো, অন্যান্য দায়িত্ব পালনের সঙ্গে-সঙ্গে সত্যব্রতবাবু 'পিপলস ডেমোক্রাসি'-র

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখালেখির কাজ করতেন। রঞ্জন চৌধুরী ছদ্মনামে অনেক তাত্ত্বিক রচনার লেখক তিনি; সুধাংশু দাশগুপ্তের সম্পাদনায় 'দেশহিতৈষী', পার্টির বাংলা সাপ্তাহিক, তার সঙ্গেও যুক্ত। সাতাত্তর সালে নির্বাচনের সন্নিকট মুহূর্তে পার্টির সদর দফতর নতুন দিল্লিতে স্থানান্তরিত হলো, সত্যব্রতবাবু দিল্লি চলে গেলেন। অর্থ ও উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রমোদবাবুর কাছে আরজি জানালাম, যে করেই হোক সত্যব্রতবাবুকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনতে হবে, তাঁকে সরকারের পরিকল্পনা উপদেষ্টা পদ গ্রহণে রাজি করাতে হবে। প্রমোদবাবু আবদার মানলেন, সত্যব্রতবাবু ফিরে এলেন, দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, কিন্তু মাত্র এক টাকা মাইনেতে। পরবর্তী বছরগুলি আমাদের বড়ো আনন্দের সময় ছিল, পরিশ্রম করার আনন্দ, যৌথ উদ্যমে, কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করা যে অর্থনীতিই রাজনীতি, রাজনীতিই অর্থনীতি। এখানে আরও একজনের কথা উল্লেখ না করলে কৃতঘ্নতা হবে। আমার নির্বাচনী যুদ্ধে অন্যতম প্রধান সেনাপতি ছিলেন মলয় চট্টোপাধ্যায় : একদা ছাত্রনেতা, পরে ব্যাংক কর্মচারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, খুব ঠাণ্ডা মাথার মানুষ, প্রচুর সামাজিক গুণাবলীতে ভূষিত। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের কয়েকদিন বাদে অতি-সুদর্শন, বছর তিরিশের এক যুবককে নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিঙে আমার ঘরে ঢুকে মলয়ের উক্তি : 'ছেলেটিকে দেখুন, আপনার আপ্ত সহায়করূপে কাজ করবে।' পাঁচ মিনিট কথা বলেই বুঝলাম, যুবকটি যেমন বুদ্ধিমান, তেমনই ঠাণ্ডা মাথার, আমার মতো সর্বদা-মাথা-গরম-করতে-থাকা মানুষের যথোপযুক্ত দাওয়াই, নাম সুজিত পোদ্দার। সুজিত গত পঁচিশ বছর সুখে-দুঃখে-হরিষে-বিষাদে আমার ছায়াসঙ্গী হয়ে আছে। ঘরের মানুষ হয়ে গেছে সে, তার স্ত্রী-সন্তানরাও আমার এবং আমার স্ত্রীর আত্মীয়তম।

সত্যব্রত সেনের সঙ্গে আলোচনান্তে রাজ্য যোজনা পরিষদকে ঢেলে সাজাবার ব্যবস্থা হলো। এই পরিষদের ঐতিহ্যগত মন্ত্রীসংকুলতা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হলো আমাদের। প্রথা-অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী পরিষদের সভাপতি, পরিকল্পনা মন্ত্রী সহ-সভাপতি, সেই সঙ্গে একগাদা অন্যান্য মন্ত্রীও সদস্য হিশেবে শোভাবর্ধন করতেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই, তাঁদের দিয়ে কাজের কাজ কিছুই হবার নয়, তাঁরা বকবকম্ করেই দায়মুক্ত। পশ্চিম বাংলার এত-এত সমস্যা, যে সব নিয়ে রাজ্য যোজনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রচুর চিন্তাসমৃদ্ধ গবেষণা জরুরি, যার ভিত্তিতে প্রকল্পরচনা প্রয়োজন, অনেক গভীরে যাওয়া প্রয়োজন, মন্ত্রী-ভারি যোজনা পরিষদ দিয়ে তা সম্ভব নয়। সুতরাং 'কেজো' বিশেষজ্ঞদের আহ্বান জানিয়ে পরিষদের সদস্য করা হলো, তাঁদের উপর রাজ্য যোজনার সামগ্রিক দায়িত্ব, মুখ্যমন্ত্রী সভাপতি রইলেন পরিষদের গুরুত্ব বোঝাবার জন্য; অন্য মন্ত্রীরা, পরিকল্পনা মন্ত্রীসুদ্ধ, সবাই বাদ। বেশ কিছু মন্ত্রীর মুখ ভার, একটি বাহারি পালক যেন তাঁদের মাথার মুকুট থেকে খসিয়ে নেওয়া হলো। এবংবিধ আত্মগরিমাবোধজড়িত সমস্যা বহু ক্ষেত্রেই প্রচুর ক্ষতি করেছে। বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিতে মন্ত্রীরা সভাপতি হিশেবে ছড়ি ঘোরাতে ভালোবাসেন, আসল কাজ তাতে কিছু হয় না : তাঁরা উপদেশ-পরামর্শ অবশ্যই দেবেন, বিভাগীয় মন্ত্রী হিশেবে তাঁদের সেই ভূমিকা থাকবেই, কিন্তু সংস্থার দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার জন্য যে অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা দরকার, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা তাঁদের নেই। তা সত্ত্বেও মন্ত্রীরা যদি সভাপতিরূপে বিরাজ করতে চান, তাতে ক্ষতি বই লাভ নেই, ছোটো-বড়ো ভ্রষ্টাচারের আশঙ্কাও বাড়ে। ইত্যাকার ব্যাপারে সতীর্থ মন্ত্রীদের প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করেছি; অসফল হয়ে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছি।

সাতাশ

এক হিশেবে পরিকল্পনা দপ্তর হাতে থাকায় সুবিধা হলো। মস্ত কাজ সত্যব্রতবাবু, যোজনা পরিষদের মধ্যবর্তিতায়, আমাদের কারও-কারও ক্ষীণ সাহায্য নিয়ে, যা সম্পন্ন করেছিলেন তা পশ্চিম বাংলার পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ পরিকাঠামোর সম্পূর্ণ বিন্যাস রচনা! কোথাও ঠেকে গেলে আমরা বিনয়দার কাছে উপদেশ গ্রহণের জন্য যেতাম, কখনও বা কথা হতো প্রমোদবাবু অথবা বিনয় কোঙারের সঙ্গে, কিন্তু গ্রামীণ উন্নয়নের সামগ্রিক ছক, পঞ্চায়েত-ভিত্তিক বিকেন্দ্রিক ব্যবস্থাতে মিশিয়ে দেওয়া, অনেকটাই সত্যব্রতবাবুর চিন্তা-ভাবনার ফসল। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের মধ্যে কর্তব্য বিভাজন, প্রতি স্তরে পদাধিকারীদের মধ্যে দায়িত্বের বণ্টন, কোন স্তরে কোন ধরনের উপদেষ্টা বা সাহায্যকারীকে যুক্ত করা উচিত, হিশেব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কৃত্যের সূচী, পঞ্চায়েত কর্মীদের শিক্ষা ও অনুশীলনের নির্ঘণ্ট, পঞ্চায়েতসমূহের উপর উন্নয়নমূলক ক্রিয়াকর্মের প্রধান দায়িত্ব অর্পণ করা হলে মহাকরণে বিভাগীয় মন্ত্রীদের কতটা অসন্তুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, জেলায়-জেলায় বিধায়করাও নিজেদের হঠাৎ কর্মসংস্থানহীন মনে করবেন কিনা, এ ধরনের বিভিন্ন সমস্যা এবং কীভাবে তাদের নিরসন সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন, তারপর উত্তর জোগানো। সমান জরুরি অন্য কিছু সমস্যা : প্রতিটি স্তরে সরকারি আমলাদের দিয়ে কাজ করাতে হবে, তাঁদের উপরওলা হবেন রাজনীতি জগতের মানুষজন, যাঁরা লেখাপড়ায় ততটা হয়তো দড় নন, পোশাকে-আশাকেও অত্যন্ত শাদামাটা। তেমন রাজনৈতিক মানুষদের সঙ্গে রাজপুরুষেরা মানিয়ে চলতে পারবেন কিনা, নাকি প্রথম থেকেই সংঘাত দেখা দেবে, কী উপায়ে সে সব জটিলতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব, ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে আমাদের নিত্য নতুন তর্ক, আলোচনা, আলোচনার পর আলোচনা করে মুশকিল আসানের হদিশ। আমাদের সমাজে যে ধরনের প্রথাগত ইতিহাস লেখা হয়, তাতে, আমি নিশ্চিত, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ইতিবৃত্তে সত্যব্রত সেনের নাম-গন্ধও থাকবে না, কোনও হামবড়া আমলা বেশির ভাগ জায়গা দখল করে থাকবেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তো ইতিহাস ভুল-ভ্রান্তি-অসত্যে ঠাসা।

প্রশ্ন উঠলো, আমরা কি কংগ্রেস-প্রবর্তিত পুরনো পঞ্চায়েত আইন পাল্টে নানা গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী ঢুকিয়ে তার পর পরিকল্পিত কর্মসূচি রূপায়ণে উদ্যোগ নেবো? যদিও কংগ্রেস আমলে বিধানসভায় পঞ্চায়েত-সংক্রান্ত একটি আইন গৃহীত হয়েছিল, যেমন গৃহীত হয়েছিল ভূমিসংস্কার-সংক্রান্ত আইনও, কার্যত উভয় ক্ষেত্রেই কাজের কাজ কিছু হয়নি, খাস জমি দখলের কাজ যেমন পিছিয়ে ছিল, উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলোনোর কাজও মুলতুবি ছিল, কর্ষিত জমিতে ভাগচাষীদের আইনি দখল দেওয়ার কর্তব্যও পালন করা হয়নি। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও অবস্থা সমান শোচনীয়। দেশের শ্রেণীচরিত্রের ছায়া: গোটা পশ্চিম বাংলায় পঞ্চায়েতের মধ্যবর্তিতায় বছরে মাত্র দু'-তিন কোটি টাকা ব্যয়

বরাদ্দ হতো, বিভিন্ন স্তরে পঞ্চায়েতের দায়িত্বে থাকতেন সরকার-মনোনীত কিছু পেটোয়া মানুষ, জমিদার-জোতদার-মহাজন প্রভৃতি শ্রেণীভুক্ত। অথচ ইতিমধ্যে-বিধানসভায়-মঞ্জুর-হওয়া আইনের ভিত্তিতেই আরও অনেক কিছু করা যেত, কংগ্রেসিরা করেননি। নিজেদের মধ্যে আলোচনা হলো, জ্যোতিবাবু-প্রমোদবাবুর সঙ্গে, পার্টির বিভিন্ন স্তরে, শরিক দলগুলির সঙ্গেও, সবাই একমত হলেন। আইন পাল্টাবার প্রয়াসে গোড়াতে মনোনিবেশ করলে কিছুটা ঝুঁকি থাকে, হয়তো প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাবার জন্য বিধানসভায় প্রস্তাব উঠবে, যা এড়ানো মুশকিল, অথচ যার ফেরে পড়লে এক বছর-দু'বছর, কে জানে, স্বচ্ছন্দে গড়িয়ে যাবে। সিদ্ধান্ত হলো পুরনো আইনই আপাতত থাকুক, তা মেনেই ত্রিস্তর গণতান্ত্রিক নির্বাচনের উদ্যোগ নেওয়া হোক, তা-ও যুগান্তকারী পরিবর্তন হবে, যা বাস্তবায়িত করতে কংগ্রেসিরা শ্রেণীস্বার্থহেতু সাহস পাননি।

আটাত্তর সালের জুন মাসে পঞ্চায়েত নির্বাচন হলো, গ্রামাঞ্চলে বিপুল উৎসাহ, কাতারে-কাতারে গরিব মানুষ তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ভোট দিতে এলেন। ভোটের দিনই গভীর রাত থেকে ফল বেরোতে শুরু করলো, বামফ্রন্টের একচ্ছত্র আধিপত্য ভোটের মারফত সুপ্রমাণিত। কয়েক মাসের ব্যবধানে ভূমি-সংস্কার আইন প্রণীত হলো, ভাগচাষীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার আইনও। কিন্তু সংবিধানের এমন বিচিত্র লীলা, যদিও ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিষয়টি রাজ্যগুলির পুরোপুরি এখতিয়ারে, আবিষ্কার করলাম এই সংক্রান্ত আইনও কার্যকরী করতে গেলে অনুমতির জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাতে হবে, সংবিধানের ৩১(ক) না (খ) কোনও ধারা অনুযায়ী। দিন যায়, মাস যায়, বছর যাওয়ার উপক্রম, রাষ্ট্রপতির, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের, অনুমতি আর আসে না। খোঁজ নিয়ে জানা গেল গোল বেধেছে প্রস্তাবিত একটি বিশেষ সংশোধনী নিয়ে। পশ্চিম বাংলায় প্রায় নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল, চমৎকার ধেনো জমিতে রাতের অন্ধকারে আল কেটে খাল বা নদী থেকে জল ঢুকিয়ে দাবি করা হতো ওটা মেছো ভেড়ি, ভূমিসংস্কারের আওতায় আসে না। অন্য কায়দাও ছিল : ফসল ঘরে বা গোলায় তোলা হয়েছে, ন্যাড়া কৃষিভূমি পড়ে আছে, একটা লেবুগাছ বা আমগাছের চারা পুঁতে উচ্চকণ্ঠে দাবি উচ্চারণ, 'ধেনো জমি কোথায় গো, এটা তো আমাদের পরিবারের বরাবরের বাগিচা,' যেহেতু বাগ-বাগিচাও কংগ্রেসি ভূমিসংস্কার আইনের বাইরে। বামফ্রন্ট সরকার এ সমস্ত ছলচাতুরি বন্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আইনে একটি সংশোধনী ঢুকিয়ে দেওয়া হলো, এখন থেকে মেছো ভেড়িই হোক আর ফুলবাগান বা ফলবাগানই হোক, সব জমিই ভূমি সংস্কার আইনের কবলে পড়বে। বিধানসভায় প্রতিপক্ষ কংগ্রেস ও জনতা দলে ভেড়িওয়ালা ও তৎসম সম্প্রদায়ের ঘোর প্রতিপত্তি, যেদিন সংশোধনীটি বিধানসভায় ভোটে গৃহীত হবার কথা, তাঁরা মস্ত শোরগোল তুলে সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে দিল্লিগামী ট্রেন-প্লেন ধরলেন, দেশের রাজধানীতে পৌঁছে ওখানকার মন্ত্রী-আমলাদের বোঝালেন এমনধারা সংশোধনী আইনে অনুমতি দিলে লক্ষ্মীছাড়া কমিউনিস্টদের কোনও দিনই পশ্চিম বাংলা থেকে হটানো সম্ভব হবে না। তাঁরা অবশ্যই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন।

কিছুদিন বাদে অনুরূপ আর একটি অদ্ভুত ঘটনা। প্রশান্ত শূর যুগপৎ পৌরমন্ত্রী ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী, তিনি সকলের সঙ্গে আলোচনা করে কলকাতার খাটাল সমস্যা দূর করার জন্য বিশেষ একটি প্রস্তাব রাখলেন : কলকাতার চৌহদ্দির মাইল কয়েক দূরে কিছু জায়গা বেছে নিয়ে মহানগর থেকে সমস্ত গরু-মহিষ সরিয়ে নিয়ে এ সমস্ত জায়গায় বসানো হোক, খাটালের মালিকদেরও সেই সঙ্গে স্থানান্তরিত করা হোক। তদনুযায়ী বিধানসভায় আইন

গৃহীত হলো, যথানিয়মে তা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো অনুমতির জন্য। পুরনো কাহিনীর পুনরাবৃত্তি, দিল্লির পূর্ণিমা-নিশীথিনীসম নীরবতা। বছর দুয়েক কেটে যাওয়ার পর অবশেষে দিল্লি থেকে সারগর্ভ চিঠি এলো, সংবিধানের ৩০৩ না কোন ধারা অনুযায়ী দেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য কোনও অঞ্চলে বাণিজ্যিক যাতায়াতে বাধাদান অবৈধ, আমরা যে আইন প্রয়োগ করতে চাইছি তাতে গরু-মহিষের অবাধ ও স্বাধীন বিচরণের অধিকার লঙ্ঘিত হবে, অতএব রাষ্ট্রপতির সম্মতি দেওয়া সম্ভব নয়। কে অস্বীকার করবেন, এ ধরনের বালখিল্য অজুহাত উপস্থাপনের একমাত্র লক্ষ্য যেনতেনপ্রকারে বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচি যত্রতত্র আটকে দেওয়া।

শত বিঘ্ন সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলে মস্ত পরিবর্তনের উদ্যোগ সফল হলো, ঝগড়াঝাঁটি করে ভূমিসংস্কার আইন পালটানো হলো, বাড়তি জমি খাস করবার বন্দোবস্ত হলো, সেই জমি যথাসত্বর বিলনোও হলো। পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে বহু ছোটো-মাঝারি সেচের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো, যেমন হলো সর্বস্তরে রাস্তাঘাট তৈরির উদ্যোগ, জল নিকাশি ব্যবস্থা প্রণয়ন। উন্নত বীজশস্য, সার, কীটনাশক ওষুধসমেত নানা সরঞ্জাম বড়ো-মাঝারি-ছোটো কৃষক পেতে শুরু করলেন; উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ-টাকা প্রতি বছর একটু-একটু করে বাড়িয়ে গ্রামে-গ্রামে পৌঁছে দেওয়া শুরু হলো। গত কুড়ি বছরে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের প্রসারও যথেষ্ট ঘটেছে, তবে এখনও অনেক জায়গায় ঘাটতি, যথাযথ বিতরণব্যবস্থার অভাবে; উৎপাদনক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বহু জায়গায় বিদ্যুৎ পৌঁছুনো যাচ্ছে না।

কয়েক বছরের মধ্যেই সুফল টের পাওয়া গেল, গ্রামে-গ্রামে উন্নতির ছোঁয়া। গ্রামাঞ্চলে উন্নতি যে ঘটছে তার একটি প্রামাণিক সংজ্ঞা প্রমোদ দাশগুপ্ত বলতেন : আগে দরিদ্র কৃষকের ঘরে এক কিলো-দু'কিলো চালও সঞ্চিত থাকতো না, খরার মুহূর্ত এলেই সমগ্র পরিবার নিরন্ন অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়তো। বামফ্রন্টের প্রথম পাঁচ বছরেই অবস্থার গুণগত পরিবর্তন, প্রায় প্রতিটি গ্রামে দরিদ্রতম সংসারেও পাঁচ-ছয় কিলো চাল মজুত, সুতরাং খরার ঋতুতেও, যতদিন সরকারি সাহায্য এসে না পৌঁছুচ্ছে, তাঁদের ঠিক না খেয়ে আর থাকতে হচ্ছে না। গ্রামাঞ্চলে অবস্থা ফেরার অন্য একটি নিরিখও উল্লেখ করতে পারি। সাতের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত রাজ্যে অন্নাভাব দেখা দিলে কাতারে-কাতারে গ্রামের মানুষ কলকাতায় এসে জড়ো হতেন, খোলা আকাশের নিচে, উদ্‌ভ্রান্ত, খাদ্যের সন্ধান করতেন ইতস্তত ঘুরে-ঘুরে। বামফ্রন্ট সরকার হাল ধরার পর এই প্রবণতা বন্ধ হয়েছে, চরম খরার সময়েও গ্রামে অন্নের সংস্থান থাকছে, কলকাতায় ছুটে যাওয়ার আর প্রয়োজন পড়ে না। এমন নয় যে কলকাতায় অভাবী মানুষের ভিড় এখন বাড়ছে না। বাড়ছে, তবে এই মানুষগুলি আসছেন বিহার থেকে, ওড়িশা থেকে, উত্তর প্রদেশ ও অন্ধ্র প্রদেশ থেকে, এমন কি অসম ও নেপাল থেকেও। আদমসুমারিতে কলকাতার জনসংখ্যায় অবাঙালিদের অনুপাত ক্রমবৃদ্ধির এটাই অন্যতম কারণ।

অন্য সমস্যাও আছে। গত দুই দশক জুড়ে কলকাতায় ও মফস্বল শহরগুলিতে পৌর উন্নয়নের কাজ অবশ্য প্রচুর হয়েছে: বাইরে থেকে যাঁরা আসেন, তাঁদের অভিমত কলকাতার রাস্তাঘাট অনেক পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে, আবর্জনা কম, বিদ্যুৎ সমস্যা তো প্রায় অবলুপ্ত। বস্তিতে-বস্তিতে অনেক সংস্কার হয়েছে, জল সরবরাহ থেকে শুরু করে দেয়াল-মেঝে-ছাদ মেরামত, পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ থেকে শুরু করে অন্যান্য উন্নত পরিষেবা ব্যবস্থা। এখানেই জটিলতার সৃষ্টি। পৌর অবস্থার সামান্য উন্নতি ঘটলেই, পরিবেশের চেহারা খানিকটা ভালোর দিকে

এগোলেই, সঙ্গে-সঙ্গে যে এলাকায় উন্নতির বহর কম, সেখান থেকে লোকজন ছুটে এসে অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চলে ভিড় করবে, সুতরাং উন্নতি টিকিয়ে রাখা দুষ্কর। দেশ জুড়ে যেহেতু আকীর্ণ বেকার সমস্যা, এবং বাংলার বাইরে থেকে লোকজন আগমনের হার অব্যাহত থাকছে, এই আধাখ্যাঁচড়া পরিস্থিতি না মেনে উপায় নেই।

গোটা ভারতবর্ষেই কর্মসংস্থান কেন্দ্রে নাম-লেখানো মানুষের হার বর্ধমান, পশ্চিম বাংলায় বৃদ্ধির হার তার সঙ্গে সমতা রেখে, তবু রূঢ় সত্য তো এড়ানো যায় না : যতদিন শিল্পোন্নয়নের নিস্তেজ ধারাকে শুধু এই রাজ্যে নয়, গোটা দেশে ফের স্রোতবতী করা না যাচ্ছে, নাগরিক সমস্যা বাড়তে বাধ্য, গ্রামের চেহারা পাল্টালেও মূল সমস্যার তেমন হেরফের হবে না। যা যোগ করতে হয়, শিল্পে প্রসার ঘটলে কারখানায়-কারখানায় শ্রমিকের চাহিদাও বাড়বে, যা মেটাতে গ্রাম থেকে মানুষ শহরে যাত্রা করবেন, শহরে কাজ পাবেন তাঁরা, পাশাপাশি গ্রামে কৃষিকর্মে ও ক্ষুদ্র শিল্পে নিয়োজিত শ্রমজীবী মানুষের অনুপাত কমবে, মানুষগুলির জীবিকার মানও উর্ধ্বগতি হবে।

রাজ্যের সার্বিক সমস্যা সমাধানের সূত্র বামফ্রন্ট সরকার সাতের দশকের উপান্ত থেকে হাতড়ে-হাতড়ে বেড়াচ্ছে। সূত্রগুলি যে পুরোপুরি মিলছে না, তার প্রধান কারণ অবশ্যই অর্থসামর্থ্যের অভাব। বিশেষ করে সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। ষাটের দশকের গোড়া থেকে বামফ্রন্ট সরকারের মহাকরণে প্রবেশ করার সময় পর্যন্ত, বেসরকারি পুঁজি একটু-একটু করে রাজ্য থেকে সরে গেছে। হেতু অনেক। কিছু-কিছু পুঁজিপতি রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে বহু দিন থেকেই ভাবিত ছিলেন। কংগ্রেস আমলে বিদ্যুতের হাল ফেরাবার কোনও তন্নিষ্ঠ চেষ্টা হয়নি, রাস্তাঘাট বেহাল, শরণার্থীদের প্রতি কেন্দ্রের চরম অন্যমনস্কতা, সব মিলিয়ে অবস্থা আদৌ পাল্টাচ্ছিল না বলে সেই পর্ব থেকেই বাঙালিদের মানসিকতায় ক্রমবর্ধমান নাস্তিকতা : এ সব কিছুই নিশ্চয়ই প্রাসঙ্গিক। তবে সমান প্রাসঙ্গিক কেন্দ্রীয় সরকারের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিও।

বেসরকারি মালিকরা যখন অপস্রিয়মাণ, শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াবার তিনটি বিকল্প উপায় : (ক) রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ করা। যে সরকারের ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না, তার পক্ষে সেরকম ব্যবস্থা নেওয়া আদৌ সম্ভব নয়; (খ) কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট থেকে রাজ্যে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা পর্বের পর স্মৃতি ঢুঁড়েও পশ্চিম বাংলায় তেমন-কোনও কেন্দ্রীয় বিনিয়োগের উল্লেখ সম্ভব নয়; এবং (গ) বিভিন্ন কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান— যেমন জীবন বীমা নিগম, সাধারণ বিমা নিগম, ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইনান্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ইত্যাদি—থেকে রাজ্যে বিনিয়োগের ব্যবস্থা। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই এ সমস্ত সংস্থার কাছে কেন্দ্রের ফরমান পৌঁছয় : পশ্চিম বঙ্গে গড় জাতীয় আয় অনেক রাজ্যের চেয়ে বেশি, এই রাজ্যের দিকে বাড়তি নজর দেওয়ার তাই তাদের দরকার, নেই তারা অন্যত্র ঝুঁকুক। পঞ্চাশ বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানগুলি গুজরাটে-মহারাষ্ট্রে-কর্ণাটকে-তামিলনাড়ুতে-পঞ্জাবে-হরিয়ানায় অঢেল টাকা ঢেলেছে, পশ্চিম বাংলার ভাগ্যে শিকেটি ছেঁড়েনি। আমরা সাতাত্তর সালে রাজ্য প্রশাসনে ঢুকে ঈষৎ বিদ্রূপ করে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রককে বলতে শুরু করলাম, আপনাদের উদ্দেশ্য তো সাধিত হয়েছে, পশ্চিম বাংলায় আমরা গরিব হয়ে গেছি, এবার আমাদের এখানে আপনাদের আর্থিক সংস্থাগুলিকে একটু টাকা ঢালতে বলুন না কেন,

মহাভারত কী আর এমন অশুদ্ধ হবে।

একাধিক আরও সমস্যার কথা বলা সমান জরুরি। স্বাধীনতা-উত্তর কালে সংগঠিত শিল্পে যে কারও পক্ষে যে কোনও নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্‌অনুমতির প্রয়োজন ছিল। অভিজ্ঞতায় ধরা পড়লো, পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে সেই অনুমতি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। লিখিত-পড়িত কোনও অনুশাসন ছিল না, কিন্তু ভারত সরকারের শিল্প মন্ত্রকের কর্তাব্যক্তিরা লাইসেন্স-প্রার্থী শিল্পপতিদের ঠারে-ঠোরে জানিয়ে দিতেন, দেশের অন্য যে-কোনও রাজ্যে শিল্প-স্থাপনের জন্য আবেদন করলে তা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে, পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে নৈব নৈব চ। সিদ্ধান্তটি প্রধানত রাজনীতিগত কারণেই, কমিউনিস্টরা পশ্চিম বাংলায় চড়ে বসেছে, ওদের শিল্পবিস্তারে সাহায্য করলে কংগ্রেস দলের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা। কংগ্রেস মন্ত্রীরা পর্যন্ত এই অভিযোগ সহজে অস্বীকার করতে পারতেন না।

দ্বিতীয় সমস্যাটি শুধু পশ্চিম বঙ্গ নয়, গোটা পূর্ব ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী একটি কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত। ১৯৫৬ সাল, টি. টি. কৃষ্ণমাচারী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, তিনি নিজেও তামিলনাড়ুতে বড়ো গোছের শিল্পপতি, হিশেব কষলেন, শিল্পক্ষেত্রে পূর্ব ভারতের আপেক্ষিক অগ্রগতি রোধ করতে হলে, সেই সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলে শিল্পের প্রসার ঘটাতে গেলে, নিয়মনীতির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কৌশল খাটাবার সমূহ প্রয়োজন। বাংলা-বিহার অঞ্চলে খনিজ পদার্থের প্রাচুর্য, লোহা আছে, কয়লাও আছে, উভয় খনিজ উত্তোলন করে কয়লা দিয়ে লোহা গালিয়ে শস্তায় ইস্পাত তৈরি সম্ভব, সেই ইস্পাত পিটিয়ে কলকব্জা-যন্ত্রপাতি তৈরি করাও, যার প্রসাদে পূর্ব ভারত জুড়ে, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায়, ব্যাপক এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প একদা গড়ে উঠেছিল, যার নির্ভরে, ইংরেজ আমলে, এবং স্বাধীনতার পরবর্তী কয়েক বছর, এই রাজ্যে শিল্পের ব্যাপক উন্নতি সম্ভব হয়েছে, অন্যান্য অঞ্চল তুলনায় ধুঁকেছে। টি. টি. কে. মাথা খাটিয়ে কৌশল উদ্ভাবন করলেন, সারা দেশে লোহা ও ইস্পাতের পরিবহন মাশুলের হার সমান করে দেওয়া হলো, যার ফলে সারা দেশে লোহা ও ইস্পাতের দাম এক হয়ে গেল। কয়লার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাটি হলো আরও মজাদার : যত বেশি দূর কয়লা বহন করে নিয়ে যাওয়া হবে, মাইল প্রতি পরিবহন মাশুল তত কম পড়বে। অর্থাৎ রানীগঞ্জ থেকে দুর্গাপুরে কয়লা টন প্রতি যে দামে বিকোবে, ত্রিচিনাপল্লীতে বা পুনেতে বা জলন্ধরে তার চেয়ে কম দামে। কেন্দ্রের এই মারাত্মক সিদ্ধান্তের পরিণামে নিছক এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ক্ষেত্রেই নয়, সব শিল্পের ক্ষেত্রেই, পশ্চিম বাংলা খরচ-খরচার ব্যাপারে যে-আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করে আসছিল, তা চকিতে উবে গেল।

অথচ বিধানচন্দ্র রায় তখন পশ্চিম বাংলার হাল ধরে আছেন, নতুন দিল্লিতে সবাই, জওহরলাল নেহরুসুদ্ধ, তাঁকে প্রচুর সমীহ করেন, তিনি তেড়ে-ফুঁড়ে প্রতিবাদ জানালে গণেশ এমনভাবে উল্টে দেওয়া সম্ভব হতো না। কিন্তু টি. টি. কে. প্রখ্যাত কুম্ভকোণম্ গ্রামের ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন আয়েঙ্গার গোষ্ঠীভুক্ত ব্রাহ্মণ, বিধানবাবুকে ল্যাজে খেলালেন : 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার রাজ্যের স্বার্থে কেন্দ্রের টাকায় আমরা দুর্গাপুরে মস্ত শিল্পাঞ্চল গড়ে দিচ্ছি, একটা ঝা-চকচকে নতুন ইস্পাত কারখানা পর্যন্ত। পশ্চিম বাংলার ভবিষ্যৎ অগ্রগতি নিয়ে আপনি তাই নিরুদ্বিগ্ন থাকতে পারেন'। বাংলার রূপকার হিশেবে বিধানচন্দ্র রায়ের রাজ্যে খ্যাতি, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় গদগদ বিনত ভাব অনেকের মানসে এখনও অটুট। কিন্তু না বলে পারছি না, পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে বিধানবাবু

প্রায়-স্থবিরত্বে পৌঁছে গিয়েছিলেন, তাঁকে যা বোঝানো হতো, তাই-ই নিরুত্তর মেনে নিতেন। মুম্বাই শহরে শচীন চৌধুরী, সর্ব ঋতুতে অর্থাভাবগ্রস্ত, টটরমটর করে কোনওক্রমে সপ্তাহে-সপ্তাহে ইকনমিক উইকলি বের করছেন, মাশুল সমীকরণ নীতির ফলে পশ্চিম বাংলার যে ভয়ংকর সর্বনাশ হবে, তা ভেবে তিনি অস্থির-উদ্বিগ্ন। নিজের পয়সায় টিকিট কেটে কলকাতায় চলে এলেন, বিধানবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন, অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, এখনও সময় আছে, উনি যদি রাগে ফেটে পড়ে প্রধান মন্ত্রীকে বলেন, এই নীতি কিছুতেই প্রয়োগ করতে দেবেন না, তাতে পূর্ব ভারতের ভবিষ্যৎ ঘোর তমসাচ্ছন্ন হতে বাধ্য, প্রধান মন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ভয় পেয়ে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হবেন। কে শোনে কার কথা। বিধানবাবুর একই বচন বারবার করে উচ্চারণ : 'ওরা আমাকে দুর্গাপুর দিচ্ছে, আমি এখানে আমার মতো করে ইন্ডাস্ট্রি গড়বো। ওরা দিল্লিতে বসে যা খুশি করুক গে।' মাশুল সমীকরণ নীতির সঙ্গে পূর্ব ভারতে শিল্প প্রসারের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক নিয়ে বিধানবাবুকে কিছুতেই বোঝানো গেল না, শচীনদা ব্যর্থমনোরথ হয়ে মুম্বাই ফিরলেন, ভগ্নদূত তিনি, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে তাঁর পত্রিকায় প্রতিবাদী সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে চললেন।

এমনকি বামপন্থী আন্দোলনেও মাশুল সমীকরণ নীতি সম্পর্কে সে সময় খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ততা ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি সর্বভারতীয় দল, সারা দেশের স্বার্থ তাকে দেখতে হবে। টি. টি. কে. যা বলছেন, তা থেকে, পূর্ব ভারতের সামান্য ক্ষতি সত্ত্বেও, যদি অন্য সর্বত্র শিল্পের ব্যাপক উন্নতি ঘটে, তা হলে মেনে নিলেই তো হয়, খুব বেশি চেঁচামেচি না করে। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, রাজ্যের কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে একমাত্র নীরেন ঘোষ সমস্যাটির গভীরে একেবারে গোড়া থেকেই প্রবেশ করতে পেরেছিলেন, অন্যান্য নেতাদের ভ্রূকুটি-নিষেধ উপেক্ষা করে।

সাতাত্তর সালে আমরা যখন মহাকরণে পৌঁছুলাম, পশ্চিম বাংলার সর্বনাশ আর শঙ্কাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের ব্যাপার নয়। পূর্ববর্তী বছরগুলিতে যে বিশিল্পায়নের অধ্যায় সূচিত হয়ে গেছে, প্রত্যেকের অভিজ্ঞতাতেই তা প্রকট। জ্যোতিবাবুও বুঝেছেন, এখন সর্ব শক্তি দিয়ে কেন্দ্রীয় নীতিসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, শুধু মাশুল সমীকরণ নীতি বিলোপ নিয়েই নয়, কেন্দ্র-রাজ্যে আর্থিক ব্যবস্থার সার্বিক পুনর্বিন্যাস নিয়ে, বিদ্‌ঘুটে লাইসেন্স প্রথা রদ করার দাবি নিয়ে, দিগন্তদৃষ্টি আরও উদার করে এমনকি প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও রাজ্যের অধিকার ব্যাপ্ততর করবার লক্ষ্য নিয়ে। এটা কেন হবে, সংবিধানের ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে কথায়-কথায় রাজ্য সরকারগুলিকে বরখাস্ত করা হবে, তাঁর জমানায় ইন্দিরা গান্ধি যেমন ষাট-সত্তরবার করেছিলেন; এটা কেন হবে, রাজ্যগুলির সম্মতি না নিয়ে কেন্দ্রের ধামা-ধরা যে-কাউকে রাজ্যে-রাজ্যে রাজ্যপাল করে পাঠানো হবে; এটা কেন হবে, এমনকি ভূমি সংস্কার আইন প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে পর্যন্ত কেন্দ্রের সম্মতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে, কেন ভারত সরকার নোট ছাপাতে পারবে, রাজ্য সরকারগুলি পারবে না; বাজারে ঋণপত্র ছেড়ে যে অর্থ সংগ্রহ করা হয়, কেন তার নয়-দশমাংশেরও বেশি কেন্দ্রীয় সরকার স্রেফ নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করবে, রাজ্যগুলি বসে-বসে বুড়ো আঙুল চুষবে। জ্যোতিবাবুর কাছে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই, আমাকে তিনি যথেচ্ছ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, আমার মতো করে খসড়া তৈরি করে তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে দিল্লিতে পাঠাতাম, কখনও-কখনও নিজেই সই করে পাঠাতাম, মুখ্যমন্ত্রী

সম্মেলনে বা জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে জ্যোতিবাবুকে দিয়ে কড়া-কড়া ভাষণ দেওয়াতাম, তিনি যে-সব বৈঠকে যেতেন না, আমি গিয়ে সরব হতাম, অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের দলে টানতে প্রয়াসবান হতাম, কলকাতায়, দিল্লি ও অন্যত্র যে কোনও ছুতোয় সাংবাদিকদের আহ্বান করে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক আশু পুনর্বিন্যাসের আত্যন্তিক আবশ্যকতা নিয়ে গলা ফাটাতাম। লোকসমক্ষে আসতে আমার সাধারণত গভীর অনভিরুচি, তবে রাজ্যগুলির স্বার্থে এ ধরনের চ্যাঁচামেচি যে প্রয়োজন তা নিজেকে বুঝিয়েছিলাম, জ্যোতিবাবু-প্রমোদবাবুকে বোঝাতে পেরেছিলাম, মনে হয় পার্টির অন্যান্য নেতাদেরও। সুতরাং যা হবার তাই-ই হলো, দুই-এক বছরের মধ্যে সারা দেশে সংবাদপত্রে নিন্দা-প্রশংসা-জল্পনার খোরাক হয়ে গেলাম। সি পি আই-এর অন্যতম প্রধান নেতা, কিছুদিন কেরল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, লোকসভাতেও ছিলেন, বাসুদেবন্ নায়ার, বেশ কয়েক বছর বাদে একদিন তিরুবনন্তপুরমে দেখা, হেসে বললেন : 'তোমার ভয়ে ঐ ক'বছর কেন্দ্রীয় সরকার কাঁপতো।'

কথাটি সম্পূর্ণ ঠিক নয়, ১৯০৭-০৯ সালে যিনি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, মোরারজী দেশাই, তিনি অন্তত কম্পমান হতেন না। মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে তাঁর ঘ্যানঘেনে লম্বা বক্তৃতায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে যখন কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক বিষয়ে বা আমাদের অন্যান্য সমস্যার উল্লেখ করতাম, বৃদ্ধ প্রধান মন্ত্রী বিরক্তি প্রকাশ করতেন, বকুনি দিয়ে আমাকে থামাতে চাইতেন, আমি বেপরোয়া, আমার পাশ থেকে ওঁরই দলভুক্ত বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুর চোখ টিপে আমাকে উৎসাহ দিতেন, যেন চালিয়ে যাই, আমার কথা যে তাঁরই মনের কথা। মোরারজী দেশাই একগুঁয়ে মানুষ ছিলেন, প্রতিক্রিয়াশীল মানুষ ছিলেন, ছিটগ্রস্ত মানুষ ছিলেন, তা হলেও আমার ধারণা হয়তো পুরোপুরি খারাপ মানুষ ছিলেন না, ঝগড়া করতে-করতেই এক ধরনের সম্প্রীতি গজিয়ে গেল ওঁর সঙ্গে। একটি নজির দিই। মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন দিল্লির বিজ্ঞানভবনে শুরু হবে, জ্যোতিবাবু যাননি, আমি তাঁর প্রতিনিধিত্ব করছি সকাল দশটা কি সাড়ে দশটায় আমরা বাইরে জড়ো হয়েছি সভাকক্ষে ঢোকবার জন্য, প্রধান মন্ত্রী আমাকে দেখে লাঠি উঁচিয়ে কপট বিরক্তিতে বাক্যবাণ ছুঁড়লেন : 'তোমরা আমার কাছ থেকে একটা কানাকড়িও পাবে না।' আমার ঠ্যাটা প্রশ্ন : 'তাহলে আমাদের এখানে ডেকেছেন কেন?' মুহূর্তের মধ্যে মোরারজী দেশাইর শাণিত প্রত্যুত্তর : 'ডেকেছি এটা জানাতে যে আমার কাছ থেকে কানাকড়িও পাবে না।' অনেকবার জ্যোতিবাবুর সঙ্গে অথবা একা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে ওঁর দফতরে বা বাড়িতে গিয়েছি, প্রথম দিকে অধৈর্যপনার ইঙ্গিত দিলেও, দমে না গিয়ে তর্ক চালিয়ে গেলে, উনি শুনতেন, খানিক বাদে ঠাণ্ডাও হয়ে আসতেন। তবে বাই-ওলা মানুষ, একবার জ্যোতিবাবু আর আমি গঙ্গার নাব্যতা নিয়ে কথা বলতে গেছি, একটা-দুটো বাড়তি ড্রেজারের জন্য অনুরোধ জানিয়েছি, হলদিয়া বন্দরের উন্নতি বিধানের জন্য একাধিক অনুরোধ জ্ঞাপন করছি, পাঁচ-দশ মিনিটের বেশি ওসব প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের এগোতে দিলেন না : 'তোমাদের কমিউনিস্টদের নিয়ে আর পারা গেল না। এই তো গুজরাট-মহারাষ্ট্র অঞ্চলে আমার মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময় মদ্যপানের উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা চালু হয়েছিল, তার ফলে ওই অঞ্চলের এত অগ্রগতি, মানুষেরা কত ভাল আছে, কিন্তু পশ্চিম বাংলায় এ ব্যাপারে কোনও আগ্রহই নেই তোমাদের। অথচ এই তো বুলগানিন আর কোসিগিন এখানে এসেছিলেন, তাঁরা তো তোমাদের চেয়ে ঢের বড়ো কমিউনিস্ট,

তাঁদের দেশে সবাই মদে চুর হয়ে থাকে, আমি তাঁদের দু'ঘণ্টা ধরে বোঝালাম, মদ বন্ধ না করলে তাঁদের গতি নেই। সোভিয়েট নেতারা মুগ্ধ হয়ে আমার কথা শুনলেন, আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত জানিয়ে বিদায় নিলেন।' সৌজন্যবশত না জ্যোতিবাবু, না আমি, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম না, সোভিয়েট নেতৃদ্বয় মস্কোয় ফিরে গিয়ে তাঁকে কি জানিয়েছিলেন, মদ্যপান ওদেশে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন কিনা, কতটা বহাল তবিয়তে তাঁদের অতঃপর জীবনযাপন-জীবনধারণ চলছে।

আটাশ

মহা উৎসাহে কাজে ডুবছি, প্রশাসনের কলকাঠি কব্জা করছি, বিধানসভায় গরম-গরম বক্তৃতা দিয়ে খ্যাতি-অখ্যাতি দুই-ই কুড়োচ্ছি, বহু পার্টি কমরেডের সঙ্গে পরিচয় নিবিড়তর হচ্ছে। সাতাত্তর সালে নির্বাচিত বিধানসভায় কাছাকাছি এসেছিলাম অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়—গদাদা—, বিজয় পাল, মাধবেন্দু মহান্ত, গোপাল বসু, তরুণ সেনগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বসু, হারাধন রায়, যামিনীভূষণ সাহা, সুনীল বসুরায়, পান্নালাল মাজি, বামাপদ মুখোপাধ্যায়, আবুল হাসান, হরমোহন সিংহ, যামিনী মজুমদার, এমন অনেকের সঙ্গে। এঁদের নাম জানতাম, এবার কাছাকাছি পৌঁছুবার সুযোগ ঘটলো। গদাদা, যিনি পশুপালন মন্ত্রী হিশেবে শপথ নিলেন বিনয়দাদের সঙ্গে, দীর্ঘদিন নদীয়ায় পার্টির হাল ধরে ছিলেন, কৃষ্ণনগরের বনেদি বংশের সন্তান, অন্য অনেকের ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছে, তিনিও প্রথম যৌবনে অগ্নিযুগের অকুতোভয় সৈনিক হিশেবে আন্দামানে গিয়েছিলেন, সেখানে মার্কসবাদে দীক্ষা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গদাদা নাকি সোভিয়েট সেনাধ্যক্ষ বুদেনির ধাঁচে ইয়া লম্বা গোঁফ জাহির করতেন, তবে আমরা দেখিনি। অকৃতদার, কমিউনিস্ট পার্টি ধ্যান-জ্ঞান, অথচ বাড়িতে মাতৃসমা বউদির প্রতি ভক্তিতে অটল। সমর সেন চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে বিশেষ হৃদয়দৌর্বল্য-জনিত কারণে প্রায়ই কৃষ্ণনগর যেতেন। জনশ্রুতি, গদাদা উদ্যোগ নিয়ে সমরবাবুকে পার্টির প্রার্থী-সদস্যের স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। গোল বাধলো এক সন্ধ্যায় জনসভার আয়োজন ঘিরে : গদাদার নির্দেশ, সেই সভায় সমরবাবুকে বক্তৃতা দিতে হবে, শুনে সমর সেন কৃষ্ণনগর থেকে সারারাত পায়ে হেঁটে কলকাতা পালিয়ে এলেন, আর কোনওদিন পার্টিমুখো হননি।

বিজয় পালকে যত দেখেছি, মুগ্ধতর হয়েছি, এক সঙ্গে কঠিন ও কোমল, আদর্শ ও কর্তব্যপালনে অনড়, অথচ হৃদয় উপচে স্নেহবর্ষণেও অপ্রতিম। এই চাল-চুলোহীন মানুষটির কাছে আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলের জনগণ কেন আনুগত্যে অনড়, বুঝতে কোনওই অসুবিধা হতো না। হারাধন রায়ের অতি সম্প্রতি প্রকাশিত স্মৃতিকথা রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষজনের আন্দোলন ত্যাগ ও তিতিক্ষার ভিত্তিতে কী করে শক্তিশালী থেকে ক্রমশ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠলো, তার উজ্জ্বল বিবরণে ঠাসা বৃত্তান্তটি ব্যক্তি হারাধন রায়ের মতো সর্ব অর্থে খাঁটি। মাধবেন্দু মহান্তের নাম ছেলেবেলা থেকেই শোনা: বিপ্লবী রাজবন্দী, মাঝে-মাঝে খবরের কাগজে উল্লেখ থাকতো এই জেল থেকে অন্য জেলে চালান হয়েছেন; বিনয় ও নিঃশব্দ মাধুর্যের স্ফুরণ তাঁর ব্যক্তিত্ব থেকে। দেবী বসুকে বরাবর খুব চেনা মানুষ মনে হতো, বাঙালি কমিউনিস্ট বলতে মনে-মনে যে ছক কাটা ছিল, যেন তার আদর্শ সংস্করণ : নবদ্বীপসম্মত বিনয়ে সিক্ত, সাহিত্যরসে ভরপুর। গোপাল বসুর রাজনৈতিক বিশ্বাসে বাঙাল গোঁর প্রলেপ, তবে কাছে-টানার আশ্চর্য জাদু তাঁর ব্যক্তিত্ব জুড়ে। তরুণ সেনগুপ্ত পার্টিতে এসেছিলেন কংগ্রেস ত্যাগ করে, বুদ্ধিদীপ্ত প্রাজ্ঞ পুরুষ, অতি

অকালে চলে গেলেন। ইছাপুর-নোয়াপাড়া অঞ্চলের বলিষ্ঠ চেহারার জঙ্গি শ্রমিক নেতা যামিনী সাহা একসময়ে যে কাব্যচর্চা করতেন, ক'জনই বা তা এখন মনে রেখেছেন? আবুল হাসান একটি ব্যাপারে বিবেচনায় ভুল করেছিলেন, পার্টি থেকে তাই তাঁকে শাস্তি পেতে হয়েছে, তা হলেও শ্রমজীবী মানুষদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে, ও পার্টির বেড়ে ওঠার ইতিহাসে, তাঁর ভূমিকা আদৌ নগণ্য নয়, সাহস করেই বলা চলে, খাঁটি কমরেড। আরও-একজনের কথা মনে পড়ছে, যিনিও এখন দল থেকে অপসৃত, ময়ূরেশ্বরের পঞ্চানন লেট, খেতমজুর আন্দোলনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে-জড়ানো, আগাগোড়া সততায় মোড়া। এরকম আরও কয়েকজনের কথা বলি : কিষাণগঞ্জ-চোপড়া অঞ্চলের কৃষক নেতা, ছোটোখাটো মানুষটি, সততা ও আদর্শের প্রতিমূর্তি, বাচ্চা মুন্সী, ও হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া-বাওড়িয়ার রাজকুমার মণ্ডল। ট্রেড ইউনিয়ান নেতাদের মধ্যে উল্লেখ করবো দুর্গাপুরের দিলীপ মজুমদার ও উত্তরপাড়ার শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়ের; দু'জনের মধ্যে প্রকৃতিগত তফাত আছে, কিন্তু নিজেদের মতো করে উভয়েই রাজ্যে শ্রমিক আন্দোলনে জোয়ার আনতে অঢেল পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের নিদর্শন রেখেছেন। আসানসোলের সুনীল বসুরায় ও বামাপদ মুখোপাধ্যায়ের মতো নিশ্ছিদ্র ভালোমানুষেরা কী করে দুঁদে ট্রেড ইউনিয়ন নেতার ভূমিকা পালন করেন তা নিয়ে আমার বিস্ময়বোধ অব্যাহত। চণ্ডীতলার মলিন ঘোষ, চেঁচাতে যাঁর জুড়ি ছিল না, কলকাতায় সদাগরি দপ্তরে করণিক, নিজের এলাকায় কৃষক নেতা, তাঁকেও ভোলা অসম্ভব।

ব্যস্ততা ও সখ্যের অনুভবে দিন কাটছিল, হঠাৎ পরিবেশ একটু উত্তপ্ত। ভারত সরকারের সঙ্গে আমাদের গুরুতর বাগবিতণ্ডা বেধে যায় ১৯৭৮ সালের বন্যাত্রাণে কেন্দ্রীয় সাহায্য নিয়ে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের দু'মাসের মধ্যে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক বন্যা, আমি দিল্লিতে গিয়ে বলেছিলাম বঙ্গোপসাগর যেন দুশো মাইল উত্তরে উঠে এসেছে, জলের দানবীয় তোড়ে হাজার-হাজার মানুষের ভেসে যাওয়া, লক্ষ-লক্ষ গৃহহীন, গবাদি পশুও সেই সঙ্গে, সর্বাগ্রে ত্রাণের ব্যবস্থা করে সবাইকে বাঁচাতে হবে। পঞ্চায়েতের বন্ধুরা, পঞ্চায়েতের কাজে তখনও তাঁরা অনভিজ্ঞ, কিন্তু কৃষক সভার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে লালিত হয়েছেন, অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী, অহোরাত্র জান কবুল করে বন্যার্ত মানুষদের রক্ষা করেছেন, বানভাসি এলাকা থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, খাদ্য পৌঁছে দিয়েছেন, কলেরা-টাইফয়েড-ম্যালেরিয়ার প্রতিশেধক ওষুধ বিতরণ করেছেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সর্বস্তরের সরকারি কর্মচারীরা : রাজ্য কর্মচারীবৃন্দের নেতা অরবিন্দু ঘোষ ও অজয় মুখোপাধ্যায়ের কথা এই প্রসঙ্গে বার-বার মনে পড়ে। এতটা সুশৃঙ্খল সাহায্যের ব্যবস্থা সম্ভব হবে তা নিজেরাও ভাবতে পারিনি। অর্থ দফতরের দায়িত্বে আমি, সর্বস্তরের রাজপুরুষদের ও পঞ্চায়েত সভ্যদের খবর পাঠানো হলো, টাকার জন্য ত্রাণের কাজ যেন ঠেকে না থাকে। কলকাতা থেকে টেলিফোন-টেলিগ্রামে প্রতিটি ট্রেজারি দফতরে নির্দেশ গেল, টাকা না-পেলে যেন সঙ্গে-সঙ্গে কলকাতায় জানানো হয়। হঠাৎ একদিন রিজার্ভ ব্যাংক থেকে একটি প্রেস নোট বের হলো, তাঁরা চিন্তিত, পশ্চিম বাংলা বড়ো বেশি ওভারড্রাফট নিচ্ছে, নিয়ম ছাড়িয়ে গিয়ে। সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বললাম, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে রিজার্ভ ব্যাংকের কর্তারা হয়তো ভারতবর্ষে অবস্থান করছেন না, তাঁরা কি জানেন না পশ্চিম বাংলা ভয়াবহ বন্যায় ভেসে গেছে, নিয়মকানুন রক্ষার চেয়ে বন্যার্ত মানুষদের রক্ষা করাই এখন বড়ো কর্তব্য।' পরদিন রিজার্ভ ব্যাংকের গর্ভনর

টেলিফোনযোগে দুঃখপ্রকাশ করে ক্ষমা চাইলেন।

যাঁরা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তাঁদের গাত্রদাহ হলো। এমনিতেই সদ্যসমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁরা হেরে ঢোল, তার উপর এমন ঢালাও ত্রাণ সাহায্য পাওয়ার পর গ্রামবাংলার মানুষ কমিউনিস্টদের ছেড়ে আর ওঁদের দিকে ফিরেও তাকাবেন না। প্রতিপক্ষীয়দের মধ্যে কংগ্রেসিরা যেমন ছিলেন, মোরারজীর নিজের দলের লোকরাও; মোরারজী বরাবরই একটু কানপাতলা মানুষ। আমাদের টাকার দরকার, ওভারড্রাফ্‌ট বেড়ে যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল ঘুরে গেছেন, এক কিস্তি কেন্দ্রীয় সাহায্য এসে পৌঁছেছে বন্যাত্রাণ বাবদ, তারপর বন্ধ। এই অবস্থায় আমাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের সংঘাত চরমে উঠলো। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী রাজপুরুষ হিশেবে অতীতে বহুদিন মোরারজীর সঙ্গে কাজ করেছেন, তাঁর কথায় ওঠেন, তাঁর কথায় বসেন। টাকা আটকে গেছে, আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, এরই মধ্যে প্রধান মন্ত্রী সরেজমিনে বন্যা দেখতে এলেন, বিমান থেকে পরিদর্শন, মামুলি, দায়সারা ব্যাপার। সন্ধ্যাবেলা আমাদের সঙ্গে বৈঠক রাজভবনে, একপ্রস্থ প্রকাশ্য ঝগড়া হলো। প্রধান মন্ত্রী জানালেন, ত্রাণ সাহায্যে প্রথম কিস্তি যে-টাকা দেওয়া হয়েছে, তার খরচের হিশেব না-পেলে বাদবাকি টাকা ছাড়া হবে না। প্রধান মন্ত্রীকে মুখের উপর বলতে হলো, হিশেব দেওয়ার দায় আমাদের নয়, অডিটার অ্যান্ড কম্প্রোটার জেনারেলের। ঝগড়া আরও গড়াতে পারতো, সে সময় যিনি রাজ্যপাল ছিলেন, ত্রিভুবননারায়ণ সিংহ, মধ্যস্থ হয়ে ব্যাপারটি মিটিয়ে দিলেন।

রাজ্যপালের প্রসঙ্গ যখন এসেই গেল, ত্রিভুবননারায়ণ সিংহের কথা সামান্য বলি, না বললে তাঁর স্মৃতির প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে। উত্তর প্রদেশের মানুষ, স্বাধীনতা আন্দোলনের কালে নেহরু পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ। জওহরলাল নেহরু-প্রতিষ্ঠিত দৈনিক পত্রিকা ন্যাশনাল হেরাল্ড-এর কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন বহু বছর। ইন্দিরা গান্ধির প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রথম পর্বে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছিলেন, কী কারণে ইন্দিরার বিরাগভাজন হওয়াতে পত্রপাঠ তাঁর চাকরি যায়। ব্যথিতচিত্তে তিনি মোরারজী দেশাইদের সংগঠন কংগ্রেস দলে যোগ দিয়েছিলেন; জরুরি অবস্থার সময় তাঁকেও কয়েদ করা হয়। সাতাত্তর সালের জুন মাসে আমরা যখন শপথ গ্রহণ করলাম, তখন, আগেই বলেছি, রাজ্যপাল ছিলেন অ্যান্টনি ডায়াস। এমনিতে নির্বিবাদী মানুষ, তবে দুর্বলচিত্ত, স্ত্রীকে ভীষণ ভয় পান বলে বাজারে গুজব, তা ছাড়া ইন্দিরা গান্ধির পরম বশংবদ, যে কারণে জ্যোতিবাবু রাজ্যপাল হিশেবে তাঁর অবস্থান খুব একটা পছন্দ করছিলেন না। তখনও তো আমাদের সঙ্গে রাজনৈতিক নৈকট্য, জ্যোতিবাবুর মনোভাব জানতে পেরে কেন্দ্রীয় সরকার ডায়াসের মেয়াদ ফুরোলে তাঁর জায়গায় ত্রিভুবননারায়ণকে পশ্চিম বাংলায় রাজ্যপাল করে পাঠালেন; মোরারজীর সঙ্গে সেই মুহূর্তে জ্যোতির্ময় বসুর বেশ ভাব, তাঁরও খানিকটা হাত ছিল এই ব্যাপারে। ত্রিভুবননারায়ণ মাটির মানুষ, পড়াশুনোয় আগ্রহী, লেখাপড়া-জানা ব্যক্তিদের সম্মান দিতে জানতেন, আমাদের সরকারের মস্ত অনুরাগী ছিলেন। কী কারণে জানি না, আমাকে ঈষৎ পছন্দ করতেন, প্রায়ই নৈশাহারে আমাদের নিমন্ত্রণ জানাতেন, তাঁর শাদামাটা স্ত্রীও যোগ দিতেন। যে দুই বছর রাজ্যপাল ছিলেন, সরকারের সঙ্গে কোনও কিছু নিয়ে সমস্যা দেখা যায়নি। শুধু একবার কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মনোনয়নের প্রশ্নে একটু দ্বিধান্বিত হয়ে বলেছিলেন, 'রাজ্য সরকার যাঁকে সুপারিশ করেছেন তিনি অভিজ্ঞতায় খাটো'। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সম্মতি দিয়ে দেন।

ত্রিভুবননারায়ণ চুপি-চুপি একটি মজার কথা বলেছিলেন, এত বছর বাদে তা প্রকাশ করতে বাধা নেই বলেই মনে হয়। ডায়াস স্পষ্টত যেমন দুর্বল, তাঁর স্ত্রী তেমনই জাঁদরেল। মহিলার পিতৃদেব বিশের দশকে বাংলা দেশে খুব কড়া আই সি এস অফিসার ছিলেন, মহিলার আচার-আচরণেও কেমন কলোনিয়াল-কলোনিয়াল গন্ধ। ত্রিভুবননারায়ণ সংগোপনে আমাকে যা বলেছিলেন, কলকাতার রাজভবনে পুরোনো মদের অত্যন্ত উৎকৃষ্ট একটি সেলার ছিল, প্রচুর দামি বিলিতি পানীয়ের সম্ভার, ডায়াস-সহধর্মিণী কলকাতা থেকে বিদায় নেওয়ার কালে সেই সেলার নাকি পুরোটা মস্ত কাঠের বাক্সে বোঝাই করে সঙ্গে নিয়ে গেছেন। গল্পটির সত্য-মিথ্যা অবশ্য আমার জানা নেই। (অনুরূপ একটি গল্প শুনেছিলাম বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সম্পর্কে। উনি ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিশেবে ছিলেন বছর দুয়েক; মেয়াদ শেষ হলে প্রস্থান করলেন, নতুন রাষ্ট্রদূত কাজে যোগ দিয়ে আবিষ্কার করলেন বিজয়লক্ষ্মী অনেক মূল্যবান কার্পেট-বস্ত্রসামগ্রী-অলঙ্কার কিনে সঙ্গে নিয়ে গেছেন, দাম মেটাননি। বেচারা নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে ব্যক্তিগত তহবিল থেকে তা মেটাতে হলো।)

দ্বিতীয় পর্বে ক্ষমতায় ফেরার পর ইন্দিরা গান্ধি রাজ্যে-রাজ্যে বিশ্বস্ত, অনুগত রাজ্যপাল নিয়োগে মনোনিবেশ করলেন, ত্রিভুবননারায়ণ সিংহকেও সরিয়ে দিলেন। কলকাতার মানুষ তাঁকে যে বিদায়- সম্বর্ধনা জানালো, তা অন্য কোনও রাজ্যপালের ভাগ্যে ঘটেনি, আমার ধারণা ঘটবেও না। তারপরেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল; একবার কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন, খবর পাঠিয়েছিলেন, সস্ত্রীক গিয়ে দেখা করে এসেছিলাম; কয়েক বছর বাদে গত হন। তাঁর পরিবর্তে যিনি রাজ্যপাল হয়ে এলেন, ভৈরবদত্ত পাণ্ডে, দিল্লির অর্থমন্ত্রকে একসঙ্গে কাজ করেছি, তারও আগে থেকে আমাদের পরিচয়। তাঁকে নিয়ে প্রমোদবাবু-জ্যোতিবাবুর অনেক সংশয় ছিল, আমার আদৌ ছিল না, ওঁকে ভালো করে জানতাম বলে। ইন্দিরা গান্ধির তরফ থেকে মাঝে-মাঝে চাপ এলেও তিনি যে ক'বছর কলকাতায় ছিলেন, তা অগ্রাহ্য করেছেন, আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। তাঁর প্রস্থানের পর যে-দু'জন পর-পর এলেন, তাঁদের সম্পর্কে অনুরূপ কথা অবশ্য কিছুতেই বলা চলে না।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছি; প্রত্যাবর্তন প্রয়োজন। বাংলা সাংবাদিকতার সৌজন্যে আমাদের শোরগোল তোলার কাহিনীকে কেন্দ্রের 'বিমাতৃসুলভ' আচরণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বলে অভিহিত করা হচ্ছিল। এমন কুৎসিত শব্দটি বাংলা ভাষায় কী করে জায়গা দখল করে নিতে পেরেছে তা নিয়ে এখনও আমার বিস্ময়বোধ। আসলে আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল কেন্দ্র বনাম রাজ্যসমূহের স্বার্থের ক্রমশ-বাড়তে-থাকা বৈপরীত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ। কোনও ক্ষেত্রেই আলাদা করে পশ্চিম বাংলার হয়ে তদ্বির করার প্রশ্ন নেই, সমস্ত রাজ্যগুলিকে জড়িয়ে, সংঘবদ্ধ আন্দোলন করে, প্রতিটি রাজ্যের স্বার্থ প্রসারিত করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। যেমন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের স্বার্থে রফতানিব্য পণ্যাদির উপর বিক্রয়কর আরোপে রাজ্যের অধিকারের ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে কিছু বিধিনিষেধ চাপানোর চেষ্টা চলছিল, তার বিরুদ্ধে লড়াই। রফতানি থেকে সংগৃহীত বিদেশী মুদ্রার কানাকড়িও রাজ্যগুলির জন্য বরাদ্দ হয় না, তা হলে নিজেদের রাজস্ব সংগ্রহ-সম্ভাবনা বিসর্জন দিয়ে কেন্দ্রকে কেন আমরা খুশি করতে যাবো? এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পণ্যপরিবহনের উপরও বিক্রয় কর আরোপের ক্ষেত্রে নানা বাধা, তাই-ই বা থাকবে

কেন? আয়কর ও অন্তঃশুল্ক থেকে সংগৃহীত রাজস্বের একটি বড়ো অংশ রাজ্যগুলির প্রাপ্য, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই করের হার কী হবে সেই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারে থাকবে কেন? অনন্তকাল ধরে আয়করের উপর কেন্দ্রীয় সরকার একটি অভিভার, সারচার্জ, চাপিয়ে রাখছে, সংবিধানের পাতা খুলে দেখানো হতো এই অভিভার থেকে আদায়-করা পয়সাকড়িতে রাজ্যগুলির কোনও অধিকার নেই। কিন্তু করের হার না বাড়িয়ে সারচার্জ চাপানো তো এক ধরনের কারচুপি। সবচেয়ে বড়ো সমস্যা, সংবিধানের নিদান-অনুযায়ী পাঁচ বছর অন্তর-অন্তর রাষ্ট্রপতি-কর্তৃক যে অর্থ কমিশন নিয়োগ করা হয়, যে-কমিশনের প্রধান কৃত্য কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে আয়কর ও অন্তঃশুল্ক থেকে সংগৃহীত রাজস্বের বিভাজন নির্ণয়, তার নিয়োগ ও নির্দেশাবলী নির্ধারণে কেন্দ্র কেন একাই ছড়ি ঘোরাবে, রাজ্যগুলির মতামতের কোনও তোয়াক্কা না করে? এ সমস্ত বিষয় ঘাঁটতে গিয়ে সংবিধানের অন্ধিসন্ধি প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, সব সময় পাঞ্জাবির ঝোলায় সংবিধানের একটি ক্ষুদ্রাকৃতি সংস্করণ থাকতো, কোনও বিতর্ক উঠলেই সেটা বের করে সংবিধানের বিশেষ-বিশেষ ধারা পড়ে প্রতিপক্ষকে জব্দ করবার চেষ্টা করতাম।

কেন্দ্রে জনতা দলের সরকারকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে মোটামুটি তবু কব্জা করে আনা যাচ্ছিল, এখানে-ওখানে খিটিমিটি চলছিল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মধ্যে একজন-দু'জন কিছুটা সহানুভূতিশীল, অন্য কেউ-কেউ হয়তো নন। সব মিলিয়ে তা হলেও আমাদের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে তেমন অসুবিধা হচ্ছিল না। কিন্তু দ্রুত পটপরিবর্তন ঘটলো। আর্যাবর্তের রাজনৈতিক লীলাখেলার ঐতিহ্যে, বলতেই হয়, প্রধান স্থান দখল করে চিরদিনই আদর্শহীন সুবিধাবাদ। ইন্দিরা গান্ধির অনাচারের প্রতিবাদে, জয়প্রকাশ নারায়ণের প্রয়াসে, রক্ষণশীল ধাঁচের প্রাচীনপন্থী কংগ্রেস থেকে শুরু করে ঘোর জনসংঘী, চরম প্রতিক্রিয়াপন্থী কুলক সম্প্রদায় থেকে শুরু করে লোহিয়া-ধাঁচের বাক্যবাগীশ সমাজতান্ত্রিক পর্যন্ত, জনতা দলের ছত্রতলে সকলের সমাবেশ। জোড়াতালি-দেওয়া দল, জোড়াতালি-দেওয়া সরকার, দু'বছরও টিকলো না, মোরারজী দেশাইকে সরিয়ে দিয়ে প্রধান মন্ত্রীর গদি দখলের জন্য চরণ সিংহ উঠে-পড়ে লাগলেন, কেউ-কেউ তত্ত্ব দাঁড় করাতে চেষ্টা করলেন মোরারজীর তুলনায় চরণ সিংহ ঢের বেশি প্রগতিশীল। যা-ই হোক, দিল্লিতে সরকার পড়লো। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতায় কুলককুলপতি প্রধান মন্ত্রীর আসনে বসে জীবনের সাধ পূর্ণ করলেন। যা অবধারিত ছিল, চরণ সিংহকে মগডালে চড়িয়ে দু'দিন বাদে ইন্দিরা গান্ধি মইটা সরিয়ে নিলেন। ফের লোকসভা নির্বাচন। তিতিবিরক্ত দেশসুদ্ধ সাধারণ মানুষ, জরুরি অবস্থার বিভীষিকার স্মৃতি দ্রুত বিলীয়মান, ইন্দিরা গান্ধিকে ফের বরণ করে নিলেন। পশ্চিম বাংলায় অবশ্য বামফ্রন্টের দুর্গ অটল রইলো।

জনতা দল ভেঙে খান খান, হিন্দুত্ববাদীরা ভারতীয় জনতা পার্টিতে জোটবদ্ধ, তবে ইন্দিরা গান্ধির দ্বিতীয় আবির্ভাব-প্রসূত হিংস্রতা প্রতিহত করতেই সেই মুহূর্তে আমাদের অধিকতর ব্যতিব্যস্ততা। মোরারজীর প্রধানমন্ত্রিত্বে যতটুকু অসুবিধা হচ্ছিল, কংগ্রেস কেন্দ্রে ফিরে আসায় পশ্চিম বাংলায় বামফ্রন্টের সমস্যা তার বহুগুণ বাড়লো। ইন্দিরা গান্ধির রন্ধ্রে-রন্ধ্রে এখন স্বৈরাচারী মানসিকতা, দলকে যেমন সামন্ততন্ত্রের পরাকাষ্ঠায় পরিণত করেছেন, প্রশাসনেও সেরকম পরিবর্তন সাধনে তাঁর ষোলো-আনা অঙ্গীকার। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তিনি এক এবং অদ্বিতীয়া, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক বিন্যাসের প্রশ্নেও তাঁর দৃঢ় সংকল্প, রাজ্যগুলিকে তাঁর পদতললীনা হয়ে স্বর্ণবীণা বাজাতে বাধ্য করবেন। যেহেতু বিকেন্দ্রিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

প্রবর্তনের আন্দোলনে আমরা পশ্চিম বঙ্গ থেকে নায়কত্ব দিচ্ছিলাম, অচিরে তাঁর স্বভাবশত্রুতে পরিণত হলাম। আর এই সম্মুখসমরে মোরারজীর তুলনায় ইন্দিরার আক্রমণ অনেক বেশি ক্ষিপ্রতর, তীব্রতর।

ইতিমধ্যে আমাদের দিক থেকেও প্রতি-আক্রমণের তূণগুলি শাণিততর হয়েছে। আমরা সর্বদা ভূমিসংস্কারের কথা বলছি, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক ঢেলে সাজাবার কথা বলছি, দেশের মুদ্রাব্যবস্থা পরিচালনায় কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যগুলির সমান অধিকার স্থাপনের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি, ব্যাংক ও বিভিন্ন আর্থিক সংস্থাদির নীতিনির্ধারণে রাজ্যগুলির ভূমিকার স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নিরন্তর কথা বলছি। যে অর্থ কমিশন প্রতি পাঁচ বছর অন্তর কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে রাজস্ব বিভাজনের প্রশ্নে সুপারিশ পেশ করে, তাতে কারা-কারা থাকবেন, তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির ন্যায্য অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হচ্ছি। যোজনা কমিশনের উপর গোটা দেশের পরিকল্পনা রচনার দায়িত্ব ন্যস্ত; জাতির আর্থিক-সামাজিক প্রগতির রূপরেখা কেমনধারা হবে সেই সিদ্ধান্ত তো শুধু কেন্দ্রের খেয়ালখুশিমতো হওয়া শ্রেয় নয়, তা নিয়ে রাজ্যগুলিরও পরামর্শ দেওয়ার অধিকার আছে। অথচ যোজনা কমিশনকে তার ধারে-কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে না, সংস্থাটিকে আর-একটা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে পরিণত করা হয়েছে, এর চেয়ে অন্যায় কিছু হতে পারে না। আশির দশকে ইন্দিরা গান্ধির জমানায় এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে কেন্দ্রে শিল্পমন্ত্রী নারায়ণদত্ত তেওয়ারি, অথচ সেই সঙ্গে তিনি যোজনা কমিশনের কার্যকরী সভাপতিও। একদিন তেওয়ারিকে হেসে-হেসে বলেছিলাম, তিনি, জনৈক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, যোজনা কমিশনেও মোড়লি করছেন, এটা ভয়ংকর কেলেঙ্কারি : যোজনা কমিশনের বড়ো কর্তাকে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে অপক্ষপাতিত্ব বজায় রাখতে হবে, যা তাঁর পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়, সুতরাং তাঁর উচিত হয় কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অবিলম্বে পদত্যাগ, নয় তো যোজনা কমিশন থেকে সরে যাওয়া। আমার বাক্যাঘাতে তেওয়ারিও সেদিন মিটিমিটি হেসেছিলেন, কিন্তু বিষয়টি তো আদৌ রসিকতার বস্তু নয়।

একটু আগে যে-উক্তি করেছি, যতদিন জনতা দলের সরকার কেন্দ্রে বহাল ছিল, আশা জেগেছিল কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের ব্যাপারে হয়তো কোনও মৌলিক সংস্কার সাধন সম্ভব হবে। বিহারের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুর, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভৈঁরো সিংহ শেখাওয়াত, কেরলের অকংগ্রেসি প্রত্যেকটি মুখ্যমন্ত্রী, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী দেবরাজ উর্স্, এঁরা অনেকেই কেন্দ্রের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় আমাদের সোচ্চার সমর্থন করতেন। মুশকিল দেখা দিল আশি সালে ইন্দিরা গান্ধির প্রত্যাবর্তনের পর। লড়াই করে সব বিরোধীদের হটিয়ে তিনি হৃত সিংহাসন পুনর্বার দখল করেছেন; তার উপর ততদিনে তিনি সম্পূর্ণ স্বৈরাচারবিহারিণী, অদূর অতীত থেকে তেমন শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তাঁর আচরণ থেকে তা মোটেই মনে হতো না, রাজ্যগুলিকে টিট করার লক্ষ্যে সংবিধানে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ তাঁর পরম ধর্ম, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনীও রাজ্যগুলিকে তিনি ছাড়বেন না। এই পর্বে প্রথমে তাঁর অর্থমন্ত্রী ছিলেন তামিলনাডুর পুরনো কংগ্রেস নেতা ভেঙ্কটরামন, পরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। তাঁর রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও যুক্তির কথামালা সাজিয়ে ধরলে বেঙ্কটরামন অন্তত মন দিয়ে শুনতেন। কিন্তু কিছুদিন বাদে জনৈক বাঙালি ভদ্রলোক অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন, নিজের রাজ্যে বা অন্যত্র কোথাও তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব ছিল না, ইন্দিরাজীর প্রসাদেই তাঁর অস্তিত্ব নির্ভর। সব রাজ্যকেই ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে

তিনি একরোখা ছিলেন, তবে পশ্চিম বাংলার বাড়তি সর্বনাশ সাধনের ব্যাপারে সত্যিই তাঁর জুড়ি ছিল না। আমরা বারবার করে যে-কথাগুলি বলতে চাইছিলাম, সংবিধানের প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহের সঠিক প্রয়োগও ঘটছে না, ধারাগুলির সংস্কারও হচ্ছে না, রাজ্যগুলির আর্থিক বরাদ্দ তাই বাড়ছে না; অথচ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব তাদের, উন্নয়নের ক্রমশ বিস্তীর্ণতর কর্মসূচি রূপায়ন তাদেরই দেখতে হয়; কেন্দ্রীয় সরকার তো দূরের আকাশ, এক হাজার-দেড় হাজার কিলোমিটার দূরে তার অবস্থান, কিন্তু রাজ্য প্রশাসন এই এখানে, জনগণের অতি সামীপ্যে, রাজ্যমন্ত্রীদের চেনেন-জানেন সাধারণ মানুষ, এই মন্ত্রীদের কাছে তাঁরা আর্জি নিয়ে আসেন, তাঁদের সন্তুষ্টিবিধান করতে না-পারলে মন্ত্রীদের একটা চড় কষিয়ে দিতেও বোধহয় পিছুপা হন না তাঁরা। এই অবস্থায় রাজ্যগুলি কী করবে? আমরা তো নোট ছাপাতে পারি না, বাড়তি কর সংগ্রহের সুযোগ আমাদের সীমিত, বাজার থেকে ঋণপত্র ছেড়ে অতিরিক্ত অর্থ তুলতে হলেও কেন্দ্রের পূর্বানুমতি প্রয়োজন। নিছক কৌশলগত কারণে নয়, নীতিগত কারণেও রিজার্ভ ব্যাংক থেকে ওভারড্রাফট নেওয়া আমি অতএব প্রায় নিয়মের পর্যায়ে উন্নীত করে ফেললাম। একটু চড়া হারে সুদ দিতে হয়, তা ঠিক, তবে তা তো পরের ব্যাপার, রাজ্যের উপার্জন ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে সুদের বোঝা তেমন অসহনীয় ঠেকবে না, আপাতত তাই ওভারড্রাফট মারফত ঋণের পন্থা ধরা যাক না কেন। তা ছাড়া, কেন্দ্র-রাজ্য লড়াইয়ে রাজ্যগুলির জয় হলে ঋণের পুঞ্জীভূত বোঝা নিয়েও ভবিষ্যতে আলোচনা করে তা লাঘবের জল্পনা তেমন অযৌক্তিক নয়।

এই সমস্ত কিছু নিয়েই কেন্দ্রের সঙ্গে মহা গোল বাধলো। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর নির্দেশে প্রতি সপ্তাহে পশ্চিম বাংলার বর্ধমান ওভারড্রাফট সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য প্রেস নোট দিয়ে মহা উল্লাসে প্রকাশ করা রিজার্ভ ব্যাংকের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। আমার বিবেচনায় এটা ঘোর বেনিয়ম : ধনী পুঁজিপতিরা ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে তা ফেরত দেন না, তাঁদের ঋণের মাত্রা উপস্থিত কত তা জানতে চাইলে অর্থমন্ত্রক থেকে এখনও বলা হয়, ওটা গোপন ব্যাপার, বাইরে জানানো আইনত সম্ভব নয়; অথচ রাজ্যগুলির ওভারড্রাফটের ক্ষেত্রে গোপনীয়তার প্রশ্ন যেন কিছুই নেই, সপ্তাহে-সপ্তাহে তা সাধারণ্যে জানিয়ে রাজ্যগুলিকে বিব্রত করতে কেন্দ্রের সীমাহীন উৎসাহ। ফতোয়া জারি করে এরই মধ্যে একবার কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী, যাঁর মাতৃভাষা বাংলা, আমাদের ওভারড্রাফট নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। একটু চিমটি কাটলেন আর কী; ক'দিন পশ্চিম বাংলার জনসাধারণকে বাড়তি দুর্ভোগে পড়তে হলো, আমাদের যুদ্ধে বিরতি ঘটলো না তাতে। (আমি রাইটার্স বিল্ডিং থেকে চলে আসার পর নজরে এলো, পশ্চিম বঙ্গ সরকার হঠাৎ ভীষণ ভালো ছেলে বনে গেছে, ওভারড্রাফট নেই, আয়ের চৌহদ্দির মধ্যে ব্যয়ের অবস্থান, 'শূন্য ঘাটতি'র বাজেট। আমার দ্বিধাহীন অভিমত, এই ভোল-পাল্টানো ভূমিকা রাজ্য সরকারের চিন্তাধারার সঙ্গে বিশ্রীরকম সামঞ্জস্যবিহীন। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের উচ্চাবচতাহেতু রাজ্যগুলি ধুঁকছে, সেই জীর্ণ অবস্থারই জানান দিত স্ফীতকায় ওভারড্রাফট; তা নেওয়া বন্ধ করে দেওয়ার অর্থ হলো পৃথিবীর কাছে ঢাক পিটে ঘোষণা করা সব সমস্যা মিটে গেছে, রাজ্যে আর্থিক অনটন আর নেই, পাশ-বালিশে ভর দিয়ে ঘুমোনো যায় এবার।)

যে ক'বছর রাজ্য সরকারে অর্থ দফতরের হাল ধরে ছিলাম, জ্যোতিবাবু কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের যুদ্ধে আমাকে অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন। তিনি বোধহয় সামান্য মজাই পেতেন, কেন্দ্রের মন্ত্রী-শান্ত্রীদের পরোয়া না করে চেঁচিয়ে যাচ্ছি, তাঁর এক মন্ত্রীর হট্টগোলে

ধরণী সচকিত হচ্ছে। অন্যান্য মন্ত্রীদের—যেমন গদাদা, পরিবহন মন্ত্রী প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা রবীন মুখোপাধ্যায়, প্রভাসদা, মহম্মদ আমিন, প্রশান্ত শূর, সবাইর—কাছ থেকেও প্রচুর উৎসাহ পেয়েছি। তবে সর্বাগ্রে কবুল করতে হয় পার্টির কাছ থেকে পরিপূর্ণ সহযোগিতার কথা। প্রশাসনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রমোদবাবু প্রবেশ করতে চাইতেন না, কিন্তু কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের রাজনৈতিক গুরুত্ব তিনি বহুদিন ধরেই অনুধাবন করছিলেন, অন্তত বছর দশেক আগে থেকেই পার্টিতে সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা চলেছে। এবার রাজ্য সরকারে থেকে আমাদের আন্দোলন সোচ্চার থেকে সোচ্চারতর হয়ে সেই আলোচনাকেই যেন অন্য একটি স্তরে উত্তীর্ণ করলো। সর্বত্র রাজ্যকে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার দাবি ছড়িয়ে পড়লো, কলকাতা, মফস্বল, শহর-শহরতলি, এমনকি গ্রামাঞ্চলেও, যত্রতত্র প্রাচীরগাত্রে, গাছের বাকলের উপরেও, দাবির ধ্বনি-প্রতিধ্বনি : রাজ্যকে অধিক ক্ষমতা দিতে হবে। রাজ্য সরকারের অর্থসঞ্চয় যথেষ্ট বাড়লে পঞ্চায়েত ব্যবস্থারও প্রসার যে সহজতর হবে, বুঝতে কারও তেমন অসুবিধা হলো না। রাজ্যে যাঁরা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, তাঁরা একটু বিপদে পড়লেন। রাজ্যের হাতে বাড়তি ক্ষমতা ও অর্থপ্রদান অন্যায়, তা তাঁরা মুখ ফুটে বলতে পারছেন না, অথচ বামফ্রন্ট সরকার বেশি টাকা পেলে তাঁদের সর্বনাশ। তা হলেও যার যা প্রাপ্য, তা তাকে দিতে হয়। তারিফ করবো প্রতিপক্ষীয়দের একটি একান্ত বাঙালি রসিকতার : তখনও চরম বিদ্যুৎ সংকট চলছে, গাড়িতে যাচ্ছি, হঠাৎ কাটোয়া না কালনা কোন শহরে, জ্বলজ্বল করে দেয়ালে লেখা দেখলাম, 'রাজ্যের হাতে অধিক মোমবাতি দিতে হবে'।

ঊনতিরিশ

বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম পাঁচ বছরে দু'টি ঘটনা, সংবাদপত্রাদির প্রবল উৎসাহে, আমার কুখ্যাতি ছড়াতে পর্যাপ্ত সাহায্য করেছিল। প্রথমটি কিছু ভুয়ো সঞ্চয়সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ নিয়ে। ইত্যাকার সংস্থা অবিশ্বাস্য বেশি সুদের লোভ দেখিয়ে অনেক পরিবারের সর্বনাশ করতে উদ্যোগী হয়েছিল। তাদের প্রচার, প্রতি মাসে এমন কি শতকরা ছত্রিশ ভাগ হারেও তারা সুদ দেবে মূলধনের উপর; গোড়ার দিকে এমনধারা সুদ দিয়েও থাকতো। কিন্তু গোটা দেশে, গোটা পৃথিবীতে এমন কোনও শিল্পবাণিজ্যের কথাই ভাবা যায় না যেখানে এমন পরিমাণ লাভ হতে পারে, এবং যে লাভ থেকে ওই উঁচু হারে সুদ দেওয়া সম্ভব। পুরো জিনিশটাই বুজরুকি : খ-র গচ্ছিত টাকা খরচ করে ক-কে সুদ পৌঁছনো, গ-র রাখা টাকা থেকে খ-কে সুদ পৌঁছনো, ঘ-র গচ্ছিত টাকা থেকে গ-কে সুদ বুঝিয়ে দেওয়া। এই ক্রমানুক্রমিক ব্যবস্থা একটা পর্যায়ে ভেঙে পড়তে বাধ্য, তখন হাজার-হাজার আমানতকারীর সর্বনাশ ঠেকানো আর সম্ভব হবে না: দুর্নীতিমূলক ব্যবসাটি যদি অবিলম্বে বন্ধ না করা যায়, হয়তো লক্ষ-লক্ষ পরিবার সর্বস্বান্ত হবে। কাগজে বেশ কয়েকদিন বিজ্ঞাপন দিয়ে জনসাধারণকে এই সর্বনেশে লোভের খপ্পরে না পড়বার জন্য সকাতর আবেদন জানানো হলো : দোহাই, জেনে-শুনে বিষ পান করবেন না। কা কস্য পরিবেদনা, বাঙালি মধ্যবিত্ত চটজল্‌দি উপার্জনের নেশায় মাতোয়ারা। মন ঠিক করে ফেললাম, ভীমরুলের বাসা ভাঙতে হবে। অর্থসচিব কুট্টি এবং আমার সিদ্ধান্ত, বাইরের কাউকেই জানানো হলো না। বিক্রয় বা প্রমোদ করের চুরিধাড়ি ধরবার জন্য অর্থ দফতরের আওতায় যে-পুলিশবাহিনী ছিল, শুধু তার প্রধানকে ডেকে একেবারে শেষ মুহূর্তে বুঝিয়ে বলা হলো। হেয়ার স্ট্রিট থানায় অসৎবৃত্তির মামলা রুজু করে একটি তথাকথিত সঞ্চয় প্রতিষ্ঠানের একাধিক দফতরে হানা দেওয়ার অভিযান অতি প্রত্যূষে। চারদিকে হই হই রই রই। যাঁরা টাকা জমা রেখেছিলেন সরল মনে, তাঁরা ঘাবড়ে গিয়ে মূলধন ফেরত পাওয়ার আশায় প্রতিষ্ঠানের শাখা দফতরগুলির বাইরে ভিড় জমালেন, তাঁদের দাবি মেটানোর মতো সামর্থ্য প্রতিষ্ঠানের ছিল না, থাকা সম্ভব ছিল না। প্রতিষ্ঠানের সংগঠকরা অচিরে পলাতক। বেশ কয়েক হাজার পরিবার তাঁদের সঞ্চিত মূলধন খোয়ালেন। অশোক মিত্রের নামে ঢিঢিক্কার পড়ে গেল। শুনলাম আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক বলেছেন : 'সুদের ওই টাকা দিয়ে চিংড়ি মাছ খেতাম, অশোক মিত্র আমার চিংড়ি মাছ খাওয়া বন্ধ করে দিল'। পরে জেনে চমকিত হলাম, আমার এক ঘোর বিপ্লবী সুহৃদ, কথায়-কথায় বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিক্রিয়াশীলতাকে গাল পাড়তেন, তিনিও ওই প্রতিষ্ঠানে টাকা জমা রেখেছিলেন, এভাবে টাকা খোয়া যাওয়ায় তিনি বিপ্লবী থেকে বিপ্লবীতর হয়ে গেলেন। আমার সম্পর্কে এক ভাইঝি, সে নাকি সমস্ত গয়নাগাঁটি বেচে, ব্যাংক থেকে দীর্ঘমেয়াদী আমানত তুলে এই প্রতিষ্ঠানে ফাটকা খাটিয়েছিল; রবীন্দ্রনাথের কবিতার সাগর-জলে-সিনান-করা কন্যার মতো, সে এখন থেকে নিরাভরণ।

বেশি ঠকেছিলেন শেষের দিকে যাঁরা টাকা জমা রেখেছিলেন, তাঁরা ; প্রথম দিকে যাঁরা রেখেছিলেন, তাঁরা গচ্ছিত টাকার সমপরিমাণ সুদের কিস্তি মারফত আগেই পুরো ফেরত পেয়ে গিয়েছিলেন।

প্রধান মালিক ফেরার, তার সাঙ্গোপাঙ্গরাও। বাজারে আমার কুৎসা ছড়িয়ে পড়লো : টেলিফোনে গালাগাল, শাসানো চিঠি, লাশ সাত টুকরো করে ফেলে দেওয়া হবে ইত্যাদি। তবে যে যাই বলুক, পার্টির ভিতর থেকে প্রচুর অভিনন্দন কুড়োলাম, অনেকেই বললেন জনগণের স্বার্থে বামফ্রন্ট কাজের মতো কাজ করেছে। গুজব কানে এলো, প্রতিষ্ঠানের সেই ফেরার মালিকের পক্ষ থেকে কাকে নাকি খবর পাঠানো হয়েছে, সে যদি আমার সঙ্গে একবার সেই জোচ্চোরটির দেখা করিয়ে দিতে পারে, তা হলে তাকে এক কোটি টাকা দেওয়া হবে, আর আমাকে একশো কোটি। নিজেদের মধ্যে প্রচুর হাসাহাসি। একমাত্র বিপদ যা দেখা দিল, প্রমোদবাবুর নির্দেশ, আপাতত কয়েক মাস দেহরক্ষী নিতে হবে।

ফেরার সংগঠককে কিছুতেই ধরা যাচ্ছিল না, পুলিশ কর্তাদের ডেকে প্রচুর উপরোধ করছি, বকাঝকা করছি, কোনও লাভ হয়নি। এক ঝানু আই এ এস অফিসার আমার কাছে একান্তে হাঁড়ি ভাঙলেন, 'স্যার, যতদিন পুলিশের লোকেরা ঐ প্রতিষ্ঠানে তাদের গচ্ছিত টাকা পুরো ফেরত না পাচ্ছে, ততদিন ওই মালিক ধরা পড়বে না।' বছর খানেক বাদে তিনি একদিন এসে জানালেন, 'স্যার, এবার বোধহয় লোকটা ধরা পড়বে। আমার কাছে খবর, পুলিশের কেষ্টবিষ্টুরা এতদিনে তাদের সমস্ত টাকা ফেরত পেয়ে গেছে।' হলোও তাই, সপ্তাহখানেক বাদে পুলিশের এক বড়োকর্তা সুসংবাদ দিলেন, লোকটা ধরা পড়েছে, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো আমার, এবার দক্ষভাবে মামলা চালিয়ে ওকে যথোপযুক্ত সাজা দিতে হবে। পুলিশের বড় কর্তাটিকে বারবার করে বললাম, 'এই ব্যক্তিকে কড়া পাহারায় রাখবেন, একে জেরা করে অনেক মূল্যবান খবর বের করা সম্ভব হবে'। বৃথাই আমার সতর্কবাণী উচ্চারণ। দিন দশেক না কাটতেই সেই পুলিশ কর্তাই কাঁচুমাচু মুখ করে টাটকা খবর জানালেন, লুকনো টাকা উদ্ধারের আশায় পুলিশের লোক প্রবঞ্চকটিকে বারো না চোদ্দো তলা বাড়ির সর্বোচ্চ তলায় নিয়ে গিয়েছিল, কী করে ঘরে ঢুকে যেন লোকটা পুলিশকে এড়িয়ে সেই বারো না চোদ্দো তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। এই রহস্যময় মৃত্যু নিয়ে অনুসন্ধানের জন্য প্রচণ্ড তাগিদ বোধ করেছিলাম, সন্দেহ না হয়েই পারছিল না নিজেদের কুকীর্তি ঢাকবার জন্য সম্ভবত কিছু পুলিশ কর্মচারী লোকটিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল, সর্ষের মধ্যেই ভূত। আমাকে বোঝানো হলো, কোনও লাভ হবে না, কিছু জল ঘোলা করা ছাড়া। গভীর অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ সত্ত্বেও ইচ্ছাকে সংবরণ করতে হলো।

অন্য অভিজ্ঞতা আমলাঘটিত। মুখ্যমন্ত্রী বিদেশে, সাময়িকভাবে আমি বিদ্যুৎ বিভাগের দায়িত্বে, পরিশ্রম করছি, প্রায়ই এটা-ওটা বিদ্যুৎ কারখানা যান্ত্রিক বা অন্য কোনও কারণে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, গ্রীষ্মের শুরু, মানুষের দুর্দশার সীমা নেই। যেখানেই কোনও বিদ্যুৎ কারখানায় গোলমাল দেখা দেয়, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সভাপতির সঙ্গে কথা বলে সুজিত পোদ্দারকে সেখানে পাঠিয়ে দিই, তার উপর কড়া নির্দেশ, যতক্ষণ পর্যন্ত কারখানা চালু না হচ্ছে, বিদ্যুৎপ্রবাহ ফের সঞ্চারিত না হচ্ছে, সে ফিরতে পারবে না। সুজিত অহরহ ব্যান্ডেল যাচ্ছে, সাঁওতালডিহি যাচ্ছে, প্রযুক্তিবিদ্‌দের সঙ্গে কথা বলছে, শ্রমিক-প্রতিনিধিদের সঙ্গেও। বারো-চোদ্দো ঘণ্টা পর কারখানা চালু হলে আমাকে টেলিফোন করে কলকাতায় ফেরার অনুমতি চাইছে।

জ্যোতিবাবু বাইরে যাওয়ার আগে জরুরি কী-কী ব্যাপারে আমাকে দৃষ্টি দিতে হবে, তা বিশদ করে বুঝিয়ে গিয়েছিলেন। সরকারে ঢুকেই আমরা বিগত বছরগুলির স্খলন-পতন শোধরাবার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য প্রচুর টাকা বরাদ্দ করেছি, তবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, টাকা বরাদ্দ করলেও নতুন কারখানা তৈরি হতে চার-পাঁচ বছর লাগে। প্রতিদিন প্রতিরাত্রি বিদ্যুতের অনটন, উৎপাদিত বিদ্যুতের একটি বড়ো অংশ বামফ্রন্ট সরকার শিল্পক্ষেত্রে বরাদ্দ করেছে বলে কলকাতার মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তদের মনে জমে-থাকা ক্ষোভ, অনেকে ধরেই নিচ্ছেন সরকারি ব্যবস্থাপনায় ঢের ত্রুটি, বেসরকারি পরিচালনায় অবস্থার উল্লেখযোগ্য হেরফের ঘটবে।

নানা মহলে বেসরকারি মালিকদের প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে প্রচুর প্রশংসাবাণী তখন উচ্চারিত হচ্ছিল, বেসরকারি পরামর্শ নিলেই যেন বিদ্যুৎ ঘাটতির অবসান ঘটবে। রাজ্যের প্রধান সংবাদপত্রগুলির গলা সবচেয়ে চড়া। সেই সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের নিন্দাচর্চায়ও তারা সদামুখর : রাজ্য সরকার অপদার্থ, কুচক্রী, অসাধু, এই সরকারের মন্ত্রীরা অকর্মণ্য, প্রতিদিন খবর কাগজ জুড়ে এই গোছের সংকীর্তন। সম্ভবত কাগজের মালিকেরা মনে-মনে আশা পোষণ করছিলেন, নিন্দা-মন্দ করে বামফ্রন্ট সরকারকে সরিয়ে দেওয়া যাবে, হয়তো রাজ্য প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করতে কেন্দ্রকে রাজি করানো যাবে, সুতরাং কুৎসা চালিয়ে যাওয়া যাক, বেসরকারি প্রতিভার নিরন্তর গুণকীর্তন করা যাক। বিদেশী ও বেসরকারি মালিক কিংবা পরিচালকদের প্রতিভা ও দক্ষতা সম্পর্কে আমার কিন্তু সেরকম শ্রদ্ধার ভাব কোনও কালেই ছিল না। ইন্ডিয়ান ইনিস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টে ও ভারত সরকারে কর্মরত থাকাকালীন ওঁদের অনেকের সঙ্গেই আমার দেখাসাক্ষাৎ-আলাপ- পরিচয় হয়েছিল। সমাজের যে-স্তর থেকে এঁদের উদ্ভব, সেখান থেকেই সরকারের সঙ্গে যুক্ত রাজপুরুষ ও প্রযুক্তিবিদদেরও : মেধা এবং পারদর্শিতায় তাঁদের মধ্যে কোনও তফাত কোনওদিন ধরতে পারিনি। রঙ্গ করে আগে যা বলেছি, বেসরকারি শিল্পের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁরা অবশ্য মদ্যপানের কৃতিত্বে একটু এগিয়ে।

বিভিন্ন বিদ্যুৎ কারখানা সাময়িক বিকল হচ্ছে, আমি আর সুজিত বিব্রত অবস্থায় আছি, এমন সময় একদিন সকালে চা পানের মুহূর্তে কাগজে পড়লাম, বিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞদের একটি বেসরকারি প্রতিনিধি দল কলকাতায় জড়ো হয়েছেন, রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ডের সাঁওতালডিহি বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদন অহরহ ব্যাহত হচ্ছে, তাঁরা নাকি গিয়ে সব ঠিকঠাক করে দেবেন, ইতিমধ্যেই তাঁরা সাঁওতালডিহির পথে রওনা হয়ে গেছেন। খবরটি পড়ে আমি হতভম্ব : আমি আপাতত বিদ্যুৎমন্ত্রী, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কীভাবে নেওয়া হলো, কারাই বা নিলেন, আমার সম্পূর্ণ অজান্তে, রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ডের সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনিও ঘুণাক্ষরে কিছু জানেন না। বিদ্যুৎ সচিবকে ডেকে পাঠালাম। তাঁর কাছে জানতে চাইলে ঈষৎ তাচ্ছিল্য-ভরা জবাব পেলাম : এসব ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলোচনা করা তাঁর প্রয়োজন মনে হয়নি, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আগেই আলোচনা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেই এই বেসরকারি দলকে পাঠানো হচ্ছে। আমি তাঁকে বললাম, মুখ্যমন্ত্রী এই সম্পর্কে আদৌ আমাকে কিছু জানিয়ে যাননি, এই অবস্থায় অতএব আমার সঙ্গে আলোচনা না-করে কোনও সিদ্ধান্ত হতে পারে না। তথাচ বিদ্যুৎ সচিব এঁড়ে তর্ক করার চেষ্টা করলে আমি একটু কড়া করে বললাম, 'বেশি কথা বলে লাভ নেই, আমার দায়িত্ব আমি জানি, তা ছাড়া দয়া করে মনে রাখবেন আমি ভদ্রলোক নই, আমি কমিউনিস্ট; অনুগ্রহ করে অবিলম্বে

এই বেসরকারি প্রতিনিধিদলকে সাঁওতালডিহি থেকে ফিরিয়ে আনুন। রাগে গজগজ করতে-করতে বিদ্যুৎ সচিব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু নির্দেশ না-মেনে তাঁর উপায় ছিল না। তিনি বেরিয়ে গিয়ে খবরের কাগজের মানুষদের—ও বেসরকারি শিল্পমহলকে—ঘটনাটি সালংকারে জানিয়ে দিলেন, অন্তত তাই আমার অনুমান।' পশ্চিম বাংলায় সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্রে আমার শ্রাদ্ধ করা হলো, শিল্পমহলও সমান উত্তেজিত: বেসরকারি বিশেষজ্ঞরা গিয়ে বিদ্যুৎ কারখানার যন্ত্রপাতি সব ঠিক করে দিয়ে আসতেন, পশ্চিম বাংলার মানুষ একটু স্বস্তি পেতেন, এই হতচ্ছাড়া মন্ত্রী তা হতে দিলেন না, ধিক তাকে, ধিক ধিক ধিক। প্রমোদবাবুকে গিয়ে সব কথা খুলে বললাম, তিনি মুখ টিপে হাসলেন।

ওই সপ্তাহেই কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের সঙ্গেও একটু ভুল বোঝাবুঝি হলো। যদিও রাজ্য সামগ্রিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের বড়ো অংশই সরকারি রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ডের অধীনস্থ কারখানাগুলিতে উৎপাদিত হয়, কলকাতা ও হাওড়ার বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা পুরোপুরি সি. ই. এস. সি-র হাতে, রাজ্য বোর্ডের কাছ থেকে শস্তায় কিনে বেসরকারি সংস্থাটি কলকাতার নাগরিকদের বিদ্যুৎ বেচে প্রচুর লাভ করতেন, এখনও করেন বলে আমার সন্দেহ।

বিদ্যুৎ সচিবের সঙ্গে যেদিন কথা-কাটাকাটি, সম্ভবত তার দিন দশেক আগে লক্ষ্য করলাম সি. ই. এস. সি.-র তরফ থেকে কাগজে-কাগজে একটি অতি আপত্তিজনক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হচ্ছে। অনেক গ্রাহক অভিযোগ করেছেন, সি. ই. এস. সি. থেকে প্রতি মাসে খুব বেশি টাকার বিল পাঠানো হচ্ছে, একদিকে বিদ্যুতের জোগান কমছে, অন্যদিকে বিলের পরিমাণ বর্ধমান। তিরিক্ষি মেজাজের এই বিজ্ঞাপনের বক্তব্য, বিল বাড়ছে তার জন্য সি. ই. এস. সি. দায়ী নয়, গ্রাহকরা প্রায়ই ভুল করে আলো-পাখার সংযোগ না নিভিয়ে বাইরে বেড়াতে যান, এতটুকুও দায়িত্বশীল নন তাঁরা, সেজন্যই বিলে বেশি টাকা উঠছে; যদি গ্রাহকরা সাবধানী না হন, নিজেদের শিক্ষিত না করেন, বেরোবার আগে সব সুইচ ভালো মতো দেখে বন্ধ করে না যান, তা হলে সি. ই. এস. সি-র কিছু করবার নেই।

গরমের সময় এমনিতেই লোকের কষ্টের অবধি নেই, তার উপর এমন উদ্ধত বিজ্ঞাপন সি. ই. এস. সি-র পক্ষ থেকে, শেষ পর্যন্ত তো সাধারণ মানুষের রাগটা সরকারের উপরই পড়বে, সরকারের দয়াতেই তো সংস্থাটি ব্যবসা চালাচ্ছে। সি.ই.এস.সি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে খবর পাঠালাম, ঠান্ডা মাথার মৃদুভাষী অতি সজ্জন ভদ্রলোক। তাঁকে বুঝিয়ে বললাম, এরকম পরিস্থিতিতে ওই রগচটা বিজ্ঞাপনে হিতে বিপরীত হবে, জনসাধারণের আরও ক্ষিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা, তাই দয়া করে উনি যেন বিজ্ঞাপনটি অবিলম্বে প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করেন। তিনি বুঝলেন, বললেন দফতরে ফিরে গিয়েই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। অথচ দিন যায়, গোটা সপ্তাহ যায়, ওই একই বিজ্ঞাপন সমানে বেরোচ্ছে, প্রত্যাহারের লক্ষণ নেই। বিদ্যুৎ সচিবের সঙ্গে খিটিমিটি হলো, মনটা খিচড়ে ছিল, পরের দিনই বোধ হয় সি. ই. এস. সি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে ফের ডেকে পাঠালাম। আমার মনে ইতিমধ্যে সন্দেহ ঢুকে গেছে, হয়তো বিদ্যুৎ সচিবের সঙ্গে পরামর্শ করেই আমার অনুরোধ উপেক্ষা করা হচ্ছে। ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে বললাম, তাঁকে কথা জানানো সত্ত্বেও বিজ্ঞাপনটি বেরিয়েই যাচ্ছে, প্রত্যাহারের কোনও লক্ষণ নেই, অতএব আমাকেও এবার একটু কঠোর হতে হচ্ছে; কাগজেই তো তিনি দেখেছেন, খবর বেরিয়েছে, আমি ভদ্রলোক নই, কমিউনিস্ট; তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছি, দফতরে ফিরে গিয়ে অবিলম্বে বিজ্ঞাপনটি বন্ধ করে দেবেন,

সেই সঙ্গে আমাকে চিঠি দেবেন এই মর্মে যে, সরকারের অনুমতি ব্যাতিরেকে সি.ই.এস.সি এখন থেকে কোনও বিজ্ঞাপন দেবে না। ম্যানেজিং ডিরেক্টর সবিনিয়ে জানালেন তাঁদের বিজ্ঞাপন বেরোয় একটি বিজ্ঞাপন সংস্থার মারফৎ। তাঁদের বিজ্ঞাপনটি বন্ধের নির্দেশ ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নির্দেশটি পালিত হতে দেরি হচ্ছে। যা-ই হোক, তিনি দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী, এবং স্খলনটি যদিও তাঁদের গাফিলতির জন্য নয়, তা হলেও তিনি আমার অনুজ্ঞা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবেন। তাই-ই হলো। বিজ্ঞাপনটি বন্ধ হলো, সেই সঙ্গে তিনি চিঠি দিলেন, এখন থেকে সরকারের অনুমোদন ছাড়া সি. ই. এস. সি বাজারে কোনও বিজ্ঞাপন ছাড়বে না।

এক দিনের ব্যবধানে দুই ব্যক্তির কাছে একই বাক্য উচ্চারণ সম্ভবত বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো ব্যাপার, তবে আমার চিরদিনই যা ধারণা, তাই-ই আরও বদ্ধমূল হলো, এক ধরনের রাজপুরুষ শক্তের ভক্ত, নরমের যম। ম্যানেজিং ডিরেক্টর মশাইর সঙ্গে পরে আমার সম্পূর্ণ সম্প্রীতি পুনর্স্থাপিত হয়েছিল। সি. ই. এস. সি-র চেয়ারম্যান, অতি অমায়িক বুদ্ধিমান মানুষ, ভুল বোঝাবুঝি যাতে আর না-গড়ায় সেজন্য তাঁকে অনুরোধ জানালাম, তাঁর কাছ থেকে যথোপযুক্ত সাড়া পেলাম।

জ্যোতিবাবু সবাইকে নিয়ে চলতে আগ্রহী, বিদ্যুৎ সচিবকে নিয়ে জটিলতা তাঁর হয়তো তেমন পছন্দ হয়নি। আমার অভিমত ছিল সচিবটিকে অবিলম্বে অন্য বিভাগে সরিয়ে দেওয়া হোক। জ্যোতিবাবুর তখনও তাঁর সম্পর্কে আস্থার ভাব, সম্মত হলেন না। কিন্তু মাস কয়েক না গড়াতেই অন্য একটি ঘটনা, মুখ্যমন্ত্রীকে পরোয়া না করে সচিব মহাশয়ের এক অতিশয় অন্যায় আচরণ, তাঁকে তাই শেষ পর্যন্ত সরে যেতেই হলো। সচিব রাজপুরুষটির প্রতি আমার তখনও কোনও বীতরাগভাব ছিল না, এখনও নেই, তবে প্রশাসনের কতগুলি আবশ্যিক নিয়মকানুন না মানা হলে মুশকিল।

বিদ্যুৎক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগের গর্বিত ফানুস গত কয়েক বছরে পুরোপুরি চুপসে গেছে। পশ্চিম বাংলায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আজ যে পালাবদল, তা ঘটেছে প্রধানত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে, বিদ্যুৎক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রতি বছর রাজ্য বাজেটে বাড়িয়ে-বাড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে । সারা পৃথিবী জুড়েই বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহকারী সংস্থাগুলি সম্পর্কে সম্প্রতি ব্যাপক আশাভঙ্গ। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পর্যন্ত, ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে, বিদ্যুৎক্ষেত্রে বিরাষ্ট্রীয়করণের পরিণামে মস্ত সংকট দেখা দিয়েছিল মাত্র কয়েক বছর আগে, আর এনরন করপোরেশনের দেশে-দেশে পুকুর-চুরি গোছের কার্যকলাপ তো এখন সকলেরই জানা।

তবে 'ভদ্রলোক নই, কমিউনিস্ট' বাক্য উচ্চারণে বোধ হয় পার্টির মধ্যে কিছু আলোড়ন ও দ্বিধা দেখা দিয়েছিল। কেউই আমাকে কিছু মুখ ফুটে বললেন না, কিন্তু পার্টির উপরমহলে মধ্যবিত্ত ধ্যানধারণার সমারোহ, আরও একটু বাড়িয়ে বলতে পারি, প্রায় প্রত্যেকেরই তিন-চার পুরুষ আগে পিতামহ-প্রপিতামহর আমলে জমিজমা ছিল, জমিদারি মানসিকতা মার্কসীয় গ্রন্থাদি পড়লেও ঠিক ঘুচতে চায় না। হালে অনেকে গাল পাড়েন, সোভিয়েট দেশ ও পূর্ব ইওরোপের অন্যত্র সাম্যবাদী আন্দোলনের দুর্দশার প্রধান কারণ লেনিন-প্রবর্তিত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা নীতি। যে-পরিস্থিতিতে গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের সার্থকতার স্বার্থে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রবর্তন করেছিলেন লেনিন, বিপ্লবোত্তর সোভিয়েট রাষ্ট্রে তা কতটা প্রযোজ্য ছিল, সেই প্রয়োগ থেকে কোন ধরনের কী-কী ঘুণ বাসা বেঁধেছিল,

নাকি মোটেই বাঁধেনি, এ সব নিয়ে এই পক্ষে-ওই পক্ষে এন্তার আলোচনা-প্রতিআলোচনা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। আমাদের দেশেও সাম্যবাদী আন্দোলনের যাবতীয় ত্রুটি-দুর্বলতার জন্য যত-দোষ-নন্দ-ঘোষ হিশেবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা তথা জোসেফ স্টালিনের বহুরটিত স্বৈরাচারী মাসিকতাকে দায়ী করার চেষ্টা আপাতত খুব জোরদার। আমার দৃঢ় প্রতীতি, বৃথাই লেনিন বা স্টালিনের উপর দোষ চাপানো, আমাদের এখানে, বিশেষত বাঙালি পরিবেশে, বামপন্থীদের মধ্যে স্খলন-পতন যা ঘটছে, তার জন্য গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে অপরাধী করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আসলে দায়ী জমিদারি মনোবৃত্তি। কেউ-কেউ ভীষণ কুপিত হবেন, কিন্তু রাজ্যের কমিউনিস্ট পার্টির বহু স্তর জুড়ে এখনও জমিদারি সেরেস্তার গন্ধ। এমনিতে ঢিলেঢালা পরিবেশ, কিন্তু নেতৃস্থানীয়দের সম্বন্ধে আতিশয্যযুক্ত সম্ভ্রম, কোনও পর্যায়ে যা প্রায় খোশামুদিতে পরিণত হওয়ার উপক্রম। এই মানসিকতারই একটি প্রচ্ছন্ন ছায়া পার্টির সদস্যদের ভদ্রলোক-ভদ্রলোক আচরণে। কানা-ঘুষো শুনতে পেলাম, কারও-কারও স্বগত বিলাপ, 'অশোক মিত্র এটা কী বললেন? আমরা নিখাদ কমিউনিস্ট, তা বলে কী সেই সঙ্গে আমরা নিখাদ ভদ্রলোকও নই?' গুঞ্জন আরও শুনলাম, এরকম নাটুকেপনার কী প্রয়োজন ছিল? গুরুজনস্থানীয়দের মধ্যে একমাত্র হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সুতীব্র আবেগের সঙ্গে আমার সমর্থনে সোচ্চার হলেন, আমার ঘোষণার অভ্যন্তরে কী নিবিড় দার্শনিক ভাবনা লুকিয়ে আছে তাঁর লেখা পড়ে তা জেনে নিজেই চমৎকৃত হলাম।

অবশ্য বিধানসভায় আমার জঙ্গি ভূমিকা পার্টির সব মহলেই উৎসাহ সঞ্চার করছিল, তাতে ভাঁটা পড়লো না। প্রতিক্ষয়ীদের অধিকতর বিরাগভাজন হতে থাকলাম, তাতে অবশ্য আমার মাথাব্যথা ছিল না। কেন্দ্রের সঙ্গে আমার লড়াই করে যাওয়ার প্রবণতাকে বঙ্গভাষীদের অভিমানাহত সত্তা, বোঝা যাচ্ছিল, অনেকটাই পছন্দ করতে শুরু করেছে।

আমলাদের সঙ্গে চেষ্টা করতাম বন্ধু কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিশেবে আচরণ করতে। কাজের বিচ্যুতি দেখলে স্পষ্ট কথা বললাম, কিন্তু সবাইকেই কড়া কথা বলি, এই সংবাদ যথেষ্ট প্রচারিত হওয়ার ফলে আমলারা আমার হাঁকডাকেও অভ্যস্ত হয়ে গেলেন, তবে আড়ালে সম্ভবত একটু ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতেন। সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠন তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে দেখা করতে আসতেন, একবার হিশেব করে দেখেছিলাম আড়াইশো থেকে তিনশো সংগঠনের প্রতিনিধি ফি বছর আলোচনায় আসছেন। তাঁদের অনেককেই বলতাম, একটু ধৈর্য ধরে থাকুন, আপনাদের প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় সরকারি কাজকর্মে যথাশীঘ্র উন্নতি সাধিত হবে, প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রসার ঘটবে, তখন সরকারের সামর্থ্যও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে মাইনেপত্তরের হারও আরও ঊর্ধ্বগামী হবে। এরকম যে হয়েছে তা অর্থ বিভাগের বিক্রয়কর শাখার ব্যাপ্তি থেকেই বুঝে নেওয়া যায়; গত দুই দশকে এই বিভাগের আয় অন্তত পনেরো গুণ বেড়েছে, তার সুফল সরকারের সর্বক্ষেত্রে অনুভূতও হয়েছে।

আমার সঙ্গে আলোচনায় যখন কোনও কর্মচারী সংগঠন খুশি হতে পারতেন না, তাঁদের অসন্তোষ সরবই থাকতো, হাত জোড় করে রঙ্গ মিশিয়ে তাঁদের বলতাম: 'দেখুন, আপনাদের দাবি-দাওয়া এই মুহূর্তে তো আমার পক্ষে মেটানো সম্ভব নয়; এক কাজ করুন, বেরোবার মুখে দরজার পাশে ওই দেখুন একটা লাঠি দাঁড় করানো আছে, লাঠিটা দিয়ে প্রত্যেকে আমার মাথায় একবার ঘা মেরে যান।'

আমাদের সরকারে প্রবেশ করার এক মাসের মধ্যেই বেতন কমিশন গঠন করা হয়েছিল;

কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে অধিকাংশ সুপারিশ কার্যকর করার ব্যবস্থা। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী-সহ গোটা রাজ্যে প্রায় কুড়ি লক্ষ মানুষ রাজ্য সরকার থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বেতন-ভাতা পেয়ে থাকেন; কুড়ি লক্ষ পরিবার, অর্থাৎ এক কোটির মতো মানুষ তাই সরকারের সিদ্ধান্ত থেকে প্রথম পর্যায়েই উপকৃত। কংগ্রেসি আমলে সরকারি কর্মচারী তথা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সম্প্রদায় যে গভীর হেলাফেলায় ছিলেন, তার আমূল পরিবর্তন ঘটলো। অর্থাভাব, কিন্তু এই দায় পালন করার মধ্যে মস্ত চরিতার্থতাবোধও ছিল।

তবে বেতন কমিশনের সুপারিশ চালু করতে গিয়েও হাজার সমস্যা। বিভিন্ন সরকারি বিভাগে প্রতিটি স্তরে বহু বেতনভাতাগত অসামঞ্জস্য, কমিশন কিছু-কিছু দূরীকরণের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু করতে গিয়ে, প্রায় অসহায়, নতুন অসামঞ্জস্যের সূত্রপাত করেছেন। একাশি সাল থেকে যে-সার্বিক বেতনক্রম ঘোষিত হলো তাতে সব সমস্যার সমাধান হলো না, হওয়া সম্ভবও ছিল না। বেতন-ভাতার অসামঞ্জস্য ঘোচানোর প্রয়াস অর্থ দপ্তরের সুতরাং বারোমাস্যায় পরিণত; অর্থমন্ত্রীর ঘরে ডেপুটিশনের পালাও। পৃথিবীতে নেই কোনও বিশুদ্ধ চাকরি, বেতনক্রমও নেই।

অন্তত একটি ব্যাপারে আমার অতৃপ্তি অব্যাহত। বেতন-ভাতা পেনশনের নতুন নিয়মাবলী একাশি সাল থেকে কার্যকর হলো, তখন যাঁরা কর্মরত, তাঁরা সে-সবের সুযোগসুবিধা পাবেন, কিন্তু যাঁরা সেই তারিখের আগে অবসর নিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে কী হবে? আমার খুব ইচ্ছা ছিল ইতিমধ্যে-অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে অন্তত পেনশনের পরিমাণ যাঁরা আগামী দিনে অবসর নেবেন, তাঁদের প্রাপ্যের সঙ্গে সমীকরণ করা হোক। সেই ইচ্ছা পুরোপুরি পূরণ হয়নি।

এ-সমস্ত সার্থকতা-অসার্থকতা পেরিয়ে অন্য যে লাভ হয়েছিল তা কার্যসূত্রে পশ্চিম বাংলার প্রত্যেকটি জেলায় আদ্যন্ত চষে বেড়ানোয়, স্থানভেদে মানুষজনের মুখ্য ভাষার ঈষৎ আদলফের, নানা আঞ্চলিক-ভৌগোলিক বিন্যাস, কৃষি-ক্ষুদ্র শিল্প-সংগঠিত শিল্পের হাল, রাস্তাঘাটের অবস্থা, আমলাতন্ত্রের কাঠামো, রাজনৈতিক দন্দ্ব-সমাসের ঘোর-প্যাঁচ ইত্যাদি নিয়ে বহুবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জেলায় বা জেলার প্রত্যন্তে গাড়িতে চেপেই পৌঁছে যেতাম, সরকারি চালক বিজয় বড়ুয়া অতি দক্ষ গাড়ি চালানোয়, মেজাজে একটু খ্যাপাটে। খ্যাপাটে হওয়ার কারণও ছিল। রাস্তায়-ঘাটে আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা একটু কমই পেত, অন্যান্য মন্ত্রীদের মতো খানিক বাদে থেমে ঘন-ঘন চায়ের খোঁজ করতাম না, কিন্তু বড়ুয়ারও যে মাঝে-মাঝে একটু বিশ্রাম প্রয়োজন, পানীয় বা আহার্যের প্রয়োজনও অমার্জনীয়ভাবে তা ভুলে থাকতাম। আমার টনক নড়লো যখন শুনতে পেলাম কার কাছে যেন সে আমার সম্পর্কে নালিশ জানিয়েছে, তার অননুকরণীয় পূর্ববঙ্গীয় বিভঙ্গে, 'হ্যা নিজেও খাইবো না, আমারেও খাইতে দিবো না'।

তিরিশ

জেলায়-জেলায় ঘুরে বেড়ানোর সুযোগে সবচেয়ে যা মোহিত করতো তা পার্টির শহর, শহরতলি ও গ্রামস্তরের কমরেডদের সান্নিধ্য। পার্টি বড়ো হয়েছে, রাজ্যের জনগণের একটি প্রধান অংশের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে, সংগঠন ক্রমশ পাকাপোক্ত, সমস্ত-কিছুর মূলে কিন্তু রাজ্যময় বিস্তৃত এই হাজার-হাজার সাধারণ কর্মীর শ্রম ও তিতিক্ষা। তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্লাবনে ভেসে গিয়ে মাঝে-মাঝে ভয়গ্রস্ত হতে হতো : এত আস্থার যোগ্য কি হতে পেরেছি, হতে কি পারবো, আচরণে বিনম্র থাকতে পেরেছি কি, এঁদের বিশ্বাসের যথাযথ প্রতিদান দিতে পারবো কি। প্রায়ই অভিভূত হয়ে যেতাম জেলা বা শাখা দফতরের সঙ্গে সর্বক্ষণ-যুক্ত-থাকা কমরেডদের দেখে। এঁদের মধ্যে অনেকে হয়তো অতীতে হাতে বোমা-পিস্তল নিয়ে বিদেশী প্রভুদের দেশ থেকে তাড়াবার স্বপ্ন দেখেছেন, পরে কারাভ্যন্তরে মার্কসবাদে দীক্ষা নিয়েছেন, বেরিয়ে এসে অনেক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, ফের জেলে গেছেন, পুলিশের লাঠিসোঁটা খেয়েছেন, অনশন-ধর্মঘট করেছেন, এখন বছরের পর বছর পার্টি সংগঠনের দায়িত্বে আছেন। নিঃসংকোচে পুনরুক্তি করছি, এঁদের অনেকেরই নাম ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে না, কিন্তু এঁরাই তো আসলে ইতিহাস রচনা করেন।

রাজনীতির আবর্তে পড়ে আমি কি এই ঘোর-লাগা বছরগুলিতে একান্ত ব্যক্তিগত বন্ধুদের ভুলে ছিলাম? নিশ্চয়ই তা নয়, তবু এতটা সময় প্রশাসনে ও পার্টিগত দায়িত্বে ব্যয় করতে হতো যে আলাদা সময় বলে নিজের কিছু থাকতো না। তা হলেও নিয়ম করে যে-যে রবিবার বা ছুটির দিনে বাইরে যেতাম না, বন্ধুদের ডেকে নিয়ে নরক গুলজারের আয়োজন। সেই রাবিবারিক আড্ডায় নিকটজনরা আসতেন, চা-কফি-চানাচুর-বিস্কুট, কখনও-কখনও সন্দেশ-পান্তুয়া-রসগোল্লা, কবি-সাহিত্যিক বন্ধুরা আসতেন, বৃত্তির বন্ধুরা, অধ্যাপককুলের মধ্যে কেউ-কেউ, একজন-দু'জন নাটকের লোক, কোনও তকমা না-আঁটা নিছক 'বাউণ্ডুলে' বন্ধু একজন-দু'জন, অকূলে সদাই ভেসে যেতাম। কয়েক ঘণ্টার জন্য এভাবে ভেসে-যাওয়ার হয়তো প্রয়োজনও ছিল, সপ্তাহের বাকিটা সময় তো রাজনীতি-অর্থনীতি-প্রশাসনিক কচকচানি।

এই বছরগুলি আমার কাছে মর্মান্তিকও, অন্য কারণে : বন্ধুজনের মৃত্যু। ঘনিষ্ঠতম তিন বন্ধু, আতোয়ার রহমান সাতাত্তর সালের শেষের দিকে, অন্য দু'জন, অরুণকুমার সরকার ও সুরঞ্জন সরকার, আশি সালের গোড়ায় গত হলেন। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তো প্রয়াত হয়েছিলেন তারও আগে, ছিয়াত্তর সালে, যখন আমি সাসেক্সে অধ্যাপনারত। এটা ঘটনা, আমার অধিকাংশ বন্ধু বয়সে আমার চেয়ে বেশ কয়েক বছরের বড়ো, অথচ তাঁদের সঙ্গে হার্দ্যিক বিনিময়-প্রতিবিনিময়ে কোনওদিনই বিন্দুমাত্র অসুবিধা দেখা দেয়নি।

আতোয়ার রহমান কঠিন অসুখে ভুগছিলেন বেশ কিছুদিন ধরে, আমার মহাকরণে

ঢোকবার কয়েকমাসের মধ্যেই তিনি চলে গেলেন, অসহায়া স্ত্রী নীরা ও আকুল-শোকে-ভেসে-যাওয়া পুত্র টিটো ও কন্যা বুড়িকে রেখে; জীবনে এমন দাগা খুব কমই পেয়েছি। সুরঞ্জন সরকার ও অরুণকুমার সরকারের সঙ্গে যেই পর্বে আলাপ, আমি প্রায় কিশোর, ওঁরা উদ্দাম যৌবনের মধ্যলগ্নে : ওঁদের চিঠির জোয়ার আমার উপকূলে, আমার চিঠির প্রত্যাঘাত ওঁদের দুয়ারে। দেশভাগের পরিণামে আমার কী সবচেয়ে বড়ো ব্যক্তিগত বিষাদবোধ, কেউ প্রশ্ন করলে উত্তর জোগাতে আমাকে কিঞ্চিৎতমও দ্বিধান্বিত হতে হবে না। যে দুই ক্যাম্বিসের ঝোলায় সুরঞ্জন-অরুণকুমার সরকারের পত্রগুচ্ছ রক্ষিত ছিল, তা সেই ডামাডোলের কালে কোথায় হারিয়ে যায়; শুধু আমার পক্ষেই নয়, গলা উঁচু করে বলতে পারি, বাংলা সাহিত্যের পক্ষেও তা অপূরণীয় ক্ষতি। একটা সময়ে সুরঞ্জন ও অরুণকুমার সরকার পরস্পরের হরিহর-আত্মা বন্ধু ছিলেন, কাজও করতেন কেন্দ্রীয় সরকারের একই দফতরে। এসব ক্ষেত্রে কখনও-কখনও যা হয়ে থাকে, তাঁদের নিজ-নিজ বৃত্ত পরে আলাদা হয়ে যায়, নিঃশব্দ পারস্পরিক অনুরাগ যদিও অটুট ছিল। অরুণকুমার সরকার, বার-বার স্পর্ধিত উক্তি করছি, উত্তর-তিরিশ যুগের অন্যতম প্রধান বাঙালি কবি, কিন্তু প্রচারবিমুখ, সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকেননি কোনওদিন, তাঁর অনুজ আলোক সরকারের মতোই, সম্বর্ধনা-সম্ভাষণের ধার-কাছ দিয়ে হাঁটেননি, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সুতরাং তাঁর নাম জ্বলজ্বল করে লেখা থাকবে না।

অরুণকুমার সরকার আশি সালের জানুয়ারিতে প্রয়াত হলেন, সুরঞ্জন মাস তিনেক বাদে। তাঁর মৃত্যুর মুহূর্তে অরুণকুমার সরকারের একমাত্র সন্তান অভিরূপ বিদেশে; সে পরে কৃতী হয়েছে, কিন্তু সেই কৃতিত্ব তার বাবা দেখে যেতে পারলেন না।

বন্ধুরা ক্রমশ উধাও, আমার ফ্ল্যাটের রাবিবারিক আড্ডার ভিড় ক্ষীয়মাণ, কিরণময় রাহা-রবি সেনগুপ্ত-ধ্রুব মিত্ররা তখনও আসেন, মাঝে-মাঝে দমকা হাওয়ার মতো সুরজিৎ সিংহ, শান্তি চৌধুরী বা রবি ঘোষ। সমর সেন সাধারণত আসতেন না, আমিই যেতাম তাঁর সুইনহো স্ট্রিটের বাড়িতে। সেখানেও আড্ডায় জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, সব চেয়ে আগে গেলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ অগ্রজ অমলদা, বৃত্তিতে হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক, তা ছাপিয়ে তাঁর পূর্ণতর পরিচয় সর্বাত্মক সমাজসেবী মানুষ, যেখানে যার যত সমস্যা, অমলদা সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড়ে তুলে নিচ্ছেন। সমান চমৎকার মানুষ ছিলেন তাঁদের মেজোভাই গাবুদা, বিখ্যাততম বাঙালি শিল্পসংস্থার সঙ্গে যুক্ত, মনটা সদাই উড়ু-উড়ু সান্ধ্য আড্ডার প্রতীক্ষায়, পৃথিবীর সমস্ত গুজবের ভাষ্য-ভাষ্যান্তর গাবুদার নখাগ্রে। পানপিপাসু, তবে ধাতস্থ হতে পারেননি কোনওদিনই, একটা-দুটো চুমুকের পরই কেমন নেতিয়ে পড়তেন, কিন্তু এই মানুষটির ভালোত্ব সম্পর্কে কারও মনে কোনও প্রশ্নই জড়ো হতো না। ততদিনে নিরঞ্জন মজুমদার প্রয়াত, তবে দেবু চৌধুরী অবশ্যই থাকতেন, সেই সঙ্গে প্রায়ই তাঁর ঢাকা-যুগের বন্ধু সুবোধ বসু, পেশায় গোত্রহীন, তবে বসুধৈব কুটুম্বকম্। আরও বছর দশেক বাদে, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা প্রায় সবাই অন্তর্হিত, তবু সখ্যের মোহ কাটে না, সোনারপুর থেকে ঠেঙিয়ে প্রতি রবিবার সকালে আমাদের ফ্ল্যাটে হাজির হতেন সুবোধদা, কখনও-কখনও পুরো দিনটা কাটিয়ে যেতেন।

সমরবাবুদের কাচের গেলাসের সেই ঠাসা আড্ডায় মাঝে-মাঝে উদয় হতাম, খানিকক্ষণ থেকে অন্যত্র ধাওয়া। দুই দাদা সদ্য গত হয়েছেন, সমরবাবুর বুকে শেল হানলো মার্কিন মুলুকে জ্যেষ্ঠা কন্যা বীথির আত্মহনন। বীথি সম্পর্কে আমার ও আমার স্ত্রীর সস্নেহ দুর্বলতা

ছিল, পাগলাটে, একগুঁয়ে, কিন্তু আশ্চর্য বুদ্ধিমতী, চাতুর্যে-মাধুর্যে উজ্জ্বলা। কিশোরীবয়স থেকেই সে বিদ্রোহিণী। ইংরেজি সাহিত্যে ভালো ছাত্রী, সুন্দর লেখার হাত, অথচ বাবা-মা'র সঙ্গে মনের আড়াআড়ি। কুড়ি না পেরোতেই বিয়ে করলো, সে বিয়ে খুব অল্প দিনই টিকে ছিল, তারপর তার আপাতউচ্ছৃঙ্খল দিনযাপন, অথচ সেই সঙ্গে নিষ্পাপ কোমলতা। স্বামীর সঙ্গে ক্ষণিক সময়ের জন্য পুনর্মিলন, আবার ছাড়াছাড়ি, এবার পুরোপুরি বিবাহবিচ্ছেদ, কিছুদিন তার ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো। বীথির ফুটফুটে পুতুলের-মতো-সুন্দর-দেখতে মেয়েটি, বাশুিল, সমরবাবু ও সুলেখা সেন নিজেদের কাছে রেখে বড়ো করেছেন, ছেলেবেলায় বাবা-মা'র সান্নিধ্য তার ভাগ্যে জোটেনি, সে-ও তাই তখন ছিল, যা আদৌ আশ্চর্যের নয়, অসম্ভব খেয়ালি।

বিবাহবিচ্ছেদের সামান্য পরে বীথি একটি ধড়িবাজ মালয়ালি ছেলের পাল্লায় পড়ে, তার সঙ্গে বিয়েরও অনুষ্ঠান হয়, দু'জনের বস্টন গমন। বছর না ঘুরতেই বীথি বুঝতে পারলো জীবনে আর একবার ভুল করেছে। এর আগেও সে একবার-দু'বার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে, শেষ মুহূর্তে বন্ধুরা কেউ গিয়ে বাঁচিয়েছে, এবার তাকে আর রক্ষা করা গেল না। আমেরিকা যাওয়ার মুহূর্তে বাশুিলকে সমরবাবুদের কাছ থেকে বীথি কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। বিদেশে কন্যার অপমৃত্যু, বালিকা নাতনি নিঃসহায় একা, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বাশুিলকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হলো। সমরবাবু এমনিতেই রুগ্ণ ছিলেন, এবার শরীর প্রচণ্ড ভেঙে পড়লো। বেশ কয়েকমাস কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত, হাসপাতাল-নার্সিং হোম ঘুরে বাড়ি আসার পর স্বাস্থ্য খানিকটা ফিরলো, মনের বিষণ্ণতা অব্যাহত। 'বাবু বৃত্তান্ত'-এর নির্দয় নাস্তিক অধ্যায়গুলি কয়েকমাস ধরে লিখেছেন, আরও হয়তো লিখতেন, কিন্তু মনে কোনও উৎসাহ পেলেন না, প্রকৃতিগত ব্যঙ্গ-বোধ গভীর তিক্ততায় আচ্ছন্ন, তবে এটাই বাঙালি ভদ্রলোক চরিত্রের স্ববিরোধিতা, সেই তিক্ততার বাচনিক বহিঃপ্রকাশ নেই, প্রায় সকলের সঙ্গেই স্বল্পবাক, নম্রভাষী, একমাত্র সহ্যের সীমা পেরোলে একটি-দু'টি খণ্ডিত বাক্যের প্রহারে শত্রু-সংহার করতেন। আর শত্রু তো পৃথিবী জুড়ে, পৃথিবীতে তো ভণ্ড-বুজরুকদের, তাঁর বিবেচনায়, শেষ নেই।

একটি ছোট্ট ঘটনার কথা মনে এলো। সমরবাবু গুরুতর অসুস্থ, বন্ধুরা মিলে ওঁকে সুখলাল কারনানি হাসপাতালে ভর্তি করবার ব্যবস্থা করেছি। জ্যোতিবাবুকে অনুরোধ জানালাম, সমরবাবুর যথাসম্ভব যত্ন নেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা মহাশয়কে ডেকে একটু অনুরোধ জ্ঞাপন করতে। মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে-সঙ্গে উক্ত ভদ্রলোককে ডেকে পাঠালেন, 'আপনারা তো জানেন উনি আমাদের একজন প্রধান কবি, আশা করি আপনি ও আপনার সহকর্মীরা ওঁকে একটু দেখবেন।' শাণিত রসিকতায় জ্যোতিবাবু প্রতিদ্বন্দ্বীহীন, হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন, 'আমিও একবার ভাবছিলাম সমরবাবুকে দেখতে যাবো, কিন্তু আমাকে দেখলে ওঁর অসুখ হয়তো বেড়ে যাবে'।

বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম পাঁচ বছর প্রায় সমাপ্তির মুখে, ইতিমধ্যে বিধানসভায় প্রতিপক্ষীয়দের প্রচুর বীতরাগের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছি, তাতে আমার কিছুমাত্র বিষাদবোধ নেই। সর্ববৃহৎপ্রচারিত বাংলা দৈনিক পত্রিকাটিরও বিষম চক্ষুশূল হয়েছি, তাঁরা আমার সম্পর্কে ইনিয়ে- বিনিয়ে অনেক অকথা-কুকথা লিখতেন, যে-কারণে একটা সময় আমার ধারণা হয়েছিল ওই পত্রিকার দফতরে যখন নবীন কর্মী-কর্মিণীদের নিয়োগ করা হয়, তাঁদের জন্য সম্ভবত প্রথমেই বিশেষ অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকে, কী করে তথ্যের সঙ্গে বিন্দুমাত্র

সংস্রবহীন অঢেল মিথ্যে কথা তড়তড় করে লিখতে শেখা যায়। ওই গোষ্ঠীর এক তরুণ সাংবাদিকের দূরদর্শনে এক ভাষণ শুনে একদিন চমৎকৃত হয়েছিলাম : সত্য বলে কোনও বস্তু নেই, তথ্যের কোনও বিশেষ অবয়ব নেই; আমরা আমাদের মনের মতো করে যা পরিবেশন করবো, তা-ই সত্য, তা-ই তথ্য।

সুতরাং আঁচ করতে পারছিলাম, নতুন যে-নির্বাচন আসন্ন, তাতে অনেক দিক থেকে আক্রমণের শিকার হবো। পার্টির অভ্যন্তরেও তা নিয়ে উদ্বেগ। আমিই প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির প্রতীক নিয়ে রাসবিহারী কেন্দ্র থেকে জয়ী হই সাতাত্তর সালে, একমেবমদ্বিতীয়ম্। ওই কেন্দ্রের যা শ্রেণীচরিত্র, এবং বাজারে আমার সম্বন্ধে যে-রটনা, ওখান থেকে দ্বিতীয়বার জেতা মোটেই সহজ নয়। এরই মধ্যে একদিন বিনয় কোঙার ঘরে ঢুকে বললেন, বর্ধমান জেলার কোনও কেন্দ্র থেকে আমাকে প্রার্থী করতে তাঁরা আগ্রহী, আমি নিজে আগ্রহী কিনা যদি জানাই। সবচেয়ে বেশি জল্পনা চলছিল চব্বিশ পরগনার যাদবপুর কেন্দ্র নিয়ে। এখান থেকে দীনেশ মজুমদার সাতাত্তর সালে হেসে-খেলে জয়ী হয়েছিল। ওর হঠাৎ-প্রয়াণের পর কয়েক মাস ওই কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন কৃষক নেতা ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য, তাঁর উপর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পার্টির জেলা সম্পাদকের দায়িত্বও। তিনি আর বিধায়ক থাকতে রাজি নন, সুতরাং ছক কষা হচ্ছিল আমাকে যাদবপুর কেন্দ্রে চালান করে দেওয়ার। পার্টি দপ্তরে গিয়ে ঘোর প্রতিবাদ জানালাম, জনগণ আমাকে ভীরু কাপুরুষ বলবে, পুরনো আসন থেকেই তাই দাঁড়াতে চাই। প্রমোদবাবু আমাকে কড়কে দিলেন : 'আসনটা আপনার নয়, পার্টির। পার্টি আপনাকে যেখান থেকে দাঁড় করাবে, আপনি সেখান থেকে দাঁড়াতে বাধ্য।' নতমস্তকে যদিও সেদিন চলে এলাম, শেষ পর্যন্ত তাঁর মন গললো, রাসবিহারী কেন্দ্র থেকেই ফের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুমতি পেলাম। সাতাত্তর সালে ওই কেন্দ্রে প্রদত্ত ভোটের আমরা শতকরা মাত্র সাঁইতিরিশ ভাগ পেয়েছিলাম, কংগ্রেস ও জনতা দলের মধ্যে উল্টো দিকের ভোট ভাগাভাগি হওয়ায় বেরিয়ে যাই। আশি সালের লোকসভা নির্বাচনে আমাদের প্রার্থী কংগ্রেস প্রার্থীর চেয়ে ওই কেন্দ্রে পিছিয়ে ছিলেন। তা হলেও, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে এত চেঁচামেচি করেছি, বাজারে নাম ছড়িয়েছে, পার্টির প্রভাব ওই মুহূর্ত সর্বত্র তুঙ্গে, কংগ্রেসের মধ্যে অনেক দলাদলি, আশা ছিল এবারও বেরিয়ে যাবো। গেলাম না। পার্টির সমস্ত সাংগঠনিক শক্তি রাসবিহারী কেন্দ্রে নিয়োজিত হলো, সর্বস্তরের বন্ধু, পরিচিত ও শুভানুধ্যায়ীরা প্রাণপাত পরিশ্রম করলেন, পোস্টারে-ফেস্টুনে মিছিলে-সভায় রাসবিহারী কেন্দ্রের সব ক'টি ওয়ার্ড উত্তাল করে দেওয়া হলো। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না, কারণটা আমার কাছে স্পষ্ট, যদিও পার্টিকে তা কোনওদিন বলবার চেষ্টা করিনি।

সেই ভুয়ো সঞ্চয়সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করায় উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, তাঁদের একটি বড়ো অংশ প্রথম থেকেই আমাকে হারাতে বদ্ধপরিকর। তবে মনে হয় না আমার অসাফল্যের তা মুখ্য হেতু। যদিও এবারও নির্বাচনী প্রচারে মলয় চট্টোপাধ্যায় আমার মস্ত অবলম্বন, সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন এক ঘোরতম আদর্শবাদী কমরেড। সকাল-বিকাল স্বেচ্ছাসেবকদের ভোটের প্রচারে পাঠাবার আগে পঁয়তাল্লিশ মিনিট বা এক ঘণ্টা ধরে তাঁদের কাছে তাত্ত্বিক বক্তৃতা দিতেন, আমাকে পাশে বসে থাকতে হতো। মনে-মনে আঙুল কামড়াতাম, ওই সময়টায় মুক্তি পেলে রাসবিহারীর উন্নাসিক মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তদের বাড়ি-বাড়ি একটু ঘুরতে পারতাম; সঞ্চয়সংস্থাটির বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁদের বিশদ করে হয়তো বোঝাতে পারতাম। কিন্তু

নির্বাচনপ্রচারসর্বাধ্যক্ষের কড়া অনুশাসন, আমাকে প্রতিদিন বসে থেকে তাঁর বক্তৃতা শুনতে হবে। নির্বাচনের আগের দিন রাত্রিবেলা প্রতাপাদিত্য রোড ধরে ফিরছি, এক বাড়ির পাঁচিলের ওপার থেকে শুনতে পেলাম সর্বাধিনায়কের কণ্ঠস্বর, দু-তিনশো স্বেচ্ছাসেবক জড়ো করে ওই মধ্যনিশীথে প্রায়-অপোগণ্ডদের বোঝাচ্ছেন, নির্বাচনে জয়লাভ আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য পার্টির আদর্শ মজবুত করে প্রচার করা। আমার বোধহয় তখন স্বগত বিলাপোক্তি করা উচিত ছিল, 'তনয়ে তারো তারিণী'।

আমার পরাজয়ে কংগ্রেস মহলে আনন্দ ধরে না। তিন দিন ধরে আকাশবাণী ও দূরদর্শনে দেশের সর্বত্র প্রতিটি সংবাদ বুলেটিন অশোক মিত্রের পরাজয়ের উল্লেখ দিয়ে শুরু। আমাকে যে-ভদ্রলোক হারিয়েছিলেন, তিনি দিল্লি গেলেন, ইন্দিরা গান্ধি সময় করে তাঁর সঙ্গে পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা করলেন, তাঁকে অভিনন্দন জানালেন, এমন সৌভাগ্য সারা দেশে কংগ্রেস বিধায়কদের মধ্যে অন্য কারও হয়নি। প্রমোদবাবুর চেয়েও জ্যোতিবাবু দৃশ্যত বেশি মুষড়ে পড়লেন, তাঁকে বললাম অবিলম্বে সত্যব্রত সেনকে রাজ্য পরিকল্পনা পরিষদের সহ-সভাপতি করে দায়িত্ব দেওয়া হোক, সত্যব্রতবাবু অর্থ দফতরের কাজকর্মে তাঁকে সাহায্য করতে পারবেন, তা ছাড়া সুজিত পোদ্দার তো রইলোই, অর্থ দফতরের আঁটঘাট সব-কিছু ওর জানা। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে যে অধ্যাপনার কাজ দু' মাস করেই ক্ষান্ত দিয়েছিলাম, তাতে ফিরে গেলাম, ইনস্টিটিউটের বাসে চেপে নিত্যদিন বরানগরে। মন্ত্রীগিরি থেকে বেরিয়ে এসে এই আপাতঅবসরযাপন ভালোই লাগলো। মধ্যবর্তী পাঁচ বছরে ধনবিজ্ঞান আরও অনেক এগিয়ে গেছে, আমার বিদ্যার পুঁজি আরও কমেছে, সুতরাং অনুকম্পায়ী সহযোগীরা আমার উপর তেমন বেশি শিক্ষকতার দায় চাপালেন না। যে লেখালেখির অভ্যাস প্রায় চলে গিয়েছিল, তা আবার মকশো করা শুরু। সবচেয়ে বড়ো লাভ, যে-বন্ধুরা প্রকৃতির নিয়মে তখনও হারিয়ে যাননি, তাঁদের সঙ্গে ফের চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া : রবিবারের প্রভাতী আসরে উপভোগের পাত্র উছলে উঠে মাধুরী দান করতে লাগলো।

কয়েক মাস না যেতেই ফের মর্মান্তিক শোক সংবাদ। জ্যোতিবাবুর সঙ্গে হালকা আড্ডা জমানো সম্ভব, কিন্তু যে বিষয়ে তিনি আলোচনায় এগোতে অনিচ্ছুক তা নিয়ে তাঁকে বিব্রত বা বিরক্ত করবার মতো বাসনা বা প্রবৃত্তি তখনও ছিল না, এখনও নেই। অন্য পক্ষে চারিত্রিক বিন্যাসে প্রমোদবাবুর থেকে আমি শত হস্ত দূরে থাকলেও তাঁর সঙ্গে যে কোনও বিষয় নিয়ে আড্ডা দেওয়া যেত, তর্ক করা যেত, এমনকি তর্ককে ঝগড়ার পর্যায়েও তুলে নিয়ে যেতে কোনও বাধা ছিল না। মহাকরণে যাওয়া নেই, স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে কর্তব্য সমাপনান্তে হাতে প্রচুর সময়, প্রায়ই আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে গিয়ে প্রমোদবাবুর মুখোমুখি হতাম। তাঁর হাতে চুরুট, চুরুটের ধোঁয়া ভেদ করে আমার তর্কবাণ নিক্ষেপ। সহসা সব-কিছু অন্যরকম হয়ে গেল। নভেম্বর মাস, চীন পার্টির আমন্ত্রণে প্রমোদবাবু ওদেশে গেলেন, আর ফিরলেন না, তাঁর শবদেহ কলকাতায় ফিরে এলো। নিজেকে যেন অবলম্বনহীন মনে হলো। যে কথাগুলি জ্যোতিবাবুকে বলা যেত না, বলতে বাধো-বাধো ঠেকত, এতদিন তা অনায়াসে দ্বিধাহীন চিত্তে প্রমোদবাবুকে বলতে পারতাম : সেই সম্ভাবনায় এখন থেকে চিরদিনের জন্য ছেদ।

বুঝতে পারছিলাম অর্থ দফতরের দায়িত্বে আলাদা কোনও মন্ত্রী না-থাকায় জ্যোতিবাবুর উপর চাপ বাড়ছে। সত্যব্রতবাবু যদিও সকাল থেকে সন্ধ্যা পরিশ্রম করছেন, ইংরেজি ভাষায়

যাকে বলা হয় ব্যক্তিগত সমীকরণ, জ্যোতিবাবুর সঙ্গে তা তাঁর কোনওদিনই ছিল না, আমি জ্যোতিবাবুকে অবাধে যতটুকু বলতে পারতাম, সত্যব্রতবাবুর পক্ষে সেটুকুও সম্ভব হতো না। আরও সমস্যা দেখা দিল, বিরাশি সালের শেষের দিকে জ্যোতিবাবু নিজে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সিঁড়ি ভাঙার অসুবিধা এড়ানোর জন্য সেই যে হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ি ছাড়লেন, আর কোনওদিন তাঁর ফেরা হয়নি। রাজভবনের প্রাঙ্গণে সরকারি আমলাদের জন্য তৈরি একটি একতলার ফ্ল্যাটে জ্যোতিবাবু উঠে গেলেন, বেশ কয়েক বছর বাদে সেখান থেকে সল্ট লেকের ইন্দিরা ভবনে।

যে-যাদবপুর কেন্দ্র থেকে এক বছর আগে প্রার্থী হতে গভীর অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম, শঙ্কর গুপ্ত সেখান থেকে জিতে বিদ্যুৎ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী, দুরারোগ্য অসুখে তাঁর অকালমৃত্যুর পর আসনটি ফের খালি। জ্যোতিবাবুর স্বাস্থ্যাবনতির উল্লেখ করে পার্টি থেকে আমাকে ফের উপরোধ, বারবার অসম্মতি জানানো, অনেকেই বললেন, অনুচিত। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনার ফাঁকে-ফাঁকে প্রশাসনিক সংস্কার কমিটির পৌরোহিত্য করছিলাম, কমিটির প্রতিবেদন দাখিল করবার ক'মাস বাদে যাদবপুর থেকে পুনরায় বিধানসভায় অতএব নির্বাচনপ্রার্থী।

প্রশাসনিক সংস্কার কমিটির কাজে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় ও একজন অভিজ্ঞ রাজপুরুষ আমাকে সহযোগিতা করেছিলেন। প্রধানত দু'টি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল; এক, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণের লক্ষ্যে অবশ্যপ্রয়োজন সংস্কারাদির নির্ঘণ্ট-নির্দেশাবলী তৈরি করা; দ্বিতীয়, প্রশাসনের ঢিলেঢালা প্রক্রিয়াকে কোন্-কোন্ পদ্ধতি বা প্রকরণের সাহায্যে দ্রুততর করা সম্ভব, তা নিয়ে কিছু নির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ। অন্য কয়েকটি সমস্যা নিয়েও কমিটি কিছু চিন্তাভাবনা করেছিল। প্রশাসনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার দ্রুত অনুপ্রবেশ ঘটানোর লক্ষ্যে একগুচ্ছ প্রস্তাব আমরা দাখিল করেছিলাম। তবে প্রশাসনরূপী গণেশকে নড়ে-চড়ে বসানো চাট্টিখানি কথা নয়, বামপন্থী সরকারের নেতৃত্ব সত্ত্বেও নয় : দ্বারপ্রান্তে শুধু যে মাধবীরই মন ঠেকে যায় তা তো নয়। মাত্র কয়েকমাস আগে, বিংশ শতাব্দী শেষ হবো-হবো করছে, হঠাৎ কাগজে দেখে চমৎকৃত হলাম, আমরা আঠারো-উনিশ বছর আগে প্রতি বিভাগে একটি করে অভিযোগ কেন্দ্র খোলবার জন্য যে-সুপারিশ করেছিলাম, তা এতদিনে কার্যকর হচ্ছে। প্রশাসনে বাংলা ভাষার প্রাধান্য এখনও ঠিক কায়েম হয়নি। আর ফাইলের শম্বুকগতি, তাই-ই কি ধাক্কা মেরে দ্রুততর করবার প্রয়াস এমন কি অংশতও সফল হয়েছে? কমিটির সচিব একটি বিশেষ ফাইলের ক্ষেত্রে গবেষণা করে দেখিয়েছিলেন, পাকা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দুশো উনসত্তর বা দুশো উনআশিবার তা উপরে-নিচে, ডাইনে-বাঁয়ে হেলেছে, দুলেছে, তিন-না-সাড়ে তিন বছর ধরে।

কমিটির পর কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করলে কী হয়, ঐতিহ্য টোল খায় না। প্রশাসনিক স্বার্থে মেদিনীপুর জেলা ভাগ করার যে-সুপারিশ তখন করেছিলাম, তা কার্যকর হলো উনিশ বছর বাদে ; পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ক্ষেত্রে অবশ্য মাত্র বছর দশেক লেগেছিল।

অন্য একটি সুপারিশ ছিল বিকেন্দ্রিকরণের পাশাপাশি প্রশাসনের গণতন্ত্রীকরণ বিষয়ে, রাজপুরুষদের যে-ধরাবাঁধা স্তরবিন্যাস তা কমিয়ে আনার অভিপ্রায়ে। এ-সব সুপারিশই এখন কীটদষ্ট, প্রায়-বিস্মৃত; শত ঢুঁড়লেও সেই কমিটির রিপোর্টের কপি সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। শুধু আই.এ.এস. রাজপুরুষরা নন, যোগ্যতার ভিত্তিতে নিম্নতর বর্গভুক্ত রাজপুরুষদের মধ্য থেকেও বেছে নিয়ে জেলা প্রশাসনের সর্বোচ্চ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করা উচিত, কমিটির

এই বিশেষ সুপারিশ রূপায়িত হলো একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বছরে।

মহাকরণে কাজ করতে গিয়ে সবচেয়ে অবসন্ন লাগতো উন্নয়নমূলক নানা কর্মসূচি প্রশাসনিক ঢিলেমিতে আটকা পড়ে থাকার অভিজ্ঞতা থেকে। মুখে বিপ্লবের কথা বলি আমরা বামপন্থীরা, অথচ সমাজব্যবস্থার বাধ্যবাধ্যকতা মেনে নিয়ে আপাতরূঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে প্রায়ই পিছিয়ে আসি। আরও যা সমস্যা, বিভিন্ন মন্ত্রীরা সংস্কারের জালে আচ্ছন্ন। উনআশি না আশি সাল এখন ঠিক মনে নেই, পূর্ণ সূর্যগ্রহণ, পৃথিবী নাকি সেই তারিখে প্রলয়ে ভেসে যাবে; সব চেয়ে গলা উঁচু যে শরিকি মন্ত্রীর, তাঁর প্রচণ্ড চাপে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো সেদিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হবে। পরিমল মিত্র প্রচণ্ড বিরক্তিতে দাবি করলেন, এই সিদ্ধান্তে তাঁর অসম্মতি যেন মন্ত্রিসভার কার্যবিধিতে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকে, তাঁর সঙ্গে আমিও গলা মেলালাম।

সমর সেন একদা 'নাউ' পত্রিকার পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় মন্তব্য করেছিলেন, যে-হারে দেবদেবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সঙ্গে দেবোত্তর সম্পত্তির পরিমাণ, দেবতাদের জন্যও জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন অবশ্য সামাজিক কর্তব্য। প্রশান্ত শূর অত্যন্ত কর্তব্যশীল মন্ত্রী, কৌশলগত সুবিধার স্বার্থে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিসর্জন দিতে তিনি আদৌ রাজি ছিলেন না। মন্ত্রিত্বে প্রবেশের প্রথম বছরেই দুটো করণীয় কাজে তাঁর দৃষ্টিক্ষেপ। কলকাতার রাজপথে কিংবা অলিতে-গলিতে, দু'কদম এগোতে না এগোতে, শিবরাম চক্রবর্তী যাকে বলেছিলেন দেবতার জন্ম : যত্রতত্র একটি কুৎসিত ক্ষুদে মূর্তি বা নিরেট পাথর বসিয়ে পুজোর ভণিতা করে তা থেকে কোনও ধাপ্পাবাজের পয়সা উপার্জনের ফিকির বন্ধ করতে তিনি প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। পাড়ায়-পাড়ায় কয়েক সপ্তাহ ধরে রাস্তা আটকে সার্বজনীন দুর্গাপূজা বা অন্য কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামে সাধারণ মানুষের অশেষ অসুবিধা ঘটানোর প্রক্রিয়াটি বিসর্জনের ব্যবস্থা নিয়েও প্রশান্তবাবু উদ্যোগী হলেন। তবে বৃথাই নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর তর্জনগর্জন : অচিরে নির্দেশ এলো, এসব স্পর্শকাতর ব্যাপারে বেশি না এগোনোই আপাতত ভালো। প্রশান্তবাবু হতাশ, আমরা যারা পাশ থেকে তাঁকে উৎসাহ যোগাচ্ছিলাম, তারাও।

এই সব কিছুর চেয়েও গভীরতর সমস্যা অনেক মন্ত্রীর মধ্যেই দৃঢ়প্রোথিত সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা : আমি মন্ত্রী, আমি এই বিভাগের দায়িত্বে আছি, আমার দায়দায়িত্ব আমি যেমন খুশি পালন করবো, তুমি কোথাকার নটবর হে, মাথা গলাতে আসছো? অথচ অর্থ তথা পরিকল্পনা দফতরের মন্ত্রী হিশেবে আমার তো এটা স্বাভাবিক শিরঃপীড়া, গরিব সরকারের বহু কষ্টে সংগৃহীত পয়সাকড়ি ঠিকমতো ঠিক সময়ে খরচ হচ্ছে কিনা তা দেখা, পরিকল্পনাগত কর্মসূচি প্রতিটি বিভাগে সুসম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা নিয়ে সজাগ-সতর্ক থাকা। অন্তত আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভাগীয় কাজকর্মের পারস্পরিক সংযোগ নিবিড় না-হলে কী করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা সুষ্ঠু পূরণ করতে পারবো, পূরণ করে অন্যান্য রাজ্যের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবো, যে-দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে সারা দেশের মানুষ বামপন্থার দিকে ঝুঁকবেন?

একটু মজাই লাগতো আমার। বন্ধুভাবে হয়তো কোনও মন্ত্রীকে পরামর্শ দিতে গেলাম, তাঁর বিভাগে ফিতের বাঁধন কী করে সামান্য আল্‌গা করা যেতে পারে, অর্থ ও পরিকল্পনা দপ্তরের সঙ্গে নিবিড়তর সংযোগে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া কী করে দ্রুততর করা সম্ভব। আমার সদিচ্ছা তো পূর্ণ হতোই না, বরঞ্চ উল্টো ফল হতো, মন্ত্রীরা অসহযোগিতার মাত্রা আরও

বাড়িয়ে দিতেন। মানিকবাবুর 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-র একটি উপকাহিনী মনে না পড়ে পারতো না। শশী ডাক্তারের পিতৃদেব গোপাল দাস শাঁসালো জোতদার-মহাজন, বাড়িতে অনেক দুঃস্থ আত্মীয়স্বজনের ঠাঁই। শশী লক্ষ্য করেছে এক আশ্রিতা আত্মীয়া তার শিশুসন্তানটির উদরে খুব বেশি পরিমাণে ভাত ঠেসতে ব্যস্ত। চিকিৎসকের মনস্কতা নিয়ে শশীর পরামর্শ, 'পিসি, ওকে অত ভাত খাইয়ো না, পেটে পিলে বাড়বে।' পিসির তৎক্ষণাৎ স্বগতমন্তব্য, 'দেখেছো, আমরা অসহায় আশ্রিত বলে কী হেনস্থা। মাছ-মাংস নয়, পরমান্ন নয়, জোটে তো সামান্য ক'টি ভাত, তাতেও বড়োলোক আশ্রয়দাতার বুক পোড়াচ্ছে।' ফলের মধ্যে হলো পিসি ছেলেকে আরো বেশি করে ভাত খাওয়াতে লাগলেন। সহযোগী অনেক মন্ত্রীকে ভালো মনে সুপরামর্শ দিতে গিয়ে আমারও অনুরূপ অভিজ্ঞতা।

পাঁচ বছর এ-সমস্ত অসুবিধার পীড়নে ভুগেছি, মনে-মনে শপথবদ্ধ ছিলাম, দ্বিতীয়বার মন্ত্রী হলে প্রশাসনিক ব্যবস্থায়, অন্তত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, পারস্পরিক সংযোগ যে-করেই হোক সংহততর করতে হবে, প্রমোদবাবু-জ্যোতিবাবুকে রাজি করিয়ে একটি-দু'টি জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করবো। নির্বাচনে হেরে গেলাম, কয়েক মাস বাদে প্রমোদবাবু প্রয়াত, মনের ইচ্ছা মনেই থেকে গেল। যাদবপুর থেকে জিতে যখন মন্ত্রিসভায় পুনঃপ্রবেশের তারিখ অত্যাসন্ন, মনের প্রকোষ্ঠে আর একবার নাড়া দিল সেই ইচ্ছা। দলের রাজ্য সম্পাদক ও জ্যোতিবাবুকে ব্যাখ্যা করে বললাম আমি কী চাইছি, কেন চাইছি। বুঝতে পারলাম জ্যোতিবাবুর সায় নেই, তাঁর বিবেচনায় বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্মের মধ্যে সংযোগ ঘটানোর দায়িত্বে মুখ্যমন্ত্রীই তো আছেন, সেই দায়িত্ব আমার প্রস্তাবমতো কেন আলাদা করে অর্থ ও পরিকল্পনা দপ্তরকে দেওয়া হবে, তাতে সংযোগসাধন মাথায় উঠবে, বিসংবাদ বৃদ্ধিরই বেশি আশঙ্কা, বিভাগীয় মন্ত্রীরা চটে যাবেন। অর্থ ও পরিকল্পনা দফতরকে এমনিতেই এই সংযোগস্থাপনের দায়িত্ব নিতে হয়, স্পষ্ট করে উল্লেখ থাকলে সমস্যা একটু কমবে, এই ব্যাখ্যা জ্যোতিবাবুকে সন্তুষ্ট করতে পারলো না। তিনি অবশ্য মুখ্য সচিবের আপত্তির কথা বললেন, যিনি নাকি বলেছেন, আমি যে-প্রশাসনিক সংস্কারের কথা বলছি তা চালু করতে গেলে মন্ত্রিসভার নিয়মাবলী খোলনলচে পাল্টাতে হবে। তর্ক জুড়তে পারতাম, মন্ত্রিসভায় একটি সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করেই তা করা যায়। কিন্তু জ্যোতিবাবুর অসম্মতি বুঝে দ্বিরুক্তি না-করে ফের শপথ গ্রহণ করলাম নিছক অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী হিশেবেই। এবার আবগারি বিভাগের দায়ও রইলো না।

আসল লোকসান যা হলো, আমার অনুপস্থিতিতে সত্যব্রত সেনের কাজের চাপ অনেক বেড়ে গিয়েছিল, তিনি স্পষ্টতই হাঁপিয়ে উঠেছেন, সত্যবাবু আর মহাকরণে থাকতে রাজি হলেন না, পার্টির কাজে ফিরে গেলেন পুরো সময়ের জন্য। তবে আমি যেমন আলস্যের ভেলায় দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে পারি, কোনও কাজ না করে স্রেফ আড্ডায় মজে গিয়ে সময়ের অপচয় করতে বিবেকে বাধে না, দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়লে ষোলো-আঠারো ঘণ্টা কাজে লেগে থাকতেও কোনও সময়ই পিছুপা হই না। ইতিমধ্যে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা একটু বেড়েছে, প্রশাসনিক সংস্কার কমিটির কর্মসূত্রে আত্মবিশ্বাসও বেড়েছে, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের গদা ঘুরিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে ঘায়েল করবার আগ্রহে সত্তা-চেতনা নিশপিশ করছে। পুনর্বার মন্ত্রীরূপে শপথ নেওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যে একগুচ্ছ কর সংশোধনের প্রস্তাব বিধানসভায় মঞ্জুর করিয়ে নিলাম। অন্যতম লক্ষ্য ছিল খনিজ পণ্যাদি থেকে রাজস্ব সংগ্রহ বাড়ানো। সংবিধানের অনুশাসন, ভূগর্ভস্থ খনিজ

পদার্থের উপর রাজ্যগুলির কর বসাবার অধিকার নেই, উত্তোলিত খনিজ বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার রয়্যালটি নির্ধারণ করবে, তা থেকে রাজ্যগুলির কিছু প্রাপ্য মিলবে।

সাধারণ মূল্যমান চড়ছে, কয়লা-লোহার দামও উর্ধ্বগামী, অথচ রয়্যালটি বাড়াবার ব্যাপারে কেন্দ্রের কোনও উদ্যোগই নেই, যথাযথ প্রাপ্য থেকে যেন ইচ্ছা করেই আমাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। অন্য দিকে তৈল উত্তোলনের ক্ষেত্রে অসম ও গুজরাট সরকারের প্রাপ্য রয়্যালটির মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে : আমরা শুধু বঞ্চিতই নই, একপেশে আচরণেরও শিকার। বিষয়টি নিয়ে বিহার ও ওড়িশার অর্থমন্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ হলো। তাঁরা একটু ধর্মভীরু মানুষ, পশ্চিম বাংলার সঙ্গে গলা মেলাতে তাঁদের রাজনৈতিক অসুবিধা ছিল, উভয় রাজ্যেই তখন কংগ্রেসি মন্ত্রিসভা। এই অবস্থায় অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহের স্বার্থে বিশেষ একটি কৌশল অবলম্বনে বাধ্য হলাম। খনির উপর রাজ্য সরকারগুলির কর বসানোর সাংবিধানিক অধিকার নেই, কুছ পরোয়া নেই, যেহেতু ভূমি ও ভূমিব্যবস্থা রাজ্যের এখতিয়ারে, খননযোগ্য ভূমির উপর ঢালাও উন্নয়ন শুল্ক আরোপের প্রস্তাব বিধানসভায় উপস্থাপন করা হলো, সঙ্গে-সঙ্গে তা মঞ্জুরও হয়ে গেল, রাজস্বসংগ্রহের একটি নতুন উৎস এখন থেকে উন্মুক্ত; রয়্যালটি থেকে যে-যৎসামান্য উপার্জন হতো, এই সূত্র থেকে সংগ্রহের সম্ভাব্য পরিমাণ তার চেয়ে ঢের বেশি। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এই নবব্যবস্থা সংবিধান-বহির্ভূত দাবি করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা রুজু করেছিলেন, সে মামলা টেকেনি। পশ্চিম বাংলাকে জব্দ করবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্র কর্তৃক তখন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হলো, যে-যে রাজ্য খনিজ জমির উপর উন্নয়ন শুল্ক বসাবে, তাদের আর কয়লা থেকে প্রাপণীয় রয়্যালটি দেওয়া হবে না। আইনজ্ঞ নই, তবু আমার দৃঢ় ধারণা এই সিদ্ধান্তটিও সুপ্রীম কোর্টের বিচারে খারিজ হতে পারতো : আর কিছু না হোক, সংবিধানের চোদ্দো সংখ্যক ধারা অনুযায়ী নাগরিকে-নাগরিকে পৃথগীকরণ যেমন সংবিধান-সম্মত নয়, রাজ্যগুলির মধ্যে বিভেদীকরণও সমান অবৈধ। কুছ পরোয়া নেই, ততদিনে বেশ কয়েক বছর গড়িয়ে গেছে, আমি আর সরকারে নেই, বাইরে থেকে শুধু দার্শনিকের ভূমিকা পরিপালন করে গেছি।

একতিরিশ

তবে সে-বিষয়ক কাহিনী তো পরের বৃত্তান্ত। যুযুধান আমি, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের লড়াইয়ে তিরাশি সালে মন্ত্রিসভায় ফিরে ফের কোমর বেঁধে নামলাম। অন্তবর্তী সময়ে আমাদের সম-মনোভাবসম্পন্ন রাজ্যগুলির যুগপৎ সংখ্যা ও শক্তি বেড়েছে। কেরলে বাম-গণতান্ত্রিক জোটের মুখ্যমন্ত্রী কমরেড নায়ানার, কর্ণাটকে জনতা দলের সরকার, মুখ্যমন্ত্রী রামকৃষ্ণ হেগড়ে, অন্ধ্র প্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী বিপুল জনসমর্থন পেয়ে সদ্য-নির্বাচিত তেলেগু দেশমের এন টি রামরাও। তামিলনাড়ুতে পালা করে হয় এম জি রামচন্দ্রন, নয় এম কে করুণানিধি, মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ব্যাপারে দু'তরফই আমাদের সমর্থন জ্ঞাপন করতে উদ্‌গ্রীব। পঞ্জাবে অকালি দল শাসনক্ষমতায়, আনন্দপুর সাহেব প্রস্তাবের ধারাগুলি দলের মন্ত্রীদের শিরায়-তন্ত্রীতে প্রবাহিত। যা আগেই উল্লেখ করেছি, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শেখাওয়াত যদিও ভারতীয় জনতা পার্টির বড়ো নেতা, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিতর্কে আমাদের সঙ্গে অনেক বিষয়েই গলা মিলিয়ে যাচ্ছিলেন। যতক্ষণ রাজনৈতিক প্রশ্নাবলী, যেমন ৩৫৬ ধারার প্রয়োগ প্রসঙ্গ, আসছে না, স্রেফ রাজস্ব বৃদ্ধি-সংক্রান্ত আলোচনা, এমনকি কংগ্রেস-শাসিত রাজ্যগুলিও আমাদের সঙ্গে তাল মেলাতে তেমন অনাগ্রাহী নয় সে সময়। কয়েক মাস বাদে জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচন, ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে লড়াই করে ফারুখ আবদুল্লা ও ন্যাশনাল কনফারেন্সের শ্রীনগরে ক্ষমতা দখল, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের ব্যাপারে তাঁরাও আমাদের সামিল। প্রায় ধর্মযুদ্ধ। সময় করে বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে বিতর্কযুদ্ধের কলাকৌশল আলোচনা করতে যেতাম, কয়েকজনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যও স্থাপিত হয়েছিল। রামকৃষ্ণ হেগড়ে মজলিশি আড্ডাবাজ মানুষ, ব্যাঙ্গালোরে গেলেই বাড়িতে ধরে নিয়ে যেতেন, তাঁর তৎকালীন অর্থমন্ত্রী বোম্মাইয়াও উপস্থিত থাকতেন। তাঁদের বিদেশী হুইস্কিতে অভিরুচি, আমার নেই, তা সত্ত্বেও আড্ডা জমাতে অসুবিধা হতো না, রাজনৈতিক আদর্শ ও জীবনদর্শনের দুস্তর ফারাক সত্ত্বেও হতো না। (বোম্মাইয়া কথাচ্ছলে একদিন বলেছিলেন, তিনি প্রথম জীবনে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। এমন কথা আমাকে বলেছিলেন উত্তর প্রদেশের একদা পরিকল্পনা মন্ত্রী ব্রহ্মদত্তও, আর বলেছিলেন, কী সর্বনাশ, ভারতীয় জনতা পার্টির তাত্ত্বিক নেতা জগদীশপ্রসাদ মাথুর, টাইমস অফ ইন্ডিয়ার ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল সম্পাদক প্রয়াত গিরিলাল জৈনও : কোথাকার জল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।) হেগড়ের বাড়িতে যাতায়াতের সূত্রে তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের সঙ্গেও সামান্য পরিচয়। হেগড়েপত্নী সারস্বত ব্রাহ্মণকুলবতী, মেয়েরা আদি অর্থে খাঁটি কসমোপলিটান, কারও স্বামী মালয়ালি, কারও সিন্ধি, কারও বা গুজরাটি। হেগড়েগৃহে শুধু পানসমারোহ নয়, খাদ্যসম্ভারের উৎকর্ষেরও অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে হয়। তবে, আলাপ যদিও জমতো, ঈষৎ আড়ষ্টতাবোধেও ভুগতাম ; ওই সমস্ত রাজ্যের মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীদের বৈভব অবলোকনে গরিব পশ্চিম বাংলা থেকে

আগত আমার চোখ ছানাবড়া, আমার বামপন্থী বিবেক কুঁকড়ে আসতো। অপরিমিত ঐশ্বর্য, অপরিমিত আপ্যায়ন, উদার আড্ডা, যার শরীরে মিশে থাকতো প্রচুর পরকীয়-পরকীয়া চর্চা, কিছু রঙ্গকৌতুকও। একটি নমুনা উপস্থাপন করছি। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের কোনও খটোমটো বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে হেগড়ের বাড়িতে, আমাদের জোট বাঁধতে হবে, একাধিক মুখ্যমন্ত্রীকে সঙ্গে পেতে হবে। অন্ধ্র প্রদেশে প্রায়-আধাপাগল রামরাও সমাসীন, জনগণের কাছে তিনি দেবতাসদৃশ, তবে তাঁর খামখেয়ালেরও শেষ নেই। গুজব রটলো তিনি নিজেকে অর্ধনারীশ্বররূপে গণ্য করেন, তাই রাত্রিবেলা শাড়িপরিহিত হয়ে ঘুমোতে যান। সন্ধ্যা থেকে আমাদের আলোচনা চলছে, রামরাওয়ের সঙ্গে পরামর্শ প্রয়োজন, হেগড়ে আপ্ত সহায়ককে বললেন তাঁকে ফোনে ধরতে, তিরিশ সেকেন্ড বাদে ফোন বাজলো, হেগড়ে ধরলেন, কন্নড়ে কী কথা হলো আপ্ত সহায়কের সঙ্গে, আমার দিকে ফিরে হেগড়ে হতাশ হয়ে হাত ঘুরিয়ে বললেন : 'হলো না, হি ইজ অলরেডি ইন হিজ শাড়ি।' অর্থাৎ রামরাও ইতিমধ্যেই শুতে চলে গেছেন, কথা বলা স্থগিত রইলো।

অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর তাড়াতাড়ি শুতে না গিয়ে উপায় ছিল না, তিনি প্রত্যূষে তিনটে-সাড়ে তিনটের মধ্যে ঘুম থেকে উঠতেন, প্রাতঃকৃত্য ও প্রাতঃপ্রাণায়ামের পর পৌনে চারটে-চারটে থেকে বহিরাগতদের সাক্ষাৎকারে ডাকতেন। গরজ বড়ো বালাই, আমাকে একবার, বাইরে নিরেট অন্ধকার, ভোর চারটেয় ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হয়েছিল, কেন্দ্র-রাজ্য যুদ্ধে অন্ধ্র প্রদেশকে পাশে পাওয়া আমাদের যে একান্ত প্রয়োজন।

চেন্নাইতে এম জি রামচন্দ্রন একদিন তাঁর গৃহে নৈশাহারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ভক্ত অনুরাগীদের দঙ্গল বাইরে অপেক্ষমাণ, আমরা দু'জন মুখোমুখি বসে রসম্ থেকে শুরু করে বিবিধ দক্ষিণী খাদ্যউপচারের সদ্ব্যবহার করছি। মজার ব্যাপার, যে দুই অভিনেতা-অভিনেত্রী তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছেন, রামচন্দ্রন ও জয়ললিতা, কেউই খাঁটি তামিল নন, রামচন্দ্রন আসলে মালয়ালি মেনন, শ্রীলঙ্কায় শৈশব কাটিয়েছেন, শ্রীলঙ্কা ফেরত তামিলনাড়ু পৌঁছে আন্নাদোরাইয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ। অন্য পক্ষে তাঁর বান্ধবী ও শিষ্যা জয়রাম জয়লতিতা আয়েঙ্গার ব্রাহ্মণী, তাঁরও জন্ম অন্যত্র, কর্ণাটকে। জয়ললিতা কনভেন্টে-পড়া মহিলা, চোস্ত ইংরেজি বলেন। কিন্তু রামচন্দ্রন বলতেন যাকে বলে চড়ুই ইংরেজি। ওঁর চেহারা যে কত সুন্দর তা টুপি ও চশমা খুলে ফেললে বোঝা যেত। হয়তো সামান্য টাক পড়ে এসেছিল বলে মাথা ঢেকে রাখতেন, তবে চোখ ঢেকে রাখবার রহস্য কোনওদিন নির্ণয় করতে পারিনি। যে সন্ধ্যায় আমাকে খেতে বলেছিলেন, অনেক সময় নিয়ে প্রচুর গল্প করলেন। সামান্য আবেগবিহ্বল হয়ে বললেন : 'দ্যাখো, তোমাদের রাজ্য সম্পর্কে আমার ভীষণ দুর্বলতা, আমি সতেরো বছর বয়সে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া মুভিটোনে যোগ দিয়েছিলাম। বছরে একটা-দুটো তামিল ছবি হতো তখন ওখানে ; আমি এখনও তার স্মৃতিতে উদ্বেল।' কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের প্রসঙ্গ উঠলে, উত্তেজিত হয়ে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে হতাশোক্তি : 'নো ইউজ, নো ইউজ, শী ডিক্টেটর, ডাজেন্ট লিসন, নেশন ইন গ্রেট ডেঞ্জার'। ইন্দিরা গান্ধি সম্পর্কে এই কথাগুলি অবশ্য তিনি কিছুতেই বাইরে বলতেন না, অন্য বাধ্যবাধকতা। কিন্তু কোনও আর্থিক সমস্যা নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে বিসংবাদ ঘটলে আমাদের সঙ্গে গলা যোগ করতে আপত্তি ছিল না রামচন্দ্রনের।

আকালি দলের সুরজিৎ সিং বারনালার সঙ্গে সাতাত্তর সাল থেকে আলাপ, তখন তিনি কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী, অত্যন্ত অমায়িক মানুষ। একবার কী প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এইচ এম

প্যাটেলের ঘরে বৈঠক ছিল, আমি সুরজিৎ সিং-এর পাশে বসা, তাঁকে বললাম, কৃষিমন্ত্রকের সঙ্গে আমার একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। তিনি আহ্বান জানালেন অর্থমন্ত্রীর ঘরের বৈঠক শেষ হলে তাঁর সঙ্গে সোজা কৃষি ভবনে যেতে, তখনই কথা বলে নেওয়া যাবে। দিল্লিতে যে কোনও যুগে, যে কোনও পর্বে, যে কোনও অধ্যায়ে যা অভাবনীয়, কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী তাঁর পাশে বসিয়ে ছোটো ফিয়াট গাড়ি নিজে চালিয়ে আমাকে তাঁর দফতরে নিয়ে গেলেন। রাজনীততে অনেক উথালপাথাল, ১৯৯৮ সাল থেকে তিনি ভারতীয় জনতা দলের জোড়াতালি-দেওয়া মন্ত্রিসভায় ক্যাবিনেট মন্ত্রী, একদিন রাজ্য সভার লাউঞ্জে আমাকে ডেকে নিয়ে নিচু স্বরে বললেন : 'তোমাদের দল পঞ্জাবে লোকসভা নির্বাচনে একমাত্র আমারই বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়েছিল, যদিও আমি জিতেছি; আমার কী অপরাধ আজ পর্যন্ত জানতে পারিনি'। বোধহয় আমতা-আমতা করে বলেছিলাম, 'ওসব উচ্চমার্গের ব্যাপার আমার জানা নেই'।

আলাপ হলো ফারুখ আবদুল্লার সঙ্গেও। বাবার ক্ষুরধার বুদ্ধি নেই, আকর্ষণক্ষমতাও বাবার তুলনায় অনেক কম, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধি অহোরাত্র তাঁর অনিষ্ট কামনা করছেন, আত্মরক্ষার খাতিরেই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে আমাদের আলোড়ন-তোলা আন্দোলনে ফারুখ যুক্ত হয়ে গেলেন, তিরাশি সালের অগস্ট মাসে শ্রীনগরে রাজ্যদের দাবি জোরদার করতে বড়ো সম্মেলন আহ্বান করলেন। কে ছিলেন না সেই সম্মেলনে : নাম্বুদ্রিপদ, রাজেশ্বর রাও থেকে শুরু করে জগজীবন রাম-বিজু পট্টনায়ক পর্যন্ত! একমাত্র ব্যতিক্রম চরণ সিংহ, তাঁকে অনুরোধ-উপরোধ করে নিয়ে আসার জন্য বিজু পট্টনায়ককে দূত হিশেবে শ্রীনগর থেকে দিল্লিতে পাঠানো হলো, ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরলেন। তবে তেমন ক্ষতিবৃদ্ধি হলো না তাতে। তিনদিন ধরে জমাট বৈঠক, আমার সঞ্চালনায় বিভিন্ন প্রস্তাবের খসড়া তৈরির জন্য একটি উপ-সমিতি গঠন করা হলো, তাতে রাজেশ্বর রাও যেমন ছিলেন, ছিলেন ইন্দ্রকুমার গুজরালও। সারা দেশ থেকে ঝেঁটিয়ে সাংবাদিকরা এলেন, শেষ দিনে হোতা হিশেবে ফারুখ আবদুল্লার সাংবাদিক সম্মেলন, প্রারম্ভিক একটা-দুটো কথা বলে আমার উপরই সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি ব্যাখ্যা করবার দায়িত্ব অর্পণ করলেন।

আন্দোলনে জোর ধরলো, জাতীয় রাজনীতির প্রধান সমস্যা রূপে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস আলোচনার পুরোভাগে চলে এলো, কংগ্রেস দল প্রায় একঘরে। উৎসাহের স্রোতধারা বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে কলকাতায় জ্যোতিবাবুর আমন্ত্রণে ওই বছরেরই ডিসেম্বর মাসে আর একটি বৈঠকের আয়োজন। এবার সম্মেলন আরও জমজমাট, যতদূর মনে পড়ে, চরণ সিংহও যোগ দিয়েছিলেন, জনতা দলের সব শরিকরাও। বামপন্থীদের বাইরে হেগড়ে-রামরাওরা তো ছিলেনই, ছিলেন অকালি দলের প্রতিনিধিরা, ডি এম কে-র প্রতিনিধি হিশেবে খোদ করুণানিধি ও তাঁর ভাগ্নে মুরোসোলি মারান। বৈঠকশেষে ব্রিগেড প্যারেড মাঠে বিশাল জনসভা, ভিড়ের আয়তন দেখে অন্য রাজ্যের নেতাদের বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে আসা।

চুরাশি সাল, নানা রাজ্য থেকে আমন্ত্রণ আসছে বক্তৃতা দেওয়া ও শলাপরামর্শের জন্য। আর একবার 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-য় ফিরতে হয়: কুমুদ যে যাত্রা দলের সঙ্গে যুক্ত, তারা মতিদের গ্রামে 'জনা' অভিনয় করছে, রাত গড়াচ্ছে, মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আগমন-নির্গমন, অমিত্রাক্ষর ছন্দের অসম পঙ্ক্তিতে কথোপকথন আবেগশীর্ষে পৌঁছুচ্ছে, মতি উত্তেজনায় কাঁপছে, মতির মুখ দিয়ে মানিকবাবুর সুমিত মন্তব্য : জমিবে, পালা

জমিবে। আমরাও তখন বলতে পারতাম, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পালা খাসা জমে গেছে, আরও জমবে।

তাঁর নয়া জমানায় ইন্দিরা গান্ধিকে সুপরামর্শ দেওয়ার মতো তেমন কেউই আর পাশে ছিলেন না, যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রধানত চাটুকার শ্রেণীভুক্ত, বিদূষক, কুশীলক বৃত্তি ছাড়া তাঁদের অন্য-কোনও ভূমিকা ছিল না। বছরের মাঝামাঝি ইন্দিরা গান্ধি পর-পর তিনটি ভুল করলেন, সম্ভবত পুত্র রাজীব ও পারিষদ অরুণ গান্ধির কথা শুনে। কাহিনীটি একটু বিস্তারিত করে বললে হয়তো অন্যায় হবে না। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সংবিধানের ২৮০ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে একটি অর্থ কমিশন নিয়োগ করতে হয়। কমিশনে সাধারণত জনৈক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন, তাঁকে সাহায্য করবার জন্য থাকেন একজন করে আইনজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ এবং প্রবীণ প্রশাসক। কমিশনের অন্যতম প্রধান কৃত্য আয়কর ও কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক থেকে আহৃত রাজস্ব কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনের নীতিনির্ধারণ, সেই সঙ্গে রাজ্যগুলির জন্য বরাদ্দ অর্থ কী করে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ভাগ করা হবে, তা নির্দেশ। ১৯৮৪-৮৫ থেকে পরবর্তী পাঁচ বছরের সুপারিশ পেশের জন্য যে-কমিশন গঠিত হয়েছিল, তার সভাপতি ছিলেন আর একজন একদা-মানবেন্দ্রনাথ রায়-ভক্ত, যশবন্ত চবন, মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রের প্রাক্তন অর্থ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, আমার সঙ্গে বহুদিনের পরিচয়। কমিশনের অন্য সদস্যদের নিয়ে তিনি কলকাতায় বৈঠক করতে এলেন, খোলাখুলি পশ্চিম বঙ্গের বেহাল অর্থব্যবস্থার বর্ণনা দিলাম তাঁর কাছে, কেন্দ্রীয় নীতির পরিবর্তন না-ঘটলে সর্বনাশ যে অত্যাসন্ন, জোর গলায় তা জানালাম। এটাও যোগ করলাম যে যতবার দিল্লি যাই, প্রতিবারই আমার মনে হয় যেন এক ধনী বিদেশের ঝলমলে রাজধানীতে পৌঁছেছি এক গরিব হতজীর্ণ দেশ থেকে। এই জায়গায় চবন আমাকে থামিয়ে কপালে সামান্য কুঞ্চন নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'অশোক, কবে থেকে তোমার এই অনুভূতি হচ্ছে?' মুহূর্তমাত্র না-থেমে আমার জবাব : 'গত দশ-পনেরো বছর থেকে'।

চিরাচরিত নিয়ম, অর্থ কমিশনের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকার হুবহু মেনে নেয়, তাদের অসুবিধা থাকলেও মেনে নেয়। প্রতি মাসে একবার-দু'বার বিভিন্ন ব্যাপারে দরবার করতে দিল্লি যেতে হতো, কেন্দ্রের বাঙালি অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করতে হতো। কাগজে বেরিয়ে গেছে রাষ্ট্রপতির কাছে চবন অর্থ কমিশনের প্রতিবেদন দাখিল করেছেন, অথচ কোনও দুর্জ্ঞেয় কারণে কেন্দ্রীয় সরকার তা প্রকাশ করতে বিলম্ব ঘটাচ্ছেন, কেন বিলম্ব হচ্ছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে প্রশ্ন করে কোনও স্পষ্ট উত্তর পাচ্ছি না।

কমিশনের সুপারিশ কুজ্ঝটিকার আড়ালে, এমন মুহূর্তে ইন্দিরা গান্ধি একটি বড়ো কেলেঙ্কারি করলেন। ফারুখ আবদুল্লা কাশ্মীরের নির্বাচনে তাঁর দলকে হারিয়ে দিয়েছেন, ফারুখকে তিনি সহ্য করতে পারছেন না, ষড়যন্ত্র ফাঁদছেন। কাশ্মীরে তখন রাজ্যপাল ইন্দিরারই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ব্রিজকুমার নেহরু, কিন্তু নেহরুকে দিয়ে কার্যসিদ্ধি হবে না বুঝতে পেরে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হলো গুজরাটে, শ্রীনগরে রাজ্যপাল হয়ে এলেন সঞ্জয়সখা, জরুরি অবস্থার কালে তুর্কমান গেট-এর কলঙ্কনায়ক, সেই কুখ্যাত আমলাটি। নব-নিযুক্ত রাজ্যপালের মধ্যবর্তিতায় বহু কোটি টাকা খরচ করে কিছু বিধায়ক কেনা হলো, হবু মুখ্যমন্ত্রী হিশেবে বাছাই করা হলো ফারুখের ভগিনীপতি, চরম দুর্নীতিগ্রস্ত, গুলাম মহম্মদ শাহ-কে। প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। এক অপরাহ্নে রাজ্যপাল ফারুখকে রাজভবনে ডেকে পাঠালেন, একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য উচ্চারণ : 'আপনাকে এই মুহূর্তে পদচ্যুত করা হলো'। বিধানসভা

ডেকে ভোট যাচাই করার প্রশ্ন নেই, পাশের ঘরে অপেক্ষমাণ গুল শাহ, তাঁকে দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে শপথবাক্য পাঠ করানো। ইন্দিরা যা চেয়েছিলেন, তা এবার ষোলোকলা পূর্ণ, কাশ্মীরে একজন ক্রীড়নক মুখ্যমন্ত্রী। এ ধরনের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধেই তো সর্বক্ষণ লড়াই করছিলাম আমরা। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের ও বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে কলকাতা থেকেই যোগাযোগ স্থাপন করলাম, আলাপ-আলোচনার সুবিধার জন্য জ্যোতিবাবুর নির্দেশে দিল্লি চলে গেলাম। কর্ণাটক ভবনে রামকৃষ্ণ হেগড়ের পৌরোহিত্যে পরামর্শ সভা, তাড়াহুড়ো করে ডাকা সভা, উপস্থিত ছিলেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বাসবপুন্নাইয়া, সি পি আই-এর রাজেশ্বর রাও, আদি কংগ্রেস দলের তারকেশ্বরী সিংহ ও অম্বিকা সোনি (তখন ঘোর ইন্দিরা-বিরোধী), চন্দ্রজিৎ যাদব (ইনিও তখন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে বামপন্থীদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করছিলেন, তারপর অবশ্য আরও অনেক ঘাটের জল খেয়েছেন), আরও কারা-কারা ছিলেন এখন ঠিক মনে পড়ছে না। কাশ্মীরে গণতন্ত্র নিধন নিয়ে কড়া প্রতিবাদ প্রস্তাব গৃহীত হলো, সিদ্ধান্ত হলো পরদিনই শ্রীনগরে গিয়ে ফারুখকে, এবং কাশ্মীরের জনগণকে, আমাদের সহমর্মিতা জ্ঞাপন করা হবে, কাশ্মীরের সংগ্রাম যে ভারতবর্ষের প্রতিটি বিরোধী দলের সংগ্রাম, প্রতিটি রাজ্যের সংগ্রাম, সে বিষয়ে কাশ্মীরের জনগণকে নিঃসংশয় করা জরুরি কর্তব্য।

কোনও-কোনও ব্যাপারে আমি হয় বেশি আশাবাদী, নয়তো প্রগাঢ়- কাণ্ডজ্ঞানহীন। কলকাতায় ফেরার তাড়া ছিল, ভেবেছিলাম সকালের বিমানে অন্য সকলের সঙ্গে শ্রীনগর পৌঁছে যা-যা করণীয় সেরে সন্ধ্যার বিমানে দিল্লি প্রত্যাবর্তন করবো, তাই গেলাম সম্পূর্ণ এক বস্ত্রে। দিল্লি থেকে বিমান ছাড়তেই অনেক দেরি, খানিক বাদে বুঝতে পারলাম, সেদিন আর প্রত্যাবর্তন সম্ভব হবে না, তখন আর বাড়তি জামাকাপড় নিয়ে আসার উপায়ও নেই, অথচ রাত্রিবাস করতেই হবে শ্রীনগরে। যে-বিমানে আমার ফেরার কথা, আমার চোখের সামনেই শ্রীনগর থেকে উড়ে গেল, বেশি রাত্তিরে শুনতে পেলাম তা দিল্লি পৌঁছয়নি, দুই খালিস্তানি বিমানটি কব্জা করে লাহোরে নিয়ে গেছে। ঘোর নিশীথকালেই আমার সহযোগী রাজনৈতিক নেতারা অভিনন্দন জানাতে এলেন, কাশ্মীর সমস্যা থেকে আর একটু হলেই সমান গুরুতর অন্য সমস্যার অংশীদার হতাম : এক ভারতীয় রাজ্যমন্ত্রী পাকিস্তানে পণবন্দী। দিল্লি থেকে যে ছ'-সাতজন এসেছিলাম, ফারুখের সঙ্গে দেখা করলাম, রাজ্যপালের কুচক্রান্তের বিস্তৃত বিবরণ শুনলাম। ফারুখের বয়ান অনুযায়ী এক সপ্তাহ ধরেই নাকি শ্রীনগর বিমানবন্দরে ঝাঁকে-ঝাঁকে ভারতীয় সৈন্য অবতরণ করছিল, অথচ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিছু জানেন না। ফারুখের আরও বিলাপ, শুধু তাঁর ভগিনীপতিকেই নয়, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও ইন্দিরা গান্ধি বশ করে ফেলেছেন, শ্রীনগরের ক্ষুব্ধ জনতা রাগে টগবগ করছে, তারা ফারুখের সঙ্গে, ন্যাশনাল কনফারেন্সের সঙ্গে। কিছুক্ষণ বাদে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি যে অসাংবিধানিক কাজ করেছেন, তীব্র কণ্ঠে তার প্রতিবাদ জানালাম, তাঁর অবিমৃষ্যকারিতার জন্য গোটা দেশকে এখন দীর্ঘ কাল ধরে খেসারত দিতে হবে, আমাদের বক্তব্যে তা-ও উহ্য রইলো না। মুখ্যমন্ত্রীকে না জানিয়ে সৈন্য আমদানির প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হলো, রাজ্যপাল ভাঙেন তো মচকান না, তাঁর সংক্ষিপ্ত বচন : 'এমন কতগুলি বিষয় আছে যা আমি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে বাধ্য নই, মহাশয়-মহাশয়াগণ, ক্ষমা করবেন, আপনাদেরও জানাতে বাধ্য নই'। যখন চলে এলাম, প্রধান মন্ত্রীর তল্পিবাহক বলে তাঁকে গাল পাড়া থেকে বিন্দুমাত্র বিরত হইনি আমরা। তাঁকে এ-ও জানিয়ে আসতে কসুর করিনি, এই

কাহিনীর এখানেই ইতি নয়, ইতি হতে পারে না। ফিরে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে আমাদের নৈরাশ্যব্যঞ্জক কথাবার্তার বিবরণ ফারুখকে দিলাম, তাঁকে বোঝালাম এক মাঘে শীত যায় না, ইন্দিরা গান্ধি এই ন্যক্কারজনক অপকর্ম করে পার পাবেন না, আমরা গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন গড়ে তুলবো কাশ্মীরে গণতন্ত্র পুনঃস্থাপনের লক্ষ্যে; তবে এটা সমান প্রয়োজন যে, কাশ্মীরে যেন শান্তি বজায় থাকে; উপত্যকার মানুষজনের সম্যকরূপে ক্ষিপ্ত হওয়ার অধিকার আছে, কিন্তু ফারুখকে দেখতে হবে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ যেন সংযত থাকে, মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। ফারুখজননী বেগম আবদুল্লার সঙ্গেও সৌজন্যসাক্ষাৎ করতে গেলাম। তিনি বিষাদপ্রতিমায় রূপান্তরিতা; উর্দুতে আমাদের বললেন, জওহরলাল নেহরুর মেয়ে ইন্দিরাকে তিনি দীর্ঘদিন চেনেন, স্নেহও করতেন তাঁকে, কিন্তু কোনওদিন আর তাঁকে ক্ষমা করবেন না, কারণ ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী তাঁর, বেগম আবদুল্লার, পরিবারের মধ্যে চিড় ধরিয়েছেন, এক ভাইকে আর এক ভাই থেকে আলাদা করে দিয়েছেন, বোনকে সরিয়ে দিয়েছেন ভাইয়ের সান্নিধ্য থেকে।

শ্রীনগর উষ্মায় উত্তপ্ত-উন্মত্ত, যা এতদিন অভাবিত ছিল, কোনও-কোনও মহল্লায় পাকিস্তান-ঘেঁষা ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে পর্যন্ত। ফারুখের অনুরোধ, আমরা শহরে গিয়ে যেন জনগণকে বোঝাই যে ভারতবর্ষের সমস্ত বিরোধী দল, যাদের আমরা প্রতিনিধিত্ব করছি, একবাক্যে ইন্দিরাকৃত অনাচারের নিন্দায় মুখর, যতদিন ন্যাশনাল কনফারেন্সের সরকার স্ব-অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না-হচ্ছে, ততদিন আমরা ক্ষান্ত হবো না। ফারুখের প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়ে দু'তিনটি গাড়ি করে শহরের ঘনবসতি অঞ্চলে উপস্থিত হলাম, আমাদের দেখে সাধারণ মানুষ উদ্বেলিত, কিছুটা আশ্বস্তও। একজন-দু'জন যুবক পাকিস্তানের সমর্থনে চিৎকার শুরু করলে ফারুখ কাছে গিয়ে নম্রস্বরে তাদের সঙ্গে কথা বললেন, তাদের বোঝালেন, তারা শান্ত হলো। শহর পরিভ্রমণান্তে ন্যাশনাল কনফারেন্সের সদর দফতরে পৌঁছে দোতলার উন্মুক্ত ব্যালকনি থেকে জড়ো-হওয়া মানুষদের কাছে ভাষণ দেওয়ার পালা। ভাষণ দিতে হবে সবাইকে উর্দুতে, আমাকে পর্যন্ত। চোখকান বুজে কয়েকটি 'তানাশাহী তোরনা পড়েগা' গোছের বাঁধা গতের বুলি আউড়ে চার-পাঁচ মিনিট বাদে যখন ক্ষান্ত দিলাম, মুহুর্মুহু হাততালি, তারকেশ্বরী সিংহর উক্তি, 'তুমি যে এত ভালো হিন্দি-উর্দু জানো, তা তো জানতাম না'। পরদিন এক 'জাতীয়' সংবাদপত্রে জনৈক মহিলা সাংবাদিকের মন্তব্য : সবচেয়ে ভালো বক্তৃতা উর্দুতে দিয়েছিলেন অশোক মিত্র। জনপরিবাদ কী করে জন্ম নেয়, অলীক ভিত্তি সত্ত্বেও, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম।

যে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে গিয়েছিলাম, তাতেই রাত্রিবাস। প্রত্যেকের জন্য ফারুখ ডাল হ্রদে একটি করে বজরার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার পাশের বজরায় চন্দ্রজিৎ যাদব, তাঁর কাছ থেকে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম ও একটি চিরুনি ধার করে কোনওক্রমে রাজ্যমন্ত্রীর বহির্মর্যাদা রক্ষা করা গেল। সকালের বিমানে আমাদের কয়েকজনের দিল্লি প্রত্যাবর্তন। কেন্দ্রীয় বঙ্গভাষী অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আমার দেখা করবার কথা ছিল সেদিন, অন্য কথাবার্তা সমাপ্ত হওয়ার পর তাঁকে ফের জিজ্ঞাসা করলাম, 'মশাই, ক'দিন আগে আপনিই তো বলেছিলেন, চবনের সুপারিশ অনুযায়ী আমরা পশ্চিম বাংলায় অনেক টাকা পাবো। ব্যাপারটি আর কতদিন ঝুলিয়ে রাখবেন?' কেন্দ্রীয় মন্ত্রীটি হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাশ্মীর নিয়ে আপনারা খুব বেশি চেঁচামিচি করবেন নাকি?' আমার বিস্মিত জবাব, 'তার সঙ্গে অর্থ কমিশনের রিপোর্টের কী সম্পর্ক?' মন্ত্রী মৃদু হাসলেন।

সম্পর্ক বোঝা গেল পরের সপ্তাহে। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠক, ছ'জন কংগ্রেস-বিরোধী মুখ্যমন্ত্রী মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তাঁরা কাশ্মীরে সংসাধিত অনাচারের প্রতিবাদে উন্নয়ন পরিষদের বৈঠক বর্জন করবেন, তাঁদের তরফ থেকে অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি পাঠ করবার পর। বিবৃতির খসড়া তৈরি হলো, রামরাও তা পাঠ করতে উঠলেন, ততক্ষণে ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর পারিষদরা বুঝে গেছেন কী ঘটতে যাচ্ছে, তাঁরা এন টি আর-কে বিবৃতি পড়তে না দিতে বদ্ধপরিকর, বিদূষকদের মধ্যে কয়েকজন, যেমন বুটা সিংহ, রাজেশ পাইলট, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী জানকীবল্লভ পট্টনায়ক, সরবে এন টি আর-এর পাঠ ভণ্ডুল করার চেষ্টায় রত। তাঁদের দেখাদেখি আমারও চেঁচিয়ে প্রতি-প্রতিবাদে গলা সংযোগ, এমন সময় ইন্দিরা গান্ধি একটি বিচিত্র কাণ্ড করলেন, হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে, কণ্ঠস্বর সরু ও তীক্ষ্ণ, বললেন, 'রাজ্যের মন্ত্রী যাঁরা উপস্থিত আছেন, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের কতগুলি নিয়ম তাঁদের জানা উচিত। কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকলে, এমনধারা বৈঠকে একমাত্র তিনিই কথা বলতে পারেন, তাঁর সহচর-হয়ে-আসা কোনও মন্ত্রী পারেন না'। অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধি আমার উপর তাঁর গায়ের ঝাল ঝাড়লেন। হট্টগোল, হট্টগোল, রামকৃষ্ণ হেগড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ইন্দিরার মন্তব্যের কড়া প্রতিবাদ জানালেন, রামরাও তাঁর পড়া শেষ করলেন, আমরা শোভাযাত্রা করে সভা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম, সঙ্গে-সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলন। হেগড়ে রাগে ফুঁসছেন, আমাকে অপমান করবার অধিকার ইন্দিরার নেই, আমি হেসে হেগড়ের হাত ধরে বললাম, অল ইন দ্য গেম।

খেলা যে আরও কতদূর গড়াবে, টের পেলাম দিন কয়েক বাদে যখন অর্থ কমিশনের সুপারিশাদি এবং তৎসম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো। আমার আর্ত কথাগুলি স্পষ্টতই যশবন্ত চবনকে নাড়া দিয়েছিল, তিনি কমিশনের প্রতিবেদনে ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫-৮৬ এই দুই বছর একটি বিশেষ সূত্র-অনুযায়ী পশ্চিম বাংলার জন্য প্রচুর বাড়তি বরাদ্দের সুপারিশ করেছিলেন। আরও কয়েকটি রাজ্যের জন্যও করেছিলেন, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গই ওই সূত্রে সবচেয়ে বেশি উপকৃত। কিন্তু না, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিতে বজ্রনির্ঘোষ : দেশে মুদ্রাস্ফীতি চিন্তাজনক হারে বাড়ছে, জাতীয় কোষাগারে অর্থের অনটন, অর্থ কমিশনের এই বিশেষ সুপারিশ অতএব মান্য করা যাবে না। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে এই প্রথম, এবং আজ পর্যন্ত এই-ই শেষ, অর্থ কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য হলো। একটু চোখের চামড়া তখনও তো ছিল, শুধু পশ্চিম বাংলাকে বঞ্চিত করলে সাংবিধানিক প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, সুতরাং কোনও রাজ্যের ক্ষেত্রেই ওই সূত্রটি প্রয়োগ করা হলো না। তবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বেছে-বেছে কংগ্রেস-শাসিত রাজ্যগুলিতে গিয়ে অভয় দিলেন, তাঁদের চিন্তার কারণ নেই, অর্থ কমিশন থেকে প্রাপ্য যে-টাকা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হলেন, তা তিনি তাঁদের বিনাসুদে দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ দিয়ে পূরণ করে দেবেন, একমাত্র পশ্চিম বাংলা অথৈ জলে ডুবুক। ঘোর দুর্ভাগ্য, কমিশনের সুপারিশ-করা অর্থ থেকে আমাদের বঞ্চিত করার ব্যাপারে অধিকাংশ অন্য অকংগ্রেসি রাজ্যগুলি থেকে তেমন অনুকম্পায়ী স্বর শুনতে পেলাম না, তাঁদের লাভ-ক্ষতির তাৎক্ষণিক হিশেব আমাদের থেকে ভিন্ন। সাংবিধানিক প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার কথা ভাবা হলো, কিন্তু আবিষ্কার করলাম, সে-ভাবনাতেও পশ্চিম বাংলা একা। তা হলেও একটা কিছু তো করতেই হয়, মস্ত স্মারকলিপি তৈরি করে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বোঝা যাচ্ছিল, রাষ্ট্রপতি জৈল সিংহ-এর সঙ্গে তখন থেকেই ইন্দিরা গান্ধির মতান্তর দেখা দিয়েছে, আমার হাত থেকে স্মারকলিপিটি গ্রহণ করে,

পাতাগুলি সামান্য নেড়ে-চেড়ে রাষ্ট্রপতি বিরক্তিসূচক উক্তি করলেন, অবশ্যই হিন্দিতে : 'এ সব ব্যক্তিরা খামোখা আপনাদের সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হচ্ছে কেন?' সেদিনই প্রথম খেয়াল হলো যে 'খামোখা' আদতে হিন্দি শব্দ।

যদিও তাঁর সুপারিশ থেকে কার্যকরী উপকার পশ্চিম বাংলার অপ্রাপ্যই রইলো, তবু কৃতজ্ঞতা জানাতে যশবন্ত চবনের সঙ্গেও দেখা করলাম। তিনি স্পষ্টতই মর্মাহত, খুব অসহায় বোধ করছেন; জানালেন যদিও কাজের কাজ কিছু হবে না, তবু ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে দেখা করে অর্থ মন্ত্রকের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সোচ্চার হবেন। মাসখানেক বাদে রিজার্ভ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নরের সঙ্গে দেখা, তিনিও পরে কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁর কাছে শুনলাম, তিনি প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন, অর্থ কমিশনের প্রথম দুই বছরের সুপারিশ পুরোপুরি মেনে নিলে জাতীয় অর্থব্যবস্থা বা মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হতো না, রাজ্যগুলির উৎকীর্ণ অর্থাভাব, যে টাকা তারা পেল না তার ঘাটতি মেটাতে তারা বাড়তি ওভারড্রাফট নিতে বাধ্য হবে। ইন্দিরা গান্ধি নাকি উত্তর দিয়েছিলেন, তাঁর কিছু করার নেই, তাঁর অর্থমন্ত্রী তাঁকে বলেছেন এমন না করলে দেশের সর্বনাশ হবে।

ইন্দিরা গান্ধি জটিল চরিত্রের মানবী, সরকারি বৈঠকে আমাকে কর্কশ, প্রায়-অভদ্র গাল পাড়লেন। অথচ প্রায় কাছাকাছি সময়ে কলকাতায় নীলিমা দেবী প্রয়াত হলেন, স্মরণিকা হিশেবে আমি একটি প্রবন্ধ ছাপালাম, তাতে উল্লেখ ছিল শৈশবে এলহাবাদ শহরে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের তিনি সহচরী ছিলেন, বিবাহিত স্বামীকে ছেড়ে প্রেমিক পুরুষের সঙ্গে চলে গিয়ে সামাজিক ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের সাহস নীলিমা দেবী দেখিয়েছিলেন, বিজয়লক্ষ্মী অনুরূপ সাহস দেখিয়ে তাঁর মুসলমান প্রেমিককে বরণ করতে অসমর্থ হয়েছিলেন; বেচারী প্রেমিকটিকে সারা জীবন নিউ ইয়র্কে নির্বাসনে থাকতে হয়। লেখাটি ইন্দিরা গান্ধির চোখে পড়েছিল, বড়ো পিসির সঙ্গে বরাবর ইন্দিরার মধুর সম্পর্ক, পিসি সম্পর্কে সামান্য বাঁকা মন্তব্য ছিল বলেই লেখাটি তাঁর আরো পছন্দ। আমার পরিচিত এক মহিলার কাছে ইন্দিরা গান্ধির মন্তব্য, 'প্রবন্ধটি লেখার আগে অশোক আমাকে জিজ্ঞেস করেনি কেন? তা হলে নীলিমা দেবী ও আমার পিসি সম্পর্কে আরো অনেক খবর ওকে দিতে পারতাম।'

মূল প্রসঙ্গে ফিরি। পশ্চিম বাংলার প্রতিবাদ যেমন ঢেউ তুললো না, কাশ্মীরে ফারুখকে অপসারণের প্রতিবাদতরঙ্গও, যা হওয়া আদৌ উচিত ছিল না, একটু-একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু যিনি নিজের পায়ে কুড়ুল মারতে বদ্ধপরিকর, তাঁকে ঠেকাবে কে? ফারুখকে উৎখাত করেছেন, পশ্চিম বাংলাকে ভাতে মারবার আয়োজন করেছেন, এবার এন টি আর-এর পালা। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকের মাসখানেক বাদে হায়দরাবাদে ফের নাটক। হরিয়ানা থেকে এক দুর্নীতিগ্রস্ত অপদার্থ ব্যক্তিকে অন্ধ্র প্রদেশে রাজ্যপাল করে পাঠানো হয়েছিল কয়েক সপ্তাহ আগে। রামরাও বিদেশে, জনৈক রাজ্যমন্ত্রীকে টোপ দেওয়া হলো, তিনি বেরিয়ে আসুন, যদি পারেন আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে, তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী করে দেওয়া হবে। তাই-ই করা হলো, রামরাও বরখাস্ত হলেন, সেই মন্ত্রী, ভাস্কর রাও না কী যেন নাম, ভুলেই গেছি, তাঁকে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিশেবে শপথবাক্য পাঠ।

ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর পরামর্শদাতারা হয়তো ভাবলেন, দান দান তিন দান, এবার কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে ঠান্ডাই-মাগুাই চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া হলো। তাঁদের প্রকাণ্ড ভুল হয়েছিল। অন্ধ্র প্রদেশের অধিকাংশ বিধায়ক শুধু রামারাওয়ের প্রতি অনুগত্যে অটল

রইলেন না, গোটা তেলেগুভাষী জনসাধারণ ক্ষেপে উঠলেন। বাস-সরকারি গাড়ি পুড়লো হায়দরাবাদে, রাজ্যের অন্যান্য শহরে-গ্রামে-গঞ্জে, অস্থির উত্তেজিত মানুষদের রাস্তায় বেরিয়ে আসা। দু' সপ্তাহের মধ্যেই ইন্দিরা গান্ধি পরাজয় বরণ করে পুরোপুরি আত্ম সমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। এন টি আর ফের অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীরূপে বৃত হলেন, সেই রাজ্যপালটিকে অন্ধ্র ছেড়ে পালিয়ে আসতে হলো, সর্বোপরি, এখন আর পালাবার পথ নেই প্রধান মন্ত্রীর, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক সামগ্রিক পুনর্বিন্যাসের জন্য একটি সরকারি কমিশনের কথাও ঘোষণা করতে হলো তাঁকে। কমিশনের জন্য যে-নির্দেশাবলী প্রস্তুত করা হলো, তা নিটোল আমাদের পছন্দসই নয়; যে-তিনজনকে নিয়ে কমিশন গঠিত হলো, তাঁদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি নিয়েও আমাদের সন্দেহ ছিল। কিন্তু মূল লক্ষ্যের অভিমুখে খানিকটা তো এগোনো গেল।

নানা কুকাজ করে ইন্দিরা গান্ধি ক্রমশ সারা দেশে অশ্রদ্ধার পাত্রী হচ্ছিলেন। আমরা প্রায় নিশ্চিত ছিলাম, পঁচাশি সালের গোড়ায় যে-সাধারণ নির্বাচন, তাতে কংগ্রেস গো-হারা হারবে। প্রধান মন্ত্রীর রাজনৈতিক নিঃসঙ্গতা প্রতিদিন প্রকটতর; বিরোধী দলগুলির পরস্পরের কাছাকাছি আসার যে-প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তা থেকেই, আমরা ভেবে নিয়েছিলাম, একটি নীতি-ও কর্মসূচি-ভিত্তিক জোট তৈরির কাজ কয়েক মাসের মধ্যেই সুসম্পন্ন করা সম্ভব হবে, ইন্দিরা গান্ধি বিভিন্ন অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়ে আমাদের প্রচুর সুবিধা করে দিয়েছেন।

অক্টোবরের শেষ তারিখে তাঁর নৃশংস হত্যা সব-কিছু হিশেব উল্টে দিল। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক জড়িত আন্দোলনও তখন থেকে একটু ঝিমিয়ে এলো। আমার ক্ষেত্রে অন্তত, এখন এ সব নিছক স্মৃতিচারণ; তা হলেও, কবুলতি না করা অক্ষমার্হ হবে, দেশ জুড়ে কেন্দ্র-রাজ্য সমস্যা নিয়ে যে শোরগোল তোলা গিয়েছিল, তাতে যদিও একটি মাঝারি-গোছের ভূমিকা পালন করেছিলাম, জ্যোতিবাবুর, এবং সেই সঙ্গে পার্টির, অকুণ্ঠ সমর্থন ও উৎসাহ ছাড়া এক পা অগ্রসর হওয়াও আমার সাধ্যের বাইরে ছিল। যবনিকার আড়াল থেকে অভয় ও ভরসা পেয়েছিলাম বলেই হইরই করে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে সক্ষম হয়েছিলাম, আত্মশ্লাঘা নিয়ে বাড়াবাড়ি তাই উপহসনীয়।

প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার আগে একটি ঘটনার কথা বলি। ইন্দিরা গান্ধি যেদিন খুন হলেন, জ্যোতিবাবু দক্ষিণ ভারতে, আমরা ক'জন মন্ত্রী রাইটার্স বিল্ডিংয়ে উপস্থিত, ঘন-ঘন দিল্লি থেকে খবর আসছে, দাঙ্গার আগুন দ্রুত ছড়িয়েছে, শিখ সম্প্রদায়ভুক্তরা কচু-কাটা হচ্ছেন, কলকাতায় ও পশ্চিম বাংলায় সেরকম কিছু হতে না দিতে আমরা বদ্ধপরিকর। আমাদের মধ্যে কয়েকজন, সঙ্গে পুলিশের কিছু বড়ো-মেজো কর্তা, শহর টহল দিতে বেরোলাম। আমার সঙ্গে কলকাতা পুলিশের এক যুগ্ম কমিশনার, গাড়িতে উঠেই আমার দিকে তাকিয়ে তাঁর গর্বিত পরিতৃপ্তির হাসি: 'এবার সর্দারগুলোকে বাগে পেয়েছি, ঠেঙিয়ে টিট করে দেবো।' আমি স্তম্ভিত, কোথায় নিরপরাধ শিখদের হামলার হাত থেকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি, এই পুলিশ কর্তা ঠিক উল্টো কথা বলছেন। কড়া ভাষায় তাঁকে ধমকালাম, ঘাবড়ে গিয়ে নীরব হলেন। এই ব্যক্তিই, কার সুপারিশ জানি না, কয়েক বছর বাদে খোদ পুলিশ কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন, তবে নিজের অবিবেচনায় টিকে থাকতে পারেননি। এ ধরনের মানুষ, আমার সন্দেহ, প্রশাসনে এখনও বেশ-কিছু বহাল আছেন।

বত্রিশ

কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের বৈরিতা সত্ত্বেও ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের অর্থবিভাগের কাজকর্মে কিছু সজীবতা এসেছে, রাজস্ব সংগ্রহের প্রয়াসে একটু-একটু করে সফল হচ্ছি। সত্যব্রতবাবু রাজ্য যোজনা পরিষদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে কথা বলে দিল্লি থেকে অরুণ ঘোষকে পরিষদের কার্যকরী প্রধান হিশেবে কলকাতায় নিয়ে আসতে সফল হলাম। অরুণ ঘোষের অফুরন্ত উৎসাহ, অত্যাশ্চর্য পরিশ্রম করবার ক্ষমতা, এবং, কারও-কারও বিচারে আমার মধ্যে যার একান্ত অভাব, সকলকে নিয়ে মিলে-জুলে কাজ করার নিপুণ দক্ষতা। অরুণ ঘোষ অচিরে আমাদের সঙ্গে একমত; রাজ্য পরিকল্পনার মূল ঝোঁক গ্রামকেন্দ্রিক ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থানির্ভর করতে হবে; পরিকল্পনার একটি সর্বাঙ্গীণ কাঠামো অবশ্যই থাকবে, শিল্পবিস্তার ও কর্মসংস্থান নিয়ে সংহত নানা প্রকল্প জড়িয়েই সে-সব ব্যবস্থা। শিল্পে অভিজ্ঞ, বিজ্ঞানে ঋদ্ধ, এমন কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করে পরিষদের সদস্য করা হয়েছিল, তাঁদের সঙ্গে অরুণ ঘোষের চমৎকার বোঝাবুঝি, আমি তাই অন্যান্য বিষয়ে মনোনিবেশ করবার ফুরসত পেলাম।

বামফ্রন্ট সরকারের সাত-আট বছর প্রায় অতিক্রান্ত। মন্ত্রিসভায় পার্টি থেকে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছেন, কোনও অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিলে পরামর্শ দান করেছেন। বিনয়দার কাছে কারণে-অকারণে সব সময়ই ছুটে যেতাম, কখনও তাঁর উপদেশ পেতে, তাঁর বিচিত্র বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা শুনতে, তত্ত্ব থেকে কী করে প্রজ্ঞায় উপনীত হওয়া যায় সেই শিক্ষা লাভ করতে। মন্ত্রীদের মধ্যে তিনি বোধহয় সবচেয়ে বেশি পড়াশুনো করতেন, তাঁর টেবিলে এমন কি ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি-র সর্বশেষ সংখ্যাটিও সর্বদা চোখে পড়তো। তাঁর কাছ থেকে অতীত দিনের কাহিনী শোনা দুর্লভ সৌভাগ্য: বিপ্লবী যুগে পিস্তল হাতে তাঁর ঘোরাফেরার বিবরণ, দামোদর উপত্যকায় কৃষক আন্দোলনের কথা, রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রথম পর্বের বৃত্তান্ত, এমন অনেক কিছু।

তবে অপ্রিয় সিদ্ধান্তের সমস্যা থেকেই যায়। সমাজব্যবস্থাকে এড়ানো তো সম্ভব নয়, বামপন্থী জোট, সব ক'টি দলই সমাজতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ, অথচ পার্শ্বপরিবেশের প্রভাব তো উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন নির্বাচনে উপর্যুপরি সাফল্য, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গ্রামাঞ্চলে আগাপাশতলা পরিবর্তনের সূচনা, শালকিয়া প্লেনামের সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী দলের শাখাপ্রশাখা যথাশীঘ্র বিস্তারের উন্মুখতা। পার্টির সদস্য সংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ছে, যে ধরনের আদর্শ, নিষ্ঠা ও পরিচিকীর্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করে পার্টির সভ্যপদ একদা বিতরণ করা হতো, সেই নিয়ম-নিগড়ে আস্তে-আস্তে শিথিলতার অনুপ্রবেশ; তা ছাড়া, বরাবরই যেটা আমার বদ্ধমূল ধারণা, যদিও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা নীতির ভিত্তিতে সাংগঠনিক শৃঙ্খলাসংরক্ষণে জোর দেওয়া মার্কসপন্থী-লেনিনপন্থীরা পছন্দ করেন,

ভারতবর্ষের, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার, প্রেক্ষিতে তা ছাপিয়ে, অধিকতর জায়গা জুড়ে, একটু আগে যা বলেছি, সামন্ততান্ত্রিক মনস্কতা। কথাটা কর্কশ শোনায়, কিন্তু জীবনের উপান্তে এসে একটু স্পষ্ট কথা যদি এখন না বলি, পরে হয়তো আর সুযোগ ঘটবে না। পশ্চিম বাংলায় স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে প্রায় প্রতিটি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের যাঁরা হাল ধরে থেকেছেন, এখনও আছেন, তাঁরা অনেকেই বড়ো, মাঝারি, ছোটো জমিদার বংশের পৌত্র বা প্রপৌত্র। আদর্শের দিক দিয়ে তাঁরা সামন্ততন্ত্র থেকে বহুদূর সরে এসেছেন, বৃত্তির দিক থেকেও তাঁদের জীবনচর্যায় জমিদারির ধ্বংসাবশেষের প্রলেপও আর লেগে নেই, অথচ অভ্যাসে-আচরণে-ব্যবহারে এখনও সামন্ততন্ত্রের অভিশাপ। দল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হোক, বড় হোক, যায় আসে না, অনেক নেতারই স্বভাবে, তাঁদের অন্য সহস্র গুণাবলী সত্ত্বেও, বংশপরাম্পরার বিষণ্ণ ছায়া। পার্টি কঠিন অনুশাসনে বাঁধা, নিয়ম-শৃঙ্খলার সামান্যতম বিচ্যুতি হবার উপায় নেই, সব স্তরে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত একবার গৃহীত হলে তা প্রয়োগ করবার দায় সর্বোচ্চ নেতৃত্বের, কোনও স্তরে কেউই তখন তার বিরুদ্ধাচারণ করতে পারবেন না: তত্ত্ব হিশেবে এই গণতান্ত্রিক আচরণবিধি চমৎকার, অথচ প্রয়োগে বিচ্যুতি ঘটে, গণতান্ত্রিকতা উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, জমিদারি সেরেস্তার ধরন-ধারণই শেষ পর্যন্ত প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, উপর থেকে নিচে প্রতিটি স্তরে নির্দেশ মানার কথা হুকুম তালিমের সমগোত্রীয় হয়ে দাঁড়ায়। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অন্য যে-প্রাথমিক শর্ত, নিচের থেকে উপর পর্যন্ত আলোচনার আবশ্যকতা, তা জমিদারি সেরেস্তার ক্ষেত্রে অভাবনীয়: তাঁরা চান বা না চান, অনেক স্তরেই নেতারা, হয়তো অন্যমনস্কতাহেতুই, জমিদারপ্রতিম বনে যান।

মন খারাপ-করা সমস্যা, কিন্তু অস্বীকার করি কী করে, জমিদারি প্রথায় যা অবধারিত, খোশামোদের ঘুণ এসে বাসা বাঁধে, বামপন্থী দলগুলিতেও এই উপদ্রবের উপস্থিতি। অনিবার্য পরিণামে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নেতাদের সঙ্গে কমরেডদের সামাজিক দূরত্ব বাড়ে, খোশামোদের মোহজালে কোনও-কোনও নেতা আটকে যান; খোশামোদবৃত্তির যা অপফল, উপরতলাকে খুশি করে কাজ হাসিল করার চেষ্টা বেড়ে চলে। সুযোগ গ্রহণ করে ইতস্তত বেনো জল, এমনকি কঠিন শৃঙ্খলে-মোড়া কমিউনিস্ট পার্টিতেও, ঢুকতে থাকে। আরও যা মারাত্মক, বিদূষণার মোহজাল উপর থেকে ক্রমশ নিচে ছড়িয়ে পড়ে, মাঝারি-ছোটো নেতাদের মধ্যেও কর্তাভজা গোষ্ঠী অচিরে গজিয়ে ওঠে। কু-আদর্শ সৃষ্টির কিছুটা কৌতুকজনক, অনেকটাই বিষাদ-উদ্রেককারী, যাকে আমি বলবো দৃষ্টান্ত, টেলিফোন সংস্কৃতি। বড়ো নেতারা নিজেরা টেলিফোন ধরেন না, তাঁরা ব্যস্ত মানুষ। কারও সঙ্গে ফোনে কথা বলতে হলে কোনও শিষ্য বা অনুগত ফোনের বোতাম টেপেন, ওদিক থেকে সাড়া পেলে যন্ত্রটি নেতার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই বিশেষ আদর্শটি এখন সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত : উঠতি ছাত্র বা যুব নেতা কোনও অশীতিপর প্রাক্তন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন, এক বয়স্য সেই বৃদ্ধকে ফোনে পাকড়ালেন : 'ধরুন, অমুক কমরেড দাদা কথা বলবেন'। বৃদ্ধ ভদ্রলোক আড়াই-তিন মিনিট যন্ত্রটি ধরে রইলেন, কিন্তু জবরদস্ত ছাত্র বা যুব নেতা, ব্যস্ত মানুষ, তাঁর ফোনের কাছে আসার সময় হয় না।

স্খলমান আদর্শহীনতা ও নীতিবিচ্যুতি সম্পর্কে বিশেষ একটি ঘটনা উল্লেখ করার তাগিদ বোধ করছি। পঁচাশি সালের মধ্যগ্রীষ্ম, বিধানসভার একটি খালি আসনের জন্য কলকাতার উত্তর প্রান্তে উপনির্বাচন। পার্টির প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, আমরা মন্ত্রীরা সন্ধ্যাবেলা মহাকরণ-ফেরত প্রচারে যাচ্ছি। পার্টির কড়া নির্দেশ, রাইটার্স বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে

কলকাতা জেলা কমিটির দফতরে পৌঁছে সরকারি গাড়ি ছেড়ে দেবো, সেখান থেকে পার্টির পরিবহনে প্রচারে যাবো। এক পাড়ায় সভা সেরে মঞ্চ থেকে নামছি, হঠাৎ দেখি এক রাষ্ট্রমন্ত্রী, অনতি-অতীতে ছাত্র ও যুব নেতা, সরকারি গাড়ি চেপে, আলো জ্বেলে, হুটারে শব্দ ছড়িয়ে উপস্থিত। তাকে মৃদু ভর্ৎসনা করলাম, 'পার্টির নিয়ম কি তোমার জানা নেই? এভাবে সরকারি গাড়ি নিয়ে দলীয় প্রচারে এসেছো কেন?' তার নিশ্চিন্ত উত্তর, 'ওরা যে করে'। ওরা মানে কংগ্রেসিরা। বলতে উদ্যত হয়েও নিজেকে সংযত করলাম, 'তা হলে ওদের দলেই তো যোগ দিতে পারতে, কমিউনিস্ট পার্টিতে এলে কেন?'

পার্টির কাছে ব্যাপারটি জানিয়ে কোনও ফল হলো না, শ্রীমান রাষ্ট্রমন্ত্রী কোনও-কোনও সর্বোচ্চ স্তরের নেতার অনুগত অনুচর। এই তখনো-উঠতি নেতাটি সত্যিই বিশ্রুতকীর্তি, কিছুদিন বাদে তার অন্য একটি অপকর্ম আমাকে বিব্রত করলো। তার দপ্তরে জনৈক উপ-সচিবের অবসরের বয়স পেরিয়ে গেছে, ইতিমধ্যে দু'-তিনবার চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে, কোনও নিয়মেই আর বাড়ানো সম্ভব নয়। অর্থ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিশেবে আমাকে নিয়ম-কানুনগুলি মেনে ও মানিয়ে চলার দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। রাষ্ট্রমন্ত্রীটির তরফে ওই উপ-সচিবের কাজের মেয়াদ পুনর্বার বাড়ানোর জন্য ফাইল চালু হলো, অর্থ বিভাগ ও মুখ্যমন্ত্রীর অসম্মতি জ্ঞাপন করে ফিরিয়ে দেওয়া হলো সেই ফাইল, দিন পনেরো বাদে আবিষ্কার করলাম রাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে সেই ভদ্রলোককে তবু বহাল রাখা হচ্ছে সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ উপায়ে। পার্টিকে জানালাম, বিহিত করুন; আমাদের নিজেদের মন্ত্রীরাই যদি নিয়ম না মানেন, শরিক দলের বেনিয়ম ঠেকাব কী উপায়ে? আমাকে বলা হলো, যেন একটু ক্ষমাক্ষেন্না করি, ও, মানে রাষ্ট্রমন্ত্রীটি, নাকি খুব দক্ষ কেজো ছেলে, অনেকভাবে পার্টিকে সাহায্য করে। শুনে তড়িদাহত হলাম।

সমস্যাটির বীজ আসলে আরও অনেক গভীরে। রাষ্ট্রমন্ত্রীটির পার্টির বিভিন্ন স্তরে পৃষ্ঠপোষক আছে; সামন্তভিত্তিক প্রথায় যা অনিবার্য, কোনও বড়ো নেতার আদরের। নেতা হয় তো বুঝতেও পারেন না তাঁকে স্তাবকতা করা হয়, তাঁর ধারণা ছেলেটি অশেষ গুণের অধিকারী, যখনই যে কাজটা তাকে করতে বলেন, সঙ্গে-সঙ্গে তা পালিত হয়। যার উপর কৃপাবর্ষণ করি, তার দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করার প্রবণতা একটু-একটু করে বাড়ে। সামন্ততন্ত্রের পাশাপাশি স্তাবকতন্ত্র তৈরি হয়, দুর্নীতির বিষ-বাষ্পও সেই সঙ্গে ছড়াতে শুরু করে। তরুণ নেতাটি, চোখের সামনে অনুরাগ-বীতরাগের একটি আদর্শকে লতামঞ্জরীসহ বিস্তারিত হতে দেখে, নিজেও তা অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়, অচিরে তারও এক ঝাঁক বিদূষক জুটে যায়। গুন গুন রবে মধুপান করার উৎসাহ উপ-স্তাবকদের মধ্যে মাথাচাড়া দেয়, একটু-আধটু নীতিস্খলনও শুরু হয় সেই সঙ্গে। শাস্ত্রেই তো বলে, নাস্তে সুখমস্তি; ছোটোখাটো দুর্নীতি থেকে বৃহত্তর দুর্নীতির দিকে ছুটতে মন ক্রমশ উচাটন হয়।

আরও একটি তথ্য জরুরি, অন্তত জরুরি বলে মনে হয় আমার। উনিশশো পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের দশকে কমিউনিস্ট পার্টিতে অনেক ছেলে-মেয়ে জড়ো হয়, যারা পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থী পরিবারভুক্ত। উদ্বাস্তু আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির সুদৃঢ় নেতৃত্ব তাদের মুগ্ধ করেছে, মোহাবিষ্ট হয়ে তারা পার্টির ছত্রতলে ভিড় করেছে। পূর্ববঙ্গের গ্রামে-শহরে শৈশব-কৈশোর অতিবাহনকালে তারা পাড়াতো কলহ-দঙ্গলে জড়িয়ে পড়তো, দাদারা তাদের পাড়ার বা গোষ্ঠীর স্বার্থে লাঠিসোঁটা-হকিস্টিক চালানো শেখাতেন, কখনও ছুরি চালানোও : চিন্তা করার বালাই নেই, দাদাদের হুকুম পালন করলেই হলো। শরণার্থী

হয়ে এই বাংলার জনারণ্যে মিশে পার্টির উৎসাহী সমর্থক হতে তাদের তেমন অসুবিধা দেখা দিল না। তারা রাজনৈতিক পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে বিশেষ যায়নি, অনেকের স্কুলের গণ্ডি পর্যন্ত অতিক্রম করা হয়নি। কিন্তু তারা বিপদে-আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে অকুতোভয়ে, পার্টির নেতৃবর্গের প্রতি তাদের আনুগত্য অসীম, নেতাদেরও তাই তাদের সম্পর্কে গভীর অনুরাগ পোষণ। (তবে আগুনে পুড়ে সোনা যে তৈরি হয় না তা-ও তো নয়। তরুণ নেতাদের ভিড়ে যাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতাম, দীনেশ মজুমদার, উদ্বাস্তু আন্দোলনের মধ্য দিয়েই উঠে এসেছিল। ওরকম নম্রস্বভাব, বুদ্ধিমান, ঠান্ডা-মাথার ব্যক্তিত্ব খুব কম চোখে পড়ে। তার অকালমৃত্যুতে, বার-বার বলবো, পার্টির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।)

বাংলার ঐতিহাসিক ধারাক্রমে রাজনৈতিক বশ্যতার দু'টি পাশাপাশি ধারা আসলে বহুদিন থেকে বহমান। চিত্তরঞ্জন দাশের উক্তি, অন্তত তাঁর উক্তি বলে প্রচারিত, একটি মন্তব্য ছেলেবেলায় প্রায়ই শুনেছি : 'আমার দু'-ধরণের শিষ্য দরকার। আমার যেমন যতীন-সুভাষকে চাই, শ্রীশ-বসন্তকেও চাই'। যতীন অবশ্যই যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষ খোদ সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীশ ঢাকার উকিল, বহুদিন জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আর বসন্তকুমার মজুমদার দেশসেবিকা হেমপ্রভা মজুমদারের স্বামী, চলচ্চিত্র পরিচালক ও অভিনেতা সুশীল মজুমদারের পিতা। জনশ্রুতি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আলোচনা-পরামর্শের জন্য যেমন যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্রের উপর সর্বদা নির্ভর করতেন, সভাসমিতিতে শত্রুপক্ষীয়দের হাঙ্গামা সামাল দিতে শক্তপোক্ত চেহারার শ্রীশবাবু ও বসন্তবাবুর উপরও তেমনই নির্ভরশীল ছিলেন, একটু ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দেখতেন শেষোক্ত দু'জনকে। সেই ঐতিহ্যের অবলুপ্তি এখনও ঘটেনি। ছেলেটা একটু-আধটু নিয়মকানুন মেনে চলে না, তাতে কী, ওর কাছ থেকে তো নানা ধরনের উপকার পাওয়া যায়।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে অনেক পরম সম্মানীয় নেতারও হয়তো খানিকটা মানসিক দৌর্বল্য দেখা দেয়, আশে-পাশে এমন কেউ থাকুক যে একটু খুশি করবার মতো, মন ভরাবার মতো, কথাবার্তা বলবে, দুরূহ কোনও কাজ শত অসুবিধা ডিঙিয়ে সম্পন্ন করে দেবে। সত্যব্রত সেনের সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা করতাম, কী করে এই প্রবণতার অপফলের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া যায়। তা করতে গেলে মাঝে-মাঝে অপ্রিয় কথা যে বলা প্রয়োজন, তা নিয়ে আমাদের মনে কোনও সংশয় ছিল না। পার্টির প্রতি আনুগত্য অটুট থাকবে, থাকবেই, তা হলেও যে সব দুর্বলতা অনুপ্রবেশ করছে, তাদের সম্পর্কেও প্রতিবাদে মুখর হতে হবে। দলের অনুশাসন ভাঙা চলবে না, পার্টি কর্তৃক যথাযথই-ভর্ৎসিত উপদলবাজি করা চলবে না, অথচ যে-যে লক্ষণগুলি অপছন্দ হচ্ছে, কোন পদ্ধতিতে তাদের নিরসন সম্ভব, তা নিয়ে আমাদের নিরন্তর আলোচনা। বেড়ালের গলায় ঘণ্টা কে বাঁধবে তা নিয়ে জটিলতা। একটি-দু'টি এমনধারা ব্যাপারে বিনয় কোঙারের উপদেশ ভিক্ষা করেছি কখনও-কখনও, তিনি সহানুভূতি-সহ শুনতেন, কিন্তু তাঁর মধ্যেও ঈষৎ দ্বিধা-জড়তা, বিব্রত বোধ করে একদিন আমাকে বললেন, 'আপনি ভুল করছেন, আমি আমার দাদা নই'।

এমনি করেই দিন কাটছিল, হঠাৎ অন্য একটি সমস্যা দেখা দিল। আমরা সরকারে ঢুকেই বামপন্থী নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে একটি খসড়া শিল্পনীতি তৈরি করেছিলাম, কলকাতার শিল্পমহলের সঙ্গে আলোচনা করে তা পরিশোধন করা হয়েছিল, যেমন হয়েছিল রাজনৈতিক নেতৃকুল ও ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সঙ্গেও আলোচনা করে। এ সব বিষয়ে আমার নাস্তিকতা বহুদিনের। ভারতীয় অর্থব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে আমি বহু পূর্বেই

প্রত্যয়ে পৌঁছেছিলাম মাশুল সমীকরণ ও লাইসেন্স বিতরণের সমস্যা শুধু নয়, কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্র-অনুশাসিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানাদির বিনিয়োগ নিয়মনীতির উপরই শিল্পক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ মূলত নির্ভরশীল; কেন্দ্রীয় সরকারের, এবং সেই সঙ্গে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানাদির বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলেই বেসরকারি মালিকরা বিনিয়োগে মনঃসংযোগ করেন, অন্যথা নয় : রেল দফতর থেকে এঞ্জিন, ওয়াগন, কোচ, স্লিপার ইত্যাদি কেনবার বরাত দিলেই এ-ধরনের পণ্য-প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি তাদের বিনিয়োগ বাড়ায়; পূর্তমন্ত্রক থেকে রাস্তাঘাট-সেতু নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণের প্রস্তাব গ্রহণ করলেই সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি যন্ত্রপাতি-সিমেন্ট-রোড রোলার-পাথরকুচি-আলকাতরা তৈরি শুরু করে, তাদের উৎপাদনের বিস্তার ঘটে। সুতরাং অগ্রাধিকারের প্রশ্নে আমি নির্দ্বিধ, শিল্পপ্রসারের স্বার্থেও কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাস করে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দানের দাবির উপরই, আমার বিবেচনায়, শতকরা নব্বুই ভাগ দৃষ্টি নিয়োগ প্রয়োজন। জ্যোতিবাবু বরাবরই, আমার বিশ্বাস, অন্যরকম ভাবতেন। উনি এটা মানতেন, কেন্দ্রীয় সরকার বিমুখ থাকলে শিল্পোদ্যোগের সম্ভাবনা পরাহত। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এটাও বলতেন, আমাদের শত্রুর অভাব নেই, নানা দিক থেকে আক্রমণ আসছে, আসবে। বামপন্থী হলেও তো, কিংবা বামপন্থী বলেই তো, আমরা অকপট বাস্তববাদী : আমাদের সরকারকে ঘিরে, গোটা কলকাতা ও পশ্চিম বাংলা জুড়ে, বড়ো-মাঝারি-ছোটো পুঁজিপতি, তাঁরা দুষ্টুমি শুরু করলে অশেষ দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হবে আমাদের। বিশেষ করে কেন্দ্র যেহেতু মুখ ফিরিয়ে আছে, স্থানীয় শিল্পপতিদেরই বাবা-বাছা বলে বাড়তি শিল্পোদ্যোগের ব্যবস্থা করতে হবে, কোথাও-কোথাও সরকারি ও বেসরকারি মালিকানা যুক্ত করে মিশ্র চরিত্রের শিল্প-ব্যবস্থা প্রণয়নে উদ্যোগ নিতে হবে।

আমার মতামত ততদিনে জ্যোতিবাবু ভালোই জেনে গেছেন, আমাকে আদৌ আর ঘাঁটাতেন না। আঁচ করতে পারছিলাম তিনি কলকাতাস্থ শিল্পপতিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন, প্রায়ই এই চেম্বার অফ কমার্স, ওই চেম্বার অফ কমার্সে, আলোচনার জন্য যেতেন, ঘরোয়া কথাবার্তাও নিশ্চয়ই বলতেন নানা শিল্পপতিদের সঙ্গে। পঁচাশি সালের শেষের দিকে রাজ্যের জন্য অনেকটা উদার ধাঁচের সংশোধিত শিল্পনীতির কথা তিনি ঘোষণা করলেন। বেসরকারি মালিকদেরই হরেকরকম ভরসা-আশ্বাস দিয়ে বিনিয়োগের জন্য আহ্বান জানানো হলো, কোনও-কোনও ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশও মেনে নেওয়া হলো। জ্যোতিবাবুর যুক্তি অতিশয় প্রাঞ্জল, বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না : আমরা বলছি আমাদের এখানে বিদেশী পুঁজি ঢুকতে দেবো না, তাই ওরা অন্যত্র যাচ্ছে, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে, কর্ণাটকে, তামিলনাড়ুতে, অন্ধ্র প্রদেশে, পশ্চিম বাংলার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাচ্ছে না। পশ্চিম বাংলা কি তা হলে মরুভূমি হয়ে যাবে, অন্য রাজ্যগুলি বিনিয়োগের প্রাচুর্যে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আর্থিক সাফল্যের মগডালে চড়ে বসবে? তার চেয়ে এটা বলি না কেন, আমরা স্বদেশী-বিদেশী পুঁজিওলাদের সঙ্গে কথা বলবো, আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে সৌষাম্য বর্ধন করে, অভাব-অভিযোগের সমাধানে সাহায্য করে এমন ধরনের বিনিয়োগ ঘটাতে তাঁরা যদি সম্মত থাকেন, আমাদের তরফ থেকে সহযোগিতার অভাব ঘটবে না। শুধু দুটো শর্ত: এক, শ্রমজীবী শ্রেণীকে কোনও ছুতোতেই শিল্পপতিরা ঠকাতে পারবেন না; দুই, পণ্যবিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনও প্রক্রিয়াতেই ক্রেতাদের উপর অন্যায্য দামের বোঝা চাপানো চলবে না। কেন্দ্রে বামপন্থীরা যখন ক্ষমতা দখল করবে, তখন অবশ্যই শিল্পনীতির বৈপ্লবিক

পরিবর্তন ঘটবে, কিন্তু তা তো এই মুহূর্তে পরাহত, সংবিধানের বর্তমান চৌহদ্দির মধ্যে থেকে আপাতত অন্যরকম ভাবনা তাই একান্ত প্রয়োজন। পার্টির প্রচুর বিরূপ আলোচনা হলো, জ্যোতিবাবু অবিচল। দিল্লি থেকে কমরেড বি টি আর-কে তলব করে আনা হলো। সবাইকে নিয়ে পার্টিকে চলতে হয়; তা ছাড়া জ্যোতিবাবু যে-পদক্ষেপ নিতে চলেছেন, তার বিরুদ্ধাচরণ কারও-কারও কাছে অযৌক্তিক, অন্য কারও-কারও মতে আদৌ অযৌক্তিকও নয়। দলের রাজ্য সম্মেলনে রণদিভে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করলেন শিল্পক্ষেত্রে পার্টিকর্মীদের কী দায়িত্ব; তাঁর জোরালো সুপারিশে অন্তঃস্থিত দ্বিধাদ্বন্দ্ব মূক হয়ে এলো, পার্টির মধ্যে অসুখী প্রতিবাদের চোরাস্রোত যদিও বইতেই লাগলো।

এরকম সময়ে আমার শরীরে একটি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন দেখা দিল। স্বাস্থ্য দুর্বল, বহু বছর কোনও অবকাশের সুযোগ নেই; হঠাৎ নরওয়ে থেকে এক পুরনো বন্ধুর চিঠি : যদি রাজনীতির আবর্ত থেকে একমাস-দু'মাস একটু সরে থাকতে চাই, তাঁদের গবেষণাসংস্থায় স্বচ্ছন্দে চলে আসতে পারি; ওঁরা ঘরবাড়ির ব্যবস্থা করে দেবেন, সস্ত্রীক সম্মানিত অতিথি হয়ে থাকতে পারবো, যদিও বেতন-ভাতার কোনও প্রশ্ন নেই, বিমানযাত্রার্থ ভাড়ার ব্যবস্থাও আমাকেই করতে হবে।

জ্যোতিবাবু এ সব ব্যাপারে মস্ত উদার, সোৎসাহে অনুমতি দিলেন। পরক্ষণে আর এক কৌতুককাহিনী। তখন ইন্দিরা গান্ধির জ্যেষ্ঠ তনয় প্রধান মন্ত্রী, উত্তরাধিকার সূত্রে, এবং এই উত্তরাধিকারের দাবি ছাড়া তাঁর প্রধান মন্ত্রী হওয়ার মতো অন্য কোনও গুণাবলী নেই। সরকারি নিয়ম, কেন্দ্র ও রাজ্যের মন্ত্রীরা যদি বিদেশে বিহারে যেতে চান, স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর অনুমতি প্রয়োজন। আমার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, এহেন প্রায়-নিরক্ষর প্রধান মন্ত্রীর স্বাক্ষর সাপেক্ষে বিদেশ ভ্রমণ করবো না। জ্যোতিবাবুকে গিয়ে বললাম আমি দু'-মাসের জন্য পদত্যাগ করে যেতে চাই, ফিরে এসে ফের মন্ত্রী হবো। প্রত্যেকের প্রশ্ন ও কৌতূহল, কেন এমনটা করছি। কারণটা জ্যোতিবাবুকেও খোলসা করে বললাম না। তবে কলকাতার কিছু-কিছু মহলে গবেষণা শুরু হলো, দুই মাসে আমি কয় কাঁড়ি ডলার উপার্জন করতে যাচ্ছি, তা নিয়ে। জ্যোতিবাবুকে নিমন্ত্রণ পত্রটি দেখালাম, বেতন-ভাতা শূন্য। আমার বন্ধু টোলন অধিকারী তখন ইন্ডিয়ান স্টাস্টিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ, জানালো ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক পদ যদি ত্যাগ করি, তা হলে সে সঙ্গে-সঙ্গে আমার সামান্য জমা-হওয়া প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটুকু বের করে দিতে পারে, তাতে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর নরওয়ে যাওয়া-আসার খরচ প্রায় উঠে আসবে; সেরকম ব্যবস্থাই করা হলো।

মাস দুই বাদে ফিরে পুনরায় মহাকরণের জোয়ালে, বিদেশের শিথিল অলস দিনযাপনের পর আবার গরিব দেশের রূঢ় বাস্তবতা। অর্থ দফতরের উপর চাপ ক্রমশ বাড়ছে। নতুন দিল্লির সরকারের সঙ্গে বাদানুবাদ বহাল, রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক ওভারড্রাফট-এর ক্ষেত্রে টানাটানি, অথচ রাজ্য সরকারের এই দফতর-ওই দফতর থেকে আরও অর্থ বরাদ্দের আর্ত দাবি। মন্ত্রীদের দোষ দেওয়া যায় না, বামফ্রন্ট সরকার তো, সবাই ভেবে নিয়েছেন, কল্পতরুসদৃশ: লোকায়ত সরকার, জনগণের অভাব-অভিযোগ মেটানোর প্রয়াসই তো তার প্রধান দায়িত্ব। অথচ অর্থ দফতরকে হিশেব রাখতে হয়, বাজেটে বরাদ্দ টাকাপয়সার গণ্ডির মধ্যে প্রত্যেকটি বিভাগের খরচপাতি আবদ্ধ থাকছে কিনা দেখতে হয়। বিভাগীয় মন্ত্রীদের আয়-ব্যয় মেলানোর দায় নেই, সেই দায়িত্ব অর্থ বিভাগের, খরচের বহর নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে গেলে সংকট। যদি বাড়তি খরচপাতি প্রতি ক্ষেত্রে উন্নয়নের তাগিদে হতো,

দুশ্চিন্তা খানিকটা সামলানো যেত। কিন্তু দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা বিভিন্নভাবে প্রকট হচ্ছিল।

সাধারণ গোছের সমস্যা, অথচ সেই সমস্যাগুলিই পুঞ্জ-পুঞ্জ জড়ো হয়ে স্ফীতকায় দুঃস্বপ্নের রূপ নেয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যেমনটি আছে, তেমনটিই থাকবে কিনা, না এ বছর বাড়ানো হবে, বিদ্যালয় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা কি পুরুলিয়ার জন্য না কুচবিহারের জন্য; অথবা বিদ্যালয়ের সংখ্যা না বাড়িয়ে বিদ্যালয়ের জন্য গৃহ-নির্মাণ, চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চি-গোলক-মানচিত্র- পাঠাগারের উন্নতি ইত্যাদির দিকে অধিকতর নজরদান, নাকি শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের মাইনে-ভাতার আরও উন্নতিসাধন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বা মান যেখানে আছে সেখানেই কোনওক্রমে ধরে রাখার জন্য কেউ-কেউ হয়তো বলছেন, অন্য কেউ-কেউ বলছেন মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানোর কথা। যে-সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক, কোন জেলায় কী পরিমাণে বাড়ানো, কোন ধরনে বাড়ানো? হয়তো কোনও বিধায়ক বা সাংসদ এসে ধরে পড়লেন, তাঁর কেন্দ্রে একটি কলেজ খোলার অনুমতি না দিলেই নয়, স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে চাপ আসছে, তাঁদের নিরাশ করলে ব্যাপক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা। পাশাপাশি হয়তো অন্য এক দাবি সোচ্চার : শিক্ষাকে সার্বজনীন করার ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলা বেশ কয়েকটি রাজ্যের তুলনায় পিছিয়ে, তা নিয়ে ক্রমশই বিরুদ্ধপক্ষীয়রা জল ঘোলা করছেন, অর্থমন্ত্রীকে ব্যাপারটি তাই ভালো করে ভাবতে হবে। মাথাব্যথার অন্ত নেই, চার-পাঁচটি বিদ্যুৎপ্রকল্পের কাজ চলছে, কিন্তু চলতি বছর আরও একটির কাজ শুরু করলে ভালো হতো, সংক্রান্ত ফাইলটি অর্থবিভাগ যথাসত্বর বিবেচনা করে দেখবেন কি? আমরা তো লড়াই করে বাঁচতে চাই, কিন্তু সংগ্রাম করতে গেলে প্রতিটি মফস্বল শহরে একটি করে স্টেডিয়াম তৈরি না করলেই নয়, সেরকম স্টেডিয়াম, যা তরুণ যুবকদের লড়াই করতে বাড়তি উদ্বুদ্ধ করবে। জেলায়-জেলায় বইমেলা অথবা যুব উৎসবের ব্যবস্থাও তো করা দরকার। প্রতিটি জেলায় রাস্তাঘাট বেহাল, পূর্ত দফতরের অনুরোধ-উপরোধ, অর্থ দফতর থেকে বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা না করলে বলো মা তারা পূর্তমন্ত্রী দাঁড়ান কোথায়?

অনুরূপ সহস্র প্রশ্ন, যাদের উত্তর জোগানো অনেক সময়ই অর্থমন্ত্রীর সাধ্যের বাইরে, কারণ তাঁকে এক সঙ্গে দুশো-তিনশো গদা ঘোরাতে হচ্ছে। ব্যাংকগুলি রাজ্যে তাদের ঋণের পরিমাণ বাড়াবে না, রাজ্য সরকারকে নিজস্ব ব্যাংকও খোলবার অনুমতি দেওয়া হবে না, যদিও অন্য একটি রাজ্যের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে; এসব সমস্যা নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের সঙ্গে চিঠিচাপাটি। রাজ্য যোজনা পরিষদকে পরিকল্পনা বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য পরামর্শ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরকে ফোন করে উপরোধ জ্ঞাপন : এই সপ্তাহে রাজ্য সরকারের ওভারড্রাফটের মাত্রা সামান্য বাড়বার সম্ভাবনা, তিনি যেন একটু ক্ষমাঘেন্না করেন; এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পণ্য পরিবহনের উপর রাজ্যগুলির কর আরোপের সংবিধানগত অধিকার কেন্দ্রীয় সরকার মানতে চাইছেন না, অন্য রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের সঙ্গে মিলে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ; গোপন খবর এসেছে এক আন্তর্জাতিক সিগারেট বিক্রয় সংস্থা পণ্য প্রবেশ কর এড়ানোর জন্য অতি নিন্দনীয় উপায় গ্রহণ করেছে, পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাদের একটু শিক্ষা দান। উদাহরণ বাড়িয়ে যাওয়া যায়, তার বোধ হয় তেমন দরকার নেই। সবচেয়ে বেশি চাপ মাইনে-ভাতা বাড়াবার ব্যাপারে। সরকারি কর্মচারীদের, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের এবং সরকার থেকে বেতন বা ভাতা পেয়ে থাকেন এমন আরও নানা জনের দুরবস্থার দিক থেকে কংগ্রেস আমলে মুখ ঘুরিয়ে রাখা হতো, যারা

কমিউনিস্টদের ভোট দেয় তাদের প্রতি দয়াশীল হওয়ার কোনও মানে হয় না, এমনই ছিল মনোভাব। এখন বামফ্রন্ট সরকার, জনগণের সরকার, সেই ঐতিহাসিক অন্যায়ের নিরসন ঘটাতে হবে, সর্বস্তরে জনগণের জীবনযাপনের মান, উপার্জনের মান, বাড়াতেই হবে। সরকারে ঢুকেই বেতন কমিশন নিয়োগ করা হয়েছিল, তার বিভিন্ন সুপারিশ না মানলেই নয়। কিছু-কিছু সুপারিশের ক্ষেত্রে বহুবিধ অন্তর্গত অসামঞ্জস্য আছে, সেগুলি খতিয়ে দেখাও অর্থ বিভাগের দায়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করার মধ্যবর্তিতায় সামাজিক কল্যাণ সাধনের যে পুণ্য সুযোগ, বামফ্রন্ট সরকার তা না গ্রহণ করেই পারে না; অর্থ দপ্তরকেই এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে। এ সমস্তের বাইরেও, এঁর-ওঁর-তাঁর কাছ থেকে আর্থিক সুবিধাবর্ধনের জন্য সতত উচ্চগ্রামের দাবি। কিংবা হয়তো অন্যান্য মন্ত্রীরা এসে টেবিলে আছড়ে পড়ছেন, মশাই, ওই বিভাগের কর্মচারীদের আপনি গত মাসে এই-এই বিশেষ সুবিধা মঞ্জুর করেছেন, আমার বিভাগের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না কেন?

তেত্রিশ

অর্থ বিভাগের দায়িত্বে আছি, সরকারি কর্মচারী কিংবা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের এতদিন-ধরে-অস্বীকৃত ন্যায্য দাবিদাওয়া পরিপূরণের কর্তব্য-পালনে আমার আনন্দ ধরে না। কিন্তু, সাধ ও সাধ্যের অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্যতীতও, কোনও-কোনও ক্ষেত্রে বিবেকদংশনের প্রহার, কারণ আমি তো পরিকল্পনা বিভাগের দায়িত্বে, উন্নয়ন খাতেও ব্যয়ের মাত্রা না বাড়ালে চলবে কী করে। দ্বন্দ্বের যন্ত্রণার অতএব অহরহ পীড়ন। সাধারণভাবে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে, ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, একটি মৌখিক বোঝাপড়া ছিল, আমার কাছে যা অন্যায় বলে মনে হবে তেমন দাবি বা অনুরোধ আমি ফিরিয়ে দেবো, ফাইল্ তাঁর কাছে যথানিয়মে যাবে, তিনি রাজনৈতিক বিবেচনা প্রয়োগ করে যদি কোথাও দাবি মঞ্জুর করা সঙ্গত মনে করেন, কিংবা আংশিকভাবেও মেনে নেওয়া মনস্থ করেন, আমার দিক থেকে অসুবিধা হবে না। অথচ প্রায় নয় বছর অতিক্রমান্তে একটি ব্যাপারে মতভেদ প্রবল আকার ধারণ করলো। প্রায় দুই যুগ গড়িয়ে গেছে, আমি বহুদিন সরকারের বাইরে, জ্যোতিবাবুও চব্বিশ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী হিশেবে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনান্তে অবসর গ্রহণ করেছেন, এখন সমস্যাটি নিয়ে প্রকাশ্য মন্তব্যে মনে হয় আর বাধা নেই। কংগ্রেস আমলে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে নৈরাজ্য চলছিল, পাঠচর্চার ক্ষেত্রে নৈরাজ্য, পরীক্ষার ক্ষেত্রে নৈরাজ্য, প্রশাসনিক নৈরাজ্য। বামফ্রন্ট দায়িত্ব গ্রহণ করার পর এরকম অনেকগুলি কলেজের পুরনো পরিচালক সমিতি ভেঙে দিয়ে প্রশাসক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। সর্বক্ষেত্রে প্রশাসকদের শিক্ষাগত মান যে যথোপযুক্ত ছিল, তা নয়। তবে প্রশাসকরা পড়াশুনোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুক্ত নন, সুতরাং তাঁদের যোগ্যতা তেমন মাথাব্যথার কারণ হয়ে ওঠেনি। মুশকিল দেখা দিল যখন এই প্রশাসকদের মধ্য থেকেই কয়েকজনকে, বা তাঁদের সুপারিশে অন্য কাউকে, কলেজ অধ্যক্ষ হিশেবে মনোনীত করা শুরু হলো। অন্য একটি ব্যাপারও ঘটলো : প্রধানত বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, সরকারি-বেসরকারি কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতনক্রমের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। বিভিন্ন বেসরকারি কলেজে এমন সব অধ্যক্ষ বাছাই করা হয়েছে, যাঁদের বিদ্যাচর্চার পরিমাপ, শিক্ষাগত মান, শিক্ষক হিশেবে অভিজ্ঞতা, সব-কিছুই সরকারি কলেজে নিযুক্ত শিক্ষক-অধ্যক্ষদের তুলনায় অনেকাংশে নিষ্প্রভ। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার তো দানছত্র খুলে বসেছেন, শিক্ষক-অধ্যক্ষদের পুরোপুরি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অধিকার দিয়েছেন, অধ্যাপক-অধ্যক্ষরাও তো জনগণের অংশ। হঠাৎ আঠারো কি কুড়ি জনের এক অধ্যক্ষ সেল তৈরি হলো। আমাদের-দাবি-মানতে-হবে ধুয়ো তুলে তাঁরা আমার ঘরে হানা দিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর ঘরেও; দাবি অবিলম্বে মানা না হলে রাস্তায় নেমে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ভয় দেখালেন। সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ ও প্রবীণ অধ্যাপকদের বেতনক্রমে বরাবরই একটু অসামঞ্জস্য ছিল : অধ্যক্ষরা সামান্য বেশি মাইনে পেতেন, বরিষ্ঠ অধ্যাপকরা, তার কম : সুপণ্ডিত, শিক্ষক হিশেবে সুদক্ষ, এমন অনেক অধ্যাপক অধ্যক্ষ হতে চাইতেন না,

প্রশাসনিক ঝুটঝামেলার বাইরে থাকা পছন্দ করতেন। মনে-মনে ভেবে রেখেছিলাম, অধ্যক্ষের দায়িত্ব বহন করতে তাঁরা রাজি হোন না-হোন, এবংবিধ জ্ঞানী প্রবীণ অধ্যাপকদের বেতনক্রম অধ্যক্ষদের বেতনক্রমের সঙ্গে একীকরণ পবিত্র সামাজিক কর্তব্য। বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের কাছ থেকে চাপ আসে আসুক, সরকারি কলেজের প্রবীণ অধাপকদের বেতনক্রম বাড়ানোই আমার অগ্র দায়িত্ব, অপেক্ষারত বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের সমস্যা নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে।

অন্যমনস্ক মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী অর্থ বিভাগের সঙ্গে যথেষ্ট আলোচনা না-করে বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন, কোনও দিক থেকে রাজনৈতিক উপরোধ এসেছিল কিনা আমার জানা নেই। অপেক্ষাকৃত অযোগ্য মানুষদের অধ্যক্ষ করে দেওয়া হয়েছে, তাতে আমার হাত ছিল না, কিন্তু আমার বিবেচনায় উন্নততর বেতনক্রম পেতে তাঁদের সামান্য অপেক্ষা করতে হবে। আগের কাজ আগে; বরিষ্ঠ অধ্যাপকদের মাইনে-ভাতা বিষয়ে প্রথমে সিদ্ধান্ত নেবো, তারপর এই অধ্যক্ষদের ব্যাপারটি দেখবো; যেখানে তারকনাথ সেন-গোপীনাথ ভট্টাচার্য-সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত-সুশোভন সরকার-ভবতোষ দত্তের মতো অধ্যাপকরা বেতনের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষদের সমপর্যায়ভুক্ত হননি, সেখানে শিক্ষা, মেধা ও বিদ্যার নিরিখে বহুগুণ নিকৃষ্টদের প্রতি দায়বদ্ধতা পূর্বাহ্ণে পূরণ করতে হবে, এমন প্রস্তাবের শরিক হতে অসম্মত থাকবো, তা যত চাপই আসুক না কেন।

ইতিমধ্যে অন্যান্য ঘটনাবলী, পার্টির রাজ্য সম্মেলন, কয়েক সপ্তাহ বাদে কলকাতাতে পার্টির সর্বভারতীয় সম্মেলন। রাজ্য সম্মেলনে জ্যোতিবাবুর দো-আঁশলা শিল্পনীতির প্রস্তাব গৃহীত হলো। বি. টি. আর-এর আবেদন শোনবার পর স্বল্প এক-বাক্যের বক্তৃতায় তার সমর্থন জানাতে হলো আমাকে, তবে পার্টির নিচের তলায় প্রবল বিক্ষোভ, কমরেডরা এসে প্রতিদিন তাঁদের অসন্তোষ জানিয়ে যাচ্ছেন। সর্বভারতীয় কংগ্রেসে মূল অর্থনৈতিক প্রস্তাব পেশ করার সম্মান পার্টি থেকে আমাকে জ্ঞাপন করা হলো। তা হলেও আমি যন্ত্রণার তীব্রতায় দীর্ণ। কেন্দ্রের সঙ্গে কলহ নতুন মাত্রা নিচ্ছে, পরিকল্পনা খাতে আমাদের প্রাপ্য অর্থ আটকে দেওয়া হয়েছে, অর্থ দফতরের উপর দাবিদাওয়ার চাপ অথচ সমানে বাড়ছে। এই ডামাডোলের মধ্যে বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের বেতনক্রম আরও বাড়ানোর চাপ, যা আমার বিবেক কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়ে ফেলেছেন; তাঁর প্রতিশ্রুতির সম্মানার্থে অবশেষে অর্থ দপ্তরের তরফ থেকে প্রস্তাব রাখা হলো, বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের যোগ্যতা-ও অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বেতনক্রমের বিষয়টি আপাতত মুলতুবি রেখে, যাঁরা ইতিমধ্যে অধ্যক্ষ হিশেবে কাজ করছেন, তাঁদের ব্যক্তিগত সম্মান-দক্ষিণা দেওয়া হোক, যাতে তাঁরা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের সম-পরিমাণ দক্ষিণা পেতে শুরু করতে পারেন। সেই প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হলো।

আমার সঙ্গে মতানৈক্যের নিরসন ঘটাতে পার্টি থেকে এক সন্ধ্যায় বৈঠক ডাকা হলো, ওই সন্ধ্যায় ওই সময়ে আমি অন্যত্র যেতে বহুদিন থেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সুতরাং আমার অসুবিধা পার্টিকে জানালাম। পরদিন প্রভাতী সংবাদ, আমার বক্তব্য পাকাপাকি খারিজ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে তাঁর স্বাক্ষরসহ দুপুর নাগাদ বিজ্ঞপ্তি বেরোলো, সৌজন্যবশত আমাকে তার কপি পাঠানো হলো, মুখ্যমন্ত্রী নিজের অধিকার প্রয়োগ করে

বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের বেতনক্রম সরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের বেতনক্রমের সঙ্গে এক করে দিলেন।

সরকারি নিয়মে আছে, কোনও ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অর্থবিভাগের মতদ্বৈধতা দেখা দিলে, সংশ্লিষ্ট বিষয়টি মন্ত্রিসভার কাছে অন্তিম সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করতে হবে। কলহপ্রবণ হলে মুখ্যমন্ত্রীকে পাল্টা নোট পাঠাতাম, মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠক পর্যন্ত তাঁর সিদ্ধান্ত-সহ বিজ্ঞপ্তিটি ঝুলিয়ে রাখা হোক। তবে তা তো ছেলেমানুষি হতো। যেখানে বিবেকের দায়, আমি অন্য কারও সঙ্গে কোনওদিনই পরামর্শ করিনি, সেদিনও করলাম না, যা নিয়ে পরে অনেক অনুযোগ শুনতে হয়েছে, আমার দায়িত্বহীনতাবোধকে দুয়ো দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার দিক থেকে কোনও অনুশোচনা নেই।

স্বীকার করতেই হয়, অনেক দিন ধরেই মনে দ্বিধা-প্রশ্ন-সমস্যার সংকট জড়ো হচ্ছিল। আমরা তো বামপন্থী, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত দেখাবো সারা দেশকে, সেরকমই তো আমাদের অঙ্গীকার। দক্ষতার প্রশ্ন এড়িয়ে বশ্যতাকে বাড়তি প্রসাদ বিবরণ করলে সেই দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। প্রায় প্রতিদিন প্রতিটি ক্ষেত্রে অথচ অদ্ভুত-কিম্ভুত নানা দাবি-দাওয়ার পরাক্রম, যার ধাক্কা অর্থ দফতরেরই শুধু যেন সামলাবার দায়, যে-দায় মেটাতে গিয়ে রাজ্য সরকারের নাভিশ্বাস। কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াই করে রাজস্বসূত্র বাড়াতে হবে, কিন্তু সেই যুদ্ধে ফল পেতে সময় লাগবে, ইতিমধ্যে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া প্রধান কর্তব্য। বেতন-ভাতা তো দায় মেনে পর্যাপ্ত বাড়ানো হয়েছে, যেখানে-যেখানে প্রয়োজন আরো বাড়ানো হবে। কিন্তু স্রেফ কিছু পেটোয়া মানুষকে খুশি রাখতে গিয়ে যদি দেউলিয়া হতে হয়, তা হলে তো আখেরে দলের মুখেই চুন-কালি পড়বে। এটাও বিবেকের প্রশ্ন, নীতির প্রশ্ন। বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের জন্য দানছত্র খোলার ব্যাপারে আমার অনমনীয়তা উপলক্ষ্য মাত্র, আমি চাইছিলাম দলকে ঈষৎ ধাক্কা দিতে, এভাবে চলতে পারে না, এভাবে চললে পরিণামে সর্বনাশ হবে। বোঝাতে অসমর্থ হলাম।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের চিঠি পাঠালাম, বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে সেখান থেকে পদত্যাগের; যেহেতু দলের কানুন অনুযায়ী এ ধরনের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পার্টির পূর্বানুমতি প্রয়োজন, দলের রাজ্য সম্পাদককে অন্য দু'টি চিঠির অনুলিপির সঙ্গে পার্টি ছাড়বার কথা জানিয়ে চিঠি। ভাবলাম, পার্টি যখন ছেড়েই দিচ্ছি, মন্ত্রিসভা ও বিধানসভা থেকে পদত্যাগের জন্য আগে থেকে দলের অনুমতি নেওয়ার আর দরকার নেই। মনে ভয়ও ছিল, মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের অনুমতি চাইলে, কে জানে, হয়তো নামঞ্জুর হবে, সেই ঝুঁকি নিতে রাজি ছিলাম না। সামান্য একটু দুষ্টুমিও করলাম : পদত্যাগের খবরটি কলকাতাস্থ এক সংবাদপত্রের সম্পাদক, যিনি ব্যক্তিগত সুহৃদ, তাঁকে জানিয়ে দিলাম, একবার খবরটি বাইরে চাউর হয়ে গেলে ফিরে যাওয়ার জন্য আর পীড়াপিড়ি হবে না, এমন ভেবে। অবশ্য আরও দুটি কাগজও সেই রাত্তিরেই খবরটি পেয়ে গিয়েছিল, কোনও অজ্ঞাত সূত্র থেকে। পার্টিতে যে চিঠি দিলাম তাতে পদত্যাগের কারণ হিশেবে শারীরিক অসুস্থতার উল্লেখ ছিল। জ্যোতিবাবুকেও তাই-ই লিখলাম, তবে এটা যোগ করলাম যে তাঁর মতামতের সঙ্গে ক্রমশ দুস্তর ব্যবধান তৈরি হচ্ছে, আমার সরে পড়াই ভালো। উল্লেখ করতে ভুললাম না যে তাঁর কাছ থেকে যত বিবেচনা ও সহৃদয়তা লাভ করেছি, তা তুলনাহীন।

অসুস্থতার প্রসঙ্গটি ঠিক বাজে ওজর ছিল না। ক'মাস ধরেই আমার দু'পাটি মাড়িতে ফুসকুড়ির মতো দেখা দিচ্ছিল। দন্তচিকিৎসক গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবিত, অনেক বই

ঘেঁটে সন্দেহ প্রকাশ করলেন হয়তো বা কোনও জটিল ধরনের কর্কট রোগ। একটু-একটু করে ফুসকুড়িগুলি শরীরময় ছড়িয়ে যেতে লাগলো; কোনও-কোনওটি প্রায় পিংপং বলের মতো মস্ত আকারের, ফুলে ওঠে, মিলিয়ে যায়। রাইটার্স বিল্ডিং ছাড়বার পর এখানে-ওখানে বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে দেখালাম, তাঁরা নিশ্চিন্ত করলেন তেমন কিছু নয়। পরে কলকাতায় জনৈক চিকিৎসক পা মচকে যাওয়ার জন্য কী একটা সুঁচ ফোড়ালেন, তা থেকে, কী আশ্চর্য, ফুসকুড়িগুলি চিরতরে মিলিয়ে গেল। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই বলেছিলেন, কৌতুক করে কিনা জানি না, সমস্যাটির সূত্রপাত মানসিক পীড়নহেতু। রাইটার্স বিল্ডিং ছাড়লাম, মানসিক উদ্বেগের অবসান ঘটলো, ব্যাধিটিও বিদায় নিল।

ফের বলি, পেটোয়া অধ্যক্ষরা ধরে পড়েছেন, উপযুক্ত যোগ্যতা-গুণাবলী থাকুক না-থাকুক, তাঁদের দাবি পূরণ করতে হবে, এটা তো কোনও আলাদা সমস্যা নয়, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন, দক্ষতা বনাম বশ্যতার প্রচলিত দ্বন্দ্ব। কংগ্রেস আমলে কমিউনিস্টদের সরকারি কাজে ও অন্যত্র আদৌ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হতো না, তিরিশ বছর ধরে যোগ্য বামপন্থীরা ধারাবাহিকভাবে অন্যায়ের শিকার হয়ে এসেছেন, এখন আমরা ক্ষমতায় ঢুকেছি, অতীতে কৃত অন্যায় খানিকটা সংশোধন তো অবশ্যই করতে হবে, আমরা তো যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বদ্ধপরিকর। মুশকিল দেখা দেয় যখন চাপ সৃষ্টি হয় যাঁরা যোগ্যতাহীন, তাঁদেরও সুযোগ পাইয়ে দিতে হবে, যোগ্য ব্যক্তিরা যদি থাকেন কোনও পদের প্রার্থী রূপে, তা হলেও। কংগ্রেস আমলে যে-অবিচার হয়েছে তার জবাব হিশেবে আমাদের পাল্টা অবিচার করতে হবে, আমার কাছে এই প্রস্তাব কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হচ্ছিল না। অথচ রোগ ক্রমশ সংক্রামক। একটু-আগে-উল্লিখিত রাষ্ট্রমন্ত্রীটির শত অপরাধ যে-নিরিখে মাফ করা হচ্ছিল, সেই একই নিরিখে প্রচুর যোগ্যতাহীনকে এখানে-ওখানে ঢোকানোর উৎসাহে অন্ত নেই, শিক্ষায়, পরিবহনে, স্বাস্থ্য বিভাগে, সংস্কৃতি দপ্তরে, আরও নানা জায়গায়। সবচেয়ে অসুখী বোধ করছিলাম শিক্ষাক্ষেত্রে প্রায় পুকুরচুরির মতো ব্যাপার ঘটছিল বলে: শিক্ষক নিয়োগে প্রতিভাবান, মেধাবী, পরীক্ষায়-চমৎকার-ফল-দেখানো প্রার্থীদের দূরে সরিয়ে পার্টির-প্রতি-বিশ্বস্ত মানুষজনকে ঢুকিয়ে দেওয়া, নির্বাচকমণ্ডলীতে পছন্দমতো লোক মনোনয়ন করে তাঁদের দিয়ে পছন্দের প্রার্থী বাছাই। কখনও-কখনও নির্বাচকমণ্ডলীর রায় পছন্দ না-হলে নিয়োগের ব্যাপারটি মাসের পর মাস ঝুলিয়ে রাখা, পুরনো নির্বাচকমণ্ডলীর মেয়াদ শেষ হলে নতুন করে নির্বাচনবৃন্দ বাছাই, তাঁদের সাহায্যে পছন্দের মানুষকে এবার কাজ পাইয়ে দেওয়া। কংগ্রেস আমলে যে-জিনিশ আকছার হতো বলে আমাদেরও তা অনুসরণ করতে হবে, কিছুতেই মানতে পারছিলাম না। এই গোছের অপকর্মে যে পার্টির বা আন্দোলনের আখেরে কোনও লাভ হয় না, বরং ক্ষতি, সে বিষয়েও আমি নিশ্চিত ছিলাম।

বেশ কয়েক বছর বাদে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে দুপুরে বোলপুর থেকে কলকাতা ফিরছি। গুসকরা স্টেশনে বছর সতেরোর একটি অজাতশ্মশ্রু, নিরীহ চেহারার ছেলে পাশে এসে বসলো। গুসকরা কলেজে পড়ে, বর্ধমানে কোনও কাজে যাচ্ছে, না কি বর্ধমানে কলেজে পড়ে, কী একটি কারণে গুসকরা এসেছিল, এখন আর মনে আনতে পারি না। বাচ্চা ছেলে, একটু আলাপ করলাম। উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান অধ্যয়নরত, পদার্থবিজ্ঞানে বিশেষ আগ্রহ। ছেলেটি আমাকে চেনে না, নামও শোনেনি কোনওদিন। জিজ্ঞাসা করলাম, কলেজে কেমন পড়ানো হয় পদার্থবিজ্ঞান। ম্লান মুখে, পৃথিবীর সঞ্চিত বিষণ্ণতা নিয়ে সে জানালো, এতদিন অমুকদা পড়াতেন, ওঁর প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রি, বোঝান-ও চমৎকার, কিন্তু উনি তো পার্টির

সদস্য নন, পাকা চাকরি পাবেন না, পাকা কাজে যিনি আসছেন তাঁকেও তারা জানে—তমুকদা—কিছু পড়াতে পারেন না, ছাত্রও ভাল ছিলেন না। কাহিনীটি আমি জ্যোতিবাবুকে বলেছিলাম, উনিও শুনে আতঙ্কিত। তবে ততদিনে ঘুণ অনেকদূর ছড়িয়ে গেছে। নেতারা তো বহুদিন ধরে বলে আসছিলেন, পার্টিতে প্রচুর বাজে লোক ঢুকেছে, অবিলম্বে তাড়াতে হবে, কিন্তু, বছরের পর বছর গড়ায়, যে কে সেই। শিক্ষাক্ষেত্রে যেমনধারা নব ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়ে গেছে, প্রায় অন্য সর্বত্রও তাই : যারা বিশ্বস্ত, পেটোয়া, তাদের বাছতে হবে, যাচ্ছেতাই বা অপদার্থ হলেও যায় আসে না। কে আর ভাববেন কোনও একটি শিক্ষক পদে ভুল নির্বাচন হলে পুরো বিভাগটি বা বিদ্যালয়টি ধ্বসে পড়ার আশঙ্কা; অপকৃষ্টরা অপকৃষ্টদেরই হাতছানি দেয়, উৎকৃষ্টরা টিকতে পারে না সেই পরিবেশে। গত কুড়ি বছরের ইতিহাস থেকে এন্তার উদাহরণ দেওয়া সম্ভব।

অস্বস্তিবোধের গভীরতর কারণও ছিল—এবং আছে। আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে উজ্জ্বল ঝকঝকে মেধাসম্পন্ন অধ্যাপকেরা প্রায় সকলেই কমিউনিস্ট পার্টির কাছাকাছি ছিলেন, তাঁদের আদর্শের প্রেরণাতেই বামপন্থী ছাত্র আন্দোলন সেই পর্বে এত জোর ধরেছিল। তুলনায় হালের ছাত্র-যুব আন্দোলনে বামপন্থী ঝোঁক অনেকটাই স্তিমিত। মানছি, এই অবক্ষয়ের বিবিধ অন্য কারণ আছে, তা হলেও বলবো, মাস্টারমশাইরা ভোঁতা হলে ছাত্র-ছাত্রীরাও খানিকটা ভোঁতা না হয়ে পারে না। কলেজে-কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন নির্বাচনে জয়যুক্ত হচ্ছে তা কিছু প্রমাণ করে না; ছাত্র আন্দোলন এখন বহুলাংশে উজ্জ্বলতারহিত। দক্ষতা বনাম বশ্যতার টানাপোড়েনে বশ্যতা ক্রমশ জয়ী হয়েছে, দক্ষতা পিছু হটেছে।

আদর্শের শুদ্ধতা যে-রক্ষা পেয়েছে তা-ও নয়। অনেক ক্ষেত্রেই নীতির অবৈকল্যের সঙ্গে বশ্যতার আদা-কাঁচকলা সম্পর্ক। যদি খোশামুদি করলে ক্ষমতার কাছাকাছি পৌঁছুনো যায় এই ডামাডোলের বাজারে, সুযোগসন্ধানীদের সক্রিয় হয়ে উঠতে বাধা নেই। কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে যাঁরা ঘোর বামবিরোধী ছিলেন, তাঁদের অনেককেই এখন দেখি ঘোর মার্কসবাদী বনে গেছেন। বোঝানো হয়, তাঁদের 'হৃদয় পরিবর্তন' হয়েছে; সরলতর ব্যাখ্যা, তাঁরা সরেস খোশামোদচূড়ামণি তথা সুবিধাবাদবিশারদ।

আসলে জমিদারি মানসিকতার সঙ্গে খোশামোদ সংস্কৃতির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। একটি কাহিনী বিবৃত করি। সরকার-ঘেঁষা এক কলেজ শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের জনৈক চাঁই, মস্ত ক্ষমতাবান, অহমিকায় মাটিতে পা পড়ে না। কোনো সন্ধ্যায় বই মেলায় গেছি, চোখে পড়লো ভদ্রলোকটিও গেছেন, স্টলে-স্টলে বিহার করে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের বিপণিতে এঁর পদধূলি পড়েছে, প্রকাশক-পুস্তকবিক্রেতার কৃতার্থ তথা সন্ত্রস্ত: ইনি প্রভাব খাটিয়ে সরকার থেকে বই কেনার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, সুতরাং এঁকে উপচার সাজিয়ে দিতে হয়। বিভিন্ন স্টলে ইনি বুড়ি ছুঁয়ে যাচ্ছেন, ঢুকছেন, বেরোচ্ছেন। প্রতিটি স্টলে ভদ্রলোককে ডাঁই-করা বই উপহার দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু মাননীয় ইনি তো নিজে বয়ে বেড়াবেন না; সঙ্গে এক অনুচর, অল্পবয়সী কোনও শিক্ষক, হাতে বিরাট ঝোলা, মহৎ ব্যক্তির হাত থেকে সসম্ভ্রমে উপহার-পাওয়া বইগুলি নিয়ে ঝোলাতে পুরছেন। পঞ্চাশের দশকে ব্যাংককে যে চমৎকার মজার দৃশ্য দেখেছিলাম, মনে পড়ে গেল। থাইল্যান্ড গোঁড়া বৌদ্ধ দেশ, মস্ত বড়োলোকের বাড়ির ছেলেদেরও অন্তত একবার গেরুয়া বসন ধারণ করে রাস্তায় নেমে পদব্রজে ভিক্ষা করতে হয়; তবে এই অভিজাত ভিক্ষুদের সঙ্গে ভৃত্যদল থাকে, ভিক্ষালব্ধ অন্ন তারা

ঝোলাতে বয়ে নেয়।

সর্বক্ষেত্রে এবংবিধ ব্যাপার ঘটতে থাকলে সামগ্রিক প্রশাসনেও তার অপছায়া দীর্ঘতর হয়। আশা পোষণ করেছিলাম, আমার পদত্যাগ নিয়ে পার্টিতে কিছু আলোচনা-বিতর্ক হবে : অন্তত কেউ-কেউ প্রশ্ন তুলবেন, বা আমার ক্ষোভের কারণ জানতে চাইবেন। সেরকম কিছুই হলো না। অনেকে আমাকে তখন জানিয়েছিলেন, দল থেকে পদত্যাগ করেই মারাত্মক ভুল করেছি; যদি দলে থেকে লড়াইটা চালিয়ে যেতাম, খানিক শুভফল প্রত্যাশা করা যেত। সেরকম আচরণ আমার রুচিতে বাধছিল। দলে থেকে ঝগড়াঝাঁটি করতে গেলে দলাদলি না করে গত্যন্তর থাকতো না, এবং দলাদলি অবধারিতভাবে খানিকটা গোপনীয়তার আকার নিত, যা পার্টির নিয়মবহির্ভূত। পদত্যাগের কয়েক মাস পর হাসপাতালে একদিন অসুস্থ কৃষ্ণপদ ঘোষকে দেখতে গিয়েছিলাম। তিনিও ততদিনে মন্ত্রী নেই, মনে হলো মানসিক অবসাদে ভুগছেন। প্রশ্ন করলেন, পার্টি কেন ছেড়ে দিলাম; অকপটে বললাম ঘোট পাকানো অপছন্দ করি বলে। তখন এ-ও মনে হয়েছিল, যদি প্রমোদবাবু থাকতেন, তা হলে তাঁকে সব খুলে বললে বোধ হয় একটি সুরাহা করতেন, জ্যোতিবাবুকে যা বলা যায় না তাঁকে বলা যেত, হয়তো আমাকে ছেড়ে আসতে হতো না।

যেদিন রাইটার্স বিল্ডিং ছাড়লাম, সেদিন সন্ধ্যাবেলা পার্টির নেতৃস্থানীয় দু'জন বাড়িতে দেখা করতে এলেন, সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানালেন, সবিনয়ে নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে ক্ষমা চাইলাম। এটাও যোগ করলাম, অবস্থার গতিকে যদিও পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি, দলের প্রতি কখনও নেমকহারামি করবো না, আমার মুখ থেকে কেউই পার্টি সম্বন্ধে একটি অপ্রিয় বাক্যও বের করতে পারবে না। আমার বিশ্বাস, সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি। এখন যা লিখছি, তা পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে বলে, এবং ঘটেছে বলেই, আমার ধারণা, উপরের বক্তব্যগুলি এখন আর পার্টির বিরক্তি উৎপাদন করবে না। ষোলো-সতেরো বছর আগে দক্ষ, স্বচ্ছ প্রশাসনের স্বার্থে যা-যা বলতে শুরু করেছিলাম, এখন তো মোটামুটি সবাই-ই পার্টির মধ্যেও সে সব কথাবার্তা বলছেন।

তবু খানিকটা তিক্ততার রেশ। আমার পদত্যাগের দু' সপ্তাহের মধ্যে সম্মানীয় বন্ধু অরুণ ঘোষকে রাজ্য যোজনা বোর্ডের সহ-সভাপতির পদ থেকে সরে যেতে হলো; পার্টির পেয়ারের একজন-দু'জন তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ শুরু করলেন যে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। আরও ব্যথিত হলাম যখন দলের তরফ থেকে সাংবাদিকদের বলা হলো, উনি তো যাবেনই, উনি 'অশোক মিত্রের লোক'। সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার এর চেয়ে যথাযথ উদাহরণ কিছু হতে পারে না। জমিদারপ্রতিমরা ভাবতেই পারেন না দুই ব্যক্তির, যে-কোনও দুই ব্যক্তির, পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে মূলে প্রোথিত বলেই এখন বামপন্থী মন্ত্রীদের মুখেও অহরহ শুনতে পাই, 'আমার সরকার', 'আমার দপ্তর', 'আমার পুলিশ', 'আমার অফিসার'।

ধরে নিচ্ছি অরুণ ঘোষ সম্পর্কে পার্টির বীতরাগ দূর হয়েছে। একবিংশ শতকের গোড়ায় তাঁর প্রয়াণের পর দল থেকে স্মরণ সভা ও স্মারক বক্তৃতার ব্যবস্থা চমকিত করেছিল, যদিও ঘুরে-ফিরে বার-বার জীবনানন্দের পংক্তিটিও মনে আসছিল: 'মানুষটা মরে গেলে যদি তাকে ওষুধের শিশি / কেউ দেয়, বিনি দামে, তাতে কার লাভ'।

চৌতিরিশ

ছিয়াশি সালের জানুয়ারিতে ফেরা যাক। মুক্ত পুরুষ, কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে শারীরিক অসুস্থতা থেকেও রেহাই পেলাম। আগের বছর ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপনার পদ ছেড়ে দিয়েছি, এই বুড়ো বয়সে আর কে কাজ দেবে! আমার সম্বন্ধে পাড়ায়-পাড়ায় কিছু আতঙ্কও তো সৃষ্টি হয়েছে : এঁকে সহযোগী করলে সংসর্গদোষের ঠেলায় পড়তে হতে পারে। অন্য দিকে ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলির বন্ধুরা উল্লসিত, কলকাতা ডায়েরি ফের শুরু করবো বলে। অতি স্নেহাস্পদ এক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক এসে ধরে পড়লেন, তাঁর কাগজে আগেও লিখেছি, এখন যদি ফের একটি পাক্ষিক কোলাম লিখতে রাজি হই। রাজি হলাম, কিন্তু জানালাম, শুধু ওঁর জন্য নয়, কোলামটি দেশের অন্যান্য কিছু পত্রিকায় ব্যবহৃত হলে ভালো হয়, অনেক বেশি মানুষ তা হলে পড়বার সুযোগ পাবেন। সেরকমই ব্যবস্থা হলো। এখানে-ওখানে ছুটকো-ছাটকা লেখার ব্যাপার তো ছিলই। মন্ত্রী থাকাকালীন প্রায় ন'বছর আমার স্ত্রী কীভাবে পুরনো সঞ্চয় ভেঙে সংসার চালিয়েছেন তার খোঁজ রাখবার মতো দায়িত্বশীলতা আমার এতদিন ছিল না, কিন্তু এখন থেকে ন্যূনতম সংস্থানের কথা ভাবতেই হলো। তিরুবনন্তপুরমের সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের অধ্যক্ষ, অনুজপ্রতিম বন্ধু কৃষ্ণন, ওখানে একটি গবেষণার কাজে আহ্বান জানালেন, কলকাতা থেকেই গবেষণা করতে পারবো। জীবিকার সমস্যা অনেকটাই মিটলো।

বন্ধুবান্ধবদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁরাই তো বরাবর আমার জীবনযাপনের অন্যতম প্রধান অবলম্বন তথা হেতু। আলিপুরের ফ্ল্যাটে রবিবারের সাপ্তাহিক আড্ডা বহাল রইলো, যদিও জনসংখ্যা কমের দিকে। যাঁরা কিঞ্চিৎ সুবিধা অন্বেষণের আকাশকুসুম তাগিদে নিয়মিত আসতেন, তাঁরা আস্তে-আস্তে ঝরে পড়লেন, তবে অপেক্ষাকৃত দুর্দিনে প্রকৃত বন্ধুদের হদিশ পেতে তেমন দেরি হয় না। কিরণময় রাহা-রবি সেনগুপ্তরা তো ছিলেনই, নির্মল ও রুমাও যথাসম্ভব সঙ্গ দান করতে শুরু করলো, যেমন করলো একই-দালানে-থাকা রঞ্জিত সাউ ও তাঁর স্ত্রী মীরা। মানব, মালিনী-মিহির, অমিয় ও যশোধরা, এদেরই বা ভুলি কী করে! সুজিত আসা-যাওয়া অব্যাহত রাখলো; কলকাতাস্থ অনেক পার্টি সুহৃদও, সত্যব্রত সেন যাঁদের পুরোধা, প্রত্যক্ষ হাজির হয়ে, বা টেলিফোনের মারফত, যোগাযোগ জারি রাখলেন। নেতারা যখন দেখলেন, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি, রাগান্বিত বেফাঁস কথাবার্তা প্রকাশ্যে কোথাও বলিনি, তাঁরাও ধাতস্থ হলেন। অবশ্য পার্টি দফতরে যিনি অন্তরঙ্গতম ছিলেন, সুবোধ রায়, কোনওদিনই কারও পরোয়া করেন না, মান-অভিমানের ঋতুতেও তিনি দেখা করতে আসতেন। আশ্চর্য মানুষ সুবোধবাবু, চট্টগ্রাম বিদ্রোহে গভীরভাবে লিপ্ত ছিলেন, সতেরো বছর বয়সে আন্দামানে নির্বাসন, ওখানেই মার্কসবাদে দীক্ষা। পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। তাঁর কর্তব্যপালনে কোনও ফাঁকিঝুঁকি নেই, নিবিড় অধ্যবসায়ের সঙ্গে পার্টির পুরনো দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদনা

করে প্রকাশ করেছেন, রাজ্য দপ্তরের অজস্র ঝামেলা সামলান। আদর্শে অবিচল, এখনও নিজের হাতে রান্না করেন, কাপড় কাচেন, কোনও ব্যাপারেই কারও মুখাপেক্ষী নন। স্পষ্টবাদিতায় সুবোধবাবুর জুড়ি নেই, দলের ভালো-মন্দ নিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলে সর্বদা চরিতার্থতাবোধ। অনেক সময় এমন হয়েছে প্রমোদ দাশগুপ্তর সঙ্গে কথা শেষ করে উঠে পড়ে তাঁকে বলতাম, 'এবার একটু লিডার অফ দ্য অপজিশনের ঘরে যাচ্ছি'। প্রমোদবাবু হকচকিয়ে গেলে পাশ থেকে সরোজ মুখোপাধ্যায় ব্যাখ্যা করে দিতেন, 'বুঝলেন না, সুবোধের কাছে যাচ্ছে'। কল্পনা দত্তের মাসতুতো ভাই সুবোধবাবু, কল্পনাদিকে পার্টিতে নিয়েও এসেছিলেন তিনিই, দল ভাগাভাগি হওয়ার পর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যথেষ্ট আড়াআড়ি ছিল, অথচ, সাংসারিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়েও, সুবোধবাবু আত্মীয়তার কতগুলি দায় বরাবর পালন করে গেছেন।

দলের নৈকট্যে এসে এত বিচিত্রস্বভাবের নিখাদ ভালোমানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, ভেবে মাঝে-মাঝে অবাক হই। সুরুল জমিদার বাড়ির সন্তান, সর্বস্বত্যাগী শ্রমিক নেতা, কমল সরকার, অসামান্য চরিত্রবল ও আদর্শনিষ্ঠা। হাওড়ার জয়কেশ মুখোপাধ্যায় ও পতিতপাবন পাঠক; হুগলির প্রবাদপ্রতিম সংগঠক বিজয় মোদক; বীরভূম জেলা কমিটির বহুদিনের সম্পাদক, একটু খেয়ালি, কিন্তু পার্টির আদর্শে তদগত-প্রাণ, সুরেন বাড়ুজ্যে; মেদিনীপুর জেলায় পার্টি ভাগ হওয়ার পর দলকে যিনি তিলেতিলে গড়েছেন, মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার মামলায় যাঁর দ্বীপান্তর হয়েছিল, সুকুমার সেনগুপ্ত, দেখলে মনে হতো এমন দয়ালু মানুষ ঠিক যেন এই পৃথিবীর নন। আবদুল্লা রসুল কিংবা মটরদা, সৈয়দ শহীদুল্লা, দু'জনেই অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞায় নন্দিত মানুষ, বিরল বিনয়ে ভরপুর, সেই সঙ্গে সমান স্নেহশীল। অন্য মটরদা, নদীয়ার সমরেন্দ্রনাথ সান্যাল : তাঁর কাছ থেকেও তো কম স্নেহ ও প্রশ্রয় পাইনি। এঁরা সবাই এখন প্রয়াত।

এখানেই মুশকিল, কাকে ছেড়ে কার নাম করবো? তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেতা গুণধর মাইতি, আদর্শের ব্রত উদ্‌যাপনে তুলনা নেই, কিন্তু নম্র, নিঃশব্দ, এখনও তাই। প্রয়াত কৃষকনেতা হেমন্তকুমার রায়, গরিবদের অভয় জোটাতে, জোট বাঁধা শেখাতে নিজেকে যিনি, সচ্ছল জীবনের মায়া কাটিয়ে, পুরোপুরি বিলিয়ে দিলেন। পলাশ প্রামাণিকও এখন গত : জঙ্গি কৃষক নেতা বলে বাইরে পরিচিতি, কিন্তু দর্শন ও সাহিত্যে তাঁর আগ্রহ ও অন্তর্দৃষ্টি অবাক করে দিত। অহরহ মনে পড়ে শ্রীহট্টের একদা লোকসংগীত-রচয়িতা-হিশেবে-বিখ্যাত সুরথ পাল চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী অপর্ণাদির কথা, যাঁরা নীরব সংকেতে বুঝিয়ে গেছেন, পার্টিকে শুধু দিতে হয়, পার্টি থেকে কিছু প্রাপ্তির কথা দুর্বলতম মুহূর্তেও ভাবতে নেই। সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি পোড়-খাওয়া প্রাক্তন বিপ্লবী, উদ্বাস্তু আন্দোলনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা, তখনই আশি বছর বয়স পেরোনো প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীকে। ছোটোখাটো মানুষ শান্তি ঘটক, বহু বছর রোগক্লিষ্ট, অতি সম্প্রতি প্রয়াত, এই মানুষটি বরানগর-বেলঘরিয়া-কামারহাটি অঞ্চলে অতীতে প্রাণপাত করে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন ও সেই সঙ্গে পার্টি সংগঠন মজবুত থেকে মজবুততর করেছেন।

হঠাৎ খেয়াল হলো, এতটা লিখেছি, কিন্তু গণেশদার কথা ভুলেই থেকেছি। নব্বুই-উত্তীর্ণ গণেশ ঘোষকে দেখলে বিশ্বাস করতে মুশকিল হতো এই মানুষটিই আমাদের শৈশবের-কৈশোরের প্রেরণা পুরুষ, সূর্য সেনের সহযোদ্ধা, দলের অকুতোভয় সৈনিক, এক সময়ে পার্টি কমরেডদের গেরিলা যুদ্ধে তালিম দিয়েছিলেন। দয়াতে-সৌজন্যে সদা আপ্লুত থাকা

গণেশদার হৃদয়, পাত্র-অপাত্র বিচার নেই, অবিশ্রান্ত এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে পরোপকার সাধছেন। অবিশ্বাস্য তাঁর নম্রতাবোধ; সাম্যবাদী অঙ্গীকার, ছোটো-বড়ো সবাইকে সন্নত নমস্কার জানাচ্ছেন, বিনয়ে নুয়ে পড়ে। সত্যব্রত সেনের মুখে গণেশদার বিশ্রুত বিনয়ের একটি দুষ্টু গল্প শুনেছিলাম। গণেশদা কোনো উদ্বাস্তু পাড়ায় গেছেন, পুকুর পাড়ে কাঁখে-শিশু এক কিশোরীর সঙ্গে দেখা। গণেশদার সম্ভাষণ, 'এই যে দিদি, নমস্কার হই, ভালো আছেন তো?' কিশোরীর লজ্জায় কুঁকড়ে যাওয়া : 'এ কী, আমাকে আপনি বলছেন কেন গণেশদা, আমার বয়েস তো সবে ষোলো'; গণেশদার নিরুদ্বিগ্ন, সহর্ষ উত্তর : 'তাতে কী, তাতে কী? তা কোলের সুন্দর শিশুটি আপনার সন্তান বুঝি?' কিশোরীর প্রায়-আর্তনাদ উক্তি : 'কী যে বলেন গণেশদা, আমার তো বিয়েই হয়নি'। গণেশদার তরফ থেকে নিশ্চিন্ত উক্তি : 'তাতে কী, তাতে কী।'

অগুন্তি মহিলা কমরেডদের কাছ থেকে প্রচুর স্নেহ লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার; অনিলা দেবী, কনক মুখোপাধ্যায়, পঙ্কজ আচার্য, মঞ্জু গুপ্ত, বয়সে আমার বড়ো, দয়াবতী তাঁরা, সমকক্ষের সম্মান জানিয়েছেন। প্রিয়জনদের গরম দুধ খাওয়াবার জন্য, আমার সন্দেহ, পার্টির মহিলাদের মধ্যে একটি স্বাভাবিক ব্যাকুলতা আছে। ভরদুপুরে মেমারিতে বিনয় কোঙারের বাড়ি গিয়েছি, ওঁকে নিয়ে কলকাতায় ফিরবো, রানীদি, মহারানী কোঙার, চোখ রাঙিয়ে বকুনি দিয়ে আম-সহযোগে গরম দুধ গলাধঃকরণে বাধ্য করলেন। অন্য একটি ঘটনা : অধিক রাত্রিতে মেদিনীপুর থেকে ফিরছি, বাগনানের কাছে অন্ধকারে-দাঁড়িয়ে-থাকা একটি ট্রাকের সঙ্গে গাড়ি ধাক্কা খেল, আমার বা চালকের তেমন লাগেনি, কিন্তু লোক জমে গেল, খবর পেয়ে বাগনান থেকে নিরুপমা চট্টোপাধ্যায় ছুটে এসে গ্রেপ্তার করে পার্টি দফতরে নিয়ে গেলেন, চিকিৎসক ডাকলেন, তারপর, কী সর্বনাশ, ফের গরম দুধ, ঢক ঢক করে গিলতে হলো। এসব মুহূর্তে আরও বেশি করে বোঝা যায় কমিউনিস্ট পার্টি মিলিত সংসার, সুগম্ভীর কবিতার মধ্য দিয়ে ছেলেবেলায় যে-নীতিশিক্ষা হয়েছিল, তারই প্রতিধ্বনি : সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

আরও একজনের কথা বলি। সাতষট্টি সালে বিধানসভার দর্শক গ্যালারি থেকে নন্দরানী দলকে প্রথম দেখি : বিধানসভায় সদ্য নির্বাচিত, প্রায়-কিশোরী, চঞ্চলা হরিণীর মতো সভার মধ্যে, ছটফট, ছুটোছুটি করছেন। যতবার মেদিনীপুর গেছি, ওঁর আদর্শে-আচরণে মুগ্ধ হয়েছি। এখন নন্দরানী পূর্ণ মন্ত্রী, তার উপর আস্ত দিদিমাও।

নিকটজন বিয়োগের মরশুমও ছিল এই বছরগুলি। পঁচাশি সালে পরিমল মিত্রের মৃত্যু, আরও এক মস্ত ভরসাস্থলের ভূতপূর্ব হয়ে যাওয়া। ওই বছরই পারিবারিক জীবনে প্রচণ্ড ধাক্কা, দেবু চৌধুরী চলে গেলেন। অনেকদিন থেকেই অসুস্থ ছিলেন, শেষ যেদিন নার্সিং হোমে দেখা করতে গিয়েছিলাম, দেখে খুশি হলেন, তবে এটাও বুঝলাম এক অদ্ভুত নিরাসক্তিতে তাঁর চেতনা সমাচ্ছন্ন, যেন বুঝতে পারছেন বিদায়ের ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। কিংবা হয়তো উনি বুঝতে পারছিলেন না, আমিই ওরকম ধারণার ঘেরাটোপে বন্দী, বিষাদে সমস্ত অন্তঃকরণ ছেয়ে এলো। অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে আমার বিশ্বাস নেই, তবু কী করে যেন অনেকেরই মুখোমুখি হয়ে হঠাৎ মৃত্যুর যবনিকা চোখের সামনে ভাসতে দেখেছি; যাঁদের ক্ষেত্রে দেখেছি, তাঁরা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই গত হয়েছেন।

তেষট্টি সালে কলকাতায় স্থিত হওয়ার সময় থেকেই দেবুদার সংসারের সঙ্গে আমরা জড়ানো। দেবুদা সমর সেনের বন্ধু, একই সান্ধ্য আড্ডা, তাই অহরহ দেখা না হয়ে উপায়

ছিল না, তা ছাড়া শচীনদার অনুজ, অচ্ছেদ্য যোগসূত্র। হেনাদি একটু একগুঁয়ে, কিন্তু আন্তরিকতায় ভরপুর। দেবুদাদের জ্যেষ্ঠ দুই পুত্র, খোকন, অরূপ, ও ছোট্টু, স্বরূপ, আমার অনুরক্ত, চার্চিল চেম্বার্সে থেকে মুম্বইতে ওরা যখন স্কুলে পড়তো, তখন থেকে। ওদের বোন, লালি, বালিকাবয়সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতো না আমরা স্বেচ্ছায় মার্কিন দেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছি; দু' চোখ গোল করে তার বিস্ময়সূচক উক্তি এখনও কানে বাজে, 'মেরিকা, ইটস্ ডিভাইন।' সত্যজিৎ রায় তাঁর 'নায়ক' ছবিতে লালিকে একটু ক্ষণের জন্য ব্যবহার করেছিলেন : বাংকের উপর থেকে বাচ্চা মেয়ে চোখ গোল করে মুগ্ধ আবেশে নিচের আসনে উপবিষ্ট নায়ক উত্তমকুমারকে দেখছে, সেই বালিকা লালি। পরে কিছুদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে পড়তে গিয়েছিল, সেখানে অশোক রুদ্রের পাল্লায় পড়ে ঘোর নকশালপন্থী বনে যায়। তবে ফাগুনের ফুল যায় ঝরিয়া ফাগুনের অবসানে, যথা-নিয়মে লালি নিজের শ্রেণীআনুগত্যে ফেরে।

খোকন-ছোট্টু কলকাতায় আমাদের ছায়াসহচর হয়ে ছিল। যে কোনও সমস্যায় ওদের তলব করতাম, দ্রুত মুশকিল আসান হয়ে যেত। চৌধুরীরা অসম্ভব উদারমনা, সেই সঙ্গে অসম্ভব খেয়ালিও। পরিবারের দোষগুণগুলি দুই ভাইয়ে পুরোপুরি বর্তেছিল, তবে ভাইদের মধ্যে স্বভাবগত তফাতও। খোকন সতত বহির্মুখী, হইহুল্লোড়ে পাড়া মাতাতে ওস্তাদ, ছোট্টু—সে ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টে আমার ছাত্রও ছিল— তুলনায় চাপা। বাবার ব্যবসা বাড়ানোর দিকে দু'জনেরই টগবগে উৎসাহ : খোকন ঝুঁকি নিতে বেপরোয়া, ছোট্টু খানিকটা হিশেবি। বাবার মৃত্যুর পর ব্যবসা ওরা ভাগাভাগি করে নেয়, তা হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। অসতর্ক বিনিয়োগ করে দু'জনকেই প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মস্ত পরিতাপের কথা, উভয়ের সাংসারিক জীবনও তেমন সুখের হয়নি। হয়তো ব্যবসায়িক বিপর্যয়হেতুই খোকনের হৃদ্‌যন্ত্রে ব্যাপক গোলমাল দেখা দেয়, ওকে পরিপূর্ণ বিশ্রামের মধ্যে থাকতে হয় মাসের পর মাস। একটু-একটু করে সুস্থ হচ্ছিল, কিন্তু কিছু সময়ের ব্যবধানে ফের পীড়াক্রান্ত, কয়েক মাস বাদে মৃত্যু। খোকনের গত হওয়ার কয়েক মাস আগে ছোট্টুও নিষ্ক্রান্ত: রহস্যজনক মৃত্যু, আমাদের সন্দেহ, অপঘাতজনিত। অনেকদিন ধরে আশা পোষণ করে আসছিলাম নিঃসন্তান আমরা, শেষ জীবনে যখন অসমর্থ হয়ে পড়বো, ভয় কী, খোকন-ছোট্টু ভ্রাতৃদ্বয় যথাযথ দেখাশোনা করবে। সেই আশা অচিরে মিলিয়ে গেল।

যেন মৃত্যুর মিছিল। পরম শুভানুধ্যায়ী স্নেহাংশুকান্ত আচার্যও চলে গেলেন ছিয়াশি সালের অগস্ট মাসে। দিল্লিতে বহুদিনের নিকট বান্ধবী রাজ থাপরের জীবনাবসান সাতাশি সালের এপ্রিলে, আমার জন্মদিনে। স্বামী রমেশ চিরদিনই একান্ত রাজ-নির্ভর; তার মানসিক শক্তি ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ। অগস্টের বাইশ তারিখে আমাকে লেখা রমেশের চিঠি, 'উইদাউট হার, আই মিয়ারলি প্লড অন।' পঁচিশ তারিখে দিল্লি থেকে টেলিফোন, রমেশ ওই দিন সকালে প্রয়াত। ঠিক দু'দিন বাদে দুপুরবেলা হাসপাতাল থেকে ফোন পেলাম, সমর সেনের জীবনায়ু শেষ, আমাকেই বাড়ি বয়ে গিয়ে সুলেখা সেনকে জানাতে হলো।

যে-রাজনৈতিক স্বপ্ন কুড়ি বছর আগে সমরবাবু দেখতে শুরু করেছিলেন, তা কুঁকড়োনো, পুরনো ভাবসখারা ইতিউতি সরে পড়েছেন। 'ফ্রন্টিয়ার' চালাতেন, অন্য কোনও করণীয়র অভাবেই হয়তো চালাতেন, তবে প্রতি সপ্তাহে না বেরোলেও তেমন ব্যত্যয় হতো না। আমার দিক থেকে এইটুকু সান্ত্বনা, শেষ পর্যন্ত তিনি অন্তত এই বিশ্বাসে স্থিত হয়েছিলেন, আমি, অশোক মিত্র, তাঁর কাগজের চিন্তা-আদর্শের সঙ্গে আপাত-বিশ্বাসঘাতকতা করলেও,

অন্তত তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে করিনি।

জীবনে অনেক ঘাটের জল খেয়েছি, অনেক বাটে চরে বেড়িয়েছি, সমরবাবুর চেয়ে ক্ষুরধার বুদ্ধির মানুষ খুব কম চোখে পড়েছে, তাঁর মতো আদর্শবাদী মানুষও, নাস্তিকতার চাদরে নিজের প্রতিভা সর্বদা ঢেকে রেখেছেন। তাঁর অন্ত্যেষ্টিতে তেমন ভিড় ছিল না, তাঁর নিঃসঙ্গতাকে নমস্কার জানাতেই যেন ছিল না। একটি-দু'টি স্মরণসভা : যাঁরা স্মরণ করতে এলেন, তাঁদেরও অনুচ্চ, প্রায়-অর্ধমনস্ক কণ্ঠস্বর। কারও-কারও কাছে আশ্চর্য মনে হলেও সবচেয়ে আবেগজড়িত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিল পূর্বোল্লিখিত তরুণ সাংবাদিকটি তার সম্পাদিত দৈনিক পত্রিকায়। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে বন্ধুবান্ধবদের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্মান-জানানো একটি সঙ্কলনগ্রন্থ সমরবাবুর হাতে তুলে দিতে পেরেছিলাম। সেটি হাতে নিয়ে সমরবাবুর স্বভাবসিদ্ধ তির্যক মন্তব্য : 'এটা ছাপাতে যা খরচ পড়েছে সেই টাকাটা যদি কেউ আমার হাতে তুলে দিত!'

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম পৃথিবী ক্রমশ ছোটো হয়ে আসছে, কূজনহীন কাননভূমি, দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে। যে সব মানুষদের সঙ্গে খোলস ছেড়ে আড্ডা দেওয়া যায়, গল্প করা যায়, হৃদয় নিঙড়ে আদান-প্রদান করা যাঁদের সঙ্গে সম্ভব, তাঁদের সংখ্যা হ্রস্বমান। শচীনদা-দেবুদার পরের দুই ভাই, হিতেন চৌধুরী ও শঙ্খ চৌধুরী, একজন মুম্বইতে, অন্যজন দিল্লিতে, আরও কাছাকাছি চলে এলেন, আমিও তাঁদের অধিকতর নিকটবর্তী হলাম। ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্ছল শঙ্খ চৌধুরী, সবচেয়ে বেশি নীরবতার উপাসক হিতুবাবু। হিতুবাবুর রোমাঞ্চকর জীবনযাপন, কিন্তু শেষের দিকে ধীর লয়ে প্রবেশ। মধ্য যৌবনে অনেক মহিলার মনোহরণে সফল, অথচ বিয়ের ফাঁদে ধরা দেননি, উনি বার্ধক্য অবস্থায় পৌঁছুবার পর প্রায়ই মনে হতো খুব ঘরোয়া মন ওঁর, গুছোনো মন, যে-মন অথচ কোনও উপযুক্ত আধার পেল না। পরিণত বয়সে বিবাহবন্ধ হলেন, তবে তা থেকে, আমাদের অনেকেরই সন্দেহ, শান্তির থেকে অশান্তির উদ্রেকই বেশি হয়েছিল। শচীনদার প্রয়াণের পর প্রায় সিকি শতাব্দী হিতুবাবু ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলির হাল ধরে ছিলেন, তত্ত্বাবধায়ক অছি হিশেবে। নব্বুই সালে অছিদের সভা ডাকা হলো ব্যাঙ্গালোরে, আমরা জড়ো হলাম। হিতুবাবু কিছুদিন ধরে হৃদ্‌রোগের শিকার, সাবধানে থাকতে হয়, নিয়ম করে ওষুধ খেতে হয়। আমাদের চেয়ে অনেক জ্যেষ্ঠ, তা হলেও তিনিই আমাদের দেখাশোনা করলেন, তত্ত্বাবধায়ক অছির ভূমিকা। বৈঠক শেষে সবাই ফিরে এলাম, একমাত্র হিতুবাবু থেকে গেলেন। তাঁর পুরনো দিনের বান্ধবী দেবিকারানী ব্যাঙ্গালোরের কাছে এক গ্রামে মস্ত বাগানবাড়ি নিয়ে থাকেন, দেখা করে ফিরবেন। কলকাতায় পৌঁছেই মর্মান্তিক খবর, হিতুবাবুও নেই : দেবিকারানীর সঙ্গে একটি পুরো দিন কাটিয়েছেন, হইহল্লা করেছেন, পুরনো সময়ের স্মৃতিতে দু'জনে ডুবে গেছেন, কিন্তু গাড়িতে অতটা রাস্তা যাওয়া-আসার ধকল হিতুবাবু সহ্য করতে পারেননি, রাত্তিরে ব্যাঙ্গালোরে ফিরে বুকে অসহ্য ব্যথা অনুভব, চিকিৎসক এসে পৌঁছুবার আগেই জীবনান্ত।

দলের সঙ্গে মানাভিমানের পালা আমার তেমন দীর্ঘায়িত হয়নি। সাতাশি সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজীব গান্ধি, সম্ভবত তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও অবিবেচনার কারণেই, মহা উৎসাহে পশ্চিম বাংলা তোলপাড় করে বেড়ালেন, এবার নাকি জ্যোতি বাসুজীকে অবসরগ্রহণ না করিয়ে তিনি ছাড়বেন না। কী চক্রে জানি না, নির্বাচনে তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা আমার সুপরিচিত সেই দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, তাঁর পত্রিকা জুড়ে প্রধান মন্ত্রীর গদগদ স্তবসাধনা, একমাত্র আমার পাক্ষিক কলামে রাজীব গান্ধিকে নিয়মিত তুলে

আছাড় মারা। সম্পাদকটি একদিন কী একটি বক্র উক্তি করেছিল এই সম্পর্কে, সঙ্গে-সঙ্গে আমি বলে দিই, তার তরফে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হলে লেখা বন্ধ করে দেবো। খানিক বাদে মহা অনুতাপের সঙ্গে তার বাড়িতে চলে এসে ক্ষমা প্রার্থনা।

নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজীব গান্ধি সর্বত্র বলে বেড়াচ্ছিলেন তিনি পশ্চিম বাংলাকে এক হাজার কোটি টাকা সাহায্য দান করেছেন। শৈলেন দাশগুপ্তের অনুরোধে পার্টির দৈনিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে প্রমাণ দাখিল করলাম, পুরো ব্যাপারটাই শূন্য কুম্ভের আস্ফালন, আসলে তিনি মাত্র কুড়ি কোটি টাকার ব্যবস্থা করেছেন। নির্বাচনের ফল বেরোলো, বিধানসভায় কংগ্রেসের আসন সংখ্যা চল্লিশে গিয়ে দাঁড়ালো, জ্যোতিবাবু চরিতার্থতার হাসি হাসলেন।

অনুরুদ্ধ হয়ে 'গণশক্তি'-তে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত লিখতে শুরু করলাম, সম্ভবত প্রতি বুধবার। দুই-একবার যখন লেখা বন্ধ করতে চেয়েছিলাম, মনে পড়ে পত্রিকার তরফ থেকে বলা হয়েছিল, আমার লেখা যেদিন বেরোয়, বিক্রি নাকি কয়েক হাজার বেড়ে যায়, সুতরাং ওরকম চিন্তা যেন বিসর্জন দিই।

মহাকরণে সকাল-সন্ধে পরিশ্রম নেই, হাতে অঢেল সময়, তা আড্ডায় অপব্যয় করতে আমার কোনওদিন বিবেকদংশন ছিল না। অন্য বন্ধুদের মতো সাহিত্যিক বন্ধুদের সংখ্যাও প্রাকৃতিক নিয়মে কমছে। অরুণকুমার সরকার-আতোয়ার রহমান-সুরঞ্জন সরকাররা নেই, মাঝে-মাঝে হতোদ্যম হয়ে পড়ি, তবে রবি সেনগুপ্ত-ধ্রুব মিত্রের মতো সুহৃদ্জন, আমার মন্ত্রিত্বহীনতা সত্ত্বেও, সাহচর্য দানে বিরত হননি। কিরণময় রাহা তো ছিলেনই, পুরনো দিনের আরও অনেক বন্ধু, যাঁরা বিলুপ্ত হননি, তাঁরাও। সত্যপ্রসন্ন দত্ত প্রায় প্রতি রবিবার শহরের পূর্ব প্রান্ত থেকে অনেক রাস্তা ঠেঙিয়ে নিয়মিত উপস্থিত। আমাদের সঙ্গে রাবিবারিক প্রাতঃরাশ তাঁর নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, সেই সঙ্গে অনেক এলোমেলো শিশির না-ভেজা গল্প। নানা বিষয়েই তাঁর সঙ্গে মতের অনৈক্য, ট্রটস্কিবাদের ভূত তাঁর মাথা থেকে নামেনি, কিন্তু এমন শুভাকাঙ্ক্ষী জীবনে খুব কম পেয়েছি। বোধ হয় এই সময়েই গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ-র ফ্ল্যাটে একদিন শিলু পেরেরাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল; ক'দিন আগেই হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে, কেউ খবর রাখেননি।

রাবিবারিক আড্ডায় তখন যাঁরা হাজির থাকতেন, তাঁরা নৃপেন্দ্র সান্যাল, অসীম সোম, 'পানীয়ন' গোষ্ঠীর অন্যতম প্রাণপুরুষ, আমার ঢাকাস্থ সখা, অজিত গুপ্ত, সুজিত, খোকন, ছোট্টু কখনও-কখনও। স্বার্থাস্বার্থরহিত এই আড্ডা, আড্ডার জন্যই আড্ডা। পৃথিবীর কোনও বিষয় বা গুজবই উল্লিখিত না-হয়ে যেতো না। মাঝে-মধ্যে বহু বছর ধরে সঞ্চিত রেকর্ড-টেপের স্তূপ পেড়ে গান শোনা, ঘণ্টার নিয়ম না মেনে, এক-একদিন এক-একজনের গান, কোনওদিন ইন্দুবালা-আঙুরবালা-আশ্চর্যময়ী দাসী-মিস লাইট-কৃষ্ণচন্দ্র দে-র, কোনওদিন শচীন কর্তার, কোনওদিন ভীষ্মদেব-জ্ঞান গোস্বামীর, অথবা দিলীপকুমার রায়ের, নয়তো জর্জ বিশ্বাস ও সুচিত্রা মিত্রের, নয়তো কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

বন্ধুদম্পতি ড্যানিয়েল ও অ্যালিস থর্নার কলকাতায় এলেই আমাদের ফ্ল্যাটে থাকতেন। থর্নারদের সঙ্গে আলাপ শচীনদার সূত্রে, তারপর আবিষ্কার করা গেল সংযোগের আরও অনেক সেতু। ওঁরা লন্ডনে ছাত্রাবস্থা থেকে হাকসারের বন্ধু, চণ্ডীরও ; জ্যোতিবাবুর সঙ্গেও সামান্য পরিচয় ছিল। ম্যাকার্থি-পর্বে ওঁদের উপর অনেক হামলার ঘটনা ঘটেছিল আমেরিকায়। তিতিবিরক্ত হয়ে থর্নাররা সোজা ভারতবর্ষে চলে আসেন, ১৯৬০ সাল পর্যন্ত

এখানে, প্রধানত মুম্বইতে, তাঁদের বিদ্যাচর্চা তথা জীবিকার্জন। তারপর সরবন থেকে আমন্ত্রণ, তখন থেকে ড্যানিয়েল প্যারিসে, অ্যালিসও অবশ্য। ইওরোপে যাওয়া-আসার উপলক্ষ্যে আমরা প্যারিসে থামবোই, ওঁদের সস্নেহ আতিথ্যে। জীবনে অনেক ঝড়-ঝাপটা ওঁদের উপর দিয়ে গেছে, কিন্তু কখনও নীতিভ্রষ্ট হননি, ওঁদের ভারতপ্রেমেও কোনওদিন ভাঁটা পড়েনি। থর্নারদের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুজি কর্কট রোগে ভুগে অসহ্য কষ্ট পেয়ে মারা যায় আজ থেকে সাঁইতিরিশ বছর আগে; এখনও তার চরিত্রমাধুর্যের স্মৃতি আমাকে উতরোল করে। তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিকোলাস-এর মতো বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানমণ্ডিত মানুষ খুব কম দেখেছি, অথচ নিজেকে জাহির করা একেবারে নেই।

মেয়ের যা হয়েছিল, সেই একই রোগে ভুগে ড্যানিয়েল চুয়াত্তর সালে প্রয়াত, তবে অ্যালিসের সঙ্গে যোগাযোগ এখনও অক্ষুণ্ণ। প্রতি শীতে অ্যালিস নিয়ম করে ভারতে আসেন, দেশময় ওঁর চেনা-জানার বৃত্ত, কয়েকটা দিন আমাদের সঙ্গে কলকাতায় কাটানো। একবার অ্যালিস এসেছেন, বন্ধুবান্ধবরা মিলে যে-ঘরে সাধারণত আড্ডা দিই, সেখানে আমার পড়ার টেবিলও, তাতে অ্যালিস কিছু কাজকর্মে রত, আমরা বাইরের ঘরে নিজেদের স্থানান্তরিত করেছি। একটি-দু'টি অন্য কারও গানের রেকর্ড বাজাবার পর জর্জ বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি, তাঁর কণ্ঠের ঐশ্বর্য ও দার্ঢ্য ফ্ল্যাটময় ঝরে-ঝরে পড়ছে। হঠাৎ দেখি অ্যালিস তাঁর পড়াশুনো ছেড়ে উঠে এসেছেন। বাংলা জানা নেই, রবীন্দ্রনাথের গানের ব্যাকরণ বা বিন্যাসের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত, কিন্তু জর্জ বিশ্বাসের প্রায়-ব্যারিটোন কণ্ঠলাবণ্যে অ্যালিস মুগ্ধ : এমন গলা, তাঁর নির্দ্বিধা ঘোষণা, কোটিতে এক। উপস্থিত সবাই আপ্লুত বোধ করলাম।

একটু অন্য বৃত্তান্ত। কেউ-কেউ কখনো-কখনো প্রশ্ন করেছেন, এই যে এতগুলি বছর মহাকরণে কাটিয়ে, ইতস্তত ছড়ি ঘুরিয়ে এলাম, কী-কী কর্তব্য পালন করে সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি পেয়েছি। আমার জবাব শুনে তাঁরা অবধারিত আশ্চর্য হয়েছেন। না, আমার প্রধান কৃতিত্বের দাবি কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের যুদ্ধে গদা-ঘোরানোর জন্য নয়; রাজস্ব ব্যবস্থা, বিক্রয়করব্যবস্থাসুদ্ধু, সিজিল-মিছিল করে রাজ্য সরকারের উপার্জন অনেকগুণ বাড়ানোর পথ সুগম করবার জন্যও নয়; যারা জনসাধারণকে চড়া সুদের লোভ দেখিয়ে প্রবঞ্চনা করছিল, তাদের ঠান্ডা করে দেওয়ার জন্যও নয় : এসব তো অবশ্যকরণীয় দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, তাদের নিয়ে শ্লাঘাবোধ অবান্তর। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভঙ্গিতে তবু যদি নিজেকে ব্যঙ্গ করে শুধোই, 'সাধিলাম কী সুকৃতি, হবো যার প্রসাদে অমর', আমার ত্বরিত উত্তর : তিনটি বিষয়ে আমার অধিকতম গর্ববোধ। প্রথম উল্লেখ্য, যে লেখককে ভুলেইছিলেন সবাই, 'রমলা' উপন্যাস যাঁর হাত দিয়ে বেরিয়েছিল, যাঁর রচিত 'মায়ের দিন' আমার বিবেচনায় বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প, অশীতিপর মণীন্দ্রলাল বসুর সম্মানে সরকার থেকে অভিনন্দনসন্ধ্যার আয়োজন। অন্নদাশঙ্কর রায় সভাপতিত্ব করেছিলেন, অনেক আবদার-অনুরোধ করে শেষ পর্যন্ত মণীন্দ্রলাল বসুকে সভায় হাজির করাতে সমর্থ হয়েছিলাম; শেষ পর্যন্ত ভারি খুশি হয়েছিলেন তিনি।

দ্বিতীয় সফলতা, গ্রামোফোন কোম্পানিকে উপরোধ জানিয়ে কনক দাসের আটাত্তর-ঘূর্ণি রেকর্ডগুলি থেকে জড়ো করে একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের রেকর্ড প্রকাশের ব্যবস্থা করা। অসম্ভব লাজুক, গুটিয়ে-থাকা মানুষ কনকদি, তিনিও খুব খুশি হয়েছিলেন। বোধহয় আরও খুশি হয়েছিলেন রেকর্ডটি বাজারে ছাড়বার দিন গ্রামোফোন কোম্পানি তাঁর আদরের বোনপো সত্যজিৎ রায়কে হাজির করেছিল বলে।

তৃতীয় দফা শ্লাঘাবোধ, জর্জ বিশ্বাসকে সরকারি সংবর্ধনা জানানো। কোনও কারণে বামফ্রন্ট সরকার সম্বন্ধে সামান্য অভিমান পোষণ করতেন জর্জ বিশ্বাস। আমার ধনুর্ভঙ্গ পণ, ওঁকে সংবর্ধনা দিতেই হবে, এটা আমাদের ন্যূনতম সামাজিক কর্তব্য। কিছুতেই ওঁকে রাজি করাতে পারছিলাম না। স্নেহাংশুবাবুকে পাকড়ালাম, তিনি এক সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে রাসবিহারী অ্যাভেনিউতে উড়নচণ্ডী গায়কের একতলার ফ্ল্যাটে হাজির। ময়মনসিংহ জেলার পুরনো অনুরাগ-আনুগত্য, কুমার বাহাদুর স্বয়ং আর্জি জানাতে এসেছেন, জর্জ বিশ্বাসের সম্মতি না-দিয়ে উপায় কী! আনন্দসন্ধ্যায় যোগ দিয়ে তিনিও, আমার ধারণা, যথেষ্ট পুলকিত বোধ করেছিলেন, নিজের থেকেই অনেকগুলি গান গেয়েছিলেন।

কাহিনীর ভিতরে ফের অন্য কাহিনী না পেড়ে উপায় নেই। শান্তিনিকেতনে-পড়া নচ্ছার বন্ধুদের মুখে গল্প শুনেছিলাম, যে-যে শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে শিশুভবনে-পাঠভবনে পড়িয়েছেন, বার্ধক্যে পৌঁছেছেন, প্রায় অথর্ব হয়ে গেছেন, আদৌ আর পড়াতে পারছেন না, অথচ অবসর গ্রহণ করছেন না, ছাত্রদল একটি বিশেষ দিবস বেছে নিয়ে ঘটা করে তাঁদের সম্মান জ্ঞাপন করতো। এবং, কী আশ্চর্য, সম্মান জানানোর তিন-চার মাসের মধ্যেই সামান্য অসুখে ভুগে প্রতিটি মাননীয় শিক্ষকমহোদয় প্রয়াত হতেন। কাহিনীটি শান্তিনিকেতনে রটে যাওয়ার পর কোনও অশীতিপর শিক্ষকই সম্মানদিবসে যোগ দিতে রাজি হতেন না, ছাত্রের পাল ধেয়ে আসছে দেখলেই দ্রুত পালাতেন।

ললাটলিখন, আমার উৎসাহ-আয়োজনের ক্ষেত্রেও সেরকম দুর্বিপাক ঘটলো। কনকদি-মণীন্দ্রলাল বসু-জর্জ বিশ্বাসকে সংবর্ধনা দেওয়া হলো, কনকদি তো জর্জ বিশ্বাসের বউদিও, দেবরকে সম্মান জানানোর সন্ধ্যায় তাঁর সস্নেহ উপস্থিতির কথা এখনও মনে পড়ে। সংবর্ধনাজ্ঞাপনের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এঁরা তিনজনই পর-পর প্রয়াত হলেন। কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না, তবু ভীষণ দমে গেলাম। যাঁরা গেলেন, তাঁদের হয়তো যাওয়ার সময় হয়েছিল, কিন্তু আক্ষেপ তো তার জন্য কম নয়। অন্য একটি কৌতুক প্রসঙ্গও এখানে মনে পড়ছে। কনকদির মৃত্যুর পর, বিষণ্ণ আমি, একটি আবেগ-ঠাসা প্রবন্ধ লিখি, যা পত্রিকায় পড়ে কলকাতার জনৈক কট্টর কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী তরুণ বুদ্ধিজীবী রেগে অগ্নিশর্মা, ঝটপট ওই পত্রিকায় লম্বা চিঠি পাঠালেন : 'কমিউনিস্টদের কী আস্পর্ধা! তারা কনক দাসের সম্পর্কে লিখতে সাহস পায়, তারা তো বিজাতীয়, দেশদ্রোহী, রবীন্দ্রনাথের গানের মাহাত্ম্য তারা কী বুঝবে?'

মন্ত্রী থাকাকালীন কী-কী করিনি এমন কোনও গর্ববোধের তালিকা আছে কিনা, তা যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, আদৌ ভড়কাবো না, আমার সেই তালিকাও তৈরি। কোনও সেতু বা রাস্তা বা নতুন সরকারি দালান 'উদ্বোধন' অনুষ্ঠানে কখনও-কখনও যদিও বাধ্য হয়ে যেতে হয়েছে, সারা পশ্চিম বাংলা ঢুঁড়লেও কেউ আমার নামে কোনও উদ্বোধনফলক পাবেন না। সল্ট লেক স্টেডিয়াম নির্মাণের ঋতুতে দিনের পর দিন কেন্দ্রীয় সরকার-নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির সঙ্গে ঝুলোঝুলি করে যেমন অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছি, যে কেন্দ্রীয় সংস্থা স্টেডিয়াম নির্মাণের দায়িত্বে, ব্যয়ের অঙ্ক একটু কমাতে তার কর্তাব্যক্তিরা রাজি আছেন কিনা, তা নিয়েও প্রচুর ঘর্মক্ষয় করেছি; কিন্তু আজ পর্যন্ত স্টেডিয়ামে গিয়ে মাঠের চেহারা দেখিনি, দেখতে অবশ্য কেউ নেমন্তন্নও করেননি আমাকে।

পঁয়তিরিশ

বছর গড়ায়, অষ্টাশি সালে দু'মাসের জন্য প্যারিস থেকে ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ। বসন্ত ঋতু, অতি সুন্দর সময়। বিশেষ করে অ্যালিস আমাদের জন্য এমন এক পল্লীতে, এমন এক রাস্তায় একটি ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দিলেন, যা বিখ্যাত বেলজিয়ান লেখক জর্জ সিমেনঁর গোচারণভূমি। ওঁর লেখা অনেক খুনের কাহিনী এই অঞ্চলে ঘটেছে, এমন কি ওঁর স্থিতধী পুলিশ গোয়েন্দা মেইগ্রে এবং তস্য ততোধিক স্থিতধী ঘরোয়াত্বমদির গৃহিণীরও বাসস্থান এই অঞ্চলে। আমার আনন্দ ধরে না, ওই দু'মাস বড়ো রাস্তা-ছোটো-রাস্তা-অলি-গলি ঘুরে বেড়িয়েছি সিমেনঁর বৈদেহী উপস্থিতির অন্বেষণে। বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে যা এখন প্রচুর ঘটছে, আমার অনুজা মার্কিনবাসিনী, পক্ষকাল ক্যালিফোর্নিয়ায় তাদের ওখানেও কাটাতে হলো, ফেরার পথে কয়েকদিনের জন্য ওয়াশিংটনে পুরনো বন্ধুদের আকর্ষণে। দিন পাঁচেক বাদে নিউ ইয়র্ক থেকে রাতের বিমানে চড়ে ভোরবেলা ফ্রাঙ্কফুর্টে। পরিকল্পনা ছিল সেখান থেকে অন্য বিমান ধরে ভিয়েনা যাবো, আমাদের কাছের মানুষ, অর্থনীতিবিদ অমিত ভাদুড়ীর স্ত্রী, ভারতীয় দূতাবাসে কর্মরতা, মধু ভাল্লার সঙ্গে দিনকয়েক কাটাবো।

ভিয়েনা যাওয়ার অন্য বড়ো কারণও ছিল। প্রায় এক যুগ খুরশীদের সঙ্গে দেখা হয় না, কিংবা দেখা হলেও মাত্র এক ঘণ্টা-দু'ঘণ্টার জন্য, হয়তো নিউ ইয়র্কের বিমান বন্দরে, অথবা লন্ডনের হোটেলঘরে। আটাত্তর সালে একটি বিদ্যাচর্চা বৈঠকে যোগ দিতে সে নতুন দিল্লি এসেছিল, দিল্লির বাইরে যাওয়ার অনুমতি পায়নি ভারত সরকারের কাছ থেকে, কলকাতা থেকে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে এলাম। সাক্ষাৎমাত্র ওর ঝরঝর কান্না : 'জীবনটাকে আমি নিজেরই ভুলে তছনছ করেছি'। স্বামীর সঙ্গে মনের মিল হয়নি, ওর অধ্যাপিকা-জীবন স্বামীর অপছন্দ। খুরশীদ ফরেন সার্ভিসে ঢুকলে অপছন্দের মাত্রা বৃদ্ধি, অতঃপর বিবাহবিচ্ছেদ, ছেলেটি ভাগাভাগি করে বাবা-মার সঙ্গে। খুরশীদ কখনও নিউ ইয়র্কে কনসাল জেনারেল, কখনও হল্যান্ডে রাষ্ট্রদূত, কখনও অন্যত্র। মাঝে-মাঝে চিঠি পাই, কর্মক্ষেত্রে কৃতী হয়েছে, কিন্তু জীবনে শান্তি নেই। ইতিমধ্যে সে কঠিন পীড়ায়ও আক্রান্ত, চিকিৎসার সুবিধার্থে পাকিস্তান সরকার তাকে ভিয়েনায় রাষ্ট্রদূত করে পাঠিয়েছে।

আমাদের দু'জনেরই খুরশীদকে দেখবার জন্য উৎকণ্ঠা, মধুর মারফৎ আগে থেকে তাকে খবর পাঠানো হয়েছে। মধু, আগেই উল্লেখ করেছি, অবাঙালি, কিন্তু দুরন্ত বাংলা জানে, বোঝেও। শাস্ত্রীয় সংগীতে পারদর্শিনী, ভারতীয় ফরেন সার্ভিসে দ্রুত উন্নতি করেছে, হিন্দি ভাষায় অগ্রগণ্যা গল্পলেখিকা। ওর ওখানে থাকবো, দু'বেলা খুরশীদকে দেখতে যাবো, মনে-মনে এমন ছক কাটা। কেলেঙ্কারি ঘটলো ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে। ভিয়েনাগামী বিমানের সময় হয়ে গেছে, এসকালেটরে চেপে উপরের তলায় উঠে বিশেষ কাউন্টার থেকে আমাদের জন্য অপেক্ষমাণ ভিয়েনার বিমানের টিকিট সংগ্রহ করতে হবে। আমার হাতে ধরা গড়গড়িয়া মাল-চাপানো গাড়ি, উপরের তলায় উঠে যে মুহূর্তে পা বাড়িয়েছি, অজ্ঞান হয়ে

পতন, গাড়িটির হাত থেকে দূরে ছিটকে যাওয়া। আমার স্ত্রী কিংকর্তব্যবিমূঢ়। লোক জমলো, আমাকে বিমানবন্দরের প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে সূচ ফোঁড়ানো হলো, তারপর তড়িঘড়ি অ্যাম্বুলেন্স করে শহরের হাসপাতালে। জরুরি অস্ত্রোপচার, তিন সপ্তাহ হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কাটানো, ভিয়েনা আর যাওয়া হলো না, খুরশীদকে দেখাও হলো না। যেদিন কেলেঙ্কারিটি ঘটলো, খবর পেয়ে মধু বিকেলের বিমানে ফ্রাঙ্কফুর্ট চলে এসে সমস্ত ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করলো, আমার স্ত্রী অকূলে কূল পেলেন। কয়েকদিন বাদে আমার অগ্রজ ও বউদিও এসে গেলেন কলকাতা থেকে।

প্রথম যৌবনে কার গদ্যকবিতায় যেন এই অমর পঙ্‌ক্তিটি পড়েছিলাম : 'ভাল্লেগে না, ভাল্লেগে না, ভাল্লেগে না...'। পঙ্‌ক্তিটির সারমর্ম বুঝতে পারলাম ওই তিন সপ্তাহ হাসপাতালে পড়ে থেকে। তবে যত্নআত্তি-সেবার তুলনা ছিল না। দেশ-বিদেশ থেকে অনেক টেলিফোন-টেলিগ্রাম-চিঠি, প্রবাসী ভারতীয়দের পক্ষ থেকে সর্বদা খোঁজখবর নেওয়া। এক পুরনো বন্ধু ও সহকর্মী জেনেভায় মস্ত উঁচু পদে তখন আসীন, দেশে ফিরে আরও সম্মাননীয়তর পদে বৃত হয়েছিলেন, খোদ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, তিনিও একদিন জেনেভা থেকে এসে দেখে গিয়েছিলেন, খোঁজ নিয়েছিলেন চিকিৎসার জন্য অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন কিনা। পৃথিবীটা এরকমই, কাছের মানুষ দূরে চলে যায়, কখনও-কখনও অবশ্য দূরের মানুষ কাছে আসে।

তবে রোগশয্যায় শায়িত অবস্থাতেও একটি মজাদার ঘটনা। হাসপাতালের বিছানায় আমাকে এলায়িত করা হয়েছে, নাড়ির স্পন্দন পঁচিশ থেকে শূন্যে নামছে, শূন্য থেকে পঁচিশে উঠছে। যখন শূন্যের দিকে অবতরণ করছে, একটি শান্ত, সমাহিত, পরম আরামদায়ক বেগনি রঙের বিভা যেন চেতনা জুড়ে নামছে, আমার সুখ ধরে না! তবে ক্ষণিক সুখ, নাড়ি-স্পন্দন যেই শূন্য থেকে উপরের দিকে উঠতে শুরু করে, শরীরময় অসহ্য যন্ত্রণার অনুভব। কষ্ট করে চোখ মেলে তাকিয়ে তার কারণ উপলব্ধি করার চেষ্টা করি : আমার শরীরের উপর ঝাঁপিয়ে চার-পাঁচজন চিকিৎসক- সেবিকা, অ্যাবাকাস গোছের একটা জিনিশ, তাতে সমান্তরাল কতিপয় সারণিতে ছোটো-ছোটো রবারের বল লাগানো, তা দিয়ে তাঁরা আমার বুকের উপর ধ্বস্তাধ্বস্তি-ডলাইমালাই করছেন, যন্ত্রণা সেই কারণে। পাশাপাশি অন্য এক বিচিত্র দৃশ্য। হাসপাতালটি আদিতে কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা শুরু করা হয়েছিল, পরে সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরে হস্তান্তরিত হয়। কিন্তু তখনও দোইয়ারকি, শাদা পোশাকের নানরাও আছেন, নীল উর্দি-পরা সেবক-সেবিকারাও। আমার শিয়রের পাশে এক প্রৌঢ়া যাজিকা উপবিষ্টা, বাইবেল খুলে বসে কানের কাছে অবিশ্রান্ত বলে চলেছেন : 'তোমার শেষ ইচ্ছা উচ্চারণ করো, শেষ ইচ্ছা উচ্চারণ করো।' ইহ ও পরলোকের এই যুদ্ধে আমি মধ্যবর্তী নিমিত্তমাত্র।

যা-ই হোক, সে যাত্রা টিকে গেলাম। কিন্তু বাইরের আকাশে তো ভয়ংকর ঘনঘটা। ইওরোপে থাকতেই টের পাচ্ছিলাম, পৃথিবী জুড়ে সাম্যবাদী আন্দোলন অভূতপূর্ব সংকটের মুখোমুখি। সোভিয়েট রাষ্ট্রে কয়েক বছর ধরে মিখাইল গোর্বাচভ হাল ধরে আছেন, খোলা হাওয়া ও আভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রতিশ্রুতি জানিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু। প্রথম দিকে অনেকেরই ধোঁকা লাগছিল। বামপন্থীদের মধ্যেও একটি বড়ো অংশ ভেবে নিয়েছিলেন, ভালোই তো, কমিউনিস্ট চিন্তা ও প্রজ্ঞায়—মার্কসই তো বলেছেন— কালিক দ্বান্দ্বিকতার বিবর্তন অত্যাবশক, সুতরাং গোর্বাচভ যা করতে চাইছেন তা থেকে শুভরই সম্ভাবনা। অচিরে ভুল

ভাঙলো। প্যারিসে ফরাশি পার্টির অন্যতম সর্বোচ্চ নেতা, অর্থনৈতিক বিষয়ে দায়গ্রস্ত পলিট ব্যুরোর সদস্য, কমরেড অ্যার্জগের সঙ্গে একদিন অনেকক্ষণ আলাপ করেছিলাম। তাঁর সাক্ষাৎ অনুযোগ, শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রের আদর্শ থেকে সোভিয়েট পার্টি ক্রমশ সরে যাচ্ছে, গোর্বাচভের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান নিরস্ত্রীকরণ, সেই সঙ্গে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে আপস করে চলা; পরিণামে ইওরোপে ও পৃথিবীর অন্যত্র সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কী হাল দাঁড়ায় তা নিয়ে তাঁর কোনও মাথাব্যথা নেই। সেরকম আশঙ্কাই অচিরে সত্য হলো। দু'বছরের মধ্যে স্বয়ং গোর্বাচভ সোভিয়েট পার্টিকেই অবৈধ ঘোষণা করলেন। যে ব্যক্তিবর্গ চিন্তায়-আচরণে কোনও দিনই কমিউনিস্ট ছিলেন না, অথচ পাকেচক্রে সোভিয়েট পার্টি দখল করে বসে ছিলেন, এবার তাঁরা স্বমূর্তি ধারণ করলেন। তাঁদের পেটোয়া মানুষজনই—রুমানিয়ার মতো একটি-দু'টি ব্যতিক্রম বাদ দিলে—পূর্ব ইওরোপের অন্যত্র সমস্ত তথাকথিত জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সোভিয়েট ব্যবস্থার পতন, সঙ্গে-সঙ্গে, আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে, গোটা পূর্ব ইওরোপেও ধনতন্ত্রের ধ্বজা, প্রায় অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানে, নতুন করে উড়লো। কোথাও একটি কামান গর্জন করে উঠলো না, বোমারু বিমান আকাশ ছেয়ে হাজির হলো না, সৈন্যসামন্ত নিয়ে মার্কিনদের সর্বাত্মক আক্রমণে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলো না পর্যন্ত, সত্তর বছর ধরে তিল-তিল করে গড়ে ওঠা সমাজতান্ত্রিক কাঠামো নিজে থেকেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়লো। সাম্যবাদ-বিরোধীরা বিজয় গর্বে স্ফীত হলেন, রঙ্গ করে পরস্পরকে ধাঁধা শুধোলেন, ধনতন্ত্র থেকে ফের ধনতন্ত্রে পৌঁছুতে খাশা সত্তর বছরের সমাজতান্ত্রিক শর্ট-কাট।

যা চলিত অভিমত, ওসব দেশে সাধারণ মানুষ সাম্যবাদী ব্যবস্থা সম্পর্কে ক্রমশ তিতিবিরক্ত হয়ে উঠছিলেন, এতদিন বাদে তারই প্রতিফলন ঘটলো : মানুষকে নাকি কিছুদিনের জন্য প্রতারণা করা যায়, কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়বেই, সোভিয়েট দেশে-পূর্ব ইওরোপে নড়লোও। অন্য যে-জোরালো মন্তব্য প্রচারের জায়গা জুড়ে রইলো, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আর্থিক পরিকল্পনার কাঠামোতে প্রচুর গলদ, যার ফলে মানুষের চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান একটু-একটু করে দুস্তর হয়ে উঠেছিল; এই আর্থিক অব্যবস্থাও সমাজতন্ত্রের ঘোর সর্বনাশের জন্য দায়ী।

ধনতন্ত্রের উল্লসিত প্রবক্তারা এমনধারা বলেন, সুবিধাবাদী কেউ-কেউ, যাঁরা একদা সাম্যবাদী শিবিরে ছিলেন, এখন যখন-যেমন-তখন-তেমন দর্শন-চিন্তায় ভেসে গিয়ে পুঁজিবাদীদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন, তাঁদেরও অনুরূপ অভিমত। সবিনয়ে বলি, তাঁদের যুক্তি তেমন তথ্যনির্ভর নয়। অর্থনীতিবিদরা পরিকল্পনার ছক কাটেন, উৎপাদিতব্য পণ্যাদির অগ্রাধিকার স্থির করেন, কিন্তু করেন রাজনৈতিক নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে, সেই নির্দেশ তাঁরা অমান্য করতে পারেন না, কোনও দেশেই পারেন না, সোভিয়েট-প্রতিম দেশে তো নয়ই। বিপ্লব-পূর্ব পর্বে লেনিন যে-গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতানীতিনির্ভর সংগঠন তৈরি করে গিয়েছিলেন, এক বিশেষ পর্যায়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রে তা এলোমেলো হয়ে আসে। এই নীতির মূল ভিত্তি পার্টির অভ্যন্তরে তর্ক-আলোচনা-মীমাংসা প্রক্রিয়ার উভয়মুখিতা : নিম্নতম স্তর থেকে ধাপে-ধাপে মতামত-প্রস্তাব ইত্যাদি সংশোধিত ও পরিশোধিত হতে-হতে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছুবে, সেখানে পুনর্বিবেচিত হয়ে ফের ধাপে-ধাপে একেবারে সর্বনিম্ন স্তরে অবরোহণ। চিন্তা-ভাবনার এ রকম ধোলাই-বাছাই কয়েক দফা হওয়ার পর পার্টি পাকা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে; সিদ্ধান্ত একবার গৃহীত হলে সর্ব স্তরে তা মানতে হবে, মানতেই হবে।

অথচ, বিশেষ করে ষাটের দশকের শুরুতে এসে, সোভিয়েত দেশে যে-পরিস্থিতি দাঁড়ালো, নেতারা উপরে বসে সিদ্ধান্ত নেন, এবং তা গোটা পার্টির উপর চাপিয়ে দেন। এই ব্যবস্থাকে আর যা-ই হোক গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা নীতির প্রতিফলন কিছুতেই বলা চলে না, বলতে হয় ওই নীতির বিকৃতি। পরিকল্পনাবিদদের তাই কিছু করবার ছিল না। নেতৃত্বের মহলে যা সিদ্ধান্ত হয়েছে তা-ই সর্বস্তরে সবাইকে মেনে নেওয়া নিয়ম হয়ে দাঁড়ালো। সাধারণ মানুষ কী ইচ্ছা-অনিচ্ছা ব্যক্ত করছেন, কী তাঁদের অভিযোগ-অভাব-আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার খবর উপরের স্তরে যেহেতু পৌঁছুতো না, পার্টি নেতৃসর্বস্বতায় পর্যবসিত হলো। সব মিলিয়ে বলা চলে, সাম্যবাদী কাঠামোর ভণিতায় এমনকি প্রায় সামন্ততন্ত্রের প্রত্যাবর্তন। অবশ্য দেশে-দেশে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের জন্য উপগ্রহবাহিত টেলিভিশনের মোহিনী মায়াও কম কৃতিত্ব দাবি করতে পারে না। সাম্যবাদী মানুষ তৈরি করবার অঙ্গীকার সোভিয়েট রাষ্ট্র ও পূর্ব ইওরোপের অন্য দেশগুলিতে অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, সুতরাং, যা হবার তাই হয়েছে, জড়োয়া গয়না গায়ে ভ্রান্তির গণিকা সহজেই জনগণকে রঙিন গলিতে টেনে নিয়ে যেতে পেরেছে।

আপাতত সাম্যবাদ-বিরোধীদের আনন্দ উপচে পড়ছে, তাঁরা ধরেই নিচ্ছেন যেহেতু সোভিয়েট ব্যবস্থার পতন ঘটেছে, পূর্ব ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রেও সমাজতান্ত্রিক শপথ ধূল্যবলুণ্ঠিত, এখন থেকে তা হলে খোদ মার্কসবাদ-ই অচল। এ ধরনের আপাতজ্ঞানগর্ভ মন্তব্য, ফের নিবেদন করি, অনেকাংশেই যুক্তিরহিত। একটি বিশেষ প্রশাসনিক পরীক্ষা ব্যর্থ হওয়ার অর্থ এই নয় যে সেই পরীক্ষার আকর যে দর্শনচিন্তা থেকে উৎসারিত, তা-ও সমান মূল্যহীন। মার্কসবাদ এক সঙ্গে ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, নৃতত্ত্ব প্রভৃতির সমাহার। যতদিন পৃথিবীতে শোষণ অব্যাহত থাকবে, শ্রেণীবিভাজন থাকবে, ততদিন ইতিহাসের জড়বাদী বিশ্লেষণ অপাঙ্‌ক্তেয় হবার নয়। মানতেই হয়, ভুবনজোড়া সাম্যবাদী আন্দোলন বিংশ শতকের শেষ পর্যায়ে মস্ত ঘা খেয়েছে। পরিণামে পূর্ব ইওরোপের জনসাধারণের যে-ক্ষতি হয়েছে, তার সমপরিমাণ কিংবা তারও বেশি অনিষ্ট ঘটেছে পৃথিবীর অন্য সর্বত্র সাম্যবাদী আন্দোলনের। যে-স্বপ্নকে সত্তর-আশি বছর আগে মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল, তা ধূমকেতুর মতো মিলিয়ে গেল, একটি মহৎ প্রেরণার সাময়িক অপমৃত্যু ঘটলো; অনেকের কাছেই, অস্তিত্বের ধ্রুবতারা খসে পড়লো যেন। আমাদের দেশ থেকে বেশ কয়েক হাজার মাইল দূরে রাশিয়া-পূর্ব ইওরোপের অবস্থান, সেখানকার দুর্বিপাকের হ্যাপা ভারতবর্ষের বামপন্থীদেরও সামলাতে হচ্ছে। তাঁদের অনেকেরই প্রোথিত বিশ্বাসের গোড়ায় যেন কুঠারাঘাত। এমন হওয়া উচিত ছিল না, আদর্শের প্রতি আস্থা চরম সংকটেও বিচলিত হতে না দেওয়াই তো সাম্যবাদীদের অঙ্গীকার হওয়া উচিত। অথচ বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন অনেকে। বিশেষ করে খুব খারাপ লেগেছিল, যখন দেখলাম, জর্মানি থেকে এক দল ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল সাংসদ কলকাতায় বেড়াতে এসে খোদ বামফ্রন্ট মন্ত্রীদের বের্লিন দেওয়ালের গুঁড়ো-গুঁড়ো-হয়ে-যাওয়া টুকরো উপহার গিয়ে গেলেন, মন্ত্রীরা তা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, নিঃশব্দে গ্রহণ করলেন।

বাইরে ডামাডোল, বামপন্থী মহলে আদর্শঘটিত সংকট। দেশে ফিরে টের পেলাম তা-ও ছাপিয়ে সমসাময়িক আভ্যন্তরীণ নানা ঘটনাবলী। কিছু-কিছু কানাঘুঁষো অনেক দিন থেকেই শোনা যাচ্ছিল : কেন্দ্রীয় সরকারে দুর্নীতি পরিব্যাপ্ততর। হঠাৎ বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংহের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগে উত্তেজনার পর্দা চড়লো। বফর্স কেলেঙ্কারি নিয়ে দেশ জুড়ে আলোড়ন, রাজীব গান্ধির দ্রুত জনপ্রিয়তা হারানো। রাষ্ট্রপতি জৈল সিংহের সঙ্গে তাঁর

মনোমালিন্যের অনেক গল্পও বাজারে চালু। বেপরোয়া গতিতে মূল্যমান বৃদ্ধি, প্রধান মন্ত্রী ও তাঁর বড়োলোক-সমাচ্ছন্ন মন্ত্রিসভার উৎসাহে ঢালাও শৌখিন জিনিশপত্র আমদানির প্রকোপে বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার দ্রুত হ্রাসপ্রাপ্ত। উননব্বুই সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজীব গান্ধি ও কংগ্রেস দলের পরাজয়, বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংহের নায়কত্বে জনতা দলের নতুন সরকার। বিশ্বনাথপ্রতাপ নিপাট ভালো মানুষ, জনতা দলের বিদ্‌ঘুটে অন্তর্কলহ সামলানোর সাধ্য তাঁর ছিল না। অন্তত পাঁচ-ছ'জন খলনায়ক লোভাতুর দৃষ্টি নিয়ে প্রধান মন্ত্রীর আসনের দিকে প্রথম থেকেই তাকিয়ে। ঘোষিত নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও মন্ত্রিসভার কেমন যেন নড়বড়ে আচরণ। নতুন অর্থমন্ত্রী মধু দণ্ডবতে চমৎকার মানুষ, কিন্তু নিজের মস্তক চালাতে গিয়ে অথৈ জলে, ধড়িবাজ মার্কিন-ভক্ত আমলারা তাঁকে সমানে ল্যাজে খেলিয়ে গেলেন। বাইরে থেকে বামপন্থীরা যতই সমর্থন দিন না কেন, যা টুকরো-টুকরো হয়ে যাওয়ার তা টুকরো-টুকরো হবেই।

জনতা মন্ত্রিসভার এই স্বল্পায়ু মরশুমের একটি কৌতুক-উদ্রেককারী গল্প, যা জ্যোতিবাবুর মুখ থেকেই শুনেছিলাম। কংগ্রেস-বশংবদ রাজ্যপালদের পরিবর্তে বিভিন্ন রাজ্যে 'বন্ধুভাবাপন্ন' ব্যক্তিদের বসাতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারের এমন ইচ্ছা। বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংহ নাকি জ্যোতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, অশোক মিত্রকে রাজ্যপাল নিয়োগ করলে কেমন হয়। লোমহর্ষক প্রস্তাব, যে-রাজ্যপাল পদ বিলোপের জন্য চেঁচিয়ে পাড়া মাত করছি, তাতে আসন গ্রহণ করার আহ্বান। জ্যোতিবাবু অবশ্য অতি চমৎকার উত্তর দিয়েছিলেন বিশ্বনাথপ্রতাপকে : 'অশোক মিত্রকে আপনি কতটা চেনেন যে ওঁকে রাজ্যপাল করতে চান? অতিথি-অভ্যাগতরা দেখা করতে এলে এক পেয়ালা চা খাওয়াবার আগেই উনি তাঁদের তাড়িয়ে দেবেন।' গল্পটি বাড়ির ভদ্রমহিলাকে বলায় তাঁর তেমন পছন্দ হলো না : আমি অবশ্যই পর্যাপ্ত রকম অভদ্র, কিন্তু চা না খাইয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার মতো অভদ্র নাকি নই।

মণ্ডল কমিশনের প্রতিবেদন পেশ, জাত-পাত নিয়ে ঘনায়মান বিসংবাদ, ভারতীয় জনতা দলের সমর্থন তুলে নেওয়া, বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংহের পদত্যাগ। এগারো বছর আগে সংঘটিত চরণ সিংহ নাটকের পুনরভিনয়, কুশীলব শুধু আলাদা। একদা মস্ত তরুণ তুর্কি, চন্দ্রশেখর, পনেরো-কুড়ি জন লোকসভা সদস্য বগলদাবা করে রাজীব গান্ধির সমর্থনে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন, রাজীবজননীর হাতে তিনি কত হেনস্থা হয়েছিলেন তা বেমালুম ভুলে গিয়ে : সুযোগ-সন্ধানীদের সম্ভবত বিস্মরণবিশারদ না হয়ে উপায় থাকে না। কংগ্রেসের সমর্থনে মাস তিন-চার চন্দ্রশেখর গদি জাঁকিয়ে রইলেন। অতঃপর উনআশি সালের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি, কংগ্রেস দল হাস্যকর ওজর দেখিয়ে চন্দ্রশেখর মন্ত্রিসভার প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নিল, ফের লোকসভা নির্বাচন। জ্যোতিবাবু স্থির করলেন একই সঙ্গে পশ্চিম বাংলার বিধানসভা নির্বাচনও সেরে ফেলবেন : যদিও আরও বেশ কয়েক মাস মেয়াদ শেষ হবার বাকি বিধানসভা ও রাজ্য মন্ত্রিসভা উভয়েরই, তা হোক, অর্থব্যয় ও কায়িক পরিশ্রম দুই-ই খানিকটা বাঁচবে।

আমি ঘোর সংকটের সম্মুখীন। পার্টি নেতৃত্ব থেকে বলা হলো, যদি বিধানসভার নির্বাচনে ফের দাঁড়াতে সম্মত হই, তাঁদের অনেক সমস্যার নিরসন হয়, আমার জন্য তাঁরা একটি নিরাপদ আসনও নাকি স্থির করে রেখেছেন। সবিনয়ে অসম্মতি জানালাম, মন্ত্রিসভায় গেলে হয়তো আমাকে আবার অর্থ দফতরের দায়িত্ব নিতে বলা হবে। পরিষ্কার জানালাম, যিনি

সেই মুহূর্তে দায়িত্বে আছেন তিনি বরবাদ হবেন আর আমি তাঁর জায়গায় মন্ত্রী হবো, তা আমার ব্যাকরণে একেবারেই গ্রাহ্য নয়, পার্টির সমস্যা আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি, তা সত্ত্বেও।

বুঝতে পারছিলাম, দলের নেতৃত্ব একটু দুঃখিত হলেন, কারও-কারও মন্তব্যে ঈষৎ অভিমানের আবেশও। মাথায় হঠাৎ বুদ্ধি খেলে গেল। তাঁদের বললাম, আপনাদের তো চৌরঙ্গি কেন্দ্রে সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে একজনকে বলির পাঁঠা হিশেবে দাঁড় করাতে হবে, আমি সেই বলির পাঁঠা হতে সানন্দে রাজি। নেতৃবৃন্দ একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন, আমি ঠাট্টা করছি না কি গুরুত্বের সঙ্গেই প্রস্তাবটি উত্থাপন করছি, বুঝতে তাঁদের সামান্য সময় লাগলো। তবে দুই-একদিনের মধ্যেই তাঁরা নিঃসংশয় হলেন, খুশিও হলেন সেই সঙ্গে। বিশেষ করে জ্যোতিবাবুর মহা উৎসাহ, বরাবরই কম কথার মানুষ, আমাকে একান্তে শুধু বললেন : 'ওয়ান্ডারফুল'। উনি খুব সম্ভব বিশ্বাসও করেছিলেন, সিদ্ধার্থ রায়কে হারিয়ে দিতে পারবো। দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হলো একানব্বুই সালের সেই নির্বাচন, কারণ দেখান হলো প্রশাসনিক জনবল তথা পুলিশ বাহিনীর অভাব। দুই পর্বের মধ্যবর্তী সময়ে রাজীব গান্ধি, তাঁর মায়ের মতোই, নৃশংসভাবে নিহত হলেন, তামিলনাড়ুতে নির্বাচন প্রচারে গিয়ে। নির্বাচনের সার্বিক ফলাফলে সেই হত্যার প্রতিফলন: প্রথম কিস্তির নির্বাচনে কংগ্রেস দলের ফল গোটা দেশেই যথেষ্ট খারাপ, কিন্তু দ্বিতীয় দফায় সেই পরিমাণ ভালো, পুনর্বার তথাকথিত সমবেদনা-ভোট। যদিও লোকসভায় ঠিক সংখ্যাধিক্য নেই, কংগ্রেস তা হলেও সর্ববৃহৎ দল, দলনেতা নরসিংহ রাও প্রধান মন্ত্রী হিশেবে শপথ গ্রহণ করলেন।

পশ্চিম বাংলায় বামফ্রন্ট হেসে খেলে জিতল, তবে সিদ্ধার্থ রায়ের কাছে আমি সম্যকরূপে পর্যুদস্ত, কলকাতা শহর জুড়েই বামফ্রন্টের ফল খুব খারাপ। এই পরাজয়ের হেতু পরে বিশ্লেষণ করে দেখেছি। আমার প্রাথমিক হিশেব ছিল, যেহেতু আগের বছর কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে চৌরঙ্গি কেন্দ্রের আওতাভুক্ত সব ক'টি ওয়ার্ডের ফল যোগ করলে বামফ্রন্ট সাকুল্যে কংগ্রেসের চেয়ে খানিকটা এগিয়ে, যদিও অবধারিত হারবো, সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে লড়াইটা তবু তেমন খারাপ জমবে না। সেই হিশেব অবশ্যই খাটেনি, খাটেনি তার কারণ বেশ কয়েকটি। সবচেয়ে আগে যে-কথা বলা প্রয়োজন, দলের যুব সংগঠনের এক উঠতি নেতা কর্তৃক নব্বুই সালের অগস্ট মাসে পোটোপাড়ার মহিলাটিকে প্রহারকর্মের বহুব্যাপী বিরূপ প্রতিক্রিয়া আমরা পুরোপুরি ভুলেইছিলাম; অন্তর্বর্তী সময়ে অন্য কোনও ভোট হয়নি, তাই ওই কুৎসিত ঘটনায় কলকাতার, বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতার, জনসাধারণ পার্টির উপর কতটা বিরক্ত, তা অনুমান করার কোনও সুযোগ পূর্বে ঘটেনি। অবশ্য পুরো ঘটনাটি এখন সাজানো সন্দেহ হয়। অপরাধী সেই যুবকর্মীটিকে দল থেকে তৎক্ষণাৎ তাড়িয়ে দেওয়া হয়, কিছুদিন বাদে সে ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা উক্ত মহিলার বিশ্বস্ততম অনুচররূপে নিজেদের জাহির করতে শুরু করে। আরও ধোঁকা লেগেছিল, বিশ্রী ব্যাপারটি ঘটবার মুহূর্তে কী করে এক নামজাদা দৈনিক পত্রিকার চিত্রগ্রাহক অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন, এবং ঝটপট অগুন্তি ছবি তুলে নিয়ে পরের দিন কাগজে ছাপিয়ে ছয়লাপ করে দিতে পেরেছিলেন, তা নিয়েও।

কিন্তু তাতে কী? যা ঘটলো তা তো কতগুলি জিনিশ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল: পার্টির কোনও-কোনও স্তরে কদর্যতা প্রবেশ করেছে, ঝাঁকে-ঝাঁকে সমাজবিরোধীও। কিছু-কিছু সংবাদপত্রে যে-বঙ্কিম কটাক্ষ করা হচ্ছিল— পূর্ববর্তী বছরে পুরসভা নির্বাচনে

বামফ্রন্টের জয় বহুলাংশে পেশীবলনির্ভর— তা-ও অন্তত আংশিক সত্য না মেনে উপায় রইলো না। একানব্বুই সালের নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতার মানুষ, রাগ পুষে ছিলেন, ঝেঁটিয়ে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন ; আমরা যে যেখানে যত প্রার্থী ছিলাম, সবাই হারলাম, জনগণ পার্টিকে শিক্ষা দিল।

নির্বাচনদ্বন্দ্বে আমার একটি বিশেষ অসুবিধার কথা কিন্তু উল্লেখ করতে হয়। সিদ্ধার্থ রায় সদ্য পঞ্জাবের রাজ্যপাল পদ ছেড়ে এসেছেন, তাঁকে পরিবৃত করে জেড পর্যায়ের দেহরক্ষী বাহিনী, লাল আলো-জ্বলা ভেঁপুর শীৎকারে আকাশবিদীর্ণ-করা গাড়ির পরে গাড়ির শোভাযাত্রা; অন্য দিকে আমি গো-বেচারা, ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত, চটিতে-পা- ঢুকোনো এলেবেলে ব্যক্তি। যে-রোমান্টিক ধারণা ঈষৎ মনে পোষা ছিল, সত্তর থেকে সাতাত্তর সালের মধ্যবর্তী সময়ের অকথ্য অত্যাচারের স্মৃতিতে দহিত হয়ে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গোটা ভবানীপুরে সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে ভোটের বাক্সে এককাট্টা হয়ে প্রতিবাদ জানাবেন, তা-ও আদৌ যথার্থ ছিল না। অতীত দিনের স্মৃতি কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে, এই সান্ত্বনাবাক্য ভুলে যাওয়া ভালো, প্রায় সবাই ভুলে যায় কয়েক বছরের মধ্যে।

ছত্রিশ

হেরে ভাবলাম, ফাঁড়া কাটলো, পশ্চিম বঙ্গের প্রশাসনিক সমস্যাদির সঙ্গে আর জড়িত হতে হবে না, নতুন করে ঝগড়াঝাঁটিতেও লিপ্ত হতে হবে না। পুরোপুরি ছাড়া পেলাম না। জ্যোতিবাবু সম্ভবত ভাবলেন, রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অনেক বিরূপ কথাবার্তা হচ্ছে, একটি কমিশন গঠন করে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা-বিশ্লেষণের ব্যবস্থা করলে মন্দ হয় না, তা ছাড়া এই ছাড়া গরুটি একেবারে তো নিরক্ষর নয়, ওঁকেই কমিশনের সভাপতি করে দেওয়া যাক। আমার অসম্মতি জানানোর বিশেষ সুযোগ ছিল না। এটাও তখন ভেবেছিলাম, কমিশনে কাজের সূত্রে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার যে অসম্পূর্ণতাগুলি আমাকে বহু বছর ধরে পীড়িত করছিল, রাইটার্স বিল্ডিং ছেড়ে আসার যা অন্যতম বড়ো কারণ, সে-সব নিয়ে ফের বিস্তৃত হবার সুযোগ পাবো।

প্রচুর পরিশ্রম করে মস্ত রিপোর্ট তৈরি করেছিলাম, প্রায় পুরোটাই নিজের লেখা, তবে প্রতিটি অধ্যায়ের প্রতিটি পঙ্‌ক্তি সদস্যদের দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেওয়া। কমিশনের কাজ চলাকালীন মাস-খানেকের জন্য অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম, তা হলেও সব মিলিয়ে সাত-আট মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করা সম্ভব হয়েছিল। একশো দশ কিংবা তারও কিছু বেশি সুপারিশে ঠাসা রিপোর্ট। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হলো, একটি-দু'টি বাদ দিয়ে সব ক'টি সুপারিশই গ্রহণ করা হলো, যথাবিহিত কার্যকর করা হবে। কিন্তু দয়িতের প্রতীক্ষা। কী উচ্চশিক্ষা, কী মধ্যশিক্ষা, কী প্রাথমিক শিক্ষা কিংবা প্রযুক্তিগত শিক্ষা বা সার্বজনীন শিক্ষা, কোনও ক্ষেত্রেই কমিশনের সুপারিশগুলির প্রতি যথেষ্ট মনঃসংযোগ করা হয়েছে বলে মনে হয় না। এবংবিধ বীতস্পৃহা, আমার কাছে অন্তত, মস্ত হেঁয়ালির মতো। রিপোর্ট দাখিল করবার আগে যথেষ্ট ভেবে-চিন্তেই সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করে নিয়েছিলাম, প্রস্তাবিত সুপারিশগুলির বিবরণ শুনে তাঁদের তো খুশি-খুশিই লাগছিল তখন। প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার পর সরকারের তরফে কেন এই ভাবগম্ভীর নীরবতা, ভেবে নির্ণয় করতে হিমশিম খেয়ে গেছি। রিপোর্টটি নিয়ে ভারতবর্ষের অন্যত্র নানা জায়গায় আলোচনা হয়েছে, জ্ঞানবান পত্র-পত্রিকাদিতেও হয়েছে, একমাত্র পশ্চিম বাংলাতেই সাড়াশব্দ নেই। কী উপলক্ষ্যে তিরুবনন্তপুরম গিয়েছি, ওখানকার এক পার্টি নেতা, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, অস্বস্তিকর প্রশ্ন করলেন : 'তোমার রিপোর্টটি তো পড়ে দেখেছি, আমাদের কাছে অতি উৎকৃষ্ট মনে হয়েছে। তবে বাংলা পার্টি ওটিকে চেপে রেখেছে কেন? কয়েকটি কপি পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে বেশ কয়েকবার চিঠি দিয়েছি, সাড়া নেই।' পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন ওঁদের পছন্দ হয়েছিল বলে আমাকে কেরল থেকে আমন্ত্রণ জানানো হলো, ওঁরাও একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করছেন, আমি যদি অনুগ্রহ করে তার সভাপতির আসন গ্রহণ করতে সম্মত হই। হলাম, ওখানে গিয়েও রিপোর্ট লিখলাম, অভ্যর্থনা পেলাম। কিন্তু স্বভূমিতে স্তব্ধতা অব্যাহত, আজ পর্যন্ত।

কিছু-কিছু সমস্যা আঁচ করতে পারি। বশ্যতা বনাম দক্ষতার প্রশ্নে কমিশনে তীব্র, স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছিল, তা সম্ভবত কারও-কারও অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ। স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নির্বাচনে উৎকর্ষের বিচার থেকে সরে আসা চলবে না, নির্বাচকমণ্ডলীর পছন্দ-অপছন্দ সর্ব ক্ষেত্রে মানতে হবে, মানদণ্ড প্রয়োগে যে কোনও প্রকার শ্লথতা অমার্জনীয়, ছাত্রদেরও শিক্ষকদের পড়ানোর মান নিয়ে অভিমত প্রকাশের অধিকার থাকবে, এরকম কিছু-কিছু সুপারিশ হয়তো অপছন্দের উদ্রেক করেছিল। এখন ভেবে দেখছি, তেমন মন খারাপ করবার বিশেষ অর্থ হয় না। গড়িয়ে-গড়িয়ে চলে আমাদের দেশ, সমাজ, গড়িয়ে-গড়িয়ে চলে রাজনৈতিক আন্দোলন, এমনকি বিপ্লবে-শপথ-নেওয়া রাজনৈতিক আন্দোলন পর্যন্ত। সবুরে মেওয়া ফলে, কিছু-কিছু বিষয়, যাদের প্রতি কমিশনের পক্ষ থেকে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, এই এতগুলি বছর বাদে সম্প্রতি নতুন করে আলোচিত হচ্ছে, সরকার একটু নড়েচড়ে বসেছেন। মণীশ ঘটকের বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি, 'অপেক্ষায় আছি বজ্রপাণি' : সেই প্রতীক্ষার ঋতু যদি এই এতগুলি বছরের ব্যবধানে অবসিত হয়, তা হলে তো আমার চরিতার্থ বোধ করা উচিত। সার্বজনীন শিক্ষার বিষয়ে অথবা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নির্বাচনে যোগ্যতার মাপকাঠিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার যে-কথা দশ বছর আগে বলেছিলাম, তা যদি এখন রূপায়িত হতে শুরু হয়, আমার তো না রেখে-ঢেকেই আনন্দ প্রকাশ কর্তব্য।

কমিশনের প্রতিবেদনে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের সাংগঠনিক সমস্যাগুলির উপর। মনে পড়ে সাতাত্তর সালে সরকারে ঢুকে এক প্রকাশ্য সভায় শিক্ষামন্ত্রীদের উদ্দেশ করে বলেছিলাম, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনুগ্রহ করে বাড়িয়ে চলুন; চুরি করে হোক, ডাকাতি করে হোক, টাকার ব্যবস্থা করে দেবো। কিন্তু প্রশ্ন তো শুধু বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানোরই না, বিদ্যালয়গুলিতে যথার্থ পঠন-পাঠন হয় কি না তা নিয়েও। যে-পার্টি সংগঠক কৃষক সভা করেন, পঞ্চায়েতের সঙ্গেও যুক্ত আছেন, আরও অসংখ্য দায়িত্বে হিমসিম খাচ্ছেন, তাঁকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ানোর দায়িত্ব দিলে কাজের কাজ কিছু না হবারই আশঙ্কা। শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে এক কাঁড়ি সুপারিশ দাখিল করা আছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃত্যের অগ্রাধিকার নির্ণয়ের সমস্যা কিন্তু এখনও ঝুলেই।

কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বাঙালি সমাজে প্রচুর ভাসা-ভাসা কথা হয়েছে, হচ্ছে। কমিশনের প্রতিবেদনে বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী থেকে কারিগরি শিক্ষার জন্য একটি আলাদা ধারা শুরু করার কথা বলা হয়েছিল। কেউ কান পেতেছেন বলে মনে হয় না।

দ্রুত শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার যে ব্যবস্থা দশ-পনেরো বছর আগে শুরু করা হয়েছিল, তাকে নীতিগত সমর্থন জানিয়েও কমিশন থেকে বলা হলো, সর্ব স্তরেই অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারভুক্ত সন্তানদের সেই সুবিধার বাইরে রাখা অনুচিত নয়, বিশেষ করে রাজ্য সরকারের যেহেতু ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। সুপারিশটি এতদিনে কার্যকর করা হচ্ছে সেটা সুলক্ষণ। অন্য পক্ষে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি মূলধন অনুপ্রবেশের কার্যকারিতা নিয়ে কমিশনের তরফ থেকে কিছু নাস্তিকতা প্রকাশ করা হয়েছিল; কর্তাব্যক্তিরা তা তেমন আমল দিয়েছেন বলে মনে হয় না, সম্ভবত দুটো কারণে : সরকারি তহবিলে অর্থাভাব, ও বিশ্বায়নের ঘোর।

একটি ছোটো ও একটি বড়ো আক্ষেপের কথাও বলতে হয়। কমিশনের সদস্যরা সবাই

সহমত পোষণ করেননি, কিন্তু সংখ্যাধিক্যের বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল, মাধ্যমিক পর্যায়ের কোনও স্তরে সংস্কৃত, বিকল্পে আরবি অথবা ফারসি, কয়েক বছরের জন্য অবশ্যপাঠ্য করা উচিত, মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও অন্তত একটি ধ্রুপদী ভাষার জন্য কিছু নম্বর আলাদা বরাদ্দ রাখা শ্রেয়: আমাদের এই সিদ্ধান্তের প্রধান যুক্তি, বাংলা ভাষা যেমন তৎসম-তদ্ভব ক্ষেত্রে সংস্কৃতনির্ভর, আরবি-ফারসির প্রভাবও আমাদের ভাষায় কম পরিব্যাপ্ত নয়, ভাষার গহনে প্রবেশ করতে হলে এ ধরনের ধ্রুপদাঙ্গ শিক্ষা জরুরি। অভিমত আমি বদলাইনি, কিন্তু হিন্দুত্বওলাদের ক্রমবর্ধমান আস্ফালনের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার এই বিশেষ সুপারিশটি গ্রহণ করতে সম্মত হননি, মনে হয় আপাতত ভালোই হয়েছে।

আমার বৃহত্তর কাতরতা অন্যত্র। বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার বছর দেড়েকের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পঠন বন্ধ করে তা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে শুরু করবার নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। সিদ্ধান্তটিতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা তো বটেই, বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অনতিতুচ্ছ অংশও, রেগে কাঁই। এত বড়ো আস্পর্ধা, বিদ্যালয়শিক্ষা অবৈতনিক করা হচ্ছে, অথচ আমাদের ঘরের ছেলেরা সরকারের পয়সায় একেবারে গোড়া থেকে ইংরেজি শেখার সুযোগ পাবে না, তা কি হয় নাকি? কলকাতা জুড়ে আন্দোলনের তোড়, ইংরেজি ভাষা সংকোচন-না সংকুচন-বিরোধী বহু সমিতির উদ্ভব; সমাজের নিচুতলার মানুষ বাড়তি সুযোগ-সুবিধা পাবেন, উচ্চতর শ্রেণীভুক্তদের অসুবিধা ঘটিয়েই পাবেন, এটা যাঁরা কিছুমাত্র পছন্দ করেন না, তাঁদের ঘোঁট-জোট-মহাজোট। কোনও-কোনও বামপন্থী মহলে পর্যন্ত ঈষৎ ঘাবড়ে যাওয়া অবস্থা। বাড়তি সমস্যা দেখা দিল, নতুন ব্যবস্থায় ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ভালোভাবে ইংরেজি শেখানোর জন্য যে সমস্ত পাঠ্যবই তৈরি হলো, তারা অতি বিদঘুটে। বৃটিশ সরকারের অর্থানুকূল্যে বিলেতে-ভাষা-পড়ানোর-পদ্ধতিতে-তালিম-নেওয়া কতিপয় বিশেষজ্ঞকে দায়িত্ব দেওয়া হলো শিক্ষকদের ইংরেজি ভাষায় প্রণালী-পদ্ধতি শেখাবার, বাঙালিদের কলোনি-মুগ্ধতা তো চট করে ঘোচবার নয়। এই বিলিতি উটকো পদ্ধতি আমদানির ফলে হিতে বিপরীত হলো, শিক্ষকদের যথাযোগ্য শিক্ষণব্যবস্থার ক্ষেত্রে আরো বেশি ত্রুটি-দুর্বলতার অনুপ্রবেশ ঘটলো।

বিশদ আলোচনা করে কমিশনের অধিকাংশ সদস্য মত দিলেন, ষষ্ঠ শ্রেণীর বদলে পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরেজি পড়ানো শুরু করা যেতে পারে, তবে সেই সঙ্গে প্রয়োজন পাঠ্যপুস্তক নতুন করে রচনা এবং ইংরেজি ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতির আমূল সংশোধন। রাজ্য সরকার প্রস্তাবটি আপাত দৃষ্টিতে মানলেন, সেই অনুযায়ী কিছু-কিছু প্রাথমিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হলো, কিন্তু স্বার্থান্বেষী সম্প্রদায় রণে ভঙ্গ দিলেন না, আক্রমণের অস্ত্র শানিয়ে যেতে লাগলেন। এক যুগেরও অধিক আগে রাইটার্স বিল্ডিং থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছি, সুতরাং সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ-বর্জনের কলালিপির সঙ্গে এখন আর পরিচিত নই। বিভিন্ন কারণে বামফ্রন্ট আশি ও নব্বুইয়ের দশকে কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলে জনসমর্থন কিছু হারিয়েছেন, পরিণামে আত্মবিশ্বাসও খুইয়েছেন খানিকটা। হঠাৎ নব্বুই দশকের উপান্তে ইংরেজি শিক্ষার ধারাক্রম পুনর্বিবেচনার জন্য এক-সদস্যের একটি কমিটি গড়া হলো, কমিটির পক্ষ থেকে নমুনা সমীক্ষার আয়োজন, প্রধানত শহুরে অভিভাবক ও মাস্টারমশাইদের মতামত যাচাইয়ের জন্য। মস্ত তাড়াহুড়ো করে নতুন ফরমান জারি হলো, এখন থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরেজি পঠন শুরু। একবার চাপের কাছে নতি স্বীকার করলে চাপ বাড়তেই থাকে; এখন শুনতে পাচ্ছি, প্রথম শ্রেণী থেকেই ইংরেজি ফিরিয়ে আনা যায় কিনা তা নিয়ে

ভাবনাচিন্তা চলছে, হয়তো ফের একটি কমিটি বসবে।

আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এর চেয়ে শোকান্তিক সিদ্ধান্ত কিছু হতে পারে না। যদিও হালে অবস্থার কিছু মোড় ফিরেছে, তা হলেও পশ্চিম বাংলায় এখনও জেঁকে-বসা নিরক্ষরতা সমস্যা, বিশেষত মহিলাদের মধ্যে। সার্বিক সাক্ষরতা নিয়ে কিছুদিন ধরে দেশ জুড়ে, এবং পশ্চিম বাংলায়, প্রচুর শোরগোল হচ্ছে, তবে কাজের কাজ তেমন এগোচ্ছে বলে মনে হয় না। এই জেলায়-ওই জেলায় কোনওক্রমে 'বর্ণপরিচয়' শিখিয়ে বিরাটসংখ্যক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে সাক্ষর করে তোলা হয়েছে বলে দাবি করা হয়, কিন্তু যাঁদের তালিম দেওয়া হলো, নিয়মিত ধারাবাহিক চর্চার অভাবে তাঁরা সহজেই ভুলে মেরে দেন। শিশুদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও ব্যাপক। প্রাথমিক স্তরে যে বালকবালিকারা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, তাদের বিপুল অংশ আসে শহর-শহরতলি-গ্রামের দরিদ্রতম পরিবারসমূহ থেকে। তাদের পিতামাতা বেশির ভাগই অক্ষরবিহীন, দৈন্যের পীড়নে তারা দীর্ণ, লেখাপড়ার পরিবেশ তাদের কাছে সুদূরবর্তী মরীচিকা। এই অবোধ শিশুদের উপর প্রাথমিক স্তর থেকে দু'টি ভাষার—মাতৃভাষা ও ইংরেজির—ভার চাপালে তারা তা বহন করতে পারবে না। তারা ভ্যাবাচ্যাকা খাবে, দু'টি ভাষার কোনওটিই কাজ-চালানো গোছেরও শিখে উঠতে পারবে না। তথ্য এমনিতেই বলে, পশ্চিম বাংলায় যে প্রায় নব্বুই লক্ষ ছেলেমেয়ে প্রতি বছর প্রাথমিক শ্রেণীতে ভর্তি হয়, মাধ্যমিক পরীক্ষার লগ্নে তাদের সংখ্যা নেমে দাঁড়ায় মাত্র পাঁচ-ছয় লক্ষে, অধিকাংশের বিদ্যোদম মরুপথে হারিয়ে যায়। এই ভয়ংকর অবস্থার একাধিক কারণ উল্লেখ সম্ভব। তবে দারিদ্র্যই সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। প্রাথমিক স্তরে ফের জমিয়ে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন ঘটলে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যাস্থলে অবস্থানের পিরামিড সংকীর্ণতর হতে বাধ্য।

যে-কথা ইতিপূর্বে বহু প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি, বাঙালি মধ্যবিত্ত আষ্টেপৃষ্ঠে সামন্ততান্ত্রিক লক্ষণে বাঁধা। গরিবরা দুটো ভাষা সামলাতে পারবে না, তাতে কী, আমাদের ছেলেমেয়েরা তো পারবে; একেবারে গোড়া থেকে তারা ইংরেজিতে তালিম না-পেলে বিভিন্ন সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না, বিশ্বায়নের দৌড়েও পিছিয়ে পড়বে। প্রধান-প্রধান সংবাদপত্রগুলিরও একই রা। এঁদের যদি বলা হয়, একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন না, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে কী ব্যবস্থা, তাঁরা পাশ কাটিয়ে যাবেন। শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি দেওয়া হয়েছে, নব্বুই দশকের প্রথম দিকে একমাত্র তামিলনাড়ু ব্যতীত অন্য কোনও বড়ো-সড়ো রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পড়ানো হতো না; গুজরাটে আবশ্যিক ইংরেজি পড়ানো শুরু মাত্র নবম শ্রেণী থেকে। তবে এ-সমস্তই অরণ্যে রোদন। যাঁরা শ্রেণীস্বার্থান্ধ, এবং যাঁরা শ্রেণীস্বার্থান্ধদের ভয়ে ভীত, তাঁদের অবিমৃষ্যকারিতা কে ঠেকাবে?

প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া প্রয়োজন, তবে তার আগে অন্য একটি ক্ষুদ্র মন্তব্য সংযোজনের লোভ সংবরণ করতে পারছি না। শিক্ষা কমিশনের সূত্রে একজন-দু' জন ব্যক্তির সংস্রবে আসতে হয়েছিল, যাঁদের মানসিকতা অতি বিচিত্র, তাঁরা গাছেরটাও পাড়বেন, তলারটাও কুড়োবেন। কে জানে, হয়তো এটাই যথার্থ সমাজদর্পণ।

সাঁইতিরি

আশির দশকের শেষ অধ্যায় থেকে শুরু করে পরবর্তী বছরগুলি আমার কাছে বিষাদের ঘন কুয়াশায় মোড়া; মৃত্যুশোকের মিছিল। কয়েকজন প্রিয়জনের বিয়োগের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। খুরশীদ অস্ট্রিয়াতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত, কঠিন পীড়ায় ভুগে-ভুগে সে-ও অবশেষে বিলীন হয়ে গেল। আমি তো তা হলেও তার মৃত্যুর কয়েক মাস আগে কানাডা থেকে ফিরে আসবার পথে ভিয়েনায় নেমে তার সঙ্গে দেখা করে এসেছিলাম, আমার স্ত্রীর সেই সুযোগটুকুও ঘটলো না। প্রায় চল্লিশ বছর তার সঙ্গে স্নেহপ্রীতির নিগড়ে জড়িয়ে ছিলাম; তার মৃত্যুসংবাদে দু'জনেরই মনে হলো সত্তার খানিকটা যেন ধ্বসে পড়লো। খুরশীদের জীবন সুখের হয়নি, কয়েক বছর আগে আমাকে সখেদে জানিয়েছিল, সব-কিছুই তার কাছে এখন অর্থহীন; তার শরীরে একাধিক জটিল ব্যাধি বাসা বেঁধেছে, আমেরিকায়, ইওরোপে বহু চিকিৎসা করিয়েছে, ক্রমশ শীর্ণ থেকে শীর্ণতরা, কয়েক সপ্তাহ সামান্য হয়তো ভালো, তার পরেই আবার অবস্থার অবনতি। এমনি করেই তার জীবনের শেষ বছর পনেরো কেটেছে। প্রথাগত আধুনিক চিকিৎসায় উপকার না পেয়ে সে হাকিমি-ইউনানির শরণাপন্ন হয়েছে; আমাদের লিখেছে, কোনও কবিরাজের সঙ্গে পরামর্শ করে ওষুধ পাঠাতে পারি কি না। পারিবারিক বন্ধু কলকাতার এক খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকের কাছ থেকে নির্দেশ নিয়ে ওকে ওষুধের বিবরণ পাঠিয়েছি। তবে সব কিছুই বিফল হলো। ঈশ্বর সম্পর্কে বীতরাগের অনেক কারণ দাখিল করতে পারি; তবে সবচেয়ে উপরে ঠাঁই দেবো এই আর্ত অভিমান : খুরশীদের মতো এমন ধর্মপ্রাণা দয়াবতী স্নেহশীলা মহিলাকে কেন এমন দুঃসহ শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জীবনের শেষের বছরগুলি কাটাতে হলো, তার কোনও সদর্থক উত্তর আজ পর্যন্ত পাইনি। ওর মৃত্যুর পর মুম্বইয়ের এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় আবেগাচ্ছন্ন একটি স্মরণিকা লিখেছিলাম, সঙ্গে ছাপতে দিয়েছিলাম ওঁর বিবাহ-দিবসের হাস্যোজ্জ্বল আনন্দ-ঝলমল ছবি, যে-ছবির দিকে তাকিয়ে হৃদয়ের মোচড়ানি আরও বাড়ে। লেখাটি বেরোবার পর পাকিস্তান থেকে একাধিক ধন্যবাদজ্ঞাপক চিঠি পাই, হয় তাঁর কোনও ছাত্রীর, নয়তো কোনও সহকর্মীর। ছেলে কামাল পড়াশুনোয় তেমন দড় নয়, খুরশীদের তা নিয়েও প্রচুর চিন্তা ছিল। এখন কামাল কোথায় কীভাবে আছে, কিছুই জানি না। তবে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়ার পর আর একটি প্রবন্ধ লিখি, যে কামালকে বহুদিন দেখি না, যার স্মৃতিতে আমি সম্ভবত আর অবশিষ্ট নেই, তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে।

মৃত্যুরা যখন আসে, সারি বেঁধেই আসে। খুরশীদের প্রয়াণের সন্নিকট সময়ে কলকাতায় আমার অতি কাছের মানুষ এক মহিলা, অর্ধ শতাব্দী ধরে যাঁকে গৌরীবৌদি বলে সম্বোধন করেছি, বেশ কয়েক বছর কর্কট রোগে ভুগে কঙ্কালসমা, তিনিও জীবনের নির্দয়তা থেকে উদ্ধার পেলেন। বন্ধু বাচ্চুর জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া, যখন নববধূ হয়ে ওদের ঢাকাস্থ টিকাটুলির বাড়িতে গৌরীবৌদি প্রবেশ করলেন, প্রায় কিশোরীই বলা চলে, আমাদের চেয়ে বয়সে

সামান্য মাত্র বড়ো। আমুদে, সদাহাস্যময়ী, সমস্ত ব্যক্তিত্ব থেকে স্নেহ বিচ্ছুরিত হচ্ছে, আমাদের আড্ডায় গৌরীবৌদি বন্ধুর মতো মিশে গিয়েছিলেন। যতদিন কলকাতায় পাকা ডেরা বাঁধিনি, কাশী থেকে, দিল্লি থেকে, লখনউ থেকে, কিংবা বিদেশের এ প্রান্ত-ও প্রান্ত থেকে, দমকা হাওয়ার মতো একদিন-দু'দিনের জন্য কলকাতায় হাজির হয়েছি, বাচ্চুদের রাসবিহারী এভিনিউ বা রাজা বসন্ত রায় রোডের বাড়িতে কখনও-কখনও রাত্রিবাস করেছি, আবিষ্কার করেছি গৌরীবৌদির আত্মীয়তাবোধ থেকে অভিন্ন তাঁর আতিথেয়তা। বাচ্চুদের বাড়ির সবাইর গানবাজনার নেশা, নানা ধরনের শখ, ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা ব্যবসায়ে নেমে : গৌরীবৌদি সব-কিছুর সাক্ষাৎ শরিক। শেষের দিকে লেক মার্কেটের উল্টো পাড়ে, যেখানে ফুলওলাদের আস্তানা, একটি বাড়ির দোতলায় রেস্তরাঁ খুলেছিলেন, সকাল-বিকেল চায়ের আয়োজন, দুপুরে-রাত্তিরে খাঁটি বাঙালি রান্না পরিবেশন। রেস্তরাঁটি এখনও আছে, গৌরীবৌদি নেই : জীবনে অনেক আনন্দের দিনের জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

একই ঋতুতে চলে গেলেন লখনউ জীবনের পরম শুভানুধ্যায়ী বিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়। কয়েক মাস বাদে ছায়ামাসি, ধূর্জটিপ্রসাদের মৃত্যুর পর এই এতগুলি বছর যিনি আমাকে আদরে ঢেকে রেখেছিলেন। একানব্বুই সালে যে-নির্বাচনে আমি সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের কাছে হেরে ভূত হই, তার একটি স্মৃতি আমাকে অপরাধবোধে এখনও আনত করে : গ্রীষ্মের ঝাঁ-ঝাঁ রোদে প্রায় নব্বুই-উত্তীর্ণা ছায়ামাসি লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন, আমাকে ভোট দেবেন।

শরীরের উপর বহু বছর ধরে অনেক অত্যাচার করেছেন রবি সেনগুপ্ত, আশির দশকের গোড়ায় কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। চিকিৎসকরা প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, আমরা এক ঝাঁক বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়পরিজন হাসপাতালের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে প্রত্যহ অনিশ্চিত প্রহর গুণি, মনে-মনে নিজেদের তৈরি করি চরম দুঃসংবাদের জন্য। একমাত্র ঘোর আশাবাদী জোছন দস্তিদার, এক সন্ধ্যায় সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠলো : 'না, রবিদা যানেওয়ালা পার্টি না'। তার কথাই ফললো, সেই যাত্রায় রবি সেনগুপ্ত বেঁচে উঠলেন। দশ বছর বাদে ফের দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে, এবার জোছন দস্তিদারের প্রত্যয় ব্যর্থ। রবি সেনগুপ্তর উপর বিরক্ত এমন লোকের অভাব নেই; বিরক্তি উদ্রেক করবার মতো ইন্ধন ভদ্রলোক, না মেনে উপায় নেই, অনেক জুগিয়েছেন। বদমেজাজি, যে-কোনও উপলক্ষ্যে বা উপলক্ষ্যহীনতায় এঁর-ওঁর-তাঁর সঙ্গে ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হতে সদা-প্রস্তুত, রাজনৈতিক গোঁড়ামি, সেই গোঁড়ামি চরিতার্থ করতে যতদূর পর্যন্ত যাওয়া যায়, তাঁর যাওয়া। অথচ এই মানুষটিই পরোপকার করবার জন্য সর্ব ঋতুতে মুখিয়ে থাকতেন : ক-কে ধরে খ-র জন্য চাকরি জোটানো, খ-কে ধরে গ-র জন্য ঘ-র কাছ থেকে একটি প্রশংসাপত্র সংগ্রহ, ঙ-র কাছ থেকে জ-র জন্য ক্রিকেট খেলার টিকিট জোগাড় করে দেওয়া, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে মধ্যরাত্রিতে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছেন যে-মহিলা, তাঁর জন্য বিকল্প ডেরা খুঁজে দেওয়া : রবি সেনগুপ্তর মতো এমন পুরোপুরি অপেশাদারি, পুরোপুরি অবৈতনিক পরপরিত্রাতা আমার অভিজ্ঞতায় দ্বিতীয় দেখিনি। তাঁর রুক্ষ বহিরাবরণ থেকে যা অনুমান করা সম্ভব ছিল না, গভীর কবিতাপ্রেমিক, সংগীতপ্রেমিক, নাটকপ্রেমিক, সাহিত্যপ্রেমিক, ধ্রুপদী সংগীতের অঢেল খবর রাখতেন, রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তী কবিদের রচনা থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্ভুল আবৃত্তি করে যেতে পারতেন, আর নাটকের নেশায় তো ঘরছাড়াই হয়েছিলেন। সবচেয়ে যা উল্লেখ্য, তা তাঁর বন্ধুবাৎসল্য :

তাপস সেনদের কাছ থেকে আমার এই উক্তির সমর্থন মিলবে। পুরনো রেকর্ড স্তূপ করে এনে রবিবার বা অন্য কোনও ছুটির দিনের শিথিল সময়ে আমরা একত্র বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শোনায় ডুবে থেকেছি; রবি সেনগুপ্তর মৃত্যুর পর আমার সংগীত-শ্রবণের ঋতু-অবসান। এখন রবি সেনগুপ্ত নেই, তাঁকে যেতে-না-দেওয়া জোছন দস্তিদারও নেই।

মাস্টারমশাই অমিয় দাশগুপ্তর খুব শখ ছিল, অন্তত নব্বুই বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন : আমরা নিশ্চয়ই সেই উপলক্ষ্যে তাঁকে অভিনন্দন জানাব, অভিনন্দনের ধরন-ধারণ কী হবে তার বিশদ বিবরণ জানতে চেয়ে আমাদের কাছে প্রায়ই তাঁর কৌতুকী প্রশ্ন। তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো না, বিরানব্বুই সালের জানুয়ারি মাসে শান্তিনিকেতনে গত হলেন। গুরুপত্নীর নির্দেশে আমি আর অশোক রুদ্র মিলে মুখাগ্নি করলাম। ধনবিজ্ঞানে তদ্গতপ্রাণ, এই মুহূর্তে বাইরের পৃথিবীতে কী ঘটছে-না ঘটছে তা নিয়ে আপাত-আগ্রহহীন, অমিয়বাবু নিজস্ব মূল্যবোধে তথাচ অনড়। ছেলে সুবিখ্যাত ধনবিজ্ঞানী, প্রায় বিদেশী বনে গেছে, মেয়েরও দূরবর্তী ভিন রাজ্যে ব্যস্তসমস্ত জীবনযাপন। তিনি নিজে কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিখাদ বাঙালি ছিলেন, বাংলা ভাষায় কিছু লেখবার অনুরোধ জানালে সানন্দে রাজি হয়ে যেতেন। শেষের দিকে কানে শুনতে পেতেন না, তাই নাটক দেখে আর রস সঞ্চার হতো না, অথচ শম্ভু মিত্র-উৎপল দত্তের প্রচণ্ড অনুরাগী। শান্তিনিকেতনে কয়েক মাস শম্ভু মিত্র তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন, শম্ভুবাবুর সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতার বিবরণ আমাকে মাঝে-মাঝেই শোনাতেন। শেক্সপিয়রের নাটকেরও অসম্ভব ভক্ত, যতবার বিদেশে গেছেন, প্রায় হন্যে হয়ে ঘুরে লরেন্স অলিভিয়ের-জন গিলগুড-র‍্যালফ রিচার্ডসনদের অভিনয় দেখেছেন। শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথের গানে বিভোর, সুগায়ক-সুগায়িকার সন্ধান পেলে তাদের অব্যাহতি নেই। ফুলের মরশুমে নিজের হাতে বাগান করতেন, তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে দেখি, বাড়ির সম্মুখবর্তী মাঠ নানা রঙের, নানা জাতের, নানা আকারের গোলাপে ছেয়ে আছে। শান্তিমাসিমাকে তাঁর মেয়ে নিজের কাছে বরোদাতে নিয়ে যত্নে রেখেছিল। মহিলা অ্যালজাইমার রোগের শিকার, স্মৃতিশক্তি এলোমেলো, কয়েকবার ওই শহরে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি, প্রতিবার গাঢ়তর অবসাদ নিয়ে ফিরেছি। কয়েক মাস হলো তিনিও প্রয়াত। পরলোকে বিশ্বাস করি না, ঈশ্বরচিন্তা অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়, তা হলেও জীবনে যা হলাম, যা পেলাম, সমস্ত-কিছুর জন্যই তো কারও-না-কারও কাছে আমরা ঋণী : আমার সর্বাধিক ঋণ গুরু ও গুরুপত্নীর কাছে।

অশান্ত অশোক রুদ্র, চিরপ্রেমিক অশোক রুদ্র, সদা-গর্বিত অশোক রুদ্র, এত রোগ তার শরীরে বাসা বেঁধেছিল, তার দুর্মর প্রাণশক্তিও তাকে বাঁচাতে পারলো না। জীবনানন্দের পঙ্‌ক্তিটি তার সম্পর্কেই আমার কাছে সবচেয়ে যথাযথ মনে হয় : এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।

সুদূর কানাডা থেকে মন গভীর বিষণ্ণ করে দেওয়ার মতো আরও খবর। পরেশ চট্টোপাধ্যায় দেশ ছাড়ার পর কিছুদিন অ্যামস্টার্ডামে, কয়েক বছর বাদে মন্ট্রিয়েল চলে যান ওখানকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়ে, সঙ্গে সাবিত্রী ও শিশুকন্যা সুপূর্ণা, যার সঙ্গে আমার ভীষণ ভাব, যে আমাকে 'ঘনশ্যাম' বলে ডাকে। সাবিত্রী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মনীষাসম্পন্না, বিদেশী ডিগ্রীধারিণী, একদা অন্ধ্র প্রদেশে জনবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তার মনটা দেশে পড়ে আছে, ফেরার জন্য প্রহর গুণছে। মনে হয় ফিরে আসার ব্যাপারে পরেশের বরাবরই দ্বিধাবোধ ছিল। ওদের যাতে এক সঙ্গে এক জায়গায় কাজ হয়, বহুবার সেই চেষ্টা

করেছি। সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছিল, প্রথমে তিরুবনন্তপুরমে, পরের বার শান্তিনিকেতনে; উভয় ক্ষেত্রেই শেষ মুহূর্তে পরেশের পিছিয়ে যাওয়া। বিদেশে আদৌ মন টেকে না, সাবিত্রী হতাশ থেকে হতাশতর, প্রায়ই আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত, ক্রন্দনসিক্ত চিঠি পাঠায়। হঠাৎ একদিন নিদারুণ দুঃসংবাদ, সাবিত্রী মন্ট্রিয়েলে ট্রেনের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে; হয়তো মায়ের শোকে, হয়তো বাবার উপর অভিমানে, কিংবা অন্য কোনও কারণে সুপূর্ণা বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেছে, আজ পর্যন্ত আর তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। সুরেলা গলায় আমাকে আর কেউ 'ঘনশ্যাম' বলে সম্বোধন করবে না।

নিকষ পদার্থবিজ্ঞানী বা অর্থনীতিবিদ হয়ে খুব বেশিদিন টেকা যায় বলে আমি বিশ্বাস করি না। যাঁরা তা হলেও টিকে থাকেন, তাঁরা আমার কাছে তেমন আকর্ষণীয় চরিত্র নন, একটাই তো জীবন, অনেক ঘাটের জল না-খাওয়ার চেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার কিছু হতে পারে না; যেটুকু বরাদ্দ সময়, পরিপূর্ণ ব্যবহার না করা মহাপাতক। আমার সুতরাং বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় সময়হেলনের জন্য বিবেকদংশন নেই। হইহই করে ক্রিকেট খেলা দেখতেও নেই, পরনিন্দা-পরচচার্য়ও নেই, অথচ তারই পাশাপাশি রক্তে-ধমনীতে এই বিশ্বাস প্রোথিত, সমাজে জন্ম, সমাজ থেকে হাত পেতে উপচার গ্রহণ করেছি, বিনিময়ে সমাজকে কিছু অন্তত দিতে হবে; পড়শিদের থেকে শুধু হাত পেতে নেবোই না, তাঁদের দেবোও। এবং সেই কারণেই আমার রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকার অন্তঃস্থিত আকৃতি, যা কবি-সাহিত্যিক বন্ধুদের বিবমিষা উদ্রেক করে। তাঁরা ভেবে পান না যে লোকটা তাঁদের সঙ্গে মিশে গিয়ে ফক্কুরি করছে, কিংবা সুচিত্রা মিত্র-জর্জ বিশ্বাসের গাওয়া গানের উন্মাদনায় ভেসে গিয়ে উথালপাথাল হচ্ছে, জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে'র কাব্য থেকে পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি আপাতঅবলীলায় আবৃত্তি করছে, সে কী করে রাজনীতির পঙ্কিল গহ্বরে স্বেচ্ছানিপতিত হয়। প্রথম-প্রথম আঁটঘাট বেঁধে যুক্তির সারণি সাজিয়ে তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করতাম, সবাই যাতে কবিতা উপভোগ করবার, গান শোনবার, খেলা থেকে আনন্দ সংগ্রহের সুযোগ সমানভাবে পেতে পারেন, সেজন্যই, যাকে তাঁরা নোঙরা রাজনীতি বলেন, তাতে আমার মজে থাকা। তবে একটা স্তরের পর প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের, আমার ধারণা, যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না, তাঁরাও তাঁদের মতসমর্থক সুগঠিত যুক্তির মালা বিস্তার করে আমাকে শিক্ষিত করতে এগিয়ে আসবেন, নীট ফল অতএব শূন্য। সুতরাং মেনে নেওয়া ভালো আমরা ধেড়ে মানুষেরা বৃথাই পরস্পরকে জ্ঞান থেকে উচ্চতর জ্ঞানমার্গে ঠেলবার চেষ্টা করি; শেষ পর্যন্ত নিজেদের বিশ্বাসের খুঁটি আকড়ে ধরে থাকি প্রত্যেকেই। কবিবন্ধুরা তাই তাঁদের কাব্যচর্চায় তন্নিষ্ঠ থাকবেন, আমি নিমগ্ন থাকবো আমার বাউণ্ডুলেপনায়; উপর্যুপরি মৃত্যুশোকে বা অন্যান্য বিষণ্ণ অভিজ্ঞতার যে অনিবার্যতা এই সত্তরোত্তর জীবনে না মেনে উপায় নেই, তা মেনে নিয়েই অস্থিতিতে স্থিত থাকবো।

তবে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নানা জায়গায় ইঙ্গিত দিয়েছেন, বা প্রতীতি ব্যক্ত করেছেন, আমরা নিরন্তর নিজেদের ছাড়িয়ে যাই। যে কবিতাপ্রেমে শৈশব থেকে ডুবে ছিলাম, ষাটের কোঠায় পৌঁছে একটু-একটু করে বুঝতে পারলাম, তা আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে। না কি আমিই কবিতার পারিজাতভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে বিচ্ছিন্নতর হচ্ছি? কবিতা যেন আখড়ায় পরিণত হয়েছে, এক কবির আঙ্গিক-রীতি-ভাষা-প্রয়োগকে অন্য আর এক কবির মুদ্রাদোষ থেকে পৃথক করা যাচ্ছে না, যেন সম্মিলিত প্রেতস্বরের ঐক্যতান চলছে। অর্থনীতিবিদ সম্প্রদায়ের মতো, কবিকুলও নিজেদের নিয়ে মজে আছেন, একে অপরকে সম্ভাষণ জানাচ্ছেন : তুমিও দুর্দান্ত

কবিতা লিখছো, আমিও লিখছি; পরস্পরে প্রশান্ত বাহবা। কিছুদিন আগে এক মারাত্মক *কাহিনী শুনেছিলাম : কোনও বিখ্যাত পত্রিকার শারদীয়* সংখ্যায় এক কবির কবিতার মুড়ো নাকি আর এক কবির রচনার লেজের সঙ্গে তালগোল করে ছাপা হয়েছে, দ্বিতীয় কবির কবিতার মুড়োর সঙ্গে প্রথম কবির কবিতার লেজ, কিন্তু উভয় কবিই বেশ কিছুদিন এই ভ্রান্তিবিলাস আবিষ্কার করতে পারেননি। হয়তো গপ্পোই, কিংবা অতিরঞ্জন তা হলেও কাহিনীটির প্রতীকী ব্যঞ্জনা অস্বীকার করা আদৌ সম্ভব নয় : কবিদের আর আলাদা করে চেনা যায় না। ব্যতিক্রম যে নেই তা আদৌ বলছি না। আমার অন্যতম প্রিয় রচনা তারাপদ রায়ের 'দারিদ্র্য রেখা' : খাঁটি কবিতা, কবিকে তাঁর বিশিষ্টতায় প্রোজ্জ্বল করে চেনানো কবিতা, অথচ যার বাচনিক সারাৎসার পেল্লাই-পেল্লাই অর্থনীতিবিদদের গালে চড় মেরে জনগণের উচ্ছ্বসিত তারিফ কুড়োবেই। পণ্ডিত-পণ্ডিত অর্থশাস্ত্রবিদরা আমাকে শূলে চড়াবেন, কিন্তু আমি আদৌ ভড়কাবো না, তাঁরা জটিল অঙ্ক কষে প্যাঁচালো সন্ধ্যাভাষায় লম্বা-লম্বা প্রবন্ধ-বই লিখে দারিদ্র্যের সমস্যা নিয়ে হাজার কাহন যা বলেন, তারাপদ এই ছোটো কবিতায় তার মর্মবস্তু জল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, পণ্ডিতরা তাঁদের সামগ্রিক চর্চায়ও যা পারেননি। অথচ সমসাময়িক অন্য অধিকাংশ গা-গুলোনো কবিদের সম্পর্কে আমার অনীহার ব্যাপ্তি সুদূর।

যে-মাসগুলি আমি শিক্ষা কমিশন নিয়ে ব্যাপৃত, দেশের অর্থব্যবস্থায় মস্ত ওলটপালট ঘটলো। রাজীব গান্ধি অর্থনীতির বিন্দুবিসর্গও বুঝতেন না, কিন্তু চুরাশি সালের নির্বাচনে এত ভালোভাবে জিতলেন, ওঁর দৃঢ়বদ্ধ ধারণা জন্মালো দাদু বা মাতৃদেবীর চেয়েও জনগণের বেশি আস্থা তিনি অর্জন করতে পেরেছেন, এবার তাঁর খেয়াল কী করে এই হতচ্ছাড়া গরিব দেশটাকে দ্রুততম উপায়ে মার্কিন মুলুক বানিয়ে তোলা যায়। মন্ত্রিসভায় তাঁর যাঁরা বয়স্য, তাঁরাও প্রায় সবাই রাজা-মহারাজা বংশভুক্ত, বা টাকাওলা ব্যবসাদার পরিবারের। সবাই মিলে স্থির করলেন, ভারতবর্ষের অর্থব্যবস্থাকে দক্ষতম, আধুনিকতম করে তুলতে হবে, বিদেশ থেকে অঢেল যন্ত্রপাতি, নতুন প্রযুক্তি আমদানি করে কৃষি ও শিল্পের উৎপাদনকাঠামো খোলনল্‌চে পাল্‌টে দিতে হবে। তাঁদের বাড়তি বাই চাপলো : দেশের বড়োলোকরা পুঁজির পাহাড়ের উপর বসে আছেন, সেই পুঁজি না খাটাতে পারলে জাতীয় অর্থব্যবস্থার সন্তোষজনক বিকাশ অসম্ভব; অতএব সর্ব উপায়ে পুঁজিওলা শ্রেণীগোষ্ঠীর মন ভেজাতে হবে। তাঁদের আরও সিদ্ধান্ত, স্বাধীনতার পর থেকে চালু মান্ধাতা আমলের যে-আমদানি-রফতানি নীতি—বিদেশ থেকে যাবতীয় বিলাসদ্রব্য আনা বন্ধ, বৈদেশিক মুদ্রা টিপে-টিপে খরচ করা, বেসরকারি মালিকদের বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের ক্ষেত্রে কঠোর কৃচ্ছ্রপ্রয়োগ— সব-কিছুর আমূল পরিবর্তন অবশ্যকর্তব্য। যে-পাঁচ বছর রাজীব গান্ধি প্রধান মন্ত্রী, ঢালাও আমদানির এই ব্যবস্থা অব্যাহত। ফল দাঁড়ালো ভয়ংকর। এতদিন প্রতি বছর দেশের আমদানির বহর ছিল জাতীয় আয়ের বড়ো জোর পাঁচ শতাংশ; ১৯৮৯ সাল নাগাদ তা বেড়ে দাঁড়ালো জাতীয় আয়ের প্রায় দশ শতাংশের কাছাকাছি; যেহেতু রফতানির পরিমাণ বাড়লো না, বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি প্রকট থেকে প্রকটতর। ততদিনে নতুন-নতুন পরামর্শদাতা জড়ো হয়েছেন প্রধান মন্ত্রীর চারপাশে, তাঁরা বললেন, কুছ পরোয়া নেই, আন্তর্জাতিক বাজারে টাকা ধার করলেই তো হয়, আমরা তো এতদিন বিদেশ থেকে-যা কিছু ঋণ নিয়েছি প্রায় সমস্তই বিদেশী সরকার ও আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলি থেকে, তার বাইরে তেমন ঋণ নিইনি, আমাদের অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে খোলা

বাজারে যথেষ্ট আস্থার ভাব আছে, ধার পেতে অসুবিধা হবে না। হলোও না। দেদার টাকা বিদেশে ধার করা হলো, ওই চার-পাঁচ বছরে সামগ্রিক বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে গেল। ঋণ করে ঘৃত সম্ভোগের প্রক্রিয়ায় একটি গেরো আছে, বিশেষত স্বল্প বা মাঝারি মেয়াদের ঋণের ক্ষেত্রে; কয়েক বছরের মধ্যে সুদসমেত ঋণের টাকা কিস্তিবন্দী ফেরত দিতে হয়, তখন দেশের সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারে টান পড়ে। একানব্বুই সালের মধ্যমুহূর্ত, রাজীব গান্ধির হত্যার প্রভাবে আর এক দফা 'সহানুভূতি' ভোট, কংগ্রেস দল কেন্দ্রে পুনরায় সরকারে ফিরেছে, নরসিংহ রাও নতুন প্রধান মন্ত্রী। দিকে-দিকে বার্তা রটে গেল, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় কমে যা দাঁড়িয়েছে তাতে আর মাত্র দু'সপ্তাহের আমদানির দায় মেটানো সম্ভব, তারপর শিয়রে সংক্রান্তি। এই বারতা শুধু দেশেই রটলো না, বিদেশেও। অবস্থা যা দাঁড়ালো বিদেশ থেকে বেসরকারি ঋণ সংগ্রহ যা দাঁড়ালো, অন্তত দাঁড়িয়েছে বলে প্রচার করা হলো, এখন থেকে সম্ভবপরতার অনেকটা বাইরে, যদি না জাতীয় আর্থিক রীতি-নীতি ঢেলে সাজানো হয়।।

প্রধান মন্ত্রী রূপে শপথ নেওয়ার পূর্বাহ্ণেই নরসিংহ রাও বোধহয় মনস্থির করে ফেলেছিলেন। বিভিন্ন সূত্রে ইতিমধ্যেই বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে আবেদন জানানো হয়েছিল, সংস্থাদ্বয় যদি এবার ভারত সরকারের পাশে এসে না দাঁড়ায়, দেশ স্বখাত সলিলে ডুববে। কে না জানে, এই দুই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কলকাঠি নাড়ে খোদ মার্কিন সরকার, তার কাছেও গোপন দরবার করা হলো। বহু বছর ধরে মার্কিন সরকার, বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার এরকম একটি পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষমাণ ছিল, স্বাধীনচেতা ভারতবর্ষের সরকার কবে মুখ থুবড়ে পড়বে, বড়ো আকারের বৈদেশিক মুদ্রা সংকটে নিমজ্জিত হবে, তখন পথে আসবে নতুন দিল্লি। দূত মারফত মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ও আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থাদ্বয়ের কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে নতুন দিল্লিতে বাণী পৌঁছুলো : আপনারা অথৈ জলে পড়েছেন, আমরা বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা না করে দিলে আপনারা মারা পড়বেন, আপনাদের ফিরিয়ে দেবো না, কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আপন্ন দেশগুলির জন্য আমাদের যে-স্থায়ী ব্যবস্থা আছে, যে-শর্তাবলী মানা আবশ্যিক, আপনাদেরও সে-সব মানতে হবে। শর্তগুলির ফর্দ নামতার মত করে পড়ে যাওয়া যায় : টাকার আর্ন্তজাতিক বিনিময় মূল্য অনেক কমাতে হবে, শিল্পক্ষেত্রে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রদ করতে হবে, বৃহৎ শিল্পে ও একচেটে পুঁজির উপর কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করা চলবে না, বিদেশী পুঁজি অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে পুরোনো নিয়মকানুন করতে হবে, অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করতে হবে, বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের উপর কড়াকড়ি ক্রমশ কমিয়ে আনতে হবে, সর্বোপরি সরকারি ব্যয় তথা সরকারি খাতে বিনিয়োগ সম্যকরূপে ছাঁটতে হবে, এমনটা করলে নাকি স্বদেশ-বিদেশের বিনিয়োগকারীরা এখন থেকে ভারতবর্ষে টাকা ঢালতে আগ্রহবান হবেন। তা ছাড়া করব্যবস্থারও সংশোধন প্রয়োজন, প্রত্যক্ষ করের বোঝা যথেষ্ট না-কমালে পুঁজিপতি-ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগে উৎসাহ পাবেন কেন?

লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা শুরু হতেই গোপন কথাবার্তা শুরু হয়েছিল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নতুন দিল্লি থেকে যথাযথ জানিয়ে দিয়েছিলেন, উল্লিখিত প্রত্যেকটি শর্তই দ্রুত অথবা ক্রমশ মেনে নেওয়া হবে। তাতেও কিন্তু ওয়াশিংটনের চিঁড়ে ঠিক ভিজলো না। লাতিন আমেরিকা ও পশ্চিম এশিয়ার অনেক দেশে— অর্থাৎ মার্কিন সরকারের অনুশাসন যেখানে-যেখানে অলঙ্ঘনীয় তাদের ক্ষেত্রে— অলিখিত নিয়ম : তাদের অর্থমন্ত্রী কে হবেন

তা আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার ও বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃপক্ষ স্থির করে দেবেন, মার্কিন সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে; তাঁদের আস্থাভাজন কোনও লোককে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে না বসালেই নয়। ভারতবর্ষ যেহেতু এখন ল্যাজেগোবরে, দুই আর্ন্তজাতিক অর্থসংস্থা ও মার্কিন সরকারের কাছে আত্মসমর্পণে প্রস্তুত, তার সরকারকেও এই নির্দেশ মানতে হবে। ওয়াশিংটন থেকে প্রথম যে-ব্যক্তির নাম বাছাই করে পাঠানো হলো, তিনি চিন্তাভাবনা করে অর্থমন্ত্রী হওয়ার আহ্বান ফিরিয়ে দিলেন; তালিকায় যাঁর নাম দ্বিতীয়, নরসিংহ রাও তাঁকে ডেকে পাঠালেন, তিনি সানন্দে-সাগ্রহে সম্মত। অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে এই ভদ্রলোকও মন্ত্রীরূপে শপথ নিলেন, মন্ত্রীদের দায়িত্ব সরকারিভাবে বণ্টন হওয়ার আগেই তাঁর অর্থমন্ত্রকে গিয়ে বসা শুরু। কয়েক দিনের মধ্যেই আলোচিত শর্তাবলী অনুযায়ী একটির পর আর একটি আত্মসমর্পণের গ্লানিজনক সিদ্ধান্ত ঘোষণা শুরু হলো, বাহারি নাম দেওয়া হলো, কাঠামোগত আর্থিক সংস্কার। খবর কাগজে আহ্লাদ ধরে না, পুঁজিপতি-সওদাগর-জমিদারদের আনন্দে ধেই-ধেই নৃত্য, ভারতবর্ষ মায়াবী আর্থিক সংস্কারের উন্মাদনায় বিভোর। এখনও সেই বিভ্রান্তির মহাক্রান্তিলগ্ন চলছে, কবে শেষ হবে কে বলতে পারে!

একটি কথা তখন মুখে-মুখে ফিরতো : হ্যাঁ, বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার যা-যা শর্ত চাপিয়েছে, সব ক'টিই গুরুভার, দেশবাসীর আপাতত কিছু কষ্ট হবে, কিন্তু কী আর করা, আমরা তো অনন্যোপায়, আমাদের সামনে কোনও বিকল্প ছিল না, ওই শর্তগুলি না মানলে দেশ সর্বনাশের অতলে ডুবে যেতো। সত্যিই কি তাই? ওই বছরগুলিতে আমদানি-রফতানির মধ্যে ব্যবধান দাঁড়িয়ে ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা চার ভাগের কাছাকাছি। যদি জাতিকে কৃচ্ছ্রে বাঁধা যেতো, আমদানির, বিশেষ করে অপ্রয়োজনীয় শৌখিন পণ্যাদি আমদানির, বহর কমিয়ে আনা যেতো, কিংবা দেশের সুরক্ষার নামে নানা বাহারি অস্ত্রশস্ত্র কেনবার মোচ্ছব, বহির্বাণিজ্য ঘাটতি তা হলে অনেকটাই মিলিয়ে যেতো, বৈদেশিক মুদ্রাসংকট নিয়ে মোটেই ভুগতে হতো না আমাদের। অতীত ঋণের যে-বোঝা টানছিলাম, তা নিয়েও বিদেশী ঋণদাতাদের সঙ্গে আলাদা বোঝাপড়ায় আসা আদৌ অসম্ভব ছিল না। প্রাপ্য টাকা ফেরত না পেলে ওদেরই অসুবিধা; তা আদায় করতে আর যা-ই হোক সৈন্য পাঠাতো না ওরা, কোনও মীমাংসায় পৌঁছুতে অবশ্যই ওদের সম্মত হতে হতো, গরজ বড়ো বালাই। অতি সম্প্রতি লাতিন আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশে এধরনের বোঝাপড়া হয়েছে।

কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে, প্রধান রাজপুরুষদের তো আগেই গেছে, আত্মবিশ্বাস শূন্যে গিয়ে ঠেকেছে, এখন আমার-যে-সব-দিতে- হবে-সে-তো-আমি-জানি পর্বের মানসিকতা। মধ্যবিত্ত-উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্তদের একটি বড়ো অংশেরও চোখ চকচক, বিত্ত-হতে-চিত্ত-বড়ো-এই-ভারতের-পুণ্যবাণী-র চেয়ে অসত্যভাষণ কিছু হতে পারে না; স্বাধীনতার পর চার দশক ধরে বিদেশী জিনিশের ব্যবহার থেকে তাঁদের বঞ্চিত রাখা হয়েছে, এবার, কী মজা, বাঁধন খুলে দেওয়া হচ্ছে। শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা উচ্ছ্বসিত, সচ্ছল বাড়ির গৃহিণীরা উচ্ছ্বসিত, সম্ভোগের জোয়ারে এবার ভেসে যাওয়ার পালা। বামপন্থীদের তরফ থেকে প্রতিবাদ জানানো হলো, তবে তাঁদের প্রভাব বা ক্ষমতা আর কতটুকু? আর এটা তো সর্ববিদিত, কমিউনিস্টরা বরাবরই দেশের স্বার্থের পরিপন্থী কথাবার্তা বলে এসেছে, মনে নেই সেই জনযুদ্ধ নীতির কথা?

এখন তো মহান আর্থিক সংস্কারের এক দশকের বেশি অতিক্রান্ত, কৃষিতে উন্নয়নের

বার্ষিক হার জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের নিচে নেমে গেছে, শিল্প ক্ষেত্রে বিকাশের হার পূর্ববর্তী দশকে যা ছিল তার অর্ধেকেরও কম, কর্মসংস্থান সংকুচিত থেকে সংকুচিততর, বিদেশী ফরমায়েসে সরকারি খাতে বিনিয়োগ অতি দ্রুত কমিয়ে আনা হয়েছে, অথচ বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ছে না, কর্তাব্যক্তিরা যা আশা করেছিলেন, বিদেশ থেকে শিল্পে-কৃষিতে-পরিকাঠামোয় টাকা ঢালবার বন্যা বয়ে যাবে, সেরকম কিছুই ঘটছে না। অর্ধশতাব্দী ধরে বহু তিতিক্ষায় গড়ে তোলা রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানাগুলি একের পর এক বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, নয়তো জলের দরে বেসরকারি মালিকদের কাছে বিক্রি। তবে, মিছে কথা বললে জিভ্ খসে পড়বে, স্বীকার না করে উপায় কী, কিছু-কিছু বিদেশী বিনিয়োগ সত্যিই ঘটেছে, বিদেশীরা এসে ঠান্ডা পানীয়ের কারখানা খুলেছে, দামি ফরাশি মদ, স্কচ-হুইস্কির কারখানা, বড়ো-ছোটো-মাঝারি বিদেশী গাড়ির দিশি সংস্করণ বেরোচ্ছে, পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে যদিও ঠিক জাহাজ বইছে না, বিদেশী জলখাবারের দোকান পর্যন্ত এখন আস্তানা গেড়ে বসেছে, ঝলমলে অলঙ্কার, দামি পোশাক, কাপড় ধোওয়ার যন্ত্র, গান শোনানোর কল, খাবার-শরীর ঠান্ডা রাখবার উপকরণ, সব-কিছু হাতের মুঠোয়, অবশ্য যদি আমাদের কড়ি ফেলবার ক্ষমতা থাকে : দেশের সামগ্রিক জনসংখ্যার উপরতলাবর্তী শতকরা দশ-পনেরোজনের মাত্র সেই ক্ষমতা আছে, বাকিদের নেই। শতকরা দশ-পনেরোজন খাশা আছেন, বাকি পঁচাশি-নব্বুই শতাংশ ক্লিন্নতায়-অভাবে-কর্মহীনতায় নরকের কাছাকাছি পৌঁছুচ্ছেন। পৃথিবীর সব দেশেই অভিজ্ঞতা, আর্থিক মন্দা জেঁকে বসলে, বেকারের সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেলে, শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষেও গত দশ বছরে ঠিক তাই-ই হয়েছে। অল্পসংখ্যক উটকো আদর্শবাদী, কিছু-কিছু ধরাধার্য-বিপথে-যাওয়া অর্থনীতিবিদ, গোঁয়ারগোবিন্দ হয়ে সংস্কারের বিরোধিতা করে যাচ্ছেন, তাঁদের হয়তো শিগ্‌গিরই কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হবে, নয়তো পাগলা গারদে।

কারখানার পর কারখানা বন্ধ, দফতরের পর দফতর, শাসকবর্গের ভ্রূক্ষেপ নেই, হড়বড় করে ইংরেজি বা অন্য বিদেশী ভাষা-বলিয়ে, মড-পোশাক পরিহিত, কম্পিউটার-দুরন্ত বড়োলোকদের ঘরের ছেলেমেয়েরা তো কাজ পাচ্ছে বিদেশী ব্যাংক, বীমা সংস্থায়, হোটেলে, পর্যটন ও বিবিধ বিনোদনশিল্পে, লক্ষ-লক্ষ অধস্তন কর্মীকর্মচারী মারা পড়ছেন, তাতে স্বর্গোদ্যানবাসী-বাসিনীদের চিত্তবিভ্রমের কারণ নেই।

যাঁরা সেই একানব্বুই সালে দাবি করেছিলেন, আহা, কী আনন্দ, দু'-তিন বছরের মধ্যেই দেশকে সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া যাবে, তাঁরা উপস্থিত মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। সরকার অবশ্য বলবেন, আর কিছু হোক না হোক, বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডার এখন উপছে পড়ছে, সাত হাজার কোটি ডলার বর্তমানে আমাদের তহবিলে, দশ বছর আগে এই অঙ্ক ছিল মাত্র একশো কোটি। বিবৃতিটিতে দু'টি জরুরি তথ্য কিন্তু সযত্নে অনুচ্চারিত : এক, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় যত, দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ তার প্রায় দ্বিগুণ; এবং দুই, বিদেশ থেকে যে-টাকা এসেছে তার বেশির ভাগই খাটানো হচ্ছে ফাটকা বাজারে, নয়তো চড়া হারে সুদ গুনছে ব্যাংকে-ব্যাংকে, এই শর্তে যে, গচ্ছিত টাকা প্রবাসী বিনিয়োগকারীরা যখন খুশি বিদেশে সুদসমেত ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। বছর চার-পাঁচ আগে এশিয়ার বেশ কয়েকটি পূর্ব প্রান্তের দেশের ঘটনাবলী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, তেমন-তেমন বড়ো গোছের কোনও আতঙ্ক ছড়ালে আমাদের সাত হাজার কোটি ডলারের বৈদেশিক সঞ্চয় এক রাত্রেই ভোজবাজির মতো মিলিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

জাতীয় বিপর্যয়ের একটি সাংস্কৃতিক উপসমস্যাও আছে। স্বাধীনতার পর অর্ধশতাব্দীর উপর গড়িয়ে গেছে, দেশের ধনবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন তত্ত্বে আস্থা রেখেছেন, বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন, পরস্পরের সঙ্গে বিতর্কে রত হয়েছেন, তা হলেও এতদিন মতান্তর কখনও মনান্তরে পর্যবসিত হয়নি। এবার হলো। যাঁরা বিশ্বায়ন, বেসরকারিকরণ, উদারীকরণ ইত্যাদি ব্যাপারে বিশ্বাস করেন না, স্বয়ম্ভর অর্থনীতির ভক্ত, তাঁরা সবাই এখন প্রায় একঘরে। ভারতবর্ষের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে হীনম্মন্যতার প্রভাব বরাবরই একটু বেশি, সেই সঙ্গে বিদূষণালিপ্সার। সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে কেউ তেমন সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেন না, তার একটি ব্যবহারিক দিকও আছে : সরকার তো মা-বাপ, মাইনেপত্তর জুগিয়ে থাকে, গবেষণার টাকার ব্যবস্থা করে দেয়, মাঝে-মধ্যে বিদেশে সফরেরও। সরকার যতদিন মৃদুমন্দ স্বনির্ভর অর্থব্যবস্থার কথা বলতো, ক্বচিৎ-কদাচিৎ এমনকি ভড়ং করে সমাজতন্ত্রের কথাও, অর্থনীতিবিদরা ঝটিতি সম্মতিবাচক ঘাড় নাড়তেন। এখন থেকে প্রতীপ হাওয়া, জাতীয় সরকার পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অঙ্গুলিহেলনে উঠছে-বসছে, অর্থনীতিবিদরা অন্য ধাঁচের কথাবার্তা বলবেন কোন সাহসে? দেশকে বিদেশী শোষণ থেকে মুক্ত করবার জন্য দ্বিশতাধিক বৎসরব্যাপী অধ্যবসায়ে এবার চিড় ধরেছে। এক চিলতে বাড়িয়ে বলছি না, মাত্র কয়েক বছর আগে দেশের এক অর্থমন্ত্রী লন্ডনে গিয়ে নিম্নরূপ বক্তৃতা দিয়ে বসলেন পর্যন্ত : প্রভুরা, আপনারা দীর্ঘ দু'শো বছর আমাদের দেশে অধিষ্ঠান করেছিলেন, আমাদের রীতি-নীতি আচার-সভ্যতা শিখিয়েছিলেন, এবার আর একবার আসুন, ধনী অর্থব্যবস্থা তৈরি করার জাদুমন্ত্র অনুগ্রহ করে আমাদের শিখিয়ে দিয়ে যান, ধন্য করুন আমাদের।

ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না, বশংবদ অর্থনীতিবিদদেরও হয় না। আর্থিক সংস্কারের ধ্বজা ওড়াতে কাতারে-কাতারে অনেক বিদ্বান-পণ্ডিত-প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলেন : বামপন্থী বলে বাজারে যাঁদের পরিচিতি, কোণঠাসা হয়ে গেলেন তাঁরা। গোদের উপর বিষের ফোঁড়া, এক পাল দিশি অর্থনীতিবিদ, যাঁরা বিলেতে-আমেরিকায় দিব্যি গুছিয়ে বসেছেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁদের এতদিন বিশেষ ভাবনাচিন্তা ছিল না, দেশের শাসকবর্গের হঠাৎ উচ্ছ্বসিত-উদ্বেল পাশ্চাত্যপ্রীতিতে তাঁরা ভারি আরাম পেতে লাগলেন : অ্যাদ্দিন দেশটা ভুল বেগানায় ঘুরপাক খাচ্ছিল, সমাজতান্ত্রিক ঝোঁক না কী সব আজেবাজে ঝামেলায় জড়িয়ে ছিল, এবার রাহুমুক্তি ঘটেছে, ভারতবর্ষ এবার ব্যক্তিগত মালিকানার হাতে তার ভাগ্য সমর্পণ করবে, বিশ্বায়িতও হবে সেই সঙ্গে, দেশের ঠাকুর ছেড়ে বিদেশী কুকুর পূজার ব্রত গ্রহণ করবে। একদা-স্বদেশের এই নতুন রূপকল্পের দিকে তাকিয়ে চিরপ্রবাসী অর্থনীতিবিদদের মুগ্ধ বিস্ময়ের সীমা নেই। তাঁদের ব্যস্ত সময় থেকে পাঁচদিন-ছ'দিন-দশদিন বের করে নিয়ে তাঁদের প্রাক্তন দেশের বুড়ি ছুঁয়ে যেতে শুরু করেছেন তাঁরা, মন্ত্রীদের সঙ্গে, আমলাদের সঙ্গে গুরুগম্ভীর বৈঠক করছেন, ভিড়-ঠাসা সেমিনারে বক্তৃতা দিচ্ছেন, অজস্র অমৃতবাণী বিলোচ্ছেন, অতঃপর হুড়মুড় করে ফের পাশ্চাত্যগামী বিমানে চাপছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ জনসমক্ষে অভিযোগ ব্যক্ত করে যাচ্ছেন, ভারতে এখনও মুষ্টিমেয় কিছু নামকাওয়াস্তে অর্থনীতিবিদ আছেন, যাঁরা এই বিলম্বিত মুহূর্তেও সমাজতন্ত্রের বুলি কপচাচ্ছেন, স্বনির্ভর অর্থব্যবস্থার কথা বলছেন, বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছেন, এঁদের জন্য তাঁদের— চিরস্থায়ী প্রবাসবাসী ধনবিজ্ঞানীদের— বিদেশে মুখ দেখানোর উপায় নেই; সরকারের, এবং সাধারণ মানুষের, ন্যূনতম কর্তব্য এসমস্ত এলেবেলে সমাজতান্ত্রিক-আদর্শে-এখনও-বিশ্বাসী তথাকথিত অর্থনীতিবিদদের ঝাড়বংশে নির্মূল করা। অর্থাৎ যাঁরা

প্রাণপণে চেঁচিয়ে বলতে চাইছেন, আছে, বিদেশীদের কাছে আত্মসমর্পণের সম্মানীয় বিকল্প আছে, তাঁদের কণ্ঠরোধের জন্য প্রচার প্রচণ্ড বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। যে সব পত্রপত্রিকায় স্বনির্ভরতাবিশ্বাসীদের বক্তব্য ছাপা হয়, তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, যাতে বিশ্ব ব্যাংক-আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের আদর্শে আস্থাহীনরা যেন নিজেদের কথা বলবার সুযোগ না পায়। এই গোছের ঘটনাবলীর একটি ব্যক্তিগত দিকও আছে। দশকের পর দশক ধরে যাঁদের বন্ধু বলে বিবেচনা করতাম, যাঁদের সংসারকে নিজের সংসার বলে ভাবতাম, যাঁরা আমাদের সংসারের সঙ্গেও একাত্ম হয়েছিলেন, তাঁরা ক্রমশ দূরবর্তী হয়ে গেছেন গত এক দশকে, এমন কি কারও-কারও সঙ্গে মৌখিক বাক্‌বিনিময়-প্রতিবিনিময়ও বন্ধ। বিশ্বায়নবাদীরা 'উদারনৈতিক' অর্থশাস্ত্রে আস্থাবান, ধনতন্ত্রে প্রত্যয়শীল; দেশের স্বার্থের সঙ্গে বিদেশী স্বার্থের বিভেদীকরণ তাঁদের চিন্তার বাইরে; অন্য পক্ষে হাতে-গোনা কয়েকজন নিকষ বিপথগামী এখনও সাম্যঘেরা সমাজের স্বপ্ন দেখেন, দেশকে সর্ব অর্থে বিদেশী প্রভাবমুক্ত করবার লক্ষ্যে চিলচিৎকারে নিমগ্ন হন, এঁদের কি কোনওদিনই কাণ্ডজ্ঞান হবে না?

অবসাদবোধের সমাচ্ছন্নতা। কয়েক অনুচ্ছেদ আগে বহু প্রিয়জনের দেহাবসানের কথা উল্লেখ করেছি। অন্তরঙ্গদের মৃত্যুর বাস্তবতাকে মেনে নিতে হয়, তবে তাতে দুঃখের লাঘব হয় না। সেই সঙ্গে, পটোল-চেরা দৃষ্টিক্ষেপ করে এখন দেখতে হচ্ছে, সময় অশান্ত, চোখের সামনে দেশটা বিদেশীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিরোধের শক্তি অনেকেই যেন হারিয়ে ফেলেছেন, মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত।

আটতিরিশ

আরেকবার বলি, জীবনের নিয়ম এটা, একদা যাঁরা কাছে ছিলেন, তাঁরা দূরে সরে যান, একদা-দূরবর্তীরা কখনও-কখনও কাছে আসেন। হয়তো আর্থিক সংস্কারজড়িত মতদ্বৈধতার কারণে, হয়তো কোনও ব্যক্তিগত ক্ষোভের পরিণামে, এক অর্থনীতিবিদ বন্ধু, জীবনের প্রথম পর্যায়ে যিনি আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন, আজ অনেক দূরের মানুষ, আমার সম্পর্কে সম্প্রতি প্রকাশ্যে গভীর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রতি আমার কিন্তু কোনও অভিমান নেই; বহু বছর ধরে তাঁর কাছ থেকে যে-ঔদার্য আমার প্রতি বর্ষিত হয়েছে, তার জন্য আমৃত্যু কৃতজ্ঞ থাকবো।

অমর্ত্যর কথা নানা জায়গায় খুচরো-খাচরা উল্লেখ করেছি, মনে হয় আরও কিছু, অনেক কিছু, বলা প্রয়োজন। আসলে এত দীর্ঘ সময় অমর্ত্য-নবনীতা নাম দু'টি এক সঙ্গে উচ্চারণ করেছি, তাদের বিশ্লিষ্ট করে ভাবা খুব কঠিন। অথচ বাস্তবতা থেকে তো মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া চলে না। তাদের বিবাহসম্পর্ক তিরিশ বছর আগে শেষ হয়ে গেছে। যখন তাদের মানসিক বিভাজনের শুরু, অনেক চেষ্টা করেছিলাম তাদের ফের মিলিয়ে দেওয়ার জন্য। যা মনে হতো অতি নিটোল সুন্দর একটি নীড়, তা ভেঙে টুকরো হয়ে যাচ্ছে, কিছুতেই যেন বরদাস্ত করতে পারছিলাম না। তবে শেষ কথা রবীন্দ্রনাথই বলে গেছেন, ফুরায় যা দে রে ফুরাতে, আমার ভাবাপ্লুততা তো অপরাপরের জীবনের নিয়ামক হতে পারে না। এখন তারা উভয়েই নিজ-নিজ বৃত্তে পূর্ণ বিভাসিত। অমর্ত্যর তো বিশ্বজোড়া নাম, নবনীতার সাহিত্যসৃষ্টি-কুশলতাও তুচ্ছনীয় নয়; দু'জনেই আমার দিনযাপনের গণ্ডির বাইরে আস্তে-আস্তে সরে গেছে। তা হলেও উভয়ের কাছ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে যত উপকার ও প্রীতিস্নেহসম্ভার হাত পেতে গ্রহণ করেছি, জাগতিক হিশেবের বাইরে তা। তাদের দুই কন্যা— পিকো, অন্তরা, ও টুম্পা, নন্দনা— স্বতঃসিদ্ধতার মতো নিজেদের পছন্দ-করা বৃত্তির মধ্যবিন্দুতে এখন উপনীত। এ এক অদ্ভুত কৌতুক, পিকো হঠাৎ-হঠাৎ হাজির হলে আমি সঙ্গে-সঙ্গে চলে যাই তার অতিবালিকা বয়সে, যখন 'সহজ পাঠ' থেকে নামতা পড়ার মতো আউড়ে, অথবা আউড়াবার ভাণ করে, তাঁকে খ্যাপাতাম : 'তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে ঘুষি মারে আকাশে'। যে মুহূর্তে 'ঘুষি মারে আকাশে' উচ্চারিত হতে শুনতো, পিকো রাগে ঝাঁপিয়ে পড়তো আমার উপর, শান্তিনিকেতনের সাক্ষাৎ নাতনি সে, রবীন্দ্র-বিকৃতি তার সইবে কেন। টুম্পাকে নিয়ে অনুরূপ একটি তিরিশ-বছর-পিছনে-যাওয়া টুকরো স্মৃতি : দেড়-দু'বছরের টুম্পা, নতুন দিল্লিতে গাড়িতে পাশে বসা, গাড়ি চালাচ্ছি আমি, আওরঙ্গজেব রোড-মানসিং রোড-শাজাহান রোড-পৃথ্বীরাজ রোডের সংযোগস্থলে কেয়ারি-করা বাগান, তাতে জলের শুঁড়-তোলা কয়েকটি ঝরনা, চোখে পড়া মাত্র, যতবারই ওখান দিয়ে গেছি, টুম্পার উচ্ছ্বসিত কলকাকলি : 'ফয়লা, ফয়লা', সেই সঙ্গে ফুর্তিতে স্টিয়ারিংয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া।

অমর্ত্যর সঙ্গে ইদানীং একেবারেই দেখা হয় না, যে সংগোপন অভিমত তাঁর সম্বন্ধে বরাবর পোষণ করে আসছি, তা না হয় এই সুযোগে ব্যক্ত করি। আমার বিবেচনায় অমর্ত্য ধ্রুপদী অর্থে আদর্শ অর্থনীতিবিদ; চিন্তাকে তত্ত্বের খোলস পরাতে তার জুড়ি নেই; তত্ত্বকে তথ্যের কষ্টিপাথরে পরিশোধন করে নিতেও সে সুপারঙ্গম; তথ্য ও তত্ত্বের মিশেল খাটিয়ে আশ্চর্য যুক্তিপ্রয়োগ-দক্ষতা সমভিব্যহারে নীতির মোহানায় পৌঁছুতে তার জুড়ি নেই। সেই নীতি জনসমক্ষে প্রাঞ্জল করে ব্যাখ্যা করার প্রতিভাও তার তুলনাহীন। যেটা দুঃখের, স্বদেশ-স্বভূমি তার মনীষা-পাণ্ডিত্য-বিচক্ষণতা থেকে উপকৃত হওয়ার তেমন সুযোগ পেল না। বছরে একবার-দু'বার একদিন-দু'দিনের জন্য অমর্ত্য দেশে আসে, নগরে-বন্দরে চরকিবাজি করে, কিছু-কিছু উপদেশ-পরামর্শ বিলোয়, তাতে আখেরে ছোটো-বড়ো যে-কোনো জাতীয় সমস্যারই তেমন সুরাহা হয় বলে মনে হয় না। মানছি, তার যা দিনযাপনের নির্ঘণ্ট, এমনধারা দৌড়ঝাঁপ ছাড়া তার উপায় নেই, বিশ্বলোক তার সামনে উন্মুক্ত-উন্মোচিত, বিশাল পরিধিকে সে বেছে নিয়েছে। তার সিদ্ধান্ত নিয়ে অনুযোগ করবার অধিকার কারও নেই, কিন্তু আমাদের বিষাদসিন্ধু তো তবু উথলে উঠবেই।

নিঃসঙ্কোচে একটি পার্শ্বমন্তব্য যোগ করছি। দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ নিয়ে অমর্ত্যর গবেষণা, যা তাকে নিত্যনতুন শিরোপা জুগিয়েছে ও জোগাচ্ছে, আমাকে বরঞ্চ ঈষৎ বিষণ্ণই করেছে। শ্রেণীবিভাজনের সমস্যা এড়িয়ে দারিদ্র্যের আকরিক বিশ্লেষণ করা চলে বলে আমি মনে করি না। 'উদারনৈতিক' স্বাধীনতা, তার বিবেচনায়, সৃষ্টির সমস্ত সমস্যার নিরসনসূচক; আমি তো বলবো, পৃথিবীর অনেক সর্বনাশী ঘটনা-সংঘটনার জন্য দায়ী এক ধরনের সমাজবিকার, যাকে কেউ-কেউ স্বাধীনতা ভেবে নিয়ে হ্লাদিত বোধ করেন।

প্রীতি-স্নিগ্ধতার বিনিময়ে অনুরূপ স্নাত হয়েছি সুখময়-ললিতার সান্নিধ্য থেকেও। সুখময়ের পাণ্ডিত্যের ব্যাপ্তি যেমন বিশাল, ওর সারল্যও সমান অতুলনীয়। শিশুর অপাপবিদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে সে পৃথিবীকে দেখেছে, দেশের সমস্যাবলীর সমাধান খুঁজেছে, প্রথম থেকেই ধনবিজ্ঞানের সূত্রগুলির জটিলতম রহস্য তার অনায়াসআয়ত্ত। সর্বগুণসম্পন্ন চৌখস অর্থনীতিবিদ হিশেবে হয়তো কোনওদিনই তাকে মনে করিনি; জরুরি অবস্থার সময় তার ইন্দিরা গান্ধির প্রতি অনুরাগ মন খারাপ করে দিয়েছিল। তাতে কিছু ইতরবিশেষ হবার নয়; সুখময় সুখময়ই, ধনবিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস-ন্যায়শাস্ত্র-গণিতে তার স্বচ্ছন্দ প্রব্রজ্যা মুগ্ধ না-করে পারতো না। আমার কল্পনায় একটি স্থিরচিত্র ভাস্বর হয়ে আছে : সুখময় কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিভৃত কন্দরে সমারূঢ়, জ্ঞানান্বেষীরা আসছেন-যাচ্ছেন, সুখময়ের কথা শুনছেন, সুখময়ের কথন থেকে জ্ঞানসমৃদ্ধ হচ্ছেন, চতুর্দিকে মন্ত্রের মতো মুগ্ধতা বিরাজ করছে, দিনের পর দিন জুড়ে। অথচ তাকে অনুরোধ-উপরোধ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে যোজনা কমিশনে বসিয়ে দেওয়া হলো। বিবেকভারাতুর সুখময়, যে-কর্তব্য তার পক্ষে অযথা কালহেলন, তাতে নিবিষ্ট হয়ে রইলো জীবনের শেষ দশ-বারো বছর। কে জানে, যদি এই পর্বের অবর্ণনীয় পরিশ্রম থেকে সে মুক্ত থাকতে পারতো, সম্ভবত আরও ঢের দিন তার জীবনায়ু প্রলম্বিত হতো, পৃথিবী ও দেশ তার কাছ থেকে প্রভূত আরও জ্ঞানের উপচার আহরণের সুযোগ পেতো। আচরিক অত্যাচারের শিকার হলো সে, ললিতা, আমরা সবাই। মৃত্যুর পর মানবাত্মার কী গতি হয়, আদৌ কোনও গতি হয় কিনা, জানা নেই, সুতরাং যে-সুখময় আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, স্রেফ তার স্মৃতি নিয়েই আমাদের এখন কাটাতে হবে। এই নিছক স্মৃতিসর্বস্বতার নির্মমতা ললিতা কেমন করে একা বয়ে বেড়াচ্ছে

ভেবে অবাক হতে হয় : চিরকালই সুখময় একান্ত ললিতানির্ভর, ললিতা সুখময়নির্ভর। বন্ধুবান্ধবের ভালোবাসা তাকে ঘিরে রেখেছে, তবু, স্বীকার করতেই হয়, ললিতাকে এখন ভীষণ একাকী নিরালম্ব মনে হয়, প্রতিভাময়ী দুহিতা মৌরীর সতত-সান্নিধ্যও যার অবসান ঘটাতে পারে না। সেই সঙ্গে সুখময়ের শিশুসারল্যের স্মৃতি নিরন্তর তাড়া করে ফেরে। অসম্ভব খাদ্যবিলাসী ছিল সুখময়। যা মস্ত কৌতূহলোদ্দীপক, খাওয়ার পোশাকি পর্যায়ক্রম সারা হয়ে গেলেই তার আসল খাওয়া শুরু; শুক্তো-শাক-ডাল-সবজি-চচ্চড়ি-মাছ-মাংস-চাটনির খাদ্যবৃত্ত সম্পূর্ণ হওয়া মাত্র সুখময়ের যথার্থ খাওয়ার পালা : একটু ফের ডাল, একটু ফের ভাজা, একটু ফের শুক্তো, একটু ফের মাছ, একটু ফের মাংস, কিংবা, খেয়াল চাপলে, আর একবার চচ্চড়িতে ফিরে যাওয়া। পৃথিবীর মানুষ সুখময়কে জানতো পণ্ডিত হিশেবে, আমাদের কাছে সে ভালোবাসার প্রগাঢ় আশ্রয়স্থল, যে-আশ্রয় কর্কশ হাতে কেউ কেড়ে নিয়ে গেছে।

খুবই কাছের মানুষ ছিল আর এক অর্থনীতিবিদ, তিরুবনন্তপুরমের সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের অধ্যক্ষ টি এন কৃষ্ণন, ষাটের দশকে কলকাতায় আমাদের সহকর্মী, অন্তত পঁয়তিরিশ বছর ধরে ঘনিষ্ঠ শুভানুধ্যায়ী, সে-ও কিছুদিন হলো প্রয়াত, তার গণিতে-পারদর্শিনী মৃদুস্বভাবা স্ত্রী রাধা তারও কয়েক বছর আগে। তাদের একমাত্র কন্যা সুনীতা প্রধানত প্রবাসিনী, ক্বচিৎ-কদাচিৎ যখন দেখা হয়, আবেগে জড়িয়ে ধরে অতীতলেহন করি।

অর্ধশতাব্দী আগে আড্ডা ও বৃত্তির বৃত্তে যাঁরা নিত্যসহচর ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে পৃথিবী থেকে নিষ্ক্রান্ত, অবশিষ্ট কয়েকজন বিভিন্ন স্থানে মহাসমুদ্রে বিচ্ছিন্ন নির্জন দ্বীপের মতো টিকে আছি; সুভাষ ধর ও নীলাঞ্জনা নিউ ইয়র্কে, দু'জনেই অসুস্থ, তা ছাড়া পারিবারিক দুর্বিপাকে বিধ্বস্ত; মোহিত হায়দরাবাদে কিন্তু বনজা নেই, পুণেতে হোনাভার কিন্তু চন্দ্রা প্রয়াত, বাঙ্গালোরে কৃষ্ণস্বামী ও মধুরা, তিরুবনন্তপুরমে রাজ, তাঁর স্ত্রী সরসম্মা বিগত, একই শহরে ইকবাল গুলাটিও কয়েক মাস আগে প্রয়াত, লীলা একা; অঞ্জু ও হিতেন ভায়া দিল্লিতে, তাদের ছেলেমেয়েরা পৃথিবীতে বিচ্ছুরিত: রুক্মিনী দিল্লিতে, ইংরেজিতে কাব্যচর্চা নিয়ে সদ্য ব্যস্ত, দেবকী সুদূর বার্কলেতে বিজ্ঞানসাধিকা, পুত্র অমিত, রিও ডি জেনিরোয় ব্রাজিলীয় সংসার সামলাচ্ছে। উমা ও শাম্বমূর্তিও দিল্লিতে, কৃষ্ণজী ও নীলাম্মা হায়দরাবাদে। আমাদের স্নেহসুধায় সিক্ত করে অর্ধ শতাব্দী আগে দিল্লির আড্ডায় নায়কত্বে বিরাজ করতেন যিনি, বলবন্ত নাগেশ দাতর, তিনিও বছর দুই হলো বিগত। প্রয়াত আমার সুহৃদ সত্যব্রত সেনও। স্নেহাংশু আচার্য ষোলো বছর আগে চলে গেছেন, মাত্র কয়েকদিন আগে চলে গেছেন সুপ্রিয়া আচার্য।

যাঁর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি যোগাযোগ অব্যাহত ছিল, অরুণ ঘোষ, একবিংশ শতাব্দী শুরু হতে না হতে পৃথিবী থেকে অপসৃত। তৃতীয় সহস্রাব্দের শুরুতে গাঢ় অবসন্নতায় ঢেকে দেওয়া আর এক মৃত্যুসংবাদ। সম্পূর্ণ অন্য বৃত্তের বন্ধু, লোকনাথ ভট্টাচার্য, বৈঠক করতে প্যারিস থেকে কায়রো এসেছিল, সেখানে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। বহুবিদ্যাবতী পরমবিচক্ষণা পত্নী, ফ্রাঁস, ও কন্যা ঈশা লোকনাথকে গভীর মমতায় ঘিরে রাখতো, তবু বুক-ভরা অভিমান নিয়ে সে চলে গেল। তার গল্প-উপন্যাসের প্রতীক বাঙালি পাঠকের কাছে অবোধ্য, তার কবিতা ফরাশি ভাষায় অনূদিত হয়ে ইওরোপ জুড়ে উচ্ছ্বসিত বাহবা কুড়িয়েছে, কিন্তু স্বদেশে সে কবি ও লেখক হিশেবে অবজ্ঞাত। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে সে কয়েক দিনের জন্য

কলকাতা ঘুরে গিয়েছিল, তার সত্তা জুড়ে এক ভীতিপ্রদ অন্যমনস্ক ঔদাস্য, অভিমানের সেই উদাসীনতা নিয়েই লোকনাথ বিদায় নিল। আর এই মুহূর্তে খবর এলো কৈশোরকাল-থেকে-আমাকে-মমতায়-জড়ানো বান্ধবী, শান্তি দিঘে, প্রায় হাসতে-হাসতে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।

বন্ধুদের সংখ্যা ক্ষীয়মাণ। প্রতিদিন সকালে চা-পান করার মুহূর্তে চট করে ভেবে পাই না, দূরভাষে কোন সুহৃদের কুশল অনুসন্ধান করবো, তাঁরা তো বেশির ভাগ নিষ্ক্রান্ত। হঠাৎ করে এসে কয়েক ঘণ্টার জন্য ভরসা ও আনন্দ দান করে যাওয়ার মতো মানুষজনও প্রায় শূন্য। কনিষ্ঠরা অনেকেই ব্যস্ত, নানা দায় মিটিয়ে বৃদ্ধদের নিত্য খোঁজ-খবর নেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে নির্মল-রুমার সৌজন্য অমলিন, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মালিনী ও মিহির ভট্টাচার্যেরও। কখনও-কখনও আসেন পুরনো বন্ধু মুরারি সাহা, শিবকিঙ্কর মিত্র। যাঁরাই আসেন, তাঁদের প্রস্থানের মুহূর্তে করুণ হেসে বলি : আবার আসিও তুমি, আসিবার ইচ্ছা যদি হয়।

এবার যে-দম্পতির কথা বলবো, তারা কলকাতায় স্থিত নয়, নতুন দিল্লির বাসিন্দা, আগেই এদের সামান্য উল্লেখ করেছি, দু'জনেই অর্থনীতিবিদ, উভয়েই জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গত তিরিশ বছর ধরে জড়িত, প্রভাত ও উৎসা পট্টনায়ক। প্রভাত উৎকলসন্তান, উৎসা বঙ্গললনা। প্রভাতের বাবা ওড়িশায় কমিউনিস্ট পার্টির জন্মলগ্ন থেকে দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, অতি শৈশবে প্রভাতের বেশ কিছু সময় কেটেছে পার্টির কমিউনে। ধনবিজ্ঞানে ক্ষুরধার, দিল্লি স্কুল ও অক্সফোর্ডের বিখ্যাত ছাত্র, কেমব্রিজে কিছুদিন পড়িয়েছে, সত্তরের দশকের গোড়া থেকে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক। প্রভাতের পড়ানোয় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে প্রাঞ্জলতার স্বাক্ষর, ছাত্রছাত্রীদের নিয়ত মুগ্ধ করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের বাইরেও যেখানে যখন বলার ডাক পায়, প্রাঞ্জলতম ভাষায় দুরূহতম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বলে। সে যদি অর্থনীতির সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিজেকে বদ্ধ করে রাখতো, আমার সঙ্গে তার সৌহার্দ্যের সম্ভাবনা হয়তো থাকতো না। কিন্তু না, অর্থনীতির ঘোরপ্যাঁচ যে জীবনসংঘাতের প্রতিবিম্ব, প্রভাত সে বিষয়ে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত। গত দশ-বারো বছরে পৃথিবীর চেহারা বদলে গেছে, বদলে গেছে দেশ-বিদেশের রাজনীতির আদল, সমাজে আদর্শের অবমুখিতার ঢল, প্রভাত তার আদর্শে-বিশ্বাসে স্থিত থেকে সমস্ত উটকো প্রবণতার বিরুদ্ধে বিরামহীন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, পাশে পেয়েছে উৎসাকে। উৎসাও অতি প্রতিভাবতী অর্থনীতিবিদ, বরাবর প্রভাতের সহপাঠিনী, তাদের জীবনচর্যাও খাঁজে-খাঁজে মিলে গেছে। দু'জনের মধ্যে চরিত্রগত তফাত আছে। প্রভাতের সৌজন্যের তুলনা নেই, পরম রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রতিপক্ষের সঙ্গেও তার ব্যবহার বিনম্র মধুর; নিজের জীবনদর্শনে অবিচল, কিন্তু ঋতুতে-অঋতুতে সে কারও সঙ্গেই সরব জেহাদে নামে না। অন্য পক্ষে উৎসা সোজাসাপ্টা কথা বলতে পছন্দ করে, যাকে ভেকধারী বলে উৎসার মনে হয়, সেই ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে ভেকধারী বলে অভিহিত করতে তার বিবেকে বাধে না। প্রভাত যেখানে খানিকটা ভাবুক, উৎসা সেখানে ভীষণরকম কেজো; দু'জনে পরস্পরের নিখুঁত পরিপূরক। বামপন্থী চর্চার পীঠস্থান রূপে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় যে আজ সর্বখ্যাত, তার অনেকটা কৃতিত্বই এই দম্পতির আদর্শনিষ্ঠা ও উদ্দীপনাসঞ্চারের প্রতিভার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

নিবিড় ভালোবাসায় ঘিরে রেখেছে এরা দু'জন। পণ্ডিত ও পণ্ডিতম্মন্যদের মহলে আমার

সুনাম নেই, মারকুটে-ঝগড়াটে বলে বাজারে প্রসিদ্ধি, অন্য কোনও জ্ঞানপীঠস্থান থেকে আমার তেমন ডাক পড়ে না, উৎসা-প্রভাত অথচ আমাকে বেশ কয়েক বার তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছে; ওখানে ছেলেমেয়েদের কাছে বক্তৃতা দিয়ে, সতীর্থদের সঙ্গে অহোরাত্র আলোচনা করে, প্রচুর আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করেছি।

অমিত ভাদুড়ীর কথাও না বলে পারছি না। অমিত ললিতার অনুজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্দান্ত ভালো ছাত্র, কেমব্রিজে গিয়ে খ্যাতি কুড়িয়েছে, কিছুদিন দিল্লি স্কুলে পড়াবার পর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেকে চালান করেছিল। ধনবিজ্ঞানে ওরও প্রতিভার দীপ্তি দেশে-বিদেশে বিকীর্ণ। ললিতা-অমিতদের বাবা আদিনাথ ভাদুড়ী কমিউনিস্ট পার্টির উষামুহূর্তের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিলেন, আদর্শবাদী মানুষ, ছেলেমেয়েদের মধ্যেও সেই আদর্শের প্রতিফলন। দেশবন্ধু পার্ক-সংলগ্ন আদিনাথবাবুর বাড়িতে একদা প্রচুর আড্ডা দিয়েছি, গৃহস্বামীর ঔদার্যে অচিরে বয়সের ভেদাভেদ ঘুচে যেত। ললিতারা ভাইবোনরা সবাই, তাদের বাবা-মা, আগন্তুক আমরা, খাবার টেবিল ঘিরে বসে প্রহরের পর প্রহর পৃথিবীর সমস্যা, সমাজের সমস্যা, জীবনের সমস্যা নিয়ে অজস্র কথাবার্তা বলেছি, পারস্পরিক অনুরাগের বন্যায় ভেসে গেছি। কোনও বিশেষ পর্যায়ে যে বিন্দুতে অবস্থান, জীবনের এমনই নিয়ম, তাকে আমরা প্রতিনিয়ত অতিক্রম করি, জ্ঞানের পরিধি বাড়ে, একেক জনের একেক রকম করে বাড়ে, অভিজ্ঞতার গতিপথও আলাদা হয়ে যায়। পারস্পরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার অনুভব যদিও বজায় থাকে, আমরা তা হলেও আস্তে-আস্তে একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাই। বাইরে থেকে ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু অমিত আমাদের অনেকের চেয়ে, আমার ধারণা, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ঢের বেশি গোঁড়া। অধ্যাপনার সূত্রে তাকে মাঝে-মাঝে পূর্ব ইওরোপে সময় কাটাতে হয়েছে, ষাটের দশক থেকে ওই ভূখণ্ডে সাম্যবাদী আদর্শের প্রয়োগে যে নীতিবিচ্যুতি প্রকট হচ্ছিল, সে তার প্রত্যক্ষদর্শী। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায়, বামপন্থী আন্দোলনের যে ধরনধারণ, তা-ও তার আদৌ পছন্দ না। অমিতের অত্যন্ত সৎ ব্যক্তিত্ব, আমার রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে তার মতামতের আড়াআড়ি সে গোপন করে না, সম্ভবত সেই কারণেই ইদানীং তার সান্নিধ্য একটু কম পাই।

অথচ, অমিত ও মধুর কাছ থেকে যে-স্নেহ ও আদর পেয়েছি, তা অবিস্মরণীয়। বহুবার দিল্লিতে ও বিদেশে তাদের আতিথ্য গ্রহণ করেছি, তাদের পরিচর্যায় আপ্লুত হয়েছি। মধু এই মুহূর্তে পর্তুগালে আমাদের রাষ্ট্রদূত, অন্যান্য অনেক ভাষার সঙ্গে চমৎকার বাংলা বলে, হিন্দিতে গল্প-নাটক লিখে যশোমতী হয়েছে, শাস্ত্রীয় সংগীতেও অপূর্ব কণ্ঠলাবণ্য। চোদ্দো বছর আগে ফ্রাঙ্কফুর্টে যখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, মধু ভিয়েনা থেকে ছুটে এসে পরিচর্যার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, তার বিবরণ আগেই দিয়েছি।

তা হলেও দেশকে টেনে-হিঁচড়ে যেদিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে , সমাজকে যে-গভীর গড্ডালিকায় ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, তাতে শেষ পর্যন্ত তো না মেনে উপায় নেই, গ্রন্থাগারের অন্ধকারে শান্তি নেই, ব্যক্তিকেন্দ্রিক মন-দেওয়া-নেওয়ায় কোনও স্বস্তির প্রস্থান নেই, জীবনের নিয়ামক রাজনীতি, সেই রাজনীতির আবর্তে দ্বন্দ্বের যন্ত্রণায় নিপীড়িত হওয়া থেকে কারওরই অব্যাহতি নেই। অমিতের জীবনদর্শন থেকে ঈষৎ দূরে সরে এসেছি, প্রভাত-উৎসাদের সারণিতে আমার অবস্থান, যদিও অমিতের চারিত্র্যদার্ঢ্যের প্রতি শ্রদ্ধা আদৌ নির্বাপিত হয়নি।

তবে আমার তো এখনও কিছু অধ্যায় পেরনো বাকি আছে। তিরানব্বুই সালের প্রারম্ভ, শিক্ষা কমিশনের পর্ব চুকেছে। ই পি ডাব্লিউ-তে লেখা চালিয়ে যাচ্ছি, কলকাতায় যার পাঠক কম, ভারতবর্ষের অন্যত্র প্রচুর। কলকাতায়ও একটি-দু'টি কাগজে নিয়মিত লিখি, তবে তাদের সম্পাদকীয় আদর্শের সঙ্গে আমার মতামতের বিপরীত-মেরু সম্পর্ক, লিখে তেমন আরাম পাই না। বামপন্থী মহলেও স্বাভাবিক কারণে আমাকে নিয়ে ঈষৎ দ্বিধাবিজড়িত ভাবনা-অনুভাবনা। কারণটা বুঝতে অসুবিধা হয় না; সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাস করি, অথচ সাম্যবাদী সংগঠনের নিয়মকলা মেনে চলবো না, তা তো হতে পারে না। অহংবোধকে পুরোপুরি বিসর্জন দিতে না পারলে ভালো কমিউনিস্ট হওয়া সম্ভব নয়, অচিরেই তা বুঝতে পেরেছিলাম, নিজের চারিত্রিক অবস্থান সম্পর্কে কোনও কালেই আমার মনে কোনও বিভ্রান্তি ছিল না। দলের অনুশাসনের মধ্যে আমার পক্ষে থাকা দুষ্কর, এটা বুঝতে পেরেই ছিয়াশি সালে সরে এসেছিলাম। সমস্যাটি পার্টির নয়, পুরোপুরি আমার। দলের মিত্র হয়েই ওই সময় থেকে আমার সময় যাপন। অতিকিশোর বয়সে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর এক গল্পে দুই ব্যক্তির মাঠে চেয়ার পেতে বসার এক বর্ণনা পেয়েছিলাম : 'পাশাপাশি নয়, মুখোমুখিও নয়, সে এক অদ্ভুত নৈকট্য'। দলের সঙ্গে আমার বর্তমান সম্পর্ক অনেকটা সেরকম।

হয়তো শিক্ষা কমিশনের জন্য অত পরিশ্রম করেছি, তার পুরস্কারহেতু, হয়তো একানব্বুই সালের বিধানসভা নির্বাচনে স্বেচ্ছায় সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সঙ্গে টক্কর দিয়েছি বলে সান্ত্বনা পুরস্কার, কিংবা হয়তো সংসদে আমাকে দিয়ে কিছু দায়িত্ব পালন করিয়ে নেওয়ার অভিপ্রায়ে, একানব্বুই সালের মার্চ-এপ্রিল নাগাদ দল থেকে আমাকে রাজ্যসভায় প্রার্থী হতে অনুরোধ জানানো হলো; তেমন না ভেবে রাজি হয়ে গেলাম, যদিও দিল্লিতে বাসা বাঁধবার চিন্তায় তেমন উৎসাহবোধ করছিলাম না। ওই সময়ে শেয়ার বাজারের কেলেঙ্কারি এবং তার নায়কদের সঙ্গে বিদেশী ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির রমরমা সম্পর্ক নিয়ে প্রচুর জল ঘোলা হচ্ছিল। পার্টি থেকে হয়তো এটাও ভাবা হয়েছিল, অর্থমন্ত্রকের নাড়ি-নক্ষত্র যেহেতু আমার অনেকটা জানা, রাজ্যসভায় ঢুকে সোরগোল তুলতে পারবো। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের খামখেয়ালে রাজসভার নির্বাচন তিন-চার মাস পিছিয়ে গেল, দিল্লি পৌঁছুতে অগস্টের তৃতীয় সপ্তাহ। ততদিনে শেয়ার কেলেঙ্কারি নিয়ে সংসদীয় তদন্ত কমিটির কাজ অনেকটাই এগিয়ে গেছে, আমার আর তার সদস্য হওয়া হয়নি। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কমিটির প্রতিবেদন নিয়ে সংসদের দুই সভায় জোর বিতর্ক, রাজ্যসভায় দলের তরফ থেকে আমাকে বলতে বলা হলো। নতুন সদস্য হয়েছি, আসন নির্দিষ্ট হয়েছে পিছনের দিকের সরিতে। ইন্দ্রকুমার গুজরাল-জয়পাল রেড্ডিরা ধরে নিয়ে গিয়ে সম্মুখতম সারণিতে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মিনিট চল্লিশেক ধরে বলেছিলাম, শুরু করেছিলাম এই মন্তব্য দিয়ে যে আমারও জন্ম কংগ্রেসি পরিবারে, তাই কংগ্রেসের দুরাচার-আকীর্ণ অবস্থা দেখে ঘৃণাবোধের সঙ্গে মনস্তাপও আমার কম নয়। সম্ভবত এই প্রারম্ভিক উক্তির জন্যই কংগ্রেস বেঞ্চি থেকে একটি-দু'টি তির্যক মন্তব্য ছাড়া তেমন বাধা এলো না, বক্তৃতান্তে চারদিক থেকে আসন চাপড়ে তারিফ ধ্বনিও শোনা গেল। আরও যা মনে পড়ে, যেদিন রাজ্যসভায় শপথ নিলাম, সেদিনই কলকাতায় উৎপল দত্তের মৃত্যু, বিষণ্ণ বিকেলে খবরটা পেলাম। উৎপলের মতো প্রতিভাধর মানুষ বিংশ শতাব্দীতে বাংলায় তথা গোটা উপমহাদেশে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন; তার শূন্যস্থান সহজে পূর্ণ হবে না। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইদানীংকার ধুঁকতে-থাকা অবস্থা আমার অভিমতকে সমর্থন করবে। কুমার রায়ের মতো ধীশক্তি-ও তিতিক্ষা-যুক্ত কেউ-কেউ

এখনো শরীর পাত করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, নতুন-নতুন তরুণ প্রতিভারও উদয় যে হচ্ছে না তা নয়। তা হলেও সব মিলিয়ে মনে হয় গোধূলি লগনে মেঘে ঢেকেছে তারা।

এক ধরনের চিন্তাহীনতা থেকে সংসদে প্রবেশ করতে রাজি হয়েছিলাম, পস্তাতে দেরি হলো না। প্রথমেই ধাক্কা খেলাম সাংসদদের আচার-আচরণ দেখে। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় সংসদের মাহাত্ম্য সম্পর্কে অনেক রোমান্টিক অভিমত বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। নব্বুই দশকের সংসদ তাঁর সেই স্বপ্নলোকের পৃথিবী থেকে অনেক দূরে। যুক্তিসিদ্ধ আলোচনার ঋতু বহুদিন গত, সংসদের এ এক সম্পূর্ণ অন্য চেহারা। স্বাধীনতার পর প্রথম কয়েক দশক সংসদে প্রধান ব্যবহৃত ভাষা ছিল ইংরেজি, অবস্থা আগাপাশতলা পাল্টে গেছে। সদস্যরা প্রধানত হিন্দি ভাষা ব্যবহার করেন; অধিকাংশ সদস্য শুধু ইংরেজি বলতে নয়, বুঝতেও সমান অপটু। শ্রেণীগত ও বর্ণগত কিছু পরিবর্তনও চোখে পড়বার মতো। তথাকথিত অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ শ্রেণী ও বর্ণ থেকে সংসদে এখন যাঁরা আসছেন, স্বভাবে দেশজ, অতি প্রাকৃত তাঁদের চলন-বলন। একদিক থেকে বিচার করলে এটা চমৎকার ঘটনা : দেশের আসল মানুষগুলি সংসদে প্রতিনিধিত্ব করতে শুরু করেছেন। কিন্তু যা মনে হয় বাস্তবে ঠিক তা নয়। যদি ইংরেজি বা হিন্দি না-জানা কেউ থাকেন সংসদে, রুদ্ধবাক্ হয়ে থাকা ছাড়া গতি নেই তাঁর, বিশেষ করে যদি দরিদ্রতম শ্রেণীর তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন। ভাষাগত বিভাজন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিভাজনের গণ্ডি পেরিয়ে; হিন্দি না-জানা সদস্যদের তাই মস্ত অসুবিধা। সংবিধানের শর্ত যথার্থ মান্য করা হলে দেশের সব ক'টি স্বীকৃত ভাষার যে-কোনও একটিতে সদস্যদের বলবার এবং সঙ্গে-সঙ্গে তা অন্যান্য ভাষায় অনুবাদের প্রযৌক্তিক কৌশল প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা জরুরি ছিল। তা করা হয়নি, হিন্দি বা ইংরেজির বাইরে অন্য কোনও ভাষায় বলতে গেলে আগে থেকে সংসদ দফতরে জানাতে হয়, যে-ভাষায় বলতে সংসদসদস্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তার জন্য অনুবাদনবিশের ব্যবস্থা করা হয়, তিনি বা তাঁরা ধীরে-সুস্থে ভাষণের ইংরেজি ও হিন্দি বয়ান কয়েকদিন বাদে জমা দেন। প্রতিটি স্বীকৃত ভাষায় তাৎক্ষণিক অনুবাদের ব্যবস্থা না থাকায় অনেক সংসদ-সদস্যই বিপদে পড়েন; তাঁরা, যে কারণেই হোক, হিন্দি বা ইংরেজিতে তেমন রপ্ত নন, অথচ অনুবাদের ফেরে পড়তে অনিচ্ছুক, তাই বাধ্য হয়ে অপটু হিন্দিতে কিংবা অপটু ইংরেজিতে বক্তব্য পেশ করেন। তাঁরা কী বলছেন তা থেকে অন্য সদস্যদের শ্রবণ সরে গিয়ে তাঁদের বচনের ব্যাকরণ-ভাষাগত ত্রুটির দিকে নিবদ্ধ হয়, অনেক সময় হাসির খোরাক জোগায় পর্যন্ত। এরকম হওয়া কখনওই উচিত ছিল না, কিন্তু এই সমস্যা নিয়ে কারও তেমন গা নেই, এমনকি ভাষা-অভিমানী আঞ্চলিক দলগুলিরও নেই। আমার কাছে কিছুদিনের মধ্যেই প্রতীয়মান হলো, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-বাবাসাহেব আম্বেডকর-আম্মু স্বামীনাথনদের দিন শেষ, ইংরেজিতে চমৎকার বক্তৃতা দিলেও কল্কে পাওয়ার সম্ভাবনা কম, ভোজপুরি বা ছত্তিশগড়ি হিন্দিরই আসল কদর।

সমস্যা আসলে আরও জটিল, সদস্যদের চরিত্র পরিবর্তন ঘটিত। দেশের রাজনীতি থেকে নৈতিকতা অস্তগত, ভ্রষ্টাচার, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, এমনকি খুন-খারাপিও আর মোটেই নিন্দনীয় আচরণ নয়। তিনশো দুই ধারায় যদি দশটা-বিশটা মামলাও ঝুলতে থাকে, কোনও চিন্তা নেই, মামলার ফয়সালা হতে দুই যুগ অতিক্রান্ত হবে, ইতিমধ্যে সবাই-ই সমান সম্মাননীয় সদস্য। 'অগ্রগামী অধঃপাত' কথাটি একদা প্রচুর ব্যবহৃত হতো, ভারতীয় রাজনীতিবিদদের হালের স্বভাব-চরিত্র নিয়ে মন্তব্য করতে গেলে ওই শব্দদ্বয়ই মনে ভিড়

করে। পশ্চিম বাংলায় রাজনীতির চারিত্রিক নিম্নগামিতা শুরু হয় সত্তর দশকের সূচনা থেকে। রাজ্যে বর্ধমান বামপন্থী প্রভাব রুখতে ইন্দিরা গান্ধির চেলা-চামুণ্ডারা মার্কস-বর্ণিত লুম্পেনদের রাজনীতির মঞ্চে প্রধান ভূমিকায় নামিয়ে দিলেন। সব দলেই, কোনও দলে বেশি কোথাও কম, কিছু গুণ্ডাশ্রেণীর মানুষ নেতাদের হুকুম তামিল করবার জন্য থাকতো। তবে এতদিন তারা আড়ালে ছিল। সত্তরের দশকে যুগান্ত, তারা পাদপ্রদীপের সামনে চলে এলো। তারা সমাজের সমস্ত ক্লেদ নিজেদের মধ্যে জড়ো করেছে, কথায়-কথায় তারা মাথা ভাঙে, খুন-খারাপি করে, খিস্তি-খেউড় ছাড়া বাক্যবন্ধ রচনা করতে পারে না। অথচ তারাই, দেশের মহান নেতৃত্ব বলে দিলেন, জাতীয় যুব সম্প্রদায়ের আদর্শ, অন্তত আদর্শ হওয়া উচিত। অপকৃষ্টকে অনুসরণ করার তাগিদ আমাদের মিশ্র সমাজব্যবস্থায় অপ্রতিরোধ্য ব্যাধি। সত্তর দশকে প্রোথিত সেই বিষবৃক্ষ এখন প্রায় সর্বত্র শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। এই ব্যাপারে আমার প্রথম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হলো সাতাত্তরের নির্বাচনের পর বিধানসভায় প্রতিপক্ষ দলের কয়েকজন সভ্যকে দেখে, তাদের ভাষা-সহবৎ-আচরণ কর্কশ, কদর্য। ছেলে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী, বাজেট আলোচনা চলছে, আমার মা, তখনই তিনি আশি ছুঁই-ছুঁই, একদিন শখ করে বিধান সভায় আলোচনা শুনতে এলেন। সভায় অঙ্গভঙ্গি-নর্তনকুর্দন-কুবাক্যবর্ষণের সমাহারে তিনি স্তম্ভিতা, পরদিন ফোনে আমাকে অনুযোগ জ্ঞাপন করলেন : 'কাদের সঙ্গে মিশিস?'

সংসদে ঢুকে অভিজ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর হলো। সংস্কৃতিশূন্যতার, রুচিহীনতার জয়জয়কার। আর্যাবর্তের পাঁচ হাজার বছরের সঞ্চিত কর্দমের নমুনা যেন প্রদর্শিত হচ্ছে সংসদভবনে, বেশভূষা থেকে শুরু করে কথায়-বার্তায় এক ধরনের নিশ্চিন্ত উদ্ধতি, এই কর্দমাক্ত জীবরাই যেন সৃষ্টির নিয়ামক, তারা যা বলবে-করবে তা-ই সবাইকে মেনে নিতে হবে। যারা উত্তম, তারা ভয়ে-সংকোচে কোণঠাসা। সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একদা লিখেছিলেন, 'সামান্যাদের সোহাগ খরিদ করে চিরন্তনীর অভাব মেটাতে হবে'; সে যে কী ভয়ংকর ভাগ্যপরিণাম, জাতীয় সংসদে তা আপাতত দৃষ্টান্তিত।

এই কীচক সম্প্রদায়ই সারা দেশে এখন মন্ত্রী-কোটাল হচ্ছে, আর একবার বলি, অগ্রগামী অধঃপাত। বছর কুড়ি আগে, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় তখনও বেঁচে, একটি গল্প শুনিয়েছিলেন। দিল্লি থেকে হায়দরাবাদ-বাঙ্গালোরগামী বিমানে হায়দরাবাদ যাচ্ছেন, বিমানে নিজের জন্য নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করেছেন, বিমান ছাড়বার সময় হয়ে গেছে, এঞ্জিন চালু হয়েছে, শেষ মুহূর্তে শাদা সেফারি স্যুট-পরা একটি কদর্য চেহারার লোক ধপ করে পাশের খালি আসনটিতে এসে বসলো, বসেই চোখ বুজলো, সঙ্গে-সঙ্গে জেট এঞ্জিনের সঙ্গে পাল্লা-দেওয়া নাসিকাগর্জনসহ অঘোর ঘুম। বিমান আকাশে উড়লো, মিনিট পনেরো সময় কাটলো, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় দেখলেন, তাঁর আসনের আশে-পাশে কয়েকজন ঘোরাফেরা করছে, উসখুশ উসখুশ। এদের মধ্যে একজনের তাঁকে উদ্দেশ্য করে বিনীত প্রশ্ন : 'ম্যাডাম, ওই ওদিকে একটি খুব ভালো আসন খালি আছে, আপনি ওই আসনটিতে গিয়ে দয়া করে উপবেশন করবেন কি?' কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় অবাক, 'আমার জন্য এই আসন নির্ধারিত হয়েছে, আমি অন্যত্র উঠে যাবো কেন?' আমতা-আমতা জবাব : 'না, মানে, আমরা অনারেবল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। তাই আপনাকে অনুরোধ করছিলাম।' 'মুখ্যমন্ত্রী, কোন্ মুখ্যমন্ত্রী, কোথায়?' 'ওই যে, আপনার পাশে যিনি বসে আছেন, তিনি'। 'তাই নাকি, উনি কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী?' কমলাদেবী জানলেন, পাশে

নিদ্রামগ্ন ব্যক্তিটি তাঁর নিজের রাজ্য কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ধৈর্য ধরে জড়ো-হওয়া মানুষগুলিকে বললেন, 'কিন্তু উনি তো এখন ঘুমুচ্ছেন। উনি যখন জাগবেন, আপনাদের কথা ওঁকে বলবো, এখন দয়া করে আর এখানে ভিড় করবেন না।' অসন্তুষ্ট, মনস্কামনা অচরিতার্থ, মুখ্যমন্ত্রীদর্শনপ্রার্থীদের সাময়িক রণে ভঙ্গ দেওয়া। খানিক বাদে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আড়মোড়া ভাঙলেন, এদিক-ওদিক তাকালেন, সৌজন্যের অভাব নেই, কমলাদেবীকে আলতো করে নমস্কার। কমলা দেবী তাঁকে জানালেন, কতিপয় ভদ্রলোক তাঁদের অনারেবল চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক, সেই উদ্দেশ্যে তাঁকে, কমলাদেবীকে, আসনটি খালি করে দিতে বলেছিলেন, যদি মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে চান, তিনি উঠে অন্য আসনে যেতে সম্মত আছেন। বিশ্বের বিরক্তি মুখে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীঃ 'না, না, ম্যাডাম, আপনি বসে থাকুন। ওই লক্ষ্মীছাড়া লোকগুলি আমাকে বড়ো জ্বালায়, ওদের সঙ্গে বাক্যালাপের আমার একেবারে ইচ্ছা নেই'। একটুক্ষণ নীরবতা, হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রীর বিনীত প্রশ্ন : 'ম্যাডাম, আপনার শুভ নাম কি জানতে পারি?' কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় নাম বললেন, মুখ্যমন্ত্রীর কোনও ভাব-বিকার নেই। এবার দ্রুত পরের প্রশ্ন : 'ম্যাডাম, আপনার স্বামীর শুভ নাম কি জানতে পারি?' কমলা দেবী অস্পষ্ট একটি জবাব দিলেন। মুখ্যমন্ত্রী তবু বেপরোয়া : 'ম্যাডাম, আপনার স্বামী কী কাজ করেন? ক'টি ছেলেমেয়ে আপনার?' মহিলার ধূসরতর, অস্পষ্টতর উত্তর, মুখ্যমন্ত্রী একটু দমে গিয়ে অবশেষে নীরব, কমলাদেবী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তবে সমাপ্তির পরও সমাপ্তি থাকে। হায়দরাবাদে বিমান থেমেছে, কমলা দেবী অবরোহণের জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন, সৌজন্যের প্রতিমূর্তি মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে, কর্ণাটকের বিখ্যাততমা দুহিতাকে, বিদায় সম্ভাষণ জানালেন, 'ম্যাডাম, আপনি অবশ্যই একবার কর্ণাটকে আসবেন, কর্ণাটক অতি চমৎকার রাজ্য'।

আজি যে রজনী যায় ফিরাইবো তায় কেমনে। অথচ, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগে, কর্ণাটকেরই মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন রামকৃষ্ণ হেগড়ে ও বীরেন্দ্র পাটিলের মতো শালীন ব্যক্তিবর্গ। হেগড়ের কথা ইতিমধ্যেই নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। বীরেন্দ্র পাটিল ষাটের দশকে রাজ্যের কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী, আশির দশকে ইন্দিরা গান্ধির পুনরাগমনের ঋতুতে কেন্দ্রে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হয়েছিলেন। সদ্য ঘোষণা করা হয়েছে, ত্রিভুবননারায়ণ সিংহকে পশ্চিম বাংলার রাজ্যপালের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। সেই সপ্তাহে কী কাজে দিল্লিতে বীরেন্দ্র পাটিলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি, আমাকে বললেন, 'দয়া করে আমার একটু উপকার করবেন? অত্যন্ত অনুগৃহীত বোধ করবো যদি কলকাতায় ফিরে গিয়ে ত্রিভুবননারায়ণজীকে জানান, ভদ্রমহিলা তাঁর সঙ্গে যে-আচরণ করলেন তাতে আমি মর্মাহত।' আমি কথাটি বাইরে ফাঁস করে দিলে ভদ্রমহিলা অবধারিত পাটিলের চাকরি খেতেন, কিন্তু যা বলা উচিত বলে মনে হয়েছে, তা বলতে পাটিল ভয় পাননি।

হতাশার মুহূর্তে খানিকটা রঙ্গ করে কাকে যেন একবার বলেছিলাম, সংসদে আমার বাঁ দিকে যারা উপবিষ্ট, তারা প্রায় প্রত্যেকেই একটি-দু'টি করে খুন করেছে, আর ডান দিকে যারা, তারা অসাধু উপায়ে অন্তত একশো-দু'শো কোটি টাকা কামিয়েছে। কে জানে, এই যে বিলাপটি এখানে লিপিবদ্ধ করছি, সেই অপরাধেই কোনও মাননীয় সদস্য হয়তো সংসদের কাঠগড়ায় আমাকে ডেকে পাঠাবেন। লোকসভা ও রাজ্যসভা দু'জায়গাতেই এই চারিত্রিক রূপান্তর। রাজ্যসভার ক্ষেত্রে আরও কিছু বাড়তি সমস্যা ইদানীং দেখা দিয়েছে।

সাধারণ্যে ধারণা ছিল, অপেক্ষাকৃত প্রবীণ ব্যক্তিরাই রাজ্যসভার সদস্য হবেন; নিয়মাবলীতেও নির্দিষ্ট, রাজ্যসভায় সদস্য হতে গেলে ন্যূনতম বয়স, লোকসভার ক্ষেত্রে যা, তার চেয়ে বেশি হওয়া আবশ্যক। হালে সম্পূর্ণ উল্টো ব্যাপার ঘটছে। রাজ্যসভার সাংসদদের গড় বয়স এখন লোকসভাভুক্ত সাংসদদের গড় বয়সের চেয়ে কম। উঠতি ছাত্র ও যুব নেতারাও, রাজ্য বিধানসভায় নিজ দলের ভোট ভারি থাকার জন্য, সহজেই রাজ্যসভায় নির্বাচিত হচ্ছেন, যেমন হচ্ছেন উঠতি শিল্পপতিনন্দন বা ধনী কৃষককুলের অল্পবয়স্ক সন্তান, কিংবা সফল ঠিকেদার বা দালাল বা, বলেই ফেলি, সর্ব-অর্থে সমাজবিরোধী। এঁদের মধ্যে অনেকে হয়তো নির্বাচক-মণ্ডলীর আস্থা অর্জন করতে অসমর্থ, দু'-তিনবার লোকসভার নির্বাচনে দাঁড়িয়ে হেরেছেন, এবার বিধানসভায় পার্টির ভোটাধিক্যের জোরে রাজ্যসভায় আসীন। যে-ভাবনা-চিন্তার ধার-ভার রাজ্যসভার সদস্যদের কাছে শাদামাটাভাবে আশা পোষণ করা যায়, তাঁদের দিয়ে তা পূরণ হবার প্রশ্ন নেই। মানছি, জ্যোর্তিময় বসুর মতো চৌখস বহু সামাজিক গুণাবলীমণ্ডিত মানুষের পক্ষে এই পরিবেশেও তুই-তোকারি করে আসর জমানো অসম্ভব হতো না; সেই প্রতিভা তো সবাইর বর্তায় না।

অন্য এক সমস্যার ব্যঞ্জনা গভীরতর। সংবিধান ও তৎসম্পর্কিত আইনে অনুশাসন, একমাত্র রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসীরাই রাজ্য থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হতে পারবেন। এই নিদানের নিহিতার্থ মোটেই অস্বচ্ছ নয়। সংবিধান-রচয়িতারা ভেবেছিলেন রাজ্যসভায় প্রধানত রাজ্যগুলির বিশেষ-বিশেষ সমস্যার উপর অধিকতর আলোকপাত করা হবে, বিশ্লেষণযুক্ত আলোচনার পর সমাধানের সূত্র খোঁজা হবে। বামপন্থীদের বাইরে অন্য কোনও রাজনৈতিক দলই এই স্পষ্ট নির্দেশ মানেনি। শেয়ালকে ভাঙা বেড়া প্রথম দেখিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধি, তাঁর প্রায়-স্বৈরাচারিণী পর্বে : অনুগত বাঙালি বিদূষককে গুজরাট থেকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছেন, অনুরূপ কোনও পেটোয়া পঞ্জাবতনয়কে অসম থেকে রাজ্যসভায় হাজির করেছেন, নয়তো কেরল রাজ্যের এক বশংবদ ব্যক্তিকে রাজস্থান থেকে। ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে, স্থায়ী বসবাস প্রমাণের যে-নির্দেশনামা তা এড়িয়ে, পছন্দের মানুষদের রাজ্যসভায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মহাজ্ঞানী-মহাজন অনুসৃত সেই পথের পথিক হতে ভালোভাবে শিখেছে দেশের অন্য দলগুলিও। জনতা দল কর্ণাটকের মানুষকে ওড়িশা থেকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টি কলকাতায় তিন পুরুষ ধরে বসবাসকারী নাগরিককে রাজ্যসভায় আসীন করেছে উত্তর প্রদেশ থেকে। ফের বলছি, একমাত্র ব্যতিক্রম বামপন্থী দলগুলি।

ফলে যা হবার তাই-ই হয়েছে। রাজ্যগুলির আর্থিক-সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ নানা সমস্যা নিয়ে রাজ্যসভায় বিস্তারিত হবার খুব কম সুযোগই এখন সদস্যদের ভাগ্যে ঘটে, হামেশা দেখা যায় মাননীয় সাংসদ যে-রাজ্য থেকে নির্বাচিত হয়েছেন, তার প্রধান ভাষা পর্যন্ত জানেন না তিনি, ওখানকার সমস্যাদি সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট কেন, ভাসা-ভাসা কোনও ধ্যান-ধারণাও নেই, কী আলোচনা করবেন তা হলে? রাজ্যসভা গঠনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই তাই ব্যর্থ হতে বসেছে। বিপরীত মতাবলম্বীও অবশ্য অনেকে আছেন; তাঁরা বলবেন জাতীয় সংহতির স্বার্থেই অন্য রাজ্যবাসী, ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষজনকে প্রত্যেক রাজ্য থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচন প্রয়োজন। বেশ তো, তাঁদের কথা যদি মেনে নিতে হয়, অনুগ্রহপূর্বক সংবিধান ও সংশ্লিষ্ট আইনগুলি পাল্‌টানো হচ্ছে না কেন?

তবে মূল সমস্যা সভ্যদের চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক মান-সংশ্লিষ্ট। যদি দাগী অপরাধীদের দিয়ে সংসদের উভয় কক্ষের শোভা বর্ধন করা হয়, তা হলে সংসদের মান উঁচু থাকবে, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা মিহিন সুসংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা দেবেন, বিষয় নির্বাচনে চিন্তার গাম্ভীর্য প্রদর্শন করবেন, এ সবই দুরন্ত দুরাশা। উভয় সভাই এখন হট্টমেলায় পরিণত, নীতি-নিয়মের তোয়াক্কা হ্রস্বমান, দেশের-সমাজের প্রধান সমস্যাগুলি অনাদরে অবহেলিত, অন্য দিকে তুচ্ছ কিন্তু চমকপ্রদ ঘটনা বা গুজব নিয়ে অন্তহীন শোরগোল-চেঁচামেচি, কখনও-কখনও প্রায় আস্তিন গুটিয়ে মারামারি। এই রুচিনিম্নগামিতা সংক্রামক : সদস্যরা আলতু-ফালতু কথা বলছেন, ঠুনকো বিষয়ে প্রহরের পর প্রহর জুড়ে বিস্তারিত হচ্ছেন, হচ্ছেন এমন ভাষায় যা বেশির ভাগ সদস্যের মালুম হচ্ছে না, তাঁরা স্বভাবতই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। এরকম পরিস্থিতিতে গলাবাজিরই প্রধান দাপট : যিনি যত চেঁচাতে পারবেন, তত বেশি তিনি সভা-পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। সভার অধিকাংশ সময় এই শ্রেণীর সদস্যদের দখলে অবলীলাক্রমে চলে যায়, স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের অভব্যতা-অভদ্রতার নেশাও চড়ে। তাঁরা গলা উঁচু করে যা বলছেন, তাই-ই প্রাধান্য পাচ্ছে, বেতারে-টেলিভিশনে প্রচারিত হচ্ছে, খবরের কাগজে প্রত্যহ সংবাদচূড়ামণি তাঁরা। শৃগাল-কুকুরসম চিৎকার-শীৎকারের সময়সীমা সকাল এগারোটা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত। এগারোটা থেকে বারোটা এক ঘণ্টা জুড়ে মৌখিক প্রশ্নোত্তর পর্ব, বারোটা থেকে পরবর্তী ঘণ্টা দেড়েক 'মুক্ত প্রহর,' অথবা দৃষ্টি আকর্ষণী আলোচনা। এই আড়াই ঘণ্টা কালপরিসর মাননীয় হুল্লোড়বাজদের সুবর্ণ মুহূর্ত। তাঁরা চেঁচাচ্ছেন, বেয়াদপি করছেন, প্রতিপক্ষকে সভার বাইরে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করছেন, আপত্তিজনক প্রায়-অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে সংবাদপত্রাদির খিদের খোরাক মেটাচ্ছেন। একজন-দু'জন সদস্য প্রশ্ন করবার কিংবা আলোচনায় যোগ দেওয়ার পূর্বক্ষণে ঘাড় ফিরিয়ে প্রেস গ্যালারির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, আশ্বস্ত হতে চান তাঁদের পছন্দের সাংবাদিকটি উপস্থিত আছেন কিনা, শেষোক্ত জনকে চোখে না পড়লে মাননীয় সদস্য ফের আসন পরিগ্রহ করেন, কারণ স্পষ্ট।

মেঘনাদ সাহা, ফিরোজ গান্ধি, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কে টি শাহদের সংসদ থেকে বহুদূর চলে এসেছি আমরা। ভাষার সৌকর্যপ্রদর্শনের ঋতু অবসিত, বিশেষ করে ইংরেজি ভাষার। বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের বিনিময়-প্রতিবিনিময়ও ক্রমশ নির্বাপিত। চতুর আক্রমণ প্রতি-আক্রমণে, অথচ সুভদ্র বাক্যব্যবহারে, পরস্পরকে বিদ্ধ করবার শৌখিনতাও আর কল্পনা করা সম্ভব নয়। এখন রীতি দাঁড়িয়ে গেছে প্রতিদিন অধিবেশনের প্রথম আড়াই ঘণ্টা, অর্থাৎ প্রশ্নোত্তরের সময়, মুক্ত প্রহরে অথবা দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব আলোচনার কালে, সদস্যরা যথেষ্ট পরিমাণে উপস্থিত। প্রেস গ্যালারিতেও তখন অধিকাংশ দিনই উপচে পড়া ভিড়। কিন্তু মধ্যাহ্ন বিরতির পর, দুপুর আড়াইটে-তিনটে নাগাদ, সভা যখন ফের বসে, প্রায়-শূন্য অধিবেশন কক্ষ, সমপরিমাণ শূন্য প্রেস গ্যালারি। হয়তো কোনও আইন প্রণয়ন করা হবে, তা নিয়ে আলোচনা, কিংবা দেশের অর্থনীতি নিয়ে, গ্রামোন্নয়নের সমস্যা অথবা নারী নির্যাতন সমস্যা নিয়ে। যাঁরা বলবেন তাঁরা থাকেন, একজন-দু'জন মন্ত্রী থাকেন, দয়াপরবশ হয়ে আরও দু'একজন থাকেন, কারণ তাঁরা সৌজন্যে বিশ্বাস করেন। বিরস দিন, বিরল কাজ, প্রবল বিদ্রোহে অধিকাংশ সদস্য হয় নিজ-নিজ আবাসে দিবানিদ্রায় মগ্ন, কিংবা সংসদভবনের কেন্দ্রীয় হলে বসে তাঁদের নরক গুলজার।

বিকেলের দিকে বেশ কিছু তন্নিষ্ঠমনা সাংসদ সুন্দর সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করেন দেশের প্রধান সমস্যাদি নিয়ে; সেসব বক্তব্য ধারাবিবরণীতে নিঃসাড় লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে, সংবাদপত্রে কোনও প্রতিবেদন জায়গা পায় না, বেতার-দূরদর্শনেও না। ইংরেজিতে বক্তৃতা দিলে তো পরিস্থিতি শোচনীয়তর, সব মিলিয়ে বড়ো জোর কুড়ি-পঁচিশজন বসে থাকেন, যিনি বলছেন তাঁর দলভুক্ত কেউ-কেউ, অন্য দলের মুষ্টিমেয় কয়েকজন অবশ্য মন্ত্রীর বক্তৃতা থাকলে সংখ্যা একটু ভারি হয়, আর যদি ভোটাভুটির ব্যাপার থাকে, তা হলে ঘণ্টা বাজে, এখান-ওখান থেকে পালিয়ে-বেড়ানো সদস্যরা জড়ো হন, ভোটপর্ব সমাধা হওয়া মাত্র তাঁদের শনৈঃ পুনঃপ্রস্থান, ভারতীয় গণতন্ত্র যে দীর্ঘজীবী হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ঊনচল্লিশ

রাজ্যসভায় প্রথম বছরটি অন্তত তত খারাপ লাগেনি। মন্ত্রী-সদস্যদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই পূর্বপরিচয় ছিল, অন্য অনেকে আমাকে নামে জানতেন। রাজ্যসভা চালনা করতেন তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি, পরে রাষ্ট্রপতি, কে. আর. নারায়ণন, তাঁকেও পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকে চিনি, তিনি তখন বৈদেশিক মন্ত্রকে ডেপুটি সেক্রেটারি, তাঁর ব্রহ্মদেশজাতিকা স্ত্রী উষা সমভিব্যহারে মাঝে-মাঝে দাতরজির বাড়ির আড্ডায় জমায়েত হতেন। আমি কোনওদিনই হাতে নোট নিয়ে বক্তৃতা দিতে পারি না, যা বলবার মনে-মনে গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করি, আমার ধারণা তাতে বক্তব্যকে অনেক তরতাজা করে পরিবেশন করা সম্ভব। বক্তৃতা দিয়ে কিছু সদস্যের কাছ থেকে তারিফ পেতেও শুরু করেছিলাম। প্রথম কয়েক মাস নিবিড় আস্তিকের মতো প্রশ্ন পেশ করতাম, দৃষ্টি আকর্ষণী বিষয়ের উপর নোটিস জমা দিতাম, প্রধানত অর্থনীতি-সংক্রান্ত বিষয়ে। পুরনো সহকর্মী একদা-সুহৃদ মনমোহন সিংহ, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, আর্থিক সংস্কারের হোতা হিশেবে তাঁর নাম তখন ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। আমিও বৃত্তিতে অর্থনীতিবিদ, তিনিও অর্থনীতিবিদ, গোড়ার দিকে ধরে নিয়েছিলাম যদিও আমাদের পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গির দুস্তর পার্থক্য, অর্থশাস্ত্রের যুক্তি-ব্যাকরণের ভিত্তিতেই আমাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চলবে। অল্প দিনেই ভুল ভাঙলো। ততদিনে মনমোহন ঝানু রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিগত কোনও সমস্যার প্রসঙ্গ তুললে জবাবে তা এড়িয়ে গিয়ে তাঁর রাজনৈতিক ঝোঁক প্রকট থেকে প্রকটতর। সৌজন্যে ভেসে গিয়ে কী লাভ, বিবমিষা উদ্রেক করতো তাঁর স্বভাবভীরুতা, যাকে অনেকে বিনয় বলে ভুল করতেন। মনমোহন যখন যোজনা কমিশনে, তখন থেকেই লক্ষ্য করছিলাম নেহরু পরিবার সম্পর্কে তাঁর অন্ধ বিদূষণার প্রবণতা, সর্ববিধ জাগতিক সাফল্যেও তাঁর সেই অপগুণে মরচে পড়েনি। তবে, এতদিনের চেনা-জানা, প্রথম বছরটিতে তাই রাজনীতি-অর্থনীতির আড়াআড়ি সত্ত্বেও আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কে চিড় ধরেনি। কিন্তু তাঁর সংকল্প, সংস্কারের রথ অপ্রতিহত গতিতে চালিয়ে যাওয়া, তাই একটির পর-আর একটি বিরাষ্ট্রীয়করণের খসড়া আইন অর্থমন্ত্রী কর্তৃক সংসদে পেশ করা হচ্ছে, স্টেট ব্যাংক সংক্রান্ত আইন, অন্যান্য ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত আইন, বিমা বিজাতীয়করণ বিল, বাজেট বিবৃতি, বিদেশী বিনিয়োগ ভিক্ষা ইত্যাদি। মনমোহনের কার্যাবলীর বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদের স্বর ক্রমশ ধৈবত থেকে আরও উচ্চগ্রাম হলো। কাছের মানুষ ছিলাম, দূরে সরে এলাম।

মনমোহনের একটি বিশেষ আচরণ অত্যন্ত ব্যথিত করেছিল। ওজনদার শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে দেদার ঋণ গ্রহণ করেন, কিন্তু ফেরত দেবার নামটি নেই, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তাঁদের দহরম-মহরম, ব্যাংককর্তাদের ঘাড়ে ক'টা মাথা যে তাঁদের উপর হম্বিতম্বি চালায়। ইতিমধ্যে রিজার্ভ ব্যাংক থেকে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছিল; তথ্যে টইটম্বুর: বিভিন্ন ব্যাংকে এক-কোটি-টাকার-উপর-

ঋণবদ্ধ ব্যক্তি ও সংস্থার বিশদ তালিকা; তাদের অদেয় ঋণের সামগ্রিক পরিমাণ, দেখা গেল, পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে (যা হালে এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশিতে দাঁড়িয়েছে)। কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রতিবেদনটির অনুলিপি পৌঁছে গেছে, অথচ সংসদ সদস্যরা তার টিকিটিও দেখেননি। অর্থমন্ত্রকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কনসালটেটিভ কমিটির বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপন করলাম, বৈঠক চলাকালীনই অর্থ সচিবের সঙ্গে ক্ষণিক পরামর্শ-অন্তে প্রতিবেদনটি সংসদসদস্যদের কাছে পেশ করতে অর্থমন্ত্রীর সম্মতি জ্ঞাপন। কমিটির সভায় ধন্যি-ধন্যি পড়লো, মন্ত্রী অনেক বাহবা কুড়োলেন, কিন্তু দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায়, ওই দলিলটি আর আমরা হাতে পাই না। অর্থমন্ত্রীকে চিঠি দিলাম, জবাব নেই। ফের চিঠি দিলাম, এবার কনসালটেটিভ কমিটির অন্য সদস্যদের কাছে সেই চিঠির প্রতিলিপি পাঠালাম। অর্থমন্ত্রীর নিঃশব্দতা অটুট রইলো। কমিটির পরের বৈঠকে অর্থমন্ত্রীকে চেপে ধরলাম। মনমোহনের যেন আকাশ থেকে পড়া : 'কই, আমি এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম নাকি? মনে তো পড়ে না; হয়তো ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।' আমি স্তম্ভিত, সেদিনই বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে মনমোহনকে তুলোধোনা করেছিলাম। যে-অসাধু বড়োলোকরা এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ব্যাংকগুলি থেকে ধার নিয়ে ফেরত দেয়নি, তাদের নাম প্রকাশ করতেও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর অনীহা, শ্রেণীস্বার্থ। অথচ এই টাকার অর্ধেক ফেরত এলেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির আর্থিক সচ্ছলতায় প্রত্যাবর্তন ঘটতো, এবং তেমনটা হলে আর হাজার-হাজার ব্যাংক কর্মচারীকে ছাঁটাই করার অজুহাত অনুপস্থিত থাকতো।

সংসদের হালচাল, কেন্দ্রীয় সরকারের আচার-আচরণ, নতুন দিল্লির আবহাওয়ার সঙ্গে লেপ্টে-থাকা মসৃণ পরিতৃপ্তির পরিবেশ : সব-কিছু নিয়েই আমার অনীহাবোধ গভীর থেকে গভীরতর। তা হলেও অস্বীকার তো করতে পারি না, এই নিরানন্দের মধ্যেও কয়েকজন সাংসদকে ব্যক্তিগত স্তরে পছন্দ করতাম। সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে প্রয়াত প্রগাদা কোটাইয়াকে : কংগ্রেস দলের শেষ বেঞ্চিতে বসতেন, সারাটা জীবন গরিব তন্তুবায়দের হাল ফেরাবার লক্ষ্যে নিমগ্ন থেকেছেন, দলে কেউ তাঁর কথা শোনে না, গরিবদের জন্য তো আর ভাবার প্রয়োজন নেই সংস্কার-উত্তর যুগে। কোটাইয়া তবু অদমনীয়, একা লড়াই করে যাচ্ছেন, যে-জীবনদর্শনে বিশ্বাস করেন, তার তাগিদে। সম্ভবত পৃথিবীময়ই এমন সাচ্চা মানুষদের সংখ্যা কমে-কমে আসছে।

জনতা দলের কমলা সিংহের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক ছিল : বঙ্গললনা, বিয়ে করেছিলেন রামমনোহর লোহিয়া-ভক্ত বাসোয়ান সিংহকে, স্বামীর মৃত্যুর পর বিহারেই জন-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। কেউ-কেউ অবাক হবেন, ভারতীয় জনতা পার্টির কয়েকজনের সঙ্গেও সৌহার্দ্যসম্পর্ক অস্বীকার করতে পারি না। সিকান্দর বখ্‌তের মতো সজ্জন প্রবীণ পুরনো কংগ্রেসি কোন্ পাকচক্রে হিন্দুত্বওলাদের খপ্পরে পড়েছিলেন, তা নিয়ে এখনও আমার বিস্ময়। আমার একদা ছাত্র, বইয়ের পোকা, ত্রিলোকীনাথ চতুর্বেদী, একসময়ে কেন্দ্রে স্বরাষ্ট্রসচিব, কম্পট্রোলর অ্যান্ড অডিটর জেনারেল হিশেবে অবসর নিয়ে সংসদে সদস্য, জনতা দল প্রার্থী করলো না বলেই বোধহয় ভাজপা-তে, কিন্তু ঘোর বেমানান; এখন সে কর্ণাটকের রাজ্যপাল। উল্লেখ করবো আইনজীবী প্রয়াত সতীশ অগ্রওয়ালের কথাও : জয়পুরের আইনজীবী, জনতা সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকে রাষ্ট্রমন্ত্রী, ভদ্রতার সঙ্গে সততার মিশেল চরিত্রে। নারায়ণনের পর যিনি উপরাষ্ট্রপতি তথা

রাজ্যসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়ে এলেন, কৃষ্ণকান্ত, তাঁর কাছ থেকেও সুন্দর ব্যবহার পেয়েছি, বক্তৃতা ভালো লাগলে ডেকে প্রশংসা করতেন, এখানে-ওখানে আমার লেখা পড়ে পছন্দ হলে তারও উল্লেখ করতেন। তিনিও এখন প্রয়াত, যেমন প্রয়াতা সুশীলাদি, সুশীলা গোপালন, এ কে. গোপালনের জীবনসঙ্গিনী, আদর্শনিষ্ঠার সঙ্গে ভালোত্বের এমন সমাবেশ অতি বিরল। আরও দু'জনের কথা যোগ করি : গান্ধিবাদী নির্মলা দেশপাণ্ডের মতো সৎ স্পষ্টবাদিনী মহিলা কংগ্রেস দলে এখনও টিকে আছেন কী করে কে জানে, কী করেই বা ইন্দিরা গান্ধির স্বেচ্ছাচারিণী ভূমিকার তারিফ করতেন একদা। রাজ্য সভায় মণিপুর থেকে নির্বাচিত সদস্য কুলবিধু সিংহর দেশপ্রেম ও ন্যায়নিষ্ঠা মুগ্ধ করতো। সমান পছন্দ করতাম বাবাসাহেব অম্বেদকরের নাতি প্রকাশ অম্বেডকরকে; সুন্দর বলিয়ে, সুভদ্র আচরণ। তরুণতর বামপন্থী সাংসদদের মধ্যে সবচেয়ে পরিশ্রমী, সবচেয়ে আদর্শ-অবিচল, ইংরেজি-হিন্দি-বাংলা সব ভাষাতেই বলতে তুখোড়, সচ্ছল কাজের মোহ ছেড়ে সক্রিয়ভাবে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনে যোগ দেওয়া দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়কে; তার প্রতিভা ও অধ্যবসায় তাকে অনেক দূর নিয়ে যাবে।

বামপন্থী মহলের বাইরে ভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে বড়ো সমস্যা, দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলছি, আকাট আদর্শহীনতা। আদর্শের প্রতি, ন্যূনতম আনুগত্য নেই, আসলে আদর্শ বলেই কিছু নেই, সকালে এক দল, বিকেলে আর এক দল, অবলীলার সঙ্গে কংগ্রেস থেকে ভাজপা-তে, নয়তো ভাজপা থেকে কংগ্রেসে, জনতা থেকে ভাজপা বা কংগ্রেসে, স্বচ্ছন্দে এধরনের স্বৈরবিহার। জাতীয় পর্যায়ে সবাই যেন মেনে নিয়েছেন এই আদর্শহীন বিবেকশূন্যতা, যেন এটাই নিয়ম। পরিণামে রাজনীতির সংজ্ঞা এখন নিছক ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির হিশেবে দাঁড়িয়ে গেছে : কোন দলে গেলে মন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে, কী করে আরও একটু বড়ো বাংলোয় বাস করা যায়, ওর ছ'টা নিরাপত্তারক্ষী, আমার মাত্র চারটে কেন ইত্যাদি ব্যাপারে সংহত মনোনিবেশ, কাকে খুশি করলে সরকারি পয়সায় ঘন-ঘন বিদেশসফরে যাওয়া যায় তা নিয়ে বিচিন্তা; রাষ্ট্রের সার্বিক মঙ্গল নিয়ে মাথা ঘামানোর আর প্রয়োজন নেই, রাজনীতিবিদের আধুনিকতম পরিশব্দ: ধান্দাবাজ বা ফন্দিবাজ।

অসুখী বোধ করার সামান্য অন্য কারণও ছিল। ছিয়াশি সাল থেকে পার্টির আর সভ্য নই, অথচ দলের হয়ে রাজ্যসভায় সদস্য হয়েছি। যেটা আমার আগে খেয়াল করা উচিত ছিল, দেরিতে বোধোদয় হলো, সংসদে দলের কোনও দায়িত্বের পদাধিকারী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, নেতা-উপনেতা-প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ইত্যাদি পদে বৃত হওয়া আমার এখতিয়ারের বাইরে, ব্যাকবেঞ্চার হিশেবেই থেকে যেতে হবে আমাকে। তাতে একটু সমস্যা। সভাধ্যক্ষ ও সহ-উপাধ্যক্ষদের সঙ্গে নিয়মিত আলাপ-আলোচনায় কিংবা কার্যসূচি নির্ধারক কমিটিতে থাকতে পারছি না, অন্যান্য দলের সঙ্গে কথাবার্তার সময়ও উপস্থিত থাকার সুযোগ নেই। আমার চেয়ে বয়সে-অভিজ্ঞতায় পর্যাপ্ত খাটো এমন অনেকে, যেহেতু তারা পার্টির সদস্য, তারা পদাধিকারবলে সংসদে পার্টির নীতি-আচরণকৌশল কী হবে, তার নিয়ামক, আমাকে তা মেনে নিতে হয়। সে বেচারিদের অপরাধ নেই, পার্টি তাদের যে-দায়িত্ব দিয়েছে, তারা পালন করছে মাত্র। ব্যক্তিগত অস্বস্তি তাতে অবশ্য কমবার নয়। অর্থনীতি-সংক্রান্ত বিষয়াবলী নিয়ে বক্তৃতা দিই, যখন বলি মোটামুটি সভাস্থ সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনেন, কিন্তু আমার যে-মানসিক গঠন, শুধু অর্থনীতি কপচানোয় আনন্দ পাই না, ঈষৎ একঘেয়ে লাগে, একঘেয়েমি থেকে অবসাদ, অবসাদ থেকে অন্যমনস্কতা। ধনবিজ্ঞানের বাইরেও

আমার যে আরও অনেক দিকে আগ্রহ আছে, তা রাজ্যসভায় বিস্মৃত হয়ে থাকতে হয়। মাঝে-মাঝে সন্দেহ উঁকি দিচ্ছিল, আমার তো তেমন সুনাম নেই, পার্টি লাইনের বাইরে ইতিউঁতি মন্তব্য করবার নজির অতীতে স্থাপন করেছি, পার্টি নেতৃত্ব তাই হয়তো রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছেন। বাড়তি মুশকিল দেখা দিল, যখন অর্থনীতি-সংক্রান্ত বিষয়েও আমার বরাদ্দ সময়ের উপর কনিষ্ঠতর কারও-কারও থাবা উদ্যত হলো।

তবে অন্য কথাও বলতে হয়। আমাকে যে-প্রদেয় মর্যাদা, তা রীতিগত অসুবিধাহেতু পার্টি নেতৃত্ব দিতে পারছিলেন না কিন্তু যথেষ্ট আকর্ষণীয় বিকল্প ব্যবস্থা করে দিলেন। যে ছ'বছর রাজ্যসভায় ছিলাম, পার্টির সুপারিশে প্রায় সাড়ে চার বছর সংসদের শিল্প-সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ছিলাম, শেষের বছরটা বাণিজ্য-সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি। লোকসভা-রাজ্যসভা মিলিয়ে স্থায়ী কমিটিগুলি সংগঠিত, বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের যুক্ত করে; কমিটিগুলির সভাপতির পদ বিভিন্ন দলের মধ্যে বণ্টন করা হয় আনুপাতিক হিশেবে। কোনও সরকারি আইনের খসড়া যথোপযুক্ত কমিটির কাছে অনেক ক্ষেত্রে প্রাগালোচনার জন্য পাঠানো হয়। অধিকন্তু কমিটিগুলির দায়িত্ব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের আওতা-ভুক্ত যে-কোনও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে প্রতিবেদন দাখিল করা। সেদিক থেকে দেখলে কমিটিগুলির সার্বভৌম অস্তিত্ব : মন্ত্রকের রাজপুরুষদের আলোচনার জন্য তাঁরা ডেকে পাঠাতে পারেন, যেমন ডাকতে পারেন যে-কোনও সাধারণ নাগরিককে, অথবা শিল্প সংস্থা, বাণিজ্য সংস্থা, কৃষক সভা তথা শ্রমজীবী সঙ্ঘের প্রতিনিধিদের। প্রতিবেদন উভয় কক্ষে পেশ হওয়ার পর কমিটির সুপারিশসমূহ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক মতামত জানাতে দায়বদ্ধ। কোনও সুপারিশ গ্রহণে সরকারের অসুবিধা থাকলে তার কারণ দর্শানোও মন্ত্রকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তবে শেষ পর্যন্ত ইত্যাকার কমিটির প্রতিবেদন থেকে বিশেষ লাভ হয় বলে আমার অন্তত মনে হয় না। কারণ বহুবিধ। অধিকাংশ সদস্য কমিটির কাজে তেমন গুরুত্বসহকারে মনোনিবেশ করেন না। কমিটি ভালো কিংবা কড়া-কড়া কথা যা-ই বলুক না কেন, সরকার দায়সারা জবাব দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে, কারণ কমিটির সুপারিশ মানা-না-মানা সরকারের মর্জির উপর নির্ভরশীল; সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার ক্ষমতা কমিটির নেই, তারা একটু-আধটু চিমটি কাটতে পারে মাত্র। বিশেষত প্রথা দাঁড়িয়ে গেছে কমিটির প্রতিবেদন সর্বসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেহেতু উভয় কক্ষে আনুপাতিক সদস্যসংখ্যার ভিত্তিতে কমিটির সভ্য বাছাই করা হয়, প্রতিটি কমিটিতে সরকার পক্ষের অবধারিত সংখ্যাধিক্য, কমিটির সভাপতি যদি বিরোধী-পক্ষীয় হোন, তা হলেও। সভাপতিকে তাই সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হয়, দেখতে হয় যে-প্রতিবেদন তৈরি হবে, তা যেন যথাসম্ভব প্রত্যেক সদস্যের মন জুগিয়ে চলে। সরকার সম্পর্কে কড়া কথা বলতে হলেও একটু ঘুরিয়ে বলা শ্রেয়; সরকারপক্ষীয় কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে আগে থেকে আলাপ করে প্রতিবেদনের খসড়া তৈরি করলে খটাখটির আশঙ্কা কম। এমন নয় যে সরকারি কাজকর্ম নিয়ে বিরূপ মন্তব্য সংযোজন কদাচ সম্ভব নয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মন্ত্রীদের বাঁচিয়ে বক্তব্য রাখা সমীচীন, নইলে সরকারপক্ষীয় সদস্যদের তাঁদের দলের কাছে জবাবদিহি দিতে হতে পারে। অবশ্য সরকার পক্ষ থেকে এমন কোনও-কোনও সদস্য যদি কমিটিতে থাকেন, যাঁদের মন্ত্রী হওয়ার সাধ অথচ হতে পারছেন না, কিংবা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সঙ্গে ব্যক্তিগত রেষারেষি চলছে, তবে অন্য কথা। তা হলেও সব মিলিয়ে অধিকাংশ কমিটির রিপোর্টই সাধারণত তেমন গভীরে

পৌঁছয় না, কিছু লোকরঞ্জন কথাবার্তা থাকে, আসল বক্তব্য ঘোরানো-প্যাঁচানো অরণ্যের আড়ালে ঢাকা পড়ে। পর-পর যে দুই স্থায়ী কমিটির সভাপতি ছিলাম, শিল্প এবং বাণিজ্য মন্ত্রক-সংক্রান্ত, উভয়েরই বিষয়পরিধি একানব্বুই সালে ঢাকঢোল-পিটিয়ে-শুরু-করা আর্থিক সংস্কারের নীতি, সিদ্ধান্ত ও গতিপ্রকৃতি জড়িয়ে। সংস্কার কর্মসূচি শুরু হওয়ার পরবর্তী প্রথম পাঁচ বছর কেন্দ্রে কংগ্রেস দল ক্ষমতাসীন, দেশের-জাতির সর্বনাশ ঘটুক না-ঘটুক, আর্থিক সংস্কারের বিরূপ সমালোচনা সে-সময় করা কংগ্রেসিদের পক্ষে প্রায় বিধর্মী আচরণ। তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গিতে দ্বিরাচারিতা। তাঁরা স্বনির্ভর অর্থব্যবস্থা ভাসা-ভাসা সমর্থন করেন, কিন্তু বেসরকারি মালিকানাও তাঁদের অপছন্দ নয়। এই দলভুক্ত কিছু সদস্য সংস্কারের কোনও বিশেষ প্রণালী বা নীতিতে অসুখী, প্রকাশ্যে তা বলতেও তাঁরা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না, অন্য পক্ষে দলে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের যাঁরা খোদ প্রতিনিধি, তাঁরা সংস্কারের প্রেমে মুখর। ক্ষেত্রে শ্রেণীগত বিচারে কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে তফাত টানা সত্যিই দুরূহ। একটু আগে যা বলেছি, প্রায় প্রতি ঋতুতেই দেখা যায় গোসা করে কেউ-কেউ কংগ্রেসে ঢুকলেন ভাজপা ছেড়ে, আবার উল্টোও ঘটেছে। ধনী কৃষক-শিল্পপতি-ব্যবসাদারদের ভিড়ে ঠাসা কংগ্রেস দল, অনুরূপ ভিড়ে ঠাসা ভারতীয় জনতা পার্টিও। তবে যেহেতু এক দল সরকারে, অন্য দল বিরোধী আসন অলঙ্কৃত করে আছে, সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্তের খানিক-খানিক সমালোচনা শেষোক্তদের করতে হয়, করতে হয় ব্যাকরণের স্বার্থে, বিশ্বাসহেতু নয়। ভারতীয় জনতা পার্টির এই দ্বৈত অবস্থানের প্রমাণ মিলতো কংগ্রেস দল সংস্কারের প্রয়োজনে কোনও সংশোধনী আইন উপস্থাপন করলে, তার উপর ভোটাভুটির মুহূর্তে। ভাজপা সদস্যরা হয়তো বামপন্থীদের সুরে খানিকটা সুর মিলিয়ে বক্তৃতা দিলেন, সংশোধনী আইনে অনেক গলদ, এটির প্রয়োগ ঘটলে দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে, গরিবরা মারা পড়বেন, বিদেশীরা আমাদের মাথায় চড়ে বসবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ যখন ঘণ্টা বাজলো, ভোটগণনার পালা শুরু, তাঁরা গুটি-গুটি সভাকক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত।

কংগ্রেস দল তো তখন সরকারি দল, তাঁরা সংস্কারের ধ্বজা উড়িয়ে চলেছেন, একটা-দুটো বছর অতিক্রান্ত হলেই দেশ সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া যাবে, কোনও স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদনে ভিন্ন কিছু থাকবে, তা সে-দলের সদস্যদের পক্ষে হজম করা শক্ত। শিল্প-সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদনগুলিতে তা হলেও আমি প্রতীপ মত প্রকাশের প্রয়াসে মোটামুটি সফল হয়েছি, অনেক সময় হয়তো ব্যাজোক্তির আড়ালে, সব সদস্যের সম্মতিও সংগ্রহ করতে সফল হয়েছি সেই সঙ্গে। মাত্র একবার জনৈক মহারাষ্ট্রবাসিনী মাননীয়া কংগ্রেসি সদস্যা কিছুতেই মানতে চাইলেন না যে আশির দশকের তুলনায় নব্বুইয়ের দশকে শিল্পোন্নয়নের হার অনেকটাই কমেছে, শিল্পে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হারও। যাঁরা জেগে ঘুমোন, কিংবা অ-তথ্যকে তথ্য বলে স্থাপন করতে বদ্ধপরিকর, তাঁদের নিয়ে কী আর করা। গত কয়েক বছর ধরে কংগ্রেস বিরোধী দল, যে-কোনও ছুতোয় এখন সরকারকে দুয়ো দিতে হবে, নেহরু-গান্ধি পরিবারের দল অতএব মস্ত উভয়সংকটে; ভাজপা সরকারের নিন্দায় মুখর হতে হবে, কিন্তু আর্থিক সংস্কারের সূচিকে গালমন্দ করা চলবে না।

অতীত কংগ্রেস দলকে তাড়া করে ফিরবেই। একানব্বুই সালের সিদ্ধান্তবলীতে ওই মুহূর্তে দেশের সম্পন্ন ঘরের মানুষেরা দারুণ খুশি, পুঁজিপতিরা খুব খুশি, জমিদার-জোতদাররাও আনন্দে মশগুল, কৃষিসংস্কার নিয়ে কংগ্রেস দল আর মুখ খোলে না।

ব্যবসাদারদের পোয়া বারো, অবাধ বাণিজ্যের ঋতু শুরু হলো বলে। দশ বছর আগে ইন্দিরা গান্ধির জমানায় যিনি অর্থমন্ত্রী ছিলেন এবং পশ্চিম বাংলার যথাসাধ্য শত্রুতা সাধনের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন, তাঁকে এবার নরসিংহ রাও বাণিজ্য মন্ত্রী হিশেবে নিয়োগ করেছিলেন, চুরানব্বুই সালের এপ্রিল মাসে মরক্কেশ শহরে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-সংক্রান্ত চুক্তি দেশের হয়ে তিনি স্বাক্ষর করে এলেন, পশ্চিমের ধনী দেশগুলির কাছে পুরোপুরি দাসখত লিখে দিয়ে। তখনও ভারতীয় জনতা পার্টি মন স্থির করে উঠতে পারছে না চুক্তিটিকে সমর্থন করবে কি করবে না। তাদের দলেও অনেকের আশঙ্কা, মরক্কেশ চুক্তির ফলে দেশে কৃষি-শিল্পে মড়ক লাগবে, কর্মসংস্থানও ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসবে। বাণিজ্যমন্ত্রী মরক্কেশ-ফেরত সংসদের উভয় কক্ষে চুক্তির সাফাই গেয়ে বিবৃতি পেশ করলেন। রঙ্গ দেখা দিল। রাজ্যসভায় কংগ্রেস দলের সংখ্যাধিক্য নেই, বামপন্থীদের সঙ্গে ভাজপা হাত মেলালে ভোটে শাসক দলকে কুপোকাৎ হতে হবে। মন্ত্রী নিয়মাবলীর যে-ধারায় বিবৃতি দিলেন, তা যদি কোনও সদ্য-ঘটা জরুরি বিষয় নিয়ে হয়, ভোটে তা গ্রহণ বা নাকচ করবার অধিকার সভার আছে। উঠে দাঁড়িয়ে ভোট দাবি করলাম, ভাজপা-র পক্ষ থেকে আমাকে সমর্থন জানানো হলো, সমাজবাদী দল, রাষ্ট্রীয় জনতা দল, জনতা দল সকলেই সোচ্চার : ভোট হোক, ভোটে শাসক দলের পরাজয় নিশ্চিত। উপাধ্যক্ষ সভা পরিচালনা করছিলেন, শাসক দলের সঙ্গে তাঁর বহু বছরের যোগাযোগ, ভোট নেওয়া বিধিসম্মত হবে কিনা তা নিয়ে তাঁর মত জানাতে সময় চাইলেন, অতএব আলোচনা ও ভোটাভুটি মুলতুবি হয়ে গেল। যে-ঋতু যায় তা আর ফিরে আসে না, কয়েক দিন বাদে মাননীয়া উপাধ্যক্ষ জানালেন, আমাদের ভোটের আবেদন প্রত্যাখ্যাত , সভানায়কের রায় নিয়ে তর্ক চলে না।

ততদিনে অবশ্য কিছুটা রোখ চেপে গেছে, সংসদের প্রায় সব ক'টি দল মিলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিদানাদির, বিশেষ করে পেটেন্ট আইন আমূল পরিশোধনের, খেয়ালখুশির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংহততর করার উদ্দেশ্যে একটি বেসরকারি সংসদীয় কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হলো। ভাজপা থেকে মুরলীমনোহর যোশী, জনতা দলের জয়পাল রেড্ডি, সমতা দল থেকে জর্জ ফার্নান্ডেজ, সি পি আই থেকে ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত (পরে অর্ধেন্দু বর্ধন), এবং আমাকে নিয়ে কমিটি। সবচেয়ে বেশি উৎসাহ যোশীর, অধিকাংশ বৈঠক হতো তাঁর বাড়িতে, আতিথেয়তার অভাব ছিল না। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নির্দেশানুযায়ী দেশের পেটেন্ট আইন পাল্টানো হলে কী-কী সর্বনাশ হবে তা নিয়ে আমরা সরব; রকমসকম দেখে মনে না হয়ে পারলো না, মুরলীমনোহর যোশীর বিশ্বায়ন-বিরোধী পরাক্রম অন্য সকলকে ছাপিয়ে। কয়েক মাস বাদে নতুন দিল্লিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-বিরোধী এক আন্তর্জাতিক কর্মশালার পর্যন্ত ব্যবস্থা হলো, যোশী স্বঘোষিত আহ্বায়ক। রাজ্যসভায় ভাজপা সাংসদরা আমাদের সঙ্গে সমানে চেঁচাচ্ছেন, বিমা বিরাষ্ট্রীয়করণের খসড়া আইন আটকে গেল। হঠাৎ আটানব্বুই সালে পট পরিবর্তন। জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা ক্ষমতার মঞ্চে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-বিরোধী কমিটির দুই মহারথী, মুরলীমনোহর যোশী ও জর্জ ফার্নান্ডেজ, নতুন সরকারে মাননীয় মন্ত্রী, রাতারাতি তাঁদের ভোল বদল। কমিটি থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি ও সমতা দল অন্তর্হিত, পরিবর্তে এবার এলেন কংগ্রেস দলের এক তরুণ সাংসদ। প্রথম দিকে কারও-কারও ক্ষীণ আশা ছিল যোশী ও ফার্নান্ডেজ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ক্রিয়াকর্মের বিরুদ্ধে এতদিন ধরে এত লাফিয়েছেন-তড়পিয়েছেন, সামান্য চক্ষুলজ্জার ব্যাপারও তো আছে, একটু-আধটু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে সবাক হবেন। আশা কুহকিনী, তাঁদের নিশ্চিন্ত বক্তব্য, তাঁরা তো অর্থনৈতিক

মন্ত্রকাদির সঙ্গে যুক্ত নন, তা ছাড়া মন্ত্রিসভায় বৈঠকে তাঁরা তো কোণঠাসা হতে বাধ্য। দুরাত্মাদের ছলের অভাব হয় না, মহাত্মাদেরও হয় না।

আমি ততদিনে সংসদের বাণিজ্য-সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও পেটেন্ট আইন সংশোধনের বিভিন্ন শর্তাবলীর বিশদ আলোচনা করে, অনেক অবশ্যপ্রয়োজন পরিশোধন ও বর্জনের উল্লেখ-সহ কমিটিতে সর্বসম্মত প্রতিবেদন মঞ্জুর করানো হলো। কমিটির কাজে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন ডি এম কে-র মুরোসোলি মারান ও কংগ্রেস দলের ভায়লার রবি। ওই মুহূর্তে বাণিজ্যমন্ত্রী আমার পুরনো বন্ধু রামকৃষ্ণ হেগড়ে, সংসদে দাঁড়িয়ে বললেন, স্থায়ী কমিটি খুব ভালো কাজ করেছে, প্রতিবেদনটি সরকারের প্রভূত উপকারে আসবে।

সমস্তই মামুলি বচন। কয়েক সপ্তাহ বাদে মুরোসোলি মারান নিজেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী বনে গেলেন, পেটেন্ট আইন বিল আগেই লোকসভায় মঞ্জুর হয়েছিল, ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে তা রাজ্যসভায় উত্থাপিত হলো। ভারতীয় জনতা পার্টি এখন সরকার চালাচ্ছে, কংগ্রেস দল বিরোধী আসনে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শর্তাবলী মানবার ক্ষেত্রে, সেই সঙ্গে পেটেন্ট আইন সংশোধনের ব্যাপারে, আগে কে বা প্রাণ করিবেক দান পরিস্থিতি। যুক্তি ও আবেগের মশলা মিশিয়ে স্বল্পদৈর্ঘ্যের বক্তৃতা ফাঁদলাম রাজ্যসভায়, দলমত নির্বিশেষে হাততালির বন্যা বইলো, কিন্তু ভোটের সময় কংগ্রেস, ভাজপা ও তার সঙ্গে মিতালি করে সরকারে ঢোকা অন্য দলগুলি এককাট্টা, পেটেন্ট আইন সংশোধনী প্রস্তাব রাজ্যসভাতেও মঞ্জুর হয়ে গেল। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের অবসান, পরদিন সন্ধ্যাবেলা কলকাতাগামী বিমান ধরার জন্য পালামে অপেক্ষাগারে সস্ত্রীক বসে আছি, কর্ণাটক থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত সদস্য, কংগ্রেস দলের অন্যতম সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, আমাকে দেখে আসন ছেড়ে উঠে এসে দু'হাত ঝাঁকিয়ে বললেন, 'ইট ওয়াজ আ গ্রেট স্পিচ।' দারুণ বক্তৃতা, কিন্তু তিনি ভোটটা উল্টোদিকেই দিয়েছেন।

এরকমই হয়। সংসদে ছ'বছর থাকাকালীন চোখের সামনে বহু ব্যক্তির লজ্জার শেষ যবনিকা খসে পড়তে দেখেছি। দুর্নীতি নিয়ে আর কেউই ভাবিত নন যেন, সরকারে যিনি গেলেন তাঁর আশেপাশের মানুষজন চুরিধাড়ি করবেন, সরকারি প্রভাব খাটিয়ে নিজেদের আখের গোছাবেন, তা প্রায় সাধারণ নিয়মে এখন দাঁড়িয়ে গেছে। দাভোল বিদ্যুৎ কারখানা নিয়ে এনরন সংস্থার সঙ্গে যে-কলঙ্কজনক চুক্তি চুরানব্বুই সালে সই করা হয়েছিল, যে-বিবরণ এখন পৃথিবীসুদ্ধু সবারই জানা, তা নিয়ে বামপন্থীরা চুক্তিস্বাক্ষরের অব্যবহিত পরেই সংসদে প্রতিবাদমুখর হয়েছিলাম: মহারাষ্ট্র সরকার এনরনের সঙ্গে দেশের-পক্ষে-অভাবনীয়-ক্ষতিকারক বোঝাপড়ায় এসেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার তাতে সমর্থন জুগিয়েছিলেন, এনরনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত তখন-পর্যন্ত-গোপন শর্তগুলি আমরা সংসদে খোলসা করেছিলাম। কেন্দ্রে তৎকালীন কংগ্রেসি বিদ্যুৎমন্ত্রীও মহারাষ্ট্রের মানুষ, এনরনের সঙ্গে বোঝাপড়া যে-কত মহান তা নিয়ে সংসদে সহস্রবাক হলেন। এখন তো তথ্য উন্মোচিত, দাভোল বিদ্যুৎ প্রকল্পের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য এনরন সংস্থার তরফ থেকে ঢালাও অর্থ বিলোনোর ব্যবস্থা হয়েছিল, যার প্রসাদ থেকে মন্ত্রী-শান্ত্রী কেউ-ই বাদ পড়েননি। ছিয়ানব্বুই সালে ভাজপার তেরোদিন আয়ু যে-কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা, ওই ডামাডোল অবস্থার মধ্যেও দাভোল প্রকল্পের প্রতি তাঁরা পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করার সময় পেলেন, অনুমান করা অন্যায় নয় যে এনরনের শিক্ষাদানের প্রসাদ ইতিমধ্যে ভাজপাকেও পরিতৃপ্ত করেছিল।

হলফ করেই বলা যায়, কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রতি বছর চার লক্ষ কোটি টাকার মত ব্যয়ের পরিমাণ, তা থেকে অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা উৎকোচে-উপঢৌকনে-দস্তুরির ফল্গুধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। যতদিন না রাজনীতির কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটছে, এরকমই চলবে, আরও বেশ কয়েক ঋতু কংগ্রেস ও ভাজপা ভাগাভাগি করে কেন্দ্রে পালা করে শাসনক্ষমতা করায়ত্ত রাখবে, একই বিভঙ্গে : এ বলবে আমাকে দেখো, ও-ও বলবে তাই। একটি-দু'টি বফর্স বা তহেলকা কেলেঙ্কারি বেতারে-টেলিভিশনে-সংবাদপত্রে মুখরোচনের উপাদান পরিবেশন করবে, কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে কারও হৃদয়ই কম্পিত হবে না : এটাই ভারতভাগ্যবিধাতার আসল চেহারা।

কাশ্মীর সমস্যার ক্ষেত্রেও অনুরূপ উক্তি না-করে উপায় নেই। এখন যা অবস্থা, সংসদের মধ্যে বুকের পাটা খুব কম সাংসদের আছে যাঁরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারবেন, এ শুধু অলস খেলা, এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন। পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে কাশ্মীর নিয়ে অসংখ্য মারাত্মক ভুল করা হয়েছে; কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই নামতা আওড়ানোর সঙ্গে রূঢ় বাস্তবের এখন আর কোনও সম্পর্ক নেই। ফৌজের বর্মে ঘিরে, অত্যাচার-পীড়ন চালিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চল আমরা দখল করে রেখেছি, কিন্তু ওখানকার মানুষদের মন জয় করতে পারিনি। রাজত্ব কায়েম রাখতে অর্ধশতাব্দী ধরে যে-পরিমাণ অর্থ জাতীয় তহবিল থেকে ব্যয় করা হয়েছে, যদি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে তা ব্যয়িত হতো, গোটা ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নয়নের হার, মোটা হিশেবে বলছি, প্রতি বছর অন্তত শতকরা তিন-চার ভাগ বাড়ানো যেত। আমরা মুখ গুঁজে আছি বলে পৃথিবীর মানুষ সোজাসাপ্টা অভিমতে উত্তীর্ণ হওয়া থেকে তো বিরত থাকবেন না। একটু শান্ত চিত্তে সব দিক বিবেচনা করে যদি এগোনো যেত, যদি এখনও এগোনো যায়, কাশ্মীরের যে-সব ভারতবিরোধী সংগঠন, তাদের মধ্যে কারও-কারওকে তা হলে কাছে টানা হয়তো সম্ভব হতো, হয়তো এখনও তা সম্ভব। তবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন আমাদের একগুঁয়েমি বিসর্জন দেওয়া। সে ধরনের সাহসিকতা, হায়, এখন শূন্যতে গিয়ে ঠেকেছে। যতটুকু সাহস দৃষ্টান্তিত হচ্ছে তা কিছু স্বাধীনচেতা উদারমনা ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে। আর সর্বশেষ যে-পরিস্থিতি, হিন্দুত্বওলারা কাশ্মীর প্রসঙ্গ বিশ্লেষণে সর্বপ্রকার যুক্তির বাইরে।

মাঝে-মাঝে কানাঘুষোয় শোনা যায়, সংসদীয় ক্ষেত্রে মান-অবনমনের জন্য প্রধানত দায়ী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংহ : তিনি যদি মণ্ডল কমিশনের প্রতিবেদন কার্যকর করার জন্য অতটা উঠে-পড়ে না লাগতেন, তা হলে দেশের এত দ্রুত সর্বনাশ ঘটতো না; তাঁর অনুন্নতবর্গ-প্রেমের জন্যই নাকি নব্বুই সালে জনতা সরকারের দ্রুত পতন ঘটলো, কেন যে তিনি অবিমৃষ্যকারিতার শিকার হলেন! অভিযোগকারীরা আরও বলবেন, এখন অনুন্নত শ্রেণীবর্গাদি থেকে উদ্ভূত যে-কেউই সর্বত্র দাপিয়ে বেড়াতে পারছেন, স্বচ্ছন্দে ঢুকে যেতে পারছেন সংসদে স্রেফ ভোটের জোরে, তাঁর অন্যান্য গুণাবলী থাকুক বা না থাকুক; নিরক্ষররা যেমন পারছেন, ফেরেবাবাজরাও তেমনি।

সবিনয়ে বলবো, ধারণা বা প্রমাণহীন অভিমতের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে লাভ নেই। ন্যূনতম গবেষণাতেই ধরা পড়বে, কেন্দ্রীয় সরকারকে কেন্দ্র করে যত আর্থিক কেলেঙ্কারি ঘটেছে, সব ক'টিরই কলকাঠি নেড়েছেন উচ্চবিত্ত শ্রেণীভুক্ত মানুষেরা। যাদের অনেক আছে, ছল-চাতুরি করে ধনৈশ্বর্য বাড়াবার তাগিদ তাদের মধ্যেই সর্বাধিক। অন্য পক্ষে, যদি মেনেও নেওয়া যায়, নিম্ন বর্ণ বা বর্গের যাঁরা সংসদ সদস্য হচ্ছেন গত দশ-বারো

বছর ধরে, তাঁরা কথাবার্তায় তেমন সড়গড় নন, সেই সঙ্গে কিন্তু মানতে হবে, ছলচাতুরিতেও তাঁরা দড় নন। তাঁরা অনেকেই, নিজেদের বক্তব্য অন্তত, মাতৃভাষায়, চমৎকার প্রকাশ করতে পারেন; যে-ভাষায় তাঁরা বলছেন তা আমার কাছে অবোধ্য বলেই কেন তাঁদের ভাষণকে সম্মান জানানো থেকে বিরত থাকবো?

নিরানব্বুই সালের অগস্টে আমার মেয়াদ ফুরোবার কথা, তবে বছরের গোড়াতেই মনস্থির করেছিলাম, পার্টি থেকে অনুরুদ্ধ হলেও আর রাজ্যসভায় ফিরবো না। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না, অযথা সময়ক্ষেপণ, সংসদের বাইরেও তেমন দলের কাজে আসতে পারছিলাম না। একটু সংকোচের সঙ্গে অন্য একটি কথাও কবুল করি। পার্টির আনুকূল্যে এমন একজন-দু'জন হঠাৎ রাজ্যসভার সদস্য হয়ে আসতে লাগলেন, যাঁদের কদাচ কেউ বামপন্থী বলে অপবাদ দেবেন না, তাঁরা অতীতে কমিউনিস্টদের কোনওদিন ভোট দিয়েছিলেন কিনা সন্দেহ, ভবিষ্যতেও দেবেন না। খবর শুনলাম, পার্টির সমর্থনে আর একজন রাজ্যসভায় আসছেন, যিনি কারগিল সংঘর্ষের সময় গলা ফাটিয়ে দাবি করেছিলেন, অবিলম্বে সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে ঢুকে লাহোর দখল করা হোক। হংসমধ্যে বক কিংবা বকমধ্যে হংস হয়ে থাকার আমার কোনও অভিপ্রায় ছিল না। সামনে লোকসভার নির্বাচন, রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি হয়ে গেছে, নিরানব্বুই সালের এপ্রিল মাসে তল্পিতল্পা গুটিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম। সামান্য মন খারাপ হলো কয়েকজনের সান্নিধ্য ছেড়ে আসতে হলো বলে। রাজনীতিবৃত্তের মানুষ প্রকাশ ও বৃন্দা কারাত, কিন্তু এই দম্পতির বুদ্ধির উজ্জ্বল্য, সৌজন্য ও অন্যান্য বহু মানবিক মূল্যবোধ ভুলে থাকা অসম্ভব। সান্নিধ্য ছেড়ে আসতে হলো দাতরজির ভাগিনেয়ী, তার কিশোরী বয়স থেকে আমার চেনা, মানিককেও। মানিক, পোশাকি নাম কালিন্দী দেশপাণ্ডে, মহিলা আন্দোলনের নেত্রী হিশেবে অধিক পরিচিত, তার স্বামী বিখ্যাত মরাঠি নাট্যকার ও চীন বিশেষজ্ঞ গোবিন্দ দেশপাণ্ডে। তাঁদের কন্যা অশ্বিনী ও পুত্র সুধন্ব-র মধ্যেও প্রতিভার দীপ্ত বিকিরণ।

চল্লিশ

আপিলা-চাপিলা ঘন-ঘন কাশি। নিজেরই ঝেড়ে কাশতে ইচ্ছা করছে। চারদিকে বিরক্তিসূচক প্রশ্ন, এই ঘ্যানঘেনে পাঁচালী আর কত দিন টানা হবে। কেউই খুশি নন। যাঁরা চেয়েছিলেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মকথন, তাঁরা হতাশ, লোকটা বাবা-মার কথা, আত্মীয়-স্বজনের কথা, ঘরবাড়ির কথা, প্রায় কিছুই জানালো না। যাঁরা একটি বিশেষ কালের বিশ্লেষণাত্মক রাজনৈতিক বৃত্তান্ত চেয়েছিলেন, তাঁরা সাহিত্যপ্রসঙ্গের নিরন্তর অনুপ্রবেশে তথা লেখকের ইতস্তত লঘুতাবিহারে বীতরাগ চেপে রাখতে পারছেন না। আর কাব্য-সাহিত্যের যাঁরা বারোমেসে ভক্ত, দেশ-সমাজ-নচ্ছার রাজনীতিকলার সাতকাহনে তাঁরা অবসন্ন।

জীবনের উপান্তে পৌঁছে প্রগল্‌ভতা যদিও বাঞ্ছনীয় নয়, অসাধুতাও কিন্তু নয়। বাঙালি মধ্যবিত্তের চরিত্র জুড়ে গুরুচণ্ডালী মিশ্রণ, চরিত্রহীনতাই তার স্বভাবের প্রধান লক্ষণ। আমার মাঝে-মাঝে কবিতা বা কবিকাহিনীতে অথবা বান্ধবস্মৃতিমেদুরতায় ডুবে না গিয়ে উপায় নেই। অথচ সমাজের মূল সমস্যাগুলি নিয়ে ভাবনায় অচিরে প্রত্যাবর্তনও সমান স্বাভাবিক। সেই সঙ্গে, ঘটে-যাওয়া নানা কাহিনীর অক্ষৌহিণী বাহিনীকে অবজ্ঞা তো মস্ত ব্যাকরণবহির্ভূত ব্যাপার। অতএব কখনও-কখনও ভুলে যাওয়া, খানিক বাদে ফিরে আসা, ফের ভোলা, ফের ফেরা, আপিলা-চাপিলারা ধরা দেয়, অথচ দেয়ও না।

তা ছাড়া, দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দিনাতিক্রম, এখন কবুল করতেই হয়, নিজেরও প্রিয়ভাজন আমি নই, অন্যদের তো নই-ই। হঠাৎ কাহিনীটি মনে পড়লো। আটাত্তর সাল, নয় তো তার পরের বছর। উত্তর বঙ্গের এক শহরে কার্যব্যপদেশে গিয়েছি। সন্ধ্যাবেলা হাতে যেহেতু কিছু ফাঁকা সময়, এক পিসতুতো দিদির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দিদির এক ছেলে সদ্যপরিণীত, নববধূটি কিছুতেই বাইরের ঘরে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করবে না। অনেক সাধ্যসাধনার পর এলো, ভয়চকিতা হরিণীসমা, বাচ্চা মেয়ে, বালিকাবধূই বলা চলে। একটু-একটু করে তার জড়তা কাটলো। ঘণ্টা দুই বাদে যখন বিদায় নিচ্ছি, তার সরলতম কবুলতি : 'কেন প্রথমটা আপনার সামনে আসতে ভয় পাচ্ছিলাম জানেন? আমাদের চন্দননগরের বাড়িতে আমরা তো ওই পাঁচলাখি কাগজটা পড়ি, ভেবেছিলাম আপনি খুব খারাপ লোক।'

সংবাদপত্রটির উপর ক্ষোভ পুষে কী লাভ, সত্যিই তো আমার স্বভাবে অনেক উচ্চাবচতা, মেজাজ কখনও সপ্তমে চড়ছে, কখনও বরফকুচির মতো শীতল হচ্ছে; বচনে কর্কশতা, ঔদার্যের ছোঁয়া যদিই বা কখনও লাগে, তা আকস্মিক অঘটন। ব্যবহারিক জীবনে সর্ব ঋতুতে একে-ওকে-তাকে দূরে ঠেলে দেওয়ার দিকে আমার ঝোঁক, কাছে টানার আগ্রহ আদৌ নেই। মানুষটা উচ্চস্বরে কলহপরায়ণ হতে ভালোবাসে, গলা চুলকে ঝগড়া করে পর্যন্ত। যেখানে ঠেস দিয়ে কথা না বললেও চলে, সে অবধারিত ঠেস দেবেই। এমন মানুষের আখেরে তাই নিঃসঙ্গতাই একমাত্র অবলম্বন : ক্রান্তির লগ্ন সমাগত হলে সে যন্ত্রণায় দগ্ধ হবে, কেউ তাকে

বাঁচাতে আসবে না। এই উপসংহারসম্ভাবনাকে অনেকেই হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবেন, সে নিজেও হয়তো জানাবে।

অথচ মানুষটা জ্ঞানপাপীও। সে তার বাঙালি মধ্যবিত্ত জাতককাহিনী ভুলতে পারে না। ঐতিহ্যের অন্তঃস্থিত স্ববিরোধিতা তাকে অহরহ ছিঁড়ে-খুঁড়ে খায়। প্রথম সংকটমুহূর্ত থেকেই সে জেনেছে, একা বাঁচা যায় না, সমাজের শরীরে লীন হয়ে গিয়ে বাঁচতে হয়, সমাজই বাঁচায়। এটাও তার জ্ঞানের বৃত্তের বাইরে নয়, যেহেতু সে অভিশপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত, একলব্যঋণ তাকে শোধ করতেই হবে। মধ্যবিত্তসুলভ স্বার্থপরতার উদ্দাম স্রোতস্বিনীপ্রবাহ যদিও তার চেতনায়-ধমনীতে, তা হলেও, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে কথা বলেছিলেন, তার উপরই দেনা শোধবার ভার; লোকায়ত সমাজব্যবস্থার বশ্যতা স্বীকার না-করে কে কবে কোথায় পালাবে, শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের লিখন মান্য না-করা অসম্ভব। পৃথিবীর ইতিহাস তো নিঃস্ব জনের মুক্তির ইতিহাস, নিঃস্ব মনের বিকচনের-উন্মোচনের বৃত্তান্ত। মানুষ সামাজিক, সেই সঙ্গে সমান অসামাজিক; মানুষ একা সৃষ্টি করে, জনারণ্যে মিশে গিয়েও করে; একাকী অঙ্গীকার, যূথবদ্ধ অঙ্গীকার। মানুষ যখন কবিতা রচনা করে, সে একা; যখন সামগান উচ্চারণ করে, সে সমষ্টির অন্যতম। মানুষ সরল, মানুষ কুটিল, মিথ্যাবাদী, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত মানুষ। 'আপিলা-চাপিলা' এমন বিশেষ একটি ব্যক্তির এলোমেলো বহুধাবিচ্ছিন্ন জীবনচর্যার উচ্ছৃঙ্খল উপাখ্যান। এই মানুষটা নিজেকে ঘোর অপছন্দ করে, নিজের গোটা জীবনটাকেই করে, সেই প্রকাশ্য কবুলতির অশ্লীলতা থেকে নিজেকে সে, গোঁয়ার গোবিন্দ, বঞ্চিত করবে কোন ছুতোয়।

এক অতি সম্মাননীয় বাঙালি জ্যেষ্ঠজন জীবনসায়াহ্নে অকপট বিষণ্ণ স্বীকারোক্তি করেছিলেন, তাঁর জীবন সফল হয়নি ; যে লক্ষ্য, আদর্শ ও ব্রত নিয়ে তাঁর জীবনসংগ্রামের আরম্ভ, তাদের কোনও-কিছুই সার্থকতার মুখ দেখেনি। 'আপিলা-চাপিলা'-র বর্ণনাকারের অতটুকু ভণিতা সাজাবারও সুযোগ নেই। তার চরিত্রহীনতাকেই সে বার বার বলেছে, স্থিত ভব, স্থিতি ভব, লক্ষ্যশূন্যতাতে আবিষ্ট হও; দিনের পর দিন যত লাঞ্ছনাতেই কাটুক না কেন, কৃত অকর্মের জন্য সাফাই গাওয়ার চেষ্টা কোরো না। মানছি, সমাজ বা দেশের সমস্যাবলী থেকে উদ্ভূত চিন্তার বিবেকপীড়নে সে নিরন্তর প্রহৃত। তা হলেও সে জানে কোথাও তার পালিয়ে যাওয়ার নেই মানা, কী মনে-মনে, কী প্রকাশ্যে। সুতরাং যাঁরা হতাশ হলেন, বিরক্তিতে যাঁরা মুখ কুঞ্চন করছেন, তাঁদের কাছে একমাত্র ক্ষমা চাওয়ার পালা বাকি। তবে যে-পাপীতাপী সে জানে ক্ষমারও সে অযোগ্য, তার জন্য কেবল অপেক্ষমাণ উজ্জ্বলন্ত নরককুণ্ড।

ভাবনাহীন ভাবনালীন কথা তাড়া করে ফেরে। কোন প্রলয় উপকূলে গিয়ে দাঁড়াবে ভারতবর্ষ, বাঙালিদেরই বা কী গতি হবে সেই পর্যায়ে, এই হতভাগ্য দেশে যাঁরা অনন্তকাল ধরে শোষিত-পেষিত, তাঁদের দুঃস্বপ্নের রাত্রির কি কখনও-ই অবসান ঘটবে না? যে ভারতবর্ষের প্রতীক বর্তমানের হিংসালোলুপ গুজরাট রাজ্য, আমরা কি গোবেচারা ভালোমানুষের মতো তা মেনে নেবো তথাকথিত জাতীয় ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে? কেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থাকতে হবে, স্পষ্ট করে কেন বলতে পারবো না, গান্ধিজী কল্পিত রামরাজ্যই অন্তিম পরিণাম হিশেবে ভারতবর্ষকে ধর্মান্ধতার অন্ধগলিতে পথভ্রষ্ট করেছে। গান্ধিজী ভেবেছিলেন রামরাজ্যের পৌনঃপুনিক উল্লেখ-সঞ্জাত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গণদেবতার যূথবদ্ধ মানস ধর্মভাবে আপ্লুত হবে, সেই বিশাল বিস্তৃত ধর্মানুভূতির পবিত্র পলিমাটিতে

স্বাদেশিকতার বীজ বপন করে জাত্যভিমানী দেশবাসীদের তিনি বিদেশী শাসনমুক্ত করবেন। কিন্তু জনগণ তো বহুলাংশে ন্যূনতম অক্ষরপরিচয়ের সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত। তাঁরা গান্ধিজীর আত্মজীবনী পাঠ করেননি, 'হরিজন' পত্রিকার পুরনো দস্তাবেজ ঘাঁটেননি, গান্ধিজীর সর্বধর্মসমন্বিত দার্শনিকতার বাণী তাঁদের উপলব্ধির বাইরে থেকে গেছে। আটপৌরে শাদামাটা বিশ্লেষণের বিচরণভূমিতে রামরাজ্য ভাবনা থেকে তাঁরা রামরাজ্য পরিষদে অবলীলায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, সেই প্রস্থান ভূমি থেকে নির্মোহ অকরুণ নিষ্ঠুর ব্যাপক নরহত্যার লীলাক্ষেত্রে। কায়দাকানুন সহ সংবিধান রচনা করে আদৌ লাভ হয়নি, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অঙ্গীকার সংবিধানের যে-ধারায় বলা হয়েছে, তার অতি উদারচরিত ব্যাখ্যায় প্রতিটি প্রধান মন্ত্রী নিজেকে নিযুক্ত করেছেন। তাঁদের পরিভাষায় ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা সব ধর্ম থেকে সমান দূরত্বে রাষ্ট্রের অবস্থান নয়, সব ধর্মকে রাষ্ট্র-কর্তৃক সমান অবজ্ঞা প্রদর্শন নয়, সব ধর্মের প্রতি সমান অন্যমনস্কতা জ্ঞাপন নয়, বরঞ্চ সব ধর্মকে গলা জড়িয়ে উৎসাহ দান করা। কালচক্রে যদি দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বীদের নিপাট আধিপত্য ঘটে, কী আর করা, উক্ত বিশেষ গোষ্ঠীই সরকারি ঝোল একটু বেশি কোলে টানবে, বেতারে-টেলিভিশনে তাদের পুরাণ কথাই বর্ণিত হবে, অন্যান্য ধর্মগুলি তো সেদিনকার ছোকরা, তাদের জাতক বা পুরাণ বলতে কিছু নেই-ই। তবে রাষ্ট্রীয় সংকটের এটা তো মাত্র সূচিমুখ। যাঁরা দেশের হাল ধরে আছেন, তাঁরা বিশ্বায়ন পছন্দ করেন, তা তাঁদের কাছে তোমার-ফুলবাগিচায়-রইবো-চাকর-আমায়-চাকর-রাখো-জী এই সমবেত সংগীত গাইবার সুযোগ মেলে দিয়েছে। যারা গোলাম হতে রাজি, তাদের গোলামত্বে বরণ করাতে ভিন্‌দেশিদের কোনও অসুবিধা নেই; গোলামরা যদি তাদের পুরাণ-ব্যাকরণের ফলিত প্রয়োগে উৎসুক হয়, তা-ও ক্ষমাঘেন্না করে নিতে সমস্যা নেই; ভিন্‌দেশিদের অসাধারণ চারিত্রিক নমনীয়তা, তাঁদের কার্যসিদ্ধি হলেই হলো, পৃথিবীর যে যেখানে যত নমুনার শ্রেণীস্বার্থান্ধ প্রতিক্রিয়াপন্থীরা থাকুক না কেন, তাদের জন্য ভিন্‌দেশিদের অভ্যর্থনা সমিতি সদা প্রস্তুত। ভিন্‌দেশি প্রভুরা অতীতে ইরানে খোমেইনিদের তোল্লা দিয়েছেন, আফগানিস্থানে তালিবানদের একদা তাঁরা মুখ্য পৃষ্ঠপোষক, ভারতবর্ষে ত্রিশূলওলাদের ভরসা জোগাতেও তাঁরা সমান উৎসাহী। তাঁরা ঝালে আছেন, ঝোলে আছেন, অম্বলেও আছেন; মানবসভ্যতার সর্বনাশ যে-পন্থাতেই সাধন সম্ভব, তাঁরা তার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করবেন, বখরার ভাগটুকু পেলেই তাঁরা তুষ্ট।

অন্য ভয়ঙ্কর সমস্যাও তো এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। ভিন্‌দেশিদের ফরমানে দেশে যে-অর্থব্যবস্থার বৃক্ষ রোপিত হয়েছে, লক্ষণ দেখে মনে হয়, তার শিকড় আরও গভীরে অনুপ্রবেশ করবে। প্লেটোর নন্দিত আদর্শে আর্থিক পরিকাঠামো তৈরি হবে তখন, সমস্ত সামাজিক সম্পত্তির সুযোগসুবিধা মুষ্টিমেয় একটি-দু'টি গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হবে, সাধারণ মানুষ অসহায়তায় আঙুল চুষবেন। বিদেশী শস্যে দেশের বাজার ছেয়ে যাবে, বিদেশী শিল্পদ্রব্যেও। কারখানার পর কারখানা প্রতিদিন বন্ধ হবে, কর্মসংস্থানহীনদের ক্রমশ বিস্ফারিততর ভিড়, নবমূল্যবোধের নিরিখে মুনাফার হার ধ্রুবতারা রূপে পরিগণিত হবে : যে-যে বৃত্তিতে লাভের বহর কম, তারা বরবাদ; খুন-ডাকাতি-চুরি-রাহাজানি করে যদি বাহির ও অন্দর মহলে সোনা-মোহর-টাকাকড়ির ঝঙ্কারনিনাদ সতত শোনা যায়, সে-সব বৃত্তিতে উপনীত হওয়াই তো শ্রেয়। এই পরিস্থিতিতে বছর যতই গড়াবে, সামাজিক হাহাকার আরও পরিব্যাপ্ত হবে, দেশের বেশির ভাগ মানুষ চরম খিন্নতায় ভুগবেন।

যাঁরা ভাবছেন, গোটা দেশে সামন্ততান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা রমরমিয়ে চলুক না কেন, কোনও চিন্তা নেই, এই অঙ্গ রাজ্যে-ওই অঙ্গ রাজ্যে বড়ো লোকদের অস্ত্র দিয়েই তাদের ঘায়েল করা যাবে, তাঁরা, বলতে বুক ফেটে যায়, মতিভ্রমে আক্রান্ত। প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে নেমে আমরা যদি কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্য রাজ্য সরকারের মতো বিদেশীদের কাছে হাত কচলাই, বেসরকারি মালিক ও বাক্সওলাদের কাছে গিয়ে বলি যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি, সমবায় ভিত্তিতে কৃষি-উৎপাদন তথা উপার্জন বৃদ্ধির দুরূহ কর্তব্যের সহজ বিকল্প হিশেবে ফল-ফুল রপ্তানি মারফত গ্রামাঞ্চলে ঐশ্বর্যসঞ্চারের যতই স্বপ্ন দেখি, ভাগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা কিন্তু শূন্যই থেকে যাবে। গোটা দেশ যেখানে বিশ্বায়ন হেতু মুখ থুবড়ে পড়ছে, পশ্চিম বাংলা তারই মধ্যে আমরা-চলি-সমুখপানে-কে-আমাদের-বাঁধবে গেয়ে বুক চেতিয়ে এগিয়ে যাবে, তা অবাস্তব প্রস্তাব। বড়ো জোর খানিক-খানিক কালনেমির লঙ্কাভাগ ঘটবে, বেপথুমান ইশারায় কারও-কারও পদস্খলনের পাশাপাশি, কিন্তু অন্য কোনও শাঁসালো শিকে ভাগ্যে ছিঁড়বে না। না-ঘরকা-না-ঘাটকা বঙ্গনিবাসীরা কোথায় যাবো তখন? কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতা দখল না-করতে পারলে, আর্থিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্ত নীতিনিয়মের খোল-নলচে পরিবর্তন ঘটাতে না-পারলে, পশ্চিম বাংলার আদর্শ-অস্খলিত অভিযাত্রা সম্ভবপরতার পরপারে। মানছি, যদি আদর্শকে বিসর্জন দিতে সম্মত হই, তা হলে হয়তো হত লঙ্কার সামান্য একটু বাড়তি ভাগ আমাদের বরাদ্দে পড়বে; তা নিয়ে যদি খুশি থাকি, ইতিকথার তা হলে তো সেখানেই যবনিকা পতন। বাংলা ভাষাও তা হলে, ভারতবর্ষের সীমানার অন্তর্গত বর্গক্ষেত্রে, আর টিকে থাকবে না। মহাদেশের অন্যত্র যদি টেকে তাতে আমাদের কী, আমরা তো রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে যেতে চাই, সন্দেহ হয়, এড়িয়ে যেতে চাই। একবিংশ শতকীয় বাঙালি সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার যে-সম্ভাব্য নিদর্শন হালে নন্দিত হতে দেখি, তা থেকে সংশয় ক্রমশ প্রতীতিতে পৌঁছয়, চকিতে-বিজুলি-আলো-চোখেতে-লাগালো-ধাঁধার এক ভিন্ন অভিজ্ঞানে আমরা ইতিমধ্যেই উত্তীর্ণ।

সামনের দিকে তাকিয়ে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, মধ্যবিত্ত মানসিকতা সেই অন্ধকারকেই আলো বলে আলিঙ্গন করতে হাঁকুপাকু। তবে এখানেই হেঁয়ালি, এখানে ভরসাও শেষ পর্যন্ত। মানব-ইতিহাস তো শেষ পর্যন্ত গড়বেন পদাতিকবাহিনী, অগণ্য অসংখ্য সাধারণ মানুষ, যাঁরা সহস্র প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিদ্রোহের প্রকরণ ভুলে যাননি, যান না; ভুলে যাওয়াটা ইতিহাসের নিয়ম নয়। মধ্যপদলোপী শব্দরূপের মতো, মধ্যবিত্ত শ্রেণীনির্ভর সমাজচিন্তাও ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য। মধ্যবিত্তশ্রেণীভুক্তরা নিজেদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েই ইতিহাসের ঋণ শোধ করতে পারেন, আমাদের এই ভূখণ্ডেও শোধ করবেন : এটা অভিশাপ নয়, প্রার্থনা।

হায়, যদি আশার ভেলায় ভেসে সমস্যার ভয়ংকর মহাসমুদ্র নিটোল শান্তিতে পেরনো যেতো! আপাতত পশ্চিম বাংলায় বামপন্থীদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বলতে ধর্তব্যের মতো কেউই নেই, পঁচিশ-বছর-আগে-পরমপরাক্রান্ত-অবিশ্রান্ত-গদি-ঘোরানো সংবাদপত্রসমূহের পর্যন্ত হাল ছেড়ে দেওয়া অবস্থা। তা হলেও ফিরতে হয় সেই অপ্রিয় বাক্যের নিহিত ভর্ৎসনার সারমূলে : অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে।

কনিষ্ঠরা রাজ্য প্রশাসনে হাল ধরেছেন, সর্বাত্মক শুভেচ্ছার ডালি সাজিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়েছি। অনুজ সম্প্রদায় আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, প্রসিদ্ধ লোকবচন, 'কন্যাকর্তা স্বয়ং কন্যা, বরকর্তা ঘর, মদনরাজার জয় হোক ভাই, তোরা ঘরকন্না কর', আবৃত্তি অন্তে

নিঃশব্দে নেপথ্যচারী হতে আপাতত সম্ভবত তাই বাধা নেই। অথচ যা মনে হয় অনেক ক্ষেত্রেই তো তা নয়। মানছি, উষর-রুক্ষ-রক্তাক্ত ভারতবর্ষে পশ্চিম বাংলা এই মুহূর্তে মরূদ্যানপ্রতিম। কিন্তু যদি আমাদের সতর্কতা অব্যাহত না থাকে, এই মরূদ্যানও অতি দ্রুত মরীচিকার মতো মিলিয়ে যেতে পারে। চোখের মণির মতো ভারতবর্ষের ঐক্য ও সংহতিকে রক্ষা করতে হবে বলে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ; সারা দেশ জুড়ে জনগণের চেতনা সমোচ্ছল উন্মেষের কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকি। কিন্তু মনকে চোখ ঠেরে কী লাভ, জাতির একটি অতুচ্ছনীয় অংশ পুরাণের অন্ধকারে ফিরতে অত্যাগ্রহী, সেই অন্ধকার থেকে বের হতে আসলে অনেকে শুরুই করেনি। সমালোচনায় মুখর হয়ে অন্ধকারপ্রেমিকদের যদি গালও পাড়ি, দেশের এই মর্মান্তিক অবস্থার জন্য বামপন্থীরা স্বয়ং কিন্তু কম দায়ী নয়। সমস্যার অন্তঃস্থলে না-ঢুকে তাঁরা সস্তায় কিস্তি মাত করতে চেয়েছেন ; যা হবার নয়, তা হয়নি, কিছুদূর গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছেন। তাঁদের ব্যর্থতা তথা সাময়িক বিবেচনাহীনতার সুযোগ গ্রহণ করেই তো প্রতিক্রিয়ার সাধকরা সর্বত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করে বসেছে। এই অভিযোগ সামান্য আতিশয্যদোষদুষ্ট তা যদি স্বীকার করেও নিই, সমস্যার তাতে নিরসন হয় না।

বরঞ্চ দ্বন্দ্বের পীড়ন আরও বেশি করে চেতনার ঘাড়ে চেপে বসে। পুরাণপ্রেমে মাতোয়ারাদের দল যতদিন দেশের দখলদারি কব্জা করে রাখবে, ততদিন কী করবেন বামপন্থীরা? জাতীয় সংহতি রক্ষার যূপকাষ্ঠে নিজেদের বিসর্জন দেবেন, চোখ বুজে সাম্যবাদী আদর্শের নাম জপ করবেন, পরস্পরকে বোঝাবেন, হঠকারী হওয়ার চেয়ে বড়ো পাপাচার নেই, এবং যেহেতু নেই, কবে সর্বভারতীয় রাধা নাচবে, তার জন্য অপেক্ষামগ্ন থাকাই একমাত্র পন্থা, এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন?

এই আমরাই কিন্তু কিছুদিন আগেও নিজেদের চিমটি কেটে বলেছি, সুযোগ হাতে এসেছে, আমাদের আদর্শ দিয়ে, পরিচিকীর্ষা দিয়ে, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের দৃষ্টান্ত দিয়ে গোটা ভারতবর্ষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবো, সংবিধানের সীমাবদ্ধতা ও শ্রেণীবিন্যাসের কিম্ভূতাকৃতি সত্ত্বেও প্রমাণ করে দেবো, নিছক অলীক স্বপ্ন নয়, বৈদেহী স্বপ্নকে মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে আনা সম্ভব; আদর্শভিত্তিক আন্দোলন, আদর্শভিত্তিক সংগঠন, সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিনম্র লোকপ্রীতিউদ্দীপক আচরণ-বিচরণ ইত্যাদি সব মিলিয়ে পশ্চিম বাংলাকে সোনা দিয়ে ঠিক মুড়ে না দিলেও, অন্তত এক সুষম গেরস্থালি সচ্ছলতার প্রান্তদেশে উত্তীর্ণ করবে, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলকে মোহিত-চকিত করবে, বামপন্থী বিকল্পের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। অথচ সব-কিছু কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। অর্ধশতাব্দীরও অধিক আগে কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত কবিতায় উচ্চারিত আকুতির প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে, লীলাময় রায়ের বয়ানে অন্নদাশঙ্কর রায় মন্তব্য করেছিলেন : 'কামাক্ষীপ্রসাদ যতই বলুন, মৈনাকরা সৈনিক হয় না, সৈন্যরাই মৈনাক হয়'। গত দশ-বারো বছরের ঘটনাবলী যেন সেরকম বিষণ্ণ আশঙ্কার কথাই ব্যক্ত করছে। গোটা দেশেই প্রতীপমুখিতার ঝোড়ো হাওয়া, সুবিধাবাদের বিবেকবিহীন আস্ফালন, একদা আশার জাল যাঁদের নিয়ে বোনা হয়েছিল, বুনেছিলাম, সেই ফারুখ আবদুল্লা-গোছের লোকদের হাল দেখুন : রামসেবকদের পরমানুগত মেষশাবক!

পশ্চিম বাংলার শতকরা পঁচাশি ভাগ মানুষ গ্রামে-গঞ্জে ছড়ানো। প্রশাসন ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় এখনও পুঞ্জীকৃত অসাফল্য, অস্বচ্ছতা, হতাশা-উদ্রেককারী শ্লথতা, কোথাও-কোথাও, অকপটে স্বীকার করা প্রয়োজন, দুর্নীতির সংক্রমণ: কেউ-কেউ ব্যঙ্গ করে

বলেন, দুর্নীতির বিকেন্দ্রীকরণ। তবে জল তো উপর থেকে নিচের দিকেই গড়ায়। সীমিত সাধ্য সত্ত্বেও গত পঁচিশ বছরে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে যে-পরিমাণ উন্নতি সম্ভবপর ছিল, তা অবশ্যই অনায়ত্ত থেকে গেছে। সব-কিছু মেনে নিয়েও দাবি করবো যতটুকু উত্তম সাধিত হয়েছে তা-ও অভূতপূর্ব, বামপন্থীদের প্রতি রাজ্যময় গরিবগুর্বোদের পৌনঃপুনিক সমর্থনজ্ঞাপন তার নিশ্চিত প্রমাণ। নগরাঞ্চলে বিনিয়োগ নেই, শিল্প ধুঁকছে, কেন্দ্রীয় সরকারের সার্বিক নীতিসিদ্ধান্তহেতু শিল্প সংস্থার পর শিল্প সংস্থা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কর্মহীনদের সংখ্যা প্রত্যহ বিস্ফারিততর। চোখের সামনে অহরহ যা দৃশ্যমান, জীবিকার সুযোগের অভাবে ছেলের দল বিপথগামী হচ্ছে, গুণ্ডা-ছ্যাঁচোড়-তস্কর-জোচ্চোরদের সংখ্যাবৃদ্ধি করছে, বেঁচে থাকার দায়। আরো যা মারাত্মক, চেতনার শরীরে হঠাৎ যেন চটুলতার প্রলেপ পড়ছে। শুধু আদর্শের চিন্তার নির্ভরই নড়বড়ে হচ্ছে না, রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারও ক্রমশ শিথিল থেকে শিথিলতর। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা কদাচিৎ এখন মাতৃভাষায় একটি আস্ত বাক্য উচ্চারণ করতে পারে, মুম্বই চলচ্চিত্রের হতকুচ্ছিত নিদর্শনের হুবহু বাংলা সংস্করণে বাজার ছেয়ে যাচ্ছে, ছেলেমেয়েদের নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি-আচারকলার যে আগাপাশতলা পাল্টে-যাওয়া, তা ঢের ছাপিয়ে এক সার্বিক ভোগলিপ্সার উগ্রতা, বাঙালি মধ্যবিত্ত আর যেন ঠাহর করতে পারছে না, আদর্শবোধের সংজ্ঞা কী, কাকেই বা বলে ঐতিহ্য, ঐতিহ্যের প্রত্যাখ্যানই যেন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের লাঠির মতো, আদর্শেরও দিন গিয়েছে। আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগে আদর্শবাদী রংরুটদের শ্রেণীত্যাগের আবশ্যকতা শেখানোর চেষ্টা হতো, মধ্যবিত্ত নির্মোক জীর্ণ বস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করে বিত্তহীনদের মিছিলের সঙ্গে নিজের শরীর-সত্তা মিশিয়ে দেওয়ার চেয়ে মহত্তর অভিজ্ঞতা, বলা হতো, পৃথিবীতে আর কিছু নেই। ব্যবহারিক জীবনে অনেকেই সেই পরীক্ষায় সফল হতে পারতেন না, কিন্তু অন্তত চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁদের শ্রেণীগত রূপান্তর ঘটতো। বিগত দশকের বিশ্বায়নবিস্তারের পরিণামে বাঙালি মধ্যবিত্তের মানসিকতায় যুগান্তকারী পরিবর্তন : সেই কবে কোন্ প্রসঙ্গে রুশ অনুগামীদের নিকোলাই বুখারিন উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন, 'বড়োলোক হও'; আমাদের মলিন জরাজীর্ণ দেশে এত যুগের ব্যবধানে হঠাৎ তার প্রতিধ্বনি। এই অন্যচারিতার একটি তত্ত্বের ভিত্তিভূমি অবশ্য আছে : গরিবদের আমরা ভুলিনি, ভুলছি না, তবে আমরা মধ্যবিত্তরা যদি সর্বাগ্রে নিজেদের আখের গুছোতে পারি, আমাদের বর্ধমান উপার্জন তা হলে বাজারে চাহিদা বাড়াতে সাহায্য করবে, ফলে জাতীয় অর্থব্যবস্থায় সজীবতা আসবে, যা থেকে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, গরিবগুর্বোদেরও হাল ফিরবে।

যুক্তির সারণি ক্রমশ আরো প্রলম্ব হয়। মধ্যবিত্তদের উচ্চবিত্তদের হবে প্রগতির স্বার্থে, তাঁদের উচ্চবিত্ততর হওয়ার প্রয়াসে বাধা দিতে নেই, তাঁদের কদর জানাও, আদর করো, তাঁদের 'অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি' হিশেবে বিবেচনা করে সুরক্ষার ব্যবস্থা করো, সুরক্ষার পরিখা আরো মজবুত করার লক্ষ্যে এর পরে তাঁদের 'অতি অতি বিশিষ্ট' বলে আখ্যাত করতে শুরু করো। যেন এক ঘোরের মধ্যে অবস্থান করছি।

মধ্যবিত্তস্বভাবজ এই বিভ্রান্তি। শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পে ভণ্ড সাধক গদগদ কণ্ঠে 'মা, কলা খাও' মন্ত্রোচ্চারণ করে খোসা ছাড়িয়ে নিজেই কদলীভক্ষণ করতো, অনেকটা সেরকম। এতদিন-পর্যন্ত-বামপন্থী আঁতে ঘা লাগে, তাই তর্ক জুড়ে অজুহাত পেশ করা হয়, গোসা করছেন কেন, চীন যা করেছে, করছে, আমরাও তাই করছি। যাঁরা ইত্যাকার বলেন, অন্তত

তিনটি প্রমাদের শিকার তাঁরা। চীনের কর্তাব্যক্তিরা গোটা দেশের প্রধান-প্রধান গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্তের নিয়ামক ; অন্য পক্ষে পশ্চিম বাংলা ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্য মাত্র, কোনও ব্যাপারেই স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রাজ্যের নেই। চীনের আর্থিক অগ্রগতির গোড়ার কথা বিপ্লবোত্তর পর্বে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন, যা দেশের মানুষের চেতনা আদ্যন্ত নতুন ছাঁচে গড়ে তুলেছে ; কী ভারতবর্ষে, কী পশ্চিম বাংলায়, সে ধরনের আমূল সমাজ সংস্কারের জন্য কত যুগ প্রতীক্ষা করতে হবে কে জানে। তৃতীয়ত, চীনের অনাবাসী নাগরিকরা যে-বিরাট অঙ্কের অর্থ দেশে বিনিয়োগের জন্য পাঠিয়েছেন, তা আমাদের কল্পনারও বাইরে। প্রবাসী বাঙালিরা, অন্তত বেশির ভাগ, চাকুরিজীবী; যদি ইচ্ছাও থাকে, দেশের মাটিতে বিনিয়োগে টাকা ঢালবার সামর্থ্য তাঁদের অতি সীমিত। স্পষ্ট কথাটি তাই স্পষ্ট করেই বলতে হয় : তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছর আগে 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' হরিধ্বনি যেমন গোলমেলে ছিল, হালের 'চীনের অর্থনীতিই আমাদের অর্থনীতি' উচ্চনাদও সমপরিমাণ কল্পনাকণ্ডূয়ন।

বাস্তবতায় না-ফিরে উপায় নেই আমাদের। বিশ্বায়নের জাদুতে যদি মজতে চাই, চৈনিক আকাশকুসুম ভুলে গিয়ে ভারতবর্ষে গত এক দশক ধরে কী হয়েছে, আরও কী হতে যাচ্ছে, সেদিকেই নজর ফেরানো দরকার। তোমার-প্রাণ-আমার-হোক-আমার-প্রাণ-তোমার-হোকের এই বিশ্বায়িত দশ-এগারো বছরে ভারতবর্ষে কৃষি উৎপাদনের হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের নিচে নেমে গেছে, শিল্পোন্নতির হার পূর্ববর্তী দশকের হারের অর্ধেকেরও কম, সরকারি নীতির প্রকোপে অসংখ্য কারখানা—যাদের একটি বড়ো অংশ পশ্চিম বাংলায়—বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কর্মহীনদের সংখ্যা হু-হু করে বাড়ছে, অবাধ আমদানির ফলে কৃষি-শিল্পের ভবিষ্যৎ ঘোর অনিশ্চিত, বৈদেশিক শক্তি আমাদের ঘাড়ে নিশ্চিত চেপে বসা। একশো বছর আগে যা ছিল সাম্রাজ্যবাদের স্বর্ণযুগ, একশো বছর বাদে তার নবসংস্করণকে আমরা নব-সাম্রাজ্যবাদ বলতেও লজ্জা পাই, ঘুরিয়ে বলি বিশ্বায়ন। একটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন অবশ্য চোখে পড়বার মতো : পরিষেবার চমকপ্রদ ব্যাপ্তি, ব্যাংক-বীমা ব্যবস্থায়, ভ্রমণে, বিনোদন শিল্পে। তথাচ সমস্যা ; পরিষেবার প্রসারে কর্মসংস্থান বাড়ে না, কমে; বৈদ্যুতিন প্রযুক্তির অনুপ্রবেশে এক লক্ষ করণিকের কাজ চলে যায়, পরিবর্তে সম্পন্ন ঘরের চালাকচতুর বড়ো জোর হাজারখানেক ছেলেমেয়ে মস্ত মাইনের চাকরিতে বহাল হয়, কম্পিউটার তাদের ধ্যানজ্ঞান ; দেশে বেকারি বাড়ে, ধনবণ্টনের বৈষম্যও।

দেখে-শুনে ভয় হয়, সমগ্র ভারতবর্ষকে বামপন্থী বিকল্প পথ দেখাবার প্রতিশ্রুতি যেন ধূসর থেকে ধূসরতর, বিশ্বায়নের সোনার হরিণ ধাওয়া করতে গিয়ে পশ্চিম বাংলা, কে জানে, হয়তো ক্রমশ কেন্দ্রীয় সরকারের বশংবদ অমাত্যে পরিণত হবে দু'দশ বছরের মধ্যে। ছায়া এই ঋতুতে অবশ্যই পূর্বগামিনী। পুঁজিপতি-ব্যবসাদারদের বেশি খুশি করে গুজরাট-মহারাষ্ট্র থেকে ভাগিয়ে নিয়ে আসবো, এই উচ্চাশার পাশাপাশি কেন্দ্রকে ভজনা করে যদি কিছু বাড়তি রেস্ত সংগ্রহ করা যায় তেমন উদ্যোগ। পুঁজিওলা-ভজনা, আমার বিবেচনায়, আর একবার বলি, পণ্ডশ্রম, কারণ কেন্দ্র-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্পে টাকা ঢাললেই তবে সাধারণত শিল্পপতিদের গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠা। ওঁরা উত্তম পুরুষ নন, সব সময়ই দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষ। তাই শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রই ভরসা, কেন্দ্রকে তোয়াজ করে যতটুকু পাওয়া যায়। ঘুরিয়ে বলে লাভ নেই, কেন্দ্রের রামভক্ত সরকার পশ্চিম বাংলার জন্য ভালোবাসায় উথলে উঠবে না, যদি না পশ্চিম বাংলার অধিবাসীবৃন্দও সবংশ রামভক্ত বনে

যান, বামপন্থার ভূত চিরতরে কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে।

বামপন্থী আদর্শের আর বাজারদর নেই, বহুকীর্তিত পশ্চিম বাংলায়ও, সন্দেহ হয়, নেই: প্রভুর সংস্কৃতিই প্রজাকুল সন্নতমস্তিষ্কে গ্রহণ করে। হাতের কাছেই একটি চমৎকার উদাহরণ। নতুন দিল্লির নিরাপত্তা-সংস্কৃতি ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যেও বৃহৎ পরিমাণে সংক্রামিত। দেশের রাজধানীতে সামাজিক মর্যাদা নিরাপত্তার তুলনাগত সমারোহের উপর নির্ভরশীল। দু'শো-আড়াইশো বছর আগে বাংলা দেশের গ্রামে কুমারী মেয়েরা শীতঋতুতে উঠোনে বা বাড়ির ছাদে সারি দিয়ে বড়ি দিতে বসতো। তাদের উদ্দীপনা সঞ্চারের জন্য বলা হতো, যার বড়ি যত উঁচু, তার বরের নাক তত উঁচু। প্রতিযোগিতামূলক গণতন্ত্র : উন্নতনাসা রাজপুত্র-কামনায় প্রতিটি কুমারী বাড়তি উৎসাহ নিয়ে বড়ি আরও নিখুঁত করতে মনোনিবেশ করতো। নতুন দিল্লিতে আপাতত একই ধরনের সংস্কৃতিপ্রবাহ : যাঁর নিরাপত্তা যত জমকালো, তিনি তত বড়ো নেতা। পশ্চিম বাংলাতেও, আশঙ্কা হয়, সেই অতল জলের আহ্বান আস্তে-আস্তে এসে পৌঁছুচ্ছে। তবে কারো-কারো আশঙ্কাই তো অন্য কারো-কারো ক্ষেত্রে আশার রূপ নিয়ে আবির্ভূত।

নরকের কোন অতলে যে-অবতীর্ণ হওয়ার আশঙ্কা, তার একটি নমুনা স্মৃতিকে এখনও শিহরিত করে। নারায়ণদত্ত তেওয়ারী তখন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী, দিল্লির উদ্যোগ ভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি! তেওয়ারী মশাইয়ের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে লখনউ-ই শিষ্টাচার, দেখা হলেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ করেন, নিয়ম করে একবার শরীরের ডান দিকে জড়িয়ে ধরে, আর একবার বাঁ দিকে। তাঁর বাহুপাশে আপ্যায়নে-এলিয়ে-পড়া আমি ওই অবস্থাতেই হঠাৎ দেখি, উভয় দিক থেকেই একজন প্রহরী আমাকে লক্ষ্য করে বন্দুক উঁচিয়ে।

জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে। ভারতীয় ঐক্য-ও সংহতি কামনায় আমরা আবিষ্ট, জাতীয় দুরাচার-দুর্নীতির প্রভাবও তাই আর এড়াবো কী করে। চীনে ঠগ-জোচ্চোরদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়, কিংবা গুলি করে মারা হয়, আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তা সম্ভব নয়। তবু, এতদিন পর্যন্ত অন্তত, দেশের অন্য সর্বত্র যে-ধরনের পুকুরচুরি ঘটে, তার তুলনায় পশ্চিম বাংলায় দুর্নীতি অনেকটাই নিষ্প্রভ। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় বা সরকারের এই বিভাগে-ওই বিভাগে ভ্রষ্টাচার নিয়ে অনেক গালগল্প প্রচারিত। তবে সেসব অধিকাংশই ছিঁচকে দুর্নীতি, ফাইলের গতি বাড়াবার জন্য কুড়ি-পঁচিশ টাকার প্রসাদ যাচ্ঞা, কোনও রাজপুরুষের হয়তো কোনও ব্যবসাদারের কাছ থেকে এক বোতল বিদেশি হুইস্কি উপহার গ্রহণ, কোনও হাবাগোবা মন্ত্রী এক বালতি রান্না-করা মুর্গির মাংস ভেট পেয়েছেন এক দালালের কাছ থেকে, সার্কিট হাউসে দরজা-জানালা বন্ধ করে সপরিবারে তার সদ্ব্যবহার। দিল্লি-মুম্বই-চেন্নাই-পটনা ও অন্যত্র যে হাজার-হাজার কোটি জনসাধারণের অর্থ দুর্নীতির বেপরোয়া চোরাপথে অদৃশ্য হয়ে যায়, তা ভীরু বাঙালির জাগতিক সম্পত্তিসৃষ্টির প্রলোভনকল্পনার বাইরে। তবে, কে জানে, জাতীয়তাবোধের মোহিনী মায়া, সুরক্ষা দৃঢ় করবার ক্ষেত্রে যেমন, দুর্নীতির ব্যাপারেও পশ্চিম বাংলা সম্ভবত এখন থেকে আর পিছিয়ে থাকতে অসম্মত হবে, অভীপ্সা যেহেতু এক জাতি-এক প্রাণ-একতা।

মহাকরণে থাকাকালীন কিছু-কিছু ছিঁচকে দুর্নীতির বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা এই সুযোগে না-হয় লিপিবদ্ধ করি। আবগারি দপ্তরের দায়িত্বে আছি। খবর পৌঁছুলো দপ্তরের কর্মচারীরা চোলাই ধরতে শহরের দক্ষিণ প্রান্তে এক বাজারে হানা দিয়েছিলেন, চোলাইকারীদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হয়েছে, বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মী জখম হয়েছেন, একজন আবগারি

ইন্সপেকটরের আঘাত গুরুতর, তাঁকে হাসপাতালে দেখে এলাম, বহু ব্যান্ডেজে জর্জরিত শরীর। আবগারি দপ্তরের সচিবকে বললাম, 'ইন্সপেকটরটি কর্তব্য সম্পন্ন করতে গিয়ে প্রহৃত হয়েছেন; এসব ক্ষেত্রে তো নিয়ম আছে বিশেষ পুরস্কার ঘোষণার। আপনি দয়া করে ফাইল চালু করুন, আমি এঁর জন্য পুরস্কার মঞ্জুর করবো।' সপ্তাহ যায়, মাস যায়, দু'একবার সচিবকে মনে করিয়ে দিয়েছি, কিন্তু ফাইল আর চালু হয় না। একদিন সচিবকে চেপে ধরলাম : 'কী ব্যাপার বলুন তো, আপনি প্রস্তাবটি পাঠাচ্ছেন না কেন?' সচিব কাঁচুমাচু জবাব দিলেন, 'স্যার, এই ক্ষেত্রে পুরস্কার ঘোষণা বোধ হয় সমীচীন হবে না।' আমি অবাক, কেন? সচিব জানালেন, একটি বিশ্বাসভঙ্গের ঘটনা ঘটেছে ; ইন্সপেকটরটি দলবল নিয়ে গিয়ে আগের রাত্তিরে মাসের তোলা নিয়ে এসেছেন; পরের সন্ধ্যায়, কী অন্যায়, চোলাই উদ্ধারে গেছেন, বিশ্বাসভঙ্গের এর চেয়ে বড়ো উদাহরণ আর কী হতে পারে।

তেমন ভয়ানক কিছু কিন্তু নয়। একটু-আধটু পুকুরচুরি করে বহুতল বাড়ি তোলা হচ্ছে কলকাতায় ও আশেপাশে, লাভের বখরা অনেকে পাচ্ছে, এ সব তো সর্ববিদিত সত্য। তবে বাঙালি কল্পনাশক্তি এখনও প্রধানত কাব্যচর্চা ও খুদে পত্রিকা বের করবার খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রভাবে সেই প্রতিভা যে-গতিধারা বদলাবে না, তঞ্চকতার মহাসমুদ্রে গিয়ে মিশবে না অদূর ভবিষ্যতে, কে বলতে পারে?

এবংবিধ আতঙ্ক অমূলক বলা চলে না। এখন তো দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতিই বলছেন, সারা দেশে বিচারকদের মধ্যে শতকরা তিরিশ ভাগ অসাধু, তাই বৃত্তান্তটি বর্ণনা করতে অস্বস্তিবোধ হচ্ছে না। এক জেলার আবগারি সুপারিন্টেন্ডেন্ট, খবর পাচ্ছি, প্রচুর উৎকোচ গ্রহণ করছেন ; খবর পাকা, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। একটি বিশেষ প্রশাসনিক কারসাজির সুযোগ গ্রহণ করে ঘুষখোর ব্যক্তিটিকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। পুজোর মাস, প্রচুর টাকা কামাবার মওকা এভাবে ব্যর্থ হবে, আবগারি কর্মীটি সোজা হাইকোর্টের অবকাশকালীন বিচারপতির কাছে চলে গেলেন। বিচারপতির ঝটিতি রায় ঘোষণা, এই অফিসারকে অবিলম্বে কোনও ভালো জেলায় বহাল করতে হবে। খুব লোভ হয়েছিল সরকারি উকিল মারফত বিচারপতিকে জিজ্ঞাসা করি, ভালো জেলার সংজ্ঞা কী, যে-জেলায় সহজে কাঁড়ি-কাঁড়ি ঘুষের টাকা অর্জন করা যায়, যে-টাকা তারপর 'মঙ্গলভস্মের পর' কবিতার সন্ন্যাসীর ধাঁচে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়া যায়? ফের বলি, পশ্চিম বাংলায় এখন পর্যন্ত যা ঘটছে তা স্রেফ নস্যি। তবে ভারতবর্ষ যত সংহত ও ঐক্যবদ্ধ হবে, নস্যি আর নস্যি থাকবে না।

সবচেয়ে বেশি মনস্তাপ অবশ্য কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পদের পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে শুরু-করা আন্দোলনের অপমৃত্যুহেতু। বামফ্রন্টের তরফ থেকে যখন রাজ্যের হাতে অধিক অর্থের দাবিতে ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সমস্যা নিয়ে সত্তরের দশকের উপান্তে চিৎকার শুরু করেছিলাম, ফ্রন্টে-তখন-আর-নেই এমন-এক-বামপন্থী দলের নেতারা প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাঁদের যুক্তি অতীব স্বচ্ছ : কেন্দ্রীয় সরকারের অবশ্যই পুঁজিবাদী চরিত্র, কিন্তু ভারতে পুঁজিবাদী বিকাশ না ঘটলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবও ঠেকে যাবে, আগে ধনতন্ত্র, পরে সমাজতন্ত্র; কেন্দ্র থেকে রাজ্যের হাতে বেশি টাকা-পয়সা চলে এলে কেন্দ্র আর্থিক দিক থেকে দুর্বল হবে, ধনতন্ত্রের দ্রুত বিকাশ ব্যাহত হবে, সমাজতান্ত্রিক সূর্যের উদয়ও তাই পিছিয়ে যাবে ; অতএব যাঁরা রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার জন্য আন্দোলন করছেন, তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল, সমাজতন্ত্রের শত্রু। সে সময় যুক্তির উদ্ভট কুশলতায় কৌতুক বোধ

করেছিলাম, এখন আবিষ্কার করছি, নবরূপে সেই যুক্তির মঞ্চে পুনরাবির্ভাব। তত্ত্ব রচিত হচ্ছে, রাজ্যে-রাজ্যে বিভিন্ন হারে কর আরোপ জাতীয় অর্থব্যবস্থার পক্ষে হানিকর; বিক্রয় করের হার রাজ্যে-রাজ্যে যদি তফাৎ হয়, গাড়ির উপর কর আজ এক রাজ্যে বেশি, পাশের রাজ্যে কম, কাল এই রাজ্যে কম, পাশের রাজ্যে বেশি, পুঁজিপতি-ব্যবসাদারদের তাতে মহা অসুবিধা, শিল্পে-ব্যবসায় তা হলে অস্থিতি আসতে বাধ্য। ভারতবর্ষ এগোলে, পশ্চিম বাংলাও এগোবে, সুতরাং পশ্চিম বাংলার স্বার্থেই বিক্রয় কর ব্যবস্থা তুলে দিয়ে কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত বিকল্প এক কর ব্যবস্থার কথা ভাবা হোক : সারা দেশে কোথাও আর তখন বিক্রয় করের হুজ্জুতি থাকবে না, পরিবর্তে বিশেষ এক কেন্দ্রীয় কর বসবে, প্রতিটি পণ্যের ক্ষেত্রে যার হার সারা দেশে সমপরিমাণ; শিল্পবাণিজ্য তা হলে ফুলে-ফেঁপে উঠবে। সবচেয়ে মারাত্মক সংবাদ, আমাদের রাজ্য নাকি এই অভিনব প্রস্তাবের প্রধান উদ্যোক্তা; জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে।

এটা তো প্রমাণিত সত্য, প্রচুর গোপন নির্দেশিকা ওয়াশিংটন থেকে দিল্লিমুখো হয়েছে গত কুড়ি বছরে, বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের তরফ থেকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের উপর কাঁড়ি-কাঁড়ি উপদেশ বর্ষণ করা হয়েছে, রাজ্যগুলিকে আর্থিক অসুবিধায় ফেলে কেন্দ্র নিজের ঘর ভালো করে গুছোক; রাজ্যগুলি যত বেশি অসাচ্ছল্যে পড়বে, তত তারা পথে আসবে, তাদের তেঁটিয়া ভাব তত নিষ্প্রভ হবে, তত তারা নতুন দিল্লির পদলেহনে আগ্রহবান হবে। বিক্রয় কর বিলোপ করে প্রস্তাবিত পরিবর্ত ব্যবস্থা এই অনুসৃত চক্রান্তের অন্যতম উদাহরণ মাত্র।

অপরাপর বাস্তব সমস্যাগুলিও তো গর্তে মুখ লুকিয়ে থাকবে না। আশির দশকের মাঝামাঝি কোনও সময়, ইতালির নতুন দিল্লিস্থ রাষ্ট্রদূত মহাকরণে দেখা করতে এলেন: পিয়েত্রো নেনী-প্রতিষ্ঠিত সোশ্যালিস্ট পার্টির সদস্য, চিন্তায়-কর্মে বামপন্থী। ইতালীয় প্রকৌশল অনুসরণ করে হিমালয়ের সানুদেশে ব্যাপক ফল চাষের সাফল্য-সম্ভাবনা নিয়ে তাঁর মনে ন্যূনতম দ্বিধা নেই, রোমে কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে ইতালি সরকারের কাছ থেকে সেই উদ্দেশে একটি বিশেষ সাহায্যপ্রকল্পেরও ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর বিশেষ ইচ্ছা সাহায্যের বৃহদংশ বামপন্থী পশ্চিম বাংলার দার্জিলিং-শিলিগুড়ি অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ হোক। কিন্তু নতুন দিল্লির রাজপুরুষদের কিছুতেই রাজি করাতে পারছেন না, তাঁরা পুরো টাকাটা পঞ্জাব-হিমাচল প্রদেশ-উত্তর প্রদেশ-মহারাষ্ট্র-কর্ণাটকের জন্য বরাদ্দ করবেন, পশ্চিম বাংলার জন্য পাই-পয়সাও নয়। নতুন দিল্লিতে রামসেবক বা নেহরু-গান্ধি আসক্ত যাঁরাই হাল ধরে থাকুক না কেন, ভিন্ন আদর্শ-অনুগত অঙ্গরাজ্য সরকার সম্পর্কে এই বিদ্বিষ্ট চিন্তা তো আগামী দিনে স্বতই মিলিয়ে যাবে না। নিখাদ ত্রিশূল-উঁচোনো রামভক্তিতে অথবা পারিবারিক সামন্ততন্ত্রের প্রতি অনুরাগে যদি আমরা আপ্লুত হই, তা হলে অবশ্য অন্য কথা।

পেশাদারি নৈরাশ্যসদাগরের হয়তো ভূমিকা আমার, স্বর্ণসুখের কল্পনা আবিষ্ট করে না। তবু ভয় হয়। যাঁদের সমর্থনে ও আশীর্বাদে পশ্চিম বাংলায় বামপন্থী আন্দোলনের পুষ্টি ও বর্ধন, কিছু-কিছু সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে তাঁদের প্রতি কি অন্যমনস্ক ঔদাসীন্য প্রদর্শিত হচ্ছে না? শ্রেণীত্যাগের প্রসঙ্গ না-হয় শিকেয় তোলা থাক, সমাজবিপ্লবও যেখানে বহু দূরের আকাশ, হঠাৎ শ্রেণীসমন্বয়ের হতভম্ব-করা বার্তা কী মঙ্গল দান করবে হতদরিদ্র-আজন্মলাঞ্ছিত কোটি-কোটি সাধারণ মানুষকে? আতঙ্কে আরও লীন হতে হয় যখন চোখে না-পড়ে পারে না, যাঁরা সাম্যবাদী চিন্তা ও আদর্শের চরম বৈরী বলে এতদিন পরিচিত ছিলেন, তাঁরাই এখন

প্রধান শুভানুধ্যায়ী ও পরামর্শদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ। সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়; মুশকিল হলো, কিছু-কিছু বিজ্ঞজনের ধারণা, সুসময়ের অক্ষয় জীবনায়ু।

জাতীয় ঐক্য ও সংহতি যেহেতু বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দুতে, জাতীয় রাজনীতির কারাগারে স্বেচ্ছাবন্দী আমরা, আদর্শশূন্য নীতিহীনতার ফসল কুড়িয়েই সম্ভবত অনির্দিষ্ট কাল বাঁচতে হবে। কংগ্রেস-ভারতীয় জনতা পার্টির অনুগামীদের মধ্যে প্রভেদীকরণ যেমন সহজ নয়, চমকপ্রদ অন্য দৃশ্যাবলীও তো দেখতে হচ্ছে, দলিতদের নায়কত্ব যাঁরা দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রিত্বের টোপ ফেললেই তাঁরা মনুবাদীদের সঙ্গে ভিড়ে যান, তথাকথিত সমাজবাদীরা বাঘা-বাঘা পুঁজিওলার তল্পিবাহকে পরিণত হন, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী সংগঠনের মস্ত চাঁই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে পাকিস্তান বিজয়ের সুখস্বপ্নে বিভোর হতে ভালোবাসেন। এঁদের কারও-না-কারও সঙ্গে মিতালি করে ভারতবর্ষকে সুস্বাস্থ্যে প্রত্যাবর্তন করানো সম্ভব, যদি কেউ এমন দাবি করেন, ঢোঁক গেলা ছাড়া উপায় থাকবে না আমার।

এবং সেজন্যই, যে-প্রবক্তরা বলেন বিরাট ভুল হয়েছিল ছিয়ানব্বুই সালে, জ্যোতিবাবুকে প্রধান মন্ত্রী করার প্রস্তাবে সম্মতি দিলে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে যেতো, মনে হয়, তাঁরাই ভুল বলছেন। আর্যাবর্তের নীতিরহিত দানবদের সামলানো শিবের বাবার অসাধ্য, এদের ক্ষুদ্র স্বার্থ, অথচ প্রচণ্ড লোভ, এদের দিয়ে কোনও নীতি বা আদর্শের পাটিগণিত-ধারাপাতই মানানো যেতো না, মনে হয় না জ্যোতিবাবুও সফল হতেন; কোনও চরম প্রতিক্রিয়াপন্থী ব্যক্তি অর্থমন্ত্রীরূপে সমারূঢ়, প্রধান মন্ত্রীকে সমীহ করার ব্যাপারে তাঁর নিশ্চয়ই কোনও মাথাব্যথা থাকতো না, তাঁর ফরমান, যেমনটা হয়ে আসছে, আসতো খোদ ওয়াশিংটন থেকে। ছিয়ানব্বুই সালে ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েছিলেন, প্রায় জড়ভরত হয়ে থাকতে হয়েছিল তাঁকে। মানছি, তিনি যে-সব অসুবিধা থেকে ভুগতেন, জ্যোতিবাবু সেগুলি খানিকটা এড়াতে পারতেন, কিন্তু প্রধান সমস্যাদি অপরিবর্তিতই থাকতো, প্রাক-পুরাণিক ঐতিহ্যের গর্বসমাচ্ছন্ন বিশাল ভূখণ্ডে যুক্তির সুবিন্যস্ত বাণী প্রচারের প্রয়াস ব্যর্থ পরিহাসে পর্যবসিত হতো। প্রাগিতিহাসপ্রেমিকরা কৌশলপ্রক্রিয়ার প্রয়োগে আদর্শবাদীদের অতি অবলীলায় বধ্যভূমিতে তুলে নিয়ে যেতে পারদর্শী।

স্বধর্মে নিধন অবধারিত এই হীনম্মন্যতা চেপে বসেছে অনেক একদা-আদর্শবাদীর চেতনার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। তাঁরা ক্লান্ত, তাঁরা ভুলে যেতে চান ঐতিহ্যের শপথ, চোখ-কান বুজে পরধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ করলেই যেন বিবেকের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন তাঁরা। পরধর্ম যে ভয়াবহ তা নিয়ে আমার মনে অন্তত দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। স্বধর্মকে মান্ধাতাগন্ধী বলে যদি গাল পাড়াও হয়, তা হলেও সেই আদি আশ্রয়ভূমিতে স্থিত থাকতেই আমার উন্মুখতা। যাঁরা আমার সিদ্ধান্ত অপছন্দ করবেন, তাঁদের দিকে অল্প হেসে যুবাবয়সে আত্মস্থ কবিতার পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করবো : দক্ষিণ পথে মেলে যদি দক্ষিণা, ভেবে দেখো তবু সেই পথ ঠিক কিনা।

খানিকটা আক্ষেপ, খানিকটা স্মৃতিরোমন্থন। দুই দশক আগে ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর অর্থমন্ত্রী বেঙ্কটরামন আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের কাছ থেকে জাতির-পক্ষে-অবমাননাকর শর্তে ঋণ নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করছেন, নির্দিষ্ট শর্তগুলি মানলে আমাদের অনেকের বিবেচনায় দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন না-হয়ে পারে না। পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ উচ্চারিত হলো, কলকাতায় প্রতিবাদী সম্মেলন গোটা দেশ থেকে জড়ো-করা অর্থনীতিবিদদের নিয়ে। কলকাতা ও পশ্চিম বাংলাতেই পড়ে রইলাম না আমরা,

প্রস্তাবিত ঋণগ্রহণের নিন্দা বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হলো, দেশ জুড়ে গড়া হলো প্রতিরোধের ব্যূহ, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার যে-গোপন চুক্তি সই করতে উদ্যত, তৎসংক্রান্ত দস্তাবেজ সংগ্রহ করে তা জনসাধারণের কাছে ফাঁস করে দেওয়া। ঋণের শর্তাদির বিপজ্জনক দিকগুলি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে প্রায় রাতারাতি বই লিখিয়ে তা প্রকাশ, রাজধানী দিল্লিতে ধিক্কার মিছিল, যে-মিছিলের শেষ পর্বে সংসদ ভবনে ধর্ণা। হুলস্থুল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সফল হয়েছিলাম আমরা, ভারত সরকারের আতঙ্কে কুঁকড়ে আসা। শেষ পর্যন্ত যদিও চুক্তিটি পুরোপুরি আটকে দেওয়া সম্ভব হয়নি, কয়েকজন সংশ্লিষ্ট রাজপুরুষ পরে আমাকে জানিয়েছিলেন আমাদের প্রতিবাদের ফলেই আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার কতিপয় অতি আপত্তিজনক শর্ত শিথিল করতে বাধ্য হয়েছিল।

অন্য যুগ। বিশ্বায়নের প্রকোপে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার দরিদ্র দেশগুলির ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা, ভারতবর্ষও সমান বিপন্ন, বিশ্ব ব্যাংক-আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার-বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-মহাপ্রভু মার্কিন সরকারের সম্মিলিত দাপটে আমাদের অস্তিত্ব আপন্ন। অথচ কলকাতায়, পশ্চিম বাংলায় প্রতিবাদের রণধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে না, আমরা বলতে গেলে উল্টোরথ যাত্রা করছি। এই মহাদেশে-ওই মহাদেশে বিভিন্ন আক্রান্ত দেশে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। ফুটবলের কল্যাণে পশ্চিম বঙ্গবাসী এখন রোনাল্ডিনহোর নাম জানেন। এই খেলোয়াড় ব্রাজিলের রিও গ্রান্দে দো সুল প্রদেশের বাসিন্দা। ব্রাজিলের কেন্দ্রীয় সরকার বরাবর সম্যকরূপে প্রতিক্রিয়াশীল, কিন্তু রিও গ্রান্দে দো সুল-এ নিকষ বামপন্থী সরকার, প্রতিক্রিয়া-অধ্যুষিত ভারতবর্ষে পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট সরকার যেমন মরূদ্যানসদৃশ, সেরকম। গত কয়েক বছর ধরে এটা হয়ে আসছে, রিও গ্রান্দে প্রাদেশিক সরকারের উদ্যোগে প্রাদেশিক রাজধানী পোর্তো এ্যাইগ্রে-তে সপ্তাহব্যাপী বাৎসরিক নিখিল বিশ্ব বিশ্বায়ন-বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ছয় মহাদেশ ঝেঁটিয়ে হাজার-হাজার প্রতিবাদী মানুষের জড়ো হওয়া, বিভিন্ন দেশে বিশ্বায়ন-বিরোধী ঘটনার চুল-চেরা সালতামামি, বক্তৃতা-বৈঠক-শোভাযাত্রা-গণসংগীত-গণনাট্যের সমারোহ। গোটা পৃথিবীর বিশ্বায়ন-শোষিত জনগণের প্রতিজ্ঞা সম্মেলনে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, আগামী দিনের প্রতিরোধ কর্মসূচি নির্ধারিত হয়। আমার মনে একটি সঙ্গোপন কল্পনা সন্তর্পণ বাসা বেঁধে আছে, রিও গ্রান্দে দো সুল প্রদেশের সরকার ও পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট সরকার পরস্পরের সঙ্গে আলাপান্তে নিখিল বিশ্ব বিশ্বায়ন-বিরোধী জমায়েতের যৌথ দায়িত্ব গ্রহণ করবে, সম্মেলন পালা করে এক বছর পোর্তো এ্যাইগ্রে-তে, পরের বছর কলকাতায়, এমন করে প্রতি বছর অনির্দিষ্ট কালের জন্য, যতদিন না দরিদ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছে। ওই ধরনের সম্মেলনই হবে যথার্থ বিশ্বায়ন, পৃথিবীর নানা প্রান্তে ধুঁকেপুকে-বেঁচে-থাকা শোষিত-অবহেলিত মানুষজনের আলিঙ্গনবন্ধন। কিন্তু কল্পনা তো কল্পনাই। সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পারি, আমাদের প্রান্তদেশে যে-রজনী গেছে তাকে ফেরানো আর বোধহয় আপাতত সম্ভব নয় : আমরা ছুটকো-ছাটকা একজন-দু'জন পোর্তো এ্যাইগ্রে-তে গিয়ে হয়তো পৌঁছুবো, পোর্তো এ্যাইগ্রে থেকে কেউ কলকাতায় আসবেন না, কলকাতা তো অপর বিশ্বায়নে এই মুহূর্তে আসক্ত।

এক দিকে পুরাণপ্রেমে, অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক মোহের জালে আবদ্ধ দেশের বর্তমান হাল দেখে গলা-টিপে-হত্যা-করা একটি বিকল্প সম্ভাবনার ছায়াছবি ক্রমশই অনুশোচনায় বিষণ্ণ করে। যদি সেই উনিশশো সাতচল্লিশ সালে অথবা তার পরবর্তী কোনও পর্যায়ে

ভারতবর্ষকে চার-পাঁচটি উপ-দেশের আদল দেওয়া হতো, তা হলে গোটা দেশের চেহারা-চরিত্রই অন্যরকম হতো। উপ-দেশগুলি কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে শুধু পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করতো, অবশিষ্ট প্রতিটি ক্ষেত্রে উপ-দেশগুলি সার্বভৌম, আর্থিক ক্ষেত্রেও কেন্দ্রের অধিকার সীমিত, রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার উপ-দেশগুলির এখতিয়ার-ভুক্ত, কেন্দ্রের জন্য সামান্য পরিমাণ বরাদ্দের ব্যবস্থা থাকতো। এমন পরিকাঠামোর অনুশাসনে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুচিত ছড়ি ঘোরাবার সুযোগ কুঁকড়ে আসতো, প্রতিরক্ষার নামে অপরিমিত ব্যয়ের মোচ্ছব নিগড়ে বাঁধা পড়তো, নিরন্ন-নিরক্ষর-অস্বাস্থ্যে ধুঁকতে থাকা সাধারণ মানুষজনের স্বার্থচিন্তা পাশে সরিয়ে রেখে পারমাণবিক বোমা নিয়ে লোফালুফির ঋতুরও অতএব যবনিকা, উপ-দেশগুলি পরস্পরের সঙ্গে লোকহিতসাধনের প্রতিযোগিতায় শুধু নিমগ্ন। ফলে আর্থিক বিকাশের হার যেমন বহুগুণ বৃদ্ধি পেত, তার সুষম বণ্টনও সম্ভব হতো। অন্যত্র একটি-দু'টি দেশে যে-ধরনের ব্যবস্থা আছে, যে-কোনও বৈদেশিক চুক্তি প্রতিটি উপ-দেশের বিধানসভার সম্মতি ব্যতীত বৈধ বলে বিবেচিত হতো না; রাতের অন্ধকারে দেশকে বিদেশী মহাপ্রভুদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া চরম প্রতিক্রিয়াশীল কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষেও অসাধ্য হতো।

আপাতত তো এই স্বপ্নকে নিধন করা হয়েছে। এখন তাই ক্ষোভ-অনুতাপের সুদীর্ঘ অধ্যায়। সেই সঙ্গে নিজের মধ্যে কুঁকড়ে এসে স্মৃতির হাহাকার। স্মৃতিসর্বস্বতায় অজস্র চড়াই-উতরাই। অনুশোচনার স্মৃতি, কৃতজ্ঞতার স্মৃতি, লজ্জাবোধের স্মৃতি, অপরাধবোধের স্মৃতি, মুগ্ধতায় মুহ্যমান হওয়ার স্মৃতি। সুদূরতম, অথচ এখনও কাতর-করা স্মৃতি, পাঁচ বছরের ক্ষীণকণ্ঠ বালক, ঘনিষ্ঠ জমিদারবাড়িতে পুজোর ঋতুতে বেড়াতে গেছি, আদরে প্রসাধিত দিনযাপন, অষ্টমীর দিন এ-গ্রাম ও-গ্রাম থেকে দরিদ্র প্রজাকুল ঠাকুর দেখতে এসেছেন, জমিদারপ্রাসাদ-সংলগ্ন উঁচু নহবতখানা, সামান্য কৌতূহলবশত এক শীর্ণা ছিন্নবস্ত্রা কৃষকরমণী সিঁড়ি বেয়ে নহবতখানায় উঠে এসেছেন, কোলে ছ'মাসের বাচ্চা, মলিন আঁচল ধরে বছর চারেকের আর একটি শিশু : বিনা অনুমতিতে উপরে উঠে আসা, এত স্পর্ধা, জমিদারের পেয়াদা কর্তৃক তাঁদের তাড়িয়ে দেওয়া, দুই শিশুকে আঁকড়ে ধরে ভয়ব্যাকুল মহিলার সিঁড়ি বেয়ে ত্রস্ত নিচে নেমে যাওয়া। দীর্ঘ সাত দশক ধরে, বিবিধ পাপকর্মের ফাঁকে-ফাঁকে, সেই অপস্রিয়মাণা নারীর কাছে অক্ষমের ক্ষমা প্রার্থনা করে যাচ্ছি।

মফস্বলের হাবা ছেলে আমি, বয়স আঠারো-উনিশ হবে হয়তো, আমাদের কালের প্রখ্যাত ছাত্র নেতা প্রশান্ত সান্যালের দিদি, অশ্রুকণা ভট্টাচার্য, কয়েকটা মাস আমাকে স্নেহের নিগড়ে বেঁধে রেখেছিলেন। অশ্রুদি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত ভালো ছাত্রী, ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই চমৎকার লিখতেন, তবে প্রথাগত লেখাপড়ার চর্চায় জড়িয়ে থাকেননি, বড়ো জোর কোনও কলেজে বা স্কুলে মাঝে-মধ্যে পড়িয়েছেন। প্রায়ই আমার সঙ্গে গল্প করতেন অশ্রুদি, সাহিত্যের গল্প, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ কেচ্ছাকাহিনী, কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতায় দ্রুত প্রভাব বিস্তারের বৃত্তান্ত, নারী আন্দোলনে নানা সমস্যার প্রসঙ্গ। ওঁর সঙ্গে আলাপচারিতা থেকে জীবনের সেই পর্বে প্রচুর প্রেরণা পেয়েছি, সাহিত্যিক তথা রাজনৈতিক প্রেরণা। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, তবু তিনি আমার গতিবিধির খেয়াল রাখতেন, গোটা-গোটা অক্ষরে মাঝে-মধ্যে চিঠি দিতেন কুশল অনুসন্ধান করে। অশ্রুদি যখন মৃত্যুশয্যায়, খবর পাঠিয়েছিলেন, কী কারণে দেখতে যেতে পারিনি, এখন তো শুধু মনস্তাপ।

সম্ভবত আটাত্তর অথবা উনআশি সাল, জ্যোতিবাবুর সঙ্গে দিল্লি যাচ্ছি, আমরা বিমানের দোরগোড়ায় পাশাপাশি দু'টি আসনে উপবিষ্ট, ডান দিকে তাকিয়ে দেখি একই সারণিতে চার-পাঁচটি আসন পেরিয়ে ভূপেশ গুপ্ত বসে আছেন, তিনিও দিল্লি যাচ্ছেন। ভূপেশবাবু আমাদের সহযাত্রী জ্যোতিবাবুকে তা জানালাম, জ্যোতিবাবুর নিরাসক্তি, যেন শুনেও শোনেননি, কিংবা ওধরনের সমাপতন তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, উনি গা করলেন না। জ্যোতিবাবুর উচ্ছ্বাসহীনতায় আমি থতমত, নিজেও উঠে গিয়ে ভূপেশবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসা থেকে বিরত রইলাম। খানিক বাদে ভূপেশবাবু একটি কম্বলে সারা শরীর ঢেকে ঘুমিয়ে পড়লেন, অন্তত তা-ই মনে হলো। পরের সপ্তাহে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আমার ঘরে ঢুকলেন, ভূপেশবাবু নাকি দুঃখ করে বলেছেন, 'জ্যোতি বসু-অশোক মিত্র কেউই আমাকে চিনলেন না।' লজ্জায় শীর্ণ হয়ে বিশ্বনাথবাবুকে সেদিনকার ঘটনার বিবরণ দিলাম, অমার্জনীয় অপরাধ করেছি সেই স্বীকারোক্তি-সহ। এমনই ভাগ্যলিখন, কিছুদিনের মধ্যেই ভূপেশ গুপ্তের মৃত্যু, ওঁর সঙ্গে দেখা করে ক্ষমাভিক্ষার সুযোগ আর হলো না।

ষাটের দশকের বেশ কিছুটা সময় মধ্য কলকাতায় একটি সরকারি ফ্ল্যাটে অবস্থান করছিলাম। ওই ঠিকানায় এক ব্যস্ত দপ্তর, একশো-দেড়শো মানুষ হয়তো কাজ করতেন। প্রত্যহ ভোরবেলা চোখে পড়তো শতচ্ছিন্ন শাড়ি-পরিহিতা এক মধ্যবয়সী মহিলাকে, এক হাতে তোলা উনুন ঝোলানো, অন্য হাতে ময়দা-সব্জি-রান্নার সরঞ্জাম, কপালে চওড়া সিঁদুর, জিনিশের ভারে শরীর ঝুঁকে পড়েছে, সারা দিন দপ্তরের কর্মীদের চা-খুচরো খাবার পরিবেশন করতেন, সন্ধ্যার অন্ধকার নামলে দিনাতিপাতের সমস্ত ক্লান্তি নিয়ে ফিরে যেতেন, হয়তো মনোহরপুকুরের বস্তিতে, হয়তো যাদবপুরে উদ্বাস্তু কলোনির আশ্রয়ে : দিনের পর দিন একই দৃশ্য। দেশভাগে বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনে যে-লাঞ্ছনা ও গ্লানির ঢল, ওই মহিলার গরিমাহীন বেঁচে থাকার সাধনার মধ্যে যেন সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার প্রতিচ্ছায়া দেখতে পেতাম। অপরাধবোধে ডুবে যেতাম, এখনও যাই : আমার মতো কয়েকজন বাস্তুচ্যুত হওয়ার অভিশাপ থেকে ভাগ্যগুণে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছি, উনি পারেননি, লজ্জা আমাদের, ওঁর নয়, ওঁর কাছে আভূমিলম্বিত হয়ে যদি ক্ষমাপ্রার্থনা না করি, সেটা আমার কাপুরুষতা।

সাহস ও চিত্তঅবৈকল্যের একটি অত্যাশ্চর্য দৃষ্টান্ত। রাজ্যসভার অধিবেশনের ফাঁকে কী কারণে একদিন-দু'দিনের জন্য কলকাতা এসেছি। জনৈকা নিকটাত্মীয়া মাসখানেকের উপর অসুস্থ, কিছু খেতে পারছেন না, যাই-ই খাচ্ছেন বেরিয়ে আসছে, পাড়ার চিকিৎসকরা ধরতে পারছেন না ব্যাধির উৎস। সঙ্গে করে দিল্লি নিয়ে এলাম, পরদিন হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দিয়ে তন্ন তন্ন পরীক্ষা, সোনোগ্রামে সন্ধ্যাবেলা ধরা পড়লো, কর্কট রোগ দ্রুত সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে, বাইরে অথচ কোনও ব্যথানুভব নেই, কলকাতার চিকিৎসকরা তাই ধরতে পারেননি; এখন যা অবস্থা, আয়ু সম্ভবত আর মাত্র মাসখানেক-মাসদেড়েক। মহিলা কলকাতায় ফিরতে চাইলেন, ফেরার পর অস্ত্রোপচার, কিন্তু কয়েক সপ্তাহের বেশি বাঁচলেন না।

যেদিন দিল্লিতে রোগ ধরা পড়লো, সন্ধ্যাবেলা পাণ্ডারা পার্কের বাড়ির বারান্দায় সবাই নিচু টেবিল ঘিরে উপবিষ্ট। আমাদের মুখে কথা সরছে না, একমাত্র সেই মহিলা নিজে অকুতোভয়। পরম উৎসাহে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রকৃতি ও প্রেমের গান গাইলেন

দাপটের সঙ্গে, এমনকি 'আসিবে ফাল্গুন পুন, তখন আবার শুনো, নব পথিকের গানে নূতনেরই বাণী...'। এখানেই সাঙ্গ দিলেন না, আমাদের সঙ্গে মস্ত আলোচনায় যোগ দিলেন, 'প্রকৃতি' ও 'প্রেম' পর্যায়ের কোন-কোন গানগুলি কার কতটা পছন্দ, তাঁর নিজের কোন-কোনগুলি বেশি পছন্দ। যেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি, যেন তাঁর ক্ষেত্রেও পৃথিবী প্রতিদিন যথানিয়মে সূর্যের চারপাশে আবর্তিত হবে, ব্যত্যয়ের প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। প্রাচীন সাহিত্যে এই মহিলাদেরই বোধহয় বীরাঙ্গনা বলে অভিহিত করা হতো।

বর্ধমানের কৃষ্ণচন্দ্র হালদার, কৃষক নেতা, প্রাক্তন রাজ্যমন্ত্রী ও সাংসদ, বয়সে আমার চেয়ে হয়তো দশ বছরের বড়ো, আস্তে কথা বলেন, আলাপে রুচির স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ে। রানীগঞ্জ না আসানসোল ঠিক মনে নেই, অন্য কমরেডদের সঙ্গে কেষ্টবাবুও আমাকে স্টেশন থেকে নিয়ে যেতে এসেছেন। একটু হড়বড় করে নামতে গেছি, পা পিছলোবার উপক্রম, কেষ্টবাবুর অসমর্থ শরীর, লাঠি নিয়ে হাঁটেন, পতনোদ্যত আমাকে নিজের শারীরিক অসুবিধার কথা ভুলে গিয়ে দৃঢ় বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন, মস্ত দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচালেন, ধন্যবাদ দিতে গিয়ে লজ্জায় স্তব্ধ হয়ে এলাম। তাঁর সঙ্গে ইদানীং দেখা হয় না, প্রতিদিন মনে-মনে সম্ভাষণ জানাই।

যে যা-ই বলুক, পৃথিবীতে মহত্ত্বেরও শেষ নেই। জোন রবিনসন, বিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনবিজ্ঞানী, আমাকে স্নেহদানে ধন্য করেছেন পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। চিন্তার দিক থেকে শ্রেণীত্যাগের তাঁর চেয়ে বড়ো উদাহরণ আমার অভিজ্ঞতায় চোখে পড়েনি। পিতা প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ, জোন ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছেন, কেমব্রিজে কেইনসের প্রিয় ছাত্রী, প্রথম জীবনে কেইনসের আদর্শ-ও তত্ত্ব ঘেঁষা জোনের গবেষণা-বইপত্তর। বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ থেকে বিবেকের অলিন্দে উত্তরণ, উদারনীতি বর্জন করে সাম্যবাদে প্রত্যয়, তারপর একটু-একটু করে বাম থেকে অতিবাম বৃত্তে। আমাকে সঙ্গী করে তিনি পঞ্চান্ন সালে দশদিন ধরে মধ্যপ্রদেশের মন্দির-পর্বত-উপত্যকা ঘুরে বেরিয়েছিলেন, খজুরাহোর স্থাপত্যসৌন্দর্যে দৃশ্যত তাঁর একাগ্রতা নেই, ধৈর্য ধরে তিনি আমাকে বোঝাচ্ছেন সোভিয়েট নেতারা 'লৌহ যবনিকা' তৈরি করে সমাজের মহৎ উপকার করেছেন, পশ্চিমের কুরুচির নিদর্শনাদি আর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে ঢুকতে পারছে না। এই গোছের মতামত চেঁচিয়ে কেমব্রিজের রাস্তাঘাটে ব্যক্ত করতে তাঁর ন্যূনতম জড়তা ছিল না। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঘোর-লাগা মরশুমে চীন গিয়েছিলেন, বেজিং থেকে সোজা দিল্লি, মাও পোষাকভূষিতা, ভারতবর্ষে যে ক'দিন রইলেন, সর্বদা ওই পোশাকে। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন মাঝে-মাঝে কেমব্রিজ যেতাম, হইহই রইরই, জোন রবিনসন, যেন উৎসবের ঋতু, বামপন্থী অর্থনীতিবিদদের জড়ো করতেন, এক সঙ্গে আমরা ঘুরবো-ফিরবো-ভোজনকক্ষে প্রবেশ করবো, অন্যরা তাকিয়ে দেখুক পৃথিবীর ভবিষ্যৎ আমাদের হাতের মুঠোয়, চিন্তার কন্দরে।

নির্বাচনের মাস, উদ্‌ভ্রান্তের মতো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, জেলা থেকে জেলান্তরে, বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি। বাঁকুড়া জেলার মেদিনীপুর-ঘেঁষা এক প্রত্যন্ত গ্রাম, হয়তো রায়পুর কেন্দ্রে, হয়তো তালডাংরায়, ঊর্ধ্বশ্বাস বক্তৃতা দিয়ে মঞ্চ থেকে নেমেছি, পাঁচ মাইল দূরে অনুষ্ঠেয় পরের নির্বাচনী সভায় যথাশীঘ্র পৌঁছুতে হবে। দু'টি আদিবাসী মেয়ে, ঠিক যুবতী নয়, কিশোরীই বলা চলে, সুন্দর সেজেছে, কপালে কাঁচপোকার টিপ, পুঞ্জিত অভিমান নিয়ে

রাস্তা আটকে শাসন করলো : 'এত কম সময় নিয়ে আসিস কেনে?' তাদের ভর্ৎসনা বুকে কশাঘাতের মতো বাজলো। এদের স্নেহ-অনুরাগ-আনুগত্য আমরা কি স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়েছি? এরাই তো বাঁচায় আমাদের, অথচ এদের জন্য আমাদের সময়ের বরাদ্দ উড়ো-খই-গোবিন্দকে দেওয়ার মতো অবহেলার উপচার : এই পাপেরও তো ক্ষমা নেই। আসলে যতই গলাবাজি করি, বঞ্চনাদ্বীপ পার হয়ে এদের জনসমুদ্রের ঠিকানা দেখিয়ে দেওয়ার মুরোদ আমাদের নেই, এরা নিজেরাই পথ কেটে এগোবে।

বছর সতেরো আগে নরওয়েতে যে-দু'মাস কাটিয়েছিলাম, শেলী নাম্নী একটি বাংলাদেশী মেয়ে, মনসুর হবিবুল্লাদের সম্পর্কে জ্ঞাতি, আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছিল, তার সুনিপুণ গৃহস্থালির কাছে আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিন্ত ছিলাম, তার বকুনি-শাসনের কাছেও আত্মসমর্পণ করে। বহুদিন তার খবর পাই না; যে-আদর তাকে যথাযোগ্য ফিরিয়ে দিতে পারিনি, তার স্মৃতি এখন অহরহ তাড়া করে ফেরে।

অন্য এক স্মৃতি। সকাল দশটা কি সাড়ে দশটার ব্যস্ত সময়, ক্যামাক স্ট্রিট দিয়ে এগোচ্ছি, মিডলটন স্ট্রিটের মুখে সুভো ঠাকুর রাস্তা পেরোচ্ছেন। গাড়ি থেকে নেমে আমার প্রীতিসম্ভাষণ : 'সুভোবাবু, কেমন আছেন?' পরনে শৌখিন বাটিকের-কাজ-করা লুঙ্গি, আজানুলম্বিত রঙিন কুর্তা, এক গাল হেসে সুভোবাবুর প্রত্যভিবাদন : 'চোখে ভালো দেখতে পাই না, কানে শুনি না, দাঁতগুলো সব খসে পড়েছে, লিভারে পচন, জানেন তো স্ত্রীবিয়োগ ঘটেছে, নিদারুণ অর্থকষ্ট, কিন্তু খাশা আছি।'

কলেজ স্কয়্যারের কফি হাউসে, হয়তো পঞ্চাশ দশকের মধ্যক্ষণে, নয়তো ষাটের দশকের উত্তাল মুহূর্তে, প্রায়ই এক সতত-অস্থির যুবকের সঙ্গে দেখা হতো। অপুষ্টিতে শীর্ণ শরীর, আর্থিক দৈন্যের ক্লিষ্টতা তাকে জড়িয়ে, মলিন আকাচা পরিধেয়, পায়ে ক্ষয়ে-যাওয়া চটি, অথচ চোখ দু'টি এক অজ্ঞাত আবেগে জ্বলছে। গ্রাসাচ্ছাদনের সামর্থ্য নেই, কিন্তু, কখনও-কখনও পয়সার অভাবে পায়ে হেঁটেই, যুবকটির প্রত্যহ আলিপুরে জাতীয় গ্রন্থাগারে গিয়ে পুঁথি ঘাঁটা চাই, সে গবেষণায় ব্যাপৃত, বিষয় অষ্টাদশ শতকীয় ফরাশি রন্ধনশিল্প। বাঙালি সাহস, বাঙালি রোমান্টিকতা, অসম্ভবকে হাতের নাগালে পাওয়ার দুর্মর দুরাশা। কোথায় সেই যুবক হারিয়ে গেছে জানা নেই, তার সাহসের স্মৃতি অথচ অহরহ প্রহার করে।

নিরন্তর প্রহৃত হই এক ক্ষোভযুক্ত গ্লানিবোধ থেকেও। পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী সুশীল চৌধুরী, প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে প্রায় বার্ধক্যে উপনীত, নিষ্ঠা, সততা ও ভালোত্বের মাপকাঠিতে তাঁর তুলনা নেই, নৃশংসভাবে খুন হয়ে গেলেন, অথচ আজ পর্যন্ত অপরাধীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে। এই অকৃতকার্যতার দায়ভার কেউ-ই তো আমরা এড়াতে পারি না, বিবেককে কোন প্রণালীতে ঘুম পাড়িয়ে রাখবো?

উত্তপ্ত রাজনৈতিক তর্ক চলছে, আদর্শ ও নীতির চুলচেরা বিশ্লেষণ; যুক্তির প্রয়োগে অসফল বলেই হয়তো, আমার দিক থেকে বিবেকের প্রসঙ্গ উত্থাপন; এক শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক নেতা আমাকে উদ্দেশ করে কেটে-কেটে বললেন, 'মশাই, আপনি ধরে নিয়েছেন আপনার একারই বিবেক আছে, আমাদের নেই?' যে-ভর্ৎসনা আমার প্রাপ্য, তা-ই পেলাম। যার নম্রতা নেই সে নিঃস্ব। ভোরের বেলার তারার কাছে আমার কিছু কথা আছে, কিন্তু এমন কথা লক্ষ-কোটি অন্য মানুষদেরও তো আছে, তাঁদের কাছে তাঁদের কথার গুরুত্ব আমার কাছে আমার কথার গুরুত্ব থেকে কোনও অংশে কম নয়। নিজেকে সংবৃত রাখার চেয়ে বড়ো কর্তব্য তাই, মানতেই হয়, অচিন্তনীয়।

সেই ন্যূনতম কর্তব্যপালনে আমি বরাবর ব্যর্থ। সুভো ঠাকুরের অবিচল নিরাসক্তিও আমার আয়ত্তের বাইরে। আরও যা যোগ করতে হয়, 'এক বর্ষার বৃষ্টিতে যদি মুছে যায় নাম,/এত পথ হেঁটে, এত জল ঘেঁটে কী তবে হলাম', অন্তরঙ্গ কবিবন্ধুর এই আর্তবিলাপের শরিক হওয়ারও আমি সমান অনুপযুক্ত। সায়াহ্নসময়ে নিঃশেষ, নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে চাই আমি, যে-কারও স্মৃতির ঝোলায় আমার একদা-অস্তিত্বের কুটোটিও যেন না পড়ে থাকে।

তা হলেও এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে দু'টি আলাদা, পরিস্বচ্ছ, চরিতার্থতাবোধ: এক, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমার জন্ম; দুই, আমার চেতনা জুড়ে মার্কসীয় প্রজ্ঞার প্লাবিত বিভাস।

আপিলা-চাপিলাদের পালা ফুরোলো।

নির্ঘণ্ট (ব্যক্তিনাম)